মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীঅলোক রায়
শ্রীঅরুণকুমার বসু
শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র
শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্য
শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্তী
শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ

শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

মূল্য : ১৬০ টাকা

ISBN 81-86908-66-8
ISBN 81-86908-76-6

প্রকাশক

সচিব, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০

মুদ্রাকর

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১২

সূচি : দ্বিতীয় খণ্ড

চিত্রপরিচয়

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের এক অলোকসামান্য পুরুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আটচল্লিশ বছরের অকাল-নিমীলিত জীবন ও আটাশ বছরের সৃষ্টিকালের মধ্যে তিনি রেখে গেছেন বিপুল দান হিসেবে ৩৯টি উপন্যাস, ২৬০-এর কিছুবেশি ছোটোগল্প এবং বেশকিছু কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও ছোটোদের উপযোগী রচনা। মৃত্যুর চারদশক পরেও এই ব্যতিক্রমী ও বিস্ময়সৃষ্টিকারী লেখক আমাদের সাহিত্যে ও মননে অনিবার্যভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন। স্রষ্টা মাত্রেই কিছু পরিমাণে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। কিন্তু মানিকের স্বাতন্ত্র্য ও গভীরতার রহস্যভেদ ও অনুসন্ধান আজও বোধ করি অসমাপ্ত। কল্লোলের কুলবর্ধন বলে তাঁকে দাবি করা হলেও তাঁর সাহিত্যে অতিরিক্ত যা ছিল তা হল অতিআধুনিকের প্রতিবাদ থেকে নাস্তিক্যের বিদ্রোহে উত্তরণ। যুগ-ব্যাধি তাঁর সাহিত্য শরীরের আয়তক্ষেত্রে নির্মম নিরাভরণ অথচ রহস্যময় রূপে ছড়িয়ে আছে। পারিবারিক আনুকূল্যের মসৃণজীবনের পথ ত্যাগ করে শুধুই সাহিত্যের জন্য যে অনিশ্চিত জীবন তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন, দুরারোগ্য ব্যাধি দারিদ্র্য সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও তার কক্ষপথের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের কেন্দ্রে ছিল সাহিত্যসাধনা। সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি সংলগ্ন যে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবন, তার ইতিবৃত্ত রচনায় মানিক-সাহিত্য অপরিহার্য।

এই ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধেই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসমগ্র প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। পাঠক-মনের সামনে থেকেও দৃষ্টির অগোচরে থেকে যাবে তাঁর রচনাবলি—এ কাম্য নয়। মানিক-সাহিত্যের সামগ্রিক সংকলন আজও অসম্পূর্ণ। মানিক-সাহিত্যচর্চা, বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে গবেষণা বেশকিছু হলেও মানিকের যাবতীয় রচনার সুসম্পাদিত পাঠ থেকে পাঠকসমাজ বঞ্চিতই রয়েছেন। এর আগে গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড সাধ্যমতো একপ্রস্থ রচনাবলি প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু দীর্ঘদিন তা বাজারলভ্য ছিল না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং লেখক-পরিবার ও গ্রন্থালয়-কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সমগ্র মানিক-রচনাবলি নতুন করে প্রকাশের পথে বাধা দূর হয়েছে। সকল পক্ষের ঐকমত্যে এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে বাংলা আকাদেমির উপর। কাজটি সহজসাধ্য নয়।

লেখকের ভগ্নস্বাস্থ্য, গৃহিণীপনার অভাব, বারবার বাসস্থান-পরিবর্তন, প্রথম যুগের প্রকাশকদের অন্যমনস্কতা ইত্যাদি কারণে যাবতীয় পাণ্ডুলিপি, প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম সংস্করণের প্রকাশ সময় ইত্যাদি সংগ্রহ করা সহজ নয়। তবে শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় . ডায়েরি ও চিঠিপত্র' গ্রন্থ প্রকাশ করে প্রামাণ্য তথ্যসংগ্রহের কাজ অনেকটাই সহজ করে দিয়েছেন। লেখকের পরিবারের পক্ষ থেকে দুর্লভ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আকাদেমির অভিলেখাগারে প্রদান করার ফলেও কিছুকিছু পাঠনির্ণয়ে অভাবনীয় সুবিধা ঘটেছে। কাজে হাত দিয়ে দেখা যাচ্ছে কিছু রচনা এখনও অসংকলিত রয়েছে, বহু তথ্য সন্ধান করতে হচ্ছে, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখকের সংশোধন-পরিমার্জন-পরিবর্তন ইত্যাদি পর্যালোচনা করে কৌতূহল-সৃষ্টিকারী বহু বিষয় পাওয়া যাচ্ছে। বাংলা আকাদেমি এই দুরূহ অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পাদনের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করেছে এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে যথাসম্ভব প্রথম প্রকাশের ক্রম অনুসারে দশখণ্ডে এই রচনাসমগ্র প্রকাশে ব্রতী হয়েছে।

মানিক-পরিবারের সর্বাঙ্গীণ সহায়তা, সম্পাদকমণ্ডলীর শ্রম ও দক্ষতায় মানিক-সাহিত্যের এক আদর্শ-পাঠ পাঠকসমাজের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। বহু নতুন তথ্য, দুষ্প্রাপ্য দলিল এবং লেখকের বিভিন্ন সময়ের স্বল্পপরিচিত ছবি, পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ রচনাসমগ্রের আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়েছে। গ্রন্থপরিচয় ও পরিশিষ্ট অংশ এই রচনাবলির অন্যতম সম্পদ। বানানের সমতাবিধানের প্রয়োজনে বাংলা আকাদেমির বানানবিধি এবং যুক্তাক্ষরের স্বচ্ছতা-প্রয়াস অনুসৃত হয়েছে। প্রকাশনসৌষ্ঠব ও সম্পাদনার উন্নতমান অক্ষুণ্ণ রেখে দাম যথাসম্ভব পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের সহায়তার ফলেই এটা সম্ভব হল। এই প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে যাঁরা জড়িত রয়েছেন তাঁদের সকলের কাছেই বাংলা আকাদেমি কৃতজ্ঞ। প্রথম খণ্ড প্রকাশের পরে সমস্ত মহল থেকেই প্রশংসা পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হল সময়সূচি রক্ষা করেই। ত্রুটি মুক্ত করার সার্বিক প্রচেষ্টাও করা হয়েছে।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

সচিব

সংশোধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রসঙ্গে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্রের দ্বিতীয় খণ্ড বাংলা আকাদেমি-র প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। বৎসরকালের মধ্যেই প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডেরও পুনর্মুদ্রণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টির জনপ্রিয়তা ও মহার্ঘতার সুনিশ্চিত পরিচায়ক। কালজয়ী লেখকের রচনাবলি এতকাল ক্রেতা-পাঠকের কাছে সহজলভ্য ছিল না। প্রকাশের পর সেগুলির দ্রুত প্রচারে প্রকাশক হিসাবে বাংলা আকাদেমির উদ্যোগ কৃতার্থ হল।

বর্তমান মুদ্রণে পূর্বতন মুদ্রণের কিছু অসংগতি ও ত্রুটি যথাসম্ভব দূরীভূত হয়েছে। মুদ্রিত গ্রন্থগুলির পাঠের ক্ষেত্রে বাংলা আকাদেমিসম্মত বানানবিধি অনুসরণ করে সেই পাঠ-কে অধিকতর নির্ভুল করার চেষ্টা হয়েছে। ইতিমধ্যে পদ্মানদীর মাঝি-র পূর্বাশায় প্রকাশিত প্রথম পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং গ্রন্থপরিচয় অংশে যথাসম্ভব সে নিয়ে তথ্য সংযোজিত হয়েছে। তাছাড়া গ্রন্থপরিচয় অংশ পরবর্তী খণ্ডগুলির গ্রন্থপরিচয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে যথাসাধ্য সংশোধিত অথবা পুনর্লিখিত হয়েছে এবং সর্বতোভাবে প্রকাশনার সৌষ্ঠব ও উন্নতমান অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

আশা করি বর্তমান সংশোধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরাগী জনসাধারণের কাছে অনুরূপ সমাদর লাভ করবে।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
সচিব

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
সচিব
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
সংস্কৃতি অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী
শ্রীসুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী
শ্রীঅংশু শূর
শ্রীনিমাই ঘোষ

তথ্যসংগ্রহে সহায়তা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
বয়েজ ওন লাইব্রেরি
বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি
রামমোহন লাইব্রেরি
চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্ক লোকাল স্টাফ লাইব্রেরি
বরানগর পিপল্‌স লাইব্রেরি
ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ক্লাব লাইব্রেরি
হিরণ লাইব্রেরি
শ্রীপ্রভাতকুমার দাস
শ্রীঅশোক উপাধ্যায়
শ্রীদীপন চট্টোপাধ্যায়
শ্রীবিমান রায়
শ্রীদীপঙ্কর ভট্টাচার্য

সম্পাদনা সহায়তা

শ্রীনৃপেন্দ্র সাহা
শ্রীকবীর সেনবরাট
শ্রীমতী ঈশানী মৈত্র
শ্রীমতী অপর্ণা দাস
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীঅমলকুমার রায়
শ্রীনন্দদুলাল সেনগুপ্ত
শ্রীপারিজাতবিকাশ মজুমদার



জন্ম : ১৯ মে ১৯০৮ মৃত্যু : ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬

পদ্মানদীর মাঝি



পদ্মানদীর মাঝি প্রথম সংস্করণেব প্রচ্ছদ

বর্ষার মাঝামাঝি।

পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরশুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোনো সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীব বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে নৌকার আলো ওগুলি। সমস্ত বাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকাবে দুর্বোধ্য সংকেতেব মতো সঞ্চালিত হয়। এক সময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়। শহরে গ্রামে রেল স্টেশনে ও জাহাজঘাটে শ্রান্ত মানুষ চোখ বুজিয়া ঘুমাইযা পড়ে। শেষ রাত্রে ভাঙা ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি ওঠে। জেলে নৌকার আলোগুলি তখনও নেভে না। নৌকার খোল ভবিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ। লণ্ঠনের আলোয মাছের আঁশ চকচক করে, মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণিব মতো দেখায়।

কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতেছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। নৌকায় আরও দুজন লোক আছে। ধনঞ্জয় এবং গণেশ। তিনজনের বাড়িই কেতুপুর গ্রামে।

আরও দু মাইল উজানে পদ্মার ধাবেই কেতুপুর গ্রাম।

নৌকাটি বেশি বড়ো নয়। পিছনের দিকে সামান্য একটু ছাউনি আছে। বর্ষা-বাদলে দু তিন জনে কোনোরকমে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারে। বাকি সবটাই খোলা। মাঝখানে নৌকার পাটাতনে হাত দুই ফাঁক রাখা হইয়াছে। এই ফাঁক দিয়া নৌকাব খোলেব মধ্যে মাছ ধরিয়া জমা করা হয। জাল ফেলিবার ব্যবস্থা পাশের দিকে। ত্রিকোণ বাঁশেব ফ্রেমে বিপুল পাখার মতো জালটি নৌকাব পাশে লাগানো আছে। জালের শেষ সীমাব বাঁশটি নৌকার পার্শ্বদেশের সঙ্গে সমান্তবাল। তাব দুই প্রান্ত হইতে লম্বা দুটি বাঁশ নৌকাব ধারে আসিয়া মিশিয়া পরস্পবকে অতিক্রম কবিয়া নৌকার ভিতরে হাত দুই আগাইয়া আসিয়াছে। জালের এ দুটি হাতল। এই হাতল ধরিযা জাল উঠানো এবং নামানো হয়।

গভীর জলে বিবাট ঠোঁটেব মতো দুটি বাঁশে বাঁধা জাল লাগে। দড়ি ধবিয়া বাঁশেব ঠোঁট হাঁ-করা জাল নামাইয়া দেওয়া হয। মাছ পড়িলে খবর আসে জেলেব হাতের দড়ি বাহিয়া, দড়ির দ্বারাই জলের নীচে জালের মুখ বন্ধ করা হয়।

এ নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি। জালটাও তারই। প্রতিবাত্রে যত মাছ ধবা হয় তাব অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের, বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের। নৌকা এবং জালের মালিক বলিয়া ধনঞ্জয় পবিশ্রম করে কম। আগাগোড়া সে শুধু নৌকাব হাল ধরিযা বসিয়া থাকে। কুবেব ও গণেশ হাতল ধবিযা জালটা জলে নামায় এবং তোলে, মাছগুলি সঞ্চয করে। পদ্মার ঢেউয়ে নৌকা টলমল করিতে থাকে, আলোটা মিটমিট করিযা জ্বলে, জোব বাতাসেও নৌকার চিরস্থায়ী গাঢ় আঁশটে গন্ধ উড়াইয়া লইযা বাইতে পারে না। এক হাত একখানি কাপড়কে নেংটির মতো কোমরে জড়াইযা ক্রমাগত জলে ভিজিয়া ও শীতল জলোবাতাসে শীত বোধ করিযা, বিনিদ্র আরক্ত চোখে লণ্ঠনের মৃদু আলোয় নদীব অশান্ত জলরাশির দিকে চাহিযা থাকিয়া কুবের ও গণেশ সমস্ত বাত মাছ ধবে। নৌকা স্রোতে ভাসিয়া যায়। বইঠা ধরিয়া নৌকাকে তারা ঠেলিয়া লইয়া আসে সেইখানে যেখানে একবার একেবারে ঝাঁকের মধ্যে জাল ফেলিয়া বেশি মাছ উঠিয়াছিল। আজ খুব মাছ উঠিতেছিল। কিন্তু ভোরে দেবীগঞ্জে মাছের দর না জানা অবধি এটা সৌভাগ্য কিনা বলা যায় না। সকলেরই যদি এ রকম মাছ পড়ে দর কাল এত নামিয়া যাইবে যে বিশেষ কোনো লাভের আশা থাকিবে না। তবে বড়ো মাছের বড়ো ঝাঁক একই সময়ে সমস্ত নদীটা জুড়িয়া থাকে না, এই যা ভরসার কথা। বেশি মাছ সকলের নাও উঠিতে পাবে।

কুবের হাঁকিয়া বলে, যদু হে এ এ এ—মাছ কিবা ?

খানিক দূরের নৌকা হইতে জবাব আসে, জবর।

জবাবের পর সে নৌকা হইতে পালটা প্রশ্ন করা হয়। কুবের হাঁকিয়া জানায় তাদেরও মাছ পড়িতেছে জবর।

ধনঞ্জয় বলে, সাঁঝের দরটা জিগা দেখি কুবের।

কুবের হাঁকিয়া দাম জিজ্ঞাসা করে। সন্ধ্যা বেলা আজ পৌনে পাঁচ, পাঁচ এবং সওয়া পাঁচ টাকা দরে মাছ বিক্রি হইয়াছে। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলে, কাইল চাইরে নামবো। হালার মাছ ধইরা যুত নাই।

কুবের কিছু বলে না। ঝপ করিয়া জালটা জলে ফেলিয়া দেয়।

শরীরটা আজ তাহার ভালো ছিল না। তার স্ত্রী মালা তাকে বাহির হইতে বারণ করিয়াছিল। কিন্তু শরীরের দিকে তাকাইবার অবসর কুবেরের নাই। টাকার অভাবে অখিল সাহার পুকুরটা এবারও সে জমা লইতে পারে নাই। সারাটা বছর তাকে পদ্মার মাছের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। এ নির্ভরও বিশেষ জোরালো নয়, পদ্মার মাছ ধরিবার উপযুক্ত জাল তার নাই। ধনঞ্জয় অথবা নড়াইলের যদুর সঙ্গে সমস্ত বছর তাকে এমনি ভাবে দুআনা চারআনা ভাগে মজুরি খাটিতে হইবে। ইলিশের মরশুম ফুরাইলে বিপুলা পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়। নিজের বিরাট বিস্তৃতির মাঝে কোনখানে সে যে তার মীন সন্তানগুলিকে লুকাইয়া ফেলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। নদীর মালিককে খাজনা দিয়া হাজার টাকা দামের জাল যারা পাতিতে পারে তাদের স্থান ছাড়িয়া দিয়া, এতবড়ো পদ্মার বুকে জীবিকা অর্জন করা তার মতো গরিব জেলের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ধনঞ্জয় ও যদুর জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থায় যা মাছ পড়ে তার দু-তিনআনা ভাগে কারও সংসার চলে না। উপার্জন যা হয় এই ইলিশের মরশুমে। শরীর থাক আর যাক এ সময় একটা রাত্রিও ঘরে বসিয়া থাকিলে কুবেরের চলিবে না।

মাঝরাত্রে একবার তারা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছে। রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে কুবের বলিল, একটু জিরাই গো আজান খুড়া।

জিরানের লাইগা মরস্ ক্যান ক দেহি ? বাড়িত্ গিয়া সারাডা দিন জিরাইস। আর দুই খেপ দিয়া ল।

কুবের বলিল, উহুঁ তামুক বিনা গায়ে সাড় লাগে না। দেহখান জানগো আজান খুড়া, আইজ বিশেষ ভাল নাই।

জাল উঁচু করিয়া রাখিয়া কুবের ও গণেশ ছইয়ের সামনে বসিল। ছইয়ের গায়ে আটকানো ছোটো হুঁকাটি নামাইয়া টিনের কৌটা হইতে কড়া দা-কাটা তামাক বাহির করিয়া দেড় বছর ধরিয়া ব্যবহৃত পুরাতন কল্কিটিতে তামাক সাজিল কুবের। নারিকেল ছোবড়া গোল করিয়া পাকাইয়া ছাউনির আড়ালে একটিমাত্র দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করিয়া সেটি ধরাইয়া ফেলিল। বারো বছর বয়স হইতে অভ্যাস করিয়া হাত একেবারে পাকিয়া গিয়াছে।

নৌকা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল।

এক হাতে তীরের দিকে কোনাকুনি হাল ধরিয়া ধনঞ্জয় হাতটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল, দে কুবের, আমারে দে, ধরাই।

কলিকাটি তাহার হাতে দিয়া কুবের রাগ করিয়া বসিয়া রহিল।

কুবেরের পাশে বসিয়া গণেশ বাড়াবাড়ি রকমের কাঁপিতেছিল। এ যেন সত্যসত্যই শীতকাল।

হঠাৎ সে বলিল, ইঃ আজ কী জাড় কুবির !

কথাটা কেহ কানে তুলিল না। কারও সাড়া না পাইয়া কুবেরের হাঁটুতে একটা খোঁচা দিয়া গণেশ আবার বলিল, জানস কুবির আইজকার জাড়ে কাঁইপা মরলাম।

এদের মধ্যে গণেশ একটু বোকা। মনের ক্রিয়াগুলি তার অত্যন্ত শ্লথ গতিতে সম্পন্ন হয়। সে কোনো কথা বলিলে লোকে যে তাহাকে অবহেলা করিয়াই কথাটা কানে তোলে না এটুকুও সে বুঝিতে পারে না। একটা কিছু জবাব না পাওয়া পর্যন্ত বারবার নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে। ধমকের মতো করিয়া যদি কেউ তার কথার জবাব দেয় তাতেও সে রাগ করে না। দুঃখও তাহার হয় কিনা সন্দেহ।

কুবেরের সে অত্যন্ত অনুগত। জীবনের ছোটোবড়ো সকল ব্যাপারে সে কুবেরের পরামর্শ লইয়া চলে। বিপদে আপদে ছুটিয়া আসে তাহারই কাছে। এক পক্ষের এই আনুগত্যের জন্য তাহাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বটি স্থাপিত হইয়াছে তাহাকে ঘনিষ্ঠই বলিতে হয়। দাবি আছে, প্রত্যাশা আছে, সুখদুঃখের ভাগাভাগি আছে, কলহ এবং পুনর্মিলনও আছে। কিন্তু গণেশ অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির বলিয়া ঝগড়া তাহাদের হয় খুব কম।

পুড়িয়া শেষ হওয়া অবধি তাহারা পালা করিয়া তামাক টানিল। নৌকা এখন অনেক দূর আগাইয়া আসিয়াছে। কলিকার ছাই জলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া হুঁকাটি ছইয়ে টাঙাইয়া দিযা জাল নামাইয়া কুবের ও গণেশ বইঠা ধরিল।

গণেশ হঠাৎ মিনতি করিয়া বলিল, একখান গীত ক দেখি কুবির ?

হ, গীত না তর মাথা।

কুবেরের ধমক খাইয়া গণেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বহিল। তারপর নিজেই ধরিয়া দিল গান। সে গাহিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ধনঞ্জয় ও কুবের মন দিয়া গানেব কথাগুলি শুনে। (যে যাহারে ভালোবাসে সে তাহারে পায় না কেন, গানে এই গভীর সমস্যার কথা আছে। বড়ো সহজ গান নয়।)

পুবদিক লাল হইয়া ওঠা পর্যন্ত তাহারা জাল ফেলিয়া বেড়াইল তারপর রওনা হইল জাহাজ ঘাটেব দিকে। সেখানে পৌঁছিতে পৌঁছিতে চারিদিক আলো হইয়া উঠিল।

নদীর তীরে, নদীর জলে এখন জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। থাকিয়া থাকিযা স্টিমারের বাঁশি বাজিয়া উঠে। সশব্দে নোঙর তুলিয়া কোনো স্টিমার ছাড়িয়া যায়, কোনো স্টিমার ভিড়ে গিয়া জেটিতে। কলিকাতা হইতে মেল ট্রেনটি আসিয়া পড়িয়াছে. ঘাটের ও স্টেশনেব দোকানপাট সমস্ত খোলা হইয়াছে। অনেকে নদীর জলে স্নান করিতে নামিয়াছে। মোটবাহী ও যাত্রীবাহী অসংখ্য ছোটোবড়ো নৌকা ঘাটে ভিড় করিয়া আসিয়াছে। ঘাটের দুদিকে বহুদূর অবধি তীর ঘেঁষিয়া কাদায় পোঁতা লগির সঙ্গে বাঁধা আরও যে কত নৌকা তার সংখ্যা নাই।

নদীতে শুধু জলের স্রোত। জলেস্থলে মানুষের অবিরাম জীবনপ্রবাহ।

মেছো নৌকার ঘাটটি একপাশে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি নৌকা মাছ লইয়া হাজির হইয়াছে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে স্থানটি হইয়া উঠিয়াছে সরগরম। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দরাদরি সম্পন্ন হইয়া হরদম মাছ কেনাবেচা চলিতেছে। চালানের ব্যবস্থাও হইতেছে সঙ্গে সঙ্গেই।

এই ব্যস্ততা ও কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সমস্ত রাত্রিব্যাপী পরিশ্রমের ক্লান্তি ভুলিয়া কুবের প্রতিদিন খুশি হইয়া উঠে। আজ সে একেবারে ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল। শেষরাত্রির দিকে শীত করিয়া বোধ হয় তাহার জ্বরই আসিয়াছে। চোখ দুটো যে তাহার ভয়ানক লাল হইয়া উঠিয়াছে গণেশ তাহা দেখিতে পাইয়া বলিয়াছে চার-পাঁচবারের বেশি।

নেংটি ছাড়িয়া তিনহাতি ছোটো ময়লা কাপড়খানি পরিয়া কুবের তীরে উঠিল। কাদার মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার ও কাঠের টেবিল পাতিয়া চালানবাবু কেদারনাথ মাছ গোনা দেখিয়া খাতায় লিখিয়া যাইতেছে। একশো মাছ গোনা হইবা মাত্র তার চাকরটা হোঁ মারিয়া চালানবাবুর চাঁদা পাঁচটি

মাছ মস্ত একটা কেরোসিন কাঠের বাক্‌সে ভরিয়া ফেলিতেছে। পাশেই কাঠের প্যাকিং কেসে এক সারি মাছ ও এক পরল করিয়া বরফ বিছাইয়া চালানের ব্যবস্থা হইতেছে। খানিক দূরে মেন লাইন হইতে গায়ের জোরে টানিয়া আনা একজোড়া উঁচুনিচু ও প্রায় অকেজো লাইনের উপর চার-পাঁচটা ওয়াগন দাঁড়াইয়া আছে। মাছের বোঝাই লইয়া যথাসময়ে ওয়াগনগুলি কলিকাতায় পৌছিবে। সকালে বিকালে বাজারে বাজারে ইলিশ কিনিয়া কলিকাতার মানুষ ফিরিবে বাড়ি। কলিকাতার বাতাসে পাওয়া যাইবে পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ।

একটা ওয়াগনের আড়ালে দাঁড়াইয়া লম্বা শার্ট গায়ে বেঁটে ও মোটা এক ব্যক্তি অনেকক্ষণ হইতে কুবেরের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছিল। কুবের তাহার দিকে চাহিতেই সে হাতছানি দিয়া ডাকিল।

কুবের খানিকক্ষণ নড়িল না। উদাসভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কাছে গিয়া বলিল, কী কন ?

সে রাগ করিয়া বলিল, কী কন ! কী জানস না ? মাছ লইয়া আয়, তিনডা আনিস।

মাছ ত নাই শেতলবাবু।

নাই কী রে, নাই ? রোজ আমারে মাছ দেওনের কথা না তর ? নিয়া আয় গা, যা। বড়ো দেইখা আনিস।

কুবেব মাথা নাড়িল, আইজ পারুম না শেতলবাবু। আজান খুড়া সিদা মোর দিকে চাইয়া রইছে দেখ না ? বাজারে কেনো গা আইজ।

কিন্তু কুবের চুরি করিয়া যে দামে মাছ দেয় বাজারে কিনিতে গেলে তার তিনগুণ দাম পড়িবে। শীতল তাই হঠাৎ আশা ছাড়িতে পারিল না।

সে মিনতি করিয়া বলিল, তিনডা মাছ আইজ তুই দে কুবের। অমন করস ক্যান ? পয়সা নয় কয়ডা বেশিই লইস, আঁই ?

তালি খানিক খাড়াও শেতলবাবু।

কুবের ফিরিয়া গিয়া কাপড়টা ভালো করিয়া গায়ে জড়াইয়া নৌকায় বসিল। চারিদিকে চেনা লোক কম নয়। চুপিচুপি মাছ লইয়া তাহাকে তীরে উঠিতে দেখিলে নিশ্চয় সন্দেহ করিবে। লজ্জার তাহার সীমা থাকিবে না। তবে একটা ভরসার কথা এই যে সকলেই নিরতিশয় ব্যস্ত। নিজের নৌকা হইতে কে কোথায় দুটা মাছ চুরি করিতেছে তাকাইয়া দেখিবার অবসর কাহারও নাই। চারিদিকে নজর রাখিয়া তিনটা মাছ কুবের একসময় গায়ের কাপড়ের তলে লুকাইয়া ফেলিল। তীরে উঠিয়া শীতলের হাতে দিতেই মাছ কটা সে চটের থলির মধ্যে পুরিয়া ফেলিল।

পয়সা কাইল দিমু কুবের।

বলিয়া সে চলিয়া যায়, কুবেরও সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াইয়া বলিল, রন শেতলবাবু, অমন ত্বরা কইরা যাইয়েন না। দামটা দ্যান দেখি।

কাইল দিমু কইলাম যে ?

অহঁ, অখন দ্যান। খামু না ? পোলাগো খাওয়ামু না ?

পয়সা নাই ত দিমু কী ? কাইল দিমু, নিয্যস্ দিমু।

পিছল নরম মাটিতে পায়ের বুড়া আঙুল গাঁথিয়া গাঁথিয়া শীতল চলিয়া গেল। আরক্ত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে কুবের বলিল, হালা ডাকাইত ! বিড়বিড় করিয়া শীতলকে আরও কয়েকটা গাল দিয়া কুবের নৌকায় গিয়া গলুইয়ের দিকে গা এলাইয়া শুইয়া পড়িল।

গণেশটা বোকা। মাছের দাম বুঝিয়া পাওয়ার সময় একটু চেষ্টা করিয়াই ধনঞ্জয় তাহাকে সরাইয়া দিতে পারিয়াছিল। একা একা দাম লইবার সুযোগ সে কোনোদিনই প্রায় পায় না। কুবের

এই সময়টা জোঁকের মতো তাহার সঙ্গে লাগিয়া থাকে। টাকা পাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভাগটা বুঝিয়া লয়।

ধনঞ্জয় নৌকায় আসিলে মাথা উঁচু করিয়া কুবের জিজ্ঞাসা করিল, কতটি মাছ হইল আজান খুড়া ? শ চারের কম না, অ্যাঁ ?

ধনঞ্জয় মুখে একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করিয়া বলিল, হ, চাইরশ না হাজার। দুইশ সাত-পঞ্চাশখান মাছ। সাতটা ফাউ নিয়া আড়াইশর দাম দিছে।

কুবের উঠিয়া বসিল।

ইটা কী কও খুড়া ? কাইল যে এক্কেরে মাছ পড়ে নাই, কাইল না দুইশ সাতাইশটা মাছ হইছিল ?

ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ রাগ করিয়া বলিল, মিছা কইলাম নাকি রে কুবির ? জিগাইস না, গণেশ আইলে জিগাইস।

কুবের নরম হইয়া বলিল, জিগানের কাম কী ? তা কই নাই খুড়া। মিছা কওনের মানুষ তুমি না ! মাছ নি কাল বেশি বেশি পড়ছিল তাই ভাবলাম তোমারে বুঝি চালানবাবু ঠকাইছে।

ঘুমে ও শ্রান্তিতে কুবেরের চোখ দুটি বুজিয়া আসিতে চায় আর সেই নিমীলন-পিপাসু চোখে রাগে দুঃখে আসিতে চায় জল। গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটোলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটোলোক। এমন ভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ও ধর্ম-সম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছে। সে প্রতিবাদ করিতেও পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।

গণেশকে ধনঞ্জয় চিড়া কিনিতে পাঠাইয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিলে নৌকা খুলিয়া দেওয়া হইল। এখন বইঠা না ধরিলেও চলে। উজান স্রোতের টানে নৌকা আপনি গ্রামের দিকে ভাসিয়া চলিবে। গণেশ ও ধনঞ্জয় গুড় মুখে দিয়া শুকনো চিড়া চিবাইতে লাগিল। কুবের কিছু খাইল না। কেবল কয়েক আঁজলা নদীর জল পান করিল। নদীর বুক জুড়িয়া এখন ভাঙা ঢেউগুলির মাথায় অসংখ্য সূর্য জ্বলিয়া উঠিতেছে। কাকচিলা মাছরাঙা প্রভৃতি পাখিগুলি ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া মাছ ধরিতেছে। অনেক দূরে অস্পষ্ট সংকেতের মতো একটি স্টিমারের ধোঁয়া চোখে পড়ে। আকাশ উজ্জ্বল ও নির্মল। মেঘের চিহ্নও নাই।

গণেশ সহসা মমতা বোধ করিয়া বলে, না আইলে পারতি কুবির আইজ। কুবের কোনো জবাব দেয় না। নিঃশব্দে থাকে।

গণেশ বলে, মাথাটা টিপা দিমু নাকি ?

কুবের বলে, অঁ হুঁ।

গণেশ খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলে, হাল ধইরা যদি বইবার পারস্ কুবির, খুড়া আর আমি বইঠা বাই, তড়াতড়ি পৌঁছান যায়।

পুবদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদি৻ে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাহাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই তবু মাথা গুজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না। একটি কুঁড়ের আনাচেকানাচে তাহারই নির্ধারিত কম

খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তারই ফলে জেলে পাড়াটি হইয়া উঠিয়াছে জমজমাট।

দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনো দিন সাঙ্গ হয় না। এ দিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্রমানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ও দিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কন্‌কন্‌। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশি মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লিতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পদ্মা ও পদ্মার খালগুলি ইহাদের অধিকাংশের উপজীবিকা। কেহ মাছ ধরে, কেহ মাঝিগিরি করে। কুবেরের মতো কেহ জাল ফেলিয়া বেড়ায় খাস পদ্মার বুকে, কুঁড়োজাল লইয়া কেহ খালে দিন কাটায়। নৌকার যাহারা মাঝি, যাত্রী লইয়া মাল বোঝাই দিয়া পদ্মায় তাহারা সুদীর্ঘ পাড়ি জমায়, এ গাঁয়ের মানুষকে ও গাঁয়ে পৌঁছাইয়া দেয়। এ জলের দেশ। বর্ষাকালে চারিদিক জলে জলময় হইয়া যায়। প্রত্যেক বছর কয়েকটা দিনের জন্য এই সময়ে মানুষের বাড়ি ঘব আর উঁচু জমিগুলি ছাড়া সারাটা দেশ জলে ডুবিয়া থাকে। জল যেবার বেশি হয় মানুষের বাড়ির উঠানও সেবার রেহাই পায় না। পথঘাটের চিহ্নও থাকে না। একই গ্রামে এ পাড়া হইতে ও পাড়ায় যাইতে প্রয়োজন হয় নৌকার। কয়েকদিন পরে জল কমিয়া যায়, জলের ভিতর হইতে পথগুলি স্থানে স্থানে উঁকি দিতে আরম্ভ করে, কিন্তু আরও একমাসের মধ্যে পথগুলি ব্যবহার করা চলে না। যানবাহন এ দেশে এক রকম নাই। মানুষের সম্বল নৌকা। উঠিতে বসিতে সকলের নৌকার দরকার হয়।

নৌকার প্রয়োজন কমে সেই শীতের শেষে, ফাল্গুন চৈত্র মাসে। খালে তখন জল থাকে না, মাঠে জলের বদলে থাকে ফসল অথবা ফসল-কাটা রিক্ততা। মানুষ মাঠের আলে আলে হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায়।

নৌকা চলে পদ্মায়। পদ্মা তো কখনও শুকায় না। কবে এ নদীর সৃষ্টি হইযাছে কে জানে। সমুদ্রগামী জলপ্রবাহের আজও মুহূর্তের বিরাম নাই। গতিশীল জলতলে পদ্মার মাটির বুক কেহ কোনোদিন দ্যাখে নাই, চিরকাল গোপন হইয়া আছে।

জেলেপাড়া নদী হইতে বেশি দূরে নয়। তবু এইটুকু পথ চলিতেই কুবেরের কষ্ট হইতেছিল। নৌকায় সমস্ত পথটা আবোল-তাবোল বকিয়া গণেশ এতক্ষণে চুপ করিয়াছে। ধনঞ্জয় নৌকা হইতে নামে নাই। পাশের গ্রামে কুটুম বাড়িতে তাহার কী প্রয়োজন ছিল। নৌকা লইয়া সে একাই সেখানে চলিয়া গিয়াছে।

গণেশের বাড়িটাই পড়ে আগে। সে বাড়িতে ঢুকিল না। অসুস্থ কুবেরের সঙ্গে আগাইয়া চলিল।

নকুল দাস ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল। কুবেরকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া বলিল, অ কুবির, শোন, শুইনা যা।

গণেশ বলিল, কুবির জ্বরে বড়ো কাতর গো।

নকুল বলিল, জ্বর নাকি ? তবে যা, বাড়িত্ যা। দ্যাখ গিয়া বাড়িতে কী কাণ্ড হইয়া আছে।

এমন কথা শুনিয়া ব্যাপারটা না জানিয়া যাওয়া চলে না। কুবের উদ্‌বিগ্ন হইয়া বলিল, কীসের কাণ্ড নকুলদা ?

শ্যাষ রাইতে তর বউ খালাস হইছে কুবির।

কুবের অবাক হইয়া বলিল, হ ? নয় মাস পুইরা যে মাত্র কয়টা দিন গেছে নকুলদা ? ইটা হইল কিবা ?

ক্যান ? নয় মাসে খালাস হয় না ?

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল, পুরুষ ছাওয়াল হইছে না ?

নকুল সায় দিয়া বলিল, হ। আমাগোর পাঁচি গেছিল, আইসা কয় কী, কুবেরের ঘরে নি রাজপুত্তুর আইছে বাবা, ওই একরত্তি একখান পোলা, তাঁর চাঁদপানা মুখের কথা কী কমু। রং হইছে গোরা।

কুবেরের স্তিমিত চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নকুল শয়তানি হাসি হাসিয়া পরিহাস করিয়া বলিল, তুই ত দেখি কালা কুষ্ঠি কুবির, গোরাচাঁদ আইল কোয়ান থেইকা ? ঘরে ত থাকস না রাইতে, কিছু কওন যায় না বাপু।

গণেশ বাগিয়া বলিল, বউ গোবা না নকুলদা ?

হ, বউ ত গোরাই, হ ?

এর বাড়ির পিছন দিয়া ওর বাড়ির উঠান দিয়া কুবের ও গণেশ এবাব একটু জোরে জোরে পা ফেলিযাই বাড়িব দিকে আগাইয়া গেল। গণেশ ভারী খুশি। বারবার সে বলিতে লাগিল, পোলা হইব কই নাই কুবির ? কই নাই ইবাব তব পোলা না হইয়া যায় না ?

শেষে বিরক্ত হইয়া কুবের বলিল, চুপ যা গণেশ। পোলা দিয়া করুম কী নিজেগোর খাওন জোটে না, পোলা !

গণেশ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, তুই নি গোসা করস কুবির ?

কবুম না ? মইরবার কস নাকি আমারে তুই ?

তাহার মেজাজের এই আকস্মিক উত্তাপ গণেশের কাছে বড়োই দুর্বোধ্য ঠেকিল। অত তাহার ভবিষ্যতের কথা ভাবিবাব, হিসাব করিবার ক্ষমতা নাই। বউ থাকিলে মাঝেমাঝে ছেলেমেয়ে হয় এই পর্যন্ত সে জানে, সুবিধা অসুবিধার কথাটা ভাবিয়া দ্যাখে না। তা ছাড়া পৃথিবীতে মানুষ আসিলে তাহাকে খাওয়ানোব দায়িত্ব যে মানুষের নয়, যিনি জীব দেন তাঁর, গণেশ এটা বিশ্বাস করে। সুতরাং ছেলে হওয়ার সংবাদে কুবেবের রাগ করিবার কী কারণ আছে সে ভাবিয়া পাইল না। ভাবিবার চেষ্টাও করিল না।

বেড়া দেওয়া ছোটো একটি উঠানের দুদিকে দুখানা ঘর, কুবেরের বাড়ির এর বেশি পরিচয় নাই। এ দিকের ঘরের সংকীর্ণ দাওয়ায় একটা ছেঁড়া মাদুর চট প্রভৃতি দিয়া ঘেরিয়া লওয়া হইয়াছে। চাহিলেই বুঝিতে পারা যায় ওটি আঁতুড়ঘর। কারণ চটের ফাঁক দিয়া ভিতরে শায়িতা মালাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

কুবের ও দিকের দাওয়া-বিহীন ঘরটিতে ঢুকিয়া পড়িল। বাহিরে বর্ষার আকাশে কড়া রোদ উঠিলেও জানালা দরজার বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় এ ঘরের ভিতরটা একটু অন্ধকার। কোনার দিকে রক্ষিত জিনিসগুলি চিনিতে হইলে ঠাহর করিয়া দেখিতে হয়। ঘরের একদিকে মাটিতে পোঁতা মোটা বাঁশের পায়ায় চৌকি সমান উঁচু বাঁশের বাতা বিছানো মাচা। মাচার অর্ধেকটা জুড়িয়া ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। তৈলচিক্কণ কালো বালিশটি মাথায় দিয়া কুবেরের পিসি এই বিছানায় শয়ন করে। মাচার বাকি অংশটা হাঁড়ি কলসিতে পরিপূর্ণ। নানা আকারের এতগুলি হাঁড়ি কলসি

কুবেরের জীবনে সঞ্চিত হয় নাই, তিন পুরুষ ধরিয়া জমিয়াছে। মাচার নীচেটা পুরাতন জীর্ণ তক্তায় বোঝাই। কুবেরের বাপের আমলের একটা নৌকা বারবার সারাই করিয়া এবং চালানোর সময় ক্রমাগত জল সেঁচিয়া বছর চারেক আগে পর্যন্ত ব্যবহার করা গিয়াছিল, তারপর একেবারে মেরামত ও ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ায় ভাঙিয়া ফেলিয়া তক্তাগুলি জমাইয়া রাখা হইয়াছে। ঘরের অন্যদিকে ছোটো একটা ঢেঁকি। ঢেঁকিটা কুবেরের বাবা হারাধন নিজে তৈয়ারি করিয়াছিল। কাঠ সে পাইয়াছিল পদ্মায়। নদীর জলে ভাসিয়া আসা কাঠ সহজে কেহ ঘরে তোলে না, কার চিতা রচনার প্রয়োজনে ও-কাঠ নদীতীরে আনা হইয়াছিল কে বলিতে পারে ? শবের মতো চিতার আগুনের জড়তম সমিধটিরও মানুষের ঘরে স্থান নাই। কিন্তু এই ঢেঁকির কাঠটির ইতিহাস স্বতন্ত্র। কুবের তখন ছোটো, পদ্মানদীর মাঝির ছেলে যতটুকু বয়সে পদ্মায় সাঁতার দিবার মতো পাকা সাঁতারু হইয়া উঠিতে পারে না, তত ছোটো। ছোটো একটি নৌকায় ছেলেকে সঙ্গে করিয়া হারাধন পদ্মা পার হইতেছিল। নদীর মাঝামাঝি পুরানো নৌকার তলাটা হঠাৎ কী করিয়া ফাঁসিয়া যায়। তখন আশ্বিন মাস, সেখানে পদ্মার এ তীর ও তীরের ব্যবধান তিন মাইলের কম নয়। পদ্মা যাহাকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, পদ্মার বুকে যত ঢেউ থাক মাইল দেড়েক সাঁতার দিয়া তীরে উঠা তার পক্ষে কষ্টকর কিন্তু অসম্ভব নয়। হারাধন একা হইলে ভাবনা ছিল না। কুবের আর একটু বড়ো এবং শক্ত সমর্থ হইলেও সে বিপদে পড়িত না। কিন্তু ছেলেমানুষ কুবের ভয় পাইয়া সাঁতার দিতে চাহে নাই, দিশেহারা হইয়া ক্রমাগত হারাধনকে জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তখন যে লম্বা কাঠের গুঁড়িটি হাতের কাছে আগাইয়া আসিয়া তাহাদের বাঁচাইয়া দিয়াছিল, হয়তো তাহা চিতা রচনার জন্যই কেহ শ্মশানে আনিয়াছিল। হারাধন কিন্তু কাঠটি ফেলিয়া দিতে পারে নাই। ঘরের আসবাবে পরিণত করিয়া সাদরে গৃহে স্থান দিয়াছে।

কুবেরের পিসি আর তার বড়ো মেয়ে গোপি কুবেরকে দেখিয়াই চেঁচামেচি করিয়া কাছে আসিয়াছিল। কুবের কারও সঙ্গে কথা বলিল না। লম্বা হইয়া পিসির বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পিসি বলিল, শুলি যে ধন ? বউ ওদিকে পোলা বিয়াইয়া সারছে দেইখা আয়।

গোপি বলিল, বাই উ ওই বাবুগোর পোলার নাখান ধলা হইছে বাবা। নকুইলার মাইয়া পাঁচি কি কইয়া গেল শুনবা ? সায়েব গো এমন হয় না। না পিসি ?

কুবের চেঁচাইয়া ধমক দিয়া বলিল, নকুইলা কী লো হারামজাদি ? জ্যাঠা কইবার পার না ?

গোপি মুখ ভার করিয়া বলিল, ক্যান কমু জ্যাঠা ? বজ্জাতটা আমারে যা মুখে লয় কয় না ?

কী কয় ?

রাইত কইরা মাইজাবাবু নি আমাগোর বাড়ি আহে তাই জিগায়। ইবার জিগাইলে একদলা পাঁক দিমুনে ছুঁইড়া মুখের মধ্যে।

দিস, বলিয়া কুবের ঝিমাইতে থাকে। খানিক পরে ও ঘরের দাওয়া হইতে শিশুর জোরালো কান্না শুনিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, ছেলেটা আগেভাগে আসিয়া পড়িলেও গলায় রীতিমতো জোর করিয়া আসিয়াছে, চেঁচাইতে পারে।

দুই

কয়েকদিন পরে ছিল রথ।

রথ উপলক্ষে কেতুপুরে কোনোরকম ধুমধাম হয় না। পদ্মার ওপারে আছে সোনাখালি গ্রাম, রথের উৎসব হয় সেইখানে। সোনাখালির জমিদারদের ছোটো একটি রথ বাহির হয়। সোনাখালি হইতে মোহনপুর অবধি দশ মাইল লম্বা একটি উঁচু পথ আছে। বর্ষাকালে এই পথটিই এ অঞ্চলে

জলের নীচে ডুবিয়া যায় না। পথটির নাম ছ কোশের পথ। নামের মধ্যে পথটির এক ক্রোশ দৈর্ঘ্য কেমন করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে বলা যায় না। সোনাখালির জমিদারদের রথ এই পথ ধরিয়া আধমাইল খানেক গিয়া অন্নবাবার মাঠের একপাশে থাকে সাতদিন, তারপর উলটারথের দিন আবার রওনা হয় জমিদার বাড়ির দিকে। স্থানটির অন্নবাবার মাঠ নাম হওয়ার একটু ইতিহাস আছে। অনেকদিন আগে এ অঞ্চলে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সে সময় কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া এই মাঠে আস্তানা গাড়েন এবং একটি বিরাট অন্নসত্র খুলিয়া দেন। নিজের বলিতে সন্ন্যাসীর এক কানাকড়ি সম্বলও ছিল না। শোনা যায়, এমনই আশ্চর্য ছিল মানুষের উপর তাঁহার প্রভাব যে সামনে দাঁড়াইয়া চোখে চোখে চাহিয়া তিনি হুকুম দিতেন আর বড়ো বড়ো জমিদার মহাজনেরা মনে মনে চাল ডাল পাঠাইয়া দিত এই মাঠে। শত শত ভদ্র গৃহস্থ নিজেরাই কোমর বাঁধিয়া তাহা রান্না করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীদের বিতরণ করিত অন্ন। ব্যাপারটা যে ঠিক এইরকমই ঘটিয়াছিল তার কোনো প্রমাণ এখন আর নাই। যে সব বড়ো বড়ো উনানে সেই বিরাট ক্ষুধা-যজ্ঞের আগুন জ্বলিত আজ তাহার একটু কালির দাগ পর্যন্ত কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

রথের দিন এই মাঠে প্রকাণ্ড মেলা বসে, উলটারথ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পদ্মা আগে তফাতে ছিল, এখন এত কাছে সরিয়া আসিয়াছে যে মেলার একটা প্রান্ত প্রায় নদীতীরেই আসিয়া ঠেকে। স্থলপথ ও জলপথে দল বাঁধিয়া আসিয়া মানুষ মেলায় ভিড় বাড়ায়। ভিড় বেশি হয় প্রথম এবং শেষ দিন, মাঝখানের কদিন মেলা একটু ঝিমাইয়া যায়। গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় ও শখের পণ্য সমস্তই মেলায় আমদানি হয়, এমন কী শহরের নারী-পণ্যের আবির্ভাবও ঘটিয়া থাকে। কাপড়ের দোকান, মনোহারি দোকান, মাটির খেলনার দোকান, খাবারের দোকান, দোকান যে কত বসে তার সংখ্যা নাই। গোরু-ছাগল বিক্রয় হয়, কাঁটাল ও আনারসে মেলার একটা দিক ছাইয়া যায়, বড়ো বড়ো নৌকায় মালদহ ও ত্রিহুতের আম আসে। লেমোনেডের নামে বোতলে ভরা স্যাকারিনের লাল নিস্তেজ জল বিক্রয় হয় অজস্র। মেয়েরা সাধ মিটাইয়া শাঁখা ও কাঁচের চুড়ি পরে, ছেলেদের কোমরে বাঁধিয়া দেয় নূতন ঘুনসি। কয়েকটি স্থানে গবর্নমেন্ট হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত জুয়াখেলা চলে। মেলার এটা একটা প্রধান অঙ্গ। সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় বালাখেলার কাছে। চারকোনা বাঁশের বেড়ার চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া চার চার পয়সায় চার চার বালা কিনিয়া বেশির ভাগ গরিব চাষাভুষারাই হরদম ছুঁড়িতে থাকে, রুদ্ধনিশ্বাসে চাহিয়া দ্যাখে নিক্ষিপ্ত বালাটি লাল শালুতে সাজানো টাকা আধুলি সিকি ও দোয়ানির অরণ্যে অন্ধের মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্থির হইতেছে ফাঁকা জায়গায়। পুনরাবর্তিত ব্যর্থতায় তাহাদের কোনোমতে যেন বিশ্বাস হইতে চায় না। কত কাছাকাছি সাজানো মুদ্রাগুলি, ফাঁকা জায়গাই যে কম ! ওদের মধ্যে কে বুঝি বউয়ের জন্য একখানা পাছাপাড় শাড়ি, ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু খেলনা ও খাবার এবং সংসারের জন্য কী কী সব জিনিস কিনিতে অনেক দিনের চেষ্টায় জমানো কটা টাকা আনিয়াছিল, দ্যাখে, সন্ধ্যার সময় দূরের মানুষ যখন বাড়ির দিকে শ্রান্ত পা বাড়াইয়াছে বেচারির কাছে বিড়ি কিনিবার পয়সাও নাই ! আজীবন উপার্জন করিয়া সে পরকে খাওয়াইয়াছে, সে যে কী নিরীহ গৃহস্থ ! কারও কথা না ভাবিয়া আজ সে এ কী করিয়া বসিল ? একবেলা স্বাধীনভাবে স্বার্থপরতা করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে সামলাইতে পারিল না ?

রথের দিন সকাল হইতে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি নামিয়াছিল। বেলা বাড়িলে নিদ্রাতুর চোখ মিটমিট করিতে করিতে গণেশ কুবেরের বাড়ি আসিল।

কুবের তখনও ঘুমাইতেছিল। গণেশ তাহাকে ডাকিয়া তুলিল। বলিল, চল্ কুবির, না-টা ঠিক কইরা থুইয়া আহি। আমারে ডাইকা আজান খুড়া নায় গিয়া বইয়া আছে।

কুবের প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া বলিল, বয় গণশা, বয়। অ পিসি, আমারে আর গণশারে দুগা মুড়ি দিবা গো ? অ' লো গোপি, আমারে নি একঘটি জল দিবার পারস ?

ঘরে মুড়ি ছিল না। কদাচিৎ থাকে। পিসি চারটি চিড়া আর একটু গুড় দিয়া গেল। গুড় মুখে দিয়া শুকনো চিড়া চিবাইতে চিবাইতে কুবের বলিল, খা গণশা। রথের বাদলা নামছে দেখছস ?

হ।

চালায় ছন চাপান লাগে। রাইতের বাদলায় ঘরে জল পড়ছিল, দ্যাখ।

গণেশ চাহিয়া দেখিল, জল পড়িয়া ঘরের একটা কোণ সত্যই ভাসিয়া গিয়াছে। জিহ্বা দিয়া সে একটা আপশোশের শব্দ করিল। বলিল, কোণ দিয়া পড়ছে তাই বাঁচান, না তো জিনিস-পত্তর সকল ভাইসা যাইত। চালায় চাপাইবি নাকি ছন আইজ ? মেলায় গেলি তো সময় পাবি না ?

কুবের মাথা নাড়িয়া বলিল, ছন কই ? নাই তো।

ছিল যে ছন ?

গোপির মার বিছানায় পাইতা দিছি।

ব্যাপারটা বুঝিয়া গণেশ গম্ভীর মুখে সায় দিয়া বলিল, ভালা করছস যা বাদলা !

ধীরে ধীরে তাহারা চিড়া চিবাইতে লাগিল। গণেশ যে তাগিদ লইয়া আসিয়াছিল সে যেন তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। খাওয়া বন্ধ করিল গণেশ আগে। বাড়ি হইতে সে দুটি পান্তা খাইয়া আসিয়াছে। কুবের খাক। ঘটিটা উঁচু করিয়া মুখে ঢালিয়া সে জল খাইল। আরও দুটি চিড়া মুখে দিয়া বাকিগুলি কুবের দান করিয়া দিল তাহার বড়ো ছেলেকে। বলিয়া না দিলে চিড়াগুলি সে একাই খাইতে পারে সন্দেহ করিয়া বলিল, চণ্ডীরে দুগা দিস লখ্যা, আঁই ?

লখ্যা মাথা নাড়িয়া বলিল, উঁহুঁক। উয়ারে পিসি দিব।

পিসির আর নাই। দে কইলাম লখ্যা।

কুবেরের দুই ছেলেই উলঙ্গ। বর্ষার ভ্যাপসা গুমোটে ঘামিয়া তাহাদের শীর্ণ দেহ চকচক করিতেছে। পিতৃদত্ত প্রসাদের ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া ঘরের কোণে দুজনের একটা ছোটোখাটো কলহ বাধিয়া গেল। কুবের আর চাহিয়াও দেখিল না। এ যে তাহার ঠিক উদাসীনতা তা বলা যায় না। মনে মনে তাহার একটা অস্পষ্ট উদ্দেশ্যই বুঝি আছে। শিক্ষা হোক। নিজের নিজের ভাগ বুঝিয়া লইতে শিখুক ! দুদিন পরে জীবনযুদ্ধে সমস্ত জগতের সঙ্গে যখন তাহাদের লড়াই বাধিবে তখন মধ্যস্থতা করিতে আসিবে কে ?

ঘটিটা তুলিয়া লইয়া ঘরের সামনে সংকীর্ণ দাওয়ায় উবু হইয়া বসিয়া কুবের উঠানে কুলকুচা করিল। গণেশের মতো ঘটি উঁচু করিয়া আলগোছে জল খাইয়া কলিকায় তামাক সাজিতে বসিল। পিসি দাওয়ার এক পাশে ইলিশ মাছের তেলে ইলিশ মাছ ভাজিতেছে। অন্য পাশে মালার আঁতুড়। নিচু দাওয়ার মাটি জল শুষিয়া শুষিয়া ওখানটা বাসের অযোগ্য করিয়া দিয়াছে, তবু ওইখানেই ভিজা স্যাঁতসেঁতে বিছানায় নবজাত শিশুকে লইয়া মালা দিবারাত্রি যাপন করিবে। উপায় কী? যে নোংরা মানুষের জন্মলাভের প্রক্রিয়া ! বাড়তি ঘর থাকিলেও বরং একটা ঘর অপবিত্র করিয়া ফেলা চলিত। দুখানা কুঁড়ে যার সম্বল তার স্ত্রী আর কোথায় সন্তানকে জন্ম দিবে ? ভদ্রলোকেরা উঠানে অস্থায়ী টিনের ঘর তুলিয়া দেয়, চৌকির ব্যবস্থা করে। যারা আরও বেশি ভদ্রলোক তাদের থাকে শুকনো খটখটে স্থায়ী আঁতুড়ঘর। কুবেরের তো সে ক্ষমতা নাই। তার যতখানি সাধ্য সে তা করিয়াছে। ভালো করিয়া বেড়া দিয়া বৃষ্টির ছাঁট আটকাইয়াছে, ঘর ছাইবার শণগুলি বিছানার তলে পাতিয়া দিয়াছে, দেবীগঞ্জের রেল কোম্পানির কয়লা চুরি করিয়া আগুনের ব্যবস্থা করিয়াছে। আর সে কী করিতে পারে ?

হঠাৎ এক মিনিটেরও কম সময় ব্যাপিয়া ঝুপঝুপ করিয়া জোরে বৃষ্টি হইয়া গেল ! তারপর যেমন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল তেমনি পড়িতে লাগিল। গণেশ দরজার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, যাবি না কুবির ?

কুবের বলিল, হ, ল যাই। আইচ্ছা তুই ক দেখি গণেশ, হীরুজ্যাঠার ঠাঁই দুগা ছন চামু নাকি ? দিব না ?

গণেশ বলিল, হীরুজ্যাঠা ছন দিব ? জ্যাঠারে তুই চিনস্ না কুবির, কাইলের কাণ্ড জানস ? বিহানে ঘরে ফির‍্যা শুমু, বউ কয় চাল বাড়ন্ত। খাও আইঠ্যা কলা, ভর রাইত জাইগা ঘুমের লাইগা দুই চক্ষু আঁধার দ্যাহে—চাল বাড়ন্ত ! বউরে কইলাম, হীরুজ্যাঠার ঠাঁই দুগা চাল কর্জ আন্‌গা, দুপুরে গাঁয়ে গিয়া কিনা আনুম। কলি না পিত্যয় যাবি কুবির,বউরে জ্যাঠা ফিরাইয়া দিল। কয় কী বিষ্যুদবার কর্জ দেওন মানা।

কুবের সবিস্ময়ে বলিল, হ ? তর নিজেব জ্যাঠা না ?

নিজের জ্যাঠা বইলাই পিরীত য্যান বেশি কুবির। খালি নিবার পারে, দিবার পারে না।

এই কথাগুলি বলিতে পারার মধ্যে গণেশের পক্ষে বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার পবিচয় আছে। কুবের শিরশ্চালনায় সায় দিয়া বলিল, আমাব ঘরে পাঠালি না ক্যান বউরে ?

গণেশ যেমন বোকা, তেমনি সবল। সে বলিল, তুই চাল পাবি কনে ?

এ কথায় অপমান বোধ করিয়া কুবের উঠিল রাগিয়া।

চাল পামু কনে ! ক্যান, আমরা ভাত খাই না ? গবিব বইলা দুগা চাল কর্জ না দেওনের মতো গবিব আমি না, জাইনা থুইস !

কুবের রাগে ও গণেশ লজ্জায় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বহিল। শেষে গণেশ আস্তে আস্তে বলিল, গোসা করলা নি কুবিরদা ?

মাঝে মাঝে, কুবেরের রাগের সময়, ভীরু গণেশ তাহাকে সম্মান করিয়া তুমি সম্বোধন কবে।

কবুম না ! গাও জ্বালাইনা কথা কস্ যে ! আজানখুড়া বইয়া আছে, ল যাই।

কুবেব উঠানে নামিযা গেল। বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া উঠানটা কাদা ও পিছল হইয়া আছে। গৃহাঙ্গানের এই নোংবা পচা পাঁকের চেযে নদীতীরের কাদা অনেক ভালো। সেই কাদায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়া গেলেও যেন এরকম অস্বস্তি বোধ হয় না। বাড়ির পাঁকে পাযে হাজা হয়, পাঁক ঘাঁটিয়া যাহাব জীবিকা অর্জন করিতে হয় সেই পাঁকের সংস্পর্শে তাহারও পা কুটকুট করে। আকস্মিক ক্রোধে কুবের ছেলেমানুষের মতো উঠানে একটা লাথি মারিল, পায়ের পাতার একটা পরিষ্কার ছাপ মাত্র উঠানে পড়িল আর কিছু হইল না।

আঁতুড় হইতে ক্ষীণস্বরে মালা বলিল, আ গো যাইও না, শুইনা যাও। চালা দিয়া নি ঘবে জল পড়ছে ? ছনগুলা লইয়া যাও, বিছানার তলে ছন দেওন না দেওন সমান।

মালার মুখে এমন নিঃস্বার্থ উক্তি প্রায় শোনা যায় না। কুবেরের মুগ্ধ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে সে বিরক্ত হইয়াই বলিল, কিয়েব সমান ! ছন না পাইতা ভিজা ভিতে শোওন যায় ? রঙ্গ কইরা কাম নাই, চুপ মাইরা শুইয়া থাক। চালার লাইগা ছন লাগে, আইনা লমু।

হোসেন মিয়া না কইছিল খড় দিব ?

হোসেন মিয়া কইলকাতা গেছে।

মালা আপশোশ করিয়া বলিল, কবে গেল ? আগে নি একবাব কইলা ! এক পয়হার সুই আইনবার কইতাম—কইলকাতায় পয়হায় দশখান পাওন যায়।

কলিকাতা হইতে মালা এক পয়সার ছুঁচ আনিতে দিত শুনিয়া কেহ হাসিল না। পিসি বরং মালার কথায় সায় দিয়াই কী যেন বলিল, ঠিক বোঝা গেল না। জবাব দিবার প্রয়োজন ছিল না। কুবেরের পায়ের আঙুলের ফাঁকে হাজার ঘায়ে বিষাক্ত পাঁক কামড়াইতেছিল। সে নীরবে বাহির হইয়া গেল।

নদীতীরে নৌকায় তাহাদের কাজ ছিল। খাওয়া দাওয়ার পর নৌকা লইয়া তাহারা সোনাখালির মেলায় যাইবে। সঙ্গে ছেলেমেয়েরা থাকিবে, কেতুপুর ও আশেপাশের গ্রাম হইতে এমন যাত্রীও পাওয়ার সম্ভাবনা আছে যাহারা ভাড়া দিয়া মেলায় যাইবে। নৌকাটা একটু সাফ করিয়া একটা অস্থায়ী হোগলার ছই খাটাইয়া দেওয়া দরকার। নৌকার ছোটো পালটি মেরামত করিবার জন্য নাবানো হইয়াছিল, বাঁশের মাস্তুলে সেটিও আবার ঠিক করিয়া খাটাইতে হইবে। বর্ষাকালে বাতাস প্রায় সোনাখালির দিকেই বহিতে থাকে, গুমোট করিয়া সামান্য বাতাস যদি উঠে, পাল তুলিয়া মেলায় পৌঁছিতে আজ একঘণ্টা সময়ও লাগিবে না।

নদীর ধারে পৌঁছিয়া তাহারা দেখিতে পাইল ছাতি মাথায় দিয়া হোসেন মিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘর ছাইবার জন্য হোসেনের কাছে বিনামূল্যে কিছু শণ পাইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাকে দেখিয়া কুবেরের খুশি হওয়াই উচিত ছিল। তবু লোকটার আবির্ভাবে চিরদিন যে দুর্জ্ঞেয় আশঙ্কা তাহাকে অস্বস্তি বোধ করায় আজও সেই আশঙ্কাই হঠাৎ তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিল। চুপিচুপি বলিল, হোসেন মিয়া রে গণেশ !

তাই তো দেহি !

একটু রহস্যময় লোক এই হোসেন মিয়া। বাড়ি তাহার নোয়াখালি অঞ্চলে। কয়েক বৎসর হইতে কেতুপুরে বাস করিতেছে। বয়স তাহার কত হইয়াছে চেহারা দেখিয়া অনুমান করা যায় না, পাকা চুলে সে কলপ দেয়, নুরে মেহেদি রং লাগায়, কানে আতর মাখানো তুলা গুঁজিয়া রাখে। প্রথম যখন সে কেতুপুরে আসিয়াছিল পরনে ছিল একটা ছেঁড়া লুঙ্গি, মাথায় একঝাঁক রুক্ষ চুল--ঘষা দিলে গায়ে খড়ি উঠিত। জেলেপাড়া নিবাসী মুসলমান মাঝি জহরের বাড়িতে সে আশ্রয় লইয়াছিল, জহরের নৌকায় বইঠা বাহিত। আজ সে তাহার বেঁটে খাটো তৈলচিক্কণ শরীরটি আজানুলম্বিত পাতলা পাঞ্জাবিতে ঢাকিয়া রাখে, নিজের পানসিতে পদ্মায় পাড়ি দেয়। জমি-জায়গা কিনিয়া, ঘরবাড়ি তুলিয়া, পরম সুখেই সে দিন কাটাইতেছে। গতবছর নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে দু নম্বর স্ত্রীকে। এইসব সুখের ব্যবস্থা সে যে কী উপায়ে করিয়াছে গ্রামের লোক ঠিক অনুমান করিয়া উঠিতে পারে না। নিত্য নূতন উপায়ে সে অর্থোপার্জন করে। নৌকা লইয়া হয়তো সে পদ্মায় মাছ ধরিতে গেল--গেল সে সত্যই, কারণ যাওয়াটা সকলেই দেখিতে পাইল, কিন্তু পদ্মার কোনখানে সে মাছ ধরিল, মাছ বিক্রিই বা করিল কোন বন্দরে, কারও তাহা চোখে পড়িল না। তাহার নৌকার মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিয়া একটা গল্প মাত্র শোনা গেল যে, যে বন্দরে তাহারা মাছ বিক্রয় করিয়াছে সেখানে নৌকায় যাতায়াত করিতে নাকি সাত-আটদিন সময় লাগে। তারপর কয়েকদিন হয়তো হোসেন গ্রামেই বসিয়া থাকে, একেবারে কিছুই করে না। হঠাৎ একদিন সে উধাও হইয়া যায়। পনেরো দিন একমাস আর তাহার দেখা মেলে না। আবির্ভাব তাহার ঘটে হঠাৎ এবং কিছুদিন পরে দুশো গোরু ছাগল চালান হইয়া যায় কলিকাতায়।

বড়ো অমায়িক ব্যবহার হোসেনের। লালচে রংয়ের দাড়ির ফাঁকে সবসময়েই সে মিষ্টি করিয়া হাসে। যে শত্রু, যে তাহার ক্ষতি করে, শাস্তি সে তাহাকে নির্মম ভাবেই দেয় কিন্তু তাহাকে কেহ কোনোদিন রাগ করিতে দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারে না। ধনী-দরিদ্র, ভদ্র-অভদ্রের পার্থক্য তার কাছে নাই, সকলের সঙ্গে তার সমান মৃদু ও মিঠা কথা। মাঝে মাঝে এখনও সে জেলেপাড়ায় যাতায়াত করে, ভাঙা কুটিরের দাওয়ায় ছেঁড়া চাটাইয়ে বসিয়া দা-কাটা কড়া তামাক টানে। সকলে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলে তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এইসব অর্ধ উলঙ্গ নোংরা মানুষগুলির জন্য বুকে যেন তাহার ভালোবাসা আছে। উপরে উঠিয়া গিয়াও ইহাদের আকর্ষণে নিজেকে সে যেন টানিয়া নীচে নামাইয়া আনে। না, মনে মনে ইহা বিশ্বাস করে না জেলেপাড়ার কেহই ; জীবন যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের একেবারে মিলন-সীমান্তে তাহারা বাস করে, মিত্র তাহাদের কেহ

নাই। তবে বিশ্বাস অবিশ্বাসের জন্য কিছু আসিয়া যায় না। হোসেন মিয়া হাসিমুখে একেবারে বাড়ির ভিতরে গিয়া জাঁকিয়া বসিয়া তাহার গোপন, গভীর ও দুর্জ্ঞেয় মতলব হাসিলের আয়োজন আরম্ভ করিলেও জেলেপাড়ায় এমন কেহ নাই যে তাহাকে কিছু বলিতে পারে। বলিতে হয়তো পারে। বলে না শুধু এই জন্যে যে বলা নিরর্থক। তাতে কোনো লাভ হয় না। যা সে ঘটায় সমস্তই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। অন্যথা করিবার জন্য বুক ঠুকিয়া দাঁড়াইলে কার কী লাভ হইবে ? তার চেয়ে বর্ষাকালে ঘরের ফুটা চাল যদি একটু মেরামত হয়, উপবাসেব সময়ে বিনা সুদে যদি কিছু কর্জ মেলে, তাই ঢের লাভ।

হোসেন মিয়ার গোপন মতলবের দুটো একটাব খবর যে জেলেপাড়াব লোকেরা রাখে না তা নয়। জেলেপাড়ার তিনটি পরিবার উধাও হইয়া গিয়াছে। হোসেন মিয়া যে ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুবুষ নির্বিশেষে এক একটি সমগ্র পরিবারকে কোথায় রাখিয়া আসিত প্রথমে কেহ তাহা টের পায নাই, পরে জানা গিয়াছিল নোয়াখালির ওদিকে সমুদ্রের মধ্যে ছোটো একটি দ্বীপে প্রজা বসাইয়া সে জমিদারি পত্তন করিতেছে। সে দ্বীপ নাকি গভীর জঙ্গলে আবৃত, শহর নাই, গ্রাম নাই, মানুষেব বসতি নাই, শুধু আছে বন্য পশু এবং অসংখ্য পাখি।

কিছু কিছু জঙ্গল সাফ করিয়া এই দ্বীপে হোসেন মিযা ঋণগ্রস্ত উপবাসখিন্ন পরিবারদের উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। লোভ দেখাইয়া, আশা দিযা, এক একটি নিবুপায় পরিবাবকে সে এই দ্বীপে লইয়া যায়, সৃষ্টিব দিন হইতে কখনও আবাদ হয নাই এমন খানিকটা জমি দেয়, থাকিবার জন্য ঘর দেয়, আবাদেব জন্য দেয় হাল বলদ ও জঙ্গল কাটিবাব জন্য যন্ত্রপাতি। অন্যান্য স্থান হইতে আরও কতগুলি পরিবারকে সে ওখানে লইয়া গিয়াছে কে জানে, কেতুপুরেব জেলেপাড়াব তিনঘর মাঝিকে সে যে আদিম অসভ্য যুগেব চাষায পবিণত কবিয়াছে এ খবর জেলেপাড়ার কারও অজানা নাই। তবু, জানা না জানা তাহাদেব পক্ষে সমান। মাথা নিচু করিয়া তাহারা হোসেন মিয়ার দেওয়া উপকার গ্রহণ করিবে। মনুষ্যবাসের অযোগ্য সেই দ্বীপকে জনপদে পরিণত করাব আহ্বান আসিলে যতদিন পারে মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিবে, যেদিন পারিবে না সেদিন স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিযা নিঃশব্দে হোসেন মিয়ার নৌকায় গিয়া উঠিবে।

তাই মনে মনে লোকটাকে ভয় করিলেও কাছে গিয়া কুবেব বলিল, ছালাম মিযা বাই।

হোসেন বলিল, ছালাম। কেমন ছিলা মাঝি ? কাহিল মা.। হয ?

জ্বরে ভুগলাম। কইলকাতার থনে আলেন কবে ?

আইজ আলাম। আর গণেশ বাই, খবর কি ? মেলায় যাবা না ?

গণেশ ঢোঁক গিলিয়া বলিল, যামু মিয়া বাই, মেলায় যামু। পোলাপানেবা মেলায় যাওনের লেইগা খেইপা আছে, না গেলে চলব ক্যান ?

গুমটি দিছে, বাদাম চলব না। সকাল সকাল রওনা দিবা; বদর কইয়ো মাঝি, সাঁঝের আগে ফিরা আইয়ো, আসমান ভালো দেখি না। শুইনা আলাম আজকালির মদ্যি জবর ঝড় হইবার পারে।

কুবের আকাশের দিকে ও নদীর দিকে চাহিল। পাতলা কুয়াশার মতো মেঘ আকাশ ভরিয়া আছে, নিস্তরঙ্গ পদ্মার বুকে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিপাতে অসংখ্য ছোটো ছোটো বুদবুদ উঠিয়া ফাটিয়া গেলে যেমন দেখায় তেমনি দেখাইতেছে। নদীর অপর তীর চোখে পড়ে না, নদীর মাঝখানের নৌকা পর্যন্ত অস্পষ্ট। আরও এদিকে একটি স্পষ্টতর নৌকার দিকে চোখ রাখিয়া কুবের সংক্ষেপে প্রশ্ন করিল, যামু না মেলায় ? বারণ করেন নাকি মিয়া বাই ?

হোসেন বলিল, যাবা না ক্যান ? ডর কিসির ? আসমান দেইখা রওনা দিবা, আসমান দেইখা ফিরবা। বাদলা দিনে ঝড় জানান দিয়া আহে।

সায় দিয়া কুবের নৌকায় উঠিল। মুসলমান মাঝির দুটি নৌকা ইতিমধ্যেই মেলায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, দুটি নৌকাই একসঙ্গে ছাড়িয়া গেল। নদীর জল তুলিয়া নৌকা ধুইতে ধুইতে কুবের একসময় চাহিয়া দেখিল, হোসেন চলিয়া গিয়াছে। চালার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় শণের কথাটা এতক্ষণে তাহার মনে পড়িয়াছে, হোসেনকে বলিয়া রাখিলে ভালো হইত। লোকটা এই আছে, এই নাই ! শণের জন্য কাল সকালে হয়তো ওর বাড়ি গিয়া শুনিবে, রাতারাতি ও ঢাকায় পাড়ি দিয়াছে ! কবে ফিরিবে ? কে তাহা জানে !

হোগলার ছাউনিটা বাতার সঙ্গে বাঁধিতে বাঁধিতে কুবের হঠাৎ সচকিত হইয়া বলিল, কে হাঁকে রে গণশা ?

বহুদূর নদীবক্ষ হইতে হাঁক আসিতেছিল, মানবকণ্ঠের একটানা একটা ক্ষীণ আওয়াজ। দুই কানের পিছনে হাত দিয়া হাঁক শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুবের সাড়া দিয়া উঠিল। এ এক ধরনের ভাষা, পূর্ববঙ্গের মাঝিশ্রেণির লোক ছাড়া এ ভাষা কেহ জানে না। এ ভাষায় কথা নাই, আছে শুধু তরঙ্গায়িত শব্দ। উন্মুক্ত প্রান্তরে, বিস্তৃত নদীবক্ষে এ শব্দ দূর হইতে দূরে চলিয়া যায়, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসে কিন্তু তরঙ্গের তারতম্য অবিকল থাকিয়া যায়। অস্ফুট গুঞ্জনের মতো মৃদু হইয়াও যদি কানে আসিয়া লাগে পদ্মানদীর মাঝি কান পাতিয়া শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারে। শব্দের দুর্লক্ষ্য উৎসের দিকে চাহিয়া সে বুক ভরিয়া বাতাস গ্রহণ করে। বাঁ হাত কানের পিছনে রাখিয়া, ডান হাতটি মুখের সম্মুখে আনিয়া সঞ্চালিত করিয়া উচ্চারিত একটানা আওয়াজে সে তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

ধনঞ্জয় মন দিয়া শোনে নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল, কেডা ? কী কয় ?

কুবের কহিল, আমাগোর রাসু।

ধনঞ্জয় অবাক হইয়া গেল।

বিন্দা মাঝির পোলা ? কস কি কুবির ! শুনছস নি ঠিক ?

রাসুর গলা চিনি না খুড়া ? অখনি আইবো, দেইখো।

ধনঞ্জয়ের বিস্ময় কমিতে চায় না। বহুদূরের নৌকাটির দিকে চাহিয়া সে বলিল, রাসু না হোসেন মিয়ার দ্বীপে গেছিল ?

হ।

আইল কিবা ?

কুবের বিরক্ত হইয়া কহিল, কিবা কমু খুড়া ? আহুক, জিগাইয়ো। হোসেন মিয়া ছাইড়া দিবার পারে, ও নিজে পলাইয়া আইবার পারে, না জিগাইয়া নি কওন যায় ?

খানিক পরে আবার হাঁক আসিল, এবার আরও স্পষ্ট। হাঁকের আওয়াজে যে একটি উৎসুক সুর ছিল তিনজনের কানেই তাহা ধরা পড়িল। গণেশ কুবেরের মুখের দিকে চাহিয়া কী বলিতে হাঁ করিয়া কিছুই বলিল না। হাঁকের জবাব দিবার জন্য কুবের সুদীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিল।

কিছুক্ষণ পরে একটা জীর্ণ পুরাতন নৌকা আসিয়া ভিড়িল পাশে। দুজন অচেনা মাঝি নৌকা বাহিয়া আসিয়াছে। ভিন গাঁয়ের নৌকা। নৌকার খোলটা কাঁটালে এমন ভাবেই বোঝাই করা হইয়াছে যে নৌকার প্রান্তভাগ জলের উপর কয়েক ইঞ্চিমাত্র ভাসিয়া আছে। উপরে কোনোরকম আবরণ নাই, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে মাঝি দুজন এবং রাসু তিনজনেই ভিজিয়া গিয়াছে। তাড়া দিয়া রাসুকে এ নৌকায় নামাইয়া দিয়া মাঝি দুজন বোধ হয় তাহাকে গাল দিতে দিতেই তৎক্ষণাৎ আবার ঠেলা দিয়া নৌকার মুখ ফিরাইয়াা বইঠা ধরিল। পদ্মানদীর চিরন্তন রীতি অনুসারে কুবের জিজ্ঞাসা করিল, কোন গাঁও থেইকা আইলা মাঝি, যাইবা কোয়ানে ?

জবাব দিবার রীতিও চিরন্তন। তাহারা সক্রোধে বলিল, সুলপী থেইকা আইলাম, যামু মেলায়।

রাগের কারণটা তাহাদের সহজেই বোঝা যায়। সুলপী হইতে সোজাসুজি সোনাখালির মেলায় যাওয়ার বদলে রাসুকে এখানে পৌঁছাইয়া দিতে তাহাদের পদ্মা পার হইতে হইয়াছিল। প্রতিদানে রাসু যে তাহাদের কিছুই দিতে পারে নাই তাহাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু এ ক্রোধ তাহাদেব ফলপ্রসূ নয়,—এ শুধু ক্রোধ। রাসুর মতো দুরবস্থায় পড়িয়া আবার যখন কেহ তাহাদের পদ্মা পার কবিয়া দিবাব অনুরোধ জানাইবে এমনি ভাবে রাগিয়া উঠিলেও সেই নিরুপায় মানুষটিকে তাহাবা না বলিতে পারিবে না, বিনা প্রত্যাশায় বোঝাই নৌকা লইয়া তিন ক্রোশ অতিরিক্ত বইঠা বাহিবে। ইহা মহত্ত্ব নয়, পরোপকার নয়—ইহা রীতি, অপরিহার্য নিয়ম। আশ্চর্য এই, এ নিয়ম পালন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠাও অনিয়ম নয়।

নৌকায় পা দিয়া রাসু খানিকক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া বহিল। তারপব কুবেরকে জড়াইয়া ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, আমি আলাম গো কুবিরদা।

কন থে আলি রাসু ?

কই কুবিরদা, কই। তোমাগো দেইখা মুখে রাও সবে না, কতকাল পবে ফিরা আলাম।

কুবেব ও গণেশ তাহাব চোখে জল দেখিতে পাইল। ধনঞ্জয় পড়িয়াছিল তাহার পিছনে, সে উপস্থিত থাকিতে রাসু যে আসিয়া পৌঁছিয়াই কুবেবকে জড়াইয়া ধবিয়া আহ্লাদে ডগমগ হইয়া উঠিল ইহাতে মনে মনে সে ঈর্ষাতুর ও অসন্তুষ্ট হইযা উঠিয়াছিল। রাসুর আবির্ভাবে উত্তেজনা তাহারও কম হয় নাই। তাহা গোপন করিয়া শান্ত উদাস ভাবে সে বলিল, বয় রে রাসু, বয়।

কুবেরকে ছাড়িয়া রাসু হোগলার নীচে নৌকাব আধভেজা পাটাতনের উপর বসিয়া পড়িল। হাতের উলটা পিঠে চোখ মুছিয়া পরনের জীর্ণ বসনে ঘসিযা হাতে লাগা অশ্রু পুঁছিয়া ফেলিল। তিন জোড়া চোখ চাহিয়া রহিল তাহার শীর্ণ কঙ্কালসার দেহটির দিকে। তিন বছর আগে হোসেন মিয়ার সঙ্গে সপরিবারে সে যখন ময়নাদ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা কবিয়াছিল দেহ তখন তাহাব অবশ্য বিশেষ পরিপুষ্ট ছিল না, কিন্তু এমন ভাবে ভাঙিয়াও সে পড়ে নাই। রাসুব মাথায় বড়ো বড়ো চুল জট বাঁধিয়া গিয়াছে, সর্বাঙ্গে অনেকগুলি ক্ষতেব চিহ্ন, কযেকটা ঘা এখনও ভালো করিয়া শুকায় নাই। দুটি পা-ই তাহার হাঁটুর কাছ হইতে গোড়ালি পর্যন্ত ফোলা। গায়েব চামড়া যেন তাহাব আলগা হইয়া শুকাইয়া শক্ত ও কালো হইয়া উঠিয়াছিল, এখন বৃষ্টির জলে ভিজিয়া ভিজা জুতাব চামড়ার মতো স্যাঁতসেঁতে দেখাইতেছে। একটু আগে বহুদূর হইতে অত জোরে হাঁক দিবার শক্তি সে কোথায় পাইয়াছিল ভাবিয়া কুবেব অবাক হইয়া রহিল।

রাসু ঝিমাইযা পড়িতেছিল, ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিল, ময়নাদ্বীপ থেইকা আলি না রাসু ?

হ।

পলাইয়া আইছস ?

হ, বৈশাখ মাসে।

বৈশাখ মাসে ? এতকাল কই ছিলি তুই ?

নোয়াখালি ছিলাম। বিষ্যুদবাবে আইলাম সুলপী। কমুনে আজানখুড়া, সগগল কমু। অখনে ক্ষুধায় মরি।—অ কুবিরদা, কিছু নি দিবার পার ?

তখনকার মতো কৌতূহল নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া রাসুকে সঙ্গে কবিয়া তিনজনে গ্রামে ফিরিয়া গেল। ধনঞ্জয়ের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিবার আগেই রাসুর আবির্ভাবের বার্তা রাষ্ট্র হইয়া গেল জেলেপাড়ার সর্বত্র। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধনঞ্জয়ের উঠান জেলেপাড়ার কৌতূহলী ছেলেমেয়ে স্ত্রীপুরুষে ভরিয়া উঠিল। সকলের চোখে অপার বিস্ময়। তিন বছর আগে সকলে যাহাকে মৃত্যুমুখে সঁপিয়া দিয়াছিল, প্রায় তিন বছর যাহাকে সকলে একরকম ভুলিয়াই ছিল, হঠাৎ সে আবার আসিল কোথা হইতে ? রাসুর মামা আশি বছরের বুড়া পীতম মাঝিও ন্যুব্জ দেহ লইয়া লাঠিতে ভর দিয়া

আসিয়া পড়িল। রাসু দাওয়ার উপরে চাটাইয়ে বসিয়া মুহ্যমানের মতো একদা-পরিচিত এই জনতার দিকে স্তিমিত নিস্তেজ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল, কাছে গিয়া ক্ষীণদৃষ্টি পীতম মাঝি তাহাকে অনেকক্ষণ ঠাহর করিয়া দেখিল। চিনিতে পারিয়া ভাবাবেগে হাত হইতে লাঠিটা খসিয়া যাওয়ায় হঠাৎ ভাগনের গায়ের উপবেই হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া সে উঠিল কাঁদিয়া। হুমড়ি খাইয়া পড়িবার আঘাতে নয়, কাঁদিয়া উঠিল সে এই বলিয়া যে রাসু একা ফিরিয়া আসিল আর সকলে কই ?

যে অনাহারের পীড়নে রাসু একদিন সপরিবারে ঘরছাড়া হইয়াছিল, দু মুঠা চাল দিয়া পীতম তাহা লাঘব করিবার কোনো চেষ্টাই করে নাই। তাই বলিয়া তার এই কান্না যে অশোভন হইল তা নয়। সেই দুর্দিনে মামাব স্বাভাবিক উদাসীনতার স্মৃতি রাসুও মনের মধ্যে পুষিয়া রাখে নাই। শুধু সেই দুর্দিনের স্মৃতি নয়, সবই যেন সে এতক্ষণ ভুলিয়া ছিল, তাহার দুঃখ বেদনার সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস। পীতমের কান্না শুনিয়া সেও হঠাৎ ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল . আমি একা ফির‍্যা আইলাম গো মামা, সবকটারে গাঙের জলে ভাসাইয়া দিয়া আমি একা ফির‍্যা আইলাম।

কান্নার মধ্যেও পীতম চমকাইয়া উঠিল। একেবারে বেখাপ্পা সুরে প্রশ্ন করিল, কস্ কি রাসু, সব কটা গেছে ?

বাসু সায় দিয়া বলিল, সব গেছে মামা, আমার কেউ নাই।

কেহ নাই। এক স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা, একুনে এই চারজনকে সঙ্গে লইয়া সে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছিল, হোসেন মিয়ার জঙ্গলাকীর্ণ ময়নাদ্বীপের উপনিবেশে একে একে চারজনেই মৃত্যুর দেশে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। এই গভীর শোকাবহ সংবাদে কেতুপুবের জেলেপাড়া নিবাসী নবনারী মূক হইয়া গেল। অথচ এই সংবাদ রাসুর আকস্মিক আবির্ভাবের মতোও বিস্ময়কর নয। সকলেই ইহা জানিত। সমুদ্রেব মধ্যে যে দ্বীপে সৃষ্টির দিন হইতে মানুষ বাস করে নাই সেখানে গিয়া কাহারও বাঁচিবাব উপায় আছে ? রাসুবা যখন সেখানে যায় তখনই সকলে নিশ্চিত জানিয়াছিল তাহাবা মরিতে যাইতেছে। রাসু যে জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে আশ্চর্য তো এইটুকুই ! এমনই আশ্চর্য যে রাসুকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়াও যেন বিশ্বাস হইতে চাহে না যে সে সত্যসত্যই ফিরিয়া আসিয়াছে।

ধনঞ্জয়ের বউ বুতিব মা একটি কলাই করা পাত্রে খানিকটা ঘোল আনিয়া দেয়, রাসু চোখেব পলকে এক নিশ্বাসে তাহা গিলিয়া ফেলে। সমবেত জনতা এতক্ষণ বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকে এক একটি সুবিধাজনক স্থান গ্রহণ কবিয়া বসিয়া পড়িলে রাসুকে ঘিরিয়া একটি সুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ সভার সৃষ্টি হয়। তারপর একে একে উঠিতে থাকে প্রশ্ন। জবাবে রাসুর প্রত্যেকটি কথা সকলে সাগ্রহে গিলিতে থাকে।

পীতম শিহবিয়া জিজ্ঞাসা করে, ময়নাদ্বীপে বাঘ সিঙ্গি আছে না রাসু ?

আছে না ? বাঘ সিঙ্গিতে বোঝাই !

বলিয়া সকলের মৃদু শিহরন লক্ষ করিয়া এই অর্ধমৃত অবস্থাতেও গর্বের উত্তেজনা রাসুকে যেন নবজীবন দান করে, ভাঙিয়া পড়িবাব ভঙ্গিতে বসিয়া থাকার বদলে হঠাৎ সে হইয়া যায় সিধা ! বলে, বাঘ সিঙ্গি ! বাঘ সিঙ্গির নামে ডরাইলা ? কী নাই ময়নাদ্বীপে কও ? সাপ যা আছে এক একটা, আস্তা মাইন্‌ষেরে গিলা খায় ! রাইতে সুমুন্দুরের কুমির ডাঙ্গায় উঠ্যা আইসা মাইন্‌ষেরে টাইনা নিয়া যায়—

হ, বলিতে বলিতে মুখ খুলিয়া যায় রাসুর, আর শুনিতে শুনিতে হাঁ হইয়া যায় তাহার শ্রোতাদের মুখগুলি। হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ, এমন ভীষণ স্থান সেটা ?

যাহারা রথের মেলায় গিয়াছিল একে একে তাহারা ফিরিয়া আসিতে থাকে। সন্ধ্যার সময় জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে আজিকার সন্ধ্যাটি নামে সানন্দে। বউরা হাসিমুখে লাল পাছাপাড় শাড়ি

নাড়িয়া চাড়িয়া দ্যাখে, নূতন কাচের চুড়ির বাহারে মুগ্ধ হয়, কাচ ও কাঠের পুঁতির মালা সযত্নে কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখে, ছেলেমেয়েরা বাঁশি বাজায় আর মাটির পুতুল বুকে জড়াইয়া ধরে। আহ্লাদ বহন করিয়া এই তুচ্ছ উপকরণও যে কুটিরে আসে না, সেখানে যে বিষাদ জমাট বাঁধিয়া থাকে তা নয়, কোনো না কোনো রূপে সোনাখালির মেলার আনন্দের ঢেউ সে কুটিরেও পৌঁছিয়াছে। একটি কাঁটাল, দুটি আনারস, আধসের বাতাসা—এই দরিদ্রের উপনিবেশেও যে দরিদ্রতম পরিবার শুধু নুন, আর অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়া ধরা পুঁটির তেলে ভাজা পুঁটিমাছ দিয়া দিনের পর দিন আধপেটা ভাত খাইয়া থাকে—খুশি হইয়া উঠিতে আর তাহাদের অধিক প্রয়োজন কীসের ? কুবেরের প্রতিবেশী বুড়া সিধু দাস একটি পয়সা সম্বল করিয়া মেলায় গিয়াছিল, পয়সাটি সে খরচ করে নাই কিন্তু মেলা হইতে সে যে বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে তাহাতে তাহার বৃহৎ পরিবারে আজ উৎসবের অন্ত নাই। ভিক্ষা সিধু করে নাই, বাগাইয়াছে। সারাদিন মেলায় ঘুরিয়া যেন-তেন-প্রকারেন সংগ্রহ করিয়াছে। সংগ্রহ করিয়াছে তিনটি দাগ-ধরা প্রকাণ্ড ফজলি আম, একটা তুলতুলে পাকা আস্ত খাজা কাঁটাল, সের তিনেক একত্র মেশানো চাল ডাল খুদ আর খাসির একটা মাথা। গরিবের উৎসবে আর কী চাই ? কুড়ানো ফেলনা জিনিস ! খাসির মাথাটা ধরিতে গেলে সে একরকম চুরিই করিয়াছে বলিতে হয়, কিন্তু তাতে কী, ভিক্ষা সিধু কারও কাছে চায় নাই, পয়সা সিধু কারও চুরি করে নাই।

কুবেরের উঠানে দাঁড়াইয়া সিধু বলে, আমারে না নিয়া ফিরা আলি কুবির ?

দাওয়ায় ডিবরির আলোতে কুবের একটা কোঁচের লোহার শলাকাগুলি পরীক্ষা করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলে, তুমি না হীরু জ্যাঠার নায় আগেই ফিরা আইলা ?

সিধু দাওয়ায় উঠিয়া যায়।

তা আইলাম কুবির, তা আইলাম। রঙ্গ কইরা কইলাম, বোঝস না ? কোঁচটা কিনা আনলি সন্দ করি। নিল কত ?

আষ্ট আনা।

আট-দশহাত লম্বা সরু তল্লা বাঁশের ডগায় দশ-বারোটি তীক্ষ্ণ লোহার শলাকা বসানো মাছমারা যন্ত্রটি সিধুও গম্ভীর মুখে পরীক্ষা করিয়া দ্যাখে। গোড়ার দিকটা ধরিয়া অন্ধকার উঠানে ছুঁড়িবার অভিনয় করিয়া বলে, ভার মন্দ না, জিতছস কুবির। কা পরশুতক আমিও একটা কিনা লমু।

সিধুর মতলব কুবের ঠিক বুঝিতে পারে না। কোঁচটি সে ঘরের মধ্যে কোনায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া আসে। বিকালে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গুমোট করিয়া আছে ; আকাশে বিশেষ মেঘ নাই বটে কিন্তু কখন যে মেঘ ঘনাইয়া আসিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিবে বলা যায় না। রাসুকে পীতম তাহার বাড়ি লইয়া গিয়াছে। এখন হয়তো আবার তাকে ঘিরিয়া সভা বসিয়াছে সেখানে, নিজের নির্বাসনের কাহিনি বলিয়া রাসু সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অত্যন্ত ক্ষুধা না পাইলে কুবেরও সেখানে গিয়া বসিত।

পিসি হাঁড়িতে ভাত ফুটাইতেছে, না খাইয়া রাসুর রোমাঞ্চকর গল্পের লোভেও কোথাও যাওয়ার ক্ষমতা এখন তার নাই।

সিধু বসিয়া বসিয়া বাজে কথা বলে, শিথিল ছাড়া ছাড়া তাহার ভাষা, অনির্দিষ্ট অবান্তর বিষয়বস্তু। কুবের আনমনে সায় দিয়া যায় : হ।

পেটে ক্ষুধার জ্বালা, মনে পীতম মাঝির বাড়ি যাওয়ার তাগিদ, বুড়া সিধুর বকবক শুনিতে শুনিতে বিরক্তির তাহার সীমা থাকে না।

শেষে সিধু যেন প্রসঙ্গক্রমেই বলে, খাসির একটা মাথা আনিলাম কুবির। মস্ত মাথাখান—মইষের মতো দুটা শিং।

নিল কত ?

শ্যাষ বেলা সস্তা কিনলাম কুবির। পুরা পাঁচ আনা চাইয়া শ্যাষ ম্যাশ চোদ্দ পয়হায় দিল। মাইয়াটারে ব্যানুন রাঁইধবার কইলাম, তা কয়, তেল মরিচ নাই, চালও নাকি বাড়ছে।

সিধুর কথা শুনিবার সমস্ত আগ্রহ কুবের সহসা হারাইয়া ফ্যালে। পিসিকে সে জিজ্ঞাসা করে, ভাত হইল পিসি ? একেবারে সে পিছন ফিরিয়া বসে সিধুর দিকে।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া সিধু উঠিয়া যায়। বাঁশের একটা টুকরিতে খাসির কোটা মাথাটা আনিয়া কুবেরের সামনে ধরিয়া বলে, দ্যাখ কুবির, মিছা কই নাই। ঘাড়ের কাছে খাসা খানিক মাংস ছিল, এই দ্যাখ—টুকরির কাছে মুখ লইয়া ঠাহর করিযা করিয়া সিধু কয়েক টুকরা মাংস বাছিয়া কুবেরকে দেখায়। করুণ নয়নে কুবেরের মুখের দিকে চাহিয়া বলে, ত্যাল মরিচ দিয়া ব্যানুন যা হইব—অমর্ত। আমিনুদ্দির ঠাঁই প্যাঁজ রসুন মাইগা আইনা—

আমারে দেখাও ক্যান ? রাঁধগা ব্যানুন।

সিধু এবার স্পষ্ট করিয়াই বলে, ত্যাল মরিচ আর একমুঠা চাল দে কুবির। তরেও দিমুনে ব্যানুন।

কুবের সন্দিগ্ধ হইয়া বলে, দিবানি নিয্যস ?

সিধু আহত হইয়া বলে, দিমু না ? কস কী কুবির ! তরে না দিয়া যামু কই ?

তেল মশলা এবং চাল লইয়া সিধু উঠিল। আঁতুড় হইতে মালা বলিল, বুড়া কি বজ্জাত ! মাথার ভাগ দিব না আইঠা কলা দিব, দেইখো। কুবের উদাসভাবে বলিল, না দেয় না দিব। আজ তো শ্যাষ না, আরেক দিন আইলে মাইরা খেদাইয়া দিমু—আমার লগে চালাকি কইরা যাইব কই ?

ভাত নামিলে ইলিশ মাছ ভাজা আর লংকারক্তিম তরকারি দিয়া ফেনসমেত তপ্ত অন্নে কুবের মুহূর্তের মধ্যে পেট ভরাইয়া ফেলিল। গোপিকে খানিক পরে একটা বাটি লইয়া গিয়া সিধুর কাছ হইতে খাসির মাথার ব্যঞ্জন আনিতে বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

পীতম মাঝির বাড়ি জেলেপাড়ার একেবারে উত্তর সীমান্তে। গোয়ালের ভিতর দিয়া তাহার বাড়িতে ঢুকিতে হয়; গোয়ালের একদিকে বাঁধা থাকে দুটি শীর্ণ গোরু, অন্যদিকে থাকে পীতমের প্রসিদ্ধ বেড়া-জাল। এতবড়ো জাল কেতুপুরের আর কাহারও নাই। বাড়িতে উঠানের বালাই নাই, গোয়াল পার হইয়া ঢুকিতে হয় প্রকাণ্ড একটা ঘরে। দুপাশের ছোটো দুখানা ঘরে ঢুকিবার দরজাও এই ঘরের ভিতর দিয়া। কার্পণ্য ও বেড়া-জালটির মতো বাড়ি করার এই খাপছাড়া ঢংও পীতমের কম প্রসিদ্ধ নয়, লোকে নাম দিয়াছে কয়েদখানা। ঘরের পিছনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপরে একটা ডোবা। ডোবার ওদিকে বাঁশবনের পরে আর মানুষের বসতি নাই, বহুদূর বিস্তৃত শস্যখেত আষাঢ়ের গোড়াতেই এখন অর্ধেকের বেশি জলে ডুবিয়া গিয়াছে। বাঁশবনে জেলেপাড়ার প্রায় সকলেরই পরিচিত একজোড়া পাঁচফুট লম্বা গোখুরা সাপ বাস করে। ডোবায় থাকে কয়েকটি গোসাপ।

বড়ো ঘরখানায় সভা রীতিমতোই বসিয়াছিল। ঘরে ঢুকিয়া কুবের অবাক হইয়া দেখিল, সভাপতি রাসু নয়, হোসেন মিয়া। পীতমের কাঠের সিন্দুকটার উপরে কাঁথা ভাঁজ করিয়া পাতিয়া হোসেনকে বসিতে দেওয়া হইয়াছে। রাসু মিশিয়া গিয়াছে একেবারে ভিড়ের মধ্যে। সকলের মুখেই একটা দারুণ অস্বস্তির ভাব, আড়চোখে সকলে হোসেন মিয়ার দিকে চাহিতেছে। এতগুলি লোকের নিশ্বাসে ঘরের আবদ্ধ বাতাস হইয়া উঠিয়াছে দূষিত, গরমে হোসেন মিয়ার কপালে বড়ো বড়ো

ফোঁটায় জমিয়া আছে ঘাম। এদিক ওদিক চাহিয়া কুবের টুপ করিয়া সকলের পিছনে বসিয়া পড়িল। হোসেন মিয়া এখানে আসিয়া জুটিল কোথা হইতে ? এত লোকের সামনে রাসুর সঙ্গে যখন তাহার মুখোমুখি হইয়া গিয়াছে, কী কাণ্ডটা আজ হয় দ্যাখো !

কুবের বিষাদ বোধ করে। আহা, এতবড়ো একটা কর্মঠ শক্তিশালী লোক, একগুঁয়ে সম্মানকামী লোক, কপালের ফেরে বড়ো জব্দ হইয়া গেল। রাসু তাহাকে একেবারে হাতেনাতে ধবাইয়া দিয়াছে সকলের কাছে। যে এত প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিল, আজ বুঝি তাব মুখ ফুটিয়া কথা বলিতেও বাধিতেছে। সোজাসুজি অপমান করিবার সাহস হয়তো কাহারও হয় নাই, কিন্তু কৌশলে নানাভাবে নানা ইঙ্গিতে কত লজ্জাই লোকটাকে সকলে না জানি এতক্ষণ দিয়াছে। কুবের এমনই মমতা বোধ করে যে সে ভাবিতে থাকে, পারিলে আজ সে হোসেন মিয়ার পক্ষই লইত। লোভ দেখাইয়া মিথ্যা আশ্বাস দিয়া হোসেন মিয়া যে রাসুর স্ত্রীপুত্রকে সুদূর ময়নাদ্বীপে লইয়া গিয়া হত্যা করিয়াছে, কোন যুক্তি দেখাইয়া তাহার এই কীর্তি সে সমর্থন করিত কুবের তাহা জানে না। সে যাকে ভয় করে, এতলোকের সামনে তার মাথা হেঁট হইয়া যাওয়ায় মনে মনে সে শুধু ব্যথা পাইতেছিল। অন্ধ আবেগের সঙ্গে তার মনে হইতেছিল, যারা পঙ্গু অসহায় জীব, শক্তিকে লজ্জা দেওয়া তাদের পক্ষে ভালো কথা নয়—মানুষের ধর্মবিবুদ্ধ এ কাজ।

এ কথা কুবের জানে যে হোসেন মিয়ার বিচার করিয়া শাস্তি বিধানেব কল্পনা জেলেপাড়াব এই সমবেত মাতব্বরেরা করিবে না। তবু আজ এই সমষ্টি বিচারকের ভঙ্গি গ্রহণ করিয়াছে। কী স্পষ্ট ভাবেই না হোসেন মিয়াকে অপমান করিতেছে সকলের বসিবাব ভঙ্গি, চাহিবাব ভঙ্গি, চুপ কবিয়া থাকার ভঙ্গি !

বিচলিত ও উত্তেজিত হইয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে কুবের দেখিতে পাইল, জহব আমিনুদ্দি এবং আরও দুজন মুসলমান মাঝি অত্যন্ত গম্ভীরমুখে একদিকে বসিয়া আছে। ধবিতে গেলে এরাই কেতুপুরের মুসলমান মাঝিব সমাজ, আবও দু-চাবজন যাবা আছে তাবা একান্ত নগণ্য। এদেব সংখ্যা পাঁচ-ছয়ঘরের বেশি হইবে না। জেলেপাড়ার পূর্বদিকে এদের একত্র সন্নিবেশিত বাড়িগুলিতে বেড়ার বাহুল্য দেখিয়া সহজেই চিনিতে পাবা যায়। যতই জীর্ণ হইয়া আসুক, ছেঁড়া চট দিয়া সুপারি গাছের পাতা দিয়া মেরামত কবিয়া বেড়াগুলিকে এরা খাড়া করিয়া রাখে। অথচ খুব যে কঠোরভাবে পর্দাপ্রথা মানিয়া চলে তা বলা যায় না। মেয়েদের বাহিরে না আসিলে চলে না। নদীতে জল আনিতে যাইতে হয়, পুরুষেরা কেহ বাড়ি না থাকিলে দোকানে সওদা আনিতে যাইতে হয়, বাড়ির আনাচেকানাচে লাউ কুমড়া ফলিলে, মুর্গিতে ডিম পাড়িলে, গ্রামে গিয়া বেচিযা আসিতে হয়। বেড়াগুলি পর্দা রাখে শুধু অন্দবেব আর এমন বউ-ঝি বাড়িতে যদি কেহ থাকে যাহাব বয়স খুব কাঁচা—তাহার। এরা এবং জেলেপাড়ার অ-মুসলমান অধিবাসীরা সদ্ভাবেই দিন কাটায়। ধর্ম যতই পৃথক হোক দিনযাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক বড়ো অধর্ম পালন করে—দারিদ্র্য। বিবাদ যদি কখনও বাধে, সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাদ, মিটিয়াও যায় অল্পেই। কুবেরের সঙ্গে সিধুর যে কারণে বিবাদ হয়, আমিনুদ্দির সঙ্গে জহরের যে কারণে বিবাদ হয়, কুবের আমিনুদ্দিব বিবাদও হয় সেই কারণেই। খুব খানিকটা গালাগালি ও কিছু হাতাহাতি হইয়া মীমাংসা হইয়া যায়।

মধ্যস্থতা হয়তো করে জহর মাঝিই।

বলে, কুবের বাই, ছাড়ান দাও। আরে হোই আমিনুদ্দি, সামাল দে। পোলাপানের পারা কাইজা করস, তগর শরম নাই ?

কুবের লক্ষ করিয়া আশ্চর্য হইল, এই আমিনুদ্দি আজ একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে। হোসেন মিয়ার দিকে সে চাহিয়া নাই, সে চাহিয়া দেখিতেছে আমিনুদ্দিকে ! আমিনুদ্দির অস্বস্তিও

অত্যন্ত সুস্পষ্ট। জহরের মধ্যস্থতায় অনেকবার বিবাদ মিটিলেও মনে মনে আমিনুদ্দির উপর কুবেরের রাগ ছিল। চোখে চোখে মিলিতে সে চোখ ফিরাইয়া লইল।

কেহ কথা কহে না। কী ভাবিয়া হোসেন মিয়া হঠাৎ কুবেরকেই বিলম্বিত সম্ভাষণ জানাইয়া বসিল।

পিছে বইলা ক্যান কুবের বাই ? আগাইয়া বও। খানাপিনা হয় নাই ?

কুবের হঠাৎ বড়ো উল্লাস বোধ করিল। আগাইয়া সকলের সামনে গিয়া বসিয়া বলিল, খাইছি মিয়া বাই।

বাঁ হাতে নিজের লালচে দাড়ি মুঠা করিয়া ধরিয়া হোসেন মিয়া বলিল, গণেশরে দেহি না ? গেছে কই ?

কেডা জানে ? ফিরতি বেলায় মেলার মদ্যি মাইজা কর্তা ডাইকা কয়, গাঁয়ে ফেরস নাকি গণেশ ?—মাছগুলা বাড়িতে দিয়া আসিস, লইয়া যা। কইয়া একডালা ইছামাচ দিলেন। মাছ দিবার লাইগা গণশা কর্তাগো বাড়িতে গেছে সন্দ করি।

মেজোকর্তার নাম অনন্ত তালুকদার। কেতুপুর গ্রামখানি তাহারই। জেলেপাড়ার যাহারা দু-এক বিঘা জমি রাখে, মেজোকর্তাকেই তাহারা খাজনা দিয়া থাকে। মেজোকর্তার নামোল্লেখে সকলে মন দিয়া কুবেরের কথা শুনিল। হোসেন মিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কর্তা আলেন কবে ?

আলেন আর বিষ্যুদবারে।

হীরু মাঝি চোখ মিটমিট করিতে করিতে বলিল, মাইজা কর্তার সগল সংবাদ দেহি রাখস কুবের, ভুবন সা-র লগে মামলার কী হইল ক দেহি ?

কুবের বলিল, কর্তা হাঁসচরের দখল পাইছেন। ভুবন সা-র নায়েব নাকি কয়েদ হইছে খবর শুনি জ্যাঠা। সাঁইথির কুঞ্জ গোঁসাই সাক্ষী দিছে, স্যায় নাকি নিজের চোখে নায়েবরে কর্তাগো কাছারি ঘরে আগুন দিতি দেখিলো।

পীতম বলিল, হ ? তুই জানলি কিবা ?

কুবের সগর্বে বলিল, ইডা কী জিগাও মামা ? আমার জাননের বাকি কী ? শেতলবাবুর ঠাঁই জানলাম।

শীতলের নামোল্লেখে পীতম মাঝি নিঝুম হইয়া গেল। নকুল শয়তানি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শেতলবাবু ? তেনারে পালি কই কুবির ?

কুবের হাসিয়া বলিল, নকুলদা য্যান পোলাপান, জান না কিছু। শীতলবাবুর ঠাঁই পয়সা পামু, কাল রাইতে আমাগোর যুগীর বাড়িতে তাগিদ দিবার গেছিলাম। পয়সা দিবার মতলব ডাকাইতটার নাই, খাতির কইরা কইল, বয় রে কুবের তামুক খা। তামুক টানি রাজ্যির গল্প কইরা আইলাম। কইলি না পিত্যয় যাবা নকুলদা, শেতলবাবু কয়, মাইজাবাবু দেনায় ডুবছে।

বুড়া পীতম মাঝি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, নকুল তখনও শয়তানি করিয়া বলিল, যুগীর না পোলা হইবো কুবির ?

কুবের বলিল, কেডা জানে ? মুটাইছে দেখলাম।

কে জানে, কী আশ্চর্য ইহাদের উপভোগ্য রসিকতা। যুগী পীতম মাঝির মেয়ে, সম্প্রতি জেলেপাড়ারই একধারে একখানা ঘর বাঁধিয়া মেজোকর্তার মুহুরি শীতল ঘোষের সঙ্গে বাস করিতেছে। এতলোকের মাঝে পীতমের সামনেই তাহার মেয়ের সম্বন্ধে নকুল যেমন অনায়াসে রসিকতা করে, সকলে হাসাহাসি করিয়া তাহা উপভোগও করে বিনা বাধায় ও বিনা দ্বিধায়।

পীতম রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলে, বাইর তুই আমার বাড়ির থেইকা নকুইলা, দূর হ !

নকুল মুচকি হাসিয়া বলে, গোসা কর ক্যান মামা ! জবাব দিবার পার না মাইঝা কর্তা কুবিররে এত খাতির করে ক্যান---তাই জিগাইয়া ? কুবেরের পোলা কেমন ধলা হইছে জিগাও।

কুবের মুষ্টি তুলিয়া বলে, মারুম কইলাম নকুইলা, মাইরা লাশ করুম তরে।

মনে হয়, সভার চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। রাসু ও হোসেন মিয়াকে উপলক্ষ করিয়া সভায় যে চাপা অসন্তোষ ও প্রতিবাদের ভাব আসিয়াছিল প্রসঙ্গান্তরে এখন তাহা বিলীন হইয়া গিয়াছে। ও বিষয়ে আর কাহারও কিছু বলিবার বা ভাবিবাব নাই। হোসেন মিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় !

বিয়ানে একবার বাড়িত যাইও রাসু বাই। পয়সা কড়ি পাইবা মালুম হয়, নিকাশ নিয়া খারিজ দিমু। ময়নাদ্বীপির জমিন না নিলি জঙ্গল কাটনেব মজুরি দিই---খাওন পরন বাদ। কাইল যাইও। লালচে দাড়ির ফাঁকে হোসেন মিয়া মৃদু মৃদু হাসে, বলে, মন করতিছ, হোসেন মিয়া ঠক। তোমারে ঠকাইয়া হোসেন মিয়ার ফয়দা কিসিব ? কোন হালারে আমি জবরদস্তি ময়নাদ্বীপি নিছি ? আপনা খুশিতে গেছিলা, ঝুট না কলি মানবা রাসু বাই। ফিরা আইবার মন ছিল, আমারে কতি পারলা না ? একসাথ আইতাম ?

রাসু ঘাড় নিচু করিয়া থাকে। আমিনুদ্দি বলে, যান নাকি মিয়া ?

হ।

শোনেন। আমি ময়নাদ্বীপি যামু না। কইয়া থুইলাম।

হোসেন মিয়া তেমনি মৃদু মৃদু হাসে।

তোমারে যাতি কই নাই আমিনুদ্দি। খুশ না হলি ক্যান যাবা ?

পাতলা পাঞ্জাবি ঘামে ভিজিয়া যাওয়ায় হোসেন মিয়ার বুকের নিবিড় লোমরাজি দেখা যাইতেছিল। সেইখানে হাত দিয়া সে আবার বলিল, জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, এ্যানে আইজ তোমরা ঘা দিলা, এই দিলের মদ্যি।---কুবের বাই, ঘব যাইবা নাকি ?

কুবের সায় দিয়া উঠিয়া আসিল। দুজনে গোয়াল পাব হইয়া নামিয়া গেল পথে। আকাশ নিবিড় মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে, দুর্ভেদ্য অন্ধকারে জেলেপাড়ার পথ পায়ের তলেও হইয়া আছে অদৃশ্য। অত্যন্ত সন্তর্পণে পা ফেলিয়া আগাইতে হয়, দীর্ঘকালের পবিচয় না থাকিলে বাড়ির আনাচকানাচ দিয়া আঁকাবাঁকা পথ তাহারা খুঁজিয়া পাইত না। কুবেরের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া আকাশেব জমানো মেঘ হঠাৎ গলিয়া যাওয়ায় চোখের পলকে তাহারা ভিজিয়া উঠিল। কুবেরের সঙ্গে হোসেন মিয়াও উঠিল গিয়া তাহার ভাঙা কুটিরে।

দাওয়ায় ছাট আসিতেছিল, হোসেন মিযাকে ঘরের মধ্যেই বসিতে দিতে হইল। কুবেরের দুই ছেলে লখা ও চণ্ডী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, জাগিয়া ছিল গোপি। চাটাইয়ের উপব জাঁকিয়া বসিযা হোসেন মিয়া তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিল, বলিল, পিয়াস জানায় বিবিজান, পানি দিবা না ? গোপি ঘটিতে জল আনিয়া দিলে আলগোছে মুখে ঢালিয়া দিযা ঘটিটা দাওয়ার প্রান্তদেশে রাখিল। ঘরের চাল বাহিয়া যে জলের ধারা পড়িতেছিল আঁজলা ভরিয়া সেই জল ধরিয়া ঘটির গায়ে ঢালিয়া ঢালিয়া ঘটিটি গোপি করিয়া লইল শুদ্ধ।

রাত্রি বাড়িতে থাকে, বৃষ্টি ধরিবার লক্ষণ দেখা যায় না। পিসি ঢেঁকি ঘরে গিয়া ঝাঁপ বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়ে, ভাইদের পাশে শুইয়া গোপির দু'চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসে, শ্রান্ত কুবেরের চোয়াল ভাঙিয়া হাই উঠে, বাহিরে চলিতে থাকে অবিরাম বর্ষণ। কিছুক্ষণ বৃষ্টি হইবার পর ঘরের ফুটা কোণ দিয়া ভিতরে জল পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, চাহিয়া দেখিয়া হোসেন মিয়া আপনা হইতে কাল সকালেই কুবেরের ঘর ছাইবার শণ দিবার কথা বলিয়াছে। কুবের একসময় উঠিয়া গিয়া মালার অবস্থা দেখিয়া আসে। বহু যত্নে কুবের তাহার আঁতুড়ের চারিদিকে বেড়ার সমস্ত ফুটা বন্ধ করিয়াছে, দাওয়ার এদিকটা ভাসিয়া গেলেও আঁতুড়ে বৃষ্টির ছাট ঢুকিবার কোনো পথ নাই। মেঝেটাই শুধু হইয়া

আছে ভিজা স্যাঁতসেঁতে যার কোনো প্রতিকার করার সাধ্য কুবেরের নাই। আর কটা দিন পরেই মালা এখান হইতে মুক্তি পাইবে। বুকে পিঠে তাহার যে অল্প অল্প ব্যথা হইয়াছে, কদিন এখানে থাকার ফলে সেটা বাড়িয়া না গেলেই বাঁচা যায়।

মালা ভয়ে ভয়ে বলে, আমারে দুগা মুড়ি চিড়া দিবা গো ?

ক্যান, ভাত খাস নাই ?

খাইছি। ভাতে টান পড়ল, পেট ভইরা খাই নাই। অখন খিদায় পেট জ্বলে।

জ্বালাইয়া মারস্ বাপু তুই। বলিয়া কুবের হাঁড়ি কলসি খুঁজিয়া পিসির নিজের জন্য লুকানো কতকগুলি চিড়া মালাকে আনিয়া দেয়। উঠিয়া বসিয়া অন্ধকারেই চিড়া মুখে দিয়া মালা বলে, হোসেন মিয়ারে খাইতে দিবা না ?

কী দিমু ?

মেলার থেইকা আম না আনছিলা ? তাই দাও—করবা কী! খিদায় মানুষটা খুন হইয়া যায় না।

কুবেরের সহসা মনে পড়িয়া যায়। ভাবে, সিধুর কাছ হইতে যে মাংসের ব্যঞ্জন পাওয়া গিয়াছে তাই দিয়া আতিথ্য করিলে মন্দ হয় না। মুসলমান মানুষ, মাংস বেশ পছন্দ করিবে। কিন্তু পরক্ষণেই এ বিষয়ে কুবেরের উৎসাহ কমিয়া যায়। এমন একদিন ছিল হোসেন মিয়া যখন খাসির মাথার ব্যঞ্জন পাইলে ধন্য হইয়া যাইত, আজ যার তার রান্না ও সব কী আর সে খাইবে ? শুধু না খাওয়া নয়, খাইতে বলিলে হয়তো সে আজ অপমানই বোধ করিয়া বসিবে। তাব চেয়ে আম যখন আছে, তাই দেওয়া ভালো।

ঘরে গিয়ে কুবের একটু অবাক হয়। চাটাইয়ে চিত হইয়া শুইয়া ইতিমধ্যেই হোসেন মিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কুবের সন্তর্পণে মৃদুস্বরে একবার বলে, মিয়া বাই ? সাড়া না পাইয়া ঠেলা দিয়া ঘুম ভাঙায় গোপির।

সিধুর ঠাঁই ব্যানুন আনছিলি গোপি ?

ঘুমে আধমরা গোপি বলে, উঁহুঁ।

উঁহুঁ ! আনতি কইয়া গেলাম না হারামজাদি ?

বাহুমূলে কুবেরের জোব টিপুনিতে গোপি চমকিয়া সজাগ হইয়া বসে। বলে, আনতি গেছিলাম বাবা। দিল না। কইল, বিড়ালে সব খাইয়া গেছে গা।

বিড়ালে খাইয়া গেছে কইল, না ?

গোপি সায় দিল। কুবের রাগে আগুন হইয়া বলিল, হালা জুয়াচ্চোর ! ব বিয়ানে খাওযামুনে বিড়ালরে। হালা বজ্জাইত !

ছাড়া পাইবামাত্র গোপি ঢলিয়া পড়ে। ঘুম বোধ হয় আসে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই। ঘরের যে কোণে জল পড়িতেছিল কুবের সেখানটা পরীক্ষা করিয়া দ্যাখে। জল বাহির হইয়া যাইবার জন্য সেখানে সে একটি সরু নালি করিযা দিয়াছিল, মাটি গলিয়া তাহা প্রায় বুজিয়া আসিয়াছে। জল জমিয়া ঘরের ভিতরের দিকে আগাইয়া আসিয়াছে অনেকদূর। হাত দিয়াই নালিটা সাফ করিয়া কুবের জল বাহির করিয়া দেয়। তারপর এক গভীর সমস্যার কথা ভাবিতে থাকে। ডিবরিতে বেশি তেল নাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিভিয়া যাইবে। হোসেন মিয়াকে ডাকিয়া তুলিয়া আম খাওয়ার অনুরোধ এখন সে জানাইবে কী ? বাদলা নামিয়া ঠান্ডা পড়িয়াছে। লোকটা আরামে গভীরভাবে ঘুমাইতেছে। ডাকিলে চটিবে না তো ?

ঘুমের মধ্যে হোসেন মিয়া পাশ ফিরিল। দ্যাখো, হঠাৎ কুবের কী আবিষ্কার করিয়াছে। হোসেন মিয়ার লম্বা পাঞ্জাবির পকেট হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে আনকোরা নতুন একটা টাকাপয়সা

রাখিবার ব্যাগ ! ব্যাগটা সে আজই মেলায় কিনিয়াছে সন্দেহ নাই। শখ করিয়া নতুন ব্যাগে কত টাকা পয়সা হোসেন মিয়া রাখিয়াছে কে জানে, ব্যাগটা ফুলিয়া মোটা হইয়া গিয়াছে।

কুবেরের দেহে কাঁপুনি ধরিয়া যায়। একমুঠা টাকা ও রেজকি হইতে প্রথমে সে একটা আধুলি ছাড়া আর কিছু লইতে সাহস পায় না। তারপর সে ভাবিয়া দ্যাখে যে এতগুলি খুচরা রেজকি কি আর হোসেন মিয়া হিসাব করিয়া গুনিয়া গাঁথিয়া রাখিযাছে ? আরও একটা সিকি এবং একটা আনি সে বাহির করিয়া লয়।

ব্যাগটা হোসেন মিয়ার লম্বা পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকাইয়া ফুঁ দিয়া সে ডিবরিটা নিবাইয়া দেয়। তখন একটা বড়ো ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়া যায়।

গোপি রুদ্ধ নিশ্বাসে বলে, বাবা !

কুবেরের দেহ শিরশির করে, মেরুদণ্ডটার ঠিক মাঝামাঝি।

চুপ যা গোপি, ঘুম যা।

আমারে কাইল পয়সা দিবা।

দিমু—চুপ যা, ঘুম যা গোপি।

গোপি আর কথা বলে না। অন্ধকারে দুহাত লম্বা ছোটো চাটাইটি সন্তর্পণে বিছাইয়া কুবের শুইয়া পড়ে।

তিন

ভোরে আগে ঘুম ভাঙিল হোসেনের। কুবেরকে সেই ডাকিয়া তুলিল, চোখ মেলিয়াই কুবেরের কেন যে হঠাৎ এক অকারণ ত্রাসে মন ভরিয়া গেল। কী হইয়াছে ? বিপদ কীসের? হ, কাল রাত্রে সে হোসেন মিয়ার পয়সা চুরি করিয়াছিল। একদফা চোখ মিটমিট করিয়া আশ্বস্ত হইল। হোসেন মিয়াকে খাতির করিয়া বলিল, যান নাকি মিয়া বাই ? খিদায় কাতর হইছেন সন্দ করি,—বাইতে কিছু খান ত নাই। এক কাম করেন, দুইগোটা আম খাইয়া যান।

প্রত্যূষে ঘুম ভাঙা মুখেও হোসেন মিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে পারে।

খাওনের কথা থোও কুবির বাই। বাড়িত গিয়া খামু।

একটা প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া বিড়ি ধরাইয়া হোসেন উঠিল। ঘুমন্ত গোপির দিকে এক নজর চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাইয়ার বয়স কত, কুবির বাই ?

নয় সন্দ কইরা থুইছি।

বিয়া দিবা না মাইয়ার ?

হ। দিমু, কেরমে কেরমে দিমু।

পকেট হইতে হোসেন ব্যাগটা বাহির করিয়া খুলিল। দেখিয়া পাংশু হইয়া গেল কুবেরের মুখ। কিন্তু না, টাকা পয়সা গুনিয়া দেখিবার জন্য হোসেন ব্যাগ বাহির করে নাই। একটা সিকি বাছিয়া লইয়া সে কুবেরের হাতে দিল। বলিল, বাচ্চাগো খাবার কিনা দিয়ো কুবির বাই। বলিয়া ব্যাগটা আবার পকেটে রাখিয়া দিল। কুবের আত্মসংবরণ করিল তৎক্ষণাৎ। যে বিপদ ঘটিল না তার জন্য আর কেন বুক কাঁপিবে, মুখ শুকনো দেখাইবে। খুশিতে বেসামাল হইয়া সে জিজ্ঞাসাই করিয়া বসিল, ব্যাগটা নতুন দেখি ? মেলায় কিনছেন বুঝি কাইল ?

হোসেন বলিল, হ।

কথা কহিতে কহিতে দুজনে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন বৃষ্টি নাই কিন্তু মেঘে মেঘে প্রভাতের রূপ অস্বাভাবিক থমথমে। হোসেন একবার মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে তাকাইল। ইয়া আল্লা, নামানো আকাশের তলে কী দীনা এই পৃথিবী ! ভিজিয়া চুপসিয়া চারিদিকে সকাতর হইয়া আছে। হোসেনের মনের কোণে একটু স্বাভাবিক কবিত্ব ছিল, জীবনে ভিন্ন অবস্থায় পড়িলে হয়তো সে কয়েকটি গীতিকা রচনা করিত, তার মধ্যে দুটি একটি মুখে মুখে প্রচার হইয়া স্থান পাইত শতাব্দীর সঞ্চিত গ্রাম্যগীতিকার অমর অলিখিত কাব্যে—মাঠেঘাটে, মশালের আলোয় আলোকিত উঠানে গীত হইয়া হইয়া ভনিতায় হোসেনের নাম দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িত, লোকে বলিত হোসেন ফকির, চল কেতুপুরে দেওয়ান ফকির হোসেন ছাহাবের দরগায় চেরাগ জ্বালি। হোসেন বুঝি কুবেরকে একেবারে ভুলিয়া যায়। অনেক দিন আগে, কুবেরের মতো ছেঁড়া কাপড় পরিয়া আধপেটা খাইয়া জলে কাদায় সে যখন দিন কাটাইত, সকাল সন্ধ্যায় তখন মনে তাহার ভাসিয়া আসিত গানের চরণ। ফুটা চালার নীচে ময়লা চাটাইয়ের বিছানায় উদরে উপবাস লইয়া তেমনই ভাবে কাল রাতটা কাটাইয়া আজ আবার হোসেনের মনে গান ভাসিয়া আসিতেছে।

কুবের, গাহান বাইন্ধবার পার ?

আমি পারতাম না। আমাগোর যুগইলা পারে। মুখে মুখে ছড়া বাইন্ধ্যা দেয়।

আমি বাইন্ধবার পারি।

কন কী মিয়া বাই ?

হোসেন এখন লাজুক। সে এদিক ওদিক তাকায়। ঘনঘন দাড়িতে হাত বুলাইয়া কুবেরের কাছেই অপরাধীর মতো হাসে। লোকটার আদি-অন্ত পাওয়া ভার।

তারপর হোসেন বলে, বাঁধুম, শুনবা ?

কুবের বলে, কন মিয়া বাই, কন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হোসেন সুর করিয়া বলিতে আরম্ভ করে :

আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও
        বোনধু, কত ঘুমাইবা।
বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা আকাল ফসল রোও
        মিয়া, কত ঘুমাইবা।
মানের পাতে রাইতের পানি হইল রুপার কুপি,
        উঠ্যা দেখবা না।
আলা করেন ঘরেব চালা কেডা চুপি চুপি,
        দিশা রাখবা না।
তোমার লাইগা হাওর দিয়া বাইয়া চেরাগ নাও
        দিল-জাগানি আলেন যিনি, মিয়া,
চিরা-মেঘের বাদাম তুইলা বন্ধু কনে যাও ?
        জিগায় তারে খাঁচার চিড়িয়া।
নিদ্ ভাঙে না, দিল জাগে না, বিবির বুকের শির,
পাড়ি দিবার সময় গেল, মাঝি তবু থির—
        মাঝি কত ঘুমাইবা।

কুবের অভিভূত হইয়া বলিল, মুখে মুখে বানাইলেন মিয়া বাই ?

খুশ হলি না পারি কী ?

হোসেন মিয়া আর দাঁড়াইল না। দুপুর বেলা ঘরের চালের জন্য শণ আনিতে গিয়া কুবের শুনিল, সে বিদেশ গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। কিন্তু হোসেন মিয়ার কথা কখনও বেঠিক হয় না। কুবেরের জন্য শণ সে রাখিয়া গিয়াছে।

গোপির বয়স এগারো, কুবের মেয়ের বয়স একবছর ভাঁড়ায় আর একবছর হাতে রাখিয়া বলে নয়। ন বছর বয়সে যে মেয়ের এগারো বছরের বাড় বিয়ের বাজারে তার দাম আছে। গণেশের শালা যুগল সম্প্রতি পাশের গ্রাম হইতে বোনের তত্ত্ব লইবার ছলে আসা যাওয়া শুরু করিয়াছে। সোজাসুজি কথা সে এখনও পাড়ে নাই, আলাপ আলোচনার মাঝখানে বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন করিয়া কুবের কী রকম দর হাঁকিবে জানিবার চেষ্টা করিয়াছে। স্পষ্ট করিয়া কুবেরও এখন পর্যন্ত কিছু বলে নাই। কথা উঠিলে বহুক্ষণ ধরিয়া মেয়ের প্রশংসা কীর্তন করিয়া শুধু একটু আভাস দিয়াছে দুকুড়ি তিনকুড়ি টাকার। বুদ্ধি থাকে যুগল আন্দাজ করিয়া নিক। গণেশের আত্মীয় বলিয়া টাকার বিষয়ে কুবের তাহাকে খাতির করিবে না। যুগল সম্ভবত তাহা টের পাইয়াছে, তাই ইলিশ মাছের মরশুমটা শেষ হইবার প্রতীক্ষায় আছে। হাতে তখন কী রকম টাকা জমে দেখিয়া কথা পাড়িবে। কুবের বোঝে না কী ! সকলের গোপন মতলব সে চোখের পলকে আঁচ করিয়া ফ্যালে।

মানুষ মন্দ নয় যুগল। এতকাল অবস্থা খুব খারাপ ছিল, তাই বত্রিশ বছর বয়স অবধি বিবাহ করিতে পারে নাই ; নিজের চেষ্টায় এখন সে অবস্থা ভালো করিয়াছে। উন্নতির জন্য তাহার প্রশংসনীয় প্রয়াসের কথা কাহারও অবিদিত নয়। দুটি একটি করিয়া কতকাল ধরিয়া কতকষ্টে সে কিছু টাকা জমাইয়াছিল, তারপর গণেশের কাছে বোনের বিবাহ দিয়া পাইয়াছিল তেইশ টাকা। সকলে ভাবিয়াছিল, এবার যুগল বিবাহ করিবে, বিবাহের জন্য ছাড়া অত কষ্টে টাকা জমায় কে ? কিন্তু যুগল তা করে নাই। সমস্ত জমানো টাকা দিয়া একটা বড়ো নৌকা কিনিয়া সকলকে সে অবাক করিয়া দিয়াছিল। দুশো টাকা সে নৌকার দাম, সুতরাং টাকা সে কম জমায় নাই। ইচ্ছা করিলে ওই টাকায় সে তিন তিনটা বিবাহ করিতে পারিত। অন্তত একটা বিবাহ করিয়া বাকি টাকায় একটা ছোটোখাটো নৌকা কিনিতে কোনো বাধাই ছিল না। তার বদলে উপার্জনের এই স্থায়ী উপায়ের জন্য সমস্ত পুঁজি ভাঙিয়া সে যে সুবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল তার তারিফ করিতেই হয়। দ্যাখো, একবছরে যুগলের ভাঙা ঘর নূতন হইয়াছে, শীর্ণ দেহে মাংস লাগিয়াছে, বিবাহের জন্য টাকাও সে আবার জমাইয়া ফেলিতে পারিয়াছে কিনা কে জানে ! জাহাজঘাটে অতবড়ো নৌকার না চাহিতে ভাড়া হয়। বেলে ও জাহাজঘাটে আসিয়া কত মানুষ ও মাল কত গ্রামে যায়, এক একটি বাণিজ্য দ্রব্যের মরশুমের সময় কত মহাজন গ্রামে গ্রামে দাদন-দেওয়া মাল সংগ্রহের জন্য চড়া দরে অসংখ্য নৌকা ভাড়া নেয়। আর শুধু ভাড়া তো নয়। উপরি আয়ও কী কম ! ধানের বোঝাই লইয়া একদিনের পথ পাড়ি দিবার সময় দশ-বিশ সের ধান নৌকার গোপন ফাঁকে ফোকরে লুকাইয়া ফেলিবার সুযোগ মেলে ঢের। কেবল ধান নয়, কলাই, মটর, হলুদ, লংকা প্রভৃতি কত কী জিনিস বছর ভরিয়া যুগল অমন কত আনিয়াছে। উন্নতি সে আরও করিবে। কারণ, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে কোনো বিষয়ে তাহার এতটুকু শিথিলতা আসে নাই। এখনও সে আগের মতোই কৃপণ। আকুরটাকুরের মাঝি সমাজে আজ সে একজন মাতব্বর লোক। একদিন সেই যে গ্রামের মোড়ল হইয়া দাঁড়াইবে কেহ তাহাতে সন্দেহ করে না।

মালার ইচ্ছা বিবাহটা তাড়াতাড়ি চুকিয়া যায় গোপির। এত বয়স হইল আর কতকাল বয়স ভাঁড়াইয়া মেয়েকে কুবের ঘরে রাখিবে ? লোকে যে ইতিমধ্যেই নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। স্বামীকে মালা তাগিদ দিয়া বলে, আগো, যুগইলা নি কিছু কয় ? কুবের তাহাকে চোখ ঠারিয়া বলে, কয় না ?

কী কয় ?

তা শুইনা তর কাম কী ? মাইয়ালোক চুপ মাইরা থাক। পোলা বিয়ানের লাইগা পিরথিমিতে আইছস বিয়া পোলা যত পারস—রাও করস কেরে ?

মালা রাগে বইকী!

গাও জ্বালাইনা কথা দেহি খইর পারা ফোটে, মায় নি মুখে মধু দিছিল আঁতুড়ে ?

গোসা হইলে মারুম গোপির মা।

মারবা নাকি ? আগো মার, মার—না যদি মার লখার মাথা খাইবা।

কুবের ঝিমাইতে ঝিমাইতে নিদ্রাকাতর চোখে স্ত্রীর দিকে তাকায়। হ, ছেলে কোলে রোগা বউটিকে তাহার রাজরানির মতো দেখাইতেছে বটে। কে জানে রাজরানি দেখিতে কেমন ? ছেলেটাও যেন ফরসাই হইয়াছে মনে হয়, এমনি বয়সে লখা আর চণ্ডী যেমন তামাটে লাল রঙের ছিল সে রকম নয়। আঁতুড়ে যতদিন ছিল কুবের বিশ্বাস করে নাই, এখন তাহার মনে সন্দেহ আসিয়াছে যে ছেলেটা সত্যসত্যই খুব ফরসা হইবে। মালার রং কালো নয়, তামাটে—মাঝে মাঝে তাহাকে বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মতো ফরসাই দেখিয়া বসে। জেলেপাড়ার কোনো স্ত্রীলোকের গায়ে এমন চামড়া নাই। একটা পা যদি ওর হাঁটুর কাছ হইতে দুমড়াইয়া বাঁকিয়া না যাইত, কুবেরের ঘরে ও পায়ের ধুলা ঝাড়িতেও আসিত না। কিন্তু মালার চেয়েও ছেলেটার রং যেন ঢের বেশি ফরসা হইয়াছে। আরও কিছু বড়ো হইলে বিবর্ণ হইয়া আসিয়া শেষ পর্যন্ত রং হয়তো ওর মালার মতোই দাঁড়াইবে। তাই যেন দাঁড়ায়। কুবের তাই চায়। যতই সে শান্ত ও সুবিবেচক হোক, মাঝে মাঝে লোকের বিশ্রী ইঙ্গিতে গা জ্বালা করে বইকী, মালার দিকে চাহিয়া কখনও মনে ঘনাইয়া আসে বইকী একটা বিতৃষ্ণা মেশানো ব্যথিত ক্রোধ। কুবেরের দৃষ্টি আবও ঘোলাটে হইয়া আসে। এখন, শ্রাবণের এই প্রথম সপ্তাহে আকাশে মেঘের এক মুহূর্তের বিশ্রাম নাই। পরপর কয়রাত্রি অবিরত জলে ভিজিয়া কুবের আবার জ্বর বোধ করিতেছে।

অনেকক্ষণ নীরবে কাটিয়া গিয়াছে, তবু থামিয়া যাওয়া আলোচনাটা আবার আরম্ভ করিতে কোনোরকম ভূমিকার দরকার হয় না। এইমাত্র রাগারাগি হইয়া গিয়াছে ? কে বলিল ! কত শান্ত ও মোলায়েম কুবেরের গলার স্বর।

স্পষ্ট কইরা যুগল কিছু কয় না গোপির মা।

মালার গলাতেও এতটুকু ঝাঁঝ নাই।

কয় না ? ক্যান ? গোপিরে নিব না ?

গণশা কয় নিব, যুগইলা কিছু কয় না। উদিন আমারে জিগায়, খোঁড়ার মাইয়া নি খোঁড়া হয়।

তুমি কী কইলা ?

আমি কইলাম, তুই বলদ যুগইলা, খোঁড়া নি ব্যারাম যে মার থাকলি মাইয়া পাইবো ? আমাগোর গোপির চলন পরির পারা। জান নি গোপির মা, গণশা মোরে এক বিষম বিত্তান্ত কয়। নকুইলা গিয়া গিয়া যুগইলার নাকি মন ভাঙে, বাকা বাকা মাইয়ার খবর দিয়া আহে। যুগইলা য্যান দুই-দশটা মাইয়ার খবর না নিয়া গোপিরে নিব না সন্দ করি গোপির মা !

বলিয়া কুবের যেন ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু মালা তাহাকে চেনে। সে প্রত্যাশা করিয়া থাকে।

জান নি গোপির মা আরেক বিত্তান্ত ? রাসু গোপিরে নিব কয়।

মালা বিস্মিত হয় না। শুধু বলে, চালচুলা নাই।

সায় দিয়া কুবের বোধ হয় এবার সত্যই ঘুমাইয়া পড়ে। কারণ, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও মালা আর তাহার কোনো মন্তব্য শুনিতে পায় না। বসিয়া বসিয়া ছেলেকে সে স্তন দেয়। রোয়াকের ওদিকে রান্নার জায়গায় বসিয়া পিসি গোপির মাথার উকুন বাছিতেছে, সারারাত উকুনের কামড়ে মেয়েটা মাথা চুলকাইয়া সারা হয়। লখা ও চণ্ডী হয় ডাংগুলি খেলিতে গিয়াছে, আর না হয় কোথাও

বড়শি ফেলিয়া ধরিতেছে পুঁটিমাছ। যেখানেই ওরা থাক আর যাই করুক, জলে ভিজিয়া জ্বরে পড়িবে না, জলে ডুবিয়া মরিবেও না। সে ভয় মালার নাই। সে কেবল ভাবিয়া মরে, মারামারি করিয়া ছেলে দুটা কোনোদিন না খুন হইয়া আসে। পঙ্গু বলিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে মালার পরিচয় কম। কেতুপুরের দশমাইল উত্তরে চরডাঙা গ্রামের এমনই এক ভাঙা কুটিরে তার মায়ের এক বামুন ঠাকুরের নামে কানাকানি করা পাপের প্রমাণস্বরূপ এই ভাঙা পা-টি লইয়া সে জন্মিয়াছিল, বড়ো হইয়াছিল বাড়ির মধ্যে, লাঠিতে ভব দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাড়ির অদূরে রাম গোয়ালার গোয়ালঘরের কাছে কদমগাছটি পর্যন্ত ছিল তাহার কষ্টকর গতিবিধির সীমা। পাড়ার ছেলেমেয়েরা ওই কদমগাছটির তলে খেলা করিত, আব করিত মারামাবি। বড়োছেলেরা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলিকে মারিয়া আর কিছু রাখিত না। অনেক সময় এইসব মারামারির শেষ ফলটা গড়াইত বয়স্কদের মধ্যে, পাড়ায় মহামারি কাণ্ড বাধিয়া যাইত। দূরে দাঁড়াইয়া চোখ বড়ো বড়ো করিয়া মালা মজা দেখিত, বড়ো ভয় করিত তাহাব। অন্য ছেলে মার খাইলে সে কিছুই করিত না, কিন্তু যে দিন সকলে মিলিয়া তাহার ছোটো ভাই দুটিকে পিটাইতে আরম্ভ করিত সেদিন সে খুলিত মুখ—তাহার বাঁশির মতো সরু গলা শোনা যাইত পাড়ার সর্বত্র, সকলে ছুটিয়া আসিত। তার আগেই মালাকে কিন্তু দিতে হইত ভ্রাতৃপ্রেমের মূল্য। ভাইয়ের বদলে ছেঁচা খাইত সে। একজন একটা ধাক্কা দিলেই সে মাটিতে পড়িয়া যাইত। তখন চাব-পাঁচজনে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া তুলিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিত রাম গোয়ালার গোয়ালঘরের পিছনে গোবরগাদায়।

সেই হইতে ছেলেদের মারামারিকে বড়ো ভয় কবে মালা। নিজের ছেলে দুটিকে সে ঘবে আটকাইয়া বাখিতে চায়। কিন্তু খাতির তাহাকে কেহ করে না। বসিয়া বসিয়া যাহার দিন কাটে কে তাহার মুখ চাহিবে, কথা শুনিবে ? হাজাব বাবণ করুক মালা, লখা ও চণ্ডী চোখের পলকে উধাও হইয়া যায়। ফাঁকি দিয়া কাছে ডাকিয়া জোর কবিয়া ধরিয়া রাখিতে গেলে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া একেবারে রক্তপাত কবিয়া ছাড়ে। তবু প্রতিদিন মালা তাহাদের নানা ছলে কাছে বাখিবাব চেষ্টাব কামাই দেয় না। সন্তানস্নেহের হিসাবে জেলেপাড়ার জননীদেব মধ্যে মালাব মৌলিকতা আছে। ছেলের বয়স আট-দশবছর পার হইয়া গেলে তার সম্বন্ধে চিন্তা করা জেলেপাড়াব মেয়েদের রীতি নয়। চিন্তা করিবার অপবাপর বিষয়েব তাদের অভাব নাই। কচি ছেলে ছাড়া মায়ের কোল খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। নিষ্ঠুর ছাড়া স্বামীও বড়ো একটা হয় না। দুটি কুঁড়েঘরের কুটিবে যে সংকীর্ণ সংসার, তাবও কাজ থাকে অফুরন্ত। পুবুষেরা মাছ ধরিয়া আনে, পাইকাবি কেনাবেচা কবে, চুপড়ি মাথায় করিয়া বাড়ি বাড়ি মাছ জোগান দেওয়া তাদেব কাজ নয়। ও কাজটা জেলেপাড়ার মেয়েবা সন্তান প্রসবের আগে-পিছে দু-একটা মাস ছাড়া বছর ভরিয়া কবিয়া যায়। অপোগণ্ড শিশু ছাড়া আর কোনো সন্তানের ছোটো ছোটো বিপদ-আপদের কথা ভাবিবারও যেমন তাহাদের সময় নাই, ওদের স্নেহ করিবাব মতো মানসিক কোমলতাও নাই। নবজাত সন্তানকে তাহারা যেমন পাশবিক তীব্রতার সঙ্গে মমতা করে বয়স্ক সন্তানের জন্য তাহাদের তেমনই আসে অসভ্য উদাসীনতা। ছেলে মরিয়া গেলেও শোক তাহারা করে না, শুধু সুর করিয়া মড়াকান্না কাঁদে। মালা পঙ্গু, অলস। ঘবের কোনায় সে স্বতন্ত্র জীবনযাপন করে, জেলেপাড়ার রূঢ় বাস্তবতা তাই তাকে অনেকটা রেহাই দিয়াছে। ছেলেমেয়েগুলিকে ভালোবাসিবার মতো মনও তাহার আছে, সময়ও সে পায়।

ছেলেদের সে ফিরিয়া পায় সন্ধ্যার পর। সারাদিন পরে পাখির ছানার মতো অবসন্ন ছেলে দুটি ফিরিয়া আসে ঘরের কোনায়, খোঁড়া মাকে তখন তাদের প্রয়োজন হয়। জেলেপাড়ার প্রত্যেকটি কুটিরে যে অভিনয় অজানা, প্রতি দিনান্তে কুবেরের ঘবে তাহার অভিনয় হয়। বাহিরে সবটুকু শয়তানি অপচয় করিয়া লখা ও চণ্ডী শান্ত হইয়া থাকে, ভদ্র ও বাধ্য ছেলের মতো ঘেঁষিয়া আসে মায়ের কাছে। সারাদিন মালার যে একতরফা অবহেলিত স্নেহ খাপছাড়া লাগিতেছিল অপর পক্ষ গ্রহণ

করামাত্র তাহা মধুর ও অপূর্ব হইয়া উঠে। মালার কাছে বসিয়া তাহারা ভাত খায়, এক ছেলের মুখে স্তন গুঁজিয়া রাখিয়া আর দুজনকে ভাত মাখিয়া গ্রাস মুখে তুলিয়া খাওয়ানোর শখ মালার একার নয়, এমনিভাবে খাওয়াইয়া না দিলে ওরা খাইতে চায় না। আর হ, মালা রূপকথা বলে। মালার মাথায় উকুন, গায়ে মাটি, পরনে ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাপড় তাই এ সময়টা সে যে কত বড়ো নিখুঁত ভদ্রমহিলা, অসামঞ্জস্য তাহা স্পষ্ট করিয়া দেয়। লখা ও চণ্ডী উলঙ্গ, চকচকে ভিজা ভিজা গায়ের চামড়া। ডিবরির শিখাটি উর্ধ্বগ ধোঁয়ার ফোয়ারা, মাথার উপরে চাল পচা শণের, চারিপাশের দেয়াল চেরা বাঁশের, স্যাঁতসেঁতে ঢেউতোলা মাটির মেঝে। আদিম অসভ্যতার আবেষ্টনী। অভিনয় সুমার্জিত সভ্যতার।

ইলিশের মরশুমে কুবের এ সময় বাড়ি থাকে কদাচিৎ। যেদিন থাকে সেদিন বড়োলোকের বাড়ির পোষা কুকুরের মতো উদাস চোখে এ সব সে চাহিয়া দ্যাখে, স্নেহ মমতার এইসব খাপছাড়া কাণ্ডকারখানা। দেখিতে দেখিতে সে হাই তোলে, বড়োলোকের পোষা কুকুরের মতোই চাটাইয়ে একটা গড়ান দিয়া উঠিয়া বসে, মুখখানা করিয়া রাখে গম্ভীর। লখা ও চণ্ডীর মতো মন দিয়া সেও যে রূপকথা শুনিতেছে মালার তাহা টের পাইতে বাকি থাকে না। ছেলেরা ঘুমাইয়া পড়িলেও সে তাই থামে না, হাত নাড়িয়া মুখভঙ্গি করিয়া রস দিয়া ঘুমন্ত ছেলেদের গল্প বলিতে থাকে। গল্প বলিতে সে ওস্তাদ। একই গল্প বারবার বলিয়া শ্রোতাদের সে সমান মুগ্ধ করিতে পারে। গোপি সরিতে সরিতে মার গা ঘেঁষিয়া আসে। পিসি ঠায় বসিয়া থাকে দুয়ারের কাছে। মালাব গল্প শুনিতে আরও কে কে আসিয়া পড়িয়াছে দ্যাখো। গণেশের বউ উলুপী, ছেলে মনাই আর মেয়ে কুকী। আর আসিযাছে সিধুর তোতলা হাবা মেয়ে বগলী। কথা বলিয়া কেহ মালার রূপকথা বলায় বাধা দেয না। চুপচাপ শুনিযা যায়। গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে মালাই সকলের সঙ্গে আলাপ করে।

আলো উলুপী, পাক করছিলি কী ?

আখায় দুগা বাইগন দিছলাম। আর ইলশার ঝোল।

কুকী ! গায় কাপড় তুইল্যা বয় হারামজাদি ! মাইয়া য্যান সং।

বলিয়া আড়চোখে চাহিয়া কুবেরকে লজ্জা দিয়া মালা আবার রূপকথা বলিতে থাকে।

চার

এবারে বর্ষায় আউশ ধানের ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

পীতম মাঝির বাড়ির পিছনে তেঁতুলগাছটার গুঁড়ি পর্যন্ত কোনোবার জল আসে না, এবার আউশ ধান পাকিবার সময় হঠাৎ এত জল বাড়িয়া গেল যে গাছের গুঁড়িটা সপ্তাহকাল ডুবিয়া রহিল প্রায় তিন হাত জলের নীচে। এ জল আগে বাড়িলে ক্ষতি ছিল না, জলের সঙ্গে ধানের গাছও বাড়িয়া চলিত। কিন্তু ফসল পাকিবার সময় জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া ধানগাছ কেমন করিয়া বাড়িবে ?

বড়ো বর্ষা হইয়াছিল এবার। কেতুপুরের মাইল পাঁচেক দূরে চন্নার চর নামে পদ্মার একটা নিচু চর অর্ধেক জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, অনেকে ভয় পাইয়া চলিয়া গিয়াছিল চর ছাড়িয়া। বহুকাল আগে খেয়ালি পদ্মা যে ভূমিখণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিল কে জানে সহসা সে আবার তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে কিনা ! ডাঙার গ্রামে বর্ষার জল ঘরে উঠিলেও পূর্ববঙ্গের লোক ভয় পায় না, সে জলের স্রোত নাই। কিন্তু পদ্মার বুকে ছোটোখাটো চরে যে সব গ্রাম, পদ্মার জল নাগাল পাইলে সে সব গ্রামের ঘর বাড়ি গোরু মানুষ কুটার মতো ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।

কত গ্রাম যে এবার পাঁচ-সাতদিন জলের নীচে ডুবিয়া ছিল।

মালার বাপের বাড়ির গ্রাম চরডাঙ্গা নাকি তলাইয়া গিয়াছিল এক কোমর জলের নীচে।

খবর পাইয়া মালা কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছিল। বলিয়াছিল, আই গো তোমার পাষাণ প্রাণ ! আমার বাপ ভাই ডুইবা মরে, একবার নি খবর নিলা !

গণেশকে সঙ্গে করিয়া কুবের একদিন খবর আনিতে গেল।

খাল পুকুর মাঠ ঘাট তখন একাকার হইয়া গিয়াছে। দুমাস আগে যে খেতের আল দিয়া মানুষ চলাচল করিত, এখন সেখানে লগি থই পায় না। কোনো গ্রাম ভাসিয়া আছে দ্বীপের মতো, কোনো গ্রামে মানুষের ঘরের ভিতরে একহাঁটু জল উঠিয়াছে, সকলে বাস করিতেছে মাচা বাঁধিয়া। যে পারিয়াছে গোরু বাছুরের জন্যও মাচা বাঁধিয়া দিয়াছে, যে পারে নাই তার বোবা অসহায় পশুগুলি ঠায় দাঁড়াইয়া আছে জলের মধ্যে। গাছের ডালে পাখিরা শুধু আছে সুখে, ভূচর মানুষ ও পশুর কষ্ট অবর্ণনীয়। এক বাড়িতে কান্না শুনিয়া কুবের উঠানে নৌকা লইয়া গেল, দাওয়ার খুঁটি ধরিয়া ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখিল বাঁশের খুঁটির উপর দুখানা তক্তপোশ একত্র করিয়া জিনিসপত্র-সহ গৃহস্থ সপরিবারে বাস করিতেছে, মাসখানেকের একটি শিশুকে বুকে করিয়া গৃহস্থের স্ত্রী কাঁদিয়া আকুল। কী হইয়াছে শিশুটির ? নীচে পড়িয়া ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে কাল রাত্রে। কতটুকু জল মেঝেতে, এক হাতও হইবে না। ছেলেকে বুকে আঁকড়িয়া ধরিয়া জননী ঘুমাইয়া ছিল, কখন কেমন করিয়া সে নীচে পড়িয়া গিয়াছিল কে জানে ! এক মাসের শিশু নিজে তো নড়িতে চড়িতে পারে না, সেই ভরসায় তক্তপোশের মাচার চারিদিকে বেড়া তাহারা দেয় নাই, দুদিকে স্বামী স্ত্রী শুইয়াছিল মাঝখানে ছিল শিশু। ছেলেকে বুকে করিয়া ঘুমের ঘোরে জননী কি পাশ ফিরিয়াছিল ? ঘুমের ঘোরে ধারে সরিয়া সেই কি সন্তানকে বিসর্জন দিয়াছিল সর্বনাশা বন্যার জলে ?

চরডাঙ্গা পৌঁছিয়া দেখা গেল সমস্ত গ্রাম জলমগ্ন, কোথাও একহাত একটু শুকনো জমি নাই। ঘরে ঘরে স্রোতহীন কর্দমাক্ত জলরাশি থমথম করিতেছে। কুবেরের শ্বশুরবাড়ির সকলে আশ্রয় লইয়াছে বড়ো ঘরের চালার তলে কাঠের ছোটো স্থায়ী মাচাটুকুতে।

দুটি গোরু ও বাছুরের জন্য তিনটি সুপারিগাছের মধ্যে মোটা বাঁশের ত্রিকোণ মাচা বাঁধা হইয়াছে, বাড়ির পোষা কুকুরটিও স্থান পাইয়াছে সেখানে। মালার বুড়া বাপ বৈকুণ্ঠ মাচায় বসিয়া ভীত গোরুদুটিকে খড় দিতেছিল, ঘরের চালে বসিয়া বঁড়শি দিয়া মাছ ধরিতেছিল মালার বড়ো ভাই অধর, আর ঘরের ভিতরকার মাচায় উঠিবার মই হইতে এদিকে রান্নাঘরের চাল পর্যন্ত পাশাপাশি দুটি বাঁশ বাঁধিয়া ইহারা যে সাঁকো তৈয়ারি করিয়াছে তার উপরে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল কয়েকটি উলঙ্গ ছেলেমেয়ে। কুবের আসিয়াছে শুনিয়া মালার ছোটো বোন কপিলা মই ধরিয়া নামিয়া আসিল। কুবেরের শাশুড়ি আর নামিল না, ঘরের মাচার উপর হইতেই কন্যা ও নাতিনাতনির কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বর্ষার দেবতাকে শাপান্ত করিতে করিতে বলিতে লাগিল যে এতখানি বয়স তাহার হইয়াছে, এমন প্রলয়ংকর কাণ্ড আর তো সে দ্যাখে নাই বাপের জন্মে ! কুবের কি জানে কী সর্বনাশ তাহাদের হইয়া গিয়াছে, বাঁধিয়া ছাঁদিয়া পাট পচাইতে দিয়াছিল, অর্ধেক পাট যে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে পাত্তা নাই। ভাসিয়া আর যাইবে কোথায়, কেউ চুরি করিয়াছে নিশ্চয়। হ্, গরিব গৃহস্থ তাহারা, কত আশায় এবার ধানের জমি ত পর্যন্ত পাটের চাষ দিয়াছিল, কে তাহাদের এমন সর্বনাশ করিয়াছে গো !

মাচা হইতে বৈকুণ্ঠ, চালা হইতে অধর, মই হইতে কপিলা আর সাঁকো হইতে উলঙ্গ ছেলেমেয়েগুলি নৌকায় আসিয়া আরাম করিয়া বসিল। কুবের তামাক সাজিয়া দিল বৈকুণ্ঠকে।

কপিলা বলিল, নাও নিয়া আইলা মাঝি, বইনেরে আনলা না ক্যান ? কতকাল দেখি নাই বইনেরে ! পোলাপানগো ত আইনবার পারতা ?

কুবের বলিল, আনুম ভাবছিলাম। তোমরা এহানে কিবা রইছ না জাইনা শ্যাযম্যাশ ডরাইলাম। আসনের লাইগা গোপি কাঁইন্দা সারা হইছিল। তুমি আইলা কবে, কপিলা ?

কপিলা মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, আমার কথা থোও।

সহজ স্বাভাবিক প্রশ্নে কপিলার বিরক্তি দেখিয়া কুবের একটু অবাক হইয়া বৈকুণ্ঠের দিকে চাহিল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ চোখ মটকাইয়া তাকে কী যেন একটা ইশারা করিল। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কুবের করিল কী, মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, অ !

কপিলা রূঢ়স্বরে বলিল, হাসলা যে মাঝি ?

কুবের বলিল, হাসি নাই কপিলা, হাসুম ক্যান ?

কুবেরের বিবাহের সময় বড়ো দুরন্ত ছিল কপিলা। তখন পঙ্গু মালাকে বিবাহ করিয়াছিল বলিয়াই হয়তো কপিলার দুরন্তপনা অত বেশি চোখে পড়িয়াছিল কুবেরের, অন্ধকারে যে বাস করে মৃদু আলোতে তার চোখ ঝলসাইয়া যায়, চোখ ঝলসানো আলোতে সে হয় অন্ধ। তারপর কপিলার বিবাহ হইয়াছে, একটি মেয়ে হইয়া আঁতুড়ে মরিয়া গিয়াছে বছর দুই আগে। কে জানে কত শান্তশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কপিলা আজকাল, কেমন সংসারী হইয়াছে তাহার মন ? আর কি কোনোদিন সে গাছের ডালে কাঁচা বেতের দোলনা বাঁধিয়া দোল খাইবে, কিশোর বয়সের অপূর্ব দেহটিকে ঘাটের উপর হইতে ছুঁড়িয়া দিবে পুকুরের জলে, ডিঙি লইয়া একা একা পালাইয়া গিয়া সকলকে দিবে বকুনি দেওয়ার শাস্তি ? রাগের মাথায় এ জীবনে আর কখনও হয়তো সে কুবেরকে চ্যালা কাঠ ছুঁড়িয়া মারিবে না। না মারুক ! একজন চ্যালা কাঠ ছুঁড়িয়া মারিবে না বলিয়া আপশোশ করার কী আছে ? খানিক পরে পাশাপাশি দুটি বাঁশের উপর দিয়া কপিলাকে ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া কুবেরের দুচোখ ঝাপসা হইয়া আসিল। হ, সেই পুরানো দিনের স্মৃতি গাঁথা হইয়া আছে কুবেরের মনে !

জল কমিয়া যাওয়া পর্যন্ত কেতুপুরে তাহার বাড়িতে গিয়া থাকিবার জন্য কুবের সকলকে নিমন্ত্রণ করিল। এ আহ্বান তুচ্ছ করিবার মতো নয়, কিন্তু সকলে গেলে কেমন করিয়া চলে ? বাড়িঘর জিনিসপত্র সব সাময়িকভাবে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিলে হইত, সে তো সম্ভব নয়। বোবা গোরুবাছুরগুলির কী হইবে ? যাইতে পারে ছেলেমেয়েগুলি—আর তাদের দেখাশোনা করিবার জন্য কপিলা যদি যায় তো যাক, মালা তো পারিবে না এতগুলি কাচ্চাবাচ্চাকে সামলাইতে।

কপিলা যাইবে ? বেশ।

কুবেরের শাশুড়ি বড়ো চেঁচায়। সে বলিল, তোমারে কমু কী কুবের, মাইয়ারে নিয়া জ্বইলা মরি—হ রে বাপ, কপিলার কথা কই—মালার লাইগা ভাবুম কেরে ? সোনার জামাই তুমি, খোঁড়া মাইয়ারে আমার মাথায় কইরা থুইছ—এই পোড়াকপাইল্যার কথা কই, কই আমাগো কপিলার কথা। অলক্ষ্মীর মরণ নাই !

সে বড়ো দুঃখের কাহিনি। সুখে ঘরকন্না করিতেছিল কপিলা, কী যে শনি ভর করিল তাহার কপালে, শীতের গোড়ায় স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া সে চলিয়া আসিল বাপের বাড়ি ! রাগ করিয়া তাহার স্বামী শ্যামাদাস আবার বিবাহ করিয়াছে, কপিলাকে নেয় না।

এ খবর কুবের জানিত না। সে সবিস্ময়ে বলিল, হ ?

তারপর কপিলাকে স্বামীর কাছে পাঠানো হইয়াছিল—ফাল্গুন মাসে। শ্যামাদাস তাহাকে বাড়িতে উঠিতে দেয় নাই, খেদাইয়া দিয়াছে। মানুষ তো সে নয়, পশু। তাই তো কুবেরের সঙ্গে তুলনা করিয়া কপিলার মা দিনরাত্রি তাহাকে গাল দেয়।

তাই বটে, পঙ্গু বলিয়া মালাকে সে কখনও অনাদর করে নাই সত্য। সেটা তবে এতখানি প্রশংসার ব্যাপার ? মালার জন্য, তাহার দারিদ্র্যপূর্ণ সংসারের ওই অলস অকর্মণ্য রমণীটির জন্য,

কুবের হঠাৎ নিবিড় স্নেহ অনুভব করে ; সৎ গৃহস্থ ও সৎ স্বামী বলিয়া যে প্রশংসা তাহার মালার জননী গলার জোরে দিগদিগন্তে বটনা করে তাহা যেন মালারই কীর্তি।

খাওয়া দাওয়ার পর কপিলা ও তাহার ভাইবোনদের সঙ্গে করিয়া কুবের কেতুপুরের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। কপিলা খুব সাজিয়াছে। চুলে চপচপে করিয়া দিয়াছে নারিকেল তেল, গায়ে হলুদ মাখিয়া করিয়াছে স্নান, পরিয়াছে তার বেগুনে রঙের শাড়িখানি। স্বামী ত্যাগ করিয়াছে বটে, বয়েস তো তার কাঁচা। আহা, কুটুমবাড়ি যাওয়ার নামে মেয়েটা আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিয়াছে।

কেতুপুরে পৌঁছিতে বেলা কাবার হইয়া আসিল। মালা উতলা হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিছু পাট চুরি-যাওয়া ছাড়া তাহার বাপ-ভাইয়ের আর কোনো ক্ষতি হয় নাই শুনিয়া সে আশ্বস্ত হইল। মালা শুধু খোঁড়া হইয়া জন্মে নাই আরও একটি পঙ্গুতা তাহার আছে ; সে হাসিতে জানে না, জীবন তাহাকে অলস করিয়া বিষণ্ণ করিয়াছে। ভাইবোনদের কাছে পাইয়া কতকাল পরে যে মুখে তাহার বিষণ্ণতার ছায়ালেশহীন হাসি ফুটিল?

এদিকে স্বস্তি রহিল না কুবেরের ! তার মতো গরিব কে আছে জগতে ? এই যে এতগুলি মানুষ আসিল বাড়িতে, ইহাদের সে খাওয়াইবে কী ? আউশের ফসল নষ্ট হওয়ায় এবার যে দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে এখন হইতে তাহা টের পাওয়া যায়, জলমগ্ন পৃথিবীতে আহার্যের মূল্য বাড়িয়াছে। ইলিশের মরশুম বলিয়া এখন যদি বা কোনোরকমে চলিয়া যায়, তারপর ? দু-চার পয়সা জমাইবার আশা ঘুচিয়া গেল। অতিথি আসিয়াছে, অতিথি চলিয়া যাইবে, তারপর সপরিবারে উপবাস করিবে সে। তখন হাত পাতিলে বৈকুণ্ঠ একটি পয়সাও তাহাকে দিবে না।

নিমন্ত্রণ করিয়া ওদের সে তবে আনিয়াছে কেন ? তার দুঃখের দিনে যারা ফিরিয়া তাকায় না, কেন সে তাদের অত খাতির করিতে গেল ? সে আদর করিয়া ডাকিয়া না আনিলেও বন্যার কটা দিন ওরা মাচার উপর বেশ কাটাইয়া দিতে পারিত। মনে মনে কুবের রাগিয়া যায়। মালা খুশি হইয়াছে। হাসি ফুটিয়াছে মালার মুখে ? স্বামীর দুঃখ না বুঝিয়া যে স্ত্রীলোক বাপ-ভাইয়ের জন্য কাঁদিয়া মরে, হাসিমুখে তাহার মুখে গুঁজিয়া দিতে হয় আখার তলের ছাই ! মালা অমন উতলা না হইলে কে যাইত চরডাঙ্গায় ? কে আনিত তাহার ভাইবোনদের ডাকিয়া ?

প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা কুবেরের মাছ ধরিতে যাওয়ার আগে, পিসি সকলকে ভাত বাড়িয়া দেয় : কুবের এইমাত্র খাইয়া উঠিয়াছে, তবু তাহার নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে আরও কয়েকটা প্রাণীকে সারি দিয়া বসিয়া খাইতে দেখিয়া ভবিষ্যতের অনিবার্য ক্ষুধায় তার ভরা পেটের অন্ন যেন মুহূর্তে হজম হইয়া যায়। মালা বসিয়া বসিয়া সকলের খাওয়ার তদ্বির করে, গোপির পাতের ডালমাখা ভাতটুকু সে আদর করিয়া তাহার ভাইয়ের পাতে তুলিয়া দেয়—এ দৃশ্য কুবের আর দেখিতে পারে না। নৌকায় গিয়া সে বসিয়া থাকে। হয়তো তখন গণেশ ও ধনঞ্জয় কেহই আসে নাই—কুবের চুপ করিয়া বসিয়া থাকে একা। নদীর ঢেউয়ে নৌকা দোল খায়। হু হু করিয়া বহে বাতাস, অন্ধকার এত গাঢ় যে মনে হয় ধোঁয়ার মতোই বুঝি বাতাসে উড়িয়া যাইবে।

কপিলা যে পিছু পিছু আসিয়াছে তা কি কুবের জানে ?

তাহার আকস্মিক হাসির শব্দে কুবের ভয়ে আধমরা হইয়া যায়। ঠকঠক করিয়া সে কাঁপিতে থাকে। নির্জন নদীতীরে সন্ধ্যারাত্রে কে হাসিল ? মানুষ নয়, নিশ্চয় নয় !

কপিলা বলে, তামুক ফেইলা আইছ মাঝি।

কুবের নামিয়া আসিয়া তামাকের দলাটা গ্রহণ করে।

বলে, খাটাশের মতো হাসিস ক্যান কপিলা, আঁই ?

কপিলা বলে, ডরাইছিলা, হ ? আরে পুরুষ !

তারপর বলে, আমারে নিবা মাঝি লগে ?

বলে আর কপিলা আবদার করিয়া কুবেরের হাত ধরিয়া টানাটানি করে, চিরদিনের শান্ত নিরীহ কুবেরকে কোথায় যেন সে লইয়া যাইবে। মালার বোন না কপিলা ? হ্। কুবের তাহার দুই কাঁধ শক্ত করিয়া ধরিয়া অবাধ্য বাঁশের কঞ্চির মতো তাহাকে পিছনে হেলাইয়া দেয়, বলে, বজ্জাতি করস যদি, নদীতে চুবানি দিমু কপিলা !

কপিলা ধপ করিয়া সেইখানে কাদার উপরে বসিয়া পড়ে, হাসিতে হাসিতে বলে, আরে পুরুষ !

তাহার নির্বিবাদে কাদায় বসা আর শয়তানি হাসি আর খোঁচা দেওয়া পরিহাস—সব বড়ো রহস্যময় ও দুর্বোধ্য। হঠাৎ কুবেরের বড়ো ভয় হয়। সে সস্নেহে বলে, পাঁক মাইখা মরস ক্যান কপিলা ? মাইন্ষে কইবো কী ? যা বাড়িত্ যা।

কে জানে কী আছে কপিলার মনে ? সে চলিয়া গেলে কুবেরের দুটি চোখের ঔৎসুক্য অন্ধকারে গোপন হইয়া থাকে। কপিলার আনিয়া দেওয়া তামাক সাজিয়া সে টানিতে আরম্ভ করে। তামাকের ভাগিদার না থাকার আরামটুকুই কী তাহার মানসিক চাঞ্চল্য ক্রমে ক্রমে শান্ত করিয়া আনে, অথবা সে নদীর বাতাস—নায়ের দোলনে পদ্মার প্রেম ? মালা যে কোনোদিন ওঠে নাই, হাঁটে নাই, ঘুরিয়া বেড়াইয়া চারিদিকে জীবনকে ছড়াইয়া মেলিয়া রাখিতে পারে নাই, তার জন্য কুবেরের কোনোদিন আপশোশ ছিল না। গতি নাই বলিয়া মালার আবদ্ধ ঘনীভূত জীবন তারই বুকে উথলিয়া উঠিয়াছে—ভাঙা চালার নীচে সংকীর্ণ শয্যায় পঙ্গু মালার তুলনা জগতে নাই। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে তামাক পৌঁছাইয়া দিতে সে তো কোনোদিন নদীতীরে ছুটিয়া আসিতে পারে না—বাঁশের কঞ্চির মতো অবাধ্য ভঙ্গিতে পারে না সোজা হইয়া দাঁড়াইতে !

বেগুনি রঙের শাড়িখানি পরিয়া চুলে চপচপে তেল দিয়া শুধু লীলাখেলা করিতেই কপিলা পটু নয়, কুবেরের সেবাও সে করে,—জীবনে কুবের কখনও যে সেবার পরিচয় পায় নাই। সারারাত্রি পদ্মার বুকে কাটাইয়া আসিয়া এখন সে না চাহিতে পা ধোয়ার জল পায়, পান্তাভাতের কাঁসিটির জন্য হাঁকাহাঁকি করিতে হয় না, খাইয়া উঠিবামাত্র তামাক আসে, প্রস্তুত থাকে তাহার দীন মলিন শয্যা এবং ফাঁক পাইলেই কোনোদিন গোঁফ ধরিয়া টান দিয়া, কোনোদিন একটা চিমটি কাটিয়া, হাসি চাপিয়া চোখের পলকে উধাও হইয়া—ঘুম আসিবার আগেই কপিলা তাহাকে স্বপ্নও আনিয়া দেয়।

পরের পেট ভরাইতে ফতুর হইতে বসিয়াও গৃহে তাই কুবেরের আকর্ষণ বাড়ে।

কমে মাঠঘাটের জল।

ও তো মানুষের চোখের জল নয়, কমিবে বইকী। একদিন মালার বড়ো ভাই অধর খবর লইতে আসে। কুবেরকে সে সত্যসত্যই কুবের ঠাওরাইয়া রাখিয়াছে কিনা সেই জানে, কর্জ চাহে দুটি টাকা। টাকা না পাইয়া তাহার রাগ হয়। সকলকে সে চরডাঙ্গায় ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চায়। কুবের বারণ করে না, মালাও নয়, ভাইবোনকে কাছে পাওয়ার আনন্দ পুরানো হইয়া আসিতে কতদিন আর লাগে বোনের ? তা ছাড়া কপিলার চাপল্য ও হাস্যপরিহাসের জন্য ঈর্ষাও হয়তো মালার হয়, কোনোদিন হয়তো কুবেরের সঙ্গে কপিলার অন্যায় মাখামাখি চোখেও পড়িয়াছে তাহার,—একস্থানে ঠায় বসিয়া থাকিলেও দৃষ্টি তো সে পাতিয়া রাখে সর্বত্র।

কিন্তু কপিলা যায় না। ঝগড়া করিয়া গাল দিয়া অধরকে সে ভাগাইয়া দেয়। কে জানে কী আছে কপিলার মনে !

ময়নাদ্বীপ হইতে রাসুর আকস্মিক আবির্ভাবের বিস্ময় গ্রামের লোকের কাছে পুরানো হইয়া গিয়াছে, রাসুর অভিজ্ঞতার গল্প শুনিবার কৌতূহল কাহারও নাই। রাসু বলিতে চায়, সবিস্তারে বারবার আগাগোড়া সমস্ত কাহিনিটা বলিবার জন্য সে ছটফট করে, কিন্তু শ্রোতা পায় না। কত শুনিবে লোকে ? শুনিয়া শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে সকলের।

হোসেন মিয়া কিছু টাকা দিয়াছে রাসুকে, রাসুর ইচ্ছা টাকাটা দিয়া সে একটি বউ খরিদ করে, গোপি হইলেই ভালো হয়। কিন্তু কুবের এ প্রস্তাব কানেও তোলে না। কত টাকা দিয়াছে হোসেন মিয়া তাহাকে ? হাজার না লাখ ? আর কী আছে রাসুর—ঘর দুয়ার, জীবিকার উপায় ? তা ছাড়া গোপির পাত্র একরকম ঠিক হইয়াই আছে—গণেশের শালা যুগল। যুগলেব মতো পাত্র থাকিতে যার তার হাতে কুবের মেয়ে দিবে কেন ?

গোপিকে কিন্তু বড়োই পছন্দ হইয়াছে রাসুর।

ময়নাদ্বীপের গল্প করিবার ছলে সে কুবেরের বাড়ি আসে, আড়চোখে আড়চোখে সারাক্ষণ সে গোপির দিকে তাকায়, পরির মতো সুন্দরী মনে হয় গোপিকে তাহার। ভাইকে কোলে কবিয়া বাঁকা হইয়া কী তাহাব দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা ! হ, বুখো বুখো লালচে বটে চুলগুলি গোপির, কপালটা একটু উঁচুই, থ্যাবড়ানো নাকের নীচে উত্তোলিত ওষ্ঠে ঠেকিয়া নোলকটা তাহার দুলিতে পায় না, আব হ, বড়ো নোংরা গোপি। তবু তো রাসু চোখ ফিবাইতে পাবে না ! তবু তো তার মনে পড়ে না এমন অতুলনীয় বৃপ সে কোথাও দেখিয়াছে ! কী রং গোপির ! কী মনোহব তাহাব চলাফেবা, কী চাউনি !

বয়স রাসুর বেশি হয় নাই, যুগলের চেয়েও তার বয়স কম। নূতন করিয়া সংসাব পাতিয়া জীবনটা আবার গুছাইয়া লইবাব সময তাহার পাব হইযা যায নাই। গোপিকে পাইলে আবাব সে আরম্ভ করিতে পারে,—বয়স্থা বাড়ন্ত মেয়ে গোপি, বিবাহের একবছবের মধ্যে ও স্বামীর ঘব কবিতে আসিবে, পাঁচ-ছ বছরের একটা মেয়েকে বিবাহ করিয়া তার বড়ো হইবার আশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিবার ধৈর্য রাসুর আব নাই। যাদের সে বিসর্জন দিযা আসিয়াছে মযনাদ্বীপে, তাড়াতাড়ি আবার তাদের ফিরিযা পাওয়া চাই। একা একা বড়ো কষ্ট হইতেছে বাসুর। পীতম মাঝিব সঙ্গে রাসুব কলহ হইয়া গিয়াছে। হোসেন মিয়ার দেওয়া টাকাটা বাগাইযা লওয়ার জন্য পীতম মাঝি বড়োই ব্যস্ত হইয়া উঠিযাছিল। রাসু তাই পৃথক হইয়া গিয়াছে। কে জানিত গ্রামেব মধ্যে পীতমের মেযে যুগীই সর্বস্বান্ত পিসতুতো ভাইটিকে এতখানি খাতিব করিবে। শীতলকে দিযা বাবুদের বলিয়া নিজেব ঘবেব কাছে খানিকটা জমি যুগীই বাসুকে জোগাড় করিয়া দিয়াছে—রাসু একখানা ঘর তুলিযাছে সেখানে।

সেই ঘবে রাসু বাস করে একা, হয়তো ধ্যান কবে গোপির ! বিকালে কেতুপুর গ্রামেব মধ্যে সওদা আনিতে যাওয়ার সময় পথেব নির্জনতম অংশে কোনোদিন গোপি বাসুকে দাঁড়াইযা থাকিতে দেখিতে পায়।

রাসু বলে, কই যাও গোপি ? সে একটু স্নেহ-ব্যঞ্জক হাসি হাসে। গাঁট হইতে বাহির করে একটি কাচ বসানো পিতলের আংটি আব পুঁতির মালা, বলে নিবা ?

গোপি খুশি হইয়া উপহাব গ্রহণ কবে। রাসুকে ভালোই লাগে তাহাব, রাসুর জন্য সে একটু দুঃখ বোধ কবে। কোথায় সেই ময়নাদ্বীপ কে জানে, সকলকে বাসু সেখানে হাবাইয়া আসিয়াছে, বড়ো কষ্ট পাইয়াছে সে জীবনে। তা ছাড়া রাসুর কথাগুলি ভারী মিষ্টি, শুনিতে বড়ো ভালো লাগে গোপিব। আর কী খাতিরটা রাসু তাহাকে করে। কত যেন সে বড়ো হইয়াছে, এগারো বছবের মেয়ে সে নয়।

যুগীর সঙ্গে মাঝে মাঝে রাসু পরামর্শ করে, একটা কী উপায় ঠাওরানো যায় না কুবেবকে যাহাতে রাজি করানো যায় ? পরামর্শ অনেক হয় উপায় হয় না। শীতলের অনুপস্থিতিতে তাহার পরিষ্কার শয্যায় আরাম করিয়া বসিয়া তাহার হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে পরামর্শ করিতে পারাটুকুই লাভ হয় রাসুর। আর যুগীর সমবেদনা। রাসুকে যুগী খুব খাতির-যত্ন করে, রাসুর মুখে ময়নাদ্বীপের কাহিনি বারবার শুনিয়াও সে শ্রান্ত হয় না। কত বাসিন্দা ময়নাদ্বীপে ? কী কী ফসল হয় ? দ্বীপের চারিদিকে বুঝি সমুদ্র ? আচ্ছা, সমুদ্র কত বড়ো—পদ্মার চেয়েও বড়ো বুঝি ? আজও যুগী রাসুকে এই সব প্রশ্ন করিতে ভালোবাসে। যুগীর বয়স বেশি নয়, বছর বাইশ,—বড়ো শান্ত

তাহাব স্বভাব, বড়ো সরল তাহার মন। শীতল তাহাকে সুখে রাখিয়াছে, আড়াল করিয়া রাখিয়াছে জেলেপাড়ার দারিদ্র্য ও হীনতা হইতে। যুগীর মনে অপরিমিত সন্তোষ। এত দয়ামায়া, এমন কোমলতা জেলেপাড়ার আর কোনো মেয়ের নাই। জেলেপাড়ার কারও ঘরে কোনোদিন যদি অন্ন না থাকে, চুপি চুপি একবার যুগীর কাছে আসিতে পারিলে আর তাহার উপবাসের ভয় থাকে না—দুঃখের কাহিনি যে যত জমজমাট করিয়া বলিতে পারে ছলছল চোখে যুগী তাহাকে চাল দেয় তত বেশি—খরচের পয়সা দান করিয়া শীতলের বকুনি শোনে। শীতল লোকটা বড়ো কৃপণ, যুগীর দান করা স্বভাবটা সে পছন্দ করে না, কিন্তু এমন আশ্চর্য মন মানুষের, যুগীর এই মন্দ স্বভাবের জন্যই তাহাকে শীতল ভালোবাসে বেশি। যুগীকে সে কৃপণ হইতে বলে কিন্তু সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিলে যুগী যেদিন ভয়ে ভয়ে তাহাকে শোনায় না যে একজন আসিয়া তাহার ঘাড় ভাঙিয়া যা পারিয়াছে আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেদিন মনটা যেন খুঁতখুঁত করে শীতলের।

মাছের মূল্য বাবদ কুবের কয়েক আনা পয়সা পাইত। শীতল কখনও ঋণ পরিশোধ করে না। তাগিদ করিয়া করিয়া কুবের হয়রান হইয়া গিয়াছে। তবু, একদিন সকালে আবার সে আশা করিয়া আসিল।

যুগী রাঁধিতেছিল, শীতল আর রাসু করিতেছিল গল্প। কুবেবকে দেখিয়া রাসু চঞ্চল হইয়া উঠিল, বসিতে দিয়া খাতিব করিয়া কলিকাটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, তামুক খাও।

না, কুবেরের বসিবার সময নাই, তামাক খাওয়ার সময় নাই ! শীতল তাড়াতাড়ি পয়সাটা দিযা দিক, সে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবে—বসিযা তামাক টানিতে আসিয়াছে নাকি সে ? হ, কুবের আজ রাগিয়াছে। আজ সে মাছের দাম আদায় করিয়া ছাড়িবে। শীতল প্রথমে অমায়িক হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে, এত রাগ কেন কুবেরের, এই সকাল বেলা ? তারপব সেও রাগিযা যায়, বলে যা যা দিমু না পয়সা, কর গিযা নালিশ !

রাসু বুঝি কুবেরকে খুশি করিতে চায়, সে বলিল, দ্যান শেতলবাবু, দিয়া দ্যান পয়সা।

পয়সা দিল যুগী। কলহের মাঝখানে দশ আনা পয়সা আনিযা কুবেবের সামনে রাখিয়া দিল, শীতলকে ধমক দিয়া বলিল, সামান্য ক আনা পয়সাব জন্য এত কাণ্ড করা কী জন্য ? কত কর্তৃত্ব যুগীর ! শীতল কথাটি বলিল না, কুবেরের দিকে কড়া চোখে চাহিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল।

পয়সা কুড়াইয়া কুবের উঠিল, সঙ্গে উঠিল রাসু। কী বিনয় রাসুর, কী সব তোষামোদে কথা ! পথ চলিতে চলিতে রাসু নানা কথা বলে। এবার সে একটা ব্যাবসা আরম্ভ করিবে—ব্যাবসা ছাড়া পয়সা নাই মানুষের, একটা সে দোকান দিবে দেবীগঞ্জে। কীসের দোকান এখনও সে তা ঠিক করে নাই, ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা কিছু ঠিক কবিয়া লইবে—কুবের কী পরামর্শ দেয় ? জীবনে উন্নতি করিবে রাসু, প্রাণপণ করিয়া লাগিলে কী না হয় জগতে ? তা ছাড়া পুরুষেব ভাগ্যের কথা কে জানে ! আজ ফকির—কাল বাজা ! কুবের গম্ভীর মুখে সায় দিয়া বলে, হ। ভাবে, ময়নাদ্বীপে গিয়া বড়ো বড়ো কথা বলিতে শিখিয়া আসিয়াছে রাসু, চাল দিতে শিখিয়াছে।

মাঠের দিকে চাহিলে বোঝা যায় জল কোথায় নামিয়া গিয়াছে, ধানের ফসল কাত হইয়া পড়িয়া আছে। পদ্মা হইতে আজ জোর বাতাস বহিতেছিল, চারিদিকে অসংখ্য পাখির কলরব, শিশিরভেজা ডাঙায় ছড়াইয়া আছে সোনার রোদ। শরৎকাল আসিয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। নদীতীরে কাশের বন এবার সাদা হইয়া উঠিবে। কুবেরের সঙ্গে রাসু তাহার বাড়ি পর্যন্ত আগাইয়া যায়। না, গোপি এখন বাড়ি নাই। কপিলার সঙ্গে সে জল আনিতে গিয়াছে নদীতে। কুবের রাসুকে বসিতে বলে না, পিসির নিরিবিলি ঘরখানায় গিয়া ঢোকে ঘুমের জন্য, রাসু আস্তে আস্তে ফিরিয়া যায়। যায় সে নদীর ধারে, গাল সে খায় কপিলার, তারপর হনহন করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করে কেতুপুর গ্রামের দিকে। না, নদীর ধারে ও ভাবে দাঁড়ানো উচিত হয় নাই। কপিলা যদি বলিয়া দেয় কুবেরকে ?

পাঁচ

ভাদ্রের পরে আশ্বিন। আশ্বিনের মাঝামাঝি পূজা।

একদিন প্রবল ঝড় হইয়া গেল। কালবৈশাখী কোথায় লাগে। সারাদিন টিপি টিপি বৃষ্টি হইল, সন্ধ্যায় আকাশ ভরিয়া আসিল নিবিড় কালো মেঘ, মাঝরাত্রে শুরু হইল ঝড়। কী সে বেগ বাতাসের আর কী গর্জন ! বড়ো বড়ো গাছ মড়মড় শব্দে মটকাইয়া গেল, জেলেপাড়ার অর্ধেক কুটিরের চালা খসিয়া আসিল, সমুদ্রের মতো বিপুল ঢেউ তুলিয়া পদ্মা আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল তীরে। জেলেপাড়ার বৃদ্ধ ও রমণীরা হাহাকার করিয়া রাত কাটাইল, ছেলেমেয়েরা কেহ ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিল, কেহ গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ইলিশের মরশুম শেষ হইলে মোটা উপার্জনের সুযোগ দুদিন পরে ফুরাইয়া যাইবে, জেলেপাড়ার কোনো ঘরে আজ বুঝি সমর্থ দেহ পুরুষ নাই, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছে দূর দূরান্তরে। কে ফিরিবে প্রভাতে, কে ফিরিবে না ? ঝড় শুরু হইলে ঘরে ঘরে মেয়েরা উঠানে পিঁড়ি পাতিয়া দিয়াছে—ঝড়ের দেবতা বসিবেন, শান্ত হইবেন। ঘরে ঘরে মেয়েরা কপাল কুটিয়া মধুসূদনকে ডাকিয়াছে। এ কী রোষ দেবতার ? কেন এ প্রলয় ?

সকালে ঝড় কমিল কিন্তু একেবারে থামিল না। সাঁ সাঁ শব্দে বাতাস বহিতে লাগিল, বৃষ্টি পড়িতে লাগিল গুঁড়িগুঁড়ি। জেলেপাড়ার দিকে তাকানো যায় না, ঘন-সন্নিবিষ্ট কুটিরগুলিকে কে যেন আবর্জনার মতো নাড়িয়া চাড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছে। কোনো ঘর কাত হইয়া পড়িয়াছে, কোনো ঘরের চালা নাই, কোনো চালার অর্ধেক খড় উড়িয়া গিয়া বাঁশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, উঠান ভরিয়া পথ জুড়িয়া জমিয়াছে গাছের ডালপালা। কুবেরের শোবার ঘরখানা পড়িয়া গিয়াছে, গোপি খুব আঘাত পাইয়াছে, কে জানে ডান পা-টি তাহার ভাঙিয়া গিয়াছে কিনা। চালা উড়িয়া দূরে গিয়া পড়িয়াছে পীতমের গোয়ালঘরের, হীরু আর সিধুর একখানা ঘরও দাঁড়াইয়া নাই, অনুকূলের তিনখানা ঘরের একটার চালা নাই, বাকি দুখানার চালায় নাই খড়। রাসুর ঘরখানা ছিল একেবারে ফাঁকায়, ভিটা আর দুটি খুঁটি ছাড়া ঘরের চিহ্নটুকুও দেখিতে পাওয়া যায় না। শীতলের বাড়ির চারিদিকে বড়ো বড়ো গাছ, তার একটা গাছ পড়িলে বাড়ি তাহার পিষিয়া যাইত, কিন্তু গাছের আশ্রয়েই ঘরগুলি তাহার বাঁচিয়া গিয়াছে। জেলেপাড়ার আরও অনেকেরই ক্ষতি হইয়াছে অল্পবিস্তর। মুসলমান মাঝিদের মধ্যে ক্ষতি হইয়াছে আমিনুদ্দির বেশি। প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরে আমের গাছ গোড়াসুদ্ধ উপড়াইয়া যে ঘরে আমিনুদ্দির বউ আর ছেলেমেয়ে তিনটি ছিল সেই ঘরখানাকে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছে। আমিনুদ্দির বউ থেঁতলাইয়া মরিয়াছিল সঙ্গে সঙ্গে, সকালে টানিয়া বাহির করার সময় ছেলেটার প্রাণ ছিল, ঘণ্টাখানেক পরে সেও শেষ হইয়া গিয়াছে। শুধু মেয়েটার কিছু হয় নাই। আমিনুদ্দি কোথায় আছে কে জানে, হয়তো ডাঙায় নয় তো পদ্মার উত্তাল জল-তলে, অতবড়ো মেয়েটা তাহার কারও সান্ত্বনা মানিতেছে না, হাউহাউ করিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে। যে মেয়ের পর্দা রাখিবার জন্য গরিব আমিনুদ্দি কুটির ঘেরিয়া উঁচু বেড়া দিয়াছিল আজ যার খুশি তাকে দেখিয়া যাও। কালো চোখে কাল সে যে কাজল দিয়াছিল এখনও তা ধুইয়া যায় নাই—বেড়ার ফাঁকে ওর কাজল চোখের সলাজ চাহনি দেখিয়া কাল অপরাহ্ণে জহরের জোয়ান ছেলে নাসির বুঝি খুশি হইয়া পদ্মায় নৌকা ভাসাইয়াছিল, পদ্মা হয়তো তাকে এতক্ষণ ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে পৃথিবীর বুক হইতে।

ভীত বিবর্ণ মুখে কাঁপিতে কাঁপিতে জেলেপাড়ার নবনারী পদ্মাতীরে গিয়া দাঁড়ায়, আরক্ত চোখে চাহিয়া থাকে উন্মত্ত জলরাশির দিকে। ঘাটে তিনটি নৌকা বাঁধা ছিল, একটি অদৃশ্য হইয়াছে, দুটি উঠিয়া আসিয়াছে ডাঙায়। খানিক দূরে গাছপালা সমেত খানিকটা ডাঙা ধসিয়া গিয়াছে, আরও খানিকটা অংশ ফাটল ধরিয়া আছে, শীঘ্রই ধসিবে।

পদ্মাতীরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কোনো লাভ নাই, চাহিয়া চাহিয়া চোখ ফাটিয়া গেলেও কাল যারা নদীতে পাড়ি দিয়াছিল তাদের দেখিতে পাওয়া যাইবে না। যে নদীতে ডুবিয়াছে সে তো গিয়াছেই, ডাঙায় যারা আশ্রয় পাইয়াছে পদ্মা শান্ত না হইলে তাদেরও ফিরিয়া আসা সম্ভব নয়।

ডাঙা পথে আসিতে পারে।

কিন্তু এখনও মাঠে ঘাটে জল একেবারে সরিয়া যায় নাই, কে কোথায় ডাঙা পাইয়াছে কে জানে, হয়তো সেখান হইতে ডাঙায় পায়ে হাঁটিয়া আসিবার সুবিধা নাই। গৃহের জন্য মন হয়তো তাহাদের উতলা হইয়াছে, ভোরের আলো ফুটিলে এই উন্মাদিনী নদীব তীর ঘেঁষিয়া নৌকা বাহিয়া হয়তো তাহারা গ্রামে ফিরিবার চেষ্টা করিবে।

বেলা বাড়িয়া উঠিলে ধীরে ধীরে বাতাস পড়িয়া গেল। পদ্মা শান্ত হইয়া আসিল। অপবাহ্নে একটি দুটি করিয়া জেলেপাড়ার নৌকাগুলি ফিরিয়া আসিতে লাগিল। প্রথমে যারা আসিয়া পড়িল, সকলে তাদের ঘিরিয়া জুড়িয়া দিল কলরব।—বাকি সব ? অন্য সকলেব খবর কী ? সকলের খবব তাহারা দিতে পারিল না, কে কোথায় তীরে ভিড়িয়াছে কে জানে, দু-চারজনের খবর মাত্র তাহারা বলিতে পারিল। যাদের সংবাদ জানা গেল তাদের উদ্‌বিগ্ন আত্মীয়স্বজনের মুখ হইতে একটা কালো পর্দা যেন সরিয়া গেল। খবর যাদের মিলিল না তাদের আপনজনেরা আবার নীববে পদ্মার সীমাহীন বুকে দৃষ্টি পাতিয়া রাখিল। তবে প্রত্যেকটি নৌকাই এই একটি আশার বাবতা বহিয়া আনিতে লাগিল যে কারও প্রাণহানি হইয়াছে এ সংবাদ তাহারা শুনিয়া আসে নাই। বুক বাঁধিয়া সকলেই প্রতীক্ষা করিতে পারে, হয়তো ব্যর্থ হইবে না।

আমিনুদ্দি ও নাসির একসঙ্গেই ফিবিয়া আসিল। আমিনুদ্দির জন্য কেহ ঘাটে আসে নাই। জহব আসিয়াছিল, নাসিবকে দেখিয়া সে শুধু বলিল, বাপজান, ফিরা্যা আলি বে ?—বলিয়া আমিনুদ্দির দিকে চাহিযা একেবারে চুপ করিয়া গেল। কারও মুখে কথা নাই। আমিনুদ্দিকে দেখিয়া সকলে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

আমিনুদ্দি এদিক ওদিক চাহিল, তারপব ভীত উৎসুক কণ্ঠে জহরকে জিজ্ঞাসা কবিল, খপর কও মিয়াবাই, ভালা নি আছে বেবাকে ? চুপ মাইরা রইলা কেরে, আঁই ?

কারও কিছু বলিবাব ছিল না। হাত ধরিয়া জহর তাহাকে ধীবে ধীরে গ্রামের দিকে টানিয়া লইযা গেল।

তাবপর আসিল কুবের ও গণেশ। আসিল তাহাবা অনুকূলের নৌকায়, ধনঞ্জয়েব নৌকাটি ডুবিয়া গিয়াছে। বোকা গণেশের একটা পা মচকাইয়া গিয়াছিল, ঝড়ে নয়, পা পিছলাইয়া একটা সে আছাড় খাইয়াছিল ডাঙায়। উলুপী আজ সাবাদিন একরকম পদ্মাতীরেই কাটাইয়াছে, গণেশকে ধরিযা সেই বাড়ি লইয়া গেল। কুবেরেব জন্য কেহ আসে নাই। পরের মুখে সে তাহাব গৃহের বৃত্তান্ত শুনিল। বড়ো ঘরটা পড়িয়া গিয়াছে ? যে ঘর ছাইবার জন্য হোসেন মিয়া শণ দিয়াছিল ? গোপিব পায়ে চোট লাগিয়াছে ? বিবর্ণ মুখে কুবের বাড়ির দিকে পা বাড়াইল। ঘর দুয়ার অনেকেরই পড়িয়াছে, সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে আমিনুদ্দির, কিন্তু তাহার নিজের ঘরখানা পড়িয়া যাওয়ার চেয়ে বড়ো দুঃসংবাদ কুবেরের কাছে আর কিছুই নয়। কবে আবার সে ঘর তুলিতে পারিবে কে জানে। মাথা গুঁজিবে কোথায় ?

পথে দেখা হইল কপিলার সঙ্গে। কুবেরকে দেখিয়াই কপিলা উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল,—বড়ো উচ্ছ্বাস কপিলার। বলিল, ফিরা আইছ মাঝি ! মুখ রাখছেন—ঠাহুর আমার মুখ রাখছেন,—আমি না মানত কইরা থুইছি পাঁচ পহার হরিলুট দিমু।

কুবের বিব্রত হইয়া বলিল, কাঁদ ক্যান ?

সঙ্গে চলিতে চলিতে কপিলা আত্মসংবরণ করিল।

পায় বিষম চোট পাইছে মাইয়া। শুনছ নি বিত্তান্ত ?

কুবের মাথা হেলাইয়া বলিল, হ। ফুইলা গেছে না ?

বিষম ফুলছে ! দিনডা ভইরা চিল্লাইয়া মরছে মাইয়া।

চারিদিকে ভাঙা গাছ, ভাঙা ঘর, পত্রপল্লবে আচ্ছাদিত পথ, কুবেরের চোখে জল আসে। ঘরের কাছে গিয়া সে দাঁড়াইল। ঘর কই কুবেরের ? ভাঙিয়া অঙ্গনে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। পিসির ঘরে সকলে আশ্রয় লইয়াছিল। ঘরে ঢুকিয়া কুবের ঢেঁকিটার উপর বসিয়া পড়িল। গোপি শুইয়া শুইয়া কাতরাইতেছে। পায়ে তাহার চুন হলুদ মাখানো হইয়াছে, হাঁটুর কাছে বেজায় ফুলিয়াছে। মালার চোখে ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি। গতরাত্রের প্রলয়ংকর কাণ্ড ভীরু পঙ্গু নারীটিকে আধমরা করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, এখনও সে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। কুবের আসিয়া পড়াতে সে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

পিসি ভাত রাঁধিয়া রাখিয়াছিল। ঝড়বাদল ভূমিকম্প কিছুই পিসির ভাত রাঁধা বন্ধ করিতে পারে না। খানিক পরে উঠিয়া কুবের ভাত খাইল। তারপর গোপির কাছে একটু বসিল। যন্ত্রণায় মেয়েটার মুখ নীল হইয়া গিয়াছে। কী করিবে কুবের, যন্ত্রণা লাঘবের কী মন্ত্র সে জানে গোপিকে যাতে এতটুকু আরাম দিতে পারে ? নীরবে চাহিয়া দেখা ছাড়া কোনো উপায় নাই। মালা ধীরে ধীরে বলিতে থাকে মড়মড় করিয়া ঘর ভাঙিয়া পড়ার সময় আতঙ্কে দিশেহারা হইয়া ছুটিয়া বাহিরে যাওয়ায় কী ভাবে গোপির উপর চালটা আসিয়া পড়িয়াছিল। ঘরে থাকিলে মেয়েটার কিছু হইত না। ঝড়ের সময় যে বাহিরে যাইতে নাই, ঘরের মধ্যে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ, সেটুকু বুদ্ধি তো মেয়ের নাই। শুনিতে শুনিতে কুবের ঢুলিতে থাকে।

হ, কুবেরের ঘুম পাইয়াছে। উন্মুক্ত নদীতীরে বসিয়া সে কাটাইয়াছে ঝড়ের রাত্রি, সকালে হাঁটিয়া আসিয়াছে দেবীগঞ্জে, দুটি মুড়ি শুধু সে খাইয়াছে, বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত দুর্ভাবনায় ঢিপঢিপ করিয়াছে বুকের মধ্যে। এখন পেট ভরিয়া খাইয়া উঠিয়া আর তাহার জাগিয়া থাকিবার ক্ষমতা নাই। মালার সব কথা তার কানে যায় না। গোপির মাথার কাছে সংকীর্ণ স্থানটুকুতে কোনোমতে কাত হইয়া সে একসময় ঘুমাইয়া পড়ে।

সন্ধ্যার আগে জেলেপাড়ার সকলেই ফিরিয়া আসিল। পদ্মার গ্রাসে কেহ যায় নাই। পীতম মাঝির নৌকাটি শুধু মাঝ-নদীতে ঝড়ের মুখে পড়িয়া ডুবিয়া গিয়াছে। নৌকায় ছিল পীতমের ছেলে মাখন, কুবেরের প্রতিবেশী সিধু আর তার ভাই মুবারি,—অর্ধমৃত অবস্থায় একটা চরে উঠিয়া রাত কাটাইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে, আর বলিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের বাহাদুরির কাহিনি, পাহাড়-সমান ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করিয়া কী ভাবে তাহারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাইয়াছিল।

কয়েকটা দিন বড়ো গোলমালের মধ্যে কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে ভাঙা ঘরগুলির সংস্কারের চেষ্টা চলিতে লাগিল। কেতুপুরের দু-চারখানা ঘরবাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল, একদিন মেজোকর্তা অনন্ত তালুকদারের সভাপতিত্বে গ্রামবাসীর এক সভা হইয়া গেল। ক্ষতিগ্রস্ত আর দুঃস্থদের জন্য চাঁদা তোলার ব্যবস্থা হইল। অনন্তবাবু নিজে দান করিলেন দশ টাকা, গ্রাম হইতে আরও পনেরো টাকা উঠিল। তার মধ্যে সাত টাকা দেওয়া হইল কেতুপুরের নন্দ ভট্টাচার্যকে, আহা, ব্রাহ্মণের দুখানা ঘর পড়িয়া গিয়াছে। জেলেপাড়ার জন্য দেওয়া হইল দশ টাকা, দু টাকা করিয়া পাঁচজনকে। বাকি টাকাটা বোধ হয় ফান্ডে জমা রহিল।

সুখের বিষয় দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর এই সময় হোসেন মিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া বেড়াইল, তারপর দাড়ি নাড়িয়া বলিল, না, টাকা কর্জ দিমু না, ছন দিমু, বাঁশ দিমু, নিজে খাড়াইয়া তোমাগো ঘর তুইল্যা দিমু,—শ্যাষে নিকাশ নিয়া খত লিখুম, একটা কইবা টিপ দিবা।

তাই সই।

পুরাতন জীর্ণ ঘরের বদলে যদি নূতন ঘর ওঠে, খত লিখিয়া দিতে আর আপত্তি কী ? ঘর যাহাদের পড়িয়া গিয়াছিল সকলে তাহারা খুশি হইয়া উঠিল। যাহাদের ঘর পড়ে নাই তাহাবা দুঃখিত হইয়া ভাবিল, ঘরদুয়ার তাহাদেরও পড়িয়া গেলে মন্দ হইত না !

সকলেই সাগ্রহে হোসেন মিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিল, করিল না শুধু আমিনুদ্দি। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, না মিয়া, ঘর দিয়া আমার কাম নাই।

আমগাছের তলে তাহার ঘরখানা যেমন নিষ্পেষিত হইয়া পড়িয়াছিল তেমনিভাবে পড়িয়া রহিল। সত্যিই তো, ঘর দিয়া আমিনুদ্দি কী করিবে ? কে আছে আমিনুদ্দির ? কাব জন্য আবার সে দুঃখের, দারিদ্র্যের নীড় বাঁধিবে ? জেলেপাড়ার সকলেই আবার পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়াছে, আমিনুদ্দি কোথাও যায় না, কার জন্য পদ্মার অতল জলে সে জীবিকার সন্ধান করিবে ? শুধু মেয়েটা আছে,—মমীন। কেন আছে কে জানে ! সারাদিন মমীন মৃদুস্বরে কাঁদে, আমিনুদ্দি চাহিয়াও দ্যাখে না, না ডাকে কাছে, না বলে মেয়ের সঙ্গে কথা।

ক্রমে ক্রমে সকলের নূতন খুঁটি, নূতন বেড়া ও নূতন চালার ঘরগুলি সমাপ্ত হইল। হোসেন মিয়া মজুরদের কী ইঙ্গিত দিয়াছিল সেই জানে, কুবেরের ঘরটা উঠিল সকলের আগে। ঘব দেখিতে আসিয়া হোসেন মিয়া গোপির জন্য বড়ো দরদ দেখাইল। বলিল, হাসপাতালে নিয়া যাও কুবের বাই, জবর চোট পাইছে মালুম হয়।

তারপর একখানা খত বাহির করিয়া বলিল, টিপ সই দেও কুবের-- একুশ টাহা দশ আনাব খত লিখিছি—বাদ দিছি দুই টাহা। টিপ সই দিয়া রাখ, যখন পারবা দিবা,—না দিলি মামলা কবুম না বাই !—হোসেন মিযা মৃদু মৃদু হাসিল, জান দিয়া তোমাগো দবদ কবি, খত কিসিব ? লিখা থুইলাম, হিসাব থাকবো—না-ত কিসির কাম খত দিয়া ?

কুবেব বলিল, পুরানো বাঁশ পুরানো বেড়া দিলি খরচা কম হইত মিয়া বাই।

ক্যান ? পুরান বাঁশ দিযা ক্যান ? খরচার লাইগা ভাইবো না, খরচা তো দিছি আমি ! না, দিই নাই ?

হ, মিয়াবাই দিছেন, আপনেই দিছেন।

টিপসই দিয়া কুবের হোসেনের মুখের দিকে চাহিল। বড়ো ভয করে কুবের হোসেন মিযাকে, বড়ো টান তাহার হোসেন মিয়ার দিকে। কী যাদুমন্ত্রে তাহাকে বশ কবিয়াছে লোকটা ?

গোপির পায়ের ব্যথাও কমে না, ফোলাও কমে না। মেয়েটাকে নিয়া মহা মুশকিলে পড়িয়াছে কুবের। মালার মতো গোপিও কি শেষ পর্যন্ত খোঁড়া হইয়া যাইবে ? কী ব্যবস্থা করা দরকার কুবেব বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হোসেন মিয়ার কথামতো সদরের হাসপাতালে লইয়া যাইবে নাকি ? সে তো কম হাঙ্গামার ব্যাপার নয় ! অতখানি পথ গোপিকে কেমন করিয়া লইয়া যাইবে ? ব্যথায় সে বিছানাতেই পাশ ফিরিতে পারে না, অত নাড়াচাড়া তাহার সহিবে কেন ? অথচ পায়ের যা অবস্থা গোপির, শীঘ্রই কোনো ব্যবস্থা না করিলে নয়।

ইতিমধ্যে পূজা আসিয়া পড়িল। চরডাঙ্গা হইতে একদিন আবার আবির্ভাব ঘটিল অধরেব। আবার সে রাগারাগি করিয়া সকলকে লইয়া যাইতে চাহিল। ছেলেমেয়েগুলি তার সঙ্গে ফিরিয়া গেল চরডাঙ্গায়, কপিলা গেল না। বলিল, কেন, ঘর পড়িয়া গিয়া ঢেঁকি ঘরটাতে যখন তাহারা সকলে একসঙ্গে মাথা গুঁজিয়া ছিল, অসুবিধার অন্ত ছিল না, তখন অধর আসিতে পারে নাই ? এখন নতুন ঘর উঠিয়াছে, থাকিবার কোনো অসুবিধা নাই, এখন সে যাইবে কেন এদের এই বিপদের মধ্যে ফেলিয়া ? কুবেরও ইহাতে সায় দিয়া বলিল, হ কেন যাইবে কপিলা তাদের এই বিপদের সময় ?

কপিলা সত্যই প্রাণ দিয়া সকলের সেবা করিতেছিল, বড়ো কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল কুবের তাহার কাছে। বড়ো ভালো মেয়ে কপিলা। কেন যে ওর বোকা স্বামীটা ওকে ত্যাগ করিয়াছে !

কেতুপুরে চারদিন পূজার ঢাক-ঢোল বাজিল,—উৎসব হইল। জেলেপাড়ার ছেলেবুড়া দুবেলা ঠাকুর দেখিল, কেহ কেহ তাড়ি গিলিয়া খুব মাতলামি করিল, শীতল একদিন একটা দেশি মদের বোতল সাবাড় করিয়া রাসুকে ধরিয়া আচ্ছা করিয়া পিটাইয়া দিল। রাসুর উপর তাহার এত রাগ কেন কে জানে !

লখার সঙ্গে কপিলা একদিন সন্ধ্যাব সময় ঠাকুর দেখিতে গিয়াছে, খানিক পরে কুবেরও গুটি গুটি গিয়া হাজির। গিয়া দ্যাখে শীতলেব সঙ্গে হাসিযা হাসিয়া কথা বলিতেছে কপিলা। বাবুদের কর্মচাবী শীতল, পূজাও বাবুদেরই,—ভাবখানা দ্যাখ শীতলের, সেই যেন সর্বেসর্বা এখানে ' ওর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া এত কথা কীসের কপিলাব ? তারপর শীতল প্রসাদ চাহিয়া আনিয়া কপিলার আঁচলে বাঁধিয়া দেয়, কপিলা একগাল হাসে। এত লোকের মধ্যে কপিলার এই নির্লজ্জ আচরণে রাগে কুবেরের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। সে ডাকিয়া বলে, লখ্যা ' ল বাড়িত্ যাই।

কপিলা বলে, মাঝি আইছ নাকি ? খাড়াও মাঝি, আমি যামু, মারে পেন্নাম কইবা লই।

কুবের বলে, লখ্যা, আইলি রে হারামজাদা পোলা ?

কপিল' পণাম শেষ কবিতে করিতে লখাকে সঙ্গে কবিয়া কুবেব জোরে জোবে হাঁটিতে আবস্ত করিল। একটু পথ গিয়াই গতি তাহার হইয়া আসিল মন্থর। না, কপিলার জন্য ফিরিয়া সে যাইবে না, তবে আস্তে আস্তে হাঁটিতে দোষ নাই। কপিলা আসিয়া সঙ্গ নেয তো নিক। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। কপিলাকে একা ফেলিয়া যাওয়া ঠিক কর্তব্য হইবে না। হয়তো শীতলকেই সে বাড়ি পৌছাইয়া দিতে বলিবে ! এতখানি অন্ধকাব রাস্তা শীতলের সঙ্গে হাঁটিয়া চলিবে কপিলা ? তাব চেয়ে বিড়ি কিনিবার ছলে এখানে কুবেরেব একটু দাঁড়ানোই ভালো।

বিড়ি কিনিতে কিনিতে কপিলা আসিয়া পড়িল। কুবেব কথাটি বলিল না। তিনজনে নীরবে চলিতে লাগিল বাড়ির দিকে। কপিলা আড়চোখে কুবেরের মুখের দিকে তাকায়, কিছু ঠাহর হয না অন্ধকারে। চলিতে চলিতে দেখা হয় রাসুর সঙ্গে, যুগীকে লইয়া সে ঠাকুর দেখিতে যাইতেছে।

কপিলা যুগীকে বলে, বইন, এক কাম করবা ? আমাগো লখা' লইয়া যাও।

কুবের আপত্তি কবিয়া বলে, ক্যান, ঠাকুর দ্যাখে নাই লখা ?

কপিলা বলিল, পোলাপান, সাধ নি মেটে দেইখা ? তোমাব লখা বুড়া তো হয় নাই মাঝি, এক নজর দেইখা ফাল দিয়া বাড়িত্ ফিবেবো ? যা রে লখা যুগী মাসির লগে,—দেইখো বইন, পোলাবে, পোলা বড়ো বজ্জাত।

মতলব কী কপিলার ? লখাকে সবাইয়া দিল কেন ? কিছুই যেন বুঝিতে পারা যায় না। কপিলা নীরবে পথ চলে, কুবের মনে মনে বাগিতে থাকে। শেষে একটা তেঁতুলগাছের তলে পথের যেখানে দুর্ভেদ্য অন্ধকার রচিত হইয়াছে সেখানে হঠাৎ কুবের শক্ত করিয়া কপিলার আঁচল চাপিয়া ধরে, বলে, শীতলের লগে অত কথা কীসের তর, আঁই ?

কপিলা বলে, কী কর মাঝি ? খুইলা পড়ব যে পরসাদ ? আঁচলটা কপিলা টানিয়া ছাড়াইতে চেষ্টা করে, মিনতি করিয়া বলে, পোলাপানের লাখান কইরো না মাঝি, ছাড়—রাস্তার মদ্যি ইডা কেমনতর কাণ্ড জুড়লা ?

বলিতে বলিতে আর কপিলা আঁচল টানাটানি করে না, কুবের তাহাকে জড়াইয়া ধরিলে শান্ত হইয়া থাকে, হঠাৎ বডো যেন করুণ কণ্ঠে বলে, মনডা ভাল না মাঝি, ছাড়বা না ? মনডা কাতর বড়ো।

কুবের তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করে, মন কাতর ক্যান রে কপিলা ?

কে জানিত কপিলা এমন উত্তর দিবে !

সোয়ামিরে মনে পড়ে মাঝি।

হ ? আগাগোড়া সব তাহা হইলে ফাঁকি কপিলার, সব ছল, এতক্ষণ রসিকতা করিতেছিল কুবেরের সঙ্গে ! ভালো, কুবেরও রসিকতা জানে।

কপিলার গালটা সে টিপিয়া দেয়, হিহি করিয়া হাসে : বলে, তাই ক কপিলা, তাই ক ! যে সোয়ামি দূর কইরা খেদাইয়া দিছে তার লাইগা মনডা পোড়ায় তর ! গেলেই পারস সোয়ামির ঘর ?

যামু।

বলিয়া কপিলা হনহন করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করে।

ছয়

সেদিন রাত্রে গোপির পায়ের যন্ত্রণা খুব বাড়িয়া গেল। তাহাকে নূতন ঘরে আনা হইয়াছিল, সারারাত সে ছটফট করিয়া গোঙাইয়া কাটাইয়া দিল। মালা জাগিয়া বসিয়া রহিল তাহার শিয়রে। কুবেরও অনেক রাত অবধি জাগিয়া রহিল। তারপর সে ঘুমাইয়া পড়িল বটে কিন্তু ভালো ঘুম হইল না। শেষ রাত্রে উঠিয়া বসিয়া সে ডাকিল, গোপির মা ?

জবাব দিল কপিলা।—গোপির মা ঘুমায়।

কুবের উঠিয়া আসিয়া বলিল, যা তুই ঘুমা গা কপিলা, আমি বইয়া থাকি।

কপিলা চাপা গলায় বলিল, আরে পুরুষ ! রাত ভইরা ঘুমাইয়া বিয়ানে কয় যা তুই ঘুমা গা কপিলা। কাউয়ায় ডাক পাড়ে শুনছ মাঝি ?

তাইতো বটে ! ফরসা হইয়া আসিয়াছে যে !

ঝাঁপ খুলিয়া কুবের বাহিরে গেল। গণেশের বাড়ি গিয়া ডাকাডাকি করিয়া তুলিল গণেশকে। যুগল কাল বোনের বাড়ি নেমন্তন্ন খাইতে আসিয়া রাত্রে এখানেই ঘুমাইয়াছিল, সেও উঠিয়া আসিল। কুবের বলিল, গণেশ, মাইয়ারে তো হাসপাতালে নেওন লাগে, বড়ো কাতর মাইয়া, রাইত ভইরা চেঁচাইয়া মরছে।

গণেশ বলিল, হ ?—র কুবির, তামুক খা। হাসপাতালে নেওন ত সহজ কথা না ! কিবা নিবি ভাবছস নি ?

নাও নিয়া যামু, আবার কিবা ?

সমস্যার সমাধানে গণেশ খুশি হইয়া বলিল, তবে চিন্তা নাই, যুগইলার নাওখান মিলব আইজ, নাও নিয়া আইছে যুগইলা।—নাওখানি দিবি না যুগইলা তর ?

যুগল সাগ্রহে নৌকা দিতে সম্মত হইল। বলিল, সেও সঙ্গে যাইবে। খুব বুঝি ফুলিয়াছে গোপির পা-টা ? কোথায় চোট লাগিয়াছে ? আগে কেন মেয়েকে হাসপাতালে নেয় নাই কুবের—আগেই লইয়া যাওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, আজ যদি হাসপাতালে লইতেই হয়, দেরি করিয়া লাভ কী ? বেলা হইয়া গেলে হাসপাতালে ডাক্তারকে পাওয়া যাইবে না।

একটা চওড়া কাঠের তক্তায় শোয়াইয়া ধরাধরি করিয়া গোপিকে নদীতীরে লইয়া যাওয়া হইল। কাঁথা বালিশ হাতে করিয়া কপিলা গেল সঙ্গে। ইতিমধ্যে জেলেপাড়ায় খবর রটিয়া গিয়াছিল। গ্রামের একটি মেয়েকে হাসপাতালে নেওয়া প্রতিমা বিসর্জনের চেয়ে কম গুরুতর ব্যাপার নয় জেলেপাড়াবাসীদের কাছে—এই ভোরে নদীতীরে একটি ছোটোখাটো ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে কুবের একেবারে হয়রান!

কপিলা আগে নৌকায় উঠিয়া কাঁথাপত্র বিছাইয়া দিল, তারপর গোপিকে তুলিয়া শোয়ানো হইল। যন্ত্রণায় ও ভয়ে গোপির মুখখানা ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। হাসপাতাল ? না জানি কী ভয়ংকর সেই স্থান ! কে জানে সেখানে কী হইবে তাহার ! কপিলার একটা হাত গোপি সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল।

নৌকা খোলা হইবে এমন সময় দেখা গেল রাসু ছুটিয়া আসিতেছে। নদীতীরে পৌঁছিয়া সে লাফাইয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িল।

কুবের জিজ্ঞাসা করিল, কী রে রাসু ?

রাসু হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, আমিও যামু।

চলুক ! এতবড়ো নৌকা, স্থানাভাব হইবে না। বেশি লোক সঙ্গে থাকিলে গোপিকে উঠানো নামানোর বরং সুবিধাই হইবে।

মহকুমা শহর আমিনবাড়ি, সেইখানে সরকারি হাসপাতাল। কেতুপুর হইতে আমিনবাড়ি বেশি দূর নয়, ঘণ্টা তিনেক লাগিল পৌঁছিতে। রাসুর সাধ ছিল গোপিকে ঘাট হইতে হাসপাতাল পর্যন্ত লইয়া যাইতে সেও কাঁধ দিবে কিন্তু তার প্রয়োজন হইল না। স[illegible] নৌকায় বসিয়া থাকিতে বলিয়া যুগল নামিয়া গেল, খানিক পরে কোথা হইতে খুঁজিয়া পাতিয়া [illegible]য়া আসিল একটা পালকি। যুগল কি কম পাকা লোক। পালকি চাপিয়া গোপি হাসপাতালে গেল।

হাসপাতালে তখন রোগীর ভিড় জমিয়াছে। একটা ছোটো ছেলের ফোঁড়া অপারেশন করা হইতেছিল, [illegible] তাহার তীব্র চিৎকার। গোপি তো দেখিয়া শুনিয়া বিবর্ণ হইয়া গোঙাইতে আরম্ভ করিল। কুবেরের মুখখানাও শুকাইয়া পাংশু হইয়া গিয়াছে। সকলেই অল্পবিস্তর ভীত ও সন্ত্রস্ত। শুধু অবিচলিত আছে রাসু। ময়নাদ্বীপ হইতে পলাইয়া আসিয়া নোয়াখালির হাসপাতালে সে পনেরোটা দিন কাটাইয়া দিয়াছিল, এ তাহার পরিচিত স্থান। সকলকে সে অভয় দিয়া বলিতে লাগিল, ভয় নাই, ভয় নাই, সব ঠিক হইয়া যাইবে।

সেই গিয়া ডাক্তারকে গোপির অবস্থা বলিয়া নামধাম লিখাইয়া আসিল। কী গর্ব রাসুর ! দেখুক কুবের, কেমন চটপটে পাকা লোক সে ! দেখিয়া রাখুক !

বেলা প্রায় এগারোটার সময় অবসর করিয়া ডাক্তারবাবু গোপির পা পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা করিয়া রাগের সীমা রহিল না ডাক্তারের: রাসুই কিনা [illegible] ঠুকিয়া কথা বলিতেছিল, তাহাকেই গোপির অভিভাবক ঠাওরাইয়া ধমক দিয়া ডাক্তার আর কি[illegible] রাখিলেন না। এতকাল কী করিতেছিল তাহারা, বসিয়া বসিয়া ঘাস কাটিতেছিল ? আগে আনিতে পারে নাই গোপিকে ? পা যদি এবার কাটিয়া বাদ দিতে হয় ?

অপারেশন টেবিলে শুইয়া গোপি কপিলার হাত শক্ত করিয়া ধরিয়াছিল, গোঙাইয়া গোঙাইয়া সে তো কাঁদিতে থাকেই কপিলাও মৃদু সুর তোলে কান্নার—তারপর ডাক্তারের ধমকে আচমকা স্তব্ধ হইয়া যায়। পরীক্ষা শেষ করিয়া ডাক্তার বড়ো ভয়ানক কথা বলিলেন। এখানে রাখিয়া যাইতে হইবে গোপিকে। তবে এ কথাও তিনি বলিলেন যে, রাখা না-রাখা গোপির বাপের খুশি, জোর জবরদস্তি নাই।

হাসপাতালের বারান্দায় পরামর্শ সভা বসিল। ডাক্তারের ধমকে রাসু বড়ো দমিয়া গিয়াছিল, সে আর কথা বলিল না—হয়তো এতক্ষণে গোপির অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া মনটাও তার খারাপ হইয়া গিয়া থাকিতে পারে। ঘরের মধ্যে গোপি কাঁদিতে লাগিল—আগো মাসি আমি থাকুম না, আমারে নিয়া যাও—আর বাহিরে কুবের গণেশ আর যুগল গম্ভীর মুখে বলাবলি করিতে লাগিল যে এবার কী করা কর্তব্য। পরামর্শ করা একান্ত মিছে, ডাক্তার যে কথা বলিয়াছে তারপর গোপিকে না রাখিলে চলিবে না এখানে, তবু তারা অজ্ঞ ও ভীরু গ্রামবাসী কিনা, দীর্ঘ পরামর্শ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তই তারা করিতে পারে না।

গোপিকে মেয়ে ওয়ার্ডে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। তারপর আর তাহাদের গোপির কাছে থাকিবার উপায় রহিল না। আবার সেই চারটার সময় আসিয়া মেয়েটার সঙ্গে তাহারা দেখা করিতে পারিবে।

গোপি কপিলাকে কিছুতে ছাড়িবে না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে বলিতে লাগিল, আগো মাসি নিয়া যাও, কই থুইয়া যাও আমারে ?

হাঁটিতে হাঁটিতে তাহারা ফিরিয়া গেল নদীর ঘাটে। পথে কিনিয়া লইল কিছু চিড়ামুড়ি। এত বেলা অবধি কেহ তাহারা কিছু খায় নাই।

নীরবে সকলে জলযোগ শেষ করিল। এবার ? কী করিবে তাহারা এবার ?

যুগলের থাকিবার উপায় নাই। নৌকা তাহার ভাড়া হইয়া আছে, সকালবেলাই তাহার দেবীগঞ্জে যাওয়ার কথা ছিল। কুবের এখন গ্রামে ফিরিবে তো ? গ্রামের ঘাটে সকলকে নামাইয়া দিয়া যুগল সোজা চলিয়া যাইবে দেবীগঞ্জে।

কুবের বলিল, তোমরা যাও, বৈকালে মাইয়াটারে একবার না দেইখা আমি যামু না।

রাসু বলিল, আমিও থাকি, আঁই ?

কুবের বলিল, না রাসু, যা গিয়া তুই। কই থাকুম কী বিত্তান্ত ঠিক নাই, তুই থাইকা করবি কী ?

গণেশ থাকিতে চাহিল, কুবের তাকেও বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিল। কপিলা অবশ্যই ফিরিয়া যাইবে তাই তার থাকা না থাকার কথাই উঠিল না, কপিলাও কিছু বলিল না। কিন্তু কপিলাই শেষ পর্যন্ত নৌকায় উঠিল না। সেও বিকাল পর্যন্ত এখানে থাকিবে, গোপিকে আর একবার না দেখিয়া গ্রামে কি সে ফিরিতে পারে ? আহা, মাসি মাসি বলিয়া মেয়েটা হয়তো কাঁদিয়া মরিতেছে। কেহ তাহাকে টলাইতে পারিল না। কুবের কত বলিল, নিজে সে কোথায় থাকিবে ঠিক নাই, মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকিলে কত হাঙ্গামা কত অসুবিধা—তা ছাড়া লোকে বলিবে কী ? কপিলা কোনো কথাই কানে তুলিল না।

নৌকা চলিয়া গেল।

কুবের মুখ ফিরাইয়া দেখিল, নদীর বাতাস কপিলাকে স্পষ্ট করিয়াছে, শাড়িখানি মিশিয়া গিয়াছে অঙ্গে। বেগুনি রঙের শাড়িখানি পরিয়াই সে যে আজও পথে বাহির হইয়াছে, এতক্ষণ কুবের তো তাহা লক্ষ করে নাই ! এতক্ষণে খেয়াল করিয়া সে যেন কেমন অসন্তোষ বোধ করিল। কপিলাকে লইয়া এখন সে কী করিবে, যাইবে কোথায় ? কী মতলব করিয়াছে কপিলা ? থাকিবার ওর কী প্রয়োজন ছিল ?

কী দ্যাখ মাঝি ? কী ভাব ? কপিলা বলিল।

জিগানে কাম কী তর ? কুবের বলিল।

গোসা কর ক্যান ? উই দ্যাখ জাহাজ আহে।

সেইখানে নদীতীরে দাঁড়াইয়া তাহারা চাহিয়া থাকে, চক্রাকারে পাক দিয়া জাহাজ আসিয়া ভিড়ে জেটিতে। কী ভিড় হইয়াছে আজ জাহাজে ! আজ পূজা শেষ, আজও দেশ-দেশান্তরের মানুষ গৃহে ফিরিতেছে ! আর, কী অদৃষ্ট কুবেরের, মেয়েটাকে আজ এই বিদেশে হাসপাতালে ফেলিয়া রাখিয়া মূঢ়ের মতো সে দাঁড়াইয়া আছে নদীতীরে, কোথায় যাইবে কী করিবে ঠিক নাই ! ভোঁ দিয়া জাহাজ ছাড়িয়া যায়। নদীর আলোড়িত জল ঢেউ তুলিয়া তীরে আছড়াইয়া পড়ে। মেয়েটার জন্য এমনই ঢেউ উঠিয়াছে কুবেরের বুকে।

হঠাৎ কপিলা বলিল, মাঝি, পয়সা কড়ি আনছ ?

হ।

কত ?

তা দিয়া কী কাম তর ?

আমি কিছু আনছি, লাগলে নিয়ো।

কপিলা আঁচলে গেরো বাঁধা পয়সা দেখাইল।

কুবের হাঁ না কিছুই বলিল না। জেটি নির্জন হইয়াছে দেখিয়া খানিক পরে জেটিতে গিয়া ছায়ায় তাহারা বসিয়া রহিল। কুবের তাকায় না কপিলার দিকে, একটার পর একটা বিড়ি ধরাইয়া টানিতে থাকে—মিনিটে মিনিটে বিড়ি খাওয়ার মতোই সে যেন বড়োলোক।

ক্যামনে ফিরবা মাঝি ? খানিক পরে কপিলা জিজ্ঞাসা করিল।

কেডা জানে ! যেমন কাণ্ড তর কপিলা ! তরে নিয়া কী যে করুম—

আমার লাইগা ভাইবো না মাঝি।

এতক্ষণে কী মনে করিয়া কুবের হাসিল, বড়ো পোলাপান তুই কপিলা। সোয়ামি শুইনা কী কইব তর ভাবছস নি ?

কউক !

তা বইকী! কলঙ্ক কিনিবার সাধ যে কপিলার ষোলো আনা দেখা যায় ? কুবের গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে। এ তো ভালো কথা নয়। এক বাড়িতে যারা বাস করে শুধু দুর্নাম কিনিবার জন্য এখানে তাদের পড়িয়া থাকিবার কোনো মানে হয় না। শুধু গোপির জন্যই কি কপিলা রহিয়া গেল ? গোপিকে সে এত ভালোবাসে ? কে জানে, কপিলার মন বুঝিবার ক্ষমতা ভগবান কুবেরকে দেন নাই।

বেলা পড়িয়া আসিলে দুজনে হাসপাতালে গেল। কুবেরের এবার প্রথম মনে হইল থাকিয়া বুঝি ভালো করিয়াছে কপিলা। এমন করিয়া নতুবা গোপিকে সে নিজে তো সান্ত্বনা দিতে পারিত না কপিলার মতো ! তা ছাড়া যে কাণ্ড আজ ডাক্তার করিলেন গোপিকে লইয়া, কপিলা না থাকিলে বুক বাঁধিয়া সে সময় কে থাকিত গোপির কাছে ? গোপির হাঁটুর হাড়ই শুধু ভাঙে নাই, মস্ত একটা বাঁশের গোঁজ ঢুকিয়া গিয়াছিল মাংসের মধ্যে, পা ফুলিয়া সেটাকে আড়াল করিয়া ফেলিয়াছে। ডাক্তার এ বেলা সেটা টানিয়া বাহির করিলেন, তারপর ভাঙা হাড়টা যতদূর সম্ভব স্বস্থানে বসাইয়া কোমরের কাছ হইতে পা পর্যন্ত কাঠের তক্তা বসাইয়া বাঁধিয়া দিলেন ব্যান্ডেজ। কুবের এ সব দেখিল না, বাহিরে বসিয়া সে শুধু গোপির আর্তনাদ শুনিল !

দুজনে যখন তাহারা হাসপাতাল হইতে পথে নামিয়া আসিল, সন্ধ্যা হইতে বেশি বাকি নাই। দূরে বিসর্জনের বাজনা বাজিতেছিল। গ্রামেই এখন তাহাদের ফিরিতে হইবে। এখানে রাত কাটাইবে কোথায় ? কাল আবার কুবের আসিয়া গোপিকে দেখিয়া যাইবে। নদীর ঘাটে গিয়া কুবের নৌকায় নৌকায় চেনা মাঝি খুঁজিয়া বেড়াইল। চেনা মাঝি দু-চারজন মিলিল বটে কিন্তু আজ বিজয়ার সন্ধ্যায় নৌকা তো কেহ খুলিবে না ! দেবীগঞ্জের দিকে যাদের যাওয়ার দরকার ছিল দিনে দিনে তারা চলিয়া গিয়াছে ! তবে গহনার নৌকা* ছাড়িবে একটা, কুবের ইচ্ছা করিলে ভাড়া দিয়া যাইতে পারে। নতুবা কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুক যে নৌকাই কেতুপুরের দিকে যাক, কুবের তাহাতে গ্রামে ফিরিতে পারিবে।

কত নাও যাইব কাইল, পয়সা দিয়া ক্যান যাইবা কুবের বাই ? বলিয়া পরিচিত মাঝি কুবেরকে নৌকায় রাত্রিযাপন করিতে অনুরোধ করে। শুধু পরিচিত মাঝি কেন, পদ্মানদীর মাঝি সে, পদ্মানদীর যে-কোনো মাঝির নৌকায় রাত্রিযাপনের অধিকার তার জন্মগত, কিন্তু এখানে রাত কাটানোই যে মুশকিল। কপিলার সঙ্গে একত্র এখানে রাত কাটাইয়া গিয়া কাল গ্রামে সে মুখ দেখাইবে কী করিয়া ? কী বিপদেই কপিলা তাহাকে ফেলিয়াছে !

---

* গহনার নৌকা—প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে ছাড়িয়া বহুদূর অবধি যাত্রী লইয়া যাওয়া আসা করে।

পয়সা দিয়া গহনার নৌকায় যাওয়া ছাড়া উপায় নাই! কত ভাড়া লইবে কে জানে! জিজ্ঞাসা করিতে গহনার নৌকার মাঝি বলে, সোনাখালি হইয়া তীরে তীরে দেবীগঞ্জ পৌঁছাইয়া পদ্মা পার হইয়া কুবেরকে কেতুপুরে তাহারা নামাইয়া দিতে পারিবে না। হাসাইলের খাল পর্যন্ত তাহারা এ তীর ঘেঁষিয়া চলিবে, কুবের সেখানে নামিতে পারে, ভাড়া মাথা পিছু তিন আনা।

হাসাইলের খাল হইতে কেতুপুর দু ক্রোশের কম নয়। এই রাত্রে অতখানি পথ কপিলা হাঁটিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। কুবের জিজ্ঞাসা করে, কী করি কপিলা?

কপিলা বলে, না গেলাম আইজ? কাইল বিয়ানে গোপিরে দেইখা মেলা করুম?

থাকুম কই? নায়?

তাই কি হয়! ডাকাত না গুন্ডা নৌকার মাঝি কে জানে, কপিলা কী পারে এই নদীর ঘাটে খোলা নৌকায় শুইয়া থাকিতে? ওই তো ঘাটের হোটেল দেখা যায়, ওখানে একটা ঘরভাড়া নেওয়া যাক।

কী আর করিবে কুবের, দরদস্তুব করিয়া ছ আনায় বড়ো একটা ঘরের একদিকে ছ্যাঁচেব বেড়ায় ঘেরা স্থানটুকু ভাড়া করে। দরজা বা ঝাঁপ কিছুই নাই, ঢুকিবার জন্য একটু ফাঁক রাখিয়া ঘেরিয়া দিয়াছে। ঘরেব মধ্যে সারি সারি মোটা পাটি পাতা, অতিথিরা রাত্রে শয়ন করিবে—ঘেরা স্থানটুকুর মধ্যে একখানা পাটিতেই মেঝের প্রায় সবটা ভরিয়া গিয়াছে। বাহিরে খোলা চালার নীচে খাওয়ার জায়গা, রান্নাঘরেও কতকগুলি পিঁড়ি পড়ে, চালাটার মাঝখানে একটা কালি-পড়া লণ্ঠন বাধা হইয়াছে, বাকি সর্বত্র জ্বলিতেছে কেরোসিনের কুপি।

কুবের গিয়া চালার নীচে বসিয়া খাইয়া আসে। চালার বাহিরে সকলের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া খোলা আকাশের নীচে খায় কপিলা। তারপর এক পয়সার পান কিনিয়া আনে কুবের, ঘেরা স্থানটুকুর মধ্যে বসিয়া দুজনে নীরবে পান চিবায়। সারাদিন কত হাঙ্গামা কত হাঁটাহাঁটি গিয়াছে, দুপুরে স্নান হয় নাই, পেটে ভাত পড়ে নাই, ক্রমে ক্রমে দুজনেরই ঢুল আসিতে থাকে। আর একটু রাত হইলে কুবের উঁকি দিয়া দ্যাখে কাপড় মুড়ি দিয়া কেহ কেহ পাটিতে শুইয়া পড়িয়াছে, কোনো পাটিতে বসিয়া কেহ টানিতেছে তামাক।

কুবের উঠিয়া দাঁড়ায়, বলে, শো কপিলা।

তুমি কই যাও?

উই পাটিতে শুই গিয়া আমি, যামু কই?

ক্ষীণ ভীরু কণ্ঠে কপিলা বলে, না, যাইও না মাঝি।

কুবের কি রাগিয়া যায়? কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করে, কী করুম তবে?

ডরামু মাঝি।

কী আর করিবে কুবের, আবার সে পাটিতে বসে। কপিলা তাহার চাদরখানা পুঁটুলি করিয়া তাহাকে বালিশ করিয়া দেয়। তার নিজের মাথায় দেওয়াব জন্য ছোটো একটি পিঁড়ি আছে। কুবের শুইয়া পড়িলে এতক্ষণে কপিলা চুল খুলিয়া দেয়, আঙুল দিয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলে, গোপির লাইগা পেরানডা পোড়ায় মাঝি, স্যায় বুঝি ডরাইয়া কাইন্দা মরে।

বুঝিতে পারা যায় কপিলা কাঁদিতেছে।

কেডা জানে কবে মাইয়া সাইরা উঠ্যা বাড়িত্ যাইব! মাইয়ারে ফেইলা ক্যাম্‌নে ফিরুম মাঝি কাইল?

কুবের কাঠ হইয়া পড়িয়া থাকে। এখানে কাঁদিতেছে কপিলা, ওখানে মালাও হয়তো কাঁদিতেছে এখন। পথের দিকে চাহিয়া কত কী হয়তো ভাবিতেছে মালা। আর গোপি কী করিতেছে তা যেন ভাবাও যায় না।

পরদিন ভোরে আগে ঘুম ভাঙিল কপিলার। হাই তুলিয়া সে উঠিয়া বসিল, ঠেলা দিয়া কুবেরকে তুলিয়া দিল। বেড়ার বাহিরে পাটিতে এখনও রাত্রির অতিথিরা নাক ডাকাইতেছে, শুধু বাহিরের দুয়ারের কাছে কেরোসিন কাঠের বাক্সে বসিয়া তামাক টানিতেছে হোটেলের মালিক। রান্নাঘরে দাসী উনানেব ছাই তুলিতেছে। কপিলাকে দেখিয়া ঘুমন্ত কুকুরটা উঠিয়া দাঁড়াইয়া লেজ নাড়িতে লাগিল।

মৃদু মধুর শীত পড়িয়াছে। কুবেরের চাদরখানা পরিয়া কপিলা প্রথমে নদীতে ডুব দিয়া আসিল, তারপর স্নান করিতে গেল কুবের। কুবের ফিরিয়া আসা পর্যন্ত কপিলা ঘেরা স্থানটুকুর মধ্যে লুকাইয়া রহিল। পুরুষের দৃষ্টিপাতে আজ বড়ো লজ্জা করিতেছে কপিলাব, দিনের আলোয় আজ তার মনে হইতেছে জগৎসুদ্ধ সকলেই বুঝি জানে যার পাশে শুইয়া সে রাত কাটাইয়াছে সে তাহাব স্বামী নয়।

মুড়ি আর বাতাসা কিনিয়া কুবেব ফিবিয়া আসিল। দুমুঠা খাইয়া কপিলা বলিল, আর সে খাইবে না। না খাক, কুবেরের পেটে জায়গা আছে ঢের। ধীরে ধীবে মুড়ি আব বাতাসা শেষ করিয়া সে বলিল, ল যাই হাসপাতাল।

তখন সবে রোদ উঠিয়াছে। এত সকালে গোপির সঙ্গে তাহারা দেখা কবিতে পাবিল না। নটা পর্যন্ত হাসপাতালের সামনে বসিয়া থাকিতে হইল। তারপর ঘণ্টাখানেক গোপিব কাছে থাকিয়া, তাহাকে অনেক আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়া ঘাটে ফিরিয়া আসিল। জহরেব শালা নুরুলের নৌকা কাঠের বোঝা নামাইয়া দেবীগঞ্জ ফিরিয়া যাইতেছিল, সেই নৌকায় তাহারা উঠিয়া বসিল।

গ্রামের ঘাটে নামিয়া কুবেব বলিল, বাড়িত্ যা কপিলা, আমি গণেশেব লগে দেখা কইবা যাই,

বাড়িতে যদি ঝড়ঝাপটা ক্রন্দন ঘনাইয়া থাকে প্রথম ধাক্কাটা কপিলার উপব দিয়াই যাক '

কপিলা কিন্তু একা বাড়ি যাইতে রাজি হইল না, বুঝিয়া বলিল, আরে পুরুষ '

তখন আর কথাটি না বলিয়া কুবেব হনহন করিয়া বাড়ির দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। কপিলা পিছাইয়া পড়িল। পথে যার সঙ্গে দেখা হইল সেই সাগ্রহে গোপিব সংবাদ জিজ্ঞাসা কবিল, চাপা হাসি ঢাকা পবিহাস বূঢ় ইঙ্গিত কিছুই কারও কাছে জুটিল না কুবেরেব। এত কী সুনাম সে রাখিয়া গিয়াছিল গ্রামে যে কপিলাব সঙ্গে একটা পুবা রাত্রি অজানা স্থানে অতিবাহিত করিয়া আসিয়াও সে সুনাম নিটোল অক্ষত দেখিতে পাইতেছে ? ব্যাপাবখানা কী ? চলিতে চলিতে হঠাৎ কুবেরেব মনে পড়ে, দুজন তো নয়, গোপিকে ধবিলে তাবা যে তিনজন ! গ্রামের লোক তাকে আর কপিলাকে হোটেলের চাঁচের বেড়ার নির্জনতায় পৃথকভাবে কল্পনা কবে নাই, ওদেব সঙ্গে গোপিকেও একত্র চিন্তা করিয়াছে। কারও মনে তাই সন্দেহ জাগিবার অবকাশ থাকে নাই।

কুবের দাঁড়াইল। কপিলা কাছে আসিলে বলিল, দ্যাখ্ কপিলা, জিগাইলে কইস্ রাইতে হাসপাতালে ছিলাম, গোপিব কাছে।

কপিলা মাথা নাড়িয়া বলিল, দূব অ ! মিছা কথা আমি কই না মাঝি !

বলিয়া খানিক আগে কুবেব যেমন করিযাছিল তেমনি হনহন করিয়া কপিলা আগাইয়া গেল। কে জানে কী আছে কপিলার মনে ! বাবণ না মানিয়া কাল ও আমিনবাড়িতে থাকিয়া গেল, আজ বারণ না মানিয়া সত্য কথা বলিতে চায় ! বলুক ! পুরুষ মানুষ কুবের, কী ভয় তাব ? কপিলার সত্যবাদিতার ফল যদি কেহ ভোগে, ভুগিবে কপিলাই !

বাড়ি গিয়া কুবের দেখিল, মালার কাছে কপিলা সবিস্তারে আমিনবাড়ির কাহিনি বলিতেছে। কাছে চাটাইটার উপর সে বসিয়া পড়িল। মালাকে সবই বলিবে নাকি কপিলা, হোটেলে রাত্রিযাপনের কথা পর্যন্ত ? কপিলা বলিয়া যায়—সন্ধ্যাবেলায় কী বিপদেই তারা পড়িল। হাসপাতালে থাকিতে দিল না, ফিরিবার নৌকা পাওয়া গেল না, কোথায় যায় ? শেষে এক মোক্তারবাবু দয়া করিয়া

তাদেব আশ্রয় দিলেন।—কী নাম য্যান মাঝি মুক্তারবাবুর ? মুখ ফিরাইয়া কপিলা জিজ্ঞাসা করিল কুবেরকে।

কুবের থতোমতো খাইয়া বলিল, কেডা জানে ?

জিগাও নাই ?

কুবের মাথা নাড়িল।

দুদিনের মধ্যে আর গোপিকে দেখিতে যাওয়া হইল না। জীবিকা অর্জন করিতেই কুবের ব্যস্ত হইয়া রহিল। পরের দিন সকালে মালা ভয়ানক গোলমাল আরম্ভ করিয়া দিল। আই গো কুবেরের পাষাণপ্রাণ ! মেয়েটাকে সে যে কোথায় রাখিয়া আসিল আর কী তাহাব খবর লইতে হইবে না ! জন্মের মতো রাখিযা দিয়া আসিয়াছে নাকি মেয়েকে, এমন যে নিশ্চিন্ত হইয়া আছে কুবের ?

সারারাত মাছ ধরিয়া কুবের তখন বাড়ি ফিরিয়াছে। ভাত খাইয়া দুপুরবেলা আমিনবাড়ি রওনা হওয়াব প্রতিশ্রুতি দিয়া সে মালাকে শান্ত করিল। তারপর ঘুমাইতে গেল পিসির ঘরে। ঘুমাইয়া উঠিয়া স্নান করিয়া আসা অবধি সে আড়চোখে চাহিতে লাগিল কপিলাব দিকে। কে জানে কপিলা আজ সঙ্গে যাইতে চাহিবে কিনা ! কপিলা কিছু বলে না, একবার সামনে আসে একবার অন্তর্হিত হয়।

খাইতে বসিয়া কুবের বলে, খাইয়া উঠ্যাই আমিনবাড়ি রওনা দিমু কপিলা।

ফিববা না আইজ ?

কেডা জানে ! হয়তো হোটেলে থাকুম।

হোটেলে ক্যান ? থাইকো, মুক্তার বাবুগো বাড়ি থাইকো !

বলিযা কপিলা হাসে। লজ্জা পাইয়া ঘাড় হেঁট করিযা কুবেব খাইযা যায়। না, কপিলাব মনেব হদিস পাইবার ভরসা তাহার আব নাই। কখন কী বলিবে কখন কী করিবে কিছুই অনুমান করিতে পারা যায় না।

খাইযা উঠিয়া কুবেব ময়লা চাদরটি গাযে জড়াইযা যাওযাব জন্য প্রস্তুত হইল। বড়ো সে গম্ভীর হইযা গিয়াছে, যেন এমন একটা অপমান সম্প্রতি তাহার জুটিযাছে যাহা তাহার প্রাপ্য নয়। বড়ো নির্মম কপিলা, বড়ো দুর্বোধ্য তাহার ব্যবহার।

রওনা হওয়ার সময় কুবেরকে চার আনা পযসা দিয়া কপিলা বলিল, গোপিরে ফল কিনা দিবা মাঝি। তাবপর মালাকে বলিল, মাঝির লগে যামু নাকি দিদি ?

মালা বলিল, তব গিয়া কাম কী ?

তখন কপিলা বিষণ্নভাবে একটু হাসিল, কুবেরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাঝি কী কও ?

কুবের মাথা নাড়িল, তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। আমিনবাড়ি সে পৌছিল অপবাহ্ণে, কপিলার পযসা দিয়া স্টিমাবঘাট হইতে কমলা লেবু কিনিযা গোপিকে দেখিতে গেল, নদীতীরে ফিরিযা আসিল সন্ধ্যাবেলা। আজ বাড়ি ফিরিবার নৌকার অভাব নাই, তবু কুবেরের কেন যেন ফিরিতে ইচ্ছা হইতেছিল না, অনেক রাত্রি অবধি নদীতীরে বসিয়া থাকিয়া সে হোটেলে ভাত খাইতে গেল। খাইতে খাইতে সে শুনিতে পাইল বাজারে আজ ভাসান-যাত্রা হইতেছে। আজ কুবের কাছে না থাকিলে কেহ ভয় পাইবে না, খাইয়া উঠিয়া সে বাজারের দিকে পা বাড়াইল !

বাজারে টিনেব চালার নীচে যেখানে তরিতরকারির দোকান বসে সেইখানে যাত্রার আসর বসিয়াছে, লোক জমিয়াছে ঢের। কুবের একপাশে বসিয়া পড়িল। পানবিড়ির দোকান ছাড়া এতরাত্রে পসরা সাজাইয়া কেহ নাই, রূপ-কন্যারাও যাত্রা শুনিতে আসিয়াছে। পেশাদার দল নয়, আলু-বেচা তেল-বেচা মানুষের শখের দল, অনেকে হয়তো পড়িতেও জানে না, একে ওকে দিয়া পড়াইয়া

শুনিয়া শুনিয়া পার্ট মুখস্থ করিয়াছে, শক্ত শক্ত অনেক শব্দই উচ্চারণ হয় না, তাই হাস্যকর রকমে ভাঙিয়া জিহ্বার উপযোগী করিয়া নিয়াছে—বক্তৃতাগুলি কথ্য ও শুদ্ধ ভাষার এক অপরূপ খিচুড়ি। পোশাক পরিচ্ছদের যেমন অভাব, অভিনেতা নির্বাচনের কাণ্ডজ্ঞানেরও তেমনই অভাব। বালক লখিন্দরের পাশে তার চেয়ে একহাত বেশি লম্বা বেহুলা নির্বিকারচিত্তে পার্ট বলে—গলাটি মিহি বলিয়া আর চমৎকার মেয়েলি ঢঙে অভিনয় করিতে পারে বলিয়া ওকে বেহুলা করা হইয়াছে আর কিছু দেখিবার প্রয়োজন হয় নাই।

তবু রাত জাগিয়া ভিড় করিয়া সকলে ভাসান-যাত্রা শোনে, একবার নয় বহুবার। ভাঙা হারমোনিয়াম আর ঢ্যাপ্‌সা তবলার সঙ্গত, মশালের লাল আলো, আলু-বেচা তেল-বেচা অভিনেতা—তবু কী মোহ এ যাত্রার ! কুবের ঠায় বসিয়া থাকে। ঢিমাইয়া ঢিমাইয়া অভিনয় চলে, মা মনসা একটা গান করেন, চাঁদ সদাগর দুটো কথা বলে, মৃত লখিন্দর উঠিয়া একটা গান করিয়া আবার মরিয়া যায়। কোথায় কখন কোন দৃশ্যের শুরু, সর্পদষ্ট লখিন্দরের জন্য বেহুলার বহুল বিলাপের পর মা মনসা আবার কেন গান গাহিয়া গাহিয়া চাঁদ সদাগরকে ভয় দেখাইয়া যান যে তাকে পূজা না করিলে লখিন্দরকে সাপে কাটিবে, এ সব বুঝিবার দরকার হয় না, কুবের মন দিয়া যাত্রা শোনে। রাত্রি শেষ করিয়া যাত্রা শেষ হইলে পেঁয়াজের যে খালি বস্তাটার উপর সে এতক্ষণ বসিয়া ছিল তার উপরেই কাত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমানোর সুযোগ সে পায় না। সকাল হইতে না হইতে তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দেওয়া হয়। সেখানে এবার দোকান বসিবে।

অনেক বেলায় সে গ্রামে ফেরে। দেখিতে পায় বাড়িতে অতিথি আসিয়াছে। কপিলার স্বামী শ্যামাদাস !

লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড জোয়ান মানুষ, ঘাড়-ছোঁয়া বাবরি চুল মাথায়, বোঁচা নাকটার নীচে একজোড়া উদ্ধত গোঁফ—খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিবার ভঙ্গি দেখিলে মনে হয় বিশ্বজগতে কারও সে তোয়াক্কা রাখে না। কুবেরের মুখখানা ম্লান হইয়া যায়। কে জানে কেন আসিয়াছে শ্যামাদাস !

শ্যামাদাসের আসিবার উদ্দেশ্য জানিতে বেশি দেরি হইল না। এ পক্ষের বউটা তাহার মরিয়া গিয়াছে। কপিলাকে সে নিয়া যাইবে। কখন যাইবে ? বেলা পড়িয়া আসিলে এক সময় রওনা হওয়া যাইবে, সে জন্য কী ! কুবের যদি খাতির করিয়া একটা দিন থাকিয়া যাইতে বলে তাতেও শ্যামাদাসের আপত্তি নাই।

বসিয়া বসিয়া তাহারা কথাবার্তা বলে, কপিলা এক সময় আসিয়া ফিসফিস করিয়া স্বামীর কানে কানে কী যেন সব গোপনে কথা বলে, তারপর হাসিয়া চলিয়া যায়, পিসির ঘরে ঢুকিবার আগে মুখ ফিরাইয়া চোখের একটা দুর্বোধ্য ইঙ্গিতও করে।

এত বেলায় কুবের ফিরিয়া আসিয়াছে, কই খাওয়ার কথা কপিলা তো কিছু বলিল না ? কুবেরের ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা মনে রাখিবার প্রয়োজন কি কপিলার ফুরাইয়া গিয়াছে ? গোপির কথাও তো কিছু সে জিজ্ঞাসা করিল না ?

গায়ের চামড়াটা কুবেরের আজ বড়ো খসখস করিতেছিল, অনেকদিন তেল মাখা হয় নাই। শ্যামাদাস আসিয়াছে বলিয়াই কপিলা বোধ হয় আজ চুলে আবার জবজবে করিয়া নারিকেল তেল দিয়াছে। কালো একটি বোতলে বিলাসিতার এই উপকরণটি কপিলা সর্বদা মজুত রাখে, একটা কিছু উপলক্ষ পাইলেই বোতলটা কাত করে মাথায়। শ্যামাদাসকে বসিতে বলিয়া কুবের কপিলার কাছে একটু তেল চাহিল। কপিলা করিল কী, রাঁধিবার তেল-রাখা বাঁশের পাত্রটি আনিয়া বলিল, ধর মাঝি, হাত পাত। কুবের হাত পাতিলে পাত্রটা সে একেবারে উপুড় করিয়া ধরিল, এক ফোঁটা তেলও কুবেরের হাতে পড়িল না।

কপিলা বলিল আই গো আই, ত্যাল ত নাই !

বলিয়া কী হাসি কপিলার !

কুবের কথাটি বলিল না, বাঁশের পাত্রটি তার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া এই দুপুরবেলা অভুক্ত অবস্থায় গ্রামের ভিতরে গিয়া দু পয়সার তেল কিনিয়া আনিল। কপিলাকে দেখাইয়া দাওয়ায় বসিয়া সর্বাঙ্গে ঘষিয়া ঘষিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সে তেল মাখিল, নিজের দেহটিকে সে যেন কপিলার চুলের মতোই তেলে জবজবে করিয়া ছাড়িবে।

সারাদিন কপিলার সঙ্গে সে কথা বলিল না।

কিন্তু সন্ধ্যার পর মাছ ধরিতে যাওয়ার সময় তামাকের গোলাটা সঙ্গে লইতে ভুলিয়া গেল। নৌকায় গিয়া একা সে বসিয়া রহিল প্রতীক্ষায়, এক সময় গণেশ ও ধনঞ্জয় আসিয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিল, তারপর মৃদু জ্যোৎস্নায় পদ্মার রহস্যময় বুকে নৌকা ভাসিয়া গেল, কিন্তু তামাক পৌঁছাইয়া দিতে কেহ আসিল না।

পরদিন কপিলাকে সঙ্গে করিয়া শ্যামাদাস চলিয়া গেল।

সাত

ইলিশের মরশুম শেষ হইয়া গেল। ধনঞ্জয়ের তিনটি নৌকা ইলিশ মাছ ধরার কাজে লাগানো হইয়াছিল, একটিতে থাকিত সে নিজে, অন্য দুটিতে তার দুই ছেলে। আশ্বিনের ঝড়ে একটি নৌকা ভাঙিয়া গিয়াছে। এবার একটি নৌকা সে রাখিল মাছ ধরার জন্য, অন্যটি লাগানো হইল ভাড়া খাটিবার কাজে। ছেলেরা মাছ ধরিবে, নিজে সে একজন মাঝিকে লইয়া নৌকা বাহিবে।

কুবেরকে ধনঞ্জয় পছন্দ করে না। গণেশকে সে তার নৌকার মাঝি হইতে বলিল। কিন্তু গণেশ কিনা বোকা, সে গেল পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে কুবেরের কাছে !

কুবের রাগিয়া বলিল, যা যা, খাট গিয়া আজান খুড়ার নায়। আমারে জিগাস ক্যান ? আজান খুড়া বেশি আপনার না তর ?

কুবের অনুমোদন না করিলে তাহা হইবার নয়, গণেশ ধনঞ্জয়কে বলিয়া আসিল তার নৌকায় একা সে মাঝির কাজ করিবে না, কুবের যদি করে তবেই সে করিবে, নতুবা নয়। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলিল, যা, মর গিয়া তবে। পঞ্চাশ জনা মাঝি রাখুম, কলের জাহাজ পাইছুস, না ?

গণেশ তাহা জানে না। চিরদিন সে কুবেরের কথায় নির্ভর করিয়া আসিয়াছে, কলের জাহাজ হোক আর ছোটো পানসি হোক কুবের যেখানে নাই গণেশও নাই সেখানে। কুবেরের দাওয়ায় বসিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানিতে লাগিল, আর কুবের গম্ভীর চিন্তিত মুখে ভাবিতে লাগিল, এবার কী করিবে। মাঝিগিরিই সে করিবে সন্দেহ নাই, তবু গম্ভীর চিন্তিত মুখে অন্য কিছু করা যায় কিনা ভাবিতে কুবের চিরদিন বড়ো ভালোবাসে।

কপিলা চলিয়া যাওয়ার পর ক্রমে ক্রমে কুবেরের অভাব বাড়িয়াছে। ঘরের লক্ষ্মী যেন চলিয়া গিয়াছে কপিলার সঙ্গে, পরিপূর্ণভাবে ক্ষুধার নিবৃত্তি আর হইতেছে না। সময়টা পর্যন্ত পড়িয়াছে খারাপ। জিনিসপত্রের দাম চড়িয়া গিয়াছে। বর্ষায় একটা ফসল নষ্ট হইয়াছিল, পাটের কল্যাণে আমন ধানের ফসলও হইয়াছে কম। চাষিদের ঘরে ধান নাই, টাকা নাই, আছে পাট — কুবেরের ঘরে কিছুই নাই। পাটের উপর চাষির অনিশ্চিত মরণ-বাঁচন, কুবেরের জীবনধারণ সুনিশ্চিত মাঝিগিরিতে— সেটা ভালোমতো জুটিতেছে না। একটা নৌকা যদি কুবেরের থাকিত ! পদ্মার ঘাটে ঘাটে তবে সে কুড়াইয়া বেড়াইতে পারিত জীবিকা, পরের নৌকায় লগি ঠেলিতে পাইবার ভরসায় বসিয়া থাকিতে হইত না।

ভোরবেলা এখন নদীর বুক জুড়িয়া থাকে কার্তিকের কুয়াশা, যদিও অগ্রহায়ণ আসিয়া গিয়াছে। জলের তল হইতে মাঠঘাট মাথা তুলিয়াছে। কোথাও রবিশস্যের চারা উঁকি দিয়াছে, কোথাও সবে শস্য-বীজ বপন করা হইতেছে। রাত্রে অল্প অল্প শীত করে, কাপড় গায়ে দিতে হয়।

কুবেরের মন বড়ো খারাপ। কিছু ভালো লাগে না। গোপি হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিযাছে, ভাঙা হাঁটুটি তাহার শক্ত হইয়া গিয়াছে, সে হাঁটিতে পারে না। ভবিষ্যতে আবার কোথায় হাড় ভাঙিয়া ঠিক করিয়া দিলে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হয়তো সে হাঁটিতে পারিবে, চলন তাহার স্বাভাবিক হইবে না কোনোদিন। যুগলকে জামাই করার আশা আর নাই। মেয়েব বিবাহ দিবার এবং সেই উপলক্ষে কিছু টাকা পাইবার ভরসাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কী উপায় হইবে গোপিব ?

রাসু মাঝে মাঝে আসে, বেশ বুঝিতে পারা যায় গোপির অবস্থা দেখিয়া সে বড়োই দুঃখিত হইয়াছে। গোপির হাঁটুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ডাক্তাব কী বলিয়াছে রাসু খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করে, এক একদিন টিপিয়া টুপিয়া নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে যায়, কী সন্তর্পণে সে যে স্পর্শ করে গোপির হাঁটু !

মালা হঠাৎ রাসুকে বড়ো খাতির করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুগল অবস্থাপন্ন লোক, গোপিব দিকে সে আর ফিরিয়াও চাহিবে না, চালচুলাহীন রাসু হয়তো গোপিকে গ্রহণ করিতে পারে।

বড়ো দোটানায় পড়িয়াছে রাসু। আজ সে চাহিলেই গোপিকে পায়, এক পয়সা পণও তাহাকে দিতে হইবে না—কিন্তু সে কি এই গোপিকে চাহিয়াছিল, এই পঙ্গু মেয়েটাকে ? খোঁড়া মালাকে লইয়া কুবের সংসার পাতিয়াছে, অসুখী কুবের নয়, দারিদ্র্যের পীড়নে সে কষ্ট পায় বটে কিন্তু পারিবারিক জীবনটি তাহার কামনা করিবার মতো—গোপিকে লইয়া হয়তো সে এমনি সুখের সংসারই পাতিয়া বসিতে পারিবে। তবু মনটা খুঁতখুঁত করে রাসুর। খোঁড়া বউ ! হয়তো জীবনে কোনোদিন সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না—যদি পারেও, লাঠি ধরিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিবে, পায়ের পঙ্গুত্বের জন্য দেহের হয়তো তার পুষ্টি হইবে না, চিরকাল কুৎসিত দেখাইবে তাহাকে।

শেষ পর্যন্ত গোপির পায়ের অবস্থাটা কী দাঁড়ায় দেখিয়া কর্তব্য নির্ণয় করার জন্য প্রতীক্ষা করাও বিপজ্জনক। হাসপাতালের ডাক্তার যদি পা-টিকে ঠিক আগের মতো করিয়া দেয় ? মরা মানুষ বাঁচায় ডাক্তার, কত ওষুধ কত যন্ত্রপাতি ডাক্তারের, একটা ভাঙা পা ঠিক করিয়া দেওয়া তার পক্ষে কঠিন নয়। তখন রাসুকে কি আর কুবের জামাই করিতে চাহিবে ? আপশোশ করিয়া মরিতে হইবে রাসুকে তখন।

সাইরা যাইব কয় নাই ডাকতর ? রাসু জিজ্ঞাসা করে।

হ। কুবের জবাব দেয়।

কিন্তু এ কথা রাসু বিশ্বাস করিতে পারে না। গোপির পা যে কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হইয়া যাইবে রাসুকে তাহা বিশ্বাস করাইতে এত বেশি আগ্রহ দেখায় কুবের যে রাসু সন্দিগ্ধ হইয়া ওঠে।

হঠাৎ একদিন সে করে কী, চলিয়া যায় আমিনবাড়ি। হাসপাতালে গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করে, বলে যে সে গোপির আত্মীয়—কোনোমতেই কি গোপির পা-টি আগের মতো করিয়া দেওয়া যায় না ? ডাক্তারের সামনে হাতজোড় করিয়া সে দাঁড়াইয়া থাকে। কত ব্যাকুল, কত উৎকণ্ঠিত আত্মীয় সে গোপির !

না, গোপির দরদি আত্মীয়কে ভরসা ডাক্তার দিতে পারেন না।

রাসু চিন্তিত মুখে গ্রামে ফিরিয়া আসে। আবার সে দেখিতে যায় গোপিকে। শীতের কুয়াশার মতো ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে মেয়েটা, শীর্ণ রোগা মুখখানাতে জ্বলজ্বল করিতেছে দুটা চোখ, একটা খড়ের পুঁটুলির উপর ভাঙা পা-টি রাখিয়া এলাইয়া পড়িয়া আছে বিছানায়।

বাস্ মমতা বোধ করে। ময়নাদ্বীপে একে একে স্ত্রীপুত্রকে হারাইয়া যে নিষ্ঠুর বেদনায় বুক তাহার দীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তেমন বেদনা লক্ষ স্ত্রীপুত্রকে হারাইয়াও আর সে কোনোদিন অনুভব করিবে না—গোপির ভাঙা পা-খানা দেখিলে মনটা শুধু কেমন করিয়া ওঠে।

একদিন সকালে হোসেন মিয়া কুবেরেব বাড়ি আসিল।

মৃদু মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাম মিলে নাই কুবের বাই ?

কুবের মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

হোসেন বলিল, জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, ক্যামনে ভালা করুম তোমাগো হুঁশ থুই কুবেব বাই। কাম করবা, আমার লায় ?

মনে মনে কুবের ভয় পাইল। কী মতলব করিয়াছে হোসেন মিয়া ? যাচিয়া কাজ দিতে চায় কেন ? হোসেন মিয়ার উপকার গ্রহণ করিলে শেষ পর্যন্ত মঙ্গল নাই কুবের তাহা ভালো করিয়াই জানে, কোন স্বার্থ সাধিবার জন্য কবে কাকে হোসেন মিয়ার প্রয়োজন হয় তাই শুধু কেহ জানিতে পাবে না। কুবেব একবার ভাবিল, না, হোসেন মিযার নৌকায় সে কাজ কবিবে না। কিন্তু এ কথা বলা যায় না। লোকটার মৃদু হাসি-ভরা মুখেব দিকে চাহিয়া যত ভয় করে কুবেবের, সেই ভয়েব তাড়নাতে ওকেই যেন জড়াইয়া ধরিবার প্রয়োজন তত বাড়ে। তা ছাড়া, আজ পর্যন্ত ক্ষতি সে কিছুই তাহাব করে নাই, বরং উপকার করিযাছে অনেক।

কুবের জোব করিয়া আগ্রহ দেখাইয়া বলিল, হোসেন মিয়ার নৌকায় কাজ পাইলে সে বর্তিয়া যায়। সে যেন জানিত না কুবেব রাজি হইবে, এমনিভাবে হোসেন খুশি হইয়া গেল—মানুষ বশ কবাব কত কাযদাই লোকটা জানে। কী কাজ করিতে হইবে কুবেরকে, কী সে পাইবে, এ সব কথা কিছুই উঠিল না। হোসেন শুধু বলিল, মাঝে মাঝে দশ পনেরো দিনের জন্য কুবেবকে বাড়িঘর ছাড়িয়া যাইতে হইবে, যাইতে হইবে পদ্মার দূরতম বন্দরে, যেখানে যেখানে হোসেন মিয়ার বাণিজ্য আছে। কীসেব বাণিজ্য হোসেন মিয়ার ? কে তা জানে। কে সে প্রশ্ন করিবে। কুবের শুধু সায় দিযা গেল—তাব আপত্তি নাই। সপরিবারে ময়নাদ্বীপ যাওয়া ছাড়া যেখানে যাইতে বলুক কুবের সেইখানে যাইবে, যা করিতে বলুক তাই কবিবে, প্রতিদানে জীবিকা পাইলেই হইল।

গণেশের কথাটা কুবেরের মনে পড়িতেছিল, তাব জন্য ধনঞ্জয়ের নৌকায় একা সে কাজ নেয নাই। আজ গণেশকে ফেলিয়া হোসেন মিয়ার নৌকায় কাজ নেওয়া তাব কি উচিত হইবে ? কুবের উশখুশ করে। গণেশের কথাটা বলিতে গিয়া মুখে আটকাইয়া যায। বন্ধুত্ব বজায় রাখিতে গিয়া যদি তার নিজের কাজটা ফসকাইয়া যায় ? তা ছাড়া, তার সঙ্গে গণেশও হোসেন মিয়ার খপ্পরে আসিয়া পড়িবে এটা কুবেরের ভালো লাগিতেছিল না।

তবু, গণেশেরও একটা উপায় হওয়া চাই।

ঢোঁক গিলিয়া কুবের জিজ্ঞাসা করিল গণেশকে নিতে পাবে না হোসেন মিযা ? গণেশ বলবান, পাকা মাঝি গণেশ—বুদ্ধিটা একটু ভোঁতা বটে কিন্তু জেলেপাড়ায় ওর মতো লগি ঠেলিতে, দাঁড় টানিতে আর কেহ পারে না।

হোসেন বলিল, ডাইকা আনবা গণেশরে ?

অখন ?

হ, যাও, বাতচিত কইরা যাই।

কুবের অনিচ্ছাব সঙ্গে উঠিয়া গেল। হোসেন মিয়াকে একা বাড়িতে রাখিয়া যাইতে তার ভরসা হয় না। গণেশকে নিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়া আমিনুদ্দি আসিয়া হোসেন মিয়ার কাছে বসিয়াছে। আমিনুদ্দিকে দেখিলে চিনিতে পারা যায় না। কয়েকদিন আগে

জহরের ছেলের সঙ্গে মেয়েটার সে বিবাহ দিয়াছে, স্ত্রীপুত্রের অপমৃত্যুর পর এত তাড়াতাড়ি মেয়ের বিবাহ দিতে সকলে তাহাকে বারণ করিয়াছিল, কারও কথা সে শোনে নাই। যেটুকু বন্ধন ছিল তাও সে অধীর হইয়া চুকাইয়া ফেলিয়াছে। এবার সে কী করিবে সেই জানে !

কুবেরকে দেখিয়া আমিনুদ্দি বলিল, ময়নাদ্বিপি যামু গিয়া কুবির, কাইজ্জা মনে থুইয়ো না, কসুর মাপ কইরো বাই।

ময়নাদ্বিপি যাবা ? ক্যান ?

কই যামু, না ত ?

কুবের ও গণেশ অভিভূত হইয়া আমিনুদ্দির দিকে চাহিয়া রহিল। সকলকে হারাইয়া রাসু একদিন ময়নাদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল, এখানে সকলকে হারাইয়া আমিনুদ্দি আজ ময়নাদ্বীপে যাইতেছে। আমিনুদ্দিকে ওখানে নেওয়ার জন্য হোসেন অনেকদিন হইতে চেষ্টা করিতেছিল, এতদিনে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল—হোসেনের কোনো ইচ্ছা কি অপূর্ণ থাকিবার নয় ? ভয়ে তাহারা হোসেন মিয়ার দিকে তাকাইতে পারে না। মনে হয় আশ্বিনের ঝড় নয়, হোসেন মিয়াই আমগাছ ফেলিয়া আমিনুদ্দির কুটিরখানি চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। লোকে যে বলে কোনো কোনো মানুষের ভূত-প্রেতের উপর কর্তৃত্ব থাকে, হোসেনেরও তাই আছে কিনা কে জানে ! একদিন রাত্রে সে যে হোসেন মিয়ার পকেট হইতে পয়সা চুরি করিয়াছিল সে কথা মনে করিয়া কুবেরের বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতে থাকে। এমন অলৌকিক শক্তি যার, সে কি টের পায় নাই চুরির কথা ? ঘরের চালা হয়তো নয়, হয়তো হোসেনের পোষ-মানা অন্ধকারের অশরীরী শক্তি সেদিন গোপির হাঁটু ভাঙিয়া দিয়াছিল, বাড়ি ছিল না বলিয়াই কুবের সেদিন বাঁচিয়া গিয়াছিল নিজে ? মেঘলা অমাবস্যার অন্ধকারের মতো অতল কুসংস্কার নাড়া খাইয়া কিছুক্ষণের জন্য কুবেরের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

খানিক পরে আমিনুদ্দি উঠিয়া গেল। তখন হোসেন কুবের ও গণেশকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, ময়নাদ্বীপে গিয়া মঙ্গলই হইবে আমিনুদ্দির, এখানে শোকে দুঃখে কাতর হইয়া থাকিবে লোকটা, তার চেয়ে সেখানে গিয়া আবার বিবাহাদি করিয়া ঘর-সংসার করা কি ভালো হইবে না ওর পক্ষে ? ময়নাদ্বীপ কি সে রকম আছে এখন, জঙ্গল সাফ হইয়া এখন সেখানে নগর বসিয়াছে।

হোসেন মিয়া চলিয়া গেলে গণেশ ও কুবের বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিল। ভবিষ্যতের সব জল্পনা-কল্পনা। চাকরি পাইয়া দুজনেই খুশি হইয়াছে, দেনাপাওনার ব্যাপারে হোসেন মিয়া কৃপণ নয়, কোথায় কোথায় যাইতে হইবে, লগি ঠেলা ছাড়া আর কী তাদের দিয়া হোসেন মিয়া করাইয়া লইবে, এখন তাই শুধু তাদের ভাবনা।

কয়েকদিন পরে হোসেন মিয়ার আহ্বান আসিল।

কুবের ও গণেশ সকাল সকাল খাইয়া নদীর ঘাটে গেল। ঘাটে হোসেন মিয়ার বড়ো একটি পানসি বাঁধা ছিল। নৌকায় আরও দুজন মাঝি আছে, তারাও হিন্দু। হোসেন মিয়ার ব্যবস্থা ভালো, একই নৌকায় হিন্দু-মুসলমান মাঝি থাকিলে তাদের রান্না-খাওয়ার অসুবিধা হয়, সে তাই তার তিনটি নৌকার দুটিতে শুধু মুসলমান মাঝিই রাখিয়াছে, আর এই নৌকাটিতে রাখিয়াছে হিন্দু মাঝি। অন্য মাঝি দুজনের নাম শম্ভু ও বগা।

তখন নদীতে কিছুকিছু কুয়াশা ছিল। সকলকে দাঁড় ধরিতে বলিয়া হোসেন নিজে হাল ধরিয়া বসিল। নৌকা চলিল দেবীগঞ্জের দিকে। দেবীগঞ্জে হোসেন নামিয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া কুবেরকে সে ডাকিল কাছে। বলিল, কলিকাতা হইতে বিড়ি চালান আসিয়াছে, নৌকায় আমিনবাড়ি পৌঁছিয়া দিতে হইবে। সেখানে গিরিধারী সাহার গদিতে খবর দিলে তাহারা মাল নামাইয়া

লইয়া যাইবে, তারপর কুবের নৌকা লইয়া ফিরিয়া আসিবে কেতুপুরে। দ্বিতীয় আদেশ পাওয়া পর্যন্ত নৌকা কেতুপুরেই বাঁধা থাকিবে।

সকলকে সঙ্গে করিয়া হোসেন রেলের মালগুদামে গেল। টাকা দিয়া মাল খালাস করিয়া আর সে কথা বলিল না, কুবেরের হাতে তিনটি টাকা দিয়া জেটিতে যে স্টিমারটি বাঁধা ছিল সোজাসুজি তাহাতে গিয়া উঠিল।

হোসেন মুখে বলিয়া যায় নাই, তবু কাহারও বুঝিতে বাকি থাকে নাই যে সমস্ত ভার সে দিয়া গিয়াছে কুবেরকে, কুবেরই সব ব্যবস্থা করিবে। কুবের প্রথমটা একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। এ কী সম্মান তার, এ কী সৌভাগ্য ! এতবড়ো একটা নৌকা, তিনজন জবরদস্ত মাঝি, তিনশো চারশো টাকার মাল—এ সমস্তের উপর কর্তৃত্বের অধিকার তাহার একার। সকলের রাহাখরচের টাকা পর্যন্ত হোসেন মিয়া তাহার জিম্মা করিয়া দিয়া গিয়াছে !

মাল তুলিতে গিয়া কুবেরের মুখে কথা আটকাইয়া গেল। ভয়ে ভয়ে সে একবার সকলের মুখের দিকে চাহিল। হোসেন মিযার পক্ষপাতিত্বে না জানি মনে মনে ওরা কত রাগিযাছে।

তারপর কুবের নীরবে একটা প্যাকিং কেস তুলিয়া লইল। শম্ভু জিজ্ঞাসা করিল, জলপানি দিবা না কুবির ?

কুবের ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, মাল নায় তুইলা দিলে চলব না ?

তা চলিবে। ধীরে সুস্থে তাহারা বিড়ির কেসগুলি নৌকায় তুলিতে লাগিল। কাজে কারও যেন গা নাই। কাজের চেয়ে কথা বলিয়া কুবেরের সঙ্গে খাতির জমাইবার চেষ্টাই তাদের বেশি। একপ্রস্থ মাল রাখিয়া আসিযাই বগা কুবেরের কাছে একটা বিড়ি দাবি করিয়া বসিল। ওদের দেখাদেখি গণেশও যেন গা ছাড়িয়া দিযাছে। কুবের মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল কিন্তু মুখে কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

মাল বোঝাই হইলে কুবের চিড়াগুড় কিনিযা দিল সকলকে, বসিযা বসিয়া এত আরামে তাহারা চিড়া চিবাইতে লাগিল যেন আজকের মতো কাজকর্ম সব শেষ হইয়া গিযাছে। নৌকা খুলিবার পরেও তাদের শৈথিল্য ঘুচিল না। এমনভাবে দাঁড় টানিতে লাগিল যেন কত কাল আগে তারা মরিয়া গিযাছে।

কুবের বলিল, গাও লাগাও বাই, জোরে খ্যাপ মার।

শম্ভু বলিল, ক্যান ?

কুবের সাহস করিয়া বলিল, ক্যান কী ? সারাদিন লাগাইবা আমিনবাড়ি যাওনে ? হোসেন মিয়া শুইনা কইব কী ?

শম্ভু বলিল, হোসেন মিয়া শুনব ক্যান ?

বলিয়া শম্ভু হাসিল। দাঁড় উঁচু করিয়া রাখিয়া বুক চিতাইয়া বলিল, ডরাও নাকি হোসেন মিয়ারে কুবির, আঁই ?

কুবেরের পরিচয় এতক্ষণে ওরা পাইয়া গিয়াছে, সর্দার বলিয়া আর মানিবে না, বন্ধুর মতো সমানভাবে কথা কহিবে। কুবের বড়ো বিমর্ষ হইয়া যায়। কত বড়ো পদটা হোসেন মিয়া তাহাকে দিয়া গিয়াছে, ইতিমধ্যে সে তার পদমর্যাদা হারাইয়া বসিল ! প্রথম প্রথম ওরা যখন খাতির করিয়া ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিল তখন একটু দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিলে ভালো হইত। গণেশটা পর্যন্ত ওদের সঙ্গে মিলিয়া তার সঙ্গে ইয়ার্কি জুড়িয়া দিয়াছে।

কড়া কথা বলিবে নাকি ? ভয় দেখাইবে ? ওরা অবশ্য চটিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাতে কী আসিয়া যায় তার ! স্বয়ং হোসেন মিয়ার সে নির্বাচিত প্রতিনিধি ! তবু জোর করিয়া কুবের কিছু বলিতে পারে না। যেটুকু সে বলে সকলে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, নৌকা অগ্রসর হয় মন্থরগতিতে।

আমিনবাড়ি পৌঁছিতে বিকাল হইয়া গেল। গিরিধারী সাহার দোকানে খবর দেওয়া হইল বটে কিন্তু সেদিন মাল খালাস করিতে কেহ আসিল না। রাত্রে হোটেলে খাইয়া কুবের নৌকায় শুইয়া রহিল, শম্ভু ও বগার সঙ্গে শহরে গিয়া গণেশ যে কোথায় রাত কাটাইয়া আসিল, সকালবেলা বারবার জিজ্ঞাসা করিয়াও কিছু জানা গেল না, রহস্য করিয়া তিনজনে তাহারা হাসিতে লাগিল। মনে মনে বড়ো রাগিয়া গেল কুবের। এ কী তামাশা জুড়িয়াছে গণেশ তার সঙ্গে? আজীবন যে নির্ভরশীল বোকা লোকটা তাহার তোষামোদ করিয়া আসিয়াছে, সঙ্গদোষে একদিনে সে এমনভাবে বিগড়াইয়া গেল?

একটু বেলায় দোকানের লোক আসিয়া মাল লইয়া গেল। কুবের অবিলম্বে নৌকা ছাড়িল। কেতুপুরের কাছাকাছি আসিয়া দূর হইতে দেখিতে পাওয়া গেল, ঘাটে হোসেন মিয়ার সবচেয়ে বড়ো নৌকাটি বাঁধা রহিয়াছে। দেখিয়া কুবেরের মুখ শুকাইয়া গেল। এত দেরি করার জন্য না জানি হোসেন মিয়া তাহাকে কী বলিবে। শম্ভু এবং বগাও হঠাৎ অত্যন্ত বাধ্য ও কর্মঠ হইয়া গেল, ঘাটের কাছে আসিয়া দাঁড় পড়িতে লাগিল ঝপাঝপ, গতি বাড়িয়া গেল নৌকার।

হোসেন মিয়া নৌকার সামনে বসিয়া তামাক টানিতেছিল, ছইয়ের মধ্যে জড়োসড়ো হইয়া বসিয়াছিল একটি নগ্নদেহ বছর চল্লিশ বয়সের পুরুষ দুটি মাঝবয়সি রমণী ও তিনটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। দেখিয়া মনে হয় একটি মুসলমান পরিবার। কুবের ওদের চিনিতে পারিল না। হোসেন মিয়ার আত্মীয়স্বজন যে নয় সহজেই টের পাওয়া যায় ময়লা ছেঁড়া কাপড় ওদের পরনে, শীর্ণদেহে শুষ্ক মুখে দারিদ্র্যের সুপরিচিত ছাপ।

ভয়ে ভয়ে কুবের হোসেন মিয়ার মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু হোসেন মিয়া এতটুকু বিরক্তির লক্ষণ দেখায় না, দাড়িতে হাত বুলাইয়া একবার শুধু জিজ্ঞাসা করে, মাল খালাস দিছ?

কুবের রসিদটা তার হাতে দেয়। তারপর এক টাকা দশ আনা পয়সা ফিরাইয়া দিয়া বলে যে খাইখরচ বাবদ এক টাকা ছ আনা লাগিয়াছে। বলিয়া তাড়াতাড়ি হিসাবও সে দাখিল করিতে আরম্ভ করে। বেশি নয়, তিনটি টাকা হইতে দুআনা পয়সা মোটে সে চুরি করিয়াছে, তবু বুকের মধ্যে তাহার টিপটিপ করিতে থাকে। হোসেন মৃদু মৃদু হাসে, বলে, রও মিয়া, রও, হিসাব দিবানে পরে।

সেদিন ছুটি।

পরদিন আবার পাড়ি দিতে হইবে।

এবার কাছাকাছি কোথাও নয়, একেবারে সেই চাঁদপুর ছাড়াইয়া মেঘনার মোহনার দিকে। গন্তব্য স্থানটি ঠিক কোথায় হোসেন ভাঙিয়া বলিল না। কুবেরের প্রশ্নে মৃদু মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, ব্যস্ততা কীসের? চাঁদপুর গিয়া কুবের নোঙর ফেলুক, ঠিক সময় সেখানে হাজির হইয়া হোসেন স্বয়ং নৌকার ভার নিবে, বলিয়া দিবে কোন পথে চলিবে নৌকা, কোথায় গিয়া শেষ হইবে যাত্রা।

এবার মাল নয়, মানুষ যাত্রী। হোসেনের নৌকায় যে মুসলমান পরিবারটি আসিয়াছে, তারা।

কুবের ও গণেশ কতদিনে বাড়ি ফিরিতে পারিবে বলা যায় না। বাড়িতে খরচ দিয়া যাওয়ার জন্য হোসেন দুজনকে পাঁচটি করিয়া টাকা দিল।

বাড়ির পথে গণেশের সঙ্গে কুবের কথা বলিল না। রাগে সে চটিয়াছে গণেশের উপর। গণেশ সঙ্গে সঙ্গে চলে, একথা সেকথা বলে, কুবের নীরব হইয়া থাকে, মুখ ফিরাইয়া চাহিয়াও দ্যাখে না। গণেশের কিনা মোটাবুদ্ধি, কুবের যে রাগিয়াছে এটা সে টের পাইল একেবারে বাড়ির কাছাকাছি গিয়া।

টের পাইবামাত্র সে বিবর্ণ হইয়া বলিল, গোসা করছ নাকি কুবিরদা?

কুবের বলিল, যা যা বাড়িত যা, বাজে বকস ক্যান?

বলিয়া সে হনহন করিয়া আগাইয়া গেল। গণেশ ক্ষুধার তাড়নায় তখনকার মতো বাড়ি গেল বটে, ভাতটি খাইয়াই সে আবার হাজির হইল কুবেরের বাড়িতে। কুবের কথা কয় না, চাহিয়াও

দ্যাখে না। গণেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া তামাক সাজিয়া নিজে দুটো একটা টান দিয়াই কুবেরের দিকে বাড়াইয়া দিল, বলিল, ধর কুবিরদা।

কুবের হুঁকা গ্রহণ করিল। তবু সে কথা বলিল না !

বিপদে পড়িয়া গণেশ প্রায় কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল, কিবা কর কুবিরদা, আঁই ? যামু গিয়া কইলাম, আর আমু না !

তখন তাহাকে ক্ষমা করিয়া কুবের জিজ্ঞাসা করিল, কাইল রাইতে ছিলি কই ?

প্রশ্ন শুনিয়াই গণেশ হাসিয়া ফেলিল, ফিসফিস করিয়া বলিল, বাক্যা মাইয়া কুবিরদা, কিবা গীত কয় !

বলিয়া সে গুনগুন করিয়া গান ধরিল—

পিরিত কইরা জ্বইলা মলাম সই, আ লো সই !
আওন যাওন সমান সোনার, জউলা চুকা দই !
আ লো সই।
থাকলি ঘরে ছ্যাচন কেমন, ঢেঁকির তলে চিড়া যেমন,
বিদেশ গেলি মনের পোড়ন ভাইজা কবে খই !
আ লো সই !

কুবের বলিল, দূর দূর লক্ষ্মীছাড়া ! কুচরিত্তির হইছস, আঁই ? ক্যান গেছিলি ?

গণেশ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কুচরিত্তির কিবা ? গীত শোননে দোষ নাই।

ঠিক বেড়ার আড়ালে মালা বুঝি শুনিতেছিল, ডাকিয়া বলিল, আবার কও গীতখান—শুনছ মাঝি ? আবার কও।

কুবের ধমক দিয়া বলিল, চুপ থাক, গীত শুইনা কাম নাই।

খানিক পরে চাঁদপুর যাত্রার কথা উঠিল। আড়াল ছাড়িয়া হাতের ভঁরে ঘষিয়া ঘষিয়া মালা এবার আসিল কাছে। মুসলমান পরিবারটিকে হোসেন মিয়া কোথায় লইয়া যাইবে অনুমান করিতে কারও বাকি থাকে নাই, কে জানে কোন গ্রাম হইতে ওদের হোসেন সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে ! কেহ কুপরামর্শ দিবে ভাবিয়া নৌকা হইতে ওদের সে গ্রামে নামিতে পর্যন্ত দেয় নাই। মানুষটি সহজ নয় হোসেন মিয়া ! মরুক, তাদের কী ? তারা মাঝি, পয়সা দিয়া যে লগি ঠেলিতে বলিবে তারই হুকুম মানিয়া নৌকা ভাসাইবে পদ্মায়, মানুষ না মাল কী আছে নৌকায় তাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই !

বিকালের দিকে গণেশের খোঁজে উলুপী আসিল, বলিল, যুগল আসিয়াছে। কী খবর যুগলের ? সাতদিন পরে তাহার বিবাহ। চার কুড়ি টাকা পণ দিয়া সোনাখালির এক রূপসি কন্যাকে সে ঘরে আনিতেছে। ভালো কথা। আনুক ! কুবেরের কী ? আশ্বিনের ঝড়ে সব আশা-ভরসা তাহার উড়িয়া গিয়াছে। চার কুড়ি টাকা ! চার কুড়ি টাকার ভাগ্যই যদি তার থাকিবে, পরের নৌকায় মাছ ধরিয়া লগি ঠেলিয়া সে মরিবে কেন আজীবন !

উলুপী আপশোশ করিয়া বলে, যে কপাল গোপির ! একটা বছর সবুর সহিল না মেয়ের, ঠ্যাং ভাঙিয়া খোঁড়া হইয়া রহিল। কত পাপ করিয়াছিল আর জন্মে কে জানে !

কুবের বলিল, ক্যান, যুগাইলা বিনা মানুষ নাই দ্যাশে ?

উলুপী একটা অদ্ভুত শব্দ করিয়া বলিল, কেডা নিব খোঁড়া মাইয়ারে ?

কুবের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে উলুপীর দিকে চাহিল, কিছু বলিল না।

রাত্রে সেদিন হঠাৎ আবার গোপির হাঁটু ব্যথা করিতে লাগিল। মেয়ে কী সহজে নিষ্কৃতি দিবে সকলকে ! ওর যে কুক্ষণে জন্ম হইয়াছিল। ভোর ভোর কুবের যখন বাড়ির বাহির হইল,

গোপি যাতনায় কাঁদিতেছে। বসিয়া থাকিবার উপায় কুবেরের ছিল না। বেলা হইলে তামাক পাতা নিয়া গোপির হাঁটুতে জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে বলিয়া, পথে গণেশকে হাঁক দিয়া, বিরস চিত্তে সে নদীতীরে গেল।

তখনও হোসেন ঘাটে আসে নাই। শম্ভু ও বগা সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া হাই তুলিতেছে। ছইয়ের মধ্যে মুসলমান পরিবারটি তেমনি জড়োসড়ো হইয়া বসিয়া আছে। রাত্রে কী ওরা ঘুমায় নাই ? আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া আর একজন কে বসিয়া আছে নৌকায়, কাপড়ের পুঁটুলিটা রাখিতে নৌকায় উঠিয়া কুবের তাহাকে চিনিতে পারিল। আমিনুদ্দি।

আমাগো লগে যাইবা নাকি আমিনুদ্দি বাই ? কুবের জিজ্ঞাসা করিল।

হ।

মাইয়া কান্দে না ?

আমিনুদ্দি সায় দিল, হ। কান্দে।

দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হইবে, নৌকাব দড়ি কাছি লগি ও দাঁড়গুলি কুবেব পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তক্তা তুলিয়া ভিতরে কতখানি জল উঠিয়াছে মাপিল। কিছু জ্বালানি কাঠ, তামাক ও নারিকেলেব ছোবড়া, চাল, ডাল, তেল, নুন, পিতলের দুটা হাঁড়ি, দুটা লোহাব কড়াই, কয়েকখানা কাঁসি কাল সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল, এ সমস্তেব তদাবকও কুবেব কবিল। কুবেবের দায়িত্ব কি কম ! এত বড়ো অভিযানের সে পরিচালক !

তদাবক শেষ করিয়া কুবের বসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল, লক্ষ করিতে লাগিল ছইযেব ভিতরেব পবিবারটিকে। কী মনমরাই ওদের দেখাইতেছে সকালবেলার ম্লান আলোকে। কারও মুখে কথা নাই, কী যেন ভাবিতেছে সকলে, ভীত ও স্তব্ধ ছেলেমেয়েগুলির পর্যন্ত এতটুকু সাড়া নাই জীবনেব ! গ্রাম ছাড়িয়া দেশ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রার গভীর বিষাদ ওদের আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে।

খানিক দেখিয়া কুবেব পুবুষটিকে জিজ্ঞাসা কবিল, নাম কী মিয়া ?

সে মৃদুস্বরে বলিল, বসুল।

বাড়ি কই ?

মালুর চব।

কথা বলিতে তাহাব ভালো লাগিতেছে না বুঝিতে পাবিয়া কুবেব চুপ করিয়া গেল।

হোসেন মিয়া আসিতে আসিতে চারিদিক আলো হইয়া উঠিল। ততক্ষণে জেলেপাড়াব অনেকে ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, উলুপী আসিয়াছে কলসি কাঁখে, স্বামীকে বিদায দিয়া সে কলসি ভরিয়া বাড়ি ফিরিবে। লখা ও চণ্ডী আসিযাই কুবেরের কাছে একটা কবিয়া পয়সা দাবি কবিয়াছিল, না পাইয়া তাহাবা মুখ গোঁজ করিয়া আছে, বিদায় নেওয়ার সময় বাপেব কাছে এতখানি নিষ্ঠুবতা তাহারা প্রত্যাশা করে নাই। রাসুও আসিয়া নৌকায় উঠিয়া বসিয়াছে। এমনিভাবে একদিন সকালবেলা সে ময়নাদ্বীপের উদ্দেশে বওনা হইয়াছিল। কিন্তু সে কথা বাসুর বুঝি আজ মনে নাই। নির্বিকার চিত্তে সে হোসেন মিয়ার নিকট বিড়ি চাহিয়া ধূমপান করে, যাচিয়া কুবেরকে বারবাব শোনায় যে কুবেরের চিন্তার কারণ নাই, তাহার অনুপস্থিতির সময় সকলের দেখাশোনা সেই কবিবে। কবে ফিরবা মাঝি ? ঠিক নাই ? তা হোক, রাসু যখন গ্রামে বহিল, বাড়ির জন্য কীসের ভাবনা কুবেরের ?

এবার নৌকা খুলিলেই হয়। কুবেরকে পথখরচের জন্য টাকা দিয়া হোসেন নামিয়া গেল। টাকার পরিমাণটা কুবেরকে অবাক করিয়া দিল—কী দরাজ হাত হোসেন মিয়ার ! ভয়ও কুবেরের হইল বইকী ! এতগুলি টাকা সামলাইয়া রাখা, হিসাব কবিয়া খরচ করা, সে বড়ো সহজ কর্মভোগ নয়। সবচেয়ে অস্বস্তির কথা, টাকাটা হাতে আসিবা মাত্র তাহার ভাবিতে ইচ্ছা হইতেছে তিন টাকায় যদি দুআনা বাঁচানো যায় নিজের জন্য, চেষ্টা করিলে এতগুলি টাকা হইতে না জানি কত বাঁচানো

চলে ! কাল হইতে এই কথাই সে থাকিয়া থাকিয়া ভাবিতেছিল বটে, ভাবিতেছিল কত টাকা হোসেন এবার তাহার হাতে দিবে,—পথখরচের টাকাটা অন্য কারও জিম্মায় হোসেন এবার দিবে কিনা এ আশঙ্কাও তাহার ছিল না এমন নয়। আজ টাকাটা পাইয়া সে খানিকক্ষণ অভিভূত হইয়া রহিল। এতখানি বিশ্বাস হোসেন তাহাকে করে ? হোসেন মিয়ার মতো মানুষকেও ফাঁকি দিতে পারিয়াছে ভাবিয়া একটু গর্বও কুবেরের হয়, না লোকটা সর্বশক্তিমান নয়।

কুবের তো জানিত না যে তিন টাকায় দুআনার বেশি ফাঁকি দিবার সাহস তাহার নাই বলিয়াই হোসেন তাহাকে বিশ্বাস করে ! পাঁচটা টাকা কুবের কোনোদিন চুরি করিতে পারিবে না। শুধু সাহসের অভাবে নয়, দুআনার বেলায় যে বিবেক তাহার চুপ করিয়া থাকে পাঁচ টাকার বেলায় তাহাই গর্জন করিয়া উঠিবে।

টাকাগুলি কোমরে বাঁধিয়া কুবের লখা ও চণ্ডীর দিকে চাহিল। তারপর দুটা পয়সা সে ছুঁড়িয়া দিল ছেলেদের দিকে। পয়সা দুটা কুড়াইয়া নিয়া দুজনে চোখের পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এমন সময়ে দেখা গেল আলুথালু বেশে একটি মেয়ে ঘাটের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। নৌকার উপর আমিনুদ্দি চঞ্চল হইয়া উঠিল। হোসেন বলিল, নাও খোলো কুবির।

খোঁটা হইতে নৌকার দড়ি খুলিয়া শম্ভু হাতে ধরিয়া রাখিয়াছিল, সে লাফাইয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িল। আমিনুদ্দির মেয়ে যখন ঘাটে একেবারে জলের কিনারা পর্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, নৌকা তফাতে সরিয়া গিয়াছে। বাপজান, বাপজান বলিয়া আকুল হইয়া মেয়েটা কাঁদিতে লাগিল, নদীতে বুঝি সে ঝাঁপই দিয়া বসে। উলুপী ছাড়া ঘাটে স্ত্রীলোক নাই যে ওকে ধরিবে। উলুপী কলসি কাঁখে জল নিতে আসিয়াছে, আমিনুদ্দির মেয়েকে তাহার ছুঁইবার উপায় নাই। কিন্তু এখন সে কথা ভাবিবার সময় নয়। সে-ই মেয়েটাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিল। আমিনুদ্দি হাঁকিয়া হাঁকিয়া মেয়েকে বলিতে লাগিল, সে ফিরিয়া আসিবে, দুদিন পরে নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে।

মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছিল। শম্ভু ও বগা বাদাম তুলিয়া দিল। তারপর কেতুপুরের ঘাট দূর হইতে দূরে সরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কুবের আমিনুদ্দির কাছে আসিয়া বলিল, মাইয়াঁরে কইয়া আস নাই ?

আমিনুদ্দি মাথা নাড়িল।

দাঁড় বাহিবার প্রয়োজন ছিল না, আস্তে আস্তে বাতাসের জোর বাড়িয়াছে, বাদাম উঠিয়াছে ফুলিয়া। কুবের এবার নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নিজের রাজ্যপাট ও প্রজাপুঞ্জের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। রাজ্য প্রকাণ্ড, বসিবার শুইবার স্থানাভাব নাই, শুধু প্রজারা বড়ো অসুখী। মাঝবয়সি রমণীটি, পরিচয় নিয়া কুবের জানিতে পারিল রসুলের সে বোন, যাত্রার আগেই মৃদুস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কত গ্রাম তাহারা পার হইয়া আসিয়াছে, এখনও থাকিয়া থাকিয়া সে চোখ মুছিতেছে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। কুবের সকলকে জলখাবার বণ্টন করিয়া দিল। বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় মনটা খারাপ হইয়াছিল, এখন মন্দ লাগিতেছে না কুবেরের। নদীকে সে বড়ো ভালোবাসে, নদীর বুকে ভাসিয়া চলার মতো সুখ আর নাই। একে একে কতকগুলি লঞ্চ ও স্টিমার দুদিক হইতে ঢেউ তুলিয়া আসিয়া আগাইয়া যায়, সম্মুখের বোঝাই নৌকাগুলি পড়ে পিছনে। কোথাও নদীর একটি ছাড়া তটরেখা নাই, কোথাও অপর তীরের গাছপালা অস্পষ্ট চোখে পড়ে। কাউয়াচিলা পাখিগুলি ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, বকেরা এখন একক শিকারী, সন্ধ্যায় ঝাঁক বাঁধিবে। স্টিমার, নৌকা, ভাসমান কচুরিপানা, আকাশের পাখি ও মেঘ সব ভাসিয়া চলিয়াছে,—তীরের দিকে চাহিয়া মনে হয় জলের সীমায় মাটির তীরভূমিও বুঝি লঘু গতিতে চলিয়াছে পিছনে।

তবু নদী ছাড়া সবই বাহুল্য। আকাশের রঙিন মেঘ ও ভাসমান পাখি, ভাঙন-ধরা তীরে শুভ্র কাশ ও শ্যামল তরু, নদীর বুকে জীবনের সঞ্চালন, এ সব কিছুই যদি না থাকে, শুধু এই বিশাল একাভিমুখী জলস্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালোবাসিবে সারাজীবন। মানবী প্রিয়ার যৌবন চলিয়া

যায়, পদ্মা তো চিরযৌবনা। বৈচিত্র্য ? কী তাব প্রয়োজন ? নূতন পৃথিবী কে খোঁজে, কে চায় পদ্মার রূপের পরিবর্তন, শুধু ভাসিয়া চলার অতিরিক্ত মোহ ?

সকালবেলা সুবাতাস ছিল, তারপর বাতাস দিক পরিবর্তন করিল। বিশেষ কিছু অসুবিধা তাহাতে হইল না। দাঁড় টানিতে কোনো কষ্ট নাই। নদীর স্রোতই নৌকা ঠেলিয়া নিয়া চলিয়াছে, ফিরিবার সময় উজান ঠেলিয়া আসিতে প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে বটে, এখন আরামেব অন্ত নাই।

মধ্যাহ্নে নৌকা ভিড়াইয়া রান্নার আয়োজন কবা হইল। দুটি উনান খুঁড়িয়া দুইটি হাঁড়িতে চাপানো হইল ভাত, কাছের এক গ্রামে তরিতরকারি মিলিল। নিজেদের জন্য রাঁধিবার ভারটা কুবেরের উপরেই পড়িয়াছিল, অদূরে রন্ধনরতা রসুলের বোন নছিবনকে দেখিতে দেখিতে কুবেব মনে মনে একটু আপশোশ করিল। ভাবিল, কী ক্ষতি মুসলমানের রান্না খাইলে ? ডাঙার গ্রামে যাহারা মাটি ছানিয়া জীবিকা অর্জন করে তাহাদের মধ্যে ধর্মের পার্থক্য থাক, পদ্মানদীব মাঝিরা সকলে একধর্মী। গণেশ, শম্ভু ও বগা সঙ্গে না থাকিলে কুবের তো নিজেব জন্যে রাঁধিতে বসিত না।

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার নৌকা চলিল। রাত্রি দশটার সময় একেবারে নদীর কিনারায় সুষুপ্ত একখানি গ্রামের পাশে সেদিনকাব মতো স্থগিত করা হইল যাত্রা।

তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে পাওয়া গেল পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গম। নদী এখানে সাগরেব মতোই পারাপারহীন। সন্ধ্যার দেরি নাই দেখিয়া কুবের সেদিন নৌকা বাঁধিল, এদিকে সে আগেও আসিয়াছে বটে, কিন্তু নদী ভালো করিয়া চেনা নয়, সন্ধ্যাব পব নৌকা চালাইতে সে সাহস কবিল না।

পরদিন চাঁদপুরে নৌকা ভিড়িল।

ভালোয় ভালোয় এতখানি পথ আসিয়া কুবেরের মনে আনন্দ ধরে না। এবাব হোসেন মিয়া আসিয়া পড়িলেই সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারে। জাহাজঘাটে স্টিমাব ভিড়িলে কুবের গিয়া যাত্রীদের অবরোহণ পথটির মুখে দাঁড়াইয়া থাকে, মোটঘাট লইয়া দেশবিদেশেব কত নবনারী তাহাব সামনে দিয়া রেল স্টেশনের দিকে চলিয়া যায়, কুবেরের উৎসুক দৃষ্টি অনুসন্ধান করে হোসেনকে। সমস্ত যাত্রী নামিয়া আসিবাব পরেও সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে।

হোসেন আসিল তিনদিন পরে রাত্রের স্টিমারে।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে কুবের চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, হোসেনকে দেখিবামাত্র সমস্ত চাঞ্চল্য তাহাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। নির্ভয় নিশ্চিন্ত রহস্যময় সদানন্দ মানুষটির সাহচর্যে মুহূর্তে সকল উত্তেজনা জুড়াইয়া যায়,—কঠিন কর্তব্য সম্পন্ন কবার গর্ব, আগামী কর্তব্য সম্পাদনের দুর্ভাবনা কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। তাই বটে। ভালোয় ভালোয় কুবের চাঁদপুর আসিয়া পৌঁছিতে না পারিলেও কিছুই আসিয়া যাইত না বটে হোসেনেব !—মৃদু মৃদু হাসিয়া সে বলিত, দরিয়ায় চুবাইয়া আইছ নাও ? ভালা করছ কুবির বাই !

হোসেন নৌকায় আসিয়া বসিল। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া রহিল, ছইয়েব মধ্যে নছিবন ও রসুলের স্ত্রী ঘোমটার ভিতর হইতে চাহিতে লাগিল—হোসেনকে দেখিয়াই তাহারা ঘোমটা দিয়াছে।

মৃদু মৃদু হাসে হোসেন, সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করে; দাড়ি মুঠা করিয়া ধরিয়া সকৌতুকে রসুলের ছ বছরের মেয়েটাকে বিবিজান বলিয়া ডাকে। আমিনুদ্দি মেয়েব খবর জিজ্ঞাসা করিলে বলে তাহাকে সে বহাল তবিয়তে ঘরের কাজ করিতে দেখিয়া আসিয়াছে, দুশমন বলিয়া গাল দিয়া হোসেনকে সে নাকি কড়া কড়া কথা বলিয়াছে অনেক।

আমিনুদ্দির চোখ ছলছল করে। সে বলে, আল্লা জানে মিয়া, আব ফিরা্য আমু না ভাবলি মনডা পোড়ায়।

হোসেন বলে, ফিরনের মন থাকলি কও মিয়া অখন, জাহাজে তুইলা দিই তোমারে কাইল। খুশ না হলি ক্যান যাবা ?

আমিনুদ্দি নীরবে মাথা নাড়ে।

হোসেন বলে, তবে কাইল তোমাগো নিকা সারি ?

আমিনুদ্দি বিস্মিত হইয়া বলে, কাইল ক্যান ? ময়নাদ্বীপি দিবা—দুইমাস বাদ।

হোসেন বলে, ময়নাদ্বীপি মোল্লা পামু কই ? রাজবাড়ির আজীজ ছাহাব কন, ময়নাদ্বীপি শও জনা মানুষ হলি আর মসজিদ দিলি আর হিঁদুরে জমিন না দিলি গিয়া থাকতি পারেন। তা পারুম না মিয়া। হিঁদু না নিলি মানুষ পামু কই ? হিঁদু নিলি মসজিদ দিমু না। ক্যামনে দিমু কও ? মুসলমানে মসজিদ দিলি, হিঁদু দিব ঠাহুরঘর—না মিয়া, আমার দ্বীপির মদ্যি ও কাম চলব না।

সকলে অভিভূত হইয়া শোনে। হোসেনের মুখে ময়নাদ্বীপের কথা কুবের কখনও শোনে নাই, আজ হোসেন বলিতে থাকে ওই দ্বীপটির জন্য তার কত দরদ। নিলামে দ্বীপটি কিনিবার পর ওখানে জনপদ বসানোর স্বপ্ন দেখিতেছে সে, জীবনে আর তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই, কামনা নাই,—হাজার দেড়েক মানুষ ওখানে চলাফেরা করিতেছে, এক বিঘা জমিও দ্বীপের কোনোখানে অকর্ষিত নাই, মরিবার আগে এইটুকু শুধু সে দেখিয়া যাইতে চায়। কত অর্থ ও সময় সে ব্যয় করিয়াছে দ্বীপের পিছনে ! ময়নাদ্বীপের নেশা পাইয়া না বসিলে আজ তো সে বড়োলোক—একসঙ্গে তাহার এতগুলি লাভবান ব্যাবসা দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে ভাবিতে বসিলে আল্লার করুণার পরিচয়ে মাথা নত হইয়া আসে। হ, ময়নাদ্বীপ ব্যাপিয়া একদিন মানুষের জীবনের প্রবাহ বহিবে বলিয়া যে কাজে হোসেন হাত দেয় সেই কাজ খোদাতালা সফল করিয়া দেন। টাকা না থাকিলে সে পারিবে কেন এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করিতে ?

কী কও রসুল, নিকা সারি কাইল ?

রসুল সায় দিয়া বলে, আমি কী কমু মিয়া, যা মন লয় করেন।

হোসেন বলে, বইন কী কয়, জিগাও।

রসুল ছইয়ের মধ্যে গিয়া খানিক পরামর্শ করিয়া আসে। নছিবনের মত আছে। আমিনুদ্দি নিঃশব্দে বসিয়া থাকে। আপন মনে কী যেন সে ভাবিতে থাকে বন্দরের আলোকমালার দিকে চাহিয়া। কুবের সবিস্ময়ে হোসেনের প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গি লক্ষ করে। কী প্রতিভা লোকটার, কী মনের জোর ! যেখানে যত ভাঙাচোরা মানুষ পায় কুড়াইয়া নিয়া জোড়াতালি দিয়া নিজের দ্বীপে রাজ্য স্থাপন করিতেছে—প্রজাবৃদ্ধির ব্যবস্থার দিকে তাহার সজাগ দৃষ্টি ! হোসেনের উদ্দেশ্যই হয়তো তাই, আমিনুদ্দির মতো জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হতাশ ও নিরুৎসাহ মানুষগুলিকে আসলে তাহার প্রয়োজন নাই, ওরা তাহার দ্বীপটি যে নবীন নরনারীতে ভরিয়া দিবে, সে তাহাদেরই প্রতীক্ষা করিয়া আছে !

অনেক রাত্রে হোসেন বিদায় গ্রহণ করিল। নৌকায় তখন জল্পনা-কল্পনার অন্ত রহিল না। প্রথম বিস্ময়টা কাটিয়া যাওয়ার পর আমিনুদ্দির সঙ্গে সকলে হাস্য-পরিহাস জুড়িয়া দিল। ঠাট্টা করিতে বড়ো মজবুত শম্ভু। তার এক একটা কথায় নৌকায় হাসির কলরব উঠিতে লাগিল, ছইয়ের মধ্যে রমণী দুটি পর্যন্ত মাঝে মাঝে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মুখে কাপড় চাপা দিতে লাগিল।

পরদিন আমিনুদ্দির সঙ্গে নছিবনের নিকা হইয়া গেল। তার পরের দিন কতকগুলি চাষের যন্ত্রপাতি, তিন চার বস্তা আলু, এক পিপা সরিষার তৈল, কাঠের একটা বাক্সো বোঝাই নুন, কতকগুলি সস্তা বিলাতি কম্বল, এক বস্তা কাপড় জামা এই সব অজস্র জিনিসপত্রে হোসেন নৌকা বোঝাই করিয়া ফেলিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে বলিল, নাও খোলো কুবির বাই।

কোনদিক যামু মিয়া বাই ?

হোসেন বলিল, সমুন্দুর !

সারাদিন এই তীর ঘেঁষিয়া নৌকা চলিল। কেতুপুরের পদ্মায় যে নৌকাকে অত্যন্ত বৃহৎ মনে হইয়াছিল, এখন সেটিকে কুবেরের মোচার খোলা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পরদিন অপরাহ্নে নোয়াখালি জেলার নারিকেল বৃক্ষপূর্ণ তীরভূমিতে নৌকা বাঁধা হইল। এদিকে কুবের কখনও আসে নাই, বিস্ময়ের সঙ্গে সে হোসেনকে জিজ্ঞাসা করিল, এই কি সমুন্দুর ? হোসেন একখানা ম্যাপ বাহির করিল। আঙুল দিয়া সে কুবেরকে চিনাইয়া দিতে লাগিল মেঘনার মোহানার দ্বীপগুলি—সিদ্ধিদ্বীপ, বিদৌদ্বীপ, সন্দ্বীপ, হাতিয়া প্রভৃতি। আরও পশ্চিমে মানপুরদ্বীপ, দক্ষিণ-শারাজপুর, বন্দোরাদ্বীপ। আর ওই যে ছোটো ছোটো বিন্দুগুলি দেখা যায় বাইশ নম্বর মোটা লাইনটার উপরে, ওগুলি মানিক দ্বীপপুঞ্জ। চিনিতে পারিতেছে কুবের ? আর ওই পুব-পশ্চিমের বাইশ নম্বর লাইন আর উত্তর-দক্ষিণের এই একানব্বই নম্বর লাইনটা যে বিন্দুতে পরস্পরকে অতিক্রম কবিয়াছে, এই বিন্দুটির কিছু উত্তর-পূর্বে ওই যে একটি সবুজ বিন্দু দেখা যায় ওর নাম ময়নাদ্বীপ। জানে কুবের,—ওরই নাম ময়নাদ্বীপ ! আব ঘণ্টা দশেক নৌকা বাহিয়া তাহারা নোয়াখালির তীরভূমিকে পিছনে ফেলিবে, তারপর হাতিয়া ডাইনে রাখিয়া ধনমানিক দ্বীপ ছুঁইয়া, ধনমানিক দ্বীপ আর রাবনাবাদ দ্বীপের যোগবেখার সঙ্গে বিয়াল্লিশ ডিগ্রি কোণ করিয়া পূর্ব-দক্ষিণে নৌকা বাহিলে একদিনে ময়নাদ্বীপে পৌঁছানো যাইবে।

কুবের ভালো বুঝিতে পারে না। হাঁ কবিয়া নকশাব বেখা ও লেখাগুলির দিকে চাহিয়া থাকে। কে জানে ওর মধ্যে মধ্যে ডাঙা ও জলেব পার্থক্য কী কৌশলে আঁকা আছে, সে তো কোনো প্রভেদ বুঝিতে পাবে না !

হোসেন মিয়া যে কত বড়ো দক্ষ নাবিক, দিকচিহ্নহীন সমুদ্রের বুকে তাহার নৌকা পরিচালনা দেখিয়াই তাহা বোঝা গেল। সামনে একটা কম্পাস রাখিয়া সে হাল ধবিয়া বসিল, নৌকার ছয়জন মাঝি টানিতে লাগিল দাঁড়। সাবাদিন পরে রক্তিম সূর্য সমুদ্রেব জলে ডুবিয়া গেল, পুবে বহুদূরে কালো বিন্দুব মতো একটি দ্বীপ ছাড়া সূর্য শুধু দেখাইয়া গেল আকাশ ও জলরাশি। রাত্রেও দাঁড় টানার বিবাম হইল না, পালা কবিয়া দুজন দুজন মাঝিকে দুঘণ্টা কবিয়া ঘুমানোব অবসর দিয়া চারজনকে হোসেন সবসময়ে বসাইয়া বাখিল দাঁড়ে, নিজে এক মিনিটেব জন্যও চোখ বুজিল না। নৌকাব সকলে হয়রান হইয়া গেল, কুবেরেব মনে হইতে লাগিল নৌকা বাহিয়া জীবনে সে আর কোনোদিন এত শ্রান্ত হইযা পড়ে নাই।

সকালবেলা দেখা গেল চাবিদিক নিবিড় কুয়াশায ঢাকিয়া গিয়াছে।

হোসেন বলিল, বইঠা থোও কুবিব, নোঙর ফেলো।

এতখানি কাছি টানিয়া নোঙব সমুদ্রের তলে গিয়া ঠেকিল যে কুবেরেব মনে হইল নোঙরটা পাতালে গিয়া পৌঁছিযাছে। কুয়াশায় নৌকা চালাইবার উপায় নাই, ধনমানিক দ্বীপের কাছাকাছি তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে, কুয়াশায় দেখিতে না পাইযা পাশ কাটাইয়া দূবে চলিয়া গেলে বিপদ হইবে ; এই দ্বীপটির অবস্থান দেখিয়া তবে ঠিক কবা যাইবে বাবনাবাদ দ্বীপের সঙ্গে ইহার যোগরেখা, তারপব সোজা আগানো চলিবে কম্পাসের উপর নির্ভর করিয়া একেবারে ময়নাদ্বীপের দিকে। সারাদিন নৌকার অবস্থান বুঝিতে পাবা যাইবে কি না সন্দেহ। অপেক্ষা করিতে হইবে রাত্রির জন্য। রাত্রে তারা উঠিলে ওই যে অদ্ভুত যন্ত্রটা আছে হোসেনের, ওই যন্ত্রের ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া তবে হোসেন বলিতে পারিবে যে কোনদিকে কতদূরে ধনমানিক দ্বীপ লুকাইয়া আছে।

কি জান মিয়া, কলের জাহাজ হলি, জানন যায় কত জোর চলতেছি, ঘণ্টায় কয় মাইল আলাম—-সমুদ্দুরের কোনখানে রইছি হিসাব করলি মেলে। নাও চালাইয়া জানুম কিবা ?—দাড়িতে হাত বুলায় হোসেন, সকলকে অভয় দিয়া আবার বলে, ডরাইও না, দশ বাজলি কুয়াশা থাকবো না। আইজ কাইল রোজ বিহানবেলা কুয়াশা হয়। অ্যাবে কি কুয়াশা কয় মাঝি ?

বসিয়া বসিয়া হোসেন গল্প বলে, সকলে শোনে। এ যেন কেতুপুরেরই এক ভাঙা কুটিরে হোসেনের আড্ডা বসিয়াছে। এমনই কুয়াশার মধ্যে একবার সে সমুদ্রের বুকে হারাইয়া গিয়াছিল, তিনদিন নোঙর ফেলিয়া ছিল সমুদ্রে, জল ফুরাইয়া গিয়া শেষের দিন তৃষ্ণায় ছাতি তাহাদের ফাটিয়া গিয়াছিল। তারপর হোসেন কম্পাস কিনিয়াছে, তারা দেখিয়া নৌকার অবস্থান নির্ণয়ের যন্ত্র কিনিয়াছে,—চাটগাঁয়ে হোসেন যখন জাহাজে কাজ করিত, খালাসির কাজ করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত একটা মালবাহী স্টিমারের বো-সান পর্যন্ত সে হইয়াছিল, সেই সময় এক সাহেব কাপ্তেনের কাছে সে এ সব যন্ত্রের ব্যবহার শিখিয়াছে। বড়ো বড়ো জাহাজ চালাইয়া হোসেন এখন পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পারে !

পৃথিবী সে কি ঘুরিয়া আসে নাই ? হ্, সে কাহিনি বলিবার মতো বটে ! কুড়ি বছর বয়সে হোসেন বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়াছিল, তারপর অর্ধেক জীবন সে তো দেশ-বিদেশে ঘুরিয়াই কাটাইয়াছে—নদীর বুকে ও সমুদ্রে।

অনেক বেলায় আস্তে আস্তে কুয়াশা মিলাইয়া গেল। নোঙর তোলা হইল। দুঘণ্টা পরে দূরে দেখা গেল ধনমানিক দ্বীপ। কম্পাসটা সামনে রাখিয়া হোসেন হাল ধরিয়া বসিল. পরদিন ভোরবেলা তাহারা ময়নাদ্বীপে পৌঁছিয়া নোঙর ফেলিল।

এই ময়নাদ্বীপ ? পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া যে রহস্য-নিকেতনের কথা সে শুনিয়া আসিয়াছে ? কুবের যেন একটিমাত্র দৃষ্টিপাতে সমস্ত দ্বীপটিকে দেখিয়া ফেলিতে চায়। দ্বীপের খানিকটা ডিম্বাকৃতি, খানিকটা ত্রিকোণ। দ্বীপের দীর্ঘতম পরিসর প্রায় এগারো মাইল—হোসেন নিজে মাপিয়া দেখিয়াছে। দ্বীপের যেখানে নৌকা ভিড়িয়াছিল, সেদিকে খানিকটা অংশ পরিষ্কার করিয়া বসতি স্থাপিত হইয়াছে, চাষ হইতেছে, বাকি অংশ জঙ্গলে ঢাকা। পশ্চিম দিকে অসংখ্য নারিকেল গাছ, সমস্ত দ্বীপে ছড়াইয়া না পড়িয়া গাছগুলি একস্থানে ঘন হইয়া মাথা তুলিয়াছে কেন বোঝা যায় না।

জমি অত্যন্ত নিচু, এত নিচু যে আশঙ্কা হয় যেদিন খুশি হইবে সেইদিনই সমস্ত দ্বীপটিকে সমুদ্র গ্রাস করিয়া ফেলিবে। দ্বীপের মাঝখানে এক মাইল পরিমিত একটা লোনা জলা আছে, সমুদ্রের চেয়েও ওখানটা বুঝি নিচু, খাল কাটিয়া যোগ করিয়া দিলে সমুদ্রের জল আসিয়া ভরিয়া ফেলিবে। জলার ধারে খানিকটা ধানের জমি করা হইয়াছে, বিস্ময়কর ফসল ফলে। জলায় ও চারিদিকের জঙ্গলে অসংখ্য সাপ আছে, কিন্তু জন্তুজানোয়ার কিছু নাই, রাসু যে বাঘ সিংহের গল্প করিয়াছিল সেটা নিছক গল্পই।

হোসেন মিয়ার উপনিবেশে লোকসংখ্যা একশোর কম নয়, কিন্তু তার তিন ভাগই প্রায় ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, যাদের অধিকাংশ এই দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ম্যালেরিয়া ও সাপের সঙ্গে লড়াই করিয়া এখনও হোসেন জয়লাভ করিতে পারে নাই, জঙ্গলের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম চলিয়াছে, অনেক খাদ্য এখানে উৎপন্ন করা যায় না, জীবনের অনেক প্রয়োজন মিটাইতে সমুদ্র পথে পাড়ি দিতে হয় সভ্য জগতের দিকে। অবিশ্রাম খাটুনি এখানে, অসংখ্য অসুবিধা এখানে, জীবন এখানে নির্মম ও নীরব। রাসুর মতো অনেকে তাই পালাইয়া গিয়াছে। হোসেনের পাঁচ বছরের চেষ্টায় দ্বীপে তাই ত্রিশটির বেশি পরিবার নীড় বাঁধে নাই। আমিনুদ্দি ও রসুলকে ধরিলে দ্বীপের গৃহস্থ পরিবারের সংখ্যা এবার বত্রিশ হইল মাত্র।

কী কঠিন কাজে হোসেন মিয়া যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, কী সীমাহীন যে তাহার ধৈর্য ও অধ্যবসায়, এবার কুবের তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে পারে। এই নিচু, জলা ও জঙ্গলপূর্ণ মনুষ্যবাসের অযোগ্য দ্বীপ, ধান ছাড়া আর কোনো ফসল যে দ্বীপের লোনা মাটিতে জন্মে না, লাউ কুমড়াগুলি ফলে কুঁকড়ানো শশার মতো ছোটো ছোটো,—এখানে এই মুষ্টিমেয় নরনারীর বসতি স্থাপন করাও হোসেন মিয়া ছাড়া আর কারও দ্বারা সম্ভব হইত না। সন্দ্বীপ, হাতিয়া, ধনমানিক,

রাবনাবাদ এইসব জনপূর্ণ দ্বীপের কথা কুবের শুনিয়াছে, ময়নাদ্বীপ যদি মানুষের বাসের যোগ্য হইত ওই সব দ্বীপের মতো কবে এখানে গড়িয়া উঠিত গ্রাম। এ কী কদর্য একটা দ্বীপ হোসেন বাছিয়া লইয়াছে ?

হয়তো সস্তায় পাইয়াছিল বলিয়া। স্বাস্থ্যকর, উর্বব দ্বীপ কিনিয়া জমিদারি পত্তনেব টাকা হোসেন কোথায় পাইত, ও রকম জনহীন দ্বীপই বা কোথায়।

দ্বীপ দেখিয়া আমিনুদ্দি ও বসুল বড়ো দমিয়া গিয়াছে। ফিরিয়া যাওয়ার কথাটাও তাদের মুখে শোনা গিয়াছে দু-একবাব। তবে হোসেনের সামনে তারা কিছু বলে নাই। বলা যায় না। কত উপকার যে হোসেন তাদের করিয়াছে তার হিসাব হয় না। আমিনুদ্দি অপরিশোধ্য আর্থিক ঋণেই শুধু আবদ্ধ নয়, হোসেন না দিলে এ জীবনে স্ত্রী কি আর তাহাব জুটিত, নছিবনের মতো স্ত্রী ? বসুলকে জেলের দুয়ার হইতে ছিনাইয়া নিয়া আসিযাছে হোসেন, দেশে ফিরিলে জেলেই হযতো তাহাকে ঢুকিতে হইবে। প্রতিদানে হোসেন আর কিছুই তাদেব কাছে চায় না, তারা শুধু এখানে বাস করুক, স্বপ্ন সফল হোক হোসেনের। ইতিমধ্যে তাদের জন্য ঘর উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে, দয়া করিয়া ওই ঘরে তারা নীড় বাঁধিলে কৃতার্থ হইয়া যাইবে হোসেন। জঙ্গল কাটিয়া যত জমি তারা চাষের উপযোগী করিতে পারিবে সব তাদের সম্পত্তি, খাজনা বা চাষের ফসল কিছুই হোসেন দাবি করিবে না। নিজেদেব জীবিকা তাহাবা যতদিন নিজেরাই অর্জন করিতে পারিবে না, জীবিকা পর্যন্ত জোগাইবে হোসেন। গৃহ ও নারী, অন্ন ও বস্ত্র, ভূমি ও স্বত্ব সবই তো পাইলে তুমি, এবাব শুধু খাটিবে ও জন্ম দিবে সন্তানেব, এটুকু পারিবে না ?

হোসেনের কাছে ফিবিয়া যাওয়াব কথা তাই কেহ মুখে আনিতে পাবে না। ফিরিয়া যে যায়, সে যায় পালাইয়া, চুপিচুপি, চোরেব মতো।

হোসেন তাদেব ক্ষমা করে। দেখা হইলে বাসুব মতো হোসেন তাদের জঙ্গল সাফ কবার মজুরি দেয়। জোব-জবরদস্তি হোসেনেব নাই, অন্যায় সে কাবও প্রতি করে না। শুধু তাকেই হোসেন শাস্তি দেয়, ভীষণ ও মর্মান্তিক, যাবা শত্রুতা কবে হোসেনেব, অকারণে ক্ষতি করিতে চায়, বিঘ্ন জন্মায় হোসেনেব স্বপ্ন সফল হইবার পথে।

কদিন কুবের দ্বীপ দেখিয়া ও দ্বীপেব মানুষগুলির সঙ্গে ভাব করিয়া কাটাইয়া দিল। খেতেব ধান সব কাটা হইয়া গিয়াছে, কিছু সরিষা, বুট ও মটর লাগানো হইয়াছে, মূলা, পালং, কপি প্রভৃতি শাকসবজি গত বছর বাঁচিয়া থাকিতে চাহে নাই, এ বছর কযেক বিঘা জমিতে নূতন একপ্রকাব সার দিয়া পরীক্ষাব জন্য কিছু কিছু চাষ হইয়াছে, কী হইবে বলা যায় না।

আরও ভিতরের দিকে দ্বীপের মাটি রবিশস্যেব উপযোগী কিনা দেখিবাব জন্য জঙ্গলেব মধ্যে এখন অল্প একটু স্থান পরিষ্কাব কবা হইতেছে। সকালবেলা দা কুড়াল লইয়া একদল লোক জঙ্গলের মধ্যে মাইলখানেক হাঁটিয়া যায়, নির্বাচিত স্থানটিতে গাছপালা ঝোপঝাড় কাটিয়া সাফ করে, শাবল দিয়া খুঁড়িয়া গাছের শিকড় তুলিয়া ফেলে, তারপর সারাদিন মশা ও পোকার কামড়ে শরীব ফুলাইয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। কুবের একদিন দেখিতে গিয়া শিহরিয়া ফিরিয়া আসিল। এই দ্বীপটির সৃষ্টির দিন হইতে যে বনভূমি কুমারী, তার বুকের এক খাবলা মাংস যেন সকলে ছিনাইয়া লইয়াছে, চারিপাশে নিবিড় বনের মাঝখানে পরিষ্কৃত স্থানটুকু এমনই বীভৎস দেখায় !

কয়েকদিন আগে কী একটা গোলমাল হইয়াছিল দ্বীপে, হোসেন উপস্থিত না থাকিলে অনেকে একত্র হইয়া জটলা করে, ভাসা ভাসা দুটো একটা কথা কানে আসে কুবেরের। বিপিন নামে ষাট বছরের এক বৃদ্ধকে হোসেন এখানে মোড়ল করিয়াছে, তাকে ঘিরিয়াই জটলাটা জমাট বাঁধে বেশি, কুবের কাছে গেলেই কিন্তু সকলে চুপ করিয়া যায়। তারপর একদিন সন্ধ্যার সময় কাজকর্ম শেষ করিয়া সকলে যখন ঘরে ফিরিয়াছে, নিজের স্বতন্ত্র কুটিরের দাওয়ায় বসিয়া হোসেন প্রসন্ন মুখে

টানিতেছে তামাক, বিপিন কথাটা ফাঁস করিল। বলিল, নালিশ আছে একটা। নালিশ ? হোসেনের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল।

বিপিন ধীরে ধীরে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল। নারীসংক্রান্ত লজ্জাকর ঘটনা। এনায়েত দ্বীপে আসিয়াছে মাত্র ছমাস আগে, ইতিমধ্যেই সে সকলকে বড়ো জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। প্রথম প্রথম এর সঙ্গে ওর সঙ্গে প্রায়ই তার কলহ বাধিত, একদিন নিরীহ দুর্বল গগন ঘোষকে মারিয়া সে জখম করিয়া দেয়, সকলে মিলিয়া তখন খুব শাসন করিয়া দেয় এনায়েতকে। তারপর হইতে সে বেশ শান্তশিষ্ট হইয়াই থাকে, ব্যাপারটা তাই হোসেনকে জানানো হয় নাই। কিন্তু কদিন আগে সে এক ভয়ানক অপরাধ করিয়া বসিয়াছে। বসির মিয়ার বউটি ছেলেমানুষ, কিছুদিন হইতে এনায়েত তাকে নাকি বিরক্ত করিতেছিল, ভয়ে বউটি কাহাকেও কিছু বলে নাই। তারপর একদিন দুপুরবেলা সকলে যখন কাজে গিয়াছে, এনায়েত বসিরের ঘরে প্রবেশ করে। বসিরের স্ত্রীর চেঁচামেচি শুনিয়া পাশের কুটিরের আকবরের স্ত্রী গিয়া পড়ায় বেচারি সেদিন ভালোয় ভালোয় রক্ষা পাইয়াছে।

হোসেন বলিল, হারামিব পোলারে কাইটা দরিয়ায় দিলা না ক্যান ?

বিপিন স্বীকার কবিল অতটা তাহারা করিতে পারে নাই, তবে মারধোর করা হইয়াছে যথেষ্ট ! খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সকলকে হোসেন ডাকিয়া আনিতে বলিল, এনায়েতও যেন আসে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে আসিয়া জুটিল, মেয়েবাও কেহ কেহ আসিয়া তফাতে দাঁড়াইয়া বহিল কৌতূহলেব সঙ্গে। বিচাব হইবে এনায়েতের। কে জানে তাহাকে শূলেই দিবে না সাগবে ডুবাইয়া মারিবে হোসেন !

এনায়েতের বয়স বেশি নয়, বলিষ্ঠ যুবক সে, ময়নাদ্বীপে এমন আব একটা মানুষও নাই। তেজের সঙ্গে সে আসিয়া হোসেনের সামনে বসিল, নির্ভয় নিশ্চিন্ত। হোসেন একে ওকে দুটো একটা কথা জিজ্ঞাসা করিল, রুষ্ট চোখে এনায়েতের দিকে চাহিতে লাগিল, বারবাব বলিতে লাগিল, কী আপশোশ ! কী আপশোশ !

তাবপর সে কৈফিয়ত তলব করিল এনায়েতের।

এনায়েত বলিল, জবরদস্তি কবি নাই মিযা।

হোসেন বলিল, না করলা জবরদস্তি, বসিবের ঘরের মদ্যি যাবা ক্যান তুমি ? কবিলাবে নজব দিবা ক্যান ?

আমাবে দেইখ্যা একরোজ স্যায হাসিলো !

আরে বলদা তুমি ! বাই বইলা হাসিলো, দ্যাশগাঁও ছাইড়া দ্বীপের মদ্যি আইসা রইছ, বাই বইন না মাইযা মবদ অ্যানে ? ভালা কাম কব নাই মিয়া। তিন রোজ বাইন্ধা থুমু তোমারে, খানাপিনা মিলব না।

তখন হোসেন মিযার হুকুমে সকলে মিলিয়া তাহাকে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া দিল। আলগা কবিযাই বাঁধিল, হোসেন মিয়ার হুকুমের চেয়ে দড়ির বাঁধন তো এ দ্বীপে জোবালো নয়, বাঁধন খুলিয়া পালানোব সাহস এনায়েতেব হইবে না। কোথায় পালাইবে ?

হোসেনেব ঘরের কাছেই একখানা ঘরে কুবের ও তাহার সঙ্গীদেব থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। সেদিন অনেক রাত্রে বাহিবে গিয়া জ্যোৎস্নালোকে কুবের দেখিতে পাইল, হোসেনের ঘরের দাওয়ায় বন্দী এনায়েত থালায় ভাত খাইতেছে, কাছে বসিয়া আছে একটি রমণী। চুপিচুপি কুবের ঘুরিয়া হোসেনের ঘরের পিছন দিকে গেল, জানালা দিয়া আস্তে আস্তে তাহাকে ডাকিয়া তুলিল।

খবর শুনিয়া হোসেন হাই তুলিয়া বলিল, হ ? ঘুমাও গা কুবির।

আর শোনো মিয়া, কী দেখলা কী শুনলা আঁধার রাইতে মনে মনে থুইয়ো, কইয়া কাম নাই। বলিয়া হোসেন পাশ ফিরিয়া শুইল।

এত বড়ো একটা ব্যাপারকে অবহেলা করিয়া হোসেনের পাশ ফিরিয়া শোয়া অবাক করিয়া দিল বটে কুবেরকে আজ, ব্যাপার সে বুঝিতে পারিল দ্বীপ ছাড়িয়া ফিরিবার দিন। বুড়া বসির নৌকায় আসিয়া উঠিল, তার ছেলেমানুষ বউ রহিয়া গেল দ্বীপে। বসির এ দ্বীপের আদি বাসিন্দা, প্রায় পাঁচ বছর এখানে সে সস্ত্রীক বাস করিতেছে। ছেলেমেয়ে হয় নাই বসিরের—একটিও নয়। পাঁচ বছরে যে একটিও মানুষ বাড়াইতে পারিল না দ্বীপের, কয়েক বছরের মধ্যে যে প্রবেশ করিবে কবরে, তাকে দিয়া আর কী প্রয়োজন আছে হোসেনের ? বসির এবার তালাক দিবে তার বউকে। তারপর যথাসময়ে এনায়েতের সঙ্গে নিকা হইবে বউটির। একটি বউ আছে এনায়েতের, শীঘ্রই সে হোসেনকে উপহার দিবে একটি আনকোরা নতুন মানুষ—ময়নাদ্বীপের এক টুকরা ভবিষ্যৎ। তবুও আরও একটি বউ হোক এনায়েতের, সার্থক হোক দুজনের অন্যায় অসামাজিক প্রেম, পাঁচ বছর যে রমণী জননী হইতে পায় নাই তার কোল জুড়িয়া আসুক সন্তান, মানুষ বাড়ুক হোসেনের সাম্রাজ্যে।

গ্রাম ছাড়িবার তিন সপ্তাহ পরে কুবের ও গণেশ গ্রামে ফিরিয়া আসিল। চাঁদপুরে তাহাদের নামাইয়া দিয়া হোসেন নৌকা লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। হোসেনের মুসলমান মাঝিরা চাঁদপুরে অপেক্ষা করিতেছিল।

গোপিকে নিয়া ইতিমধ্যে অনেক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কুবের যেদিন চলিয়া গেল সেইদিনই গোপির পা ভয়ানক ফুলিয়া ওঠে। বাড়িতে পুরুষ কেহ নাই, কী করিবে ভাবিয়া না পাইয়া মালা কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছিল। তারপর রাসু আসিয়া সব ব্যবস্থা করিয়াছে। কত যে করিয়াছে রাসু গোপির জন্য, শত মুখেও মালা তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারিবে না। সেইদিনই গোপিকে রাসু আমিনবাড়ির হাসপাতালে নিয়া গিয়াছিল, রাত্রেই গোপির হাঁটুতে আবার অস্ত্র করা হয়। সে এখনও হাসপাতালে আছে, প্রায়ই রাসু তাহাকে দেখিতে যায়। ডাক্তার আশ্বাস দিয়াছে হাড় ভাঙিয়া মাংসপেশির জট ছাড়াইয়া গোপির হাঁটু এবার ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, একটু খোঁড়াইলেও সে হাঁটিতে পারিবে।

কুবের ফিরিয়াছে খবর পাইয়া রাসু আসে। কুবের দুটো একটা কৃতজ্ঞতার কথা বলিতেই সে একেবারে গলিয়া যায়। মাথাটা একবার চুলকাইয়া রাসু কয়েকটা ঢোঁক গেলে। তারপর হঠাৎ বলিয়া বসে, গোপিরে দিবা মাঝি আমারে ?

কুবের গম্ভীর হইয়া যায়। বলে যে ব্যস্ততা কীসের ? গোপি তো পড়িয়া আছে হাসপাতালে, আগে সে ফিরিয়া আসুক ? রাসু তবু পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। গোপির পা ভালো হইয়া যাইবে শুনিয়া অবধি সে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, এই সময় কুবেরের কাছে কথা আদায় করিয়া না রাখিলে পরে হয়তো সে মত বদলাইয়া ফেলিবে। গোপির পঙ্গুতা আরোগ্য হওয়া যখন অনিশ্চিত ছিল তখন কথাটা পাকাপাকি করিয়া নেয় নাই বলিয়া বড়ো এখন অনুতাপ হইয়াছে রাসুর।

শেষে কুবের বলে, কাইল কমু রাসু।

রাত্রে সে পরামর্শ করিল মালার সঙ্গে। পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, রাসু যদি দেড়কুড়ি টাকা পণ দেয় আর দুকুড়ি টাকার গহনা দেয় গোপিকে তবে এ বিবাহ হইতে পারে। তার কমে হইবে না।

পরদিন রাসু আসিল। কুবেরের দাবি শুনিয়া সে ভড়কাইয়া গেল। বলিল, অত টাকা কই পামু ?

কুবের তার কী জানে ? এই কটা টাকা যদি সে বিবাহে খরচ করিতে না পারে, বিবাহের পর বউকে তবে সে খাওয়াইবে কোথা হইতে ?

রাসু মাথা নিচু করিয়া থাকে। মালা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝি মমতা বোধ করে, কুবেরকে ইশারায় কাছে ডাকিয়া ফিসফিস করিয়া টাকার পরিমাণটা কিছু কমাইতে বলিয়া দেয়। কিন্তু মেয়েমানুষের পরামর্শে ভুলিবার পাত্র কুবের নয়। গম্ভীর অবিচলিত মুখে সে বসিয়া থাকে বেড়ায় ঠেস দিয়া, চক্ষু মুদিয়া যেন ঘুমাইয়া পড়ে।

অনেকক্ষণ পরে রাসু বলে, আইচ্ছা দিমু।

· বলিয়া সে উঠিয়া যাইতে চায় কিন্তু এবার কুবের তাহাকে খাতির করিয়া বসায়, আগ্রহ সহকারে গল্প জুড়িয়া দেয় ময়নাদ্বীপের। রাসুর না জাগে উৎসাহ, না আসে মুখরতা। কী হইল রাসুর ? এতদিনের স্বপ্ন তাহার সফল হইবে জানিয়া আহ্লাদ হইল না কেন ? তামাক সাজিয়া খানিকক্ষণ টানিয়া হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া কুবের আড়ালে যায়। কদিন আগেও তাহারা হুঁকা কাড়াকাড়ি করিয়া তামাক টানিয়াছে কিন্তু এখন কিনা রাসু তাহার ভাবী জামাতা, ওর হাতে এখন আর হুঁকা দেওয়া যায় না, ওর তামাক খাওয়ার সময় সামনে থাকা যায় না।

দিন তিনেক পরে কুবের আমিনবাড়ি গিয়া গোপিকে দেখিয়া আসিল। হাসপাতালের খাবার খাইয়া বিছানায় শুইয়া শুইয়াই গোপি দিব্যি মোটাসোটা হইয়াছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য রঙের যেন তাহার খোলতাই হইয়াছে বেশ। দিন সাতেক পরে সে ছুটি পাইবে।

রীতিমতো শীত পড়িয়াছে এখন। জেলেপাড়ার ছেলেবুড়াব শরীব রুক্ষ হইয়া খড়ি উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। মালার চামড়া কিন্তু চিরদিন মসৃণ, হাজার শীতেও কখনও তাহার গা ফাটে না। কপিলারও বুঝি ফাটে না। যে তেলটাই কপিলা খরচ করে শরীরের পিছনে ! মাঠে পালং শাকের পাতাগুলিতে যে সরস লাবণ্য ফুটিয়া আছে, কপিলার দেহে হয়তো তার অভাব নাই। মালার বোন তো সে। মালার চেয়ে সে হাজার গুণে শৌখিন।

কাজকর্ম নাই, বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া কুবেব সময় কাটায়। পীতম মাঝির অসুখ হইয়াছে, বুড়ো বয়সে তাহার সেবা করিবার কেহ নাই, যুগী তাই আসিয়া বাপের কাছে আছে। পীতম সেবা গ্রহণ করে মেয়ের কিন্তু দিবারাত্রি তাকে গাল দিয়া কিছু রাখে না। যুগীর হাতের জল খাইয়া চিরদিন নরকে পচিবার সাধ যে তাহার নাই, সব সময় এই কথাটা সে ঘোষণা করে এবং ঘোষণা কবিতে করিতে গলা কাঠ হইয়া আসিলে যুগীব দেওয়া জল খাইয়াই তৃষ্ণা মেটায়। পীতমেব টাকা আছে অনেক। বলে, টাকার লোভে যুগী তাহাব সেবা কবিতে আসিয়াছে কিন্তু একটি পয়সা সে যুগীকে দিয়া যাইবে না। যা কিছু তাহার আছে সব সে কালই বাবুদের জিম্মা করিয়া দিবে, তাব পলাতক ছেলেটা ফিরিয়া আসিলে সব সে পাইবে। ছেলেটা পীতমের ফিরিয়া আসিল বলিয়া।

রাসু একবার পীতমকে দেখিতে আসিয়াছিল, পীতম তাহাকে দূর দূর করিয়া খেদাইয়া দিয়াছে। রাতারাতি খুন করিয়া ময়নাদ্বীপ ফেরত ডাকাতটা যে তার সর্বস্ব লুটিয়া লইবে অত বোকা পীতম নয়। রাসু কাছে আসিলে সে তার ঠ্যাং খোঁড়া করিয়া দিবে। শীর্ণ হাত দুটি উঁচু করিতেও পীতমের কষ্ট হয়, রাসুর ঠ্যাং সে কেমন করিয়া খোঁড়া করিবে সেই জানে !

কুবেরের কাছে রাসু মনোবেদনা জানায়। একমাত্র ভাগনে সে পীতমের,.তাকে পীতম ত্যাজ্য করিয়া দিল ! কত দুঃখ-কষ্ট পাইয়া সে ফিরিয়া আসিল ময়নাদ্বীপ হইতে, দুদিন বাড়িতে ঠাঁই দিল না, অম্লান বদনে খেদাইয়া দিল রাস্তায়। মরিবার সময় এখন কাছে থাকিয়া একটু সেবা কবাব জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছে, তাতেও বুড়া তাহাকে সন্দেহ করিবে, বাড়িতে ঢুকিতে দিবে না ? তা ছাড়া, নিজের ভাগনে সে পীতমের, বুড়ার টাকাপয়সা বাড়িঘরের একটা অংশ কি তার পাওয়া উচিত নয় ? কাকে ও সব দিয়া যাইবে বুড়া ?

কুবের বলে, পোলার লাইগা থুইয়া যাইব কয়।

রাসু বলে, পোলা ! বাঁইচা আছে নাকি স্যায় ? গাঙে ডুইবা গেছে গা কবে !

আলস্যে সময় কাটায় কুবের, গ্রামের জোয়ান মানুষগুলি জীবিকা অর্জনের জন্য বাহির হইয়া যায়, গ্রামে থাকে শুধু বুড়া, শিশু ও নারীর দল, কুবের শুধু শুনিতে পায় পাকা মুখের আপশোশ আর নরম গলার কলহ। দেখা হইলেই হীরু জেলে অনন্তবাবুর নাম করিয়া কুবেরকে পরিহাস করে। কোনোদিন কুবের রাগে, কোনোদিন তাহার মন খারাপ হইয়া যায়। আজ কতকাল অনন্তবাবু গ্রামে

নাই, কলিকাতার বাবু তিনি, জেলেপাড়ায় রাত্রে স্কুল খুলিবার মতলবে কবে তিনি দু-চারবার কুবেরের বাড়ি যাতায়াত করিয়াছিলেন, এখনও তাহা মনে করিয়া রাখা কী জন্য ? শুধু কুবেরের বাড়ি তো নয় ! কী পাগলামি মেজোবাবুর আসিয়াছিল কে জানে, জেলেপাড়ার মানুষগুলির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্য সময় নাই অসময় নাই আসিয়া হাজির হইতেন, বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া দেশের নাম করিয়া কী যেন সব বলিতেন দুর্বোধ্য কথা। কতদিন নির্জন দ্বিপ্রহরে কত বাড়ির ভিতর হইতে মেজোবাবুকে কুবের বাহির হইতে দেখিয়াছে। তাহার পঙ্গু অসহায় স্ত্রীর নামের সঙ্গেই শুধু মেজোবাবুর নামটা হীরু জড়ায় কেন ?

হীরুকে একদিন কুবের মারিবে। বেদম মারিবে !

বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া সময় কাটায় কুবের, মনটা তাহার ভালো নাই। জগা মাঝির বউ যেন কপিলার অনুকরণ করিয়া হাঁটিতে শিখিয়াছে, ভিজা কাপড়ে পথ চলিতে চলিতে চমকাইয়া উঠিয়া পিছনে কুবেরকে দেখিয়া তাহার চোখে সন্দেহ ঘনাইয়া আসার আগে কুবেরের তো অন্যমনস্কতা ঘোচে না। অপ্রতিভ হইতে হয় কুবেরকে। নকুলের বাড়ির সামনে কুলগাছটার তলে একদিন কপিলার পায়ে কাঁটা বিঁধিয়াছিল। মিছে কথা, কাঁটা বিঁধে নাই। উঃ, বলিয়া কুবেরকে জড়াইয়া ধরিবার ছল সেটা কপিলার। কেতুপুরে দুর্গা-প্রতিমা দেখিয়া ফিরিবার সময় সেদিন কী ছলনাময়ীই কপিলা হইয়া উঠিয়াছিল।

গোপিকে আনিবার নাম করিয়া কুবের একদিন ভোর ভোর গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। শ্যামাদাসের বাড়ি আকুরটাকুর গ্রামে, হাঁটা পথে বারো তেরো মাইল। খেতের আল দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতে কতবার যে কুবের ভাবিল ফিরিয়া আসে, আকুরটাকুরে পৌঁছিয়া একটা পুকুরে মুখ হাত ধুইতে নামিয়া কতবার সে যে পুকুরঘাট হইতেই সোজা আমিনবাড়ির দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করা স্থির করিয়া ফেলিল তার হিসাব নাই !

তবু শেষ পর্যন্ত শ্যামাদাসের বাড়ির দরজাতেই পথ শেষ হইল তাহার।

শ্যামাদাস মাঠে গিয়াছিল। কিন্তু শ্যামাদাসের মা বোন ঘর-বাড়ি জুড়িয়া আছে, কপিলা এখানে ঘোমটা-টানা বউ। কুটুম্বকে শ্যামাদাসের মা খাতির করিয়া বসিতে দিল, কুশল ও এদিকে আসিবার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিল। শ্যামাদাসের বাড়িঘর দেখিয়া কুবের মনে মনে পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, ভালোরকম জবাব দিতে পারিল না। চার ভিটায় চারখানা বড়ো বড়ো ঘর শ্যামাদাসের, চারিদিক লেপা-পোছা ঝকঝকে। ঘরের মধ্যে উঁকি দিলে কত জিনিস চোখে পড়ে,—কাঠের সিন্দুক, বেতের ঝাঁপি, বাসনকোসন—কত কিছু। উঠানের একপাশে ধানের মরাই, অপর পাশে গোয়াল ঘর। লক্ষ্মীশ্রী মাখানো সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরসংসার, কুবেরের ভাঙা কুটিরের তুলনায় বৈকুণ্ঠপুরী। বুকের ভিতরে টাটায় কুবেরের। এই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী গিয়া তাহার ভাঙা ঘরে শাকান্ন খাইয়া কটা দিন কাটাইয়া আসিয়াছিল বলিয়া আজও সে আকাশকুসুম রচনা করে, ভাবে আজও লক্ষ্মীর মন পড়িয়া রহিয়াছে কেতুপুরে তাহার সেই নোংরা নীড়টিতে ! কী বোকাই কুবের ছিল !

কপিলা জিজ্ঞাসা করে, খবর কী মাঝি ? কী মনে কইরা আইলা ? ভালা নি আছে পোলাপানরা ?

ডুরে শাড়ি পরিয়াছে কপিলা, চুলের তেলে কপাল তাহার ভিজিয়া গিয়াছে, দেহ যেন উথলিয়া উঠিয়াছে কপিলার, বর্ষার পদ্মার মতো। কী ভীষণ খুশি মনে হইতেছে কপিলাকে ! নিজের মলিন কাপড় ও চাদরটির লজ্জায় কুবেরের ছুটিয়া পলাইতে ইচ্ছা হইতে থাকে।

কয়েক মিনিট সাধারণ কথাবার্তা বলিয়া কপিলা আবার রাঁধিতে যায়। আরও খানিকক্ষণ আলাপ করিয়া কপিলার শাশুড়িও প্রস্থান করে। বাড়ির দু-একটি ছেলেমেয়ে শুধু ঘোরা-ফেরা করে কুবেরের কাছে, তারপর তারাও চলিয়া যায়। কুবের বসিয়া থাকে একা। বোকা, নোংরা, অপদার্থ

কুবেব। মযনাদ্বীপের এনায়েত ও বসিরের কথা কুবেরের মনে পড়ে—মনে পড়ে জ্যোৎস্নালোকে হোসেনেব কুটিরের দাওয়ায় বন্দী এনায়েতের ভাত খাওয়া; যার জন্য দ্বীপের অধিবাসীদের কাছে কবার সে মার খাইয়াছে, তারই আনিয়া দেওয়া ভাত ! হোসেনের কল্যাণে কদিন পরে মিলনও তাদেব হইবে—প্রকাশ্য, সামাজিক, আইনসঙ্গত মিলন। কী আশ্চর্য ভাগ্য লইয়াই এক একটা লোক জন্মায় জগতে ! বসিয়া থাকিতে থাকিতে পথ চলার শ্রান্তিতে ঢুল আসে কুবেরের। আধ-জাগা আধ-ঘুমানো অবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিতে থাকে, রচনা করিয়া চলে আকাশকুসুম। সর্বশক্তিমান হোসেনকে সে যেন বলিয়াছে কপিলাকে পাইলে সপরিবারে সে ময়নাদ্বীপে গিয়া বাস করিবে—গণেশকেও বলিয়া সে বাজি করিবে যাইতে। হোসেন তাহার চিরন্তন হাসি হাসিয়া যেন বলিয়াছে, তাই করুম কুবির বাই, তাই করুম—আইনা দিমু কপিলারে। তারপর যেন একদিন—

কপিলা আসিযা বলে, থাকবা নাকি মাঝি ?

কুবের বলে, না।

দুইদিন থাইকা যাও ? আইছ ক্যান কও দেহি ?

সুবচনীর হাটে যামু মন কইরা বাইরইছি কপিলা। তা ভাবলাম তরে দেইখা যাই।

কপিলা মুচকি হাসিয়া বলে, সুবচনীর হাট নাকি আইজ ?

কুবের বিবর্ণ হইয়া বলে, না ?

হাটে গিয়া ঘুমাইয়া থাকগা মাঝি, কাইল হাট কইরা বাড়িত যাইয়ো, বলিয়া কপিলা রান্নাঘরে চলিযা যায়। কুবের উঠিযা নামিয়া যায় উঠানে। লাউমাচার কাছে গিয়া সে দাঁড়ায়। লজ্জায় মুখখানাতে তাহার মাচার উপরকার উপুড় করা কালো হাঁড়িটার ছায়া পড়ে যেন। কপিলাব সঙ্গে সে কেন পারিয়া উঠিবে ? পদ্মানদীর বোকা মাঝি সে, এক হাটে কিনিয়া কপিলা তাহাকে আরেক হাটে বেচিয়া দিয়াছে। অনেকদিন আগে।

দুপুরবেলা বাড়ি ফিরিয়া কুবেরকে দেখিয়া শ্যামাদাস খুশি হইল। দুজনে পুকুরে স্নান কবিয়া আসিয়া একসঙ্গে খাইতে বসিল, অতিথি আসিয়াছে বলিয়া কপিলা আজ অনেক রান্না করিয়াছে। কিন্তু খাদ্যে কুবেরের রুচি ছিল না। কুবেরের হঠাৎ আসিবার কারণটা শ্যামাদাসও জানিতে চাহিল। কুবের এবার এক আশ্চর্য মিথ্যা রচনা করিয়া বসিল। হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে গিয়া বাস করিতে চাহিবে এমন যদি কেহ জানা থাকে শ্যামাদাসের ? অনেক সুবিধা সেখানে বাস করার। বাড়ি-ঘর অন্নবস্ত্র জমিজমা সব এখন বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে, দশ-বিশবছব পরে দ্বীপে বসতির বিস্তার হইলে তখন নামে মাত্র খাজনা ধার্য হইবে জমির, পুরুষানুক্রমে স্বত্ব জন্মিবে জমিতে। শ্যামাদাস যদি দশজনকে এই সুবর্ণ সুযোগের সংবাদ জানায় আর কেহ ময়নাদ্বীপে যাইতে রাজি হইলে কুবেরকে যদি খবর দেয়, বড়ো ভালো হয় তবে।

শ্যামাদাস অবাক হইয়া বলিল, চা বাগানের ঠিকাদারি নিছ নাকি মাঝি, আঁই ?

চা বাগান ? কীসের চা বাগান ? শ্যামাদাস চলুক না, ময়নাদ্বীপ দেখিয়া আসিবে ? আজই চলুক।

তুমি যাওনা ক্যান ময়নাদ্বীপি ? শ্যামাদাস জিজ্ঞাসা করিল।

কুবের থতোমতো খাইয়া বলিল, যামু। আমিও যামু।

আজ এখানে থাকিয়া যাওয়ার জন্য কুবেরকে অনেক অনুরোধ করিল শ্যামাদাস। কিন্তু থাকিবার উপায় কি আছে কুবেরের ! গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তাহাকে ময়নাদ্বীপের বারতা প্রচার করিতে হইবে।

সুবচনীর হাটের ভিতর দিয়া আমিনবাড়ির পথ। হাটের শূন্য চালাগুলি খাঁ খাঁ করিতেছিল, পথের ধারে স্থায়ী দোকান ও আড়তগুলি শুধু খোলা আছে। একটা খাবারের দোকানের সামনে

নড়বড়ে বেঞ্চটাতে কুবের বসিয়া পড়িল। ভয়ানক শীত করিতেছিল কুবেরের, শরীরটা ছমছম করিতেছিল আর চোখ দুটো করিতেছিল জ্বালা। হুড়মুড় করিয়া জ্বর যে আসিতেছে অনেকক্ষণ আগেই সে তাহা টের পাইয়াছিল। বেঞ্চিটা রোদে সরাইয়া নিয়া চাদর মুড়ি দিয়া সে শুইয়া পড়িল। ক্রমে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, দোকানের ছায়া কুবেরকে অতিক্রম করিয়া হাটের চালাগুলির মাথায় উঠিয়া গেল, কুবের তেমনিভাবে পড়িয়া রহিল বেঞ্চিটাতে। শেষে ময়রা তাহাকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল।

জ্বর আসিবার মুখে ভোজ খাইয়াছিল, অবস্থা বড়ো শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে কুবেরের। কপিলার স্বামী শ্যামাদাসের অবস্থা ভালো বলিয়া, গরিব সে, জ্বর গায়ে পথে নামিয়া আসিয়াছিল, এত জ্বর যে আসিবে কুবের তো ভাবিতে পারে নাই। মাথার মধ্যে যেন কুয়াশা নামিয়াছে আর শব্দ হইতেছে গমগম। কোথায় কী অবস্থায় সে পড়িয়া আছে তাও মাঝে মাঝে গোলমাল হইয়া যাইতেছে সব,—সমুদ্র তরঙ্গ, দুর্গাপূজার আলো, অন্ধকার একটা চাঁচের বেড়ার বাহিরে সারিসারি ঘুমন্ত মানুষ, বারবার জাল নামানো উঠানো, ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা মাছের লাফালাফি সব একাকার হইয়া যাইতেছে। ময়রা মুখের চাদর সরাইয়া দিলে কুবের আরক্ত-চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, বিড়বিড় করিয়া বলে, শ্যামাদাসেরে খবর দিবা, আকুরটাকুরের শ্যামাদাস ?

সন্ধ্যার পর কুবের আবার ফিরিয়া গেল কপিলার কাছে, তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া একটা মোটা কাঁথা তাহার গায়ে চাপাইয়া দিয়া কপিলা রাঁধিতে গেল। অন্ধকার ঘরে কুবের শুইয়া রহিল একা।

শেষরাত্রে ঘাম দিয়া কুবেরের জ্বর ছাড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে ঘুমও ভাঙিয়া গেল তাহার, আর ঘুম আসিল না। একটা বিশ্রী বোঁটকা গন্ধে বড়ো অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। অল্প অল্প আলো হইলে সে উঠিয়া বসিল। ঘরখানা খুবই ছোটো, ঘরের অর্ধেক জুড়িয়া পাটের স্তূপ আর দরজার কাছে প্রকাণ্ড একটা পাঁঠা বাঁধা, শুইয়া শুইয়া দাড়ি নাড়িয়া জাবর কাটিতেছে।

শরীরটা বড়ো দুর্বল বোধ হইতেছিল কুবেরের। ধীরে ধীরে উঠিয়া সে বাহিরে গেল। কপিলা উঠানে গোবর লেপিতেছিল, বলিল, কিবা আছ মাঝি ?

কুবের ক্ষীণস্বরে বলিল, জ্বর নাই। আমি অখন যামু কপিলা।

এখনই যাইবে কুবের, এই ভোরে ? নাইবা গেল সে আজ দুর্বল শরীর লইয়া ? একটু সুস্থ হইয়া কাল গেলে হয় না ? অন্তত কিছু খাইয়া যাক সে। এখনই দুধ দুহিয়া কপিলা জ্বাল দিবে, একটু দুধ খাইয়া যাক।

না, কুবের কিছু খাইবে না। প্রয়োজন নাই। পাঁঠা ও পাটের সৌরভে তার পেট ভরিয়া গিয়াছে। বিষণ্ণ মুখে কুবের মাথা নাড়ে। পদ্মানদীর কূল ছাড়িয়া দশ মাইল তফাতে চলিয়া আসিয়াছে সে, মন কেমন করিতেছে তার। পদ্মার বাতাস গায়ে না লাগিলে, কেতুপুরের মেছো গন্ধ না শুঁকিলে, সে সুস্থ হইবে না।

কপিলা গোবর লেপা স্থগিত করিয়া বলে, গোসা করছ মাঝি ? গোসা কইরো না। ঘরভরা মাইনষের পাল, ঘর নি আছে আর তোমারে দিমু শোওনের লাইগা ?

কুবের বলিল, হ রে কপিলা, হ। ব্যাজাল পারিস না, তর ব্যাজালে গাও জ্বলে।

গাও জ্বলে মাঝি ? গাও জ্বলে ?

হ, জ্বলে ! গোরু ছাগল ভাবস আমারে তুই, খেলা করস আমার লগে। তরে চিনা গেলাম কপিলা, পরনাম কইরা গেলাম তরে।

কপিলা ফিসফিস করিয়া বলে, চুপ কর মাঝি, বেবাকে শুনবো। যাইবা যাও, কী আর কমু তোমারে ? এউক্কা কথা কইয়া দিই মাঝি, মাথা খাও, দিদিরে কথাডা কইয়ো। কইয়ো, কপিলা

পরের ঘরের বউ, পরের শাসনে কপিলার মুখে রাও নাই। অতিথ কই থাকবো, অতিথ কী খাইবো, কপিলারে কেডা তা জিগায় ? দুষি কইরো মাঝি, শাইপো—কিন্তু এই কথাডা কইয়ো দিদিরে, মাথা খাও মাঝি, কইয়ো।

কাব লগে কথা কস বউ ?—ঘবেব ভিতর হইতে শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করে।

কপিলা চাপা সুরে বলে, যাও গা মাঝি। ক্যান আইছিলা তুমি ?

আমিনবাড়ির হাসপাতাল হইতে গোপিকে সঙ্গে করিয়া জলপথে কুবের গ্রামে ফিরিল। তাহাব শীর্ণ চেহারা দেখিযা মালা বারবার জিজ্ঞাসা করিল, কী হইয়াছিল তাহার, ফিবিতে এত দেরি হইল কেন ? প্রশ্নগুলিকে এড়াইয়া গেল কুবের। অল্প সময়ের মধ্যে অকস্মাৎ অনেকগুলি বিচিত্র অভিজ্ঞতা কুবেরকে যেন নতুন মানুষ কবিয়া দিয়াছে, নদী ও নদীতীরের একটানা জীবনে তাহাব গত কয়েকটি মাস চিরস্মরণীয়। কোথায় ছিল কপিলা, কোথায় ছিল আশ্বিনের ঝড়, কোথায ছিল ময়নাদ্বীপ ! সব একসঙ্গে ভিড় করিয়া আসিয়াছে তাহার জীবনে।

গ্রামে ফিরিয়া কুবের দেখিল, বাসু ইতিমধ্যে পীতমের সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিয়াছে। যুগীব ছেলে হইয়াছে, পীতমকে কে আর দেখিবে, কাজটা তাই পাইয়াছে বাসু। যুগীর মতো রাসুকেও সে সর্বদা শাপান্ত করে, বাসু নীরবে সেবা করে বুড়ার, রাগও করে না, দুঃখিতও হয না। রাসুর ধৈর্য দেখিযা কুবের খুশি হয়, পীতম খুশি থাকিলে রাসু হয়তো কিছু পাইবে টাকা-কড়ি, গোপিবই ভালো হইবে তাহাতে। এমন কী, পীতমকে দেখিতে গিয়া তার কাছে রাসুর কিছু কিছু প্রশংসাও কবিয়া আসে কুবের। বলে, মনটা ভালো রাসুর, দযা-মায়া আছে রাসুব বুকে, নকুল-টকুলের মতো পাজি সে নয়। পীতম শোনে কিন্তু বিশ্বাস করে না। বলে, অরে তুই চিনস না কুবির, অ ডাকাইত। একদিন আমার বুকে চাকু মাইরা সর্বস্ব নিয়া পালাইবো হারামজাদা, তুই আছস কোন তালে !

কুবের প্রতিবাদ করে। না, রাসু সে রকম নয়। বড়ো ভালো রাসু।

কয়েকদিন পরে হোসেন মিয়া ফিবিযা আসিলে কুবেরের অলস দিনগুলি শেষ হয। বকমাবি ব্যবসা হোসেনের, ধান, পাট, বিড়ির পাতা, তামাক, গুড়, চিনি, মশলাপাতি এক একবাব এক একরকম বোঝাই নিয়া কুবের বন্দর হইতে বন্দরে যাতায়াত করে। গোয়ালন্দের অপর তীবে একবাব সাতশো ছাগল আসিয়া হাজির, সারাদিন ধরিয়া কুবের তাহাদেব নদী পার করিল। ছাগলের গন্ধে বারবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল কপিলার বাড়িতে এক কষ্টকর রাত্রিযাপনেব কথা। পরের বাড়িতে পরের শাসনে নিবুপায় নির্বাক বউ কপিলা যেখানে তাকে .পাট-জমানো পাঁঠা-বাঁধা ভাঙা ঘরখানায় শুইতে দিয়াছিল।

তারপর একদিন চাঁদপুব যাওয়ার হুকুম পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি যাইতে হইবে, দিবারাত্রি নৌকা বাহিয়া যাওয়া চাই। গণেশ বিরক্ত হইয়া গজগজ করিতে লাগিল। শম্ভু ও বগা বহুদিন হোসেনের অধীনে কাজ করিযাছে তারা কিছুই বলিল না, প্রাণপণে বইঠা বাহিয়া কুবেরকে অবাক করিয়া দিল। হোসেনকে কিছু কিছু কুবের এখন চিনিতে পারিয়াছে। সাধারণত সময়ের হিসাব হোসেনের একটু শিথিল, নৌকার খেপ দিতে মাঝিরা দেরি করিলে কিছু সে বলে না, শম্ভু ও বগা তাই গা ছাড়িযা দিয়া বইঠা ধরে, কুবেরের তাড়া গ্রাহ্য করে না। কিন্তু হোসেন যখন মুখ ফুটিয়া বলে যে দ্রুতগতির প্রয়োজন, শম্ভু ও বগার সমস্ত শৈথিল্য তখন অন্তর্হিত হয়। এমনভাবে বইঠা বাহিতে থাকে তাহারা যেন ভূতে পাইয়াছে তাহাদের। মনে মনে সায় দেয় কুবের। এমনিভাবেই কাজ নিতে হয বটে মানুষের কাছে, এমনই কৌশলে। একটু দেরিতে যখন কিছুই আসিয়া যায় না, মাঝিদের সঙ্গে তখন বকাবকি না করিলে, তাড়াতাড়ির সময় দুবার বলিতে হয় না, এতটুকু ইঙ্গিত পাইলে আলস্য-পরিতৃপ্ত মাঝিরা সহসা অতিমাত্রায় কর্মঠ হইয়া ওঠে।

হোসেনের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় কুবের প্রতিনিয়তই পায়। বিস্তৃত তাহার কর্মক্ষেত্র, এখানে ওখানে ছড়ানো তাহার জীবন, এলোমেলো তাহার চলাফেরা,—তবু চারিদিকে সামঞ্জস্য, সব নিয়মে বাঁধা। একটা জটিল বিশৃঙ্খলায় সে সব শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

চাঁদপুরে হোসেন মিয়া নৌকায় যোগ দিল। ময়নাদ্বীপের পথেই এবারও নৌকা চলিল, নোয়াখালির উপকূলে ক্ষুদ্র একটি গ্রামের কাছে নৌকা বাঁধা হইল। নৌকায় বোঝাই দেওয়া হইল নারিকেল। বোঝাই শেষ হইল কিন্তু নৌকা খুলিবাব হুকুম হোসেন দিল না। দুদিন সেইখানে নিষ্কর্মা হইয়া তাহারা বসিয়া রহিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় নদীর মোহনার দিক হইতে মুসুরি বোঝাই প্রকাণ্ড একটা সমুদ্রগামী বোট আসিয়া ভিড়িল পাশে, চট্টগ্রামবাসী এক বৃদ্ধ মুসলমান নামিয়া আসিয়া অনেকক্ষণ হোসেনের সঙ্গে করিল পরামর্শ। বোট হইতে তারপর ত্রিপল মোড়া কী যেন আসিল এই নৌকায়, ছইয়ের মধ্যে পাটাতনের তলে হোসেন তাহা লুকাইয়া ফেলিল। তারপর হোসেন ও বৃদ্ধ মুসলমানটি নামিয়া গেল তীরে, গুনিয়া গুনিয়া হোসেন কতকগুলি নোট তাহার হাতে দিল, নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, নাও খোলো কুবিব বাই।

বড়ো কৌতূহল হইতেছিল কুবেরের। পাটাতনের নীচে কী লুকাইয়া রাখিয়াছে হোসেন ? হোসেনকে প্রশ্ন করিবার সাহস কুবেরের হইল না। অনেক রাত্রে নৌকা বাঁধিয়া রাঁধিবার আয়োজন করিবার সময় শম্ভুকে সে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল।

শম্ভু বলিল, আপিম মিয়া, আপিম। চুপ যাও।

আপিম ? চুপিচুপি আপিমের ব্যবসা করে হোসেন ? এ তো ভালো কথা নয় ! নানাদিকে কত উপার্জন হোসেনের, এইসব অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা কেন তার ? তা ছাড়া, চোরাই আপিমের ব্যাবসা করা তো সহজ বিপদেব কথা নয়। ধরা পড়িলে কী উপায় হইবে তখন ? কুবেরের ভয় করিতে লাগিল। হোসেন মিয়ার সঙ্গে যেদিন সে ভিড়িয়াছে, সেইদিন হইতে সে জানে একদিন অনিবার্য বিপদ আসিবে, একেবারে সর্বনাশ হইয়া যাইবে, আজ কুবের বিপদের স্বরূপটা বুঝিতে পারিল। আজ হোক, কাল হোক হাতে পড়িবে হাতকড়া, তারপব দু-দশবছর জেলের বাহিরে কুবেরকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

ছইয়ের ভিতরটা হোসেন মিয়া দখল করিয়াছে, নৌকার উন্মুক্ত অংশে হোগলার ঢাকনি চাপাইয়া মাঝিরা শয়ন কবে। শুইয়া শুইয়া কুবের অনেক আবোল-তাবোল চিন্তা করিল। একবার ভাবিল, এবার গাঁয়ে ফিরিয়া হোসেন মিয়ার নৌকায় আর সে কাজ করিবে না। জেলে যাওয়ার চেয়ে না খাইয়া মরাও ভালো। কিন্তু না খাইয়া মরার সঙ্গে কুবেরের পরিচয় আছে। হোসেন মিয়ার সঙ্গে ভিড়িয়া জীবনে সে প্রথম সচ্ছলতার সুখ জানিযাছে, এই কাজ ছাড়িয়া দিলে যে অবস্থা তাহার হইবে খানিকক্ষণ সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া কুবের বুঝিতে পারে জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিবার ক্ষমতা আর তাহার নাই। ক্ষোভে কুবেরের চোখে জল আসে। এ কী অন্যায় হোসেন মিয়ার ! এই সব বিপজ্জনক কাজগুলি বাদ দিলেও তাহার তো কাজের অভাব নাই, সে সব কাজে ব্যাপৃত না রাখিয়া কুবেরকে কেন সে এই বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে ? তারপর কুবের ভাবে, এই সব ভয়ংকর কাজের সহায়তা যদি তাকে করিতে হয়, বিপদের ভাগ যদি তাহার থাকে, লাভের অংশও তো তার পাওয়া উচিত ? জেলে যাওয়ার ঝুঁকি যার সে কী শুধু বইঠা বাহিবার মজুরিই পাইবে ?

মনে মনে কুবের কলহ করে হোসেনের সঙ্গে। কল্পনায় সে বারবার এই ঘটনাগুলি ঘটাইয়া যায় : হোসেনের অন্যায়টা বুঝাইয়া দিতে সে ভারী অনুতপ্ত হয়, তাড়াতাড়ি কোমরের কালো বেল্ট হইতে একতাড়া নোট নিয়া সে কুবেরকে দেয়। চার ভিটায় চারখানি বড়ো বড়ো ঘর তোলে কুবের,

গোয়াল করে, ধানের মরাই করে, ঝাঁকার উপর লাউলতা তুলিয়া দেয়। তারপর একদিন কপিলাকে নিমন্ত্রণ করে। কপিলার পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া বলে যে তাকে ছাড়িয়া থাকিতে বুক ফাটিয়া গিয়াছে কুবেরের—ও কপিলা, আমারে ফেইলা আর যাইস না, যাইস না—আমি নি মইরা গেলাম কপিলা তরে না দেইখা ?

কেতুপুরে ফিরিয়া কুবের এক আশ্চর্য সংবাদ শুনিল।

পীতমের বাড়িতে চুরি হইয়া গিয়াছে।

গভীর রাত্রে সিঁদ কাটিয়াছে চোর। ঘরের কোণে কোথায় পীতম মস্ত একটি ঘটি ভরিয়া টাকা পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, চোরের তাহা জানিবার কথা নয়। তবু সেইখানটা খুঁড়িয়াই ঘটিটা চোর নিয়া গিয়াছে।

টাকার শোকে বড়ো কাতর হইয়া পড়িয়াছে পীতম। চুরির ব্যাপারে রাসুকেই সে সন্দেহ করে। রাসু নিজে সিঁদ দিয়াছে এ কথা সে স্পষ্ট বলে না, তবে চোরের সঙ্গে রাসুর যে যোগ আছে তাতে পীতমের সন্দেহ নাই। ঘরের লোক বলিয়া না দিলে ঘটির সন্ধান চোর পাইত কোথায় ? পীতমের গালাগালিতে রাসু কখনও রাগ করে নাই। কিন্তু এবার চুরির অপবাদ দেওয়ামাত্র পীতমকে আচ্ছা করিয়া কড়া কড়া কথা বলিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। এটাও বড়ো সন্দেহজনক।

চুরির অপবাদের জন্য যেন নয় ! টাকার সঙ্গেই যেন সে গিয়াছে, এতদিন গেল না কেন তবে, পীতমের যতদিন টাকা ছিল ?

কুবের খবর নিতে গেলে পীতম কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোর, রাসু ও বিশ্বসংসারের বিরুদ্ধে তার নালিশ জানাইতে লাগিল। হায়, তার সারা জীবনের সঞ্চয়, সাতকুড়ি তেরোটা টাকা ! কোথায় আছে তার সেই পলাতক পুত্র, বুড়ো বাবাকে মনে করিয়া কবে সে ফিরিয়া আসিবে সেই আশায় পীতম যে টাকাগুলি জমাইয়া রাখিয়াছিল ! সে কি চোরকে দিবার জন্য ? লক্ষ্মীছাড়া রাসুর পেটে যাওয়ার জন্য ?

কুবের বলে, রাসু জানল কিবা কই থুইছিলা ঘটি ?

তা কি পীতম জানে ? যে শয়তান মানুষ রাসু, কেমন করিয়া যেন টের পাইয়া গিয়াছে ঘটিটা কোথায় পোঁতা ছিল, রাসুর অসম্ভব কাজ নাই। ঘটির সন্ধান করিতেই হয়তো সে আসিয়াছিল পীতমকে সেবা করিবার ছলে ! সারাদিন ঘরের মধ্যে ঘুরিত রাসু—একোণ ওকোণ করিয়া বেড়াইত, আর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেঝের দিকে চাহিয়া কী যেন খুঁজিত। তখনই সন্দেহ হইয়াছিল পীতমের। হায়, তখন যদি সে সাবধান হইত !

কুবের বিশ্বাস করিল না রাসুর অপবাধ। ঘটি কোথায় পোঁতা ছিল তাই যদি রাসু জানিবে, চোরের সঙ্গে যোগ দিয়া টাকার সে ভাগিদার জুটাইবে কেন ? নিজেই তো অনায়াসে চুপিচুপি ঘটিটা সরাইয়া ফেলিতে পারিত, তারপর গর্ত বুজাইয়া লেপিয়া মুছিয়া ঠিক করিয়া রাখিলে কতকাল পরে পীতম টাকা চুরির কথা টের পাইত ঠিক ছিল না। সিঁদ কাটিবার হাঙ্গামা রাসু করিতে যাইবে কেন ?

চৌকিদার থানায় খবর দিয়াছিল। পুলিশ আসিয়া চুরির তদন্ত করিল। পুলিশ দেখিয়া কুবেরের বুকের মধ্যে কাঁপিতে আরম্ভ করিয়া দেয়, হোসেন মিয়ার সঙ্গে এবার নৌকাযাত্রা করিয়া আসিয়া পুলিশের জন্য চিরন্তন স্বাভাবিক ভীতিটা কুবেরের অস্বাভাবিক রকম প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। পুলিশের কাছে পীতম অম্লান বদনে বলিয়া দিল রাসুকে সে সন্দেহ করে।

রাসুকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, তার ঘরখানা খুঁজিয়া দেখা হইল, তারপর রাসুর হাতে হাতকড়া না দিয়াই পুলিশ চলিয়া গেল। না, রাসুর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নাই।

পুলিশ চলিয়া গেলে পীতমের বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ রাসু যা মুখে আসিল তাই বলিয়া পীতমকে অভিসম্পাত করিল। শুনিয়া কে বলিবে পীতম তার মামা !

তারপর একদিন সকালে কুবেরেব কাছে আসিয়া রাসু জিজ্ঞাসা করিল, কবে বিয়া দিবা ?

কুবের তৎক্ষণাৎ সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল, গতিক কী রে রাসু ? পীতম খুড়ার টাকা নি তুই নিছস ?

রাসুর মুখখানা একটু বিবর্ণ হইয়া গেল বইকী !

সে বলিল, কী কও লখার বাপ, আঁই ? টাকা নাই আমার ? কাম করি না আমি ?

কী কাম করস ?

শেতলবাবু কাম দিছেন, বাবুগো নায। মামাব ঘরে চুরি করুম ? অমন কথা কইয়ো না লখার বাপ !

তখন কুবের বলিল, পণের টাকা দিয়া থো না ক্যান তবে ?

রাসু বলিল, দিমু। কবে বিয়া দিবা কও ?

গোপি সারিয়া উঠিতেছিল। এখনও সে ভালো করিয়া হাঁটিতে পারে না বটে, তবে ক্রমেই পায়ে জোর পাইতেছে। মাসখানেক পবে বিবাহ তাহাব দেওয়া যায়। কিন্তু বিবাহেব আগে টাকা কুবেরের পাওয়া চাই, মেয়ের গায়ে ওঠা চাই গহনা। রাসুর মুখের কথায় নির্ভব করিয়া থাকিবার পাত্র সে নয়।

যথাসময়ে টাকা ও গহনা দিবার প্রতিজ্ঞা কবিয়া রাসু বিদায় লইল। প্রতিজ্ঞা কবিল সে অবলীলাক্রমে, রাসুর যেন টাকার ভাবনা শেষ হইযাছে বাবুদেব নৌকায় কাজ পাইয়া, সে যেন বড়োলোকই হইয়া গিয়াছে। টাকা ও গহনার কথা শুনিয়া একদিন মুখে তাহার কালিমা ঘনাইয়া আসিয়াছিল, আজ সে নির্ভয় নিশ্চিন্ত !

মালা বলে, রাসুরে য্যান কেমন কেমন দেহি, আমি ডবাই মাঝি।

কুবের বলে, ডরাইয়া কাম নাই তর।

আঁই ? বলিয়া মালা অবাক হইয়া থাকে।

কুবের গোপিকে ডাকে। লাঠি ধরিয়া হাঁটিতে বলে গোপিকে। গোপি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়ায়, কষ্টে দু-এক পা হাঁটে। কুবের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া বলে, সাবব গোপির মা, খাসা সারব পাওখান গোপির। বাসুব লগে ক্যান দিমু বিয়া ?

কইলা যে রাসুরে ?

কুবের একগাল হাসে। বলে, তুই নি মাইয়ালোক গোপির মা, বোঝস না। রাসুরে হাতে থুইছি, পাও যদি না সারে মাইয়ার, রাসুব লগেই দিমু। আর সাইরা যদি যায় গোপির মা, পাওখান যদি সাইরা যায় গোপির—

মহোৎসাহে কুবের গোপির হাঁটুতে হাসপাতালের দেওয়া ওষুধ মালিশ করিতে থাকে। জোরে জোরে ঘষে কুবের, ব্যথায় গোপি কাতরায়। কুবের ধমক দিয়া বলে, চুপ থাক, চুপ থাক। জোর জোর না দিমু তো সাবব ক্যান ? মালিশ করিতে করিতে থামিয়া গিয়া হাঁটুটা সে টিপিয়া টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া দ্যাখে। বলে, ফুলা কমে নাই গোপির মা ?

হ। কম য্যান লাগে।

বলিয়া মালা উৎসুক চোখে গোপির পায়ের দিকে চাহিয়া থাকে। অনেকক্ষণ পরে সলজ্জভাবে বলে, মনে এউক্কা সাধ ছিল মাঝি। কমু ?

হ, এমনইভাবে ভনিতা করে মালা। মালার তামাটে মুখখানা একটু রাঙা দেখায়। আস্তে আস্তে সে জিজ্ঞাসা করে কুবেরকে, হাসপাতালের যে ডাক্তার গোপির পা ভালো করিয়া দিয়াছে

সে কি মালার পা-খানার কিছু করিতে পারে না ? একবার গিয়া দেখাইয়া আসিলে হয় কিন্তু। কিছু যদি ডাক্তার না করিতে পারে নাই করিবে, মালার বড়ো সাধ একবার গিয়া দেখাইয়া আসে। কুবের কী বলে ?

কুবের গম্ভীর হইয়া বলে, তর পায়ের কিছু হইবো না গোপির মা।

কেন ? হইবে না কেন ? মালা জিজ্ঞাসা করে। আহা, একবার দেখাইয়া আসিতে দোষ কী ? ডাক্তার যদি বলে কিছু হইবে না, নিজের কানে শুনিয়া আসিয়া মালা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে। একবার লইয়া চলুক কুবের তাহাকে। একফোঁটা যদি মায়া থাকে তার জন্য কুবেরের বুকে, একবার সে তাকে লইয়া চলুক সদরের হাসপাতালে। কুবের কী বুঝিবে খোঁড়া পায়ের জন্য সারাজীবন কী দুঃখ মালা পুষিয়া রাখিয়াছে মনে !

না ? লইয়া যাইবে না কুবের ? আই গো কুবেরের পাষাণ প্রাণ ! মালার চোখে জল আসে। বিনাইয়া বিনাইয়া সে বলিতে থাকে যে মেয়ের জন্য কুবের দশবার হাসপাতাল যাইতে আসিতে পারে, মালাকে একবার, শুধু একটিবার লইতে তাহার আপত্তি ! হ, অনেক পাপ করিয়াছিল আর জন্মে মালা, এবার তাই এমন কপাল লইয়া জন্মিয়াছে। কোলের ছেলেটাকে মালা মাই ছাড়াইয়া নীচে ফেলিয়া দেয়, ঘুরিয়া বসিয়া দরজার খুঁটিতে ঠক্‌ঠক্ করিয়া মাথা ঠোকে আর কাঁদিতে কাঁদিতে আহ্বান করে মরণকে—যে মরণ এমনই নির্দয় যে মালার মতো পোড়াকপালির দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।

চুপ যা গোপির মা, চুপ যা !

কেন চুপ যাইবে ? কুবেরের দরদ আছে নাকি মালার জন্য ? সে তো কপিলার মতো ভঙ্গি করিয়া হাঁটিতে পারে না যে তাকে লইয়া কুবের আমিনবাড়ির হাসপাতালে যাইবে, হোটেলে রাত কাটাইয়া আসিবে পরমানন্দে !

কুবের বিবর্ণ হইয়া বলে, কিবা কথা কস গোপির মা ? মাইরা ফেলুম কইলাম ! তারপর সে সুর বদলাইয়া বলে, হাসপাতালে যাওনের লাইগা কাঁদনের কাম কী আঁই ! যাইবার চাস নিয়া যামুনে ! যা মুখে লয় কইয়া রাগাইস না গোপির মা !

মালা ফোঁসফোঁস করিতে করিতে বলে, নিবা ? নিয্যস ? নিবা ?

নিমু।

কিন্তু মালাকে আমিনবাড়ি নিয়া যাওয়ার সময় কুবেরের হয় না। হোসেন মিয়ার কাজের এখন অন্ত নাই, অবিরত চালান আসিতেছে, চালান যাইতেছে, এ বছর সতেজে ব্যাবসা আরম্ভ করিয়াছে হোসেন। মাঝখানে আবার একবার নৌকা লইয়া নারিকেলের ও চোরাই আপিমের চালান আনিতে কুবেরকে সেই নোয়াখালির উপকূলে যাইতে হইল। এবার আপিম পৌঁছাইয়া দিল একটি স্টিমলঞ্চ, লঞ্চে এক সাহেব আসিয়াছিল, হোসেন মিয়াকে কী তার খাতির ! আপিমের পুঁটুলি নিয়া নৌকা চালাইতে এবারও কুবেরের বুকের মধ্যে সমস্ত পথ একটা আতঙ্ক জাগিয়া রহিল। গতবার ফিরিয়া গিয়া হোসেন প্রত্যেক মাঝিকে দশটা করিয়া টাকা—বখশিশ দিয়াছিল— এবারও দিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু টাকার কথা ভাবিয়া কুবেরের একবিন্দু আনন্দ হইল না।

গণেশ জিজ্ঞাসা করে, কী ভাব কুবিরদা ? ঝিমাও ক্যান ? মিয়া বাই আপিম দিছে নাকি ?

কুবের বলে, চুপ যা বলদ !

গণেশ বলে, কুকীর মা রুপার পইছা চায় কুবিরদা। ভাবি কী, ইবার মিয়াবাই টাহা দিলি দিমু পইছা গড়াইয়া কুকীর মারে।—গণেশের খুশি ধরে না, কুবেরের গায়ে ঠেলা দিয়া বলে, হোসেন মিয়ার নায় কাম নিয়া বড়ো কাম করছ কুবিরদা ! টাহার মুখ দেখিলাম।

কুবের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুদূর নদী বক্ষে চাহিয়া বলে, উটা কী রে গণশা ? পুলিশের লন্‌চো নাকি ?

হ।

কুবের শিহরিয়া বলে, কোন দিকে যায় ?

আমাগো দিকে আহে দেহি কুবিরদা।

কুবের বিবর্ণ মুখে হোসেন মিয়ার কাছে যায়। ফিসফিস করিয়া বলে, পুলিশ লন্‌চো আহে মিয়াছাব।

হোসেন মৃদু মৃদু হাসে, বলে, বইঠা ধর গিয়া কুবির বাই। হোসেন মিয়া থাকতি কারে ডরাও ? নদীর মধ্যি জাল ফেলাইয়া মাল উঠাইবো কোন হালার পুত ?

হ ? বিপদ ঘনাইয়া আসিলে আপিমের বান্ডিল নদীর জলে ফেলিয়া দিলেই চুকিয়া গেল ? তাই হইবে বোধ হয় ! সেই জন্যই হয়তো হোসেন সর্বদা জলপথে আপিমের চালান নিয়া আসে, নতুবা নোয়াখালি হোক চট্টগ্রাম হোক রেলে স্টিমারে চাঁদপুর আসা ঢের সুবিধা। কুবেরের ভয় কিছু কমে। তবু, সুদূর পুলিশ লঞ্চের দিক হইতে দৃষ্টি সে ফিরাইতে পারে না। লঞ্চটি যখন ক্রমে ক্রমে কাছে আসিয়া পাশ দিয়া চলিয়া যায় কুবের শ্বাসরোধ করিয়া থাকে।

একদিন ভোরবেলা বাড়ি ফিরিয়া কুবের মালাকে দেখিতে পাইল না। গোপি বলিল, রাসুর সঙ্গে মালা আমিনবাড়ির হাসপাতালে গিয়াছে।

কুবের রাগিয়া বলিল, কার নায় ?

বাবুগো নায়।

তিনদিন নদীর বুকে কাটাইয়া আসিয়াছে, মেজাজ গরম হইয়া ছিল কুবেরের। রাগে সে গুম খাইয়া রহিল। গোপি গড়গড় করিয়া ব্যাপারটা বিস্তারিত বলিয়া গেল। মালা কদিন হইতে রাসুকে তোযামোদ করিতেছিল, কাল মেজোবাবু মকদ্দমার জন্য আমিনবাড়ি গিয়াছেন, সেই সুযোগে বাবুকে বলিয়া কহিয়া মালা ও রাসু সঙ্গে গিয়াছে।

মেজোবাবু ? মেজোবাবুর নৌকায় মালা আমিনবাড়ি গিয়াছে ? মেয়ের দিকে কুবের কটমট করিয়া তাকায়। গোপিই যেন অপরাধিনী।

গোপি ভয়ে ভয়ে বলে, লখা লগে গেছে বাবা।

সারাদিন কুবের বাড়ি ছাড়িয়া নড়িল না। জীবনটা হঠাৎ তিতো হইয়া গিয়াছে কুবেরের কাছে। সমস্ত সকালবেলাটা সে রাগে আগুন হইয়া রহিল, নিধু মাঝি আলাপ করিতে আসিলে তাহাকে অকথ্য গালাগালি করিয়া ভাগাইয়া দিল, বিনাদোষে মারিয়া চণ্ডীকে করিয়া দিল আধমরা। তারপর রাগ কমিয়া অপরাহ্ণে আসিল বিষাদ। কেবলই মনে হইতে লাগিল কুবেরের, মালা প্রতিশোধ লইয়াছে। কপিলার সঙ্গে সে কিনা একদিন আমিনবাড়িতেই রাত কাটাইয়া আসিয়াছিল, মালা তাই মেজোবাবুর সঙ্গে সেই আমিনবাড়িতেই গিয়াছে, হাসপাতালে যাওয়ার সেই একই উপলক্ষের ছল করিয়া।

সন্ধ্যা হইল, মালা ফিরিল না। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া আসিল হোসেন। কুবের ছাড়া বড়ো ঘরখানা হইতে সকলকে সরাইয়া দিয়া ঘরের মাঝখানের খুঁটি বাহিয়া উঠিয়া নিজে সে চালের খড় ফাঁক করিয়া ছোটো ছোটো দুটি বান্ডিল লুকাইয়া ফেলিল। খুঁটি বাহিতেও জানে হোসেন, গুণের লোকটার অন্ত নাই।

কুবের নীরবে এই অদ্ভুত কাণ্ড চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। নামিয়া আসিয়া হোসেন বলিল, ডরাইয়ো না কুবির বাই, ডর নাই।

কুবের মুহ্যমানের মতো মাথা নাড়িল।

হোসেন বসিল। বলিল যে পুঁটলি দুটি যতদিন সে না লইয়া যায়, কুবেরের ছুটি। সারাদিন বাড়ি বসিয়া আরাম করিবে কুবের, কেমন ? চালে গোঁজা জিনিস দুটিকে সে পাহারা দিবে বটে কিন্তু

বারবার ওদিকে চাহিবার প্রয়োজন নাই কুবেরের। একেবারে না তাকানোই ভালো। না, ঘরের চালায় কিছুই গোঁজা নাই কুবেরের। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া আজ হোসেন তাহার বাড়ি আসে নাই, খুঁটি বাহিয়া উঠিয়া ঘরের চালে কিছুই সে গুঁজিয়া রাখে নাই।

কী কও কুবির বাই, তাই না ? হোসেন মৃদু মৃদু হাসে।

হ, বলিয়া কুবের সায় দেয়।

সকলের চেয়ে বিশ্বাসী, সকলের চেয়ে নিরাপদ এই সরল পদ্মানদীর মাঝিটাকে হোসেন মিয়া যেন ভালোবাসে। কত টাকা হোসেন মিয়ার, দূরে দূরে ছড়ানো কত বড়ো তাহার ব্যাবসা, এগারো মাইল লম্বা একটা দ্বীপের সে মালিক, কুবের তো তাহার চাকর, তবু কুবেরের ঘরের ছেঁড়া চাটাইয়ে হোসেন আরাম করিয়া বসে, বন্ধুর মতো গল্প করে কুবেরেব সঙ্গে। চেনাই যেন যায় না এখন হোসেনকে। হোসেনের নৌকায় কাজ নেওয়ার আগে কুবের তো তাকে শুধু সঙ্গতিপন্ন বলিয়া জানিত, অসংখ্য উৎস হইতে হোসেনের যে কত টাকা আসে এখন ভাবিতে গেলে কুবেরের মাথা ঘোরে ! সে আর গণেশ শুধু জানিয়াছে, কেতুপুরের আর কেহ হোসেন মিয়ার রহস্য জানে না।

টাকাওলা মানুষের সঙ্গে মেশে না হোসেন, তাদের সঙ্গে সে শুধু ব্যাবসা করে, মাল দিয়া নেয় টাকা, টাকা দিয়া নেয় মাল। মাঝিরা তাহার বন্ধু। অবসর সময়টা সে পদ্মাব দীন দরিদ্র মাঝিদের সঙ্গে গল্প করিয়া কাটাইয়া দেয়, টাকায় ফাঁপানো ব্যাগ পকেটে নিয়া বর্ষার রাত্রে জীর্ণ চালাব তলে চাটাইয়ে শুইয়া নির্বিবাদে ঘুমাইয়া পড়ে।

সেদিন রাত্রে মালা ফিরিল না।

পরদিন বেলা বারোটার সময় হাতের ভরে দুলিয়া দুলিয়া সে গৃহে প্রবেশ কবিল, নদীর ঘাট হইতে এতটা পথ এমনিভাবে আসিতে কাপড়খানা তাহার কাদা মাখা হইয়া গিয়াছে। কুবের খাইতে বসিয়াছিল, একবার চাহিয়া দেখিয়া আবার খাওয়ায় মন দিল। ঘরে গিয়া কাপড় বদলাইয়া মালা দাওযায় আসিয়া বসিল। কুবের চোখ তুলিযা তাকায় না। চড়া গলায় পিসিকে আর দুটি ভাত আনিতে বলে।

মালা বলে, আগো শুনছ ?

না, কুবের শুনিতে পায় না, সে বধির হইয়া গিয়াছে !

মালা বলে, তুমি ত নিলা না, রাসুর লগে তাই হাসপাতাল গেছিলাম। গোসা নি করছ ?

জবাবের জন্য মালা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে। তারপর সজল কণ্ঠে বলে, ডাক্তর কয়, পাও সারনেব না আমার।

আরও কত কথা মালা বলে, কুবের সাড়া-শব্দ দেয় না। খাইয়া উঠিয়া নীরবে তামাক টানিতে থাকে। গোঁয়ার কী সহজ কুবের !

মালা শেষে রাগিয়া বলে, ক্যান মাঝি ক্যান, এত গোসা ক্যান ? কবে কই নিছিলা আমারে, চিরডা কাল ঘরের মধ্যি থাইকা আইলাম, এউক্কা দিনের লাইগা বেড়াইবাব যাই যদি গোসা করবা ক্যান ?

যা, বেড়া গিয়া মাইজা কত্তার লগে—হারামজাদি, বদ !

কী কইলা মাঝি, কী কইলা ?

তারপর কী কলহই দুজনের বাধিয়া গেল ! প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিল, দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল মজা। শেষে রাগের মাথায় কুবের হঠাৎ কলিকাটা মালার গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। কলিকার আগুনে মালা ও তাহার কোলের শিশুটির গা স্থানে স্থানে পুড়িয়া গেল, কাপড়েও আগুন ধরিয়া গেল মালার। সিধুর বোন ছুটিয়া আসিয়া কাপড়খানা টানিয়া খুলিয়া লইল, নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়া লজ্জা নিবারণ করিল মালার। দুঃখিনী সে, বড়ো ছেঁড়া তাহার কাপড়খানা।

স্ত্রী-পুরুষে ভিড় করিয়াছে অঙ্গনে, তাদের সামনে পঙ্গু অসহায়া স্ত্রীর এই দশা, মালার দুরবস্থায় আমোদ পাইয়া সকলে হাসিয়াছে, কে যেন হাততালি দিল। এতক্ষণে চমক ভাঙিল

কুবেরের। লাফাইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া গাল দিতে দিতে সকলকে সে বাড়ির বাহির করিয়া দিয়া আসিল। তারপর নিজের একখানা কাপড় আনিয়া দিল মালাকে।

ক্রমে ক্রমে শীত কমিয়া আসিল।

কেতুপুর গ্রাম ও জেলেপাড়ার মাঝামাঝি খালটা শুকাইয়া গিয়াছে। পদ্মার জলও কমিয়াছে অনেক। ক্রমে ক্রমে মাঠগুলি ফসল-শূন্য হইয়া খাঁ খাঁ করিতে লাগিল, পায়ে চলা পথগুলি স্পষ্ট ও মসৃণ হইয়া আসিয়াছে অনেকদিন আগে। আমগাছে কচিপাতা দেখা দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে পাখির সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে দেশে। ঝাঁক বাঁধিয়া বুনোহাঁসের দলকে উড়িতে দেখা যায়। উত্তরাভিমুখী নৌকাগুলি দক্ষিণের জোরালো সমগতি বাতাসে বাদাম তুলিয়া তরতর করিয়া ভাসিয়া যায়, দূরে গেলে অতিথি হাঁসগুলির মতোই রহস্যময় মনে হয় তাদের। মাছ দুধ সস্তা হইয়াছে, পদ্মার চর হইতে কলসিভরা দুধ আসিয়া বাজারে চার পয়সা সের বিকাইয়া যায়।

শীতে কুঁকড়ানো গ্রামগুলি গা মেলিয়াছে। সকাল সন্ধ্যায় মালা কাপড় ভাঁজ করিয়া লখা ও চণ্ডীর শরীর ঢাকিয়া গলায় বাঁধিয়া দেয় না, খালি গায়েই তারা শুকনো ডোবা পুকুরে কাদা ঘাঁটিয়া মাছ ধরিতে যায়। ফাটা চামড়া উঠিয়া গিয়া ত্বক মসৃণ হইয়া আসিতেছে সকলের, মালার রং যেন আরও ফরসা হইয়া আসিয়াছে, একমুষ্টি যৌবন যেন অতিরিক্ত আসিয়াছে মালার দেহে। মালাকে চাহিয়া রাত্রে কুবেরের ঘুম ভাঙে · কোনোদিন গৃহে, কোনোদিন পদ্মার বুকে।

রাসুর সঙ্গে গোপির বিবাহের বন্দোবস্ত কিন্তু হইয়া গিয়াছে বাতিল। এ কীর্তিও হোসেন মিয়ার। সোনাখালির একটি পাত্র হোসেন ঠিক করিয়া দিয়াছে গোপির জন্য, নাম তার বঙ্কু, বয়স বেশি নয়। এ জগতে বঙ্কুর আপনার কেহ নাই বটে কিন্তু হোসেন মিয়া আছে। হোসেন মিয়া যার মুরুব্বি, কীসের অভাব তার ? বঙ্কু পাঁচকুড়ি টাকা পণ দিবে কুবেরকে, গোপিকে গহনা দিবে তিনকুড়ি টাকার, আর একদিন জেলেপাড়ার সকলকে দিবে ভোজ।

এ কথা জানিতে কুবেরের বাকি নাই যে বিবাহের পর নবদম্পতিকে হোসেন ময়নাদ্বীপে লইয়া যাইবে, কিন্তু জানিয়া কী লাভ ? হোসেন মিয়ার অবাধ্য কুবের কেমন করিয়া হইবে ? তা ছাড়া পাঁচকুড়ি টাকার মায়া ত্যাগ করিবার সাধ্য কুবেরের নাই। বিবাহ দিলে মেয়ে পরের ঘরে যায়, কাছে অথবা দূরে। গোপি না হয় যাইবে দূরে—অনেক দূরের ময়নাদ্বীপে। হয়তো কখনও একটু মন কেমন করিবে কুবেরের, কিন্তু তার প্রতিকার কী ? মন তো অনেক কারণেই কেমন করে মানুষের !

খবর শুনিয়া রাসু গালাগালি করিয়া গিয়াছে। বলিয়াছে, কথা দিয়া কথা রাখিল না কুবের, কুবেরের সে সর্বনাশ করিয়া ছাড়িবে। যুগীকে গিয়া রাসু বুঝি ধরিয়াছে, তারপর একদিন শীতল আসিয়া রাসুর সপক্ষে খানিকক্ষণ ওকালতি করিয়া গিয়াছে কুবেরের কাছে। বলিয়াছে, টাকা যদি বেশি চায় কুবের, সে তা বলে না কেন ? সোনাখালির পাত্র যত টাকা দিতে চায় তাই দিবে রাসু। গ্রামে রাসুর মতো পাত্র থাকিতে দূর দেশে মেয়েকে কুবের পাঠাইবে কেন ?

কেন ? এ কেনর জবাব দিবার ক্ষমতা নাই কুবেরের ! ময়নাদ্বীপে গিয়া গোপিকে বাস করিতে হইবে ভাবিলে জালে আবদ্ধ ইলিশ মাছের মতো মাঝে মাঝে তারও মনটা কি ছটফট করে না ? তবু তাকে এ সব বলা মিছে।

একদিন গোয়ালন্দে অধরের সঙ্গে কুবেরের দেখা হইয়া গেল। অধর বলিল, কয়েকদিন আগে কপিলা চরডাঙায় আসিয়াছে, কিছুদিন থাকিবে। বাড়ি ফিরিয়া কুবের সেদিন মালাকে বড়ো দরদ দেখায়। বলে, মালা কতকাল বাপের বাড়ি যায় নাই, ইচ্ছা করে না যাইতে ? ইচ্ছা যদি হয় তবে না হয় চলুক মালা কাল, দু-চারদিন থাকিয়া আসিবে। মালা বলে, না, বাপের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা তাহার নাই। বাপ কি যাইতে বলিয়াছে তাকে ? এতকাল সে যে যায় নাই, একবার কি দেখিতে

আসিয়াছে তাকে ? মালা কাঁদো কাঁদো হইয়া যায়। বলে, তার মনটা শুধু পোড়ায় বাপভাইয়ের কথা ভাবিয়া, তার জন্য ওদের কারও দরদ নাই। কেন সে যাইবে বাপের বাড়ি যাচিয়া ? কুবের বিপন্ন হইয়া বলে, গেলে দোষই বা কী ? বাপের বাড়ি তো বটে, যাচিয়া বাপের বাড়ি যাইতে কারও লজ্জা নাই। কালই চলুক মালা, দু-দিন একদিন পরেই ফিরিয়া আসিবে ?

এবার মালা সন্দিগ্ধ হইয়া বলে, যাওনের লাইগা জিদ কর ক্যান মাঝি ?

জিদ কিবা ? দরদ কইরা কইলাম, জিদ !

মালার উপর রাগের সীমা থাকে না কুবেরের। চরডাঙা যাওয়ার আর তো কোনো ছুতা তাহার নাই ! জামাই অকারণে শ্বশুরবাড়ি গেলে দোষ অবশ্য কিছুই হয় না, কিন্তু এখন কপিলা ওখানে আছে, হঠাৎ কুবেরের আবির্ভাব ঘটিলে কে জানে কে কী ভাবিয়া বসিবে। বসিয়া বসিয়া কুবের উপায় চিন্তা করে আর ক্রুদ্ধ চোখে মালার দিকে থাকিয়া থাকিয়া তাকায়। হ, আজ বসন্তের আদর্শ আবহাওয়া আসিয়াছে কেতুপুরে, দোলের উৎসব হইবে কাল, লখা ও চণ্ডী আবির কিনিয়া আনিয়া আজই অঙ্গনে খানিক ছড়াইয়াছে।

বিকালে পদ্মার ঘাটে নৌকার তদবির করিতে গিয়া কুবেরের আরও মন-কেমন করিতে থাকে। কাব্যের মসৃণ মার্জিত মন-কেমন করা নয়, তার ভীরু প্রকৃতির সঙ্গে যতখানি খাপ খায় ততখানি দুরন্ত মানসিক অস্থিরতা। পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়া শরীরটা কুবেরের ভালো হইয়াছে—খাদ্য যতটুকু শক্তি দিত আগে ব্যয় করিতে হইত তার দশগুণ, এখন সেটা শুধু বন্ধ হয় নাই, বিশ্রামও জুটিয়াছে অনেক। মনেরও যেন তাতে ব্যাকুল হওয়ার ক্ষমতা বাড়িয়াছে এবং কমিয়া গিয়াছে দুর্বল অভিমান, সিদ্ধি বা আপিমের নেশার মতো আগে যা কুবেরের মনকে অনেকটা শান্ত করিয়া রাখিত। নৌকায় বসিয়া কুবের যেন ভুলিয়া যায় যত নিষ্ঠুরতা করিয়াছে কপিলা, যত দুর্বোধ্য নির্মম খেলা সে খেলিয়াছে তার সঙ্গে। মনে পড়ে শুধু কপিলাকে, কপিলার লীলা-চাপল্য, কপিলার হাসি ও ইঙ্গিত, তেলে ভেজা চুল ও কপাল আর বেগুনি রঙের শাড়িখানি। আর মনে পড়ে শ্যামাদাসের উঠানে ভোরবেলা গোবর লেপায় রত কপিলাকে, মালাকে বলিবার অনুরোধ মেশানো তার শেষ সকাতর কথাগুলি। ক্যান আইছিলা মাঝি, জিজ্ঞাসা করিয়াছিল না কপিলা ? হ, ও জিজ্ঞাসার মানে কুবের বোঝে। আবার তাই যাইতে চায় কুবের কপিলার কাছে, এখনই যাইতে চায় শস্যহীন শুকনো মাঠগুলি ঊর্ধ্বশ্বাসে পার হইয়া চরডাঙ্গায়, কপিলা যেখানে চুল বাঁধিতেছে।—কুবেরকে দেখিয়া তার বোতলটি কাত করিয়া আরও খানিকটা তেল মাথায় ঢালিবে কপিলা : তার উত্তোলিত দুটি বাহু, মুখের ছলনাভরা হাসি, বসিবার দুর্বিনীত ভঙ্গি সব পাগল করিয়া দিবে কুবেরকে। ঘাটে আরও নৌকা আছে, মাঝি আছে। এখানে থাকিতে ভালো লাগে না কুবেরের, বাড়ি ফিরিতেও ইচ্ছা হয় না। নদীর ধারে ধারে সে হাঁটিতে আরম্ভ করে, ভাঙিয়া পড়ার জন্য প্রস্তুত তীরের ফাটলধরা অংশগুলির উপর দিয়া। চলিতে চলিতে এক সময় দশ-বারোহাত ডাঙা তাকে সঙ্গে করিয়া ধসিয়া পড়ে নীচে, শীতের পদ্মার জল যেখান হইতে হাত পনেরো পিছাইয়া গিয়াছে। মাটির একটা চাপড়াই বুঝি মাথায় ঘা দিয়া কুবেরকে অজ্ঞান করিয়া দেয়। মিনিট দশেক পরে চেতনা হয় কুবেরের। প্রথমে কুবেরের মনে হয় এ বুঝি কপিলারই এক কৌতুক। তারপর কষ্টে উঠিয়া বসিয়া সে নিঝুম হইয়া থাকে। শেষ বেলার সূর্য যেন পদ্মাকেও নিঝুম করিয়া দিয়াছে, দূরের নৌকাগুলি এবং আরও দূরের স্টিমারটি যেন হইয়া গিয়াছে গতিহারা। বাতাসের জোর নাই, নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ যেন ক্লান্ত। নিজের এলোমেলো চিন্তাগুলিকে কুবের ভালো বুঝিতে পারে না। মাথার মধ্যে একটা ভোঁতা বেদনা টিপটিপ করিতেছে। মাথার বাঁ পাশটা দিয়া একটু রক্তও পড়িয়াছে। তাই বলিয়া কেবলই এখন মনে আসিতে থাকিবে কেন গণেশের সেই গান—পিরিত কইরা জ্বইলা মলাম সই, আলো সই ? কার সঙ্গে পিরিত করিয়া জ্বলিয়া মরিতেছে কুবের ? কপিলার সঙ্গে ? হ, ভারী মেয়েমানুষ কপিলা ! তার সঙ্গে আবার পিরিত। ছেলেমানুষ নাকি কুবের ?

পদ্মানদীর মাঝি — ২০৪/২০৫ পৃষ্ঠার A চিহ্নিত স্থলে —

[illegible]

পদ্মানদীর মাঝি পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

পদ্মায় স্নান করিয়া কুবের বাড়ি ফিরিল। ভাত খাইতে বসিয়া হঠাৎ কুবের বলিল, চরডাঙ্গা যাবি লখা ?

যামু বাবা, যামু।

কাইল বিয়ানে মেলা দিমু, আঁই ?

হ, এ ফন্দি মন্দ নয়। দোলের উৎসবে মামাবাড়ি যাইবে ছেলেরা। একা তো যাইতে পারিবে না তারা, কুবের তাই সঙ্গে যাইবে। কেহ টেরও পাইবে না কীসে কুবেরকে টানিয়া আনিয়াছে চরডাঙ্গাতে !

মালা বলিল, আগো, নিয়া যাইবা ত আমারেও নিয়া চল।

কুবের বলে, না তরে নিমু না। যাবি না কইলি ক্যান ?

কুবের বাঁচিয়াছে। মালাকে লইয়া চরডাঙ্গা যাওয়া কী সহজ কথা ! রাজি না হইয়া ভালোই করিয়াছে মালা, যাতায়াতের ডুলিভাড়াটা কুবেরের বাঁচিয়া গেল।

মালা এখন যাইতে চায়। ছেলেদের লইয়া কুবের যদি সত্যসত্যই যায় চরডাঙ্গা তবে আর সে যাইবে না কেন ? কুবের তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা তুলিয়াছিল বলিয়াই না প্রথমটা সে রাজি হয় নাই ? মালা স্বামীর তোষামোদ আরম্ভ করে। রাত্রে খানিক রাগারাগি কাঁদাকাটি করিতেও ছাড়ে না। কিন্তু কুবের অটল। যাইবে না বলিল কেন মালা ? কুবের যখন তোষামোদ আরম্ভ করিয়াছিল বাহাদুরি করিয়া তখন যাইতে অস্বীকার করিল কেন ? মরিয়া গেলেও কুবের তো তাকে চরডাঙ্গায় লইবে না ! হ কুবেরের গোঁ মালা জানে না। কী ভাবিয়াছে সে কুবেরকে ?

রাত্রি থাকিতে উঠিয়া লখা ও চণ্ডীকে টানিয়া তুলিয়া কুবের রওনা হইয়া গেল। মাথা-কপাল কুটিয়া যাওয়ার জন্য কাঁদিতে লাগিল মালা, কুবের ফিরিয়াও তাকাইল না। সকাল সকাল তাহারা পৌঁছিল চরডাঙ্গায়। হাঁটিতে হাঁটিতে ছেলে দুটার পা ব্যথা হইয়া গিয়াছে। চণ্ডীকে মাঝে মাঝে কোলে করিয়া চলিতে হওয়ায় কুবেরের ধরিয়া গিয়াছে হাঁপ। শ্বশুরবাড়ির দাওয়ায় বসিয়া গামছা দিয়া সে ঘাম মুছিতে লাগিল। একটু পরে কপিলা একখানা পাখা আনিয়া দিল। কুবের খুশি হইয়া বলিল, আছস কিবা কপিলা ?

কিবা দ্যাখ ?

কাহিল য্যান লাগে তরে।

হ, কাহিল হইছি।

কুবের ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, ক্যান রে কপিলা, অসুখ নি করছে তর ?

মনডার অসুখ মাঝি, তোমার লাইগা ভাইবা ভাইবা কাহিল হইছি।

বলিতে বলিতে আঁচলের আড়াল হইতে হাত বাহির করিয়া এক ভাঁড় চুন-হলুদ কপিলা কুবেরের গায়ে ঢালিয়া দেয়। হাসিয়া গলিয়া পড়ে কপিলা। কুবের মূঢ়ের মতো চাহিয়া থাকে। আনন্দ অথবা দুঃখ কীসে তাহার রোমাঞ্চ হয় সে বুঝিতে পারে না। কেতুপুরে থাকিবার সময় এমনিভাবে হাসিত কপিলা। আকুরটাকুরে শ্যামাদাসের বাড়িতে এ হাসির আভাসও কপিলার মুখে সে দেখিতে পায় নাই।

কপিলার হাসির শব্দে বৈকুণ্ঠ বাহিরে আসে। লখা ও চণ্ডীকে সঙ্গে করিয়া কপিলা চলিয়া যায় ভিতরে।

শ্যামাদাসের কাছে বৈকুণ্ঠ ময়নাদ্বীপের কথা শুনিয়াছে। সে সেই কথা আরম্ভ করিল। কথায় কুবেরের মন ছিল না, সে অন্যমনে বৈকুণ্ঠের কথার জবাব দিয়া গেল।

রং ও কাদা নিয়া গ্রামে দোলের উৎসব চলিয়াছে, রঙের চেয়ে কাদার পরিমাণটাই এ পাড়ায় বেশি। চাষাভুষা জেলে-মাঝির পাড়া এটা, এখানে রঙের বড়ো অনটন। অনেক বেলায় কাদামাখা

মূর্তিসমূহের একটা শোভাযাত্রা পাড়া হইতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইল। গাধার মতো ক্ষুদ্রকায় একটা ঘোড়ার উপরে বিচিত্র সাজে দোলের রাজা অতি কষ্টে বসিয়া আছে, গলায় তাহার ছেঁড়া জুতোর মালা, গায়ে গোটা দশেক ছিন্নভিন্ন জামা, চারিদিকে লড়বড় করিয়া ঝুলিতেছে অনেকগুলি ছেঁড়া ন্যাকড়া। সামনে দিয়া যাওয়ার সময় শোভাযাত্রার লোকেরা কুবের, বৈকুণ্ঠ ও অধরকে কাদা মাখাইয়া দিয়া গেল, অধর ভিড়িয়া গেল দলে। তাথৈ তাথৈ নাচ, ছুটাছুটি, হইচই, ডোবা পুকুরের পাঁক তুলিয়া যাকে খুশি ছুঁড়িয়া মারা—আনন্দ বটে দোলের ! খানিক ইতস্তত করিয়া লখা ও চণ্ডী অধরেব সঙ্গে যোগ দিবার জন্য ছুটিয়া গেল, কুবেরের বারণ কানেও তুলিল না।

কাদা ধুইয়া স্নান করিয়া আসিবাব উদ্দেশ্যে কুবের গেল পুকুরে। কপিলা বুঝি টের পাইযাছিল। খানিক পরে সেও পুকুর ঘাটে আসিয়া হাজির।

আমারে রং দিলা না মাঝি ?

পাঁক দিমু কপিলা ? রং ত নাই !

দূর অ ! রং নাই, পাঁক দিবার চায় ! দিয়ো না মাঝি পাঁক, দিয়ো না কইলাম !

পাঁক দিতে বারণ করে কপিলা কিন্তু পা পিছলাইয়া কাদা মাখিয়া জলে সে গড়াইয়া পড়ে। হাতের ঠেলায কলসি ভাসিয়া যায় কুবেবের দিকে। কপিলা বলে, ধরো মাঝি, কলস ধরো।

বলে, আমারে ধর ক্যান ? কলস ধরো।

হ, ভীত চোখে চারিদিকে চাহিয়া কলসির মতোই আলগোছে কপিলা ভাসিয়া থাকে, তেমনই ত্রাসের ভঙ্গিতে—স্তন দুটি ভাসে আর ডোবে। চোখের পলকে বুকে কাপড় টানিয়া হাসিবাব ভান করিয়া কপিলা বলে, কথা যে কও না মাঝি ?

কুবেব বলে, তর লাইগা দিবারাত্র পরানডা পোড়ায কপিলা।

কপিলা চোখ বুজিয়া বলে, ক্যান মাঝি, ক্যান ? আমারে ভাব ক্যান ? সোয়ামির ঘবে না গেছি আমি ? আমারে ভুইলো মাঝি—পুবুষের পরান পোড়ে কযদিন ? গাঙের জলে নাও ভাসাইয়া দূর দ্যাশে যাইয়ো মাঝি, ভুইলো আমাবে। ছাড়, মানুষ আহে।

সাঁতার দিয়া কপিলা কলসি ধরিয়া আনে। কাপড় ঠিক করিয়া ভবা কলসি কাঁখে তুলিযা পিছল ঢালু পাড় বাহিয়া উপরে উঠিযা যায়। হ, ফিরিয়া একবার তাকায কপিলা। ভবা কলসিব জল খানিকটা উছলাইয়া পড়ে।

দুপুবে খাইয়া উঠিয়া কুবেব বলে, লখা, চণ্ডী, ল মেলা কবি। দিনে দিনে গাঁয ফিবুম।

মালা বিস্মিত হইয়া বলিল, আইজ ফিবা আইলা যে ?

মাইনষে থাকে তর বাপের বাড়ি ?

পথ হাঁটিয়া হাঁটিযা লখা ও চণ্ডী আধমরা হইয়া গিয়াছিল। কুবেরও কম শ্রান্ত হয নাই। জিরাইয়া জিরাইয়া গ্রামে পৌঁছিতে তাহাদের সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছিল। লখা ও চণ্ডী দুটি দুটি ভাত খাইয়া শুইয়া পড়িল। কপিলা চরডাঙ্গায় আসিয়াছে তাদের মুখে এ খবর শুনিয়া মালা গম্ভীর হইয়া গেল। কুবেরকে আর সে কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। খোঁড়া পা-টি টান কবিবার চেষ্টাতেই বোধ হয় একবার তাহার মুখখানা হইয়া গেল বিকৃত। কপিলা চলিয়া যাওয়ার পর হইতে নিজের পঙ্গুতা সম্বন্ধে মালা সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। কুঁকড়ানো শীর্ণ পা-টিকে সে মাঝে মাঝে সিধা করিবার চেষ্টা করে, দুহাতে মাঝে মাঝে পা-টিকে ঘষিতে থাকে সজোরে। জন্ম হইতে অভ্যস্ত বিকলাঙ্গটি এতকাল পরে মালাকে বিশেষভাবে কাতর করিয়াছে।

বাড়ির দক্ষিণে খানিকটা ফাঁকা জমি ছিল। গোপির বিবাহের আগে ওখানে একখানা ঘর তুলিবার কথা ভাবিতেছিল কুবের। এতকাল সময় ছিল না, হোসেনের চালানি কারবারে এখন একটু

মন্দা পড়িয়াছে। বাড়িতে থাকিবার সময় পায় কুবের। চরডাঙ্গা হইতে ফিরিবার পরদিন সে ঘর তুলিবার জন্য বাবুদের অনুমতি আনিতে গেল।

কুবের কি জানিত অনুমতির জন্য মেজোবাবুর কাছেই তাহাকে দরবার করিতে হইবে। নিচু হইয়া প্রণাম করিয়া জোড় হাতে মেজোবাবুর সামনে দাঁড়াইতে হইল কুবেরকে। করুণ কণ্ঠে জানাইতে হইল আবেদন। ঘর তুলিবে কুবের ? খুব টাকা হইয়াছে নাকি কুবেরের ? মেজোবাবু হাসিয়া কথা বলেন। ফরাসের সামনে মেঝেতে উবু হইয়া বসিবার অনুমতি কুবের পায়, কিন্তু যুক্তকর মুক্ত করিবার নিয়ম নাই। জেলেপাড়ার খবর জিজ্ঞাসা করেন মেজোবাবু। কে কেমন আছে, কার কেমন অবস্থা, কী রকম মাছ পড়িতেছে এ বছর। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে একদিন মেজোবাবুর যাতায়াত ছিল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতির জ্ঞান বিতরণ করিয়া মাঝিদের জীবনগুলি উন্নততর করিবার ঝোঁকে তিনি আভিজাত্য ভুলিয়াছিলেন। শিক্ষা মাঝিরা পায় নাই, মাঝিদের বউ-ঝিরা শুধু পাইয়াছিল দুর্নাম, গ্রামে গ্রামে খবর রটিয়াছিল যে কেতুপুরের মেজোকর্তা জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে রমণী চাখিয়া বেড়াইতেছেন—জেলেপাড়া মেজোবাবুর প্রণয়িনীর উপনিবেশ ! আজ আর জেলেপাড়ার দিকে যাওয়ার সময় মেজোবাবু পান না। মাঝিদের কারও সঙ্গে দেখা হইলে খবর জিজ্ঞাসা করেন। সকালে দুপুরে জেলেপাড়ার ভাঙা কুটিরে গিয়া সময় যাপন করিবার সময়েও যে দুস্তর ব্যবধান মাঝিদের সঙ্গে মেজোবাবুর থাকিয়া গিয়াছিল, কোনো মন্ত্রে তাহা ঘুচিবার নয়। মাঝিরা বিব্রত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল. ভালো করিবার খেয়ালে বড়োলোক কবে গরিবের হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছে ? মেজোবাবু তো হোসেন মিয়া নয়। দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অন্তহীন সরলতার সঙ্গে নিচু স্তরের চালাকি, অবিশ্বাস ও সন্দেহের সঙ্গে একান্ত নির্ভর, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অধর্মকে অনায়াসে সহিয়া চলা—এ সব যাদের জীবনে একাকার হইয়া আছে, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া যারা ভাবুক কবি, ডাঙায় যারা গরিব ছোটোলোক, মেজোবাবু কেন তাদের পাত্তা পাইবেন ? ও কাজ হোসেন মিয়ার মতো মানুষের পক্ষে সম্ভব, মেজোবাবুর চেয়ে বেশি টাকা উপার্জন করিয়াও যার মাঝিত্ব খসিয়া যায় নাই।

মালা ? মালার কথাও মেজোবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন। মালার পায়ের যে চিকিৎসা চলিতেছিল, কী হইল তার ? তারপর ফাঁকা জমিটুকুতে ঘর তুলিবার অনুমতি দিয়া কুবেরকে মেজোবাবু বিদায় দিলেন।

মালা আজও মুখ ভার করিয়া ছিল। কিন্তু কৌতূহল দমন করা যায় না।

কী কইল মাইজা কত্তা ?

কী কইব ? তর কথা জিগাইল।

হ ?

নায় তুইলা আবার তবে হাসপাতাল নিয়া যাইব কইল গোপির মা।

গোঁয়ার কি সহজ কুবের ! গোঁ ধরিলে আর তো সে তাহা ছাড়িবে না ! মেজোবাবুর নৌকায় মালা যে আমিনবাড়ি গিয়াছিল, কতকাল সে এ কথা মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিবে সেই জানে, হয়তো মালা যখন বুড়ি হইয়া যাইবে, বিকল পা-টির মতো সর্বাঙ্গ শীর্ণ হইয়া আসিবে তাহার, তখনও এ কথা ভুলিবে না কুবের। কলহ করিয়া মালা কাঁদে। মৃত্যু কামনা করে নিজের। কিন্তু এ বিষয়ে কুবের কঠোর, নির্মম। অন্য বিষয়ে মালার সঙ্গে তাহার ব্যবহার বদলায় না, পঙ্গু অসহায় স্ত্রীর জীবন তারই বক্ষের আশ্রয়ে আজও উথলিয়া ওঠে, কিন্তু আমিনবাড়ি যাওয়ার জন্য অম্লান বদনে মালাকে সে পীড়ন করে। আজ রাত্রেই হয়তো কুবের মালাকে বুকে জড়াইয়া মিঠা মিঠা কথা বলিবে, পদ্মার ঠান্ডা বাতাসে জুড়াইয়া জুড়াইয়া কী যে মধুর হইয়া উঠিবে কুবেরের ব্যবহার ! কাল হয়তো আবার সে কাঁদাইবে মালাকে মেজোবাবুর কথা তুলিয়া। এমনই প্রকৃতি পদ্মানদীর মাঝির, ভদ্রলোকের মতো একটানা সংকীর্ণতা নয়, বিরাট বিস্তারিত সংমিশ্রণ।

ঘর তোলা শেষ হইতে দিন দশেক সময় লাগিল। তারপর একদিন বঙ্কুব সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল গোপির।

কপিলা আসিল বিবাহে।

সে না আসিলে বিবাহের কাজ করিবে কে ? মালা তো পঙ্গু।

কুবের খুশি হইয়া বলিতে লাগিল, আইছস কপিলা, আইছস ? কুবের যেন ভুলিয়া গিযাছে চরডাঙ্গার পুকুরের জলে কী কথা তাহার হইয়াছিল কপিলার সঙ্গে। কিন্তু কপিলা সব মনে পড়াইয়া দেয়। সরিয়া সরিয়া পালাইয়া বেড়ায় কপিলা, ঢেঁকিঘরের ভিতরে দাঁড়াইয়া কুবের ইশারা করিয়া কাছে ডাকিলে মুখ ঘুরাইয়া থাকে। এ তো ছলনা নয়, খেলা নয় কপিলাব। কী যেন ভাবিয়া আসিয়াছে কপিলা এবার, বড়ো সে গম্ভীর। একটু হাসি, দুটি কথাব কাঙাল কুবের, কপিলার হাসি কই, কথা কই কপিলার মুখে ?

হলুদ মাখিতে মাখিতে হলদে হইয়া বিবাহ হইয়া গেল গোপির। বব-কনেকে কুবের পদ্মার নৌকায় তুলিয়া দিল। গোপি আবার ফিরিয়া আসিবে। হোসেন মিয়ার তাড়াতাড়ি নাই। বঙ্কু ও গোপি দুমাস দেশে থাক, তাতে সে আপত্তি করিবে না।

বিবাহের পরই কপিলার ফিরিয়া যাওয়ার কথা ছিল, কী ভাবিয়া সে রহিয়া গেল। কদিন পরে শ্যামাদাস আসিয়া তাকে আকুরটাকুর লইয়া যাইবে। দিন দুই পরে কুবেরকে হোসেন মিয়ার একটা চালান আনিতে যাইতে হইল। মাইল দশেক উজানে একটা গ্রামের ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া সে পাট বোঝাই করিল নৌকায়। তারপর দেবীগঞ্জ ফিরিয়া আসিল অনেক রাত্রে।

সকলে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অত রাত্রে কেতুপুরে ফিবিতে রাজি হইল না। কুবেরের মন পড়িয়াছিল বাড়িতে। নদীর ধারে ধারে সে হাঁটিতে আরম্ভ করিল গ্রামের দিকে। নদীতে জেলে নৌকার আলোগুলি ইতস্তত সঞ্চালিত হইতেছে, মাছ ধরিবাব কামাই নাই পদ্মায়। চলিতে চলিতে কত কী ভাবে কুবের। কারও ঘুম না ভাঙাইয়া কপিলাকে কি তোলা যাইবে না ? আর কিছু চায় না কুবের কপিলার কাছে, গোপনে শুধু দুটা সুখ-দুঃখের কথা বলিবে। একটু রহস্য করিবে কপিলার সঙ্গে। বাঁশের কঞ্চির মতো অবাধ্য ভঙ্গিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কপিলা টিটকারি দিবে তাকে, ধবিযা নোয়াইয়া দিতে গেলে বসিয়া পড়িবে কাদায়, চাপা হাসিতে নির্জন নদীতীরে তুলিয়া দিবে বোমাঞ্চ।

আর কিছুই কুবেব চায় না।

কেতুপুরের ঘাটে পৌঁছাইয়া কুবেরের বুকের মধ্যে হঠাৎ কাঁপুনি ধরিয়া গেল, গলা শুকাইয়া গেল কুবেরের। স্পষ্ট সে দেখিতে পাইল সাদা কাপড় পরিয়া এতরাত্রে একটি রমণী ঘাটে দাঁড়াইয়া আছে। কোনো দিকে মানুষের সাড়া নাই, পদ্মার জল শুধু ছলাৎ ছলাৎ করিয়া আছড়াইয়া ভাঙা তীরকে ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছে, নদীর জোরবাতাসে সাদা কাপড় উড়িতেছে একাকিনী রমণীর।

ভীত কর্কশ কণ্ঠে কুবের বলিল, কেডা খাড়াইয়া আছ গো, কেডা ?

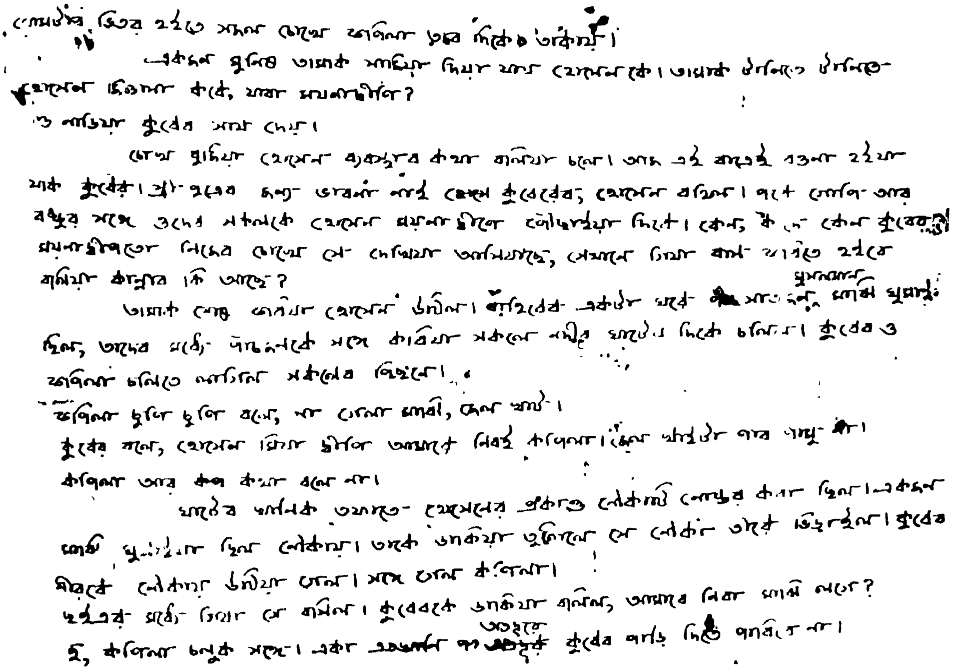
নদীর দিকে মুখ করিয়া রমণী দাঁড়াইয়া ছিল, কুবেরের গলার আওয়াজে চমকাইয়া অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল। তারপর ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কেডা ? মাঝি আইলা ?

কুবের অবাক হইয়া বলিল, কপিলা ? দুপুর রাইতে ঘাটে কী করস কপিলা ?

কপিলা কাছে আসিল, বলিল, ডরাইছিলাম মাঝি !

তারপর আরও কাছে আসিল কপিলা, কুবেরের বক্ষের আশ্রয়ে সে কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বড়ো বিপদ হইয়াছে আজ। আজ বিকালে হঠাৎ পুলিশ আসিয়া বাড়ি তল্লাশ করিয়াছে কুবেরের, ঢেঁকিঘরের পাটখড়ির বোঝার তলে পীতম মাঝির চুরি যাওয়া ঘটিটা পাওয়া গিয়াছে। বাড়ি ফিরিলেই চৌকিদার ধরিবে কুবেরকে। সন্ধ্যার পর চুপিচুপি কপিলা তাই ঘাটে আসিয়া বসিয়া আছে। কুবের ফিরিলে সতর্ক করিয়া দিবে।

কুবেরেব মুখে কথা সরিল না।


গোয়ালের ভিতর হইতে সজল চোখে কপিলা তার দিকে তাকায়।

একজন মুনিষ তামাক সাজিয়া দিয়া যায় হোসেনকে। তামাক টানিতে টানিতে হোসেন জিজ্ঞাসা করে, যাবা ময়নাদ্বীপি?

মাথা নাড়িয়া কুবের সায় দেয়।

চোখ বুজিয়া হোসেন ব্যবস্থার কথা বলিয়া চলে। আজ এই রাত্রেই রওনা হইয়া যাক কুবের। স্ত্রী-পুত্রের জন্য ভাবনা নাই কোনো কুবেরের, হোসেন বলিল। পরে গোপি আর বঙ্কুর সঙ্গে ওদের সকলকে হোসেন ময়নাদ্বীপে পৌঁছাইয়া দিবে। কেন, কী যে কেন কুবেরের ময়নাদ্বীপেতে নিজের চোখে সে দেখিয়া আসিয়াছে, সেখানে গিয়া বাস করিতে হইবে বলিয়া কান্নার কি আছে?

তামাক শেষ করিয়া হোসেন উঠিল। বাহিরের একটা ঘরে সাত-আটজন মুসলমান মাঝি ঘুমাইয়া ছিল, তাদের মধ্যে পাঁচজনকে সঙ্গে করিয়া সকলে নদীর ঘাটের দিকে চলিল। কুবের ও কপিলা চলিতে লাগিল সকলের পিছনে।

কপিলা চুপি চুপি বলে, না গেলা মাঝি, কেন যাও।

কুবের বলে, হোসেন মিয়া দ্বীপি আমারে নিবই কপিলা। কেউ আটকাইতে পারব না।

কপিলা আর কথা বলে না।

ঘাটের খানিক তফাতে হোসেনের প্রকাণ্ড নৌকাটি নোঙর করা ছিল। একজন মাঝি ঘুমাইয়া ছিল নৌকায়। তাকে ডাকিয়া তুলিলে সে নৌকা তীরে ভিড়াইল। কুবের নীরবে নৌকায় উঠিয়া গেল। সঙ্গে গেল কপিলা। ছইএর মধ্যে গিয়া সে বসিল। কুবেরকে ডাকিয়া বলিল, আমারে নিবা মাঝি লগে?

হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারিবে না।

পদ্মানদীর মাঝি পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

অনেকক্ষণ পরে সে বলিল, রাসুর কাম। সব্বোনাশ করব কইছিল না রাসু—রাসুর কাম।

কী করবা মাঝি ?

কে জানে কী করিবে! বিপদে-আপদে মুখ চাহিবার একজন আছে কুবেরের, তার কাছে গিয়া দাঁড়াইবে। ঘাটে হোসেনের নৌকা বাঁধা আছে দেখিয়া কুবের একটু আশ্বস্ত হইল।

কপিলার চোখ মুছাইয়া দিল কুবের, বলিল, বাড়িত্ যা কপিলা।

তুমি কী করবা ?

হোসেন মিয়ারে বিত্তান্ত কই গিয়া, দেখি স্যায় কী কয়।

আমি লগে যামু মাঝি।

হ, বাঁশের কঞ্চির মতো অবাধ্য কপিলা। কোনোমতেই কুবের তাহাকে বাড়ি পাঠাইতে পারিল না। কুবেরের সঙ্গে সে হোসেন মিয়ার বাড়ি গেল। হোসেনকে কিছু বলিতে হইল না, খবর সে আগেই শুনিয়াছে। লালচে দাড়ি মুঠা করিয়া ধরিয়া সে ভাবিতে ভাবিতে বলিল, ময়নাদ্বীপি যাবা কুবির ? চুরি আমি সামাল দিমু।

আমি চুরি করি নাই মিয়া!

তা কি হোসেন মিয়া জানে না ? কিন্তু চোরাই মাল যখন বাহির হইয়াছে কুবেরের ঘরে, চোরকে সেখানে মাল রাখিয়া আসিতে কেহ যখন দেখে নাই, কে বিশ্বাস করিবে কুবেরের কথা ? বাহিরের কেহ শত্রুতা করিয়া রাখিয়া যাইতে পারে এমন কোনো স্থানে মাল বাহির হয় নাই, একেবারে ঘরের মধ্যে লুকানো অবস্থায় মাল পাওয়া গিয়াছে। তা ছাড়া গরিব নয় কুবের ?

বিবর্ণ মুখে কুবের মাথা হেঁট করিয়া থাকে।

ঘোমটার ভিতর হইতে সজল চোখে কপিলা তার দিকে তাকায়।

একজন মুনিষ তামাক সাজিয়া দিয়া যায় হোসেনকে। তামাক টানিতে টানিতে হোসেন জিজ্ঞাসা করে, যাবা ময়নাদ্বীপি ?

ঘাড় নাড়িয়া কুবের সায় দেয়।

চোখ বুজিয়া হোসেন ব্যবস্থার কথা বলিয়া চলে। আজ এই রাত্রেই রওনা হইয়া যাক কুবের। স্ত্রী-পুত্রের জন্য ভাবনা নাই কুবেরের, হোসেন রহিল। পরে গোপি আর বঙ্কুর সঙ্গে ওদের সকলকে হোসেন ময়নাদ্বীপে পৌঁছাইয়া দিবে। কেন, কাঁদে কেন কুবের ? ময়নাদ্বীপ তো নিজের চোখে সে দেখিয়া আসিয়াছে, সেখানে গিয়া বাস করিতে হইবে বলিয়া কান্নার কী আছে ?

তামাক শেষ করিয়া হোসেন উঠিল। বাহিরের একটা ঘরে সাতজন মুসলমান মাঝি ঘুমাইয়া ছিল, তাদের মধ্যে পাঁচজনকে সঙ্গে করিয়া সকলে নদীর ঘাটের দিকে চলিল। কুবের ও কপিলা চলিতে লাগিল সকলের পিছনে।

কপিলা চুপিচুপি বলে, না গেলা মাঝি, জেল খাট।

কুবের বলে, হোসেন মিয়া দ্বীপি আমারে নিবই কপিলা। একবার জেল খাইটা পার পামু না। ফিরা আবার জেল খাটাইব।

কপিলা আর কথা বলে না।

ঘাটের খানিক তফাতে হোসেনের প্রকাণ্ড নৌকাটি নোঙর করা ছিল। একজন মাঝি ঘুমাইয়া ছিল নৌকায়। তাকে ডাকিয়া তুলিলে সে নৌকা তীরে ভিড়াইল। কুবের নীরবে নৌকায় উঠিয়া গেল। সঙ্গে গেল কপিলা।

ছইয়ের মধ্যে গিয়া সে বসিল। কুবেরকে ডাকিয়া বলিল, আমারে নিবা মাঝি লগে ?

হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারিবে না।

পিরীত কইর‍্যা জ্বইলা মলাম সই, আলো সই!
আগুন যাতন সমান সোনার, গড়লা চুকা দে!
আলো সই!

থাকলি' ঘরে ছ্যাচন কেমন, চৌকির তলে চিড়া যেমন,
বিদেশ গেলি মনের পোড়ন, ভাইঙা কবে খে!
আলো সই!

পদ্মানদীব মাঝি পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

জীবনের জটিলতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছেলেমেয়েদের জলখাবারের জন্য আজ সকালে আলুভাতে রাঁধিবার সময় অনুরূপার ছিল না। বিমল ও প্রমীলার হাতে একটি করিয়া পয়সা দিয়া সে তাই বলিল, মুড়ি কিনে খাবি যা বাপু আজ, ভাত হয়নি।

পয়সাটা হাতে পাওয়ামাত্র বিমল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

গেল সে বিড়ির দোকানে, কিনিল এক পয়সার বিড়ি।

মুড়ি খাইলে পেট ভরে কিন্তু বিমলের নেশা নূতন—ক্ষুধার চেয়ে জোরালো। কাল সন্ধ্যা হইতে সে বিড়ি খাইতে পায় নাই। পুকুরপাড়ে দাঁড়াইয়া পরপর তিনটা বিড়ি শেষ করিয়া সে পড়িতে বসিল।

আর ভাঙা ছাতিটি মাথায় দিয়া প্রমীলা গেল মুড়ি কিনিতে। যাইতে যাইতে দ্যাখে, ওমা এ কী ! গোবুর গাড়ির চাকায় রাস্তায় যে সরু নদী সৃষ্ট হইয়াছে তারই একটার তীরে চকচক করিতেছে রুপার একটা সিকি।

সিকিটা কুড়াইয়া নিয়া উত্তেজনায় প্রমীলার ছোটো বুকখানি কাঁপিতে লাগিল। সকালে ঘুম ভাঙিয়া বালিশের তলে কোনোদিনই সোনার মোহর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু পথে রুপার সিকি কুড়াইয়া পাওয়া কি তার চেয়ে কম ? হঠাৎ লাখ টাকা পাইলে আমার যেমন অশান্তি হয়, চার আনা পয়সা পাইয়া মেয়েটার মন তেমনি আশ্চর্য সুখকর অশান্তিতে ভরিয়া গিয়াছে।

মুড়ি আর কেনা হইল না। প্রমীলা বাড়ি ফিরিল।

কী পেয়েছি দ্যাখো দাদা ! মোটর কিনব, পুতুল কিনব, আরও কত কী আমি কিনব ! বলিতে বলিতে আনন্দে প্রমীলার গলা বুজিয়া আসে।

কোথায় পেলি রে ?

রাস্তায় পড়েছিল—আমি দেখতে পেলাম !

কোন রাস্তায় পড়েছিল ?

পাঁচুদের বাড়ির সামনে।

বিমল মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, ওটা আমার সিকি, দে।

প্রমীলার মুখ শুকাইয়া গেল। এ রকম একটা অন্যায় ডাকাতির আশঙ্কা প্রথম হইতেই তাহার ছিল, কিন্তু মা অথবা বাবার বদলে দাদাই যে ডাকাত হইয়া দাঁড়াইবে এটা সে ভাবিতে পারে নাই। পলাইবার উপায় থাকিলে সে পলাইত, কিন্তু বিমল শক্ত করিয়া হাত ধরিয়া আছে।

বা রে, আমি যে কুড়িয়ে পেলাম !

বিমল বলিল, তুই কুড়িয়ে পেলে কী হবে—ওটা আমার সিকি। কাল সন্ধ্যাবেলা আমার হাত থেকে ওখানে ওটা পড়ে গিয়েছিল। দে—দে বলছি, মিলি, সিকি !

এমনিভাবে বাঁধিল কলহ। গোলমাল শুনিয়া অনুরূপা ব্যাপার দেখিতে আসিয়া সিকিটি আঁচলে বাঁধিয়া আবার রাঁধিতে গেল। বিমল অবশ্য মার পিছুপিছু ধাওয়া করিয়া গেল রান্নাঘর পর্যন্ত, কিন্তু অনুরূপার কাছ হইতে একটা সিকি আদায় করা তার কর্ম নয়। ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল প্রমীলা কাঁদিতেছে। মনটা বিমলের বড়ো খারাপ হইয়া গেল। চার আনা পয়সা হাতে আসিলে প্রমীলার কান্নায় বিচলিত হইত কি না কে জানে—এখন মুখখানা তাহার বিষণ্ণ দেখাইতে লাগিল। ছোটো বোন—তার প্রতি একটা গভীর অন্যায় যে করিয়াছে শুধু তাই নয়—মিছামিছি নিজেকে সে হীন করিয়াছে একেবারে অকারণে।

প্রমীলার দুঃখ অবর্ণনীয়। একটি স্প্রিং দেওয়া মোটরের সাধ অনেকদিনের, চার আনা পয়সা দিয়া মোটর তো কেনা যাইতই, পুতুলও কেনা যাইত,—আর দু পয়সার লেবেঞ্চুস। দাদা এ কী করিল ! মাঝে মাঝে চালাইতে চাহিলে দাদাকে সে কী মোটরটা চালাইতে দিত না ? লেবেঞ্চুসের ভাগ দিত না ? ও রকম করিয়া দাদার তবে লাভটা হইল কী ?

দাদার এই লাভের হিসাবটা প্রমীলা কোনোদিন বুঝিতে পারে না। সে দিন জলের কলসি ভাঙিয়া ফেলার কথাটা মাকে বলিয়া দিয়া ওর লাভ কী হইয়াছিল ? স্কুল হইতে রঙিন মলাটের ছবির বই আনিয়া সে তাহাকে দেখিতে দেয় না—অনেক পায়ে পড়িলে দেয়। সে তার পুতুল লুকাইয়া রাখে, তাকে মিছামিছি কাঁদায়, তার চুল ধরিয়া টানিতে ভালোবাসে। কেন যে এসব করে ?

অনুরূপার অবশ্য নিত্য খরচের টানাটানি, কিন্তু তাই বলিয়া মেয়ে যে সিকিটা পথে কুড়াইয়া পাইয়াছে এবং যেটা কাড়িয়া নেওয়ায় আকুল হইয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছে সেটা সংসার খরচে লাগানোর মতো কঠিন মন তার নয়। বিকালে বিমলকে সে চার আনার মিষ্টি আনিতে দিল।

বিমল ঘুরিয়া আসিয়া সিকিটা ফেরত দিল, অচল। যেটিকে উপলক্ষ করিয়া এত কাণ্ড হইয়া গেল তার দাম সিকি পয়সাও নয়। সিকিটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া অনুরূপা বলিল, নে মিলি, তোর সিকি তুই নে তবে।

প্রমীলা বলিল, চাইনে। আমার ভালো সিকি নিয়ে খারাপ দেওয়া হচ্ছে।

তবে তুই নে।

বিমল বিনা প্রতিবাদে সিকিটা গ্রহণ করিল। পরে কাজে লাগিবে। কীভাবে লাগিবে ইতিমধ্যেই সে তাহা ভাবিয়া ফেলিয়াছে।

পরদিন রথ দেখার জন্য বিমল দু আনা পয়সা পাইল। মেলায় পৌঁছিল চারিটি পয়সা। পথে সে এক পয়সার বিড়ি কিনিয়াছে, আর তিন পয়সার জিলাপি খাইয়াছে। মেলায় ঘুরিতে ঘুরিতে সে বারকয়েক অচল সিকিটা চালাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সেটা এমনই অচল যে কোনোমতেই চলিল না।

ভাব তাহাদের দুপুরবেলাই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিমলের অনুতাপ কমে নাই। জেলপলাতক কয়েদির মতো সর্বদা অত্যন্ত লজ্জাকর অবস্থায় ধরা পড়িবার ভয় মনের মধ্যে চাপিয়া বসিয়াছে। কয়েকটি স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইল, কিন্তু তাদের সঙ্গ ভালো লাগিল না। দাঁড়াইয়া সে খানিক যাত্রা শুনিল। ওদিকে পুতুলনাচ হইতেছিল, প্রমীলা আর বাবাকে সেখানে দেখিয়া সে তার কাছে গেল না। যেখানে সকলে ভিড় করিয়া বালা খেলিতেছিল সেখানে গিয়া ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

কতক্ষণ খেলা দেখিয়া সে চার পয়সার চারিখানা বালা কিনিল। চৌকিতে লাল শালুর উপরে কত টাকা আধুলি সিকি দুয়ানি ছড়ানো ! ওর একটা সিকি যদি সে জিতিতে পারে তাহা হইলে প্রমীলার কাছে হঠাৎ যে বিশ্রী অপরাধ সে করিয়া ফেলিয়াছে তার প্রায়শ্চিত্তের উপায় হয়। পয়সা সে নিবে না, বলিবে, একটা রুপার সিকি দাও। সিকিটা যাতে অচল না হয়, খুব ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

সে একটা দুয়ানি জিতিল। কিন্তু তার প্রয়োজন সিকির, দুয়ানি দিয়া সে করিবে কী ! বিমল আরও বালা কিনিল, খুব সাবধানে দ্যাখে—বালাটা টাকার উপর দিয়া সিকির উপর দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া ছুঁড়িতে লাগিল। প্রত্যেকটি বালা ছোঁড়ে আর ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া টাকা আর আধুলি সিকি দুয়ানির ভিড়ের মধ্যে সংকীর্ণতম ফাঁকা স্থানটুকু বাছিয়া নিয়া স্থির হয়।

শেষে বিমলের সবগুলি বালা ফুরাইয়া গেল। বিমলের কান্না আসিতে লাগিল। ভিড়ের মধ্যে তার নিশ্বাস আটকাইয়া আসে। মুখ আমসির মতো শুকাইয়া গিয়াছে।

সকালে যা করিয়া ফেলিয়াছে সেটা ফিরাইয়া লইবার কোনো উপায়ই নাই, এইটুকুই তার কাছে অতি ভয়ানক মনে হয়। সে এখন যাই করুক, রাস্তায় মাথা খুঁড়ুক, না খাইয়া মরিয়া যাক, কিছুতেই আর সকালবেলার ব্যাপারটার প্রতিকার করা যাইবে না।

এ কী নিষ্ঠুর উপায়হীনতা !

কয়েকদিন পরে অনুরূপা একটা টাকা দিয়া বিমলকে মুদির দোকানে জিনিস আনিতে পাঠাইয়াছে ; দেখা গেল ফেরত পয়সার মধ্যে আনিয়াছে একটা অচল সিকি। প্রমথ স্বয়ং তৎক্ষণাৎ মুদির কাছে গেল বটে, কিন্তু সিকি সে ফেরত নিল না।

বিমল ধরা পড়িল পরদিন। সাত বছরের মেয়ের অবস্থা সচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সন্দিগ্ধা অনুরূপা জেরা আরম্ভ করাতে সব প্রকাশ হইয়া গেল। এত পয়সা তুই কোথা পেলি রে মিলি !

দাদা দিয়েছে।

কত দিয়েছে ?

চার আনা। কী বললে জান মা ! বললে, নে মিলি, তোকে দিলাম, মোটর কিনিস।

সে রাত্রে ভাইবোনের জ্বর আসিল। ওষুধে ডাক্তারে প্রমথের সাতাশ টাকা খরচ হইয়া গেল।

পথে কুড়াইয়া পাওয়া একটা অচল সিকিকে আশ্রয় করিয়া এত ব্যাপার ঘটিয়া যায়। এমনই মানুষের জীবন, এমনই জীবন মানুষের !

তখন অনুরূপার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে সেদিন মুদির দোকানের ফেরত পয়সার অচল সিকিটা কোথা হইতে আসিযাছিল। বিমলকে সে এমন মার মারিল বলিবার নয়। কথাটা একবারও ভাবিয়া দেখিল না যে অচল একটা সিকি যদি বিমল কৌশলে তার ঘাড়ে চালান করিয়া দিয়াই থাকে কাজটা সে করিয়াছে বোনের জন্য—মিলির জন্য। পয়সা চার আনা সে তো নিজের জন্যও রাখিতে পারিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সারা বিকালটা ঘুরিয়াও পাঁচটা টাকা জোগাড় করা গেল না। আবার নগেনের কাছে হাতপাতা ছাড়া উপায় নাই।

কিন্তু নগেন এখন ক্লাবে গিয়াছে নিশ্চয়, আটটা নয়টার আগে বাড়ি গেলে তাকে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিমল বাড়ি ফিরিল।

গলির নাম জীবনময় লেন, দু পাশের বাড়ির চাপে বহুকাল জীবন ত্যাগ করিয়াছে—শবের মতো শীতল। বারচারেক দিক পরিবর্তন করিয়া এই গলি যে পুরাতন বাড়িটির বাহিরের জীর্ণ দরজায় শেষ হইয়াছে সেই বাড়িতে প্রমথ আজ সাত বৎসর সপরিবারে বাস করিতেছে। প্রমথ এখন ভালো চাকরি করে, একশো সতেরো টাকা মাহিনা ; কিন্তু ছেলেমেয়ের সংখ্যা উপার্জনের অনুপাতে বেশিই বাড়িয়াছে। সুতরাং অনুরূপার খরচের টানাটানি কমে নাই।

ছেলে যে মানুষ হইল না। নইলে কি এত কষ্ট হয়। প্রত্যেক মাসের শেষের দিকে অনুরূপা আজকাল এই কথা বলিতে শুরু করিয়াছে। কথাটা বিমলের কানে যায়, কিন্তু মনে লাগে না। লাগিলেও লাভ নাই। উপার্জনের পথ পাইলে তো সে উপার্জন করিবে ? আকাশে টাকা নাই, হাত বাড়াইলে দুই হাতের অঞ্জলি টাকায় ভরিয়া যায় না। পাঁচটা টাকার জন্য সারাটা বিকাল ঘুরিয়া বেড়াইলেও একটা টাকার জোগাড় হইয়া উঠে না। সে করিবে কী ?

বিমল যখন বাড়ি ফিরিল, প্রমীলা আর শান্তা রোয়াকে বসিয়া গল্প করিতেছে। শান্তা চওড়া লালপাড় শাড়ি পরিয়াছে। এ যেন তার প্রকাশ্য যুদ্ধঘোষণা।

কোথায় টোটো কোম্পানি করে এলেন ? প্রমীলা বলিল, সম্পাদকদের বাড়ি বোধ হয় ?

শান্তা হাসিয়া বলিল, ওমা, সে কী ? এখনও সম্পাদকেরা আপনার বাড়িতে এসে ধরনা দেয় না ? অতগুলি কবিতা ছাপলেন !

বিমল নীরসকণ্ঠে বলিল, কতগুলি কবিতা ছাপলাম ?

সতেরোটা।

বিমল বিস্মিত হইয়া বলিল, আমি কতগুলি কবিতা ছাপলাম তার হিসেব রাখার জন্য আপনি খাতা খুলেছেন নাকি ?

না, যে কবিতা পড়তে প্রাণ বেরিয়ে যায়, তার কটা পড়লাম তা এমনি হিসেব থাকে।

আমি কাউকে আমার কবিতা পড়তে মাথার দিব্যি দিইনি।

কিন্তু জীবন দিয়েছেন। কবিতা লেখার জন্য নিজের ভবিষ্যৎটা মাটি করলেন, সে বুঝি মাথার দিব্যি দেওয়ার চেয়ে কম ?

এ নিন্দা, না প্রশংসা বোঝা দায়। সোজাসুজি নিন্দা করিলে বিমলের ভালো লাগিত।

যাই হোক, আপনার ঠিক হয়নি। আমি কুড়িটা কবিতা ছেপেছি।

বিমল পকেট হইতে দুটি মাসিকপত্র বাহির করিল। এতখানি আগ্রহের সঙ্গে শান্তা সে দুটি আয়ত্ত করিয়া নিল যে বিমলের মনে হইল, যতকাল বাঁচিবে রাতদুপুরে বিনিদ্র বেদনা ও অসহ্য আবেগের পীড়ন সহিয়াও সে প্রত্যহ কবিতা লিখিবে। শান্তার সিঁথির সিঁদুরের মতো উদ্ধত কল্পনা নয়, শান্তার হাসিটির মতো ম্লান স্তিমিত ভাবসম্পদ আজ হইতে তার কবিতায় যেন প্রাণবন্ত হয়।

আজ আপনার দু বার প্রাণ বেরোবে।

প্রমীলা বলিল, দু বার কারও প্রাণ বেরায়?

শান্তা বলিল, কারও কারও বেরোয় ভাই, দুবার ছেড়ে দশবাব বেরোয়। বলে, পলকে পলকে কত লোকের প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে!

বিমল বলিল, যেমন আমার।

শান্তার কথা শেষ হইতেই প্রমীলা ডালের অবস্থা দেখিতে রান্নাঘরে গিয়াছিল, নহিলে এ কথা বলিবার সাহস বিমলের হইত না।

শান্তা নির্বিবাদে বলিল, আপনি যে দুঃখবাদী কবি, আপনার কবিতা পড়লেই সেটা বোঝা যায়। সারাদিন ছিলেন কোথায়?

সারাদিন মানে যদি তিনটে থেকে হয়, টাকার খোঁজে পথে পথে ঘুরছিলাম।

আর আমি আজ সারাদিন টাকার বোঝা বয়ে ঘুরছি। শান্তা আঁচল খুলিয়া দেখাইল। অনেকগুলি নোট।—ধার নেবেন?

ধার কেন, দান করুন না?

নেওয়া যায় না, নিতে নাই, কিন্তু নিতে সে অনায়াসে পারে। ও টাকা শান্তার স্বামী উপার্জন করিয়াছে, তবু নেওয়া যায়। শান্তা খুশি হইবে। শান্তা পরিহাসের মতো করিয়া ধার দিতে চাহিল, সে পরিহাসের মতো করিয়া নিতে অস্বীকার করিল, কিন্তু শান্তার দেওয়ার আগ্রহ ও তার নেওয়ার প্রয়োজন কোলাকুলি করিল নেপথ্যে।

শান্তা বলিল, আপনি কবি নন। কবি হলে নিতেন। টাকা কারও নয়, যার দরকার হয় তার। আপনার খিদে পেলে আমি খেতে দেব, আপনি খাবেন। তাতে দোষ নেই। টাকার দরকার হলে আমি দেব, কিন্তু আপনি নেবেন না। এটা ঠিক নয়। দরকারের হিসেবে খাবারও যা, টাকাও তাই।

বিমল বলিল, ওটা থিয়োরি। ওগুলি স্বীকার করা যায়, পালন করা যায় না। আপনি সেদিন স্বীকার করলেন পাপপুণ্য বলে কিছু নেই। কিন্তু তাই বলে পাপ করতে পারেন?

খুব পারি। আমি ঢের পাপ করেছি।

বিমল বলিল, পাপ কাকে বলে আপনি তা জানেন না।

তবে আমার খুব সুবিধা। না জেনে যত খুশি পাপ করব—পাপ হবে না।

প্রমীলা ফিরিয়া আসিয়াছিল। তার সামনে শান্তা এ কথাটা না বলিলেই বিমল খুশি হইত।

প্রমীলা বলিল, আমার উনুনে একবার না জেনে হাত দেবে চল, দেখবে হাতটা ঠিক পুড়ে যাবে।

শান্তা আশ্চর্য হইয়া বলিল, তা যাবে না? যাবেই তো !

জানালা-প্রেমটা সাধারণত বাজে প্রেমের পর্যায়ে পড়ে। ও যেন পাশাপাশি দুটি বাড়ির বিশেষ অবস্থানের সুযোগ নিয়া দুপক্ষেরই পরস্পরের সঙ্গে একটু তামাশা করা। কিন্তু কতগুলি কারণে বিমলের প্রেমটা বাজে হইয়া যায় নাই। সবচেয়ে বড়ো কারণটা অবশ্য তাহার হৃদয়, কিন্তু তেইশ বছরের একটা অপদার্থ ছেলের হৃদয়ের কথাটা সংসারের অভিজ্ঞ লোকেরা সসন্দেহে মাথা নাড়িবে। অর্থাৎ, না হে বাপু লেখক, ওটা হৃদয় নয় ফাজলামি।

ছোটো কারণগুলির মধ্যে একটা হইল এই যে শান্তাকে ভালোবাসার চেয়ে ঢের সহজে ও সুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে অন্য কাহাকেও ভালোবাসার সুযোগ বিমলের ছিল। এমন কী, বি এ পাস অত্যন্ত আধুনিক একটি মেয়েকে ভালোবাসিয়া সে অনায়াসে নিজের জীবনে খুব একটা রোমান্টিক বিবাহ ঘটাইয়া ফেলিতে পারিত। আত্মীয়স্বজনের বিস্ময় ও ত্রাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কপর্দকহীন কবি-স্বামীকে নিয়া খেলার ঘরের উপন্যাস সৃষ্টি করিতে লাবণ্য আজও রাজি আছে এবং বিমল তাহা জানে। তবু শান্তাই তাহাকে জয় করিয়াছে;—বয়েল বিডার-পড়া পরের বউ গেঁয়ো মেয়ে শান্তা। জীবন একটা অদ্ভুত কাব্য।

আর একটা কারণ বৈচিত্র্য। ঠিক যে বৈচিত্র্য তাহা নয়, কারণ যত বিচিত্রই হোক ছয় মাস ধরিয়া ব্যাপারটা একভাবে দিনের পর দিন একটানা ঘটিয়া চলিয়াছিল।

প্রথম আরম্ভ হয় বর্ষাকালের এক মেঘাচ্ছন্ন দুপুরে। সারা সকাল শান্তার জানালা বন্ধ ছিল। বন্ধ জানালার ওদিকে বেলা দশটার সময় বিমল পুরুষকণ্ঠে খুব তর্জনগর্জন শুনিয়াছিল। তারপর সব চুপচাপ হইয়া যায়। শান্তা কখন জানালা খুলিয়াছিল বিমল দ্যাখে নাই, দেখিলে তাড়াতাড়ি গেঞ্জি গায়ে দিত। একটা স্বপ্নবিভোর ঘুম দিয়া উঠিয়া বাস্তব স্বপ্নের মতো শান্তাকে সে আবিষ্কার করে।

পিঠে এলানো চুল, গায়ে সাদা শেমিজ আর পরনে নীলাম্বরী, আকাশের মেঘের গাঢ়তর প্রতিবিম্বের মতো। চোখ তুলিয়া শান্তা একবার চাহিয়া দেখিল, তারপর চোখ নামাইয়া বসিয়া রহিল। সরিয়া গেল না। বিমল আশ্চর্য হইয়া গেল।

সেই যে তাহাদের নির্বাক পরিচয় শুরু হইল ছয় মাসের মধ্যে তাহা না নিল রূপান্তর, না গেল থামিয়া। সকালে শান্তার জানালা বন্ধ থাকে। সাড়ে দশটায় অধর অফিসে গেলে জানালা খুলিয়া শান্তা আধঘণ্টাখানেক চুপচাপ জানালায় বসিয়া থাকে, তারপর স্নান করিয়া খাইয়া বিমলের দৃষ্টির অন্তরালে খাটে শুইয়া ঘুমায়। আবার জানালায় আসে বৈকালে রোদের তেজ যখন কমিয়া আসিয়াছে, পশ্চিমে বড়ালদের চারতলা বাড়ির সুদীর্ঘ ছায়াটি যখন গড়াইয়া শান্তার জানালার গোড়ায় আসিয়া পড়িয়াছে।

বিমলের দিকে সে কখনও তাকায় না। দিনের পর দিন বিমলের সাহস যে বাড়িতেছে, ক্রমে ক্রমে সে যে একেবারে নিজের জানালার কাছে চেয়ার সরাইয়া আনিয়া প্রকাশ্যভাবে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, এ বিষয়ে সে যেন সচেতন নয়। পাছে সচেতন না হইয়া আর উপায় থাকে না, এই জন্যই সে যেন বিমলের দিকে তাকায় না।

মাঝে মাঝে শান্তা প্রমীলার কাছে আসে, কিন্তু বিমলকে দেখিলে ঘোমটা টানিয়া দেয়। বিমলকে মুখ দেখাইতে তার যেন লজ্জা করে। তার মুখ সে যেন চিরকালের জন্য বিমলের দৃষ্টির আড়ালে রাখিতে চায়।

ভাবিয়া ভাবিয়া বিমলের মাথা ঘুরিয়া যায়। এ কী ব্যাপার? শান্তা যদি পাগল না হয় তবে এর কী সংগত ব্যাখ্যা করা চলে? প্রমীলার কাছ হইতে সে তার কবিতার খাতা নিয়া ফেরত দিতে চায় না, প্রমীলার মুখে তার কথা শুনিতে সে ভালোবাসে, তারই জন্য সে প্রত্যহ জানালায় আসিয়া বসে, তবু তাহাকে দেখিয়া সে ঘোমটা দেয় কী হিসাবে? একবার চোখাচোখির সুযোগ দেয় না কেন? কথা বলিবার সাহস যাহাতে তাহার হয়, তার সামান্য একটু প্রেরণা দিতেও ওর এতখানি কার্পণ্য কেন? সারাটা জীবন তার চোখের সামনে ওইভাবে জানালায় বসিয়া কাটাইয়া দিতে চায় নাকি? অত কাছে আসিয়াও সুদূর গ্রহবাসিনীর মতো এই অবিশ্বাসী দূরত্ব ও কী কোনোদিন কমিতে দিবে না?

শেষে একদিন বিমল কথা বলিল।

আপনাকে এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সকল অবস্থাতেই নির্দোষ।

শান্তার মুখ বিশেষ শুকনো দেখাইতেছিল না, বিমলের প্রশ্নেই বরং তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

কই, না? বলিয়া সে জানালা ছাড়িয়া সরিয়া গেল।

বিমল সভয়ে একবার বলিল বটে, রাগ করলেন? কিন্তু তার কোনো জবাব আসিল না।

তারপর কয়েকদিন শান্তার আর দেখা নাই। প্রথমটা বিমলের ভারী অনুশোচনা হইল, শেষে সে রাগ করিয়া ভাবিল, ভালোই হয়েছে। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেল। কাল থেকে দু বেলা লাবণ্যদের বাড়ি যাওয়া যাবে।

কিন্তু সেইদিন বিকালে প্রমীলার কাছে বেড়াইতে আসিয়া শান্তা বিমলেব সঙ্গে একেবারে আলাপ করিয়া গেল। কদিন ভাবিয়া শান্তা বুঝিতে পারিয়াছিল, যার চোখের ভাষা স্বীকার করিতে হয়, তার মুখের কথাটা ঠেকাইবার উপায় নাই। ঠেকানো ন্যায়সংগতও নয়। কবিতার বই কিনিতে যেমন কিছু পয়সা লাগে, জীবনে কাব্যের আমদানি করিতেও কিছু মূল্য দিতে হয়।

অর্থাৎ যুক্তি ও সমর্থন আবিষ্কার করামাত্র শান্তা নিশ্চিন্তমনে কাম্য অবস্থাটি বরণ করিয়া নিল। এর মধ্যে কোনো জটিলতা আছে বলিয়া বিশ্বাস করিল না। মনে মনে বলিল, বাঃ, আমাকেও বাঁচতে হবে ?

তারপর শান্তা বলিল, কী মজা হয়েছিল শোনো ভাই।

প্রমীলা বলিল, আমার ডাল পুড়ে যাবে।

কত লোকের কপাল পুড়ছে, তোমার না হয় একটু ডাল পুড়ল।

কথায় কথায় কত লোকের কত কী হচ্ছে। তুমি লোকটা যেন কী রকম ভাই।

স্পষ্ট বল না কেন, পাগল ! শান্তা একটু হাসিল।

আমি বলি আর না বলি, দাদা মাঝে মাঝে বলে। তবে স্পষ্ট করে বলে না, দারুণ সন্দেহে আমায় জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে মিলি, তোর বন্ধু পাগল নাকি ?

তখন প্রমীলার দাদাকে নিয়া তাহারা খানিকক্ষণ আলোচনা করিল। সে আর কী বলে ? সে আর কী করে? এক-একদিন অত রাতে বাড়ি ফেরে কেন ? সেদিন শান্তা খাতাপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছিল বলিয়া রাগ করিয়াছে নাকি ?

আলোচনা থামিল হঠাৎ। প্রমীলা ডাল নামাইতে গেল এবং শান্তার লজ্জা করিতে লাগিল। পরের দাদাকে নিয়া কি অত আলোচনা চলে ? প্রমীলা ফিরিয়া আসিলে সে আবার বলিল, কী মজা হয়েছিল শুনলে না ?

প্রমীলা বলিল, বল।

শান্তা বলিল, বিয়ের আগে মামার বাড়িতে ছিলাম, সে তো তুমি জান, তোমায় বলেছি। একদিন আমাব খুব জ্বর হল। খাই না দাই না, চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকি, মাঝে মাঝে অজ্ঞানও হয়ে যাই। সকালের ওষুধ কেউ দুপুরে খাইয়ে যায়, দুপুরের বার্লি কেউ সন্ধ্যার সময় এনে বলে, খা লো বার্লি খা। এখন তেষ্টা পেলে জল পাই একঘণ্টা পরে।

প্রমীলা মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, কী বাড়িয়েই বলতে পারে, বাঃ!

এদিকে, ঠিক সেই সময় মামিমার টিয়াপাখিটারও কী যেন অসুখ—খায়দায় না, ঘাড় গুঁজে আমার মতো ঝিমায়। একদিন শুনি মামিমা বারান্দায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলছে, হে ভগবান, ওকে আমার ভালো করে দাও, আমি সওয়া-পাঁচ-আনাব হরিলুট দেব। শুনে আমি তো চমকে উঠলাম। মামিমার মনে এত দরদ ! আস্তে আস্তে মামিমাকে ডাকলাম। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, কেঁদো না মামিমা আমি ভালো হয়ে যাব।

প্রমীলা হেসে বলিল, মামি কী বললে ?

মামির কথা আর নাই বা বললাম ! শান্তা হাসিল না। অতীতের এমন একটা হাস্যকর স্মৃতি মনে আসিলেও তার হাসি পায় না।

বিমল যখন নীচে নামিয়া আসিল, শান্তা বিদায় নিতেছে। বিমলের মনে হইল, শান্তা কেবলই বিদায় নেয়। সে যে কখন আসে, জানিবার উপায় নাই। শুধু যাওয়াটাই চোখে পড়ে।

তার আঁচলের এক কোণে চাবি বাঁধা, অন্য কোণটা খালি।

বিমল সহজভাবে বলিল, টাকা ফেলে যাচ্ছেন।

ওমা !

শান্তা নোটগুলি কুড়াইয়া নিল। একটু হাসিয়া বলিল, নিজে রোজগার করি না কী না, টাকায় দরদ নেই।

বিমল ভাবিল, এ কথাটা ও না বলিলেই ভালো কবিত। আজ তার টাকার এত দরকার, টাকা সম্বন্ধে এতখানি উদারতাব অভিনয় আজ কী ওর কবা উচিত ? সে তো অনায়াসে নিজেকে অপমানিত মনে করিতে পারে !

শান্তা চলিয়া গেলে প্রমীলা ভ্রু কুচকাইয়া বলিল, বগলদাবা করে ওটা কী নিয়ে যাচ্ছ দাদা ?

তা দিয়ে তোর দরকাব কী ?

আমার কিছু নয় তো ?

দিন দিন তুই বড়ো বেয়াদব হচ্ছিস মিলি।

প্রমীলা চাপা ব্যঙ্গের সুরে বলিল, কী করব বল, না হয়ে উপায় নেই। মাকড়িটা যাওয়ার পর থেকে নিজের জিনিসপত্র সম্বন্ধে আমাকে একটু সাবধান থাকতে হয়।

ক্ষণকালের জন্য মনে হইল ছেলেবেলার মতো বিমল হয়তো আজ এত বড়ো বোনকে মারিয়া বসিবে। কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিল।

কাল তোর মাকড়ি এনে দেব।

মাকড়ির জন্য আমার ঘুম আসছে না। বলিযা প্রমীলা রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

বিমল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রমীলার মাকড়ি সে চুরি করে নাই, ধার নিয়াছিল। না বলিয়াই নিয়াছিল অবশ্য, কিন্তু কয়েকদিনের জন্য বোনের মাকড়ি না বলিয়া নিলে কি চুরি করা হয় ? এমন সম্পর্ক ভাইবোনের ? বিমলের ইচ্ছা হইল কথাটা পরিষ্কার করিয়া নেয়। রান্নাঘরের দরজায় গিয়া জিজ্ঞাসা করে, তুই কি সত্যি আমাকে চোর মনে করলি মিলি ?

কিন্তু প্রমীলাকে কিছু না বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল।

মোড়ের মুদি দোকানে খবরের কাগজের বান্ডিলটা বিক্রি করিয়া পাঁচটা পয়সা পাওয়া গেল। বিমল এক পয়সায় একটা সিগারেট কিনিল। চার পয়সা ট্রামে লাগিবে।

ট্রামে পয়সা লাগিল না। কন্ডাক্টর টিকিট চাহিলে সে গম্ভীর গলায় বলিল, পাস। সবদিন এ ফিকির খাটে না, কিন্তু আজ খাটিল। কন্ডাক্টর নীরবে নিজের স্থানে ফিরিয়া গেল।

এতক্ষণে বিমলের মনে হইল সে সত্যসত্যই চারটা পয়সা উপার্জন করিয়াছে।

নগেনের বাড়িটা প্রকাণ্ড সামনে বাগান আছে। বাগানের আকৃতিতে সামঞ্জস্য নাই বলিয়া ভারী চমৎকার দেখায়। বাড়ির ডানদিক ঘেঁষিয়া অন্যলোকের বাড়ি, বাঁদিকে পিছনের দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত কয়েক হাত চওড়া গোলাপের ফুলশয্যা। বৎসরের কোনো কোনো সময় দোতলায় নগেনের ঘরে গোলাপের গন্ধ উঠিয়া আসে।

দমদমের কাকিমা আসায় নগেন আজ ক্লাবে যাইতে পারে নাই। দমদমের কাকিমা অত্যন্ত অভিমানিনী।

যেমনি অভিমানিনী তেমনি রূপসি। তিনি যেন একটা হ্রস্ব দীপশিখা। দেখিলে মনে হয় তিনি যে তিলোত্তমা নন, সে শুধু বেঁটে বলিয়া। গয়না পরিতে খুব ভালোবাসেন। ছোটো মেয়েটির মতো দেখাইত বলিয়া গয়না পরিলে তাহাকে মানায়ও।

প্রথম হইতেই সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, নগেনকে একান্তে পাইযা বলিলেন, তোমার কাকা বড়ো দুঃখ করেন, নগেন।

কেন কাকিমা ?

তুমি যাও না বলে বলেন, নগেন আমাদের পর করে দিয়েছে—আমাব অসুখ হলেও দেখতে আসে না।

নগেন লজ্জিত হইয়া বলিল, যাব যাব করি কাকিমা, সময় হয়ে ওঠে না।

কাকিমা গলার স্বর এমন করিয়া ফেলিলেন যেন অনুপস্থিত স্বামীর চেয়ে নগেনই তাহার বেশি আপনার।

কী জান বাবা, এমন দুর্বল প্রকৃতি ওর, কেউ না গেলে মনে করেন মিশুক স্বভাব নয় বলে ওকে অবহেলা করা হচ্ছে। ওকে নিয়ে আর পাবি না। সারাদিন মন খারাপ, উঠতে বসতে সোয়াস্তি নেই, কেবলই হাই তুলছেন, শরীর খারাপ হচ্ছে—

কাকিমা থামিলেন। কথা শুনিবার সময় নগেন এমন নির্বোধের মতো মুখের ভাব করিয়া থাকে বলিয়া ইহাকে কিছু বলিতে কী রকম যেন ভয় করে। মনে হয় কথা যেন ও শুনিতেছে না, কথাব পিছনে মনটাকে দেখিতেছে।

নগেন বলিল, এবার থেকে হরদম কাকার সঙ্গে দেখা করতে যাব কাকিমা।

শেষ হওয়া কথার রেশ ধরিয়া এমন অবাস্তব কথা বলে বলিয়া নগেনকে কিছু বলিতে আরও ভয় হয়। কাকিমা হাসিবার ভান করিয়া বলিলেন, আর গিয়েছ? কাল বাদে পরশু তো তুমি চললে লখনৌ।

কালকেই যাব কাকিমা।

কাকিমা চমকাইয়া বলিলেন, কালকেই চলে যাবে?

লখনৌ যাবার কথা বলছি না। কাল কাকার সঙ্গে দেখা করত যাব।

যেও, বলিয়া কাকিমা একরকম জোর করিয়া স্বামীর স্বাস্থ্যের কথাটা আবার টানিয়া আনিলেন। বলিলেন, ওঁর শরীরের অবস্থা দেখে বড়ো ভাবনায় পড়েছি বাবা।

নগেন গম্ভীর হইয়া বলিল, কাকা পরিশ্রম বড়ো কম করেন।

মানে, সে বলিতে চায় তার সঙ্গে লখনৌ হাওয়া বদল করিতে যাওয়ার দরকার নাই, এখানে থাকিয়া একটু পরিশ্রম করিলেই সজনীর শরীর ভালো হইয়া যাইবে। কিন্তু কাকিমা কথাটা বুঝিবার নমুনা দেখাইলেন না। বলিলেন, কম কী, একবারেই করেন না। বেড়াতে যেতে পর্যন্ত ওঁর আলস্য। দিনের মধ্যে অমন পঞ্চাশবার বলি, ওগো, অমন চুপচাপ বসে থেক না, একটু কিছু পরিশ্রম কর, নইলে শরীর টিকবে কেন? তা বলেন, উৎসাহ নেই। কেন তা থাকবে না বল তো ? আমার চেয়ে উনি পাঁচ বছরের বড়ো, ওঁর বয়স এই তেত্রিশ। এই বয়সে মানুষ অমন মনমরা নিরুৎসাহ হয়ে যাবে? সারাদিন হয় নভেল পড়ছেন, নয় কড়িকাঠের দিকে হাঁ করে চেয়ে মাথামুন্ডু ভাবছেন, আর নয়তো আমার সঙ্গে করছেন ঝগড়া। আর নয়তো মুখের ভাব এমন করে বসে আছেন যেন আজকেই ওর বউ মরে গেছে। তুমিই বল, এ কারও সহ্য হয় ?

নগেন মৃদুস্বরে বলিল, আমি জানি কাকিমা, কাকা বড়ো sensitive।

কাকিমা মুহূর্তে ম্লান হইয়া গেলেন :

তুমি কিছুই জান না বাবা। আমাব যে কী দুরদৃষ্ট! সেদিন পশ্চিমে যাওয়ার সব ঠিক করলেন, এক বছর দেড় বছর ঘুরবেন। অতদিনেব জন্য ওই মানুষকে আমি একা ছেড়ে দিতে পারি? বললাম, দু-একমাসের জন্যে হয়তো একাই যাও, নইলে আমি সঙ্গে যাব। এই নিয়ে ঝগড়া হল তিন দিন। তারপর পশ্চিমে যাওয়াই বন্ধ করে দিলেন, তবু আমায় নিতে বাজি হলেন না। কিন্তু একবার হাওয়া বদলানো ওঁর বড়ো দরকার বাবা। কী যে কবি আমি, বিষই খাই, না গলাতে দড়ি দিই—

বুঝিবে বলিযাই বলা, যে সামান্য ইঙ্গিতটুকু দেওয়া হইল তার সাহায্যে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পবিষ্কার বুঝিয়া নিতে যদি কেউ পারে নগেনই পাবিবে কাকিমার এই বিশ্বাস এবং আশা। সত্যকথা বলিতে কী, নগেনেব বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। সেটা অনুমান কবিয়া কাকিমার গাল আপেলের মতো লাল হইয়া উঠিল।

সমস্যা তাহার সহজ নয়। এক কথায় জবাব দেওয়া যায় না। অথচ এখনই কিছু বলা দরকার। কারণ, আজ অন্তত কাকিমার সমস্যার কী সমাধান সম্ভব, সে বিষয়ে আলোচনার একটু সূত্রপাত করিয়া না রাখিলে ভবিষ্যতে কাকিমাও আর এ কথা তুলিতে পাবিবেন না, সেও পারিবে না।

নগেন চিন্তিত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। এ রকম চিন্তা কবা তাব অভ্যাস আছে। নিজের জীবনে তাহার বৈচিত্র্য আছে, সমস্যা নাই। কারণ, নিজের হৃদয় সম্বন্ধে এই সুদর্শন যুবকটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর।

নগেন ভাবিয়া দেখিল, কাকিমার ইচ্ছাটি বিশেষ জটিল নয়। তিনি কিছুদিনেব জন্য স্বামীবিরহ প্রার্থনা করেন এবং সেই অবসরে স্বামীর স্বাস্থ্য ফিবিযা আসে এই ইচ্ছা রাখেন। অর্থাৎ সজনী নগেনের সঙ্গে চলিয়া যাক হাওয়া পরিবর্তনে এবং শিখিয়া আসুক যাব সঙ্গে সে অমন ঝগড়া করিত সে স্ত্রীব কতখানি দাম।

এই শেষ ইচ্ছাটাই কাকিমার সকল লজ্জার উৎস। আজ পনেরো বৎসর তাহাদেব বিবাহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে একদিনের জন্য তাহাদের ছাড়াছাড়ি হইযাছিল কিনা স্মবণ করা যায় না। কাকিমার বাপের বাড়ি নাই। ভালোবাসা কোনো পক্ষেরই কম নয়, কিন্তু দীর্ঘ মিলনটা আর তাহাদের সহ্য হইতেছে না—বিশেষ করিয়া সজনীর। দু পক্ষেরই পাওযা এত জমিয়া গিয়াছে যে, চাওয়ার আর কিছু অবশিষ্ট নাই, সে সাহসও হয় না। এবং কাকিমার চেয়ে সজনীই সর্বাংশে বেশি ভীরু।

কাকিমাকে লজ্জা না দিয়া নগেনকে এক ঢিলে দুই পাখি মারার কৌশলটা এখনই খানিক প্রকাশ করিতে হইবে। কিন্তু যাই সে বলুক, লজ্জা কাকিমা পাইবেনই। বিষয়টা যে লজ্জার। নগেন ভাবিয়া দেখিল কাকিমার লজ্জা নিবারণ করা যায় না, কিন্তু তাহার অনুপস্থিতিতে একা একা লজ্জা পাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়।

কাকিমাকে দেখাইয়া সে ঘড়ির দিকে চাহিল। ব্যস্ত হইয়া বলিল, আমার একবার বাইরে যেতে হবে কাকিমা, দেরি হয়ে গেল। কাল দমদমায় গিয়ে এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে আসব।

কাকিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, আচ্ছা।

নগেন বলিল, আমার মনে হয় আমাদের সঙ্গে লখনৌ গেলে কাকার শরীর ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু পরশু যদি আমরা যাই আপনি যাওয়ার ব্যবস্থা করে উঠতে পারবেন না। যাওয়ার হাঙ্গামা তো কম নয়। কাকাকে তা হলে একাই যেতে হবে, যাই হোক, কাল পরামর্শ করে একটা কিছু ঠিক করা যাবে কাকিমা।

নগেন আর দাঁড়াইল না।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিবেন, না কাঁদিবেন, কাকিমা ভাবিয়া পাইলেন না! শেষে একটা ঢোঁক গিলিয়া তিনি সিঁড়ির কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, জুতা বদলাইয়া নগেন যখন বাইরে যাইবে তখন তাহাকে দমদমায় ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে বলিবেন। এত রাত্রে এক-গা গয়না নিয়া শুধু দারোয়ানের সঙ্গে বাড়ির গাড়িতে বাড়ি ফিরিবার সাহস কাকিমার নাই। নগেনের মা ওদিকের ঘরে জ্বর হইয়া শুইয়া আছেন, ও ঘরেও কাকিমা আর ঢুকিতে চান না।

নগেনকে বিমল আবিষ্কার করিল তাহার ঘরে।

কাকিমা সিঁড়ির গোড়ায় পাহারা দিচ্ছেন কেন ?

আমি পালাতে গেলে আটকাবেন।

কাকিমার কাছে তুমি আবার কী অপরাধ করলে নগেনদা ?

কত লোকের কাছে কত অপরাধ করেছি তার কী ঠিক আছে ? বোধ হয় দমদমা পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

অন্যায়, বলিয়া বিমল হাসিল। তারপর নগেনকে বিশেষ অনুগ্রহ করিবার মতো করিয়া বলিল, আমি পৌঁছে দিয়ে আসবখন নগেনদা।

তুমি যাবে ? বাঁচালে ভাই। শরীরটা এত খারাপ লাগছে !

শবীর খারাপ না লাগিলে নগেন বিমলকে কষ্ট দিত না।

তারপর দুজনে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিল। বিমলকে আজ নগেনের কয়েকটা কথা বলিবার আছে। পরশু যদি সে চলিয়া যায়, প্রমীলাকে একটা খবর দেওয়া দরকার। সে খবর পাঠাইয়াছে এ ভাবে নয়, আপনা হইতে খবর পৌঁছিয়াছে এইভাবে।

জানিস মিলি, নগেনদা পরশু লখনৌ যাবে।

পরশু ?

হ্যাঁ। পরশু কমলবাবুরা যাবেন, ওঁদের সঙ্গে।

কমলবাবুরা কে কে যাবে দাদা ?

সবাই যাবে।

লাবণ্য ?

লাবণ্যও যাবে। আমার কী মনে হয় জানিস? লাবণ্যর জন্যই নগেনদা বলা নেই, কওয়া নেই লখনৌ ছুটছে তিন দিনের নোটিশে। নগেনদার মতো লোক ও রকম ফাজিল মেয়ের জন্যে পাগল হয়ে ছুটেছে, এটা ভারী আশ্চর্য না ?

হ্যাঁ।

তোর কী হল বল তো ?

কী আবার হবে ?.... আচ্ছা দাদা নগেনবাবু আপনা থেকে এ সব বললে ?

কীসব বললে ?

এই লখনৌ যাওয়ার কথাটথা ? লাবণ্যদের সঙ্গে ?

তাই আবার কেউ বলে নাকি ? আমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে সব কথা বার করে নিলাম—নইলে নগেনদা কিছুই বলত না।

ভাইবোনের মধ্যে এমনি একটা কথোপকথন আজ অথবা কাল হওয়া চাই। প্রমীলার মুখখানা নগেন কল্পনা করিতে পারে। কিন্তু কোনো কল্পনার উপরেই তাহার শ্রদ্ধা নাই।

জানালার বাহিরে একটা পামগাছ ভূতের মতো দাঁড়াইয়া আছে, দিনের আলোয় ওর সবুজ পাতাগুলি দেখিলে হাত বাড়াইয়া ছুঁইতে ইচ্ছা হয়। এখন যদি আকাশ হইতে একটা বজ্র খসিয়া পড়ে আর সে বজ্রের আঘাতে ওই তরুটি নিঃশব্দে জ্বলিতে থাকে নগেন তাহা কল্পনা করিতে পারিবে, কিন্তু সে কল্পনার উপরেও তার কোনো শ্রদ্ধা থাকিবে না। তার কল্পনা যেন নিজস্ব কিছু নয়।

গাছটার দিকে নগেন তাকাইল না পর্যন্ত, চাকরি-টাকরিতে তোমার বোধ হয় লোভ নেই বিমল ?

আমার সম্বন্ধে তোমাব এমন খারাপ ধারণা হল কী কবে ?

লোভ থাকলে লোভেব জন্য মানুষ চেষ্টা করে। সে সব লক্ষণ তোমার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিমল জানে নগেন তাহাকে বকিবে না, সমালোচনাও করিবে না। তবু সে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

বলিল, কী যে বল নগেনদা! চাকরির চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে মুখে রক্ত উঠে গেল। দিনরাত ওই তো ধ্যান করি।

নগেন হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, বিশ্বাস হয় না, তা হলে হেডউডের চিঠির জন্য আমায় তাগিদ দিতে।

বিমল বোকা নয়, সুপারিশপত্রেব জন্য নগেনকে তাগিদ দিতে সে ভুলিয়া যায় নাই। ম্যাকনিলের আপিসের চাকরিটা এত ভালো চাকরি, যে সেটি পাইবার ভরসা সে রাখে না। এই জন্যই চুপচাপ ছিল। কিন্তু নগেনের কাছে এ কৈফিয়ত দিতে দেওয়া যায় না। তার সুপাবিশে ফল হইবার ভরসা সে রাখে না, এ কথা শুনিলে নগেন একেবারেই খুশি হইবে না।

লজ্জার ভান করিয়া সে বলিল, ভুলে গিয়েছিলাম নগেনদা।

কবি আর কাকে বলে! টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া নগেন একখানা খামে মোড়া পত্র বাহির করিল। বিমলের হাতে দিয়ে বলল, শুধু চিঠিতে ফল হবে কী না কে জানে ! নিজে গিয়ে বলে আসতে পারলে সবচেয়ে সুবিধা হত। কিন্তু সেই যে বুধবার এসেই চলে গেলে তারপর সাতদিন আব তোমার টিকিটি দেখতে পেলাম না, আজ সকালে এলেও হত, দুপুরে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম।

কাল দুপুরেই ?

পরশু চলে যাব, কাল আমার সময় কোথায় ? কোর্টে কাল তিনটে মোকদ্দমা ঝুলছে।

শেষ কথাটা মিথ্যা নয়, ভুল। কোর্টে মকদ্দম' কাল একটিমাত্র আছে এবং সে জন্য নগেনের কোর্টে যাওয়ার দরকার হইবে না। নগেন মিথ্যাবাদী নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে সে এ রকম ভুল কথা বলে।

বিমল শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

পরশু চলে যাবে মানে ? সাতাশে তোমার যাওয়ার কথা ছিল।

নগেন জানালার কাছে সরিয়া যাইতে যাইতে বলিল, সে প্ল্যান বদলে গেছে।

তখন বিমল প্রশ্ন শুরু করিল। নগেন অর্ধ-অনিচ্ছার সঙ্গে তার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিল। পরশু যাওয়াই সুবিধা ? কীসে ?.....একা যাইতে হইবে না ? একা যাইতে হইবে না মানে ? সঙ্গী আবার জুটিল কে ? সজনীবাবু ? সজনীবাবু ভারী সঙ্গী ! বোবার যদি বা শত্রু থাকে সজনীবাবুর নাই, ওর সঙ্গে যাওয়াটা সুবিধা নয়, শাস্তি। কমলবাবু ? কমলবাবু এখন লখনৌ যাইবেন কেন ? লখনৌ তার কী দরকার ? সপরিবারেই ? তার মানে, লাবণ্যও যাইবে নাকি ? ওঃ !

বিমল হাসিল।

ওই জন্য প্ল্যান বদলালে ? মিলি শুনলে হাসবে।

ওকে না বললে হাসবে না ! বলিয়া নগেন তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিল। বলিল, এখানে খেয়ে নেবে ?

বিমল বলিল, কাকিমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে যে। অত রাত্রে আর এখানে আসব না নগেনদা, বাড়ি চলে যাব।

বাসের পয়সা এনেছ তো ? বিশ্বাস নেই তোমাকে, ভুলো মন !

বিমল সহজভাবেই বলিল, পকেটে চারটি পয়সা আছে। আমায় পাঁচটা টাকা ধার দিতে হবে নগেনদা।

নগেন আবার ড্রয়ার খুলিল। দশ টাকার একটা নোট বাহির করিয়া বিমলের হাতে দিয়া বলিল, পাঁচ টাকা নেই। দশ টাকাই নাও। চাকরি হলে শোধ দিয়ো।

নগেনের অগোচরে বিমল একবার সন্তর্পণে নোটের প্রান্ত ঘামে ভেজা আঙুল দিয়া ঘষিয়া দেখিল। নগেন একবার ভুল করিয়া তাহাকে একখানার বদলে দুখানা নোট দিয়া ফেলিয়াছিল।

জীবনে নগেন যে ইচ্ছা করিয়া ছোটোবড়ো অনেক ভুল করে সেটুকু অনুমান করার সাহস বিমলের কোনোদিন ছিল না। নগেনকে সে বোঝে না, সে তার কাছে অনেকটা রহস্যময়। নগেন কথা কয়, হাসে, শিস দেয়, পরিহাস করে এবং পরিহাস বোঝে, নিজের বিশেষ পছন্দ-অপছন্দের সংস্কার রাখে। মানুষটা সাধারণ। নাটকীয় নয়। তবু সে কী যেন অতিরিক্ত কিছু, যার জন্য তার সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত দুর্বোধ্য ধারণা জন্মিয়া যায়।

•

সমস্ত পথ কাকিমার বকুনির কামাই নাই। তিনিও কবিতা লেখেন।

সত্যি লেখেন কাকিমা ?

কাকিমা বিনয় করিয়া বলিলেন, ভালো কী আর লিখতে পারি বাবা ? আমরা হলেম সেকেলে ধরনের লোক। কবিতা লিখতে ছেলেবেলা থেকে কে আর শেখালে বল ?

কবিতা লেখা যে লেখাপড়া শেখার মতো ছেলেবেলা হইতে কেহ শিখাইতে পারে বিমলের সে জ্ঞান ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লেখাপড়ার বদলে কবিতা লিখিতে শিখিতেন। বোধ করি সেই জন্যই তিনি আজ অত বড়ো কবি। ছেলেবেলা কবিতা লেখা না শিখিয়া তার ভবিষ্যৎটা মাটি হইয়া গিয়াছে।

আপনার কবিতা পড়তে দেবেন তো কাকিমা ?

কাকিমা সলজ্জে বলিলেন, না না, সে পড়বার মতো কবিতা নয় বাবা। যা মনে আসে লিখে যাই, হিজিবিজি—

যা মনে আসে তাই লিখিয়া ফেলিলে যে কবিতা হয় না, এ জ্ঞান কাকিমার আছে। বস্তুত এই জ্ঞানটাই কবিতা লেখার সব চেয়ে বড়ো মূলধন। যত অঙ্ক-কষা শিখিলে বি এসসি পাস করা যায়, তার চেয়ে ঢের বেশি খাটিয়া কবিতা লিখিতে হয়, না শিখিলে কবিতা লেখা যায় না। আজ দুই বছর এই নিয়া বিমলের মন খারাপ হইয়া আছে। মনে যার কবিতা আছে সে কবি নয়, এ কী ট্রাজেডি জীবনে ! ও চুন সুরকির স্তূপ থাকা-না-থাকা সমান—ওর নাম বাড়ি নয়, পরের মন ওতে বাস করিবে না।

বয়স কী ছাই এমনি করিয়া বাড়ে !

এমনিভাবে তাহারা দমদমায় পৌঁছিল। কাকিমাকে বাড়ি পৌঁছিয়া দেওয়াব মধ্যে যে এতখানি নাটক দেখার সুযোগ ছিল, বিমল তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই।

বেড়ানো হল ?

সজনীর মুখ ভার।

তোমার হিংসা হচ্ছে নাকি ?

কাকিমা হাসি মুখখানি ভার করিলেন।

আমার আবার হিংসা কীসের ! তোমার বেড়ানো হল কি না তাই বল ।

কারও অসুখ করলে দেখতে যাওয়াকে বেড়ানো বলে না।

আমার অসুখ করলে কজন দেখতে আসে।

তোমার অসুখ তো লেগেই আছে বারোমাস, তার আবার দেখতে আসবে কী !

সজনী খানিকক্ষণের জন্য চুপ করিল। তারপব কহিল, আমি আজ খাব না।

বিমল সাশ্চর্যে কহিল, কাকা খাবাবের ওপবেও রাগ কবেন নাকি ?

কাকিমা বলিলেন, করেন। খাবারেব ওপবেও ওঁর রাগটা একটু বেশি। খাবে কী? ক্ষমতা থাকলে তো খাবে? যাবার সময় দেখে গেছি ওই ইজিচেযাবে পড়ে আছে চিত হয়ে, এখনও দেখছি তাই। হাতে পায়ে ঝিঁঝিঁও ধবে না, ভগবান !

বাড়ি ফেরার পথে বিমল বাবকয়েক মাথা চুলকাইল। কাকিমা আর সজনীর সম্বন্ধে তার অন্যবকম ধারণা ছিল। কাকিমা ভালো মানুষ, সজনী নার্ভাস। ওরা আবার ঝগড়া করিতে পাবে নাকি ?

ট্রামে অধরের সঙ্গে দেখা। সেই যে শান্তা, বাতায়ন পথে বিমল যাকে ভালোবাসিয়াছে, অধর তাব স্বামী।

লোকটার প্রকৃতি ভয়ানক গম্ভীব। হাসিলে তাহাকে ভারী সুন্দর দেখায়, কিন্তু হাসিবার প্রক্রিয়াটা সে আয়ত্ত কবিতে পারে নাই বলিয়াই অনেকে সন্দেহ কবে। মাঝে মাঝে সে মদ খায়, কিন্তু নেশা হয় না, এমনই সে কঠিন লোক।

বিমল ইহাকে ভয় কবে। স্বল্প পরিমাণ শক্তি নিয়া সে জীবন-যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, এখনও তাহার মধ্যে এতখানি শৈশব আছে যে, তাহা আজও তাহার চরিত্রকে দুর্বল করিয়া রাখিয়াছে, সে স্নেহ কবে, স্নেহ চায়, আজও তার দারুণ অভিমান। কিন্তু অধর যেন জীবন-যুদ্ধের জন্য বিশেষ করিয়া সৃষ্টি-করা যোদ্ধা। আঘাত সহিবাব বর্ম আছে, আঘাত করিবার অস্ত্র আছে, এবং ফাঁকতালে বিজয়লক্ষ্মীকে টানিয়া তুলিবার সাহসও আছে। লোকটা যে বড়ো লোক হয় নাই কেন, ভাবিযা বিমল অবাক হইয়া যায়।

বিমলের অভিজ্ঞতায় অধর আজ প্রথম রসিকতা করিল, এত সকাল সকাল বাড়ি ফিরছেন ?

অধর ইচ্ছা করিয়াই বিমলকে তুমি বলে না। এবং সেটা বিমল বুঝিতে পারে। বিমল বলিল, আপনার মতো আমিও একটা নতুনত্ব করছি এই আর কী !

অধরের হাসিহীন মুখ গম্ভীর হইল।

আমার অনুকরণ করছেন কবে থেকে ?

আজই প্রথম।

এ যে রীতিমতো সংগ্রাম ! সজনী ও কাকিমার কলহের চেয়ে সূক্ষ্ম হইলেও ঢের বেশি রূঢ়, ঢের বেশি তীব্র! বিমল আশ্চর্য হইয়া গেল। আপনা হইতে এমন ব্যাপারও যে ঘটিয়া যায় তাহার এ ধারণা ছিল না।

অধর আর কিছু বলিল না। ভাঁজ করা খবরের কাগজখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। মুখে তাহার ভাবপরিবর্তনের ইঙ্গিতও নাই। বিমল বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। একটা আলো ঝলমল দোকানের নাম পড়িয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, অধর হয়তো ওই দোকানটারই বিজ্ঞাপন পড়িতে তন্ময় হইয়া গিয়াছে।

খানিক পরে ভিতরে চোখ আনিতেই সে দেখিল অধর একাগ্র দৃষ্টিতে তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আছে। অধর চকিতে খবরের কাগজে দৃষ্টি নামাইয়া নিল। এমনভাবে নিল যে বিমলেব বিস্ময়ের সীমা রহিল না। প্রথম দিন শান্তাকে চুরি করিয়া দেখিতে দেখিতে চোখাচোখি হওয়ামাত্র এমনই চকিতে সে দৃষ্টি সরাইয়া নিয়াছিল।

বিমলের মনে হইল, শান্তার স্বামীর সর্বাপেক্ষা গোপন একটা পরিচয় সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। ওর মধ্যে একটা দুর্বলতা আছে, একটা অসামঞ্জস্য আছে। আজ অতর্কিতে ধরা পড়িয়া গেল। বর্ম ভেদ করিয়া নেপথ্যের এই দুর্বোধ অসংযমকে জীবনে হয়তো আর আবিষ্কার করা যাইবে না, কিন্তু ইহার অস্তিত্বে কখনও সন্দেহ করাও আর চলিবে না। কাল হোক, পরশু হোক আবার যখন ইহার সঙ্গে দেখা হইবে, মনে পড়িয়া যাইবে যে এ লোকটা খাঁটি লোহা দিয়া তৈরি নয়।

অনেক মাথা ঘামাইয়া বিমল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের ঠাকুব পালিয়েছিল, ঠাকুর পেয়েছেন?

জীবনে যেন এই প্রথম বিমলেব মুখের দিকে চাহিল এমনই নির্বিকার দৃষ্টি চোখে আনিয়া অধর বলিল, ঠাকুর পালিয়েছিল দশ-বারো দিন আগে, এতদিনেও একটা ঠাকুর পাব না?

অর্থাৎ, তুমি একটা গাধার মতো প্রশ্ন করিয়াছ।

বিমল আহত লজ্জার অভিনয় করিয়া নার্ভাস হইয়া বলিল, না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

খবরের কাগজে চোখ নামাইয়া অধর বলিল, হ্যাঁ, ঠাকুর পেয়েছি। একদিনের বেশি শান্তাকে কষ্ট করে রাঁধতে হয়নি।

এবার আর বিমলকে নার্ভাস হওয়ার অভিনয় করিতে হইল না। অধরের যে দুর্বলতাব পরিচয়ই সে আবিষ্কার করিয়া থাক, অধর ভিন্ন এ কথা আর কেউ বলিতে পারিত না। এ কথার জবাব আছে, কিন্তু অধরের চেয়ে ভয়ানক লোক না হইলে সে কথা অধবের সামনে মুখ দিয়া বাহির করার ক্ষমতা আর কাহারও নাই।

বিমল মনে মনে বলিতে লাগিল, আপনার স্ত্রী চমৎকার রান্না করেন। সেদিনের নেমন্তন্নেব কথা অনেক কাল মনে থাকবে। মাংস যা হয়েছিল, অমৃত!

বিমলের দিকে চাহিয়া অধর বলিল, ঠাট্টা করছেন?

মনে মনেও বিমল এবার আর কিছু বলিতে পারিল না।

অথচ প্রমীলা অধরকে গ্রাহ্য করে না, বিমলের চেয়ে সে তো আরও কত বেশি ভীরু। বরং প্রমীলা উপস্থিত থাকিলে অধরের দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া আসে। মনে হয়, গাঢ় অন্ধকার হইতে সদ্য বাহির হইয়া আসিয়া আলো তার চোখে সহিতেছে না।

প্রমীলা বলে, অধরবাবু, আপনার মুখে একটা মিষ্টি কথা আজ পর্যন্ত শুনলাম না। কথা বললেই মনে হয় ধমকাচ্ছেন। আপনার ধমক গ্রাহ্য করে কে?

কথাটা সে পরিহাস করিয়াই বলে, শান্তার সঙ্গে পাতানো সম্পর্কের হিসাবে অধরকে ঠাট্টা করিবার অধিকার তাহার আছে। কিন্তু বিমলের মনে হয় সুস্পষ্ট পরিহাসটির মধ্যে এমন একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আছে যাহা তীক্ষ্ণ ও উদ্ধত। অধর যেন সেটুকু বুঝিতে পারে, কিন্তু বুঝিতে পারার কোনো লক্ষণ দেখায় না, এইমাত্র।

প্রমীলা আরও অনেক কিছু বলে। বলে, ও সব আপনি বুঝবেন না, সব লোকে যদি সব জিনিস বুঝতে পারত তবে আর ভাবনা ছিল না।

এমন করিয়া সে কেন বলে কে জানে, অধরের উপর তার রাগের কারণটা দুর্জ্ঞেয়। বোধ হয় শান্তা তাহাকে কিছু বলিয়াছে। কিন্তু স্বামীর বিরুদ্ধে পরের কাছে কিছু বলিবার মেয়ে শান্তা নয়। তবে হয়তো প্রমীলা নিজেই কিছু অনুমান করিযাছে। কিন্তু ও বিষয়ে বিমলের জ্ঞান খুব কম। জ্ঞানসঞ্চয়ের ইচ্ছাও তার নাই। যাকে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভয় করে প্রমীলা তাকে ওভাবে তুচ্ছ করিয়া দেয় কী করিয়া বুঝিতে চাওয়াব মধ্যেই যেন নিজের বেশি রকম দুর্বলতা আছে, এমনিভাবে বিমল কৌতূহলটা চাপিয়া রাখে।

অধরের পিঠের লাঠিটা নীচে পড়িয়া গিয়াছিল। সেটি তুলিয়া অধবের দুই হাঁটুর ফাঁকে ঠেস দিয়া রাখিয়া বিমল আবার বাহিরের দিকে চাহিয়া বহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শান্তার কাছে অধর বিমলের খুব প্রশংসা করে। বলে, ছেলেটি ভালো। একটু উদ্ধত, কিন্তু এ বয়সে মিনমিনে হওয়ার চেয়ে একটু তেজ থাকা মন্দ নয়।

শান্তা এ বিষয় কোনো মন্তব্য করে না।

অধর আরও বলে : ওব সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে। অনেক ধারণা বদলে দেয়। আমি হেন লোক, ওব সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ করে আমার পর্যন্ত মনে হয় কবিতা লেখাটা নেহাত বাজে কাজ নয়।

বলিয়া সে জোর করিয়া হাসে। এমন উৎকট হাসিই সে হাসে যে মনে হয় বিমল যে কবি আর সে যে কবি নয়, এই কথাটা শুধু নিজের হাসি দিয়াই সে প্রমাণ করিতে চায় ; কথা প্রসঙ্গে যে—বিমল শান্তার মনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইযাছে তার সঙ্গে শান্তা তাহার তুলনা করুক এ ইচ্ছা সে যেন রাখে। বিমলের শান্ত হাসিটা অধরের মনে আছে। ও হাসির সঙ্গে শান্তার পরিচয় যে আরও ঘনিষ্ঠ এও সে জানে।

আজ সদ্য সদ্য ট্রামে বিমলের সঙ্গে কলহ করিয়া আসিয়া সে একান্ত নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল। মুখে তাহার বিরক্তির রেখাটি নাই। শোবার ঘরে ঢুকিয়া শান্তার চমকও সে নির্বিকারভাবেই চাহিয়া দেখিল।

শান্তা খাতায নিবিষ্টচিত্তে লিখিতেছিল।

কী লিখছ ? কবিতা ?

না।

ধোপার হিসাব ?

না। এমনি হিজিবিজি কাটছি।

ওটা কবিতা লেখার প্রথম অবস্থা। হিজিবিজি কাটা দেখতে চাই না, কবিতা লিখতে আরম্ভ করলে দেখিয়ো। দেখাবে তো ? জামা খুলিয়া সে দেয়ালে বসানো কাঠের আঙ্গুলে ঝুলাইয়া দিল। লোমশ বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, কথা বলছ না যে ? বোবা হয়ে গেলে নাকি ? না, ভাব লেগেছে ?

কী বলব ?

কবিতা লিখলে আমায় দেখাবে ?

কবিতা লিখব কেন ?

লিখবে না ? অধর আশ্চর্য হইয়া গেল। তারপর হাসিয়া বলিল, সেই ভালো। লিখো না। ও রোগের চিকিৎসা নেই।

শান্তার পাশেই সে বসিল। ডান পা-টি নাচাইতে আরম্ভ করিয়া বলিল, তার চেয়ে বরং নতুন নতুন রান্না শিখো, বেনামি খাবার কোরো, সুনাম হবে। আজ একজনের কাছে তোমার যা প্রশংসা করে এলাম !

অধর নিজে নিজেই খুশি হইয়া উঠিল। খপ করিয়া শান্তার একটি হাত টানিয়া নিয়া উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিয়া বলিল, অমৃত তৈরি করার মতোই হাত বটে। তোমার সর্বাঙ্গ যদি তোমার হাত দুটির মতো হত শান্তা তোমাকে পাহারা দিতেই আমার প্রাণ বেরিয়ে যেত !

অধর মাঝে মাঝে অল্প পরিমাণে মদ খায়। কিন্তু শান্তা জানে তাহাতে অধরের দেহমনের জড়তাই শুধু কাটিয়া যায়, কখনও নেশা হয় না। অধরের আজ এমন চপলতা কেন ? সঙ্গত নয়, তবু শান্তার ভয় করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ সে কথা বলে নাই। কনে বউও সে নয় যে চুপ করিয়া স্বামীর আদর ভোগ করিবে।

একটু হাসিয়া এবার শান্তাকে বলিতে হইল, আজ যে তুমি এত কথা বলছ ?

কখন বললাম ?

এই তো বললে। এত কথা বলছ কেন জিজ্ঞেস করলে অন্যদিন তুমি জবাবই দিতে না।

অধর সহসা কথা বলিল না। প্রথমে হাসি এবং তারপর পা নাচানো বন্ধ করিল। তারপর শান্তার কাঁধে হাত রাখিল। তার মুখখানা বিষণ্ণ হইয়াছে।

কীসের ভূমিকা ? শান্তা বিবর্ণ হইয়া গেল।

কথার জবাব না দিলে তোমার রাগ হয় নাকি ?

কয়েক মুহূর্তেই শান্তা অভিভূতা হইয়া গিয়াছিল। এই লোকটির উগ্র ব্যক্তিত্ব যখন এমন মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া এত নিকটস্থ হয়, তখন মাথা ঠিক রাখা শক্ত। মনে হয়, পৃথিবীর আর সব মানুষ এর আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। কোনোমতে ঘাড় নাড়িয়া শান্তা বলিল, না; রাগ কেন হবে ?

অধর আহত হইয়া বলিল, রাগ হয় না ? আমি কথার জবাব না দিলে তোমার রাগ হয় না ?

শান্তা তাড়াতাড়ি বলিল, রাগ হয় না—দুঃখ হয়।

অধর তাহাকে কাছে টানিয়া নিল। শান্তার কাছে এখনই সে যেন তার সমস্ত অনাদর অবহেলার অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিতে গিয়া ভগ্নকণ্ঠে চুপ করিয়া যাইবে। তার মুখ দেখিয়া শান্তার বুকের ভিতর টিপটিপ করিতে লাগিল।

যদি সত্যই দুঃখ প্রকাশ করে, ক্ষমা চায় ? যদি বলে, তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি, আমি কী শান্তা ? আর আমি অমন করব না। আমায় তুমি ক্ষমা কর। সে তখন কী করিবে ? অনুতপ্ত স্বামীকে কী বলিবে ?

অধর হঠাৎ কিছু বলিল না। অনেক কিছু বলিবার ইচ্ছা তাহার ছিল, কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য তাহার অভিনয় মাথা ছাড়িয়া হৃদয়ে স্থানান্তরিত হইয়া যাওয়ায় সে মুখ খুলিতে পারিল না।

এ ভয় অধরের ছিল। হঠাৎ একদিন হ্যাঁচকা টান দিয়া কাছে টানিতে গেলে মানুষ আরও দূরে পালায় বটে, অন্য আকর্ষণটির আরও কাছে সরিয়া যায় বটে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে ওভাবে টানিতে যাওয়াটা মাঝে মাঝে বিপজ্জনক হইয়াও দাঁড়ায়। শান্তা এত ভীরু, এত ক্ষীণ তাহার গ্রহণ করিবার সামর্থ্য যে, ওর কাছাকাছি আসিয়া ওকে ভয় দেখানো যেমন কঠিন, হঠাৎ বন্যার মতো মমতা ঢালিয়া দিয়া ওর নেওয়ার শক্তিটুকুকে পঙ্গু করাও তেমনি কঠিন। প্রথম মানুষ খুন করিতে যাওয়ার মতো কোথায় যেন বাধিয়া যায়। মনে হয়, আজ থাক, আর একদিন দেখা যাইবে। তাড়াতাড়ির কী আছে ?

কিন্তু থামিবার উপায় ছিল না, কাবণ তার কোনো মানে হয় না। অধর বারকয়েক শান্তার কপালে, মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, আচ্ছা, আর কখনও তোমায় দুঃখ দেব না।

এ কথা বলা চলে। আজ রাত্রিটা কাটিলে এ কথার আর কোনো মানে থাকিবে না।

রাত্রে শান্তা চোখের পাতা বুজিতে পারিল না। রাত্রি একটা পর্যন্ত বিমলের ঘরে আলো জ্বলিতেছে বোঝা গিয়াছিল, বন্ধ জানালার একটা ফাঁক দিয়া বিমলের আলো সূক্ষ্ম রেখাব মতো এ ঘরে প্রবেশ করে, শান্তার মনে হয় আলোকরেখার অন্যপ্রান্তে বিমল চোখ রাখিয়া বসিয়া আছে। প্রতিরাত্রেই মনে হয়। বিমল যতক্ষণ আলো জ্বালাইয়া রাখে শান্তা ঘুমাইতে পারে না। একদিন কাগজ দিয়া সে জানালার ফুটাটি বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই।

অধর বলিয়াছিল, কী করছ ?

বাইরে যাব।

জানলা দিয়ে বাইরে যেতে পারবে না। ওতে শিক বসানো আছে।

এটা দরজা নয়? ওমা, তাই তো! ঘুমের চোখে বে... এসেছি।

আলো জ্বাললেই হয়।... যেদিন ঘুম আসবে না বাইরে ... বসে থেকো। আমাকে সারাদিন খাটতে হয়।

একটু পরে . না খাটলে, হাওয়া দিয়ে পেট ভরাতে হবে, বুঝলে? সে ক্ষমতা থাকলেও বরং বোঝা যেত।

আজ বিমলের ঘরে আলো নিবিয়া গেলেও শান্তা ঘুমাইতে পারিল না। কিছুদিন হইতে তাব মনে হইতেছিল তারই চারিদিকে কী যেন একটা চক্রান্ত গড়িয়া উঠিতেছে, জীবনে এমন কতগুলি ছোটো বড়ো ঘটনা জমা হইয়াছে, যাব মানে বোঝা যায় না। বিমলেব আকর্ষণটা সে খানিক খানিক বুঝিতে পাবে এবং বিশ্বাস করে ও তাব নিজেব বচনা, কিন্তু বিমলের দিকে তাহাকে এমন করিযা ঠেলিয়া দিতেছে কীসে ? যেখানে সে থামিতে চাহিয়াছিল সেখানে থামিতে পারে নাই, যেখানে আসিলে ভয়ের কথা সেখানে আগাইয়া আসিয়াছে,—বিপদের মধ্যে, অনিশ্চয়তাব মধ্যে, যে কোনো সাংঘাতিক সম্ভাবনার মধ্যে। বিমলের চোখের ভাষা যে কোনোদিন মুখব হইয়া উঠিতে পাবে। কাল—

কালের ব্যাপারটা সত্যই ভালো নয—যদিও তখন খুব ভালো লাগিয়াছিল। জানেন, এই কালি আর আমার বুকেব রক্তে কোনো তফাত নেই। এই দিয়ে আমি কবিতা লিখি—বলিয়া কলমের গোড়ায় কালি নিয়া বিমল তাহার হাতেব তালুতে মাখাইয়া দিয়াছিল।

হাতের তালুতে কালি মাখাইতে গিয়ে বিমল এত জোবে তাহার হাত ধবিয়াছিল যে আর কেহ সেভাবে ধবিলে শান্তার ব্যথা লাগিত।

যদিও পবিহাস নয়, তবু সেটুকু পবিহাসের পর্যায়ে ফেলা যায়। কিন্তু তারপর বহুক্ষণ ধরিয়া হাত ধুইয়া দেওয়ার মধ্যে পরিহাসের লেশমাত্র ছিল না। সে কোনো প্রতিবাদ কানে তুলিল না, তার শিহরিত লজ্জা অগ্রাহ্য করিল, রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া নিজের চোখ দুটিকে স্পষ্টই মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। হাত যে ছিনাইয়া নিতে পারে না, তাব হাত নিয়া কী অমন খেলা খেলিতে হয় ? প্রমীলা উপস্থিত না থাকিলে দুঃখে, অভিমানে সে কাঁদিয়া ফেলিত। হয়তো কাঁদিত না। কিন্তু সত্যই তার কান্না পাইয়াছিল।

বিমলের দস্যুতাটুকু খুবই তুচ্ছ, কিন্তু কদিন সে এমন দস্যুতাতে তুষ্ট থাকিবে? হাতে কালি ঢালার ছলনার আড়ালে সে হাত ধরিতে চায় ধরুক, শান্তা বারণ করিবে না, বারণ করিতে চাহেও না। কিন্তু কালি ঢালিয়াই সে যখন হাত ধরিতে যাইবে ?

ওদিকের বিছানায় অধর নাক ডাকাইতেছে। এদিকের বিছানা ছাড়িয়া শান্তা উঠিল। বাস্তবিক তার শরীরটাই জ্বালা করিতেছে। নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া সে ছাদে চলিয়া গেল। আজ তার ভূতের ভয় কমিয়া গিয়াছে।

বিমলকে সে সামলাইতে পারিত, দুটি বাতায়নের সীমা বজায় রাখিতে না পারিলেও হাত নিয়া খেলা করিবার আগে হাতে কালি ঢালার ছলনা কোনোদিন ঘুচিতে দিত না। কিন্তু যে অদৃশ্য শত্রু তাহাকে বিমলের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে তার সঙ্গে রফা করিবে কেমন করিয়া ! কতদিন সে বিমলের কাছে ছুটিয়া গিয়াছে—কেন গিয়াছে না জানিয়া। ইহার সঙ্গে লড়াই চলে না।

একেবারে খেলা ছাড়িয়া দিবে কী না এত রাত্রে ছাদে দাঁড়াইয়া শান্তা তাহাই ভাবিতে লাগিল। আর বিছানায় মটকা মারিয়া পড়িয়া থাকিয়া অধর ভাবিতে লাগিল, রাতদুপুরে ছাদে যাইতে শিখিয়াছে, ঘরে দম আটকায়। আর বেশি দেবি নাই।

সোজা কথায়, অধরের মতো মানুষও ধৈর্য হারাইতেছিল। পাপের নেশা হইয়াছে অথচ পাপ করিতেছে না এ ব্যাপার তাহার ধারণাতীত। প্রেমের বিকাশ হইতেই যে এত সময় লাগে এটা তার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্য ঠেকিতেছিল। কল্পনার, মাধুর্যের, মন দিয়া মন চেনার আনন্দের বাধা যে আর সব বাধার চেয়ে বড়ো এ অভিজ্ঞতা অধরের ছিল না। ফুলের দাম যার কাছে নাই, তার কাছে পুষ্পমাল্যের সুতাটি অবশ্যই লোহার শিকলের চেয়ে শক্ত নয়।

তাছাড়া, ফুল যে একদিনে শুকায় এ সত্যটাও পৃথিবীর অনেকেব কাছে বড়ো। যেন, ফুল শুকাইলে সেটা আর কিছু হইয়া যায় !

সকালে ঝিকে দিয়া অধর বিমলেব কাছে শান্তার চায়েব নিমন্ত্রণ পাঠাইয়া দিল —প্রমীলাও যেন অবশ্য আসে।

রাত-জাগা মাথা-ধরা নিয়া শান্তা চুপ করিয়া রহিল।

আসিল বিমল একা, প্রমীলা রান্না করিতেছে।

অধর বলিল, আসুন, আসুন। সকালে উঠে কবি-মুখ দর্শন হল ; দিনটা ভালো যাবে।

বিমল ভাবিয়া আসিয়াছিল, অধর-বাড়ি নাই। অধর বাড়ি থাকিতেই শান্তা তাহাকে চা-পানের জন্য ডাকিয়া পাঠাইবে এমন আশঙ্কা সে করে নাই। অধরের অভ্যর্থনায় একমুহূর্তে তাহার বিরক্তির সীমা রহিল না।

শান্তা আজও লালপাড় শাড়ি পরিয়াছে। পাড়েব রং এত ঘন যে মাথার কাপড়ে প্রতিফলিত আলোয় তাহার মুখে লালিমার আভা পড়িযাছে।

বিমল নিঃশব্দে বসিল।

শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, মিলি এলো না ?

মিলি রাঁধছে।

অধর বলিল, বোন রাঁধছে, ভাই তাই একাই এলেন ?

নিমন্ত্রিতের প্রতি এ কেমন মন্তব্য ? সকালে কবি-মুখ দেখার কথাটা ঠাট্টা, কিন্তু এটা? শান্তা ভীত হইয়া উঠিল। কাল পর্যন্ত অধর বিমলের কত প্রশংসা করিয়াছে, আজ সে সেই প্রশংসিত ব্যক্তিটিকে সামনা-সামনি অপমান করিবে নাকি ? বিমলের মুখ দেখিয়া শান্তার বুক মমতায় ভরিয়া গেল। ও জবাব দিতেও পারিবে না, অপমান সহিতেও পারিবে না। এমন কিছু বলিবে অথবা করিবে যে হাসিয়া উঠিয়া অধর তাহাকে অপদস্থের একশেষ করিয়া ছাড়িবে। এমন অনুচিত, এমন অবান্তর এবং ধরিতে গেলে এমন হাস্যকর কথা যে বলিতে পারে তার সঙ্গে বিমল পারিয়া উঠিবে কেন ?

অধর একাগ্র দৃষ্টিতে শান্তার মুখের দিকে চাহিয়াছিল—ওর বুকে সে মমতার চাষ করিয়াছে, নিজের জন্য নয় পরের জন্য। অধরের চোখে একবার পলক পড়িল না। নদীর পাশে আগ্নেয়গিরির ছবি সে দেখিয়াছে, অমনই একটি স্থানে শেষ জীবনে তাহাকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইবে; শান্তাকে স্মরণ করিয়া একবার জলে ডুবিবে, প্রমীলাকে স্মরণ করিয়া একবার আগুনে পুড়িবে,—জীবনের সেই হইবে জপ আর তপ। কিন্তু এখন আত্মসংবরণ করিতেই মাঝে মাঝে যেন নিশ্বাস আটকাইয়া আসে। বিমল দারুণ অপমান বোধ করিয়াছিল। কিন্তু শান্তভাবেই সে বলিল, আমার আসা অন্যায় হয়ে গেছে।

অধর দুঃখিত হইয়া বলিল, রাগ করলেন ? আমি কিছু ভেবে কথাটা বলিনি। প্রমীলা বাঁধবে বইকী—নিশ্চয়ই রাঁধবে।

নিশ্চয় রাঁধবে মানে ?

রাঁধবে না ? অধর আশ্চর্য হইয়া গেল।

মুশকিল এই যে পাথরে কিল মারিলে হাতেই লাগে, পাথরের কিছু হয় না। অধর যে তাকে তুলার মতো ধুনিয়া বাতাসে উড়াইয়া দিতে পারে বিমল তাহা জানিত—লড়াই বাঁধার আগেই সে হারিয়া আছে। উঠিয়া চলিয়া যাওয়ার সামর্থ্যটুকু সংগ্রহ করিবার জন্যই সে কয়েক মুহূর্ত বসিয়া রহিল।

অধর খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাকে এই প্রথম তুমি সম্বোধন করিয়া কথা কহিল।

সত্যি রাগ করেছ নাকি বিমল ? দ্যাখো দিকি ছেলেমানুষি ! পাতানো জামাইবাবু বলে কি আমার ঠাট্টারও খারাপ মানে করতে হয় ?

হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, না হয়, আর ঠাট্টা করবই না। হাতজোড় করে ক্ষমা চাচ্ছি।

বিমলের বদলে শান্তাই এবার চলিয়া গেল। অধর তার চোখের কোণে জল দেখিয়াছে।

বিমল উঠিবার চেষ্টা করিল না, রাগের লক্ষণও দেখাইল না। চায়ের কাপটা তুলিয়া নিয়া ছোটো ছোটো দুটি চুমুক দিয়া মৃদুস্বরে বলিল, নিজে নিজে কুস্তি করে হাঁপান কেন? নিজের সঙ্গে কুস্তি করে হাঁপাতে নেই, লোকের হাসি পায়।

অধর স্মিতমুখে বলিল, একজন কিন্তু কাঁদবার উপক্রম করেছিল।

কে ? উনি ? বিমল মাথা নাড়িল, হাসি চাপতে না পেরে পালিয়ে গেলেন। আমাকে ছেলেমানুষ বানাতে চেয়ে নিজে আপনি এমন ছেলেমানুষ বনেছেন যে বুঝতে পারলে আপনার হাসি আসত।

অধর বলিল, তা ঠিক। আমি ভারী বোকা। বুঝতে না পেরে চোরের হাতে আমি সর্বস্ব তুলে দিতে পারি। সে একটু হাসিল, একটু একটু করে কেউ যদি আমার সর্বস্ব চুরি করে, চেয়ে দেখেও বুঝতে পারি না কী ব্যাপার চলছে। সব চুরি হয়ে গেলে ছেলেমানুষের মতো—ছেলেমানুষের মতো কী করি বল তো ?

বিমল সভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অধর হার মানিয়াছে এবং নিরুপায়ের মতো তার ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিয়াছে। এই কারণেই ইহাকে হারাইতে বিমলের ভয় করে, আগেই সে হার মানিয়া রাখে। হার মানিলেই ও শান্তাকে শিখণ্ডীর মতো সামনে ধরিয়া জিতিতে চাইবে।

বিমল চলিয়া গেলে উপরের ছোটো ঘরখানায় শান্তাকে আবিষ্কার করিয়া অধর প্রশ্ন করিল, আমায় অপমান করে উঠে এলে যে ?

শান্তা ডাল বাছিতেছিল। হঠাৎ অধরের পায়ে ধরিয়া তীব্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, আমায় মাপ করো। আর কক্‌খনো আমি এমন করব না।

অধর থতোমতো খাইয়া গেল। এও কি অভিনয় শিখিয়াছে ?

তবু, অবস্থাবিশেষে সমস্তই মানিয়া নিতে হয়। যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা কেন ঘটিল বলিয়া আপশোশ করে বোকা। ঘটনা ঘটিবার পর অবস্থা যা দাঁড়াইয়াছে, তাহারই হিসাব করিয়া বুদ্ধিমানে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে।

অধর তিনদিন অসুখের ছুতায় অফিস কামাই করিল। শান্তাকে কাজ করিতে দিল না, চোখের আড়াল হইতে দিল না, হারানো ভালোবাসার মতো সর্বদা বুকে করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিল।

সহসা সে অসাধারণ স্ত্রৈণ হইয়া পড়িল। সকালবেলাই বলে, এসো, গান শিখবে।

এখন ?

এসো, লক্ষ্মী।

শান্তাকে সে লক্ষ্মী বলে! লক্ষ্মী !

অধর ভালো গান জানে, প্রথম বয়সে যথেষ্ট সংগীতচর্চা করিয়াছিল। মনে করিয়া করিয়া শান্তাকে সে ভৈরবী শেখায়, মালকোষের নমুনা দেখায়, দরবারি কানাড়া যে মেয়েদের গলায় কেন মিষ্টি শোনায় না বুঝাইয়া দেয়। চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া শান্তার গলা চিরিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়।

তখন অধর বলে, এবার একটা বাংলা গান গাও।

শান্তা প্রাণপণে বহু পুরাতন বাংলা গান ধরে, অধর মন দিয়া শোনে। এ বাড়িতে হঠাৎ গানবাজনার ধুম পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া ও বাড়িতে প্রমীলা বিস্মিত হয়, বিমলের দুর্ভাবনার সীমা থাকে না।

দুপুরবেলা তাহারা দাবা খেলে। দাবা খেলায় শান্তা কম যায় না। মামার সঙ্গে এ খেলা সে বহু খেলিয়াছে, চাল জানে। মন্ত্রী দিয়া অধরের রাজার সম্মুখস্থ গজকে চাপিয়া রাখিয়া গজের মুখে ঘোড়ার কিস্তি দিয়া সে ভুল চাল দেওয়ার ভান করে এবং নিজের মন্ত্রী দিয়া অধর তার ঘোড়াকে হত্যা করিলে কোথা হইতে একটা গজ টানিয়া অধরের নৌকা তুলিয়া নেয়।

বলে, ফেরত নেবে ?

অধর মাথা নাড়ে— না।

তখন শান্তা বুঝিতে পারে নৌকা দেওয়া অধরের খেলামাত্র—দান। ঘোড়ার টোপটি সে ইচ্ছা করিয়াই গিলিয়াছে তবু সে আশায় আশায় বলে, সর্বনাশ ! তুমি ও বোড়েটা ঠেলে দিলেই গেছি।

অধর বোড়ে ঠেলিয়া দেয় না। মন্ত্রীকে অন্য ঘরে নিয়া গিয়া বলে, বোড়ে ঠেললে কিছু হয় না। এবার সামলাও দেখি ?

শান্তা আক্রমণ সামলায়, কান্নাও সামলায়। তার হাঁপ ধরিয়া গিয়াছে। দিবারাত্রি এ ভাবে মানুষ সাইকলজির উপন্যাস রচনা করিতে পারে ? কিছুই সহজ নয়, সাধারণ নয়, প্রত্যেকটি কাজের গোপন অর্থ আছে, গোপন উদ্দেশ্য আছে। মুখের 'হাঁ' শুনিয়া মনের 'না'কে সে আর কত আবিষ্কার করিবে ? খেলার হারজিত নিয়া পর্যন্ত উত্তেজিত হইতে পারিবে না তাহার এ কী শাস্তি !

বিমল এ রকম করিত না। ইচ্ছা করিয়া তাকে জিতাইয়া দিলেও এমনভাবে দিত যে ইচ্ছা করিলে সে খুশিও হইতে পারিত আবার ইচ্ছা করিলে রাগ করিয়া দাবার ছক উলটাইয়া দিয়া বলিতে পারিত, চাইনে খেলিতে। একটা নৌকা দান করিতে অধর কত কায়দা করে ! হারিলে সে যেন কাঁদিবে। তাই কৌশলে অধর কান্না নিবারণ করিল।

স্বামীকে সহসা শান্তার দয়ার বৈজ্ঞানিকের মতো লাগিল। দয়া করার ভয়ানক ভয়ানক পন্থা যে আবিষ্কার করিয়াছে।

শান্তা মনে মনে ঠিক করিয়া রাখে, বিমলের সঙ্গে একদিন দাবা খেলিবে। জিতিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে বিমলকে দিয়া এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া নিয়া।

বলিবে, সত্যি, ঠাট্টা নয়। আমাকে একবার ভদ্রলোকের মতো হারাতে দিন।

বিকালে অধর বলে, চলো বায়োস্কোপ যাই।

আজ ? আজ আমার মাথা ধরেছে।

চলো, লক্ষ্মী! আজ বায়োস্কোপ দেখে আসি, কাল থিয়েটার যাব।

শান্তা বায়োস্কোপ যাওয়ার জন্য কাপড় পরিতে পরিতে ভাবে, কাল থিয়েটার দেখিয়া আসিয়া পরশু ও যদি বলে, চলো দার্জিলিং বেড়িয়ে আসি ? ফিরবার সময় অজন্তা হয়ে তিব্বত ঘুরে আসব ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নগেনের লখনৌ যাওয়ার খবরটা প্রমীলা এমনভাবে গ্রহণ করিল যে, বিমল ভাবনায় পড়িয়া গেল। লাবণ্যের কথা উল্লেখ করিয়া সে একটা হাসির কথা বলিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না।

শুধু বলিল, লাবণ্যকে শেষ পর্যন্ত নগেনদার পছন্দ হবে এটা তুই ভাবতে পেরেছিলি ?

প্রমীলা মাথা না নাড়িয়াই বলিল, না।

আমিও পারিনি।

যেন প্রমীলার না ভাবার চেয়ে তার না-ভাবাটাই বেশি বিস্ময়ের।

পাশের বাড়ির উঠানে প্রকাণ্ড একটা নিমগাছ আছে, উপরের অংশটা এ বাড়ি হইতে নজরে পড়ে। প্রমীলা সেদিকে চাহিয়াছিল। কারণ, বিমল তাহার মুখের ভাব পরিবর্তন দেখিতেছে। বিমল বিশেষ কিছু অনুমান করিতে পারিবে এ ভয় প্রমীলার নাই, তবু পূর্ণমাত্রায় আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া মনে মনে সে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। লাবণ্যের সঙ্গে অসময়ে লখনৌ যাইতেছে শুনিয়া তাহার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিয়াছে এ কথা জানিতে পারিলে নগেন নিশ্চয় হাসিবে। ভাবিবে, ওরা সবাই সমান। নরনারীর সম্পর্কটা কেবলই অবস্থাগত করিয়া রাখিতে চায়। না, নগেন যদি একা লাবণ্যকে সঙ্গে নিয়া লখনৌ ঘুরিয়া আসে তাহাতেও তার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিবার অধিকার নাই।

অন্তত নগেনের সঙ্গে তাহার ও রকম কড়ারই হইয়াছে। দুমাস ধরিয়া সে যে আসা-যাওয়া কমাইয়াছে, গত একমাসের মধ্যে সে যে একবার খবর নেয় নাই তারপর এই যে সে একটা অকথ্য রকমের আধুনিক মেয়ের সঙ্গে বিদেশে চলিল—এ সমস্তই তুচ্ছ, এ নিয়া অভিমান চলিবে না।

বিপদের আর অন্ত নাই।

খানিক ঘুরিয়া আসিয়া বিমল বলিল, এমনও তো হতে পারে যে, লাবণ্যই নগেনদার পিছনে ছুটছে।

বিমল হাসিয়া বলিল, তোকে কিছু করতে বলছি না। তারপর আবার গম্ভীর হইয়া বলিল, করলেই বা দোষ কী ? নগেনদা বন্ধুমানুষ, ওকে বাঁচানো পাপ নয়।

প্রমীলা মাথা নাড়িয়া বলিল, ও সব মরণ যারা চায় তাদের কেউ বাঁচাতে পারে না দাদা।

নগেনদা সে রকম নয়।

কী রকম নয় ?

বিমল খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। স্থানত্যাগ করার আগে সংক্ষেপে বলিয়া গেল, তুই বড়ো বেয়াদব।

পায়ের নীচের মাটির মধ্যে যে দেবী বাস করেন তার নাম ধরিত্রী। বড়ো সহিষ্ণু তিনি। প্রমীলা যে আজ প্রথম নয় আরও অনেকবার তার আলিঙ্গন কামনা করিয়াছে বিমল তাহা জানিত না।

একদা বিমল একটা আশা করিয়াছিল। নগেন তখন সর্বদা আসা-যাওয়া করিত এবং বেশ বোঝা যাইত প্রমীলাকে সে পছন্দ করে। প্রমীলার মনের ভাবটা বিমলও পরিষ্কার জানিতে পারে নাই, কিন্তু অনেক কিছু সন্দেহ করিবার অবকাশ প্রমীলা তাহাকে দিয়াছিল। তারপর নগেন যখন এ বাড়িতে আসা প্রায় ছাড়িয়া দিল এবং সে জন্য প্রমীলারও কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না, তখন বিমল মনকে বুঝাইয়াছিল, কথাটা বাজে।

এতদিনের বাজে কথাটা আজ তাকে বিচলিত করিয়াছে।

নগেনের অবহেলা প্রমীলা গ্রাহ্য করে নাই, কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। খোঁজখবর না নেওয়াটাও সব সময় অবহেলার পর্যায়ে ফেলা যায় না। প্রেমের ব্যাপারে কোন কাজের পিছনে কী কারণ আছে অনুমান করিবার সাহসও বিমলের নাই।

প্রমীলা রান্না করিতেছিল, বার কয়েক বিমল নিজের চোখে তাহাকে এবং তাহার কাজ করাটা দেখিয়া আসিল। কয়লার উনুন, ধোঁয়া হয় না, ধোঁয়ার ছলনা করিয়া কাঁদিবার উপায় প্রমীলার ছিল না, কিন্তু উনানে ডালের হাঁড়ি চাপাইয়া গালে হাত দিয়া পিঁড়িতে বসিযা থাকিবার সুযোগ ছিল, তবু বিমল তাহাকে একবার অন্যমনস্ক অবস্থায় আবিষ্কার করিতে পাবিল না। এমন কী সে আজ পাঁচুব কান পর্যন্ত মলিয়া দিল। কোনো মমতা বোধ করিল না। প্রমথ আজ একঘণ্টা আগে আপিস যাইবে ইহার দায়িত্ব যে তার নয়, ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে এ কথা ঘোষণা করিতেও তার বাধিল না।

জীর্ণ সিঁড়িটার উপরের ধাপে দাঁড়াইয়া বিমল অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে বোনের প্রতিবাদের ভঙ্গিটা লক্ষ করিয়া দেখিল।

ক্রুদ্ধা মেয়েটা রান্নাঘবের দবজায় ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়া আছে, সামনে এত বড়ো মেযেকে মারিতে না পারার জন্য দুঃখিত প্রমথ।

আজ তার কী করব? আগে বললে না কেন?

তুই মর। আগে তুই ভাত চাপাতে পারলি না?

না, পারলাম না। আমি গুনে জানব আজ তোমার আগে ভাত চাই ?

মেয়েটা সত্যই বিদ্রোহ করিবে নাকি ? লাবণ্যের সঙ্গে লখনৌ চলিয়াছে বলিয়া বাপের সঙ্গে কলহ করার মতো দুঃসাহসী হইয়া উঠিবে ? প্রমীলার খোঁপা খুলিয়া গিয়াছিল, হলুদ মাখা হাত দিয়াই সে খোঁপাটা আটকাইয়া ফেলিল। যেন এ কাজটা শেষ করিয়াই সে ভয়ানক একটা কিছু করিয়া বসিবে।

অনুরূপা আজকাল নড়াচড়া করিতে পারে না—ডান পায়ে কী যেন হইয়াছে, হাঁটিতে কষ্ট হয়। তাছাড়া ছেলে হওয়ার দিনও তাহার ঘনাইয়া আসিল।

ঘরের ভিতর হইতে সে চ্যাঁচাইয়া বলিল, চুপ কর মিলি, চুপ কর। লজ্জা নেই তোর, বাপেব মুখের ওপর জবাব দিচ্ছিস ?

জবাব আবার দিচ্ছে কে ? বলিয়া প্রমীলা রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল। প্রমথ খানিক গর্জন করিল, শেযে—

খেয়ে খেয়ে তেল বেড়েছে—এ বেলা তুই খেতে পাবিনে। একবেলা খেতে না পেলে তেল কমবে। এ বেলা তোর খাওয়া বন্ধ—যদি খাস তো গোবুর রক্ত খাস।

—বলিয়া সে স্নান করিতে গেল। চৌবাচ্চার ধারে দাঁড়াইয়া মেয়েকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, খেলেই বা কে দেখতে আসছে ? আমি তো থাকব আপিসে। ও যা মেয়ে, ও গোবুর রক্তও খেতে পারে—চাল চুরি করে খায় !

প্রমীলার চাল খাওয়ার কথাটা সত্য, তবে ঠিক চুরি করিয়া নয়।

আজকাল আর সকালে আলুভাতে ভাত হয় না, পাঁচুর আর তার পেটের বোন অনিলার জন্য দু পয়সার মুড়ি বরাদ্দ আছে—কিংবা সকলের জন্য রাত্রে যে আটার রুটি হয় বাড়তি

থাকিলে তারা তাই খায়। বিমলের জন্য বাড়িতে জলখাবারেব কোনো ব্যবস্থা নাই কিন্তু বাড়িব বড়ো ছেলে বলিয়া মাসের প্রথমে জলখাবারের দবুন তাকে তিনটি টাকা দেওয়া হয়। প্রমথ নিকটস্থ চায়ের দোকানে খবরের কাগজ পড়িতে গিয়া কিছু খাইয়া আসে কি আসে না সে খবব কেহ পায় না।

প্রমীলার জন্য কোনো ব্যবস্থা নাই। বিকালে ভাইবোনদেব সঙ্গে সে পাউরুটির ভাগ পায়, কিন্তু সকালে তার ক্ষুধার সম্ভাবনাকে কেহ স্বীকার করে না। একদিন কী মনে করিয়া, সম্ভবত কিছু মনে না করিয়াই সে রান্নার চাল একমুষ্টি চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিয়াছিল।

তখন তার স্বাস্থ্য ভালো হইতেছিল—ক্ষুধার দাঁবি আশ্চর্য রকম প্রবল। চাল চিবানোর এক্সপেরিমেন্টটা সে একদিনে সীমাবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। এবং সেই জন্যই ব্যাপারটা গোপন থাকে নাই। একদিনে সকলে মিলিয়া (বিমল বাদ) তার লজ্জার বোঝা এত বাড়াইয়া দিয়াছিল যে, পরদিন তার জন্য মুড়ির ব্যবস্থা হইলেও তার ক্ষুধা পায় নাই, ববং বাটিতে এক পয়সার মুড়ি সামনে নিয়া বসিয়া অপমানে তার চোখে জল আসিয়াছিল।

কিন্তু কাঁদে নাই। প্রমীলা কোনোদিন কাঁদে না।

সে না কাঁদুক, প্রমথের পরিবর্তন হইয়াছে। স্বভাবেব উগ্রতা একেবারে যায় নাই, কিন্তু সকলকে সে যেন আজকাল ভয় করিতে শুবু করিয়াছে—ছেলেমেয়েকে পর্যন্ত সে আজকাল সোজাসুজি আঘাত করিতে অস্বস্তি বোধ করে। প্রমীলাব একবেলাব খাওয়া বন্ধ কবিতে সে আজকাল তাই দিব্যি দেয়, পুরাতন অপরাধের কথা তুলিযা লজ্জা দিবার চেষ্টা করে।

আধসিদ্ধ ভাত গিলিযা আপিস যাওয়ার সময প্রমথ বলিযা গেল, ভাত খাস বে মিলি, বুঝলি ?

প্রমীলা ঘবেব ভিতর ঘাড় হেঁট কবিযা বসিযা বহিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রমথ চঞ্চল হইযা উঠিল। মেযেকে দু-একটি মিষ্টি কথা বলিয়া যাওয়ার প্রেরণাটা এত প্রবল যে না বলিয়া চলিয়া যাইতে পা ওঠে না, অথচ ওবকম অনভ্যস্ত কাজটা সহসা কবিয়া ফেলাও যায় না।

খানিক ছটফট করিয়া প্রমথ হঠাৎ বলিল, এক গ্লাস জল দে তো।

প্রমীলা নীরবে জল দিল।

প্রমথ আগেই যথেষ্ট জল পান করিযাছিল, তবু গেলাসটা অর্ধেক খালি কবিযা ফেলিল।

ভাত খাস বুঝলি ?

বলিয়া আরও স্নেহ প্রকাশ করিয়া ফেলার ভয়ে ডান বগলেব কাগজপত্রের বান্ডিলটা কোটের বাঁদিকের পকেটে ঢুকাইবাব চেষ্টা কবিতে করিতে একরকম পালাইয়া গেল।

প্রমথের পরিবর্তন হইয়াছে।

ভাত খাইতে বসিয়া বিমল বোনকে আরও একটু পরীক্ষা কবিবার জন্য জিজ্ঞাসা কবিল, তোব মুখ এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন রে ?

বাবা চাল চুরির অপবাদ দিয়ে গেল শুনলে না ?

বাবার কথায় বুঝি মানুষের মুখ শুকনো হয় ?

সকালে বিমল প্রমীলার মাকড়ি ফেরত আনিয়াছিল, নগেনের লখনৌ যাওয়ার খবরটা দেওযার গোলমালে মাকড়ি দিতে মনে ছিল না। মাকড়ির কথাটা তার মনে পড়িয়া গেল। মাছের ঝোলেব আলুর টুকরা কয়টা পাঁচুর পাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, সে তুই ছেলেমানুষ বলে। কেউ যখন কিছু বলে, তখন কেন বলেছে সেটা বুঝতে হয়। সেই দিন তুই আমায় মাকড়ি-চোর বললি। আমি রাগ করেছিলাম ? আমার তোর উপর তখন অন্য কারণে ভীষণ রাগ হয়েছিল, কী আর করিস তুই, আমায় চোর বলে একটু স্বস্তি পেলি।

প্রমীলা বলিল, অন্য কারণে রাগ হয়েছিল মানে ?

বিমল বলিল, মানে তুই জানিস। যাই হোক, তোর মাকড়ি এনেছি।

এনেছ ? বাঁচলাম। তোমায় চোর বলার শাস্তি পাওয়াব জন্য মনটা ছটফট করছিল।

বিমল খুশি হইয়া হাসিল।

প্রমীলা রান্নাঘরে ফিরিয়া গেল। বিমলকে খানিকটা ডাল আনিয়া দিয়া বলিল, মানুষ যে তার মুদ্রাদোষ নয় সেটা আমি কিন্তু অনেকদিন থেকে জানি দাদা। হাতে কটা টাকা এলেই দুল কিনে দিয়ে শাস্তি আরও বাড়িয়ো না।

তোকে দুল কিনে দেবার জন্য আমার ঘুম আসছে না—বলিয়া বিমল অনিলার মাছের কাঁটা বাছিয়া দিতে আরম্ভ কবিল।

অধর আজও বাড়িতে আছে টের পাইয়া দুপুরটা বিমল পাড়ায় তাস খেলিয়া কাটাইয়া আসিল।

খাসনি, মিলি ?

অন্যদিন প্রমীলার না খাওয়ার সম্ভাবনাটা বিমলের মনে থাকিত না। ভুলিয়া যাওযার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটা আজ কী কারণে বন্ধ হইযাছে।

প্রমীলা ইংরাজি পড়িতেছিল, নগেনের বউ হইতে গেলে মুখ্‌খু হইয়া থাকিলে চলিবে কেন ? মাথা নাড়িয়া বলিল, রাত্রে খাব।

কাল রাত্রে কটা রুটি খেয়েছিলি ?

মিথ্যা বলিয়া বাহাদুরি করাব চেষ্টা প্রমীলা কখনও করে না, সে জন্য দাদার সহানুভূতি বাড়ানোর অপরাধ যদি হয় তার দোষ নাই। সে বলিল, দুটো।

নে খা।

চাযের দোকান হইতে বিমল গোটা তিনেক কেক কিনিয়া আনিযাছে।

প্রমীলা বিনা বাক্যব্যয়ে কেক তিনটা উদরস্থ করিল, জল খাইযা বলিল, কী গন্ধ ! পচা ডিম দিয়েছে নাকি ?

বিমল সান্ত্বনা দিয়া বলিল, ভয় নেই, মরবি না। আমি ঢের খেয়েছি।

এই সব খাও তোমরা ? এই আরশোলার গন্ধ দেওয়া কেক ?

কেক কে খেল দিদি ? পাঁচু খবর নিতে আসিল।

প্রমীলা গম্ভীর হইয়া বলিল, আমি খেয়েছি। বাবাকে বলে দিবি তো ? বলিস।

পাঁচু বলিল, আমায় না দিলে বলে দেব।

বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া প্রমীলা লজ্জার সঙ্গে হাসিল। বলিল, সবগুলো খেয়ে ফেললাম—একটা রাখা উচিত ছিল। তোকে বিকেলে এনে দেব পাঁচু।

প্রমীলার কযেক আনা পয়সা সঞ্চিত আছে।

সে আবার বলিল, নগেনবাবুদের বাড়ি থেকে আসবার সময় এনে দেব।

এবং এর নাম ডিপ্লোম্যাসি।

বিমল অবাক হইযা বলিল, নগেনদার বাড়ি যাবি নাকি ?

যাব। অনেকদিন লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা হয়নি। নিশ্চয় রাগ করেছে।

লক্ষ্মীদি ? সে তো শ্বশুরবাড়ি।

প্রমীলা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, আজ এসেছে।

তুই জানিস কী করে ? জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া বিমল চুপ করিয়া রহিল। লক্ষ্মী আসে নাই, শীঘ্র আসিবেও না এবং প্রমীলা তাহা জানে।

আঁচল ঘষিয়া বিব্রত পাঁচুর ঘাড়ের ময়লা তুলিতে তুলিতে প্রমীলা বলিল, নিয়ে যাবে তো দাদা ?

আমি ? আমি এখুনি নগেনদাকে তুলে দিতে স্টেশনে যাচ্ছি।

প্রমীলা হার মানিল না, সঙ্গে সঙ্গে বলিল, স্টেশন থেকে নিয়ে যেয়ো ?

আমার সঙ্গে স্টেশনে যাবি ?

দোষ কী ?

কী দুঃসাহসী মেয়ে ! বিমল চিন্তিত হইয়া উঠিল প্রমীলাকে স্টেশনে সে নিয়া যাইতে পারে, কিন্তু যাওয়া কি উচিত ? তার পক্ষে, তার বোনের পক্ষে সে কত বড়ো অপমান।

মানে, একেবারে স্টেশনে গিয়া পলাতক প্রেমিককে পাকড়াও করিলে বোন তার কত নীচে নামিয়া যাইবে ? নগেন ভাবিবে এ মেয়ের আত্মসম্মান বোধ নাই। লাবণ্য ভাবিবে, গরিবের মেয়েটা পায়ে পড়িতে আসিয়াছে। আর সর্বক্ষণ সে সচেতন হইয়া থাকিবে যে বোনকে সঙ্গে নিয়া সে স্বার্থের জন্য অম্লানবদনে অকথ্য অপমান সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে সকলে এই কথা ভাবিতেছে।`হীন চক্রান্তটা তার এমনি করিয়া সে বোনের জন্য একটা বর গাঁথিতে চায়।

হয়তো এমন কথাও কারও মনে হইতে পারে যে, প্রমীলার কোনো দোষ নাই, তাকে জোর করিয়া সেই স্টেশনে আনিয়া ফেলিয়াছে।

অবশ্য লোকে কী ভাবিবে, না ভাবিবে সেটা বড়ো কথা নয়, লোকে অনেক কিছুই ভাবিয়া থাকে। আজ স্টেশনে না গিয়া যদি প্রমীলার উপায় না থাকে, তবে যাইতেই হইবে ; ওদের যদি ঝগড়া হইয়া থাকে, শুধু রাগ করিয়াই যদি নগেন লাবণ্যের সঙ্গ নিয়া থাকে, তবে একটা বোঝাপড়ার জন্য স্টেশনে যাওয়াও প্রমীলার পক্ষে দোষের নয়—ওটুকু অপমান মানিয়া নিলে চলিবে না। কিন্তু শুধু ঝগড়ার জন্য নগেন কি তার বোনকে এমন শাস্তি দিবে? শেষ মুহূর্তে সকলের সামনে তাকে নত না করিয়া ছাড়িবে না ?

যে একদিন স্ত্রী হইবে তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা থাকে এতটুকু ? বিশেষত নগেনের মতো মানুষের ?

ওদের মধ্যে ব্যাপারটা যে সহজ নয় প্রমীলার স্টেশনে যাওয়ার ইচ্ছাই তার প্রমাণ। সুতরাং দায়িত্ব নগেনের আছে। এ ভাবে গিয়া দেখা করিয়া আসা প্রমীলা যে অপরিহার্য মনে করিতেছে, এ অবস্থাটা নগেনই সৃষ্টি করিয়াছে। এ তবে তার কেমন ব্যবহার?

বিমল ভালো করিয়া কিছু বুঝিতে পারিল না। তার মনে হইল, ঝগড়া হয়তো নগেন করে নাই, প্রমীলাকে শাস্তি দিতে হয়তো সে চাহে না, নিছক ঘটনাচক্রেই সে লাবণ্যদের সঙ্গে বিদেশে যাইতেছে ; ভয় পাইয়াছে প্রমীলা। নগেন অনেক দিন আসে নাই, তারপর একবার দেখা পর্যন্ত না করিয়া একটা ফাজিল অথচ সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে দূর দেশে চলিয়াছে, নানা আশঙ্কায় প্রমীলার বুক কাঁপিতেছে। কে কী ভাবিবে, নিজেকে কতখানি সস্তা করিয়া দেওয়া হইবে, অপমানই বা কতখানি জুটিবে এ সব ভাবিবার সময় তাহার নাই।

কথাটা ভাবিবার সময় ছিল না। যাইতে হইলে এখনই রওনা হওয়া দরকার। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বলিল, তুই স্টেশনে যাবি কী করে? ফিরে এসে তোকে নগেনদার বাড়ি নিয়ে যাবখন।

স্টেশনে না গিয়া যদি উপায় না থাকে প্রমীলা বারণ শুনিবে না।

প্রমীলা বারণ শুনিল না। বলিল, না না, তখন সময় হবে না দাদা। স্টেশন হয়ে একেবারে চলে যাব? ফিরে এসে আমায় রাঁধতে হবে না?

বিমল বলিল, তবে কাপড় পরে নে। কিন্তু তোর মন বড়ো ছোটো হয়ে গেছে মিলি।

প্রমীলা বোধ হয় মনে মনে বলিল, হোক। কিন্তু মুখে সে কিছুই বলিল না। তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়াইয়া কাপড় বদলাইয়া তৈরি হইয়া নিল।

সমস্ত পথ বিমল একটি কথা বলিল না, বাসের প্রত্যেকটি লোকের মুখে বিমল অন্তরালের মানুষটিকে খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিল। ইহাদের অনেকেরই গৃহ এবং গৃহিণী আছে, কিন্তু একটা রোগা আর ফরসা আর কাঁদো-কাঁদো মেয়ের উপস্থিতিতে কী করুণ ওদের আত্মনিগ্রহ !

স্টেশনে পৌঁছিয়া বিমল ঘড়ি দেখিল। গাড়ি ছাড়িতে মিনিট পনেরো বাকি আছে। বলিল, ওরা গাড়িতে উঠে বসেছে নিশ্চয়—দাঁড়া প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনি।

প্রমীলা বলিল, দাদা শোনো। লাবণ্য কী ভাববে ?

জানি না।

হাসবে ?

নিশ্চয় হাসবে। মুচকে মুচকে হাসবে।

আমি যাব না।

ব্যস ! বিমলের বিরক্তির সীমা রহিল না—তোর মাথায় ছিট আছে নাকি ?

প্রমীলার ফিট হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। ভয়ে ভয়ে সে বলিল, আমি ওয়েটিং রুমে বসছি, তুমি দেখা করে এসো।

যা, মরগে যা।

অল্প দূরেই মেয়েদের ওয়েটিং রুম, প্রমীলা সেখানে ঢুকিয়া পড়িল। দরজার পাশ হইতে চাহিয়া দেখিল, বিমল একটি সিগারেট ধরাইয়াছে এবং চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সিগারেটটা আধখানা পুড়িয়া গেলে বিমল প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনিয়া নগেনকে খুঁজিতে গেল।

একটি সেকেন্ড ক্লাস কামরা রিজার্ভ করা হইয়াছে। লাবণ্যদের পরিবারটি বিশেষ বড়ো নয়, কিন্তু লাবণ্যের বাবা ভয়ানক মোটা, একাই তিনি গাড়িখানা ভারাক্রান্ত করিয়াছেন। ফ্রক পরা দুটি মেয়ে আছে, বছর দশেকের একটি অসুস্থ ছেলে আছে। আর আছে লাবণ্য স্বয়ং। সজনীর জিনিসপত্র গাড়িতে আছে, কিন্তু সে নিজে অনুপস্থিত। বুকস্টলের পিছনে চাপা গলায় সে কাকিমার সঙ্গে কলহ করিতেছে।

গাড়ির মধ্যে এককোণে বসিয়া নগেন কাগজ পড়িতেছে। লাবণ্যের সঙ্গে তার যেন কোনো সম্পর্ক নাই।

লাবণ্যের বাবা কমলবাবু বিশেষ কারণে বিমলকে দেখিতে পারেন না। এখনও তিনি তাহাকে দেখিতে পাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখাইলেন না।

লাবণ্য বলিল, কবি যে ! তারপর গলা খুব নামাইয়া বলিল, কাকে তুলে দিতে এলে বল তো আমাকে? বিশ্বাস হয় না।

বৃঢ় কথা শুনতে তোমার এত আগ্রহ কেন ? আমি কাউকেই তুলে দিতে আসিনি। নগেনদার সঙ্গে একটু দরকার আছে।

লাবণ্য বলিল, তুমি যে দরকারবাদী কবি অনেকদিন তা টের পেয়েছি।

বিমল ডাকিয়া বলিল, নগেনদা, একবার নেমে এসো—কথা আছে।

নগেন নামিয়া আসিল।

এসো আমার সঙ্গে, বলিয়া অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে হাত ধরিয়া সে নগেনকে টানিয়া নিয়া চলিল।

প্রমীলা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

খবরটা এমন অবিশ্বাস্য যে, নগেন পর্যন্ত কিছুক্ষণ কথা বলিতে পারিল না। অথচ সকল অবস্থাতে মানানসই কথা বলার মতো সহজ কাজ তার কাছে আর কিছুই নয়।

প্রমীলা এসেছে ?

হ্যাঁ। ওয়েটিং রুমে বসে আছে।

দ্যাখো দিকি ছেলেমানুষি। নগেন একটু হাসিল। তার কথার সুরে মনে হইল প্রমীলার স্টেশনে আসার মধ্যে ছেলেমানুষি ভিন্ন সত্যসত্যই আর কিছু নাই।

বিমল তার হাত ছাড়িয়া দিল।

নগেন আবার বলিল, সকালে একটা খবর পেলে আমিই তোমাদের বাড়ি যেতাম বিমল। এমনিই যেতাম, ভেবেও ছিলাম যাব—সময় পেলাম না। কদিন নিশ্বাস পেলার অবসর পাইনি। তা ছাড়া মনে করলাম, একমাস পরেই তো ফিরছি—

বিমল বাধা দিয়া বলিল, থাক, নগেনদা।

নগেন আহত বিস্ময়ে চুপ করিয়া গেল। এমন সুস্পষ্ট পরাজয় জীবনে সে ভোগ করে নাই, এমন আবোল-তাবোল কথা বলার মতো বিচলিতও হয় নাই। প্রমীলার মতো ভীরু সাধারণ মেয়ে যে আকস্মিক দুঃসাহসিকতায় এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করিয়া ফেলিতে পারে, নগেনের সে ধারণা ছিল না। এ অবস্থাটিকে যে কেমন করিয়া আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়, এখনও সে তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই অথচ এখনই তাহাকে প্রমীলার সামনে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তার জীবনে এমন ঘটনা অভূতপূর্ব।

প্রমীলাকে ডাকিয়া দিয়া বিমল বলিল, তোরা কথা ক, আমি চট করে এক কাপ চা খেয়ে আসছি।

নগেন হাসিয়া কহিল, ট্রেন ফেল করে দিয়ো না বিমল।

না। ভয় নাই।

যাওয়ার আগে বিমল শুনিয়া গেল নগেন বলিতেছে, তোমার রাগ হয়েছে নাকি, মিলি ?

গাড়ি ছাড়িবার দুই মিনিট পূর্বে বিমল ফিরিয়া আসিল। নগেন চলিয়া গিয়াছে। প্রমীলা হাসিমুখে চারিদিকে চাহিয়া তাহাকে খুঁজিতেছে।

ভয়ে এতক্ষণ প্রমীলার লজ্জা ছিল না। এবার দাদাকে দেখিয়া তাহার সমস্ত মুখ লাল হইয়া গেল।

চল, বাড়ি যাই।

চলো।

বাড়ি ফেরার সময় সমস্ত পথ বিমল বিরক্ত হইয়া রহিল। এখন আর তাহার কোনো সন্দেহ নাই যে সবটাই প্রমীলার ছেলেমানুষি। ওর ক্ষতি হইল, না লাভ হইল কিনা ভগবান জানেন, কিন্তু মাঝখান হইতে নিজেকে অপমানিত করিল, নগেনের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করিল। বিমলের মনে হইতে লাগিল, মেয়ে জাতটার মতো ছ্যাবলা জাত পৃথিবীতে নাই। এবং নিজেও সে কম বোকা নয়। প্রমীলা নগেনকে ডাকিয়া দিতে বলে নাই। ও বাহাদুরিটা করিবার তার কী দরকার ছিল ?

এদিকে বুকস্টলের পিছনে সজনী ও কাকিমার কলহের শেষ নাই। একা একা বেড়াইতে যাওয়া প্রথম হইতেই সজনীর মনঃপূত হয় নাই, কাকিমা কথাটা পাড়া অবধি ওই নিয়া তাহাদের কথা কাটাকাটি শুরু হইয়াছে। সজনীকে রাজি করানোর জন্য যে কাণ্ডটা কাকিমাকে করিতে হইয়াছে, সে শুধু কাকিমাই জানেন, বিষ খাওয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়া পর্যন্ত ফল হয় নাই সজনী এতখানি বাঁকিয়া বসিয়াছিল।

তুমি যাবে না কেন ?

কতবার বলব ? দশদিন বাদে দিদিরা আসবে। আমি এখন কোথাও যেতে পারব না।

তবে আমিও পারব না।

কেন আমার যাওয়া না-যাওয়ার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কী শুনি ? তোমার দিদি আসবে ?

আমার অত বেড়াবার শখ নেই।

দ্যাখো, ভালো হবে না বলছি। নগেনের সঙ্গে যদি তুমি না যাও, আমার যেদিকে চোখ যাবে চলে যাব—চোখের সামনে এমন করে তুমি অধঃপাতে যাবে, এ আমি দেখতে পারব না। যাবে না ? ঠিক করে বলো। যাবে না তো ?

তুমি যাবে না কেন ?

একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তিতে কাকিমার এবার রাগ হয়।

সেটা বোঝ না? কচি খোকা নাকি ?

তখন সজনী করুণ সুরে বলে, আমার যেতে ইচ্ছা করছে না।

কাকিমা তৎক্ষণাৎ সুর নরম করেন, ছোটো ছেলের মতো স্বামীকে বোঝান, আদর করিয়া বলেন, দ্যাখো, আজ কত বছর একদিনের জন্য আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়নি। তাই তো আমাদের এত ঝগড়া হচ্ছে। একটি মাস তুমি বাইরে ঘুরে এসো দেখবে আর ঝগড়া হবে না। বলিয়া একটু হাসেন, বিরহের অভাবে আমাদের মিলন যে তিতো হয়ে গেল গো !

শুনিয়া তখনকার মতো অভিভূত হইয়া সজনী বলে, আচ্ছা, যাব।

কিন্তু খানিক পরেই বলে, দ্যাখো, এখন গিয়ে বিশেষ কী লাভ হবে? আর অত লোকের সঙ্গে যেতে আমার ভালোও লাগবে না। আমি বরং পুজোর সময় নিজেই যাব।

তখন আবার গোড়া হইতে সব শুরু হয়। কাকিমা কাঁদেন, বলেন, বুঝেছি, আমি না মরলে তোমার উপায় নেই। আমি না হয় মরবই। তখন তোমার অম্বলের অসুখ হোক আর অনিদ্রারোগ হোক আমি দেখতে আসব না—তোমার যা খুশি কোরো।....তোমার লজ্জা নেই ? বউ কী মানুষের থাকে না ? হলামই বা বউ, মেয়েমানুষের আঁচল চাপা হয়ে থাকতে তোমার মাথা কাটা যায় ? এ কী ! কুঁড়ে বলে মানুষ এমন হয় ?

স্টেশনে আসিযা সজনী তার মেয়াদ কমাইবার জন্য আবদার ধরিয়াছে। পরের বাড়িতে সে একমাস থাকিবে কেমন করিযা ? পরের বাড়ি পনেরো দিন বড়ো জোর থাকা যায়, তার বেশি নয়।

আর পনেরো দিন হোটেলে থেকো।

তা হলে মরেই যাব।

নগেন তোমার পর ? ও তো বাড়ি ভাড়া করবেই—

নগেনকে আমি দেখতে পারি না, ও ভয়ানক গম্ভীর। ওর সঙ্গে একমাস এক বাড়িতে থাকলে আমি খেপেই যাব।

কাকিমা সংক্ষেপে বলিলেন, তাই বরং যেয়ো, কিন্তু একমাসের মধ্যে ফিরে এসো না। এলে, দিদির সঙ্গে আমি বর্মা চলে যাব।

সজনী আহত হইয়া বলিল, আচ্ছা তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।

তখন গাড়ি ছাড়ার সময় হইয়াছে। সজনী গটগট করিয়া গাড়িতে উঠিয়া ওদিকের আসনে বসিয়া পড়িল।

লাবণ্য বলিল, কী সজনীবাবু, পরামর্শ শেষ হল ?

কিন্তু সজনী কথা কহিল না। রাগে, দুঃখে, অভিমানে তার চোখে জল আসিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছিল। সে চোর, না ডাকাত যে এ ভাবে ধরিয়া বাঁধিয়া তাকে দ্বীপান্তরে পাঠানো হইতেছে? নিজের শান্ত নির্জন গৃহে পরিত্যক্ত ইজিচেয়ারটির জন্য সজনীর মন কেমন করিতে লাগিল। ঘরের আরামপ্রদ কোণটি ছাড়িয়া মানুষের মধ্যে, কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িতে তার যে মাথা ঘোরে, ভয় হয়, অস্বস্তি ও অশান্তির সীমা থাকে না, এ কথা সবচেয়ে ভালো করিয়া যে জানে, সেই কিনা তার এমন শাস্তির ব্যবস্থা করিল !

শেষ মুহূর্তে সজনী মুখ ফিরাইয়া দেখিল অত্যাচারী স্ত্রীটি তাহার প্ল্যাটফর্মে পরিত্যক্ত বিপন্নার মতো একাকিনী দাঁড়াইয়া এদিকেই চাহিয়া আছে। সজনীর মনে হইল ওর দুচোখ জলে ভরতি।

গাড়ি চলিতে আরম্ভ করা মাত্র দরজা খুলিয়া সে টুক করিয়া নামিয়া গেল। সলজ্জ হাসির সঙ্গে নগেনকে বলিল, আমি কদিন পরে যাব নগেন। কাল কোর্টে মস্ত একটা মোকদ্দমা আছে—মনে ছিল না।

সজনীর সম্পত্তি আছে সুতরাং সে মকদ্দমারও অধিকারী।

কাকিমা হাসিবেন, না কাঁদিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। গাড়ি বাহির হইয়া যাওয়া পর্যন্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

তারপর বলিলেন, এটা কী করলে ?

সজনী ভীতভাবে চুপ করিয়া রহিল। কী যে করিয়া ফেলিয়াছে সেও ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না।

কাকিমা বলিলেন, চলো বাড়ি চলে যাই। আমার আব মুখ দেখাবার উপায় রাখলে না।

মুখে এ কথা বলিলেও মনে মনে তিনি এত খুশি হইয়াছিলেন যে, উপভোগে বাধা পড়িবে ভয়ে বিমল ও প্রমীলাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেও ডাকিবার চেষ্টা করিলেন না।

মোটরে বসিয়া ব্রিজ পর্যন্ত সজনী কোনো রকমে চুপ করিয়া রহিল। তারপব বলিল, বিমল আর ওর বোনকে স্টেশনে দেখলাম।

কাকিমা বলিলেন, ডাকলে না কেন ?

এমনি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অন্যদিন ছুটি শেষ হইলে অধর আপিসে যাইবে শান্তা এই রকম একটা আশা করিয়াছিল। কিন্তু তাব আশা পূর্ণ হইল না। অধব আরও সাতদিনের ছুটি নিল।

শান্তার বিবর্ণ মুখভাব লক্ষ করিয়া সে হাসিয়া বলিল, অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এর পর তোমায় ছেড়ে আপিস যেতে কষ্ট হবে—বলিয়া মুখের হাসি আরও ব্যাপক করিয়া যোগ দিল, এ সাত দিন বাদ দিলেও আর এক মাস ছুটি পাওনা আছে—আপিস যেতে ইচ্ছা না হয়, দেব ঝেড়ে আর একটা দরখাস্ত ! কী বল ?

হাত বাড়াইয়া অধর স্ত্রীর গাল টিপিয়া দিল ; আরও এক মাস ছুটি নেওয়ার কথা ভাবিয়াই তার যেন খুশির সীমা নাই।

শান্তা ভয়ে ভয়ে বলিল, অনেক দিন মামাকে দেখিনি, নিয়ে যাবে ?

অধর আশ্চর্য হইয়া বলিল, আমি ? আমি যাব তোমার ওই ছোটোলোক মামার বাড়ি ?

শান্তা আরও আস্তে বলিল, আমায় পাঠিয়ে দাও।

অধর আরও আশ্চর্য হইয়া বলিল, বিয়ের আগে ওরা তোমায় কী রকম কষ্ট দিত সব তো শুনেছি শান্তা, তুমি কি মনে কর তারপরেও তোমাকে আমি ওদের ওখানে পাঠাব ? তারপর গলা মোলায়েম করিয়া, তা ছাড়া, তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। ও সব যাওয়ার কথা-টথা বোলো না বাবু শুনতে ভয় করে।

শান্তার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। অধরের মুখে এ সব কথা যে কী পরিমাণ বেমানান হয়, শুনিলে খট করিয়া কানে বাজিয়া কী অস্বাভাবিক লজ্জা বোধ হয় অধর তাহা জানে, তবু সে এ সব কথা বলে কী করিয়া ?

মামা আমায় কষ্ট দেয়নি। মামিমাই একটু-আধটু বকত।

অধর শব্দ করিয়া হাসিয়া উঠিল, একটু-আধটু বকত ! এ দাগটা কীসের গো ?

শান্তাকে কাছে টানিয়া তাহার বাহুমূলের পোড়া দাগটিতে অধর হাত বুলাইতে লাগিল। অল্পে অল্পে হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, আমি থাকলে তোমার মামিমাকে সেদিন জ্যান্ত পুঁতে ফেলতাম। কী যন্ত্রণাটাই তুমি পেয়েছিলে !

শান্তা বলিল, ওটা তো মামিমা পোড়ায়নি, রাঁধতে তেল জ্বলে উঠে পুড়ে গিয়েছিল।

অধর অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, ও সব বললে এখন শুনবে কে ? তেল জ্বলে উঠলে এখানটা পুড়তে পারে নাকি ? না না, ওখানে তোমায় আমি পাঠাব না। একটু আবৃত্তি কর না, শুনি ?

কী আবৃত্তি করব ?

স্বপন-পশারী থেকে করো।

পরদিন শান্তা বলিল, আচ্ছা, ঠাকুরঝিকে আনাবে না একবার ? ঠাকুরঝি রাগ করবে।

পাঠালে তো আনব ?

পাঠাবে বইকী। ঠাকুরজামাই লোক ভালো।

ঠাকুরজামাই তো আর পাঠাবে না, পাঠাবে ঠাকুরজামাইয়ের পিতাঠাকুর। আমি চিঠি লিখেছিলাম, এখন পাঠাতে পারবে না জানিয়েছে। বুড়ো কী কম বজ্জাত !....এখানে বোসো তো।

অধর জানালার কাছে চেয়ারটা দেখাইয়া দিল।

কেন ?

বোসো না। বলছি।

শান্তা বসিল। অধর বলিল, সোজা হয়ে বোসো—অত শক্ত হয়ে নয়, বেশ আলগা দিয়ে বোসো—মাথাটা একটু হেঁট করো, অত নয়, অল্প একটু—ব্যস্। ডানদিকে একটু মুখ ফিরাও। কাঁধ থেকে আঁচলটা নামিয়ে দাও। এবার চুপ করে বসে থাকো, নড়ো না।

অধর খাটের প্রান্তে বসিয়া তীব্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শান্তাকে দেখিতে লাগিল।

তোমার মুখের বাঁদিকে আলো পড়েছে, ডান দিকে ছায়া। কী যে তোমায় দেখাচ্ছে শান্তা ! আমি উপমা দিতে জানি না কিন্তু—দাঁড়াও, ছায়াটা আরও গাঢ় করে দি।

উঠিয়া গিয়া অধর এদিকের জানালাটা বন্ধ করিল, কপাট ভেজাইয়া দিল। আলো ও ছায়ার ভাগাভাগিতে শান্তার সু-সামঞ্জসিত মুখখানি কুৎসিত হইয়া গেল।

তেমনই ভাবে অধর তাহাকে পুরা আধঘণ্টা বসাইয়া রাখিল। বিমলেব নয়, সে গল্পে পড়া কবির নকল করিতেছে, যে কবি মানবোচিত কিছুই করে না শুধু প্রিয়ার কথা ভাবে, প্রিয়াকে কোনো কথা ভাবায় না ; প্রিয়াকে নিয়া খেলা করে, প্রিয়াকে খেলিতে দেয় না এবং কাছে থাকিয়াও ব্যবধান বজায় রাখিয়া শুধু প্রিয়াকে চাহিয়া দ্যাখে, প্রিয়া নড়াচাড়া করিলে স্বপ্ন ভাঙিয়া যাওয়ার দুঃখে হতাশ বোধ করে।

অপমানে শান্তার দুই কান ঝাঁঝাঁ করিতে লাগিল। আধখোলা বুকের কাছে দুটি হাত জড়ো করিয়া নির্বাক নিশ্চল ছবিটি হইয়া বসিয়া থাকার জন্য সে জন্ম নিয়াছিল নাকি ? সে কী সার্কাসের পোষা জন্তু ? তাকে নিয়া এ ভাবে আমোদ করিবার অধিকার ও লোকটাকে কে দিয়াছে ?

বিমল তাহাকে নিয়া একদিন এমনই কাব্য করিয়াছিল—কিন্তু এ ভাবে নয়। এমন রূঢ় নির্মম আমোদের জন্যে নয়।

বিমলের পাশের বাড়ির নিমগাছটা তখনও সম্পূর্ণ ন্যাড়া হয় নাই, কিছু কিছু পাতা আছে। বিকালের দিকে গাছটির আলোছায়ায় বোনা ছায়া বিমলদের ছোটো উঠানটির অর্ধেক ঢাকিয়া দিয়াছিল।

বিমল সহসা বলিয়াছিল, একটা মজা দেখবেন ?

কী মজা ?

এখানে এসে দাঁড়ান, আমাদের বাড়ির কার্নিশের পাশ দিয়ে আপনাদের বাড়ির ছাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকুন। পাঁচ মিনিট তাকিয়ে থাকলেই দেখবেন আমাদের বাড়িটা ওপরে উঠেছে।

সে অবিশ্বাস করিয়া বলিয়াছিল, যান, তাই কখনও হয় ?

পরীক্ষা করেই দেখুন না।

ফাঁকি দিয়া ধার করা ক্যামেরায় বিমল তাহার ফটো তুলিয়া নিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাকে রাগ করিতে দেখিয়া হাসে নাই।

দোষ হয়ে থাকলে বলুন নষ্ট করে ফেলছি। প্রমীলাকে জিজ্ঞাসা করুন ওর ফটোও নিয়েছি। ফটো নিলে দোষ কী আর ?

সেদিন বিমলের ছেলেমানুষি ভালো লাগে নাই। আজ তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল বিমলের কাছে গিয়া অনুনয় করিয়া বলে, আর একটা ফটো নেবেন ? যেভাবে খুশি, যেখানে খুশি দাঁড় করিয়ে দিন আমাকে।

ফটোটা ভালো ওঠে নাই। শান্তার সর্বাঙ্গে কে যেন সাদা-কালো ছোপ দিয়া দিয়াছে, দেখিলে হাসি পায়, বিমল ফটোগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। শান্তার যে মুখ দেখিলে হাসি পায়, সে মুখ দেখিয়া বিমল করিবে কী ?

ইতিমধ্যে সে ক্যামেরাটি আরেকবার ধার করিয়া আনিয়া দু দিন রাখিয়াছিল, অধরের চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ি থাকার রকম দেখিয়া ফেরত দিয়া আসিয়াছে।

প্রমীলাকে স্টেশনে নিয়া গিয়া অপমানিত হইয়া আসার পরদিন সকালে নগেনের চিঠি নিয়া বিমল আলিপুরে হেডউড সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেল।

রবিবারের সকাল, হেডউড চার্চে ধর্ম করিতে গিয়াছিল। একঘণ্টা ধরিয়া তাহার বাগানের ফুলগুলির সঙ্গে ভাব করিয়া বিমল বিরক্ত হইয়া উঠিল। সাহেবের কুকুরটা তাহাকে ভালোবাসিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লেজ নাড়িয়াছে, তবু।

নগেনের চিঠি পড়িয়া হেডউড বহুক্ষণ ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া রহিল, শেষে বলিল, This is too much !

কিন্তু চাকরি সে বিমলকে দিল। একটা স্লিপ টানিয়া নিয়া খসখস করিয়া কী কতগুলি লিখিয়া বিমলের হাতে দিল। কাল বেলা একটার সময় আপিসে গিয়া বড়োবাবুর হাতে স্লিপটা দিতে হইবে।

Don't come before one p.m.

বিমল বলিল, No, Sir !

আর বোসের সঙ্গে দেখা হলে বোলো যে আমি বলেছি, This is too much. Don't forget. Let that Shylock understand, this is too much. You can go.

গেট পার হইয়া বিমল রাস্তায় পা দিয়াছে, বেয়ারা ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, সাহেব ডাকিতেছে।

হেডউড বলিল, শোনো বাবু ! বোসকে কিছু বলবার দরকার নেই।

এও নগেনকে ভয় করে ! বিমল বলিল, No, Sir !

বাড়ি ফেরার পথে চাকরি পাওয়ার আনন্দে নিজেকে বিমল কিছুমাত্র উত্তেজিত দেখিল না। মনের মধ্যে কোথায় যেন বিঁধিতেছিল। বোনকে যে স্টেশনে ছুটিয়া যাইতে বাধ্য করে তার অনুগ্রহে চাকরি পাওয়া যেন খুব অগৌরবের কথা, অন্যায়।

অথচ, নগেনের হয়তো কোনো দোষই ছিল না।

কয়দিন কবিতা বাহির হইতেছিল না, ভাব ভাষা ছন্দ মিল সব যেন একসঙ্গে আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে। আজ বিকালে ঘরের জানালায় এক মুহূর্তের জন্য শান্তার অসুস্থ বিবর্ণ মুখ দেখিয়া বিমলের মন এত খারাপ হইয়া গেল যে, রাত্রে জীবনে এই প্রথম চেষ্টা করিয়া কবিতা লিখিতে বসিল। এবং কতকগুলি বাজে লাইন লিখিয়া তার মন আরও খারাপ হইয়া গেল। আলো নিভাইয়া সে শুইয়া পড়িল বটে, কিন্তু ঘুম আসিতে দেরি হইল। এবং তারই ফলে এই জ্ঞান লাভ করিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল যে প্রমীলা এত রাত্রে না ঘুমাইয়া কাঁদে।

ভাইবোনের বিছানায় অত্যন্ত সংকীর্ণ একটু স্থানে গুটিসুটি হইয়া তাহাকে শুইতে হয়, তারই মধ্যে কী রকম কায়দা করিয়া সে বালিশে মুখ গুঁজিযাছে। বিমল অনেকক্ষণ বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েদের কান্নায় তার শ্রদ্ধা নেই—কারণে, অকারণে ওরা এত কাঁদে ! কান্না যেন ওদের একটা বিলাসিতা। তবু প্রমীলার জীবনে যে ইতিমধ্যে—ধরিতে গেলে জীবন আবম্ভ হওয়ার আগেই—কান্নার আমদানি হইয়াছে, এ কথা জানিয়া রাত্রির অন্ধকারকে তাহার অভিশাপ দিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল।

এ রকম ইচ্ছার আরও একটা কারণ ছিল। নিজের অন্ধকাব ঘরে অবিন্যস্ত বুক্ষ শয্যায় নিজেব অতি নিকটে শান্তাকে আজ তাহার এত বেশি প্রয়োজন মনে হইতেছিল যে, একটা ভয়ানক কিছু করিয়া ফেলিবার ঝোঁক সে সামলাইতে পারিতেছিল না। এত রাত্রে কাঁদাকাটা করার জন্য প্রমীলাকে ধমকাইয়া দিবার ইচ্ছাটা কষ্টে দমন করিয়া বিমল নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। জানালার লোহার শিকে মাথা ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল, শান্তাকে ভালোবাসা কত বড়ো বোকামি হইযা গিয়াছে। আজিকার চাকরি পাওয়ার যত যশ, অর্থ, সম্মান যাই সে পাক, জীবনে সব তাহাব তুচ্ছ হইয়া যাইবে, কারণ শান্তা তাহার কবিতার বদলে শুধু কাব্যরসই দিল, প্রেমকে মানিল না। মাসে একশো পঁচিশ টাকায় শান্তাকে সে খাওয়াইতে পারে না? কিন্তু শান্তা খাইবে না। তাহাকে খাওয়াইবার লোক আছে, ছেলেমেয়ে দিয়া তার সংসার রচনা করিবার লোক আছে, সমাজের মধ্যে, মানুষের মধ্যে তার সম্মানের আসনটি রিজার্ভ রাখার লোক আছে। জীবনে তাহার যাহা জোটে নাই, তার মতো মূর্খ অপদার্থ কবি ভিন্ন জগতে যে জিনিস দিবার ক্ষমতা কারও নাই শান্তা শুধু সেইটুকুই তার নিকট হইতে গ্রহণ করিল এবং এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিল যে গ্রহণ করাটাই বিনিময়।

পরদিন বেলা একটার সময় আপিসে গিয়া বিমল বড়োবাবুর হাতে সাহেবেব চিঠি দিল। বড়োবাবু খাতির করিয়া বলিলেন—তুমি লোকটা তো ভাগ্যবান হে ! এ পোস্টে লোক নেওয়া হয়ে গিয়েছিল।

তার কী হল ?

একদিন কাজ করে পনেরো দিনের মাহিনা পেয়েছে।

কাজ শেখার ফাঁকে ফাঁকে লোকটির কথা না ভাবিয়া সে থাকিতে পারিল না। কার অনুগ্রহে তাহার চাকরিটি গেল জীবনে বোধ হয় সে তাহা কল্পনা করিতে পারিবে না। নগেনের এক মাইলের মধ্যে ও বোধ হয় কোনোদিন আসে নাই, সেই নগেনেরই প্রভাব ওর জীবনের শনিগ্রহের মতো কাজ করিয়াছে। জীবনের এক-একটা ব্যাপার কী জটিল !

পাঁচটার পর বাহিরে যাওয়ার পথে একটি যুবক বিমলের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। অতিরিক্ত নীল দেওয়া ধোপদুরস্ত কাপড়ের উপর সে বাড়িতে সাবান দিয়া কাচা একটা শার্ট চাপাইয়াছে। মুখে চোখে একটা সকাতর বিদ্রোহের ছাপ।

চাকরিটা তা হলে আপনিই পেলেন ?

পেলাম।

পেলেন ? কেন পেলেন ?

শুনবেন কেন পেলাম ? মুরুব্বির জোরে ?

আপনি কী পাস জানতে পারি কি ?

বি এ।

আমি এম এ পাস করেছি।

বিমল বলিল, সে তো বুঝলাম। কিন্তু এ পাস-ফেলের ব্যাপার নয়। যার যেমন কপাল।

আপনার চেয়ে আমার কপাল বেশি চওড়া। সাহেব বললে, সরি বাবু, আই হ্যাভ্ গট এ বেটার ম্যান ?

বিমল মাথা নাড়িয়া বলিল, জানি না।

যুবকটির চোখ ছলছল করিতে লাগিল। রাস্তার গাড়ি-ঘোড়ার দিকে চোখ রাখিয়া বলিল, কাল বাড়িতে পাঁচসিকের হরিলুট হয়ে গেছে। কত কাল পরে কাল বউ হাসিমুখে কথা বলেছিল। কাল দুবেলা ভাতের সঙ্গে কী পেয়েছি জানেন ? দুধ। আর বিকেলে লুচি জলখাবার। আচ্ছা নমস্কার !

লঘুপদে ধাপ কটি নামিয়া ফুটপাথ অতিক্রম করিয়া সে দ্রুতগামী বাসটির সামনে দাঁড়াইয়া পড়িল। বিমলের মনে হইল তার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে ভুলিয়া গিয়াছে। ছেলেটা শাস্তি দিল কাকে ?

ভিড় জমিবার আগে যতটুকু দেখা দরকার বিমল দেখিল। তারপর দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল। এ ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নাই, কোনো দায়িত্ব নাই। প্রত্যেক মাসে মাহিনা নেওয়ার সময় এর কথা সে স্মরণ করিবে না। কাল বাংলা কাগজে লিখিবে মোটর দুর্ঘটনা, ইংরাজি কাগজে লিখিবে Motor Accident , লোকে কাগজ পড়িয়া এ ব্যাপার সম্বন্ধে যতটুকু জানিবে, সে নিজে তার কিছুই জানে না।

রাত্রে বিমল শান্তভাবে ঘুমাইল। ওদিকে নিদ্রাতুরা শান্তাকে অধর যে কত রাত অবধি জাগাইয়া রাখিল সে তার কোনো সংবাদ পাইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যতখানি বেদনার সঙ্গে নারী মানুষকে পৃথিবীতে আনে, মানুষ বোধ হয় ঠিক ততখানি অনিচ্ছার সঙ্গে পৃথিবীতে আসে। পৃথিবী ছাড়িয়া যাওয়াটাকে মানুষ তাই এত ডরায়। অনিচ্ছায় পাওয়া পথিকবৃত্তি মৃত্যুভয়েই ধন্য হইয়া গিয়াছে। ছেলেটা বাস চাপা পড়িয়া মরিয়া তাই জানিয়া গেল ছোটো-ছোটো ব্যর্থতায় জীবনটা ভারাক্রান্ত হইলেও শক্তি তার কম নয়, প্রকৃতির সবচেয়ে প্রবল বন্ধনকে সে জয় করিয়াছে, না মরিবার লাখ লাখ সুযোগের একটা গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করে নাই।

কাল একটা লোককে বাস চাপা পড়তে দেখলাম মিলি।

কলকাতায় লোকে তো হরদম বাস চাপা পড়ছে।

বিমল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

তুই কাল কাঁদছিলি কেন রে ?

কাল রাত্রে? তুমি জানলে কী করে ? মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই।

অত মন খারাপ করিস না, বুঝলি ?

বিমল আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

শান্তার কী হয়েছে রে ?

কপাল ফিরেছে। অধর ওকে মাথায় তুলে নাচছে।

ঠিক ! কম্পিটিশন ! স্ত্রীর হারানো হৃদয়টিকে অধর জয় করিতে চায়।

বিমল খুশি হইয়া উঠিল। শান্তার হৃদয় তবে সত্যই হারাইয়াছে। হারাইয়াছে মানেই সে পাইয়াছে। নয় কী ?

একটা ভারী মজা হইয়াছে। আজকাল আপিসে তাহার কবিতা লেখার ঝোঁক আসে। যে দুপুরগুলি আড্ডা দিয়া ঘুমাইয়া সে কাটাইয়া দিত, এখন সেগুলি মোটা মোটা টাকার হিসাব লিখিয়া, চিঠিপত্রের নকল করিয়া কাটে। কষ্ট হয়, মন বসে না। হাতে কলম ধরিয়া সম্ভব অসম্ভব কল্পনা করা ভিন্ন আর কিছু করার উপায় থাকে না বলিয়া বাপমায়ের এক ছেলের মতো কল্পনা আশ্চর্য পায়।

অথচ একজন বাসচাপা-পড়া হতভাগার চেয়ারে বিনা অধিকারে বসিয়া, প্রমীলাকে রাতদুপুরে যে কাঁদায় তার অনুগ্রহে পাওয়া চাকরি করিতে করিতে কবিতা রচনার কথা ভাবাও উচিত নয়।

সন্ধ্যার পর কমার্শিয়াল স্কুলে টাইপরাইটিং শিখিতে যায়। স্কুলটা ভালো পাড়ায় নয়। কোনোদিন দু-একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। বন্ধু হাসিয়া বলে, কদিন থেকে হে ? বিমল ভাবে, একদিন যদি অধরকে সে এখানে আবিষ্কার করিতে পারে ? কী নিশ্চিন্তই সে হইতে পারে সেদিন ! স্বামীত্বের সবগুলি সুযোগ নিয়া সারাজীবন চেষ্টা করিলেও সে যে শান্তার হৃদয় জয় করিতে পারিবে না এ বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ রাখার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু বিমল জানে অধরকে এ রাস্তায় হাঁটিতে দেখিলেও নিশ্চিন্ত সে হইতে পারিবে না, জানিবে তার মতো সঙ্গত কারণেই অধর এ পথে পা দিয়াছে। লোকটার মধ্যে হীনতা আছে, সংকীর্ণতা আছে, নির্মমতা আছে, কিন্তু বাজারের মেয়ে দরকার হওয়ার মতো ছোটোলোকোমি নাই। মদকে অধর গ্রহণ করিবে, কিন্তু মদের সঙ্গে যে মেয়েমানুষ খাপ খায়, তাহাকে কামনা করিবে না।

এইখানেই বিমলের ভয়। এ সব মানুষ যা ধরে তার শেষ না দেখিয়া ছাড়ে না। শান্তাকে সে যখন জয় করিতে চাহিয়াছে, হয় জয় করিবে, না হয় পাগল করিয়া ছাড়িবে। শান্তাও টের পাইবে ইহাকে ভালোবাসা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। এমন যার প্রেমের অভিযান, তাহাকে শান্তা প্রতিহত করিতে পারিবে কী ? তার সবচেয়ে মুশকিল হইবে অধর নিজেকে সকল অবস্থাতে অবলীলাক্রমে বাঁচাইয়া রাখিবে। বিমলের জন্য ওর বুকে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে সে যদি খেপিয়া যায়, ওকে ভালো না বাসে সে হইবে শুধু তারই খেপিয়া যাওয়া, অধরের পরাজয় নয়। তাকে পাগলা গারদে পাঠাইয়া দিয়া অধর বিবাহ করিবে এবং কী এক আশ্চর্য কৌশলে তার জন্য সঞ্চিত ভালোবাসার সবটুকু নতুন বউকে দান করিবে। বিবাহ যদি সে নাও করে, প্রিয়াকে পাগল করিয়া পাগলা গারদে পাঠানোর অকথ্য দুঃখটা মদ খাওয়ার মতো উপভোগ করিবে—ও যেরকম মানুষ আত্মপ্রবঞ্চনাকে ও মৃত্যুর দিন পর্যন্ত টানিয়া চলিতে পারে। মানসিক বিপর্যয়ের লোভে যে ছড়ি দিয়া অন্ধ ভিখারির সর্বাঙ্গে দাগ কাটিয়া মুঠা ভরিয়া রূপা দেয় তাকে যে ভাঙা যায় না, শান্তা তাহা জানে। বিমলকে না ভুলিবার ও নিজের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব করিয়া তোলার মূল্য হিসাবে অধরকে সে যদি ভাঙিতে পর্যন্ত না পারে, কেন সে বিমলকে ভুলিয়া বাঁচিবে না ?

বাঁচিবার জন্য মানুষ ভালোবাসে। বাঁচিবার জন্য ভুলিতে পারে না।

মঙ্গলবার রাত্রে অনুরূপার একটি ছেলে হইয়াছে। মানুষের পৃথিবীতে আসার হাঙ্গামা বড়ো কম নয়। এই বৈচিত্র্যটুকুর জন্য প্রমীলা আর বিমল দুজনেই আগন্তুকটির প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করিয়াছে।

ওকে আমি মানুষ করব দাদা।

কাঁরস !

ওর নাম রাখব অমল।

রাখিস।

এইটুকু পুঁচকে হয়েছে ও আবার মানুষ হবে !

বলিতে বলিতে প্রমীলার মাথা খারাপ হইয়া যায়। যে আবহাওয়া এ বাড়ির, ছেলেমেয়ের সহজে সাধারণ মানুষ হওয়া কঠিন। ওর মধ্যে আবার কীসেব ছিট দেখা দিবে কে জানে ! দাদার মতো বয়স হওয়ার আগেই হয়তো ও নিজেব জীবনটা জট পাকাইয়া ফেলিবে।

একদিন সকালের ডাকে প্রমীলার নামে একখানা খামের চিঠি আসিল এবং চিঠিখানা পড়িয়াই প্রমীলা বিবর্ণমুখে সেটি শেমিজের ভিতব চালান করিয়া দিল। বিমল ভূমিকাস্বরূপ জিজ্ঞাসা করিল, আমার চিঠি নেই ?

না।

ওটা কার চিঠি ?

আমার।

কে লিখেছে ?

প্রমীলা চুপ কবিযা বহিল।

বিমল রুক্ষস্বরে বলিল, কাব চিঠি ? বল মিলি, ভালো চাস তো। খামের চিঠি না খুলে তোকে দেওয়া হয় এই তোর ভাগ্য বলে জানিস। গোপন কবিস কোন লজ্জায় ?

এ চিঠি তোমাকে দেখাতে পাবব না।

কার চিঠি বল।

প্রমীলা তবু চুপ কবিযা বহিল।

না বললে লাভ নেই মিলি। কেড়ে নেব। আমার একটা দায়িত্ব আছে।

ছেলেবেলা একটা সিকি কাড়িয়া নেওয়াব সময় প্রমীলার চোখে আর ঠোঁটে যে শব্দহীন কান্না দেখা দিয়াছিল, আজও তারই আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু আজ কাড়িযা নিতে হইল না প্রমীলা নিজেই খামটা তাহাব হাতে তুলিয়া দিল। ভিতরে মোটা সাদা নোট পেপাবের ভাঁজে একখানা একশো টাকার নোট।

চিঠি কী হল ?

চিঠি ছিল না।

বিমল মুখ কালো কবিয়া বলিল, নগেনদা পাঠিয়েছে ?

প্রমীলা মৃদুস্ববে বলিল, জানি না।

লখনৌ-এর ছাপ বয়েছে। নগেনদা ছাড়া আর কে লখনৌ থেকে টাকা পাঠাবে ? তোকে আমার চাবকাতে ইচ্ছা করছে মিলি। এটা নিয়ে আমি এখন কী করি !

প্রমীলা তাহার এ সমস্যা সমাধানে কোনো সাহায্য কবিল না। একফাঁকে চোখ দুটি মুছিয়া ফেলিয়া তরকারি কুটিতে বসিল। নোটটি হাতে নিয়া বিমল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার কাজ দেখিতে লাগিল।

নগেনদার কাছে তুই টাকা চেয়েছিলি ?

প্রমীলা মাথা নাড়িল।

তবু শুধু শুধু সে টাকা পাঠাল কেন ? ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে এ তার কী রকম ইয়ার্কি ? টাকা পাঠাবার সাহসই বা তাব হল কী করে ?

প্রমীলা অস্ফুট স্বরে বলিল, হয়তো লাবণ্য পাঠিয়েছে।

লাবণ্য ? লাবণ্য তোকে টাকা পাঠাতে যাবে কেন ? ওর টাকা বেশি হয়েছে নাকি ?

তা আমি জানি না।

তুই সব জানিস !

নোটটা বিমল গায়ে ছুঁড়িয়া দিল। উপরে যাওয়ার আগে বলিয়া গেল—তোর টাকা, তোর অপমান নিয়ে যা খুশি তুই করবি যা। আমি কিছু জানি না।

সারাদিন বিমলের মনটা খচখচ করিতে লাগিল ! বোনের নামে একশো টাকার নোট আসার মধ্যে শুধু অকথ্য অপমান ও লজ্জা নয়, ভয় পাওয়ারও কারণ আছে বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। এ সব খাপছাড়া ব্যাপারের ফলাফল ভালো হয় না। নগেন পাঠাক আর লাবণ্যই পাঠাক, ও টাকাব মধ্যে প্রমীলার অমঙ্গলের ইঙ্গিত আছে।

বিকালে আপিস হইতে ফিরিয়া সে আর একটা দুঃসংবাদ পাইল। ঠিকা ঝি বাসন মাজিতে আসিয়া খবর দিয়াছে, শান্তারা চলিল। কোথায় চলিল, সে খবর সে পায় নাই, কিন্তু ওবা যে চলিল এ খবর ঠিক।

কীরে মিলি, এ কী ব্যাপাব ?

ব্যাপার তো শুনলে।

ওরা চলেছে কোথায় ?

তা জানি না। হয়তো অন্য বাড়িতে যাবে।

কিন্তু এটা তো অধরের নিজের বাড়ি ?

ভাড়া দেবে। নিজেরা ভালো বাড়িতে থাকবে।

সেটা অসম্ভব নয়। কিন্তু শান্তা যদি ভালো বাড়িতে থাকিতে না চায়, অধর তাহাকে গায়ের জোরে নিয়া যাইবে কোন হিসাবে ?

ব্যবস্থাটা তা হলে করছে অধর ?

আমি তা কী করে বলব ? হয়তো শান্তাও থাকতে চায় না।

এটাও অসম্ভব নয়। অবস্থা বুঝিয়া শান্তাই হয়তো নিজেই এ ব্যবস্থা করিয়াছে। বিমলকে যদি ভুলিতেই হয় দূরে গিয়া সে কাজটা করা সহজ।

কিন্তু কী স্বার্থপর ও মেয়েটা ! কী হীন সুবিধাবাদী ও !

সুবিধামতো ভাসা-ভাসা একটু খেলা করিয়া বিপদের সম্ভাবনাতেই ও পালাইয়া বাঁচিতে চায়। এমনিভাবে মজা করার চেয়ে সর্বনাশও মানুষের বেশি সম্মানজনক কাম্য নয় !

স্কুলে গিয়া টাইপরাইটারের চাবি টিপিতে টিপিতে বিমলের মাথা গরম হইয়া উঠিল। যে কথাটা ভাবিবার ক্ষমতা এতক্ষণ তাহার ছিল না, অনায়াসে সে এখন তাহা ভাবিতে আরম্ভ করিয়া দিল। ভাবিল, ভুলিবার জন্য শান্তা পালাইতে চায় এ কথা তাকে কে বলিয়াছে ? এত যে হিসাবি সে ভুলিবে কী ? ভুলিবার তার কী আছে ? মনে তার দাগ পড়িল কবে যে, দাগ তুলিবার দরকার হইবে ? ও সব বাজে কথা, কল্পনা। সে বিরক্ত করিবে এই ভয়ে শান্তা চলিয়া যাইতেছে। ইদানীং যে একটু বাড়াবাড়ি হইতেছিল সে পাছে তার সুযোগ গ্রহণ করে শান্তার এই আশঙ্কা হইয়াছে।

আর এই শান্তাকে এতদিন সে দেবীর মতো পূজা করিয়াছে, বাঁচাইয়া চলিয়াছে। সেদিন শান্তা যখন ঘরে আসিয়াছিল দরজায় খিল তুলিয়া দিলে সে কী করিত ? যার দেবীত্ব মিথ্যা, তাকে নারীর আসনে টানিয়া নামাইয়া আনিলে প্রতিবাদের তার কী থাকিত ?

অথচ শান্তার হাতটি ধরিতে তার ভয় হইয়াছে, পাছে অপমান করা হয়, পাছে প্রকাশ্য রূঢ়তায় নেপথ্যের স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়।

স্কুল ভালো লাগিল না। বিমল বাহির হইয়া আসিল। গলির দুধারে যে মেয়েগুলি সন্ধ্যা হইতে দাঁড়াইয়া আছে তাদের সম্বন্ধে বিমলের কোনোদিন কিছুমাত্র কৌতূহল ছিল না। আজ চলিতে চলিতে দু-একটি মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তার মনে হইল, বাস্তবতা সম্বন্ধে এতদিন তার কোনো

ধারণা ছিল না। সে জানিত, তাদের বাড়ির সেই যুবতি ঝি, মোড়ের দোকানের পানওয়ালি, বাজারেব মেছুনি আর গলির দুদিকের অন্ধকারে কোটরবাসিনী সেই হতভাগিনী এদের জীবনেব বাস্তবতাই নিষ্কলুষ—তাতে খাদ নাই। শান্তার মতো জীবন যাদের নিভৃত, সংযত ও নিরাপদ, জীবনে যাদের অবসর আছে, চিন্তা আছে, কল্পনা আছে, ভালোবাসা দেওয়া-নেওয়ার সুযোগ আছে, তাদের বাস্তবতা অন্যরকম। মাটি হইতে তারা শুধু প্রাণপণে রস টানে না, বর্ণ নেয়, গন্ধ নেয়, কোমলতা নেয় এবং সেই বর্ণ, গন্ধ ও কোমলতা ফাঁকি নয়।

কিন্তু আজ সে ধারণা বদলাইবার দিন আসিয়াছে। শান্তার ফাঁকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। অবাস্তবতার মোহে ঠকিয়া গিয়াছে। কবিতা দিয়া স্তব করিয়াছে মাটির প্রতিমাকে, সংযম দিয়া মর্যাদা রাখিয়াছে ছলনার।

একটা সাংঘাতিক বকমের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বিমলের অসাধাবণ তীব্র ইচ্ছা হইতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল ভিতরে যে একটা ভয়ানক জ্বালা আবম্ভ হইয়াছে শান্তাকে না ভাঙিলে সে জ্বালা কিছুতে কমিবে না।

শান্তার সঙ্গে এতদিন সে যে অবাস্তব ভদ্রতা করিয়া আসিয়াছে এখন তেমনই একটা উগ্র অভদ্রতা করিয়া ফেলা চাই। নইলে জীবনে সে শান্তি পাইবে না।

এবং শান্তাব এমনই কপাল যে আজই তাহাকে বিমলের ঘরে আসিতে হইল। পরশু তাহাদের যাওয়াব ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত অধর তাহাকে নিজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, চব্বিশ ঘণ্টা তার সতর্ক প্রহরায় একবারও শৈথিল্য দেখা যায় নাই। এ বাড়ি ছাড়িয়া এ পাড়া ছাড়িয়া জন্মের মতো চলিয়া যাওয়ার আগে যাওয়ার কথাটা নিজের মুখে বিমলকে সে যে জানাইতে পারিবে এ আশা শান্তাব ছিল না। সন্ধ্যার পব অধর আজ সহসা নিজেকে গুটাইয়া নিয়াছে। তাব কোথায় নিমন্ত্রণ আছে, ফিরিতে তার অনেক রাত্রি হইবে।

অপ্রত্যাশিত সুযোগটা শান্তাকে যেন বিমলের ঘরের দিকে ঠেলিয়া দিল।

ও বাড়ি গিয়া নীচে প্রমীলার সঙ্গে সে কয়েক মিনিট কথা বলিল। কিন্তু আলাপ তাহাদেব জমিল না। প্রমীলা ভারী ব্যস্ত।

শান্তা বলিল, আচ্ছা তুমি কাজ কর, আমি ততক্ষণ তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করে আসি ভাই। কবিতার কত নিন্দা করেছি !

প্রমীলা তাহাকে সাবধান কবিয়া বলিল. যাও, কিন্তু সাবধানে কথা বোলো। ভীষণ রেগে আছে।

কার ওপরে ?

কী জানি ! তোমার ওপরেও হতে পারে !

আমার ওপরে রাগতে যাবেন কেন? বলিয়া হাসিয়া শান্তা উপরে গেল।

বিমল কেমন করিয়া টের পাইয়াছিল, বলিল, ভেতরে আসুন। এবং শান্তা ঘরে ঢোকা মাত্র সে দরজায় খিল তুলিয়া দিল। বিছানাটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, ওখানে বসুন।

শান্তা নির্ভয়ে বসিল। হাসিয়া বলিল, মারবেন নাকি ? জানেন, আমরা চললাম আপনাদেব পাড়া ছেড়ে।

বিমল জানালার কাছে সরিয়া যাইতে যাইতে বলিল, সেই রকমই শুনছি। কিন্তু পালাবার দরকার ছিল না। আপনি অনায়াসে এখানে থাকতে পারতেন,—আমি আপনার ছায়াও মাড়াতাম না।

শান্তা বারণ করিয়া বলিল, জানালাটা বন্ধ করবেন না।

বিমল ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আদেশটা যদি না মানি ?

আদেশ দিইনি। জানালা বন্ধ করলে আমাকে এখুনি চলে যেতে হবে। ঝিকে বলে এসেছি, উনি ফেরামাত্র এই জানালা দিয়ে সে আমাকে ডাকবে। কিছু না বুঝে মাথা গরম করেন কেন ?

স্বামীর সঙ্গে জুয়াচুরির ব্যবস্থা করেছেন ? বেশ বেশ।

বিমল ফিরিয়া আসিল এবং উদ্ধতভাবে শান্তার পাশে বসিয়া পড়িল। দরজায় খিল পড়া অবধি শান্তার বুকের মধ্যে কাঁপিতেছিল, কিন্তু বিমল যে রকম খেপিয়া গিয়াছে, ও সব তুচ্ছ বুক-কাঁপাকে সে গ্রাহ্য করিবে না, কারণ সেটা এক ধবনেব অপমান। বিমলেব এই উত্তেজিত অবস্থাকে সে ভয় করিতেছে জানিলে ও আরও রাগিবে, আরও উত্তেজিত হইবে, আরও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিবে। সে যদি আজ বাঁচিতে চায়, এ পাগলকে বাধা দিয়া বাঁচিতে পারিবে না। সর্বনাশ যদি বিমল আজ তাহাকে দেয়, বিমলের দান বলিয়াই সে আজ মাথা পাতিয়া নিবে, এমনই একটা ভাব সে যদি আগাগোড়া বজায় রাখিয়া চলিতে পারে, ওর শান্ত হইতে সময় লাগিবে না।

ওর মনের শিশু দুষ্টবৃত্তিকে শান্তা চেনে।

সংকুচিত হওয়ার পরিবর্তে শান্তা তাই বিমলের একটি হাত দুই হাতে মুঠ করিয়া ধরিল, যেন, সে এখন নিরুপায় বটে, কিন্তু নির্ভরতাব তার সীমা নাই। হাসিয়া বলিল, জুয়াচুবি নয়, ছলনা বলতে পারেন। বন্ধুর জন্য এটুকু করতে হয়, তাতে দোষ নেই। ওকি কিছু বুঝবে ? ছাই বুঝবে। যা তা ভাববে। কিন্তু ও অন্যায় করে একটা কথা ভাববে বলেই বন্ধুব কাছে না এসে তো আমি থাকতে পারি না ? তাই একটু ছলনা করে দুদিক বজায় রাখলাম। কী জানেন, এখানে সত্যিকাবের—আন্তরিকতায় তার মুখের হাসি মুছিয়া গেল, কী জানেন, মানুষ মানুষকে বোঝে না বলেই তো বেঁচে থাকা এত কষ্টকর। আপনি আমাকে যেমন বোঝেন, আমি আপনাকে যেমন বুঝি, সকলের সঙ্গেই যদি সে রকম একটা সম্পর্ক থাকত তবে আব ভাবনা কী ছিল !

রীতিমতো বক্তৃতা। কিন্তু শুধু বিমলের নয়, নিজের উন্মাদনাকেও সে জয় করিতেছিল। কথাগুলি বলিবার ভঙ্গিতে তাই আরও অনেক কিছু প্রকাশ হইয়া গেল। আজই শান্তাকে দেহেমনে নিজের করিয়া নেওয়ার যে প্রতিজ্ঞা একটু আগে বিমলের মনে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মতো কঠোব হইয়া উঠিয়াছিল তার আর তেমন জোর রহিল না।

কিন্তু ওই প্রতিজ্ঞাটি ছাড়াও অনেক প্রতিজ্ঞা বিমলের মনে ছিল। তীব্র চাপা গলায় সে বলিল, বন্ধুটন্ধু নই। আমি আপনাকে ভালোবাসি। লজ্জা শান্তা জয় করিতে পারিল না। তার কথা দীর্ঘনিশ্বাসের মতো মৃদু হইয়া গেল।

আমি বাসি না ?

একটু বলিতে হয়। কাবণ ভালোবাসাটা শুধু একপক্ষের এটা প্রমাণিত হইয়া গেলে অপর পক্ষেব স্বার্থপরতা ও ঠকানোর কথাটা আপনি আসিয়া পড়ে। এবং সে বড়ো হীনতার কথা।

সুতবাং খুবই সংক্ষেপে দুজন প্রায় সমবয়সি নরনারী, যাদেব একজন সংসার সম্বন্ধে এত অনভিজ্ঞ যে একেবারে বেহিসাবির মতো ভালোবাসিতে পারে এবং অন্যজন নারীজীবনে চাওয়া-পাওয়া সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই এত বেশি মাথা ঘামাইয়াছে যে নিজেকে এবং নিজের ভালোবাসাকে সর্বদা সংযত রাখার চেষ্টা করে, ইহারা, এই দুজন, পরস্পরের ভালোবাসাকে স্বীকার করিল। প্রেম এমনইভাবে স্বীকৃত হয়। একদিন—অকস্মাৎ—সংক্ষেপে।

একটি নিবিড় আলিঙ্গন, গোটাকয়েক পাগলাটে চুম্বন, এক মিনিটের তীব্র, তীক্ষ্ণ ও বিশ্বাস্য সেন্টিমেন্টালিটি, ইহার উপর দিয়াই শান্তার ফাঁড়াটা কাটিয়া গেল।

একটু সরিয়া শান্তা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। একটু একটু করিয়া সমস্তই তার মনে পড়িতেছে—স্বামীর কথা, অনিবার্য ভবিষ্যৎ সংসারটির কথা, আজ রাত্রির কথা মনে করিয়া নিশ্চিত আনন্দ ও সুনিশ্চিত যন্ত্রণার কথা, তার সিঁথির সিঁদুর বিমলের কপালে লাগা কেমন করিয়া সম্ভব

হইল নিজের জীবনের এই দুর্ভেদ্য রহস্যের কথা। বিমলকে সে বলিয়াছে ভালোবাসি; বিমলের চুম্বনকে সে ব্যাকুল আগ্রহে গ্রহণ করিয়াছে, তবু যেন এ ব্যাপারকে সে বুঝিতে পারিতেছে না। মনে হইতেছে, ভালোবাসারও একটা অতিরিক্ত নেশার ঝোঁকে সে এই বিপজ্জনক খেলা শুরু হইতে খেলিব না, খেলিব না বলিতে বলিতে এতদূর পর্যন্ত খেলিয়া আসিয়াছে। স্বামী থাকিতে আর একজনকে পৃথিবীতে সে এই প্রথম ভালোবাসিল না, সংসারে এমন হয়, কিন্তু সে যেন আলাদা ধরনের। পরপুরুষকে যে ভালোবাসে, সে সমস্ত জানিয়া-বুঝিয়াই ভালোবাসে, তার পিপাসায় রহস্য থাকে না, তার আত্মসমর্পণ অকারণ হয় না, তাকে যে জয় করা হইয়াছে এটুকু অন্তত সে বোঝে। কিন্তু বিমল তাকে জয় করে নাই, সে বিমলের অধিকারে আসিয়াছে। কেন আসিয়াছে ?

সে বিমলকে ভালোবাসে নাই, তবু বিমলের জন্য তার ভালোবাসা সত্য হইয়া উঠিয়াছে। এ ঘরে আসিবারও কামনা তাহার ছিল না তবু এ ঘর ছাড়িয়া যাইতে তার ইচ্ছা হইতেছে না, এই বিছানায় শুইয়া দুটি শ্রান্ত চোখ বুজিবার সাধ হইতেছে। বিমলের বুকের কাছে গুটিসুটি হইয়া সারারাত সে স্বপ্ন দেখিতে চায়।

শান্তা চোখ তুলিয়া নিজের অন্ধকার ঘরের দিকে চাহিল। বাহির হইতে ওই ঘরের দিকে চাহিলে তার ভয় করে কেন? ঘরের ভিতরে তো করে না !

বিমল তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিবে না। বলিতে লাগিল, আপনি বুঝতে পারছেন না। এ ছাড়া আর উপায় নেই। আপনি স্বীকার করে যান।

শান্তা বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়িল। বলিল, সে হয় না।

বিমল উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

কেন হবে না ? কাল আমি বাড়ি ঠিক করে আসব, আপনি খুব ভোরে সদর দরজাটি খুলে বেরিয়ে আসবেন। এতে কঠিন কী আছে ?

দরজা খুলে বেরিয়ে আসার কথা নয়। ও সব হয় না।

হয়। এমন সহজ উপায় থাকতে আমরা কষ্ট করব কেন ? এমন নয় যে আমি আপনাকে খেতে দিতে পারব না ! না হয় একটু টানাটানির মধ্যে দিন যাবে।

আমাকে খেতে দিতে পারলেও হয় না।

বিমল তবু ছাড়িল না, শান্তার গৃহত্যাগের সপক্ষে যত যুক্তি, যত আবেদন মাথায় আসিল একধার হইতে বলিয়া গেল। জীবনের নিশ্চিত দুঃখটাকে না ঠেকাইলে চলিবে না। যুক্তি ফুরাইয়া গেলে শিশুর মতো বিমল আবদার আরম্ভ করিল।

তখন শান্তা কাঁদিয়া ফেলিল। শব্দ করিয়া নয়, তার চোখে জল আসিল।

চোখ মুছিয়া বলিল, আপনি কিছু বোঝেন না। ও মোকদ্দমা করবে।

করুক।

কিন্তু এ ঔদ্ধত্যের যে কোনো মানে হয় না বুঝিতে বিমলের সময় লাগিল না। সে খিল খুলিয়া দিল। বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। জীবনে শান্তার সঙ্গে আর দেখা হইবে, এ সত্যের অন্যথা নাই।

ইহার পর আর টানাটানি করিতে গেলে সেটা নিছক নাটকে দাঁড়াইবে।

তবু বিমল বলিতে ছাড়িল না—এর শোধ নেব।

নীচে নামিতে নামিতে প্রমীলা বলিল, কবিতা শোনা হল ?

হল।

সব ?

জীবনে যত কবিতা আছে সব।

তবে আর কী বাড়ি গিয়ে গলায় দড়ি দাও। মানুষের জীবন নিয়ে খেলা ? ছি ছি ! ও তো রাক্ষসীর কাজ।

অধর বলিল, ছাদে চলো। ঘর থেকে সব দেখেছি। তোমরা আলোতে ছিলে, আমি অন্ধকারে ছিলাম; কিন্তু দেখতে সুবিধা হয়েছে আমার। উঃ, এমন করে মানুষ ঠকে ! মানুষের বুকের পাঁজর এমনই করে হৃৎপিণ্ডে বিঁধে যায় ! স্ত্রীর হাত ধরিয়া অধর ছাদে উঠিয়া গেল।

দুধকলা দিয়ে সাপ পোষার কথা শুনে হাসি পেত। ভাবতাম, মানুষ অত বোকা হয়, পণ্ডিতের এটা বাড়ানো কথা। বুকের ভালোবাসা দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা পয়সার সুখসুবিধা দিয়ে মানুষ যে সাপের চেয়ে ভয়ানক প্রাণীকে পোষে এ কথা কল্পনা করতে পারতাম না। কিন্তু সেটা আমারই কল্পনার লজ্জা। পৃথিবীতে বোকা আছে, আমার মতো বোকা পৃথিবীতে আছে শান্তা। আমিই তার প্রমাণ।

শান্তা একপাশে আলিসায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অধর অস্থিরভাবে, মর্মাহতভাবে তার সামনে ছটফট করিয়া হাঁটিতে লাগিল। সে যেন খেপিয়া গিয়াছে, কিন্তু সাধাবণ অবস্থায় ফিরিয়া আসার জন্যই তাব যেন সবটুকু খ্যাপামি।

তুমি ওদের বাড়ি থেকে ফিরে আসতে, আমি তোমায় আদর কবতাম। তোমাব ঠোঁটে হয়তো বিমলের লালা লেগে থাকত, আমি চুমু দিয়ে তাই মুছে নিতাম—ভাবতাম অমৃত। বিমলের গায়ের তাপ নিয়ে তুমি আসতে আমি ভাবতাম সে তোমার স্বাস্থ্য। কেন তুমি সেইদিন আমাকে জানতে দিলে না যেদিন প্রথম নর্দমা ঘেঁটে এলে ? কেন তোমাকে ছুঁতে দিলে ? জানা মাত্র আমি তোমায় ছুটি দিতাম শান্তা। এই ঘববাড়ি, তোমাদের ছেড়ে দিয়ে আমি মেসে গিয়ে থাকতাম। নরকে যদি নামলে তো উঠে এলে কেন ?

সত্যমিথ্যায় জড়ানো এবং আন্তরিকতা ও অভিনয় মেশানো কথাগুলি বিষাক্ত মদের মতো শান্তার শিরায় শিরায় জ্বালা ধরাইয়া দিতে লাগিল। তবু এই অবস্থার, অধরের এমন কবিয়া কথা বলাব কী যেন একটা মোহকরী উপভোগ্য আকর্ষণ আছে। মনে হয় জীবনের একটা অদ্ভুত রহস্য এই বিপুল সমারোহেব সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে। এ শুধু ভূমিকা। শান্তা নীববে শুনিতে লাগিল।

অথচ আমি তোমায় ভালোবাসি। বাসি না শান্তা ?

শান্তা মিথ্যা বলিবে কেন ? সে স্বীকাব করিয়া বলিল, বাস।

তবে ?

তবে কী ? এমন একটা বাহুল্য প্রশ্ন যে অবস্থাবিশেষে উচ্চারণভেদে এত ভয়ানক শোনায় শান্তা তাহা কল্পনা করিতে পারিত না। সে একবার শিহরিয়া উঠিল।

অধর পায়চারি বন্ধ করিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল। বলিতে লাগিল, তুমি তো অনায়াসে মরতে পারতে ! এত বড়ো পাপ করার চেয়ে মরাটা কি কঠিন শান্তা ? তোমাকে আমি ভালোবাসি, আমাকে তুমি ধ্বংস করে দিলে। আমার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এমন পাপ করলে যার বাড়া পাপ মেয়েমানুষের নেই—কোনো মানুষের নেই। এ কাজ করার আগে মরে তো তুমি নিজেকে বাঁচাতে পারতে। মরা কত সহজ। দু মিনিট নিশ্বাস না নিলে—ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়লে মানুষ মরে যায়। তুমি মরলে না কেন ? চোখ বুজে ছাদ থেকে তুমি উঠোনে ঝাঁপিয়ে পড়লে না কেন ? কীসে তোমার বাধল ? বিমলের বুক থেকে নেমে এসে আমার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলার আগে এক মিনিটের জন্য ছাদে এসে তুমি নীচে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতে না কী ? কীসে তোমায় আটকে রাখল ? আমি হলে মরতাম শান্তা, অসতী হওয়ার জন্য নয়, একজন নির্দোষ মানুষকে ঠকানোর জন্য আমি মরতাম। কত লোক মদ খায়, স্ত্রীকে মারে, এক মুহূর্তের জন্যও তাকে বিশ্বাস করে না, তারাও তো এমন করে

ঠকে না শান্তা ! জগতে কি বিমলের অভাব আছে? কিন্তু স্বামীর লাথি খেয়ে, অবিশ্বাসের অপমান সয়ে তারা বিমলকে ঠেকিয়ে রাখে। না পারলে মরে। তুমি ? তুমি স্বামীর স্নেহ পেয়েছ, সম্মান পেয়েছ, তোমার অবস্থায় জীবন কাটাতে পেলে পৃথিবীর অর্ধেক মেয়ে বর্তে যায়। আব তুমি দিনের পর দিন স্বামী থাকার সুযোগটি এমনিভাবে ব্যবহার করলে ?

অধর থামিল। তবে একেবারে থামিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল কিন্তু এখন থামিয়া গেলে যে দুর্বলতাব প্রশ্রয় দেওযা ছাড়া আর কোনো লাভই হইবে না, এ জ্ঞান অধরেব আছে। শান্তাকে আর বাঁচিতে দেওয়া যায় না, সে অবস্থা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। ওকে এখন জীবন দান করিলে জীবনব্যাপী শাস্তিই দেওয়া হইবে।

এ যে মানুষ পাবে আমি তা ভাবতেও পাবতাম না শান্তা। অভিনয় টের পাওয়া যায়। কিন্তু আমায় তুমি দিনেব পব দিন ভুলিয়ে রেখেছ। তোমাব কথা-হাসি-ব্যবহাবে এতটুকু তারতম্য আমার চোখে পড়তে দাওনি, আমাকে অন্ধ করে রেখেছ। বিমলের ঘর থেকে সোজা আমার বুকে উঠে আসতে তোমাব এতটুকু ভাবান্তরও হয়নি, ভালোবাসার চোখ দিয়ে আমি যা ধরতে পারি। তুমি অসাধারণ শান্তা, পৃথিবীতে তোমাব তুলনা নেই।

শান্তা নীরবে শুনিতে লাগিল। একান্ত বিহ্বলতার মধ্যেও নিজেকে আবিষ্কাব করিতেছে। অধরেব চারিদিকে যে কুয়াশা ছিল, সেটাও কাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু বিমলকেও শান্তার মনে আছে। ওর শেষ মুহূর্তের সকবুণ ব্যাকুলতাটুকু। কল্পনাতীত মিথ্যার উপব দাঁড়াইযা ওটুকু সে সৃষ্টি কবিযাছে এবং ওটুকু সত্য।

লণ্ঠনেব যে গাঢ আলোয শান্তা বিমলের চোখেব উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখিযাছিল, কে যেন তেমনই আলো আনিয়া চোখে ঝাপটা মারিতেছে। তবু চোখে অন্ধকার দেখার বিবাম নাই। শান্তা চোখ বুজিল।

আমাকে একটা সত্যকথা বলবে শান্তা ?

কী ?

একদিন এক মুহূর্তের জন্যও তোমার অনুতাপ কী এমন তীব্র হযে উঠতে পারেনি যে, ছাদে এসে উঠোনে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পার ?

তুমি কি চাও আমি উঠোনে ঝাঁপিযে পড়ি ?

তোমার কাছে আমি আব কিছুই চাই না শান্তা।

মাথা নিচু করিয়া অধর ধীরে ধীরে সিঁড়িব মুখেব কাছে আগাইযা গেল। সেইখানে একটু দাঁড়াইল। তারপব অন্ধকাব সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে আবম্ভ করি।।

নীচে নামিয়া ঝিকে সদর দরজা বন্ধ কবিতে বলিয়া ও যতক্ষণ না বাড়িব বাহিব হইয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তার অপেক্ষা করিতে হইবে। ওকে জড়াইযা লাভ নাই। লোকে যখন সন্দিগ্ধচিত্তে প্রশ্ন করিবে, ঝি যেন তখন বলিতে পারে, কই না? বাবু তখন সবে বাইরে গেছেন—আমি দরজা দিলাম, আমি জানিনে ?

অধর সম্বন্ধে শান্তা বিস্ময়কর জ্ঞানলাভ করিয়াছে। বিমলের চেয়েও উগ্রভাবে, অন্ধভাবে ও তাকে ভালোবাসে। বিমলের মাথা খারাপ হয় নাই, কিন্তু অধর পাগল হইয়া গিয়াছে। এতদিন একসঙ্গে থাকিয়াও এই সর্বনাশা ভালোবাসার খ:' সে পায় নাই। কিন্তু সেটা বিশেষ আশ্চর্যেব কথা বলিয়া শান্তার মনে হইল না। সে সাধারণ মেয়ে, এ রকম সাংঘাতিক প্রেমেব খবর রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যাহা তাহার বুদ্ধি ও অনুভূতির সীমার বাইরে, তাহাকে সে আয়ত্ত করিতে পারিবে কেন? আজিকার মতো অস্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া না পড়িলে ও জিনিসকে সে কোনোদিন বুঝিতে পারিত না। গুমোটের মধ্যে কালবৈশাখীকে আবিষ্কার করার দৃষ্টি তাহার ছিল না, ঝড় না ওঠা পর্যন্ত গুমোটের মানে সে বুঝিতে পারিত না।

অধর আজ যে ব্যবস্থা করিয়া গেল, সে জন্য তাকে শান্তা দোষ দেয় না। ওর কাছে সে পুতুল হইয়াছিল বইকী। পুতুল নিয়া অমন উন্মত্ত প্রেমিকের চলে না। অথচ ফেলিয়া দেওয়ারও উপায় নাই। তাকে অধর ত্যাগ করিতে পারিত না, মামার কাছে পাঠাইয়া দিলে চলিত না। যে পুতুল সাড়া দেয় না, তাকে নিজের হাতে ভাঙিয়া ফেলা ছাড়া অধরের আর কী উপায় ছিল ?

উঠানটা অল্প অল্প আলোকিত, ঝিকে ডাকিয়া অধর উঠানে একটু দাঁড়াইল, কিন্তু উপরের দিকে চাহিল না। ঝি আসিলে সে বাহিরের দিকে পা বাড়াইল, তখনও একবার ছাদের দিকে চাহিয়া দেখিল না। দরজা বন্ধ করিয়া ঝি ফিরিয়া আসিল।

মাথায় অতিরিক্ত রক্ত উঠিয়া গেলে চোখের সামনে আগুনের ফুলকি ছুটিয়া থাকে, ভালো করিয়া কিছু দেখা যায় না। তবু শান্তা একবার চারিদিকটা দেখিবার চেষ্টা করিল। এবং তারপর কল্পনায় বিমলের বুকে নিজেকে সঁপিয়া দেওযার মতো আলিসার ওদিকে নিজেকে সে শান্তভাবে সঁপিয়া দিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিমল খবব পাইল পরদিন বিকালে আপিস হইতে ফিরিয়া জলযোগের পব। খবব দিল প্রমীলা। একটু খাপছাড়া ভাবে।

তোমার সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার পর শান্তা একটা বিশ্রী কীর্তি করেছে দাদা. ছাদে উঠে উঠোনে লাফিয়ে পড়েছে।

বিমল বুদ্ধশ্বাসে বলিল, কখন ?

প্রমীলার জবাবটা মারাত্মক। শান্তা যে ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে, খবর যেন শুধু এই কারণেই অসাধারণ যে, ও কাজটা সে বিমলের ঘর হইতে বাহির হওয়ার পরেই কবিযাছে। অন্য সময শান্তা এ কীর্তি কবিলে প্রমীলার কিছু আসিয়া যাইত না।

এত বড়ো বোনকে আঘাত করিবার ইচ্ছা চাপিয়া বিমল বলিল, কী হয়েছে ? মবে গেছে ?

না, এখনও মরেনি। বোধ হয় মববে। মাথা ফেটে গেছে, বাঁ হাতটা দু জাযগায় ভেঙেছে. কোমর মচকে গেছে—আরও যেন কী'কী হয়েছে শুনলাম।

শুনলি ? তুই দেখতে যাসনি ?

না।

কেন ?

কী হবে দেখতে গিয়ে? আমি কিছু করতে পারব? কাল যে ভালো মানুষটার সঙ্গে কথা বলেছি তার ভাঙাচোরা শরীরটা দেখবাব কৌতূহল আমার নেই দাদা। আমি পুরুষ নই. আমার—

প্রমীলা কাঁদিতে গিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া রহিল।

বিমল তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। শান্তা জর্দা দেওয়া পান খায়, খানিক আগেও বিমলের ঠোঁটে যে জর্দার স্বাদ ও গন্ধ লাগিয়াছিল। শুষ্ক ঠোঁটে জিভ বুলাইয়া আনিয়া বিমলের সমস্ত মুখ তিতো হইয়া গেল। এক মিনিটে সে তিনদিন জ্বর ভোগ করিয়া উঠিয়াছে।

আচ্ছা, তুই যা মিলি।

যাই। আজ সারাদিন আমি যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম সেটা বলে যাই। শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে শান্তা যেন তোমাকে অভিশাপ দিয়ে যায়।

প্রমীলা চলিয়া গেলে বিমল জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। শান্তার জানালা বন্ধ, কান পাতিয়া কোনো শব্দ শোনা যায না। ঘরের ভিতরের ছবিটি বিমলের মনে সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। ঘরের ভিতরে অনেকগুলি ছবি সে দেখিতে পায়, এককোণে ছোটো আলনাটিতে শান্তার শাড়ি আর শেমিজ

সাজানো রহিয়াছে, ওদিকের দেয়াল ঘেঁষিয়া বসানো আলমারিটি কাচের পুতুল আর নানারকম শৌখিন জিনিসে বোঝাই, একটা তাকে শান্তার সেলাই-এর সরঞ্জাম। ওইখান হইতে বুনিবার কাঁটা আর উল বাহির করিয়া শান্তা জানালায় বসিত, দরকার শেষ হইলে আবার ওইখানে রাখিয়া দিত। কী বুনিতেছিল কে জানে ! তার অসম্পূর্ণ শিল্পপ্রচেষ্টাটি বিমল আলমারির তাকে দেখিতে পায়, কিন্তু চিনিতে পারে না। ভিতরের বারান্দার দিকে একটি খোলা জানালা, তারই আলোতে শান্তার সাদাসিধে ড্রেসিং টেবিলটি পাতা আছে---আয়নার তলার দিকটা সিঁদুরের গুঁড়ায় লাল।

এদিকে শান্তার খাট, জানালা খোলা থাকিলেও চোখে পড়ে না। পাঁচ-ছয়টা বালিশের আশ্রয়ে নিস্পন্দ শান্তা শুইয়া আছে, তার লজ্জা নিবারিত হইয়াছে ব্যান্ডেজে। শান্তার চোখের পাতারও মৃদুতম কম্পন নাই, সে এমন শান্ত।

খাটের বাজুতে একটি চওড়া লালপাড় শাড়ি। ওখানে শাড়িটি কী করিয়া আসিল বিমল তাহা জানে। কাল তাড়াতাড়ি ওই কাপড়টি বদলাইয়া শান্তা তার ঘরে আসিয়াছিল।

অধরকে বিমল কিছুতেই ও ঘরে মানাইতে পারিল না। একটা অশরীরী উপদেবতার মতো সে ও ঘরের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিমল জানালার কাছে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু কোনো শব্দ তার কানে আসিল না। শুধু বোঝা গেল অন্ধকার হইয়া আসিলে ঘরে কে মৃদু নীল আলো জ্বালিয়াছে।

তখন বিমল খবর নিতে গেল।

দরজা খুলিয়া দিল ঝি। ঝির নাম বিন্দু।

বিন্দু বলিল, একটু দাঁড়ান বাবু, বাবুকে ডেকে আনি।

বিমলের মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া বিন্দু অধরকে ডাকিতে গেল। বিমল পথে দাঁড়াইয়া রহিল। খানিক পরে বিন্দু নামিয়া আসিল।

বাবু আসতে পারবেন না, ব্যস্ত আছেন।

বিমল রুদ্ধ নিশ্বাসে শান্তার খবর জিজ্ঞাসা করিল। বিন্দু বলিল, ভালো আছেন। বিমলের আরও অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ছিল, কিন্তু সে সুযোগ পাইল না। বিন্দুর প্রতি অনেকগুলি নিষেধ জারি করা হইয়াছিল। বিমল দ্বিতীয় প্রশ্ন উচ্চারণ করিবার আগেই দরজা আবার বন্ধ হইয়া গেল।

বিমল বাড়ি ফিরিল না, গলির মোড়ে চায়ের দোকানে এক কাপ চা খাইয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। এখানে চেনা লোক আসে। পাড়ার লোকেরা শান্তার কথা তোলে। ইতিমধ্যে কথাটা ছড়াইয়া গিয়াছে।

কারণটা নিয়া গবেষণা হয়। কেউ বলে আত্মহত্যা, কেউ বলে খুন, অ্যাকসিডেন্টের কথা যে বলে সে একেবারে পাত্তাই পায় না। দায়ি সাব্যস্ত হয় অধর। হয় সে নিজে করিয়াছে, না হয় তার অত্যাচার সহিতে না পারিয়া বেচারি বউটি নিজে---

একজন বলিল, বেচারি বোলো না হে, ভেতরের কথা কে জানে? হয়তো কারও সঙ্গে শ্রীমতী কোনো কীর্তি করেছিলেন, শেষে ধরা পড়ে---

পথে নামিয়া যাওয়ায় শেষটা বিমল শুনিতে পাইল না। ওদের সে দোষ দিল না। ওদের মতো সেও যদি তৃতীয় ব্যক্তি হইত, এমনিভাবে শান্তাকে নিয়া আলোচনা করিতে তার বাধিত না।

কিন্তু শান্তা যা করিয়াছে সে কী কীর্তি ?

এ জীবনে সে আর কোনো নারীর কীর্তিতে বিশ্বাস করিবে না।

কিন্তু সে তো পরের কথা, এখন সে কী করিবে ? কোথায় যাওয়া যায় ? মানুষের সঙ্গ ভালো লাগে না, নির্জনতার কথা ভাবিতেও অসহ্য বোধ হয়। কী করিবে সে ? মদ খাইবে ?

নিজের মনে সে মাথা নাড়িল। শান্তার আত্মহত্যা মদে ডুবিবে না, তাছাড়া ভালো অবস্থাতে যদি মদ খাওয়া অন্যায় হয়, শান্তার অজুহাতে মদ খাওয়া অপরাধে দাঁড়াইবে। শান্তাকে সে ভালোবাসে, তার জন্য শান্তা যদি এ কাজ করিয়া থাকে, নিজের অনুভূতিকে সে রেহাই দিবে না। মদ কেন, বিষ খাইলে তো মাথা ধরা একেবারে ঠান্ডা হইয়া যায়—কিন্তু বিষ খাওয়ার অধিকার তাহার কোথায় ?

বাড়ি ফিরিয়া শান্তার রুদ্ধ বাতায়নটিকে সে পাহারা দিবে। ওদিকে চাহিয়া তার বিনিদ্র রজনী কাটিয়া যাইবে। মদ খাওয়ার চেয়ে, বিষ খাওয়ার চেয়ে সে হইবে আরও বড়ো নেশা, আরও গভীর বিস্মৃতি।

অনেক রাত্রে, বোধ হয় বারোটার পর, শান্তা আসিয়া জানালা খুলিয়া এবং কয়েকটি অস্ফুট কাতরানির শব্দ করিয়া মুহ্যমানের মতো ঠেস দিয়া জানালায় বসিয়া রহিল।

বিমলের মাথা ঘুরিয়া গেল। এ কী আবির্ভাব ! ঘুমের চাদরে পৃথিবীর সমস্ত শব্দ চাপা পড়িয়া গিয়াছে, আকাশের চাঁদের আলো শান্তার গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, ঘরের মধ্যে রহস্যময় নিষ্প্রভ নীল আলো। মাথায় তাব ব্যান্ডেজের ঘোমটা, মুখের সবটা চোখে পড়ে না। বাঁ হাতটি গলায় বাঁধা থলিতে ঝোলানো। কাপড়ের এমন অসংযম যে দেখিলে কাঁদিতে ইচ্ছা হয়।

প্রাণপণ চেষ্টায় সে ঢুলুঢুলু চোখ দুটি খুলিয়া রাখিয়াছে। কী দেখিবার কামনা ও চোখের কে জানে !

বিমল মৃদু অস্ফুট স্বরে নাম ধরিয়া ডাকিল।

শান্তা বলিল, কী ?

এমন করলে কেন শান্তা ? এ প্রবৃত্তি তোমায় কে দিয়েছে ?

শান্তা মুহূর্তে অভিমান করিয়া বলিল, বকছ কেন, আমি কী করেছি !

বিমল কিছুক্ষণ কথা বলিতে পারিল না। ভয়ে আর দুর্ভাবনায় উত্তেজনা পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। শান্তাও চুপ করিয়া বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে বিমল বলিল, খুব কষ্ট হচ্ছে শান্তা ?

না গো না, কষ্ট কীসের ? তোমার কাছে আসবার জন্যেই তো ছটফট করেছিলাম—আমাকে আসতে দেয় না। যা খুশি কর না তুমি, আমার কষ্ট হবে কেন? বলিয়া চাঁদের আলোয় সে একটু হাসিল, আমার শুধু লজ্জা করছে। মিলি কী ভাববে ?

কিছু ভাববে না শান্তা। তুমি শুয়ে থাকবে যাও।

যাই। কিন্তু মিলি নিশ্চয় যা তা ভাববে। ও কী জানে বল? আমাকে ও রাক্ষসী ভাববে, মনে করবে মানুষের জীবন নিয়ে আমি খেলা করি। আমি কিন্তু খেলা করিনি। করেছি ?

না। মিলি তোমাকে ও সব কথা বলেছে বুঝি ?

কই না। বলেনি। যদি বলে ?

বলবে না। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে শুয়ে থাকো শান্তা। বুঝতে পেরেছ ?

পেরেছি।

কী বুঝেছ ?

গিয়ে শুয়ে থাকব, এই তো ?

হ্যাঁ, যাও।

শান্তার কথা কান্নায় জড়াইয়া গেল—তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন? আমি কী করেছি? আমি বাড়ি যাব না—তোমার কাছে থাকব। তাড়িয়ে দিয়ো না আমায়—বাড়ি যাব না, যেতে পারব না।

বিমল বলিল, অমন কোরো না শান্তা, আমার কান্না আসছে।

শান্তা সভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল।

বিমল বলিল, তোমায় আমি তাড়িয়ে দেব কেন ? মাথা কি তোমার খারাপ হয়ে গেছে শান্তা ? আমার মনের ইচ্ছাটা তুমি কী বুঝতে পারছ না ? তোমায় আমি যেতে বলিনি তো। বলেছি খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে। তুমি ঘুমিয়ে পড়লেই আমি গিয়ে তোমার কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে আসব।

শান্তা থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চুমু দেবে ?

দেব। অনেক চুমু দেব।

আমি রাক্ষসী নই ?

না। তুমি লক্ষ্মী।

মিলি আমায় বকবে না ?

না বকবে না। কখন তুমি শোবে শান্তা? কখন কপালে হাত বুলোব ?

যাচ্ছি গো, যাচ্ছি।

শান্তা উঠিল এবং খাটের দিকে পা বাড়াইয়াই ঢলিয়া পড়িয়া গেল। শব্দও করিল না, উঠিবার চেষ্টাও করিল না।

বিমল পাগলের মতো অধর আর ঝিকে ডাকাডাকি করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না। অধর যেন ইহারই প্রতীক্ষা করিয়াছিল এমনইভাবে নিঃশব্দ ছায়ার মতো সে খোলা জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

চিল্লিয়ে পাড়া মাত কোরো না।

বলিয়া সে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। বিমল দেখিতে পাইল না কী অপরিসীম যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কত যত্নে শান্তার অচেতন দেহটা সে বুকে করিয়া খাটে তুলিয়া দিতেছে।

বিমল দুই হাতে জানালার শিক চাপিয়া ধরিয়াছিল, হাত সরাইতে গিয়া হঠাৎ সে মুঠ খুলিতে পারিল না। এত জোরে সে লোহার শিকে আঙুল জড়াইয়া ছিল যে গাঁটগুলি সাদা হইয়া গিয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দিন চারেক কাটিয়াছে।

সকাল বেলাটা বিমল অধরের বাড়ির সামনে ছটফট করিয়া বেড়ায়। অধর বাহিরে আসিলে বাঘের মতো হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া থাকে।

প্রথম দিন অধরকে শান্তার খবর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

উনি কেমন আছেন, অধরবাবু ?

অধর বলিয়াছিল, বিমল, আমার সংযমের একটা সীমা আছে। বাড়িতে একটা গুলিভরা রিভলভারও আছে। মানুষের জীবনমৃত্যুর কোনো দামও আমার কাছে নেই—আমার নিজেরও না। অতিরিক্ত কৌতূহলী হয়ে কেন নিজের প্রাণটা হারাবে—আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে? তোমাকে আমি অন্য শাস্তি দিতে চাই—আমার সে সাধে বাদ সেধো না।

আরও শাস্তি? বিমলের ইচ্ছা হইয়াছিল অধরের মুখের উপরে হাসিয়া উঠে, বলে ধন্যবাদ ! আমার তবে এখানে আশা করার কিছু রইল ! কিন্তু সে হাসিতেও পারে নাই, কিছু বলিতেও পারে নাই।

অগত্যা বিন্দু ঝির কাছে বিমল খবর জিজ্ঞাসা করে। খবর আর কী, রাত্রে জ্বর খুব বাড়ে, দিনে একটু কম থাকে, কেষ্ট ডাক্তার একবার করিয়া দেখিয়া যায়, বাঁচিবে বলিয়াই ভরসা করা চলে।

ভালো সেবা হচ্ছে তো ঝি ?

আমাকে বিন্দু বলবেন বাবু।

ভালো সেবা হচ্ছে তো বিন্দু ?

হচ্ছে বইকী বাবু।

কে সেবা করছে ?

বাবু করছেন, আমি করছি—

বাবু সেবা করেন ?

মিথ্যা বলব না, পুরুষ মানুষ যতটা পারেন, তা তিনি করেন।

তারপর বিন্দু পালটা প্রশ্ন করে, আপনি এত খোঁজখবর নেন কেন বলুন তো ?

এমনি। এই টাকা দুটো নাও বিন্দু, জলটল খেয়ো।

বিন্দু হাত পাতিয়া টাকা নেয়। বিমল বলে, ভালো করে সেবা কোরো, গিন্নিমা সেরে উঠলে তোমায় আমি পুরস্কার দেব—তোমায় খুশি করে দেব বিন্দু।

বিন্দু একটু হাসে। এত দরদ ! বলে, সাধ্যমতো করব বইকী—আমার তো মানুষের প্রাণ ! বলতে হবে কেন !

বিমল ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা বিন্দু, তুমি ঠিক জান সেদিন ঝগড়া বিবাদ হয়নি ?

বিন্দু একটু ভাবে।

না বাবু। একটা উঁচু কথা শুনিনি। বাবু কাপড়জামা পরে বেরিয়ে যাবার পর গিন্নিমা হুড়মুড় করে ছাত থেকে পড়লেন। ভগবান জানেন, আঁধার ছাতে সেদিন কার আসা হয়েছিল !

মানে ভূত। কীর্তিটা ভৌতিক, বিন্দুর এ রকম সন্দেহ আছে।

কেষ্ট ডাক্তারের কাছে গেলে ভালো খবর পাওয়া যায়, কিন্তু যাওয়ার সাহস বিমলের হয় না। সে যদি বলে বাঁচিবে না, বাঁচিবার আশা কম ?

রাত্রি গভীর হইয়া আসিলে দেয়াল ধরিয়া হামা দিয়া মেঝেতে গড়াইয়া নিজেকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া জানালায় উপস্থিত হয়। না গিয়া তার উপায় নাই। জানালাটা তাহাকে অনিবার্য শক্তিতে টানিয়া নিয়া যায়। কোনো সার্থকতার লোভে নয়, কোনো ব্যথা বিস্মৃতির জন্য নয়, তার বহু অভিনীত অভিসারের পুনরভিনয়ের জন্য প্রতি রাত্রে ওখানে তাহাকে যাইতেই হয়।

কেন যায় সে জানে না, জানিয়া-বুঝিয়া সে যায় না। সে শুধু যায়।

নিজের জানালায় দাঁড়াইয়া বিমলের হাত-পা কামড়াইতে ইচ্ছা হয়, শিকে জড়ানো আঙুলের গাঁটগুলি এক মুহূর্তে সাদা হইয়া যায়।

কিন্তু সে কৌশল করে।

বলে, আমার অসুখ করেছে শান্তা।

ওমা, অসুখ কেন ? ওষুধ খেয়ো।

সারাদিন শান্তা আর কারও কথা বুঝতে পারে না, ডাকিলে শুধু সাড়া দেয়, কিন্তু কথা বলে না। তাহার বিকারগ্রস্ত মন শুধু বিমলের কথার কিছু কিছু অর্থ বুঝিতে পারে।

বিমল বলে, আমার ভারী অসুখ করেছে শান্তা—আমি দাঁড়াতে পারছি না। ভয়ানক অসুখ করেছে বলে আমার এখানে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ ? আমার অসুখ হয়েছে—ভয়ানক অসুখ হয়েছে—এত অসুখ হয়েছে যে, দাঁড়াতে মাথা ঘুরছে। তুমি শোবে যাও শান্তা, আমি ঘুমোব। বুঝতে পারছ কী বললাম ? তুমি শোবে যাও—আমি ঘুমোব। শোনো, আমার অসুখ করেছে, আমি দাঁড়াতে পারছি না, তুমি শুতে যাও, আমি ঘুমোব। অসুখ সেরে গেলে তোমায় ডাকব। আমি না ডাকলে তুমি কিন্তু জানালায় এসো না শান্তা। বিছানা ছেড়ে উঠো না। বলো, উঠবে না ? আমি না ডাকা পর্যন্ত শুয়ে থাকবে ?

এমনিভাবে একই কথা বারংবার আবৃত্তি করিয়া সে শান্তাকে বোঝায়। শান্তা ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করে। বিমলের কথার অন্য অর্থ করিয়া কাঁদে, বিমলকে কাছে, আরও কাছে আসিবার জন্য মিনতি করে। শেষে ধীরে ধীরে সে বিমলের কথা বুঝিতে পারে। দেয়াল ধরিয়া হামা দিয়া মেঝেতে গড়াইয়া সে খাটের কাছে সরিয়া যায়, তখন আর বিকারের জন্য তার যে অস্বাভাবিক জ্ঞানটুকু আসিয়াছিল, সেটুকু অবশিষ্ট থাকে না। খাটে উঠিবার চেষ্টা না করিয়া সে মেঝেতেই শুইয়া পড়িতে চায়। কে তাহাকে সযত্নে বিছানায় উঠাইয়া দেয়, সে তাহা জানিতেও পারে না।

বালিশের আশ্রয়গুলি ঠিক করিয়া দিয়া অধব জানালা বন্ধ করিতে আসে।

বিমল কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলে, অধরবাবু, আপনার কি দয়ামায়া নেই, আপনি কি মানুষ নন ? কী বলে আপনি ওঁকে উঠে আসতে দেন ?

অধর সংক্ষেপে বলে, গায়ের জোরে আমি কখনও আটকাইনি। ও যদি উঠে আসে আমি কী করব ?

এ কী আপনার নিজের কথা ভাববার সময় ?

আবোল-তাবোল বকো না। ওষুধ খেতে না চাইলে জোর করে ওষুধ খাওয়াই, মাথাব ব্যান্ডেজ খুলে ফেলতে চাইলে বাধা দি। আমার যতটুকু কবাব অধিকার আছে, আমি তা করি।

সে জানালা বন্ধ করিয়া দেয়।

পরদি: বিমল অন্য কৌশল কবে।

আমি কাল বাইরে যাব শান্তা, সাত-আটদিন আসব না। শুনছ ? আমি কাল চলে যাব, কাশী চলে যাব। সাত-আটদিন আসব না। বুঝতে পারলে ?

কোথায় যাবে?

কাশী যাব।

কেন যাবে?

বেড়াতে যাব। সাত-আটদিন আমি থাকব না শান্তা। তুমি জানালায় এসো না। আমি না থাকলে তুমি বিছানা ছেড়ে উঠবে কেন ? বুঝতে পাবছ ? আমি থাকব না। তুমি বিছানা ছেড়ে উঠবে না। ফিবে এসে আমি তোমায় ডাকব।

আস্তে আস্তে কথাগুলি সে বহুবার আবৃত্তি করে।

আমি কার কাছে থাকব ? বলিয়া শান্তা কাঁদিতে আরম্ভ করে।

মাঝখানে ব্যবধান শুধু দু সারি শিকের। এ ঘরের আলো ও ঘরে যাইতে পারে, এ ঘরের বাতাস ও ঘরে বহিতে জানে। বিমল হাত উঁচু করিলে হাতের ছায়া শান্তাকে ছুঁইতে পারে। তবু মাঝখানে দু সারি শিকের ব্যবধান।

দুটি শিকের মাঝখানে বিমল জোরে মাথা গুঁজিয়া দেয়। শান্তার কান্না থামাইতে তার অনেক সময় যায়। তারপর আবার সে তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করে।

শেষে শান্তা বোঝে এবং প্রতিজ্ঞা করে যে, বিমল ফিরিয়া না আসিলে, নাম ধরিয়া তাহাকে না ডাকিলে, সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিবে না।

কিন্তু পরদিন তাহার প্রতিজ্ঞার কথা মনে থাকে না, আরও দুর্বল আরও শক্ত দেহটা সে জানালায় টানিয়া আনে।

পরমাত্মীয়ের দেহে প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের মতো বিমল তখন শেষ চেষ্টা করিয়া দ্যাখে।

রুক্ষ কঠোর স্বরে বলে, কী চাও তুমি, কেন জানালায় এসেছ ?

শান্তা কাঁদিবার উপক্রম করিয়া বলে, বকছ কেন ?

বকব না? কেন তুমি আমাকে বিরক্ত কর ?

শান্তা কাঁদিয়া বলে, কী বিরক্ত করেছি ?

বিমল বলে, কী বিরক্ত করেছি ! তোমার লজ্জা করে না জানালায় আসতে ? অবাধ্য কোথাকার—বলিয়া সে সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দেয়।

কিন্তু পরদিন জানালার ফাঁক দিয়া সে হতাশ হইয়া চাহিয়া দ্যাখে। ভালো হাতটি দিয়া জানালার শিক ধরিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টায় শান্তা হাঁপাইতেছে। কোনো বাধানিষেধের কথা সে জানে না, বিমলের বারণ, দেহের যাতনা কিছুই তাহাকে বিছানায় ধরিয়া রাখিতে পাবে না। কোন যুক্তি কোন কৌশলে বিকারগ্রস্তার এ অন্ধ আবেগ বিমল ঠেকাইয়া রাখিবে? কোন বিরুদ্ধ প্রেরণা দিয়া সে শান্তার বিবেচনাহীন প্রেরণাকে প্রতিহত করিবে ?

জানালা খুলিয়া বিমল সহসা এক বুদ্ধি খুঁজিয়া পায়। অনেক কৌশলে, অনেক পরিশ্রমে শান্তার মামার নাম ও ঠিকানাটি সে বাহির করিয়া নেয়। আজ আর শান্তাব ফিরিযা যাওয়াব ক্ষমতা থাকে না, অধর তাহার অচেতন দেহটা জানালা হইতেই তুলিয়া নিযা যায়।

সকালে শান্তার মামার কাছে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়া আসিয়াও নিজেকে বাববার মূর্খ বলিযা অভিহিত করিল। যে আত্মীয়স্বজন আছে এবং খবর পাইলে তারা যে ছুটিযা আসিবে এ কথাটা তার আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল। শান্তার বিপজ্জনক বাতায়ন-অভিসার বন্ধ করিতে সম্ভব-অসম্ভব কত কৌশলই সে করিয়াছে ! অথচ এই সহজ উপায়টির কথা তার মনে হয় নাই।

ক-রাত্রি এ রকম জাগিয়া কাটিয়াছে, দুপুরে বিমল ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল যে শান্তা ভালো হইয়া গিযাছে এবং যে ভয়ানক শাস্তি সে ভোগ কবিয়াছে, সেটা ব্যর্থ হয় নাই। শান্তা সেই সন্ধ্যার কথা ভুলিয়া গিয়াছে, বাতায়ন-অভিসারের স্মৃতি তার মনে এত অস্পষ্ট যে এ জন্মে ঘটিয়াছিল কিনা সন্দেহ হইতেছে এবং বিমলক সে আর ভালোবাসে না।

ঘুম ভাঙিবার পর বিমল চোখ মেলিল না, পাশ ফিরিয়া স্বপ্নেব তৃপ্তিটুকু উপভোগ করিতে লাগিল। স্বপ্নটা ঠিক স্বপ্নের মতো যুক্তিহীন নয়। এমন একটা মানসিক বিপর্যয়েব পর শান্তা তাহাব দুদিনের ভালোবাসার ইতিহাসটুকু ভুলিয়া যাইতে পারে বইকী ! ওব মন একেবারে বদলাইয়া যাওয়া আশ্চর্য নয়। ভবিষ্যৎ স্থায়ী শান্তির জন্য শান্তার এমনই একটা ভয়ংকব দুর্ভোগের যে প্রয়োজন ছিল, এ চিন্তায় বিমল ভারী একটা সান্ত্বনা পাইল।

প্রমীলা কী একটা কলম খুঁজিতে ঘরে আসিয়াছিল, গোপনে নগেনকে একখানা পত্র লিখিবে। স্টেশনে সেদিন সে যাহাই বলিয়া গিয়া থাক, তখনকার মতো তাই নিয়া খুশি হইলেও পরে প্রমীলা ভাবিয়া দেখিয়াছে এ ভাবে সে থাকিতে পারে না। থাকা উচিত নয়। এ ভাবে নগেন তাকে রাখিতে পারে না, সে অধিকার নগেনের নাই। সে গরিব গৃহস্থের মেয়ে, তাব কাছে অতখানি আধুনিকতা আশা করাই নগেনের অন্যায় হইয়াছে। সে বিবাহ বোঝে, সংসার বোঝে, নগেনের মুখ চাহিয়াও জীবনে আর কোনো অসাধারণত্বকে সে প্রশ্রয় দিবে না। স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিবে।

বিমল চোখ মেলিয়া বলিল, কী রে মিলি ?

তোমার কলমটা নিতে এলাম। দেবে না ?

নে, নিব ভাঙিস না। তোর চোখের নীচে কালি পড়েছে মিলি। তোর রং এমন বিশ্রী ফরসা যে মনে হচ্ছে চোখে দোয়াতের কালি লাগিয়েছিস।

কাল ঘুমোতে পারিনি।

আমি চার রাত ঘুমোইনি। বোস না, তোর সাথে একটু গল্প করি।

প্রমীলা বসিল। বলিল, রাতদুপুরে বারান্দায় দুমদাম পা ফেলে হাঁটো কেন বল তো ? মা-বাবা দুজনেই টের পেয়েছিল। সকালে কত পরামর্শ হল।

কীসের পরামর্শ রে ?

তোমার একটি বউ আনবার।

যা, বউ ! ছেলে রাতদুপুরে বারান্দায় পায়চারি করলে বুঝি বউ আনতে হয় ?

সাধারণ ছেলেদের জন্য তাই ব্যবস্থা। প্রমীলা গম্ভীর হইয়া গেল। ব্যবস্থাটা ভালো দাদা। যে ছেলে পড়াশুনা করে তারপর চাকরি করে তারপর বিয়ে করে—

তারা জীবনে সুখী হয়। সুখটা সত্যি সুপ্রাপ্য মিলি। বোধ হয় সেই জন্যই কারও কারও সুখে মন ওঠে না।

দুঃখ চায়।

এবং রাশি রাশি পায়।

প্রমীলা হাসিয়া বলিল, দুঃখটাও তো তা হলে সুপ্রাপ্য দাদা !

তা নয়। সহজে এলে কী হবে, অনেক দাম দিতে হয়।

প্রমীলা একটু ভাবিয়া বলিল, কিন্তু যাই বল, দুঃখের মধ্যে কেমন যেন যুক্তি নেই। এ যেন নিজের ঘরে আগুন দিয়ে মজা দেখা। তা ছাড়া আগুনটা ছড়ায়— অন্যরও দু-চারটে বাড়ি পোড়ে। একা একা কেউ দুঃখ পেতে পারে না, ওর মধ্যে দু-চারজন জড়িয়ে থাকবেই—কী দাদা ?

বিমল জানালায় ছুটিয়া গেল।

অধরবাবু ! অধরবাবু ! ঝি, ও ঝি !

বিমলের পাশে দাঁড়াইয়া প্রমীলা চাহিয়া দেখিল, ও বাড়ির জানালায় ডানাভাঙা পাখির মতো ঘাড় গুঁজিয়া শান্তা পড়িয়া আছে। সে নিশ্চল, সে নিস্পন্দ, ভয়াবহ তাহার সেই অস্বাভাবিক অবস্থান। মাথার ব্যান্ডেজটা রক্তে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে।

অধর আজ কোনো মন্তব্য করিল না। বিমলের পাশে প্রমীলা দাঁড়াইয়া আছে শুধু এই জন্য নয়, শান্তার দিকে তাকানো মাত্র বোঝা যাইতেছিল সে মরিয়া গিয়াছে।

তবু অধর একবার তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল।

প্রমীলা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, কী দেখলেন ?

অধর মাথা নাড়িয়া বলিল, নেই। শেষ হয়ে গেছে।

বিমল কাতরাইয়া উঠিল, অধরবাবু, আপনার পায়ে পড়ি অমন করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ওকে তুলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন, একজন ডাক্তার ডাকুন। এখনও হয়তো প্রাণ আছে।

অধর শান্ত স্বরে বলিল, এসো, নিজেই দেখে যাও। শান্তা নেই বিমল, সে স্বর্গে চলে গেছে।

তবু একজন ডাক্তারকে আপনি ডেকে পাঠান অধরবাবু।

বেশ, পাঠাচ্ছি ডেকে। কিন্তু তুমিও একবার নিজে দেখে যাও।

অধর আস্তে আস্তে জানালার পাটটি ভেজাইয়া দিল এবং ঘরের মাঝখানে সরিয়া যাইতে গিয়া অন্ধের মতো দুই হাত সামনে বাড়াইয়া হঠাৎ সে শান্তার দেহের পাশে পড়িয়া গেল। তার দুই হাতের আঙুলগুলি শক্ত মেঝেটাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য নিষ্ফল আঁচড় দিতে লাগিল। এবং দেখিতে দেখিতে চার পাঁচটা আঙুলের ডগা দিয়া রক্ত বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু ঘরের বাহিরে বিন্দুর পায়ের শব্দ পাওয়ামাত্র সে তীরবেগে উঠিয়া বসিল, বলিল, সব কষ্ট শেষ হয়েছে বিন্দু। ভগবান মুক্তি দিয়েছেন। রাখালবাবুকে খবর দিয়ে আয় তো।

বিনা বাক্যব্যয়ে মড়াকান্না আরম্ভ করিয়া দিয়া বিন্দু বাহির হইয়া গেল।

অধর জানালা বন্ধ করিয়া দিতে বিমল বলিল, তা হলে সত্যি শেষ হয়ে গেছে ! বলিয়া সে জানালাতেই বসিয়া পড়িতে যাইতেছিল, প্রমীলা তার হাত ধরিয়া হ্যাঁচকা টান দিয়া দাঁড় করাইয়া দিল।

ছুটে যাও দাদা, ছুটে যাও—দেখে এসো। কথা কয়ো না কথা কইবার সময় নাই, যাও।

বিমল এক মুহূর্ত নড়িতে পারিল না, প্রমীলা রক্তহীন মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিল গভীর রাত্রে। শান্তা যে সময়ে জানালায় আসিত সেই সময়।

প্রমীলা নীচে জাগিয়া বসিয়াছিল, বলিল, কলতলায় কাপড় রেখেছি; স্নান করে আর কাজ নেই, কাপড়টা ছেড়ে ফেলো শুধু।

কেন, কাপড় ছাড়ব কেন ?

শ্মশান ? শ্মশানে আমি যাইনি। গেলেও কাপড় ছাড়তাম না। এক গ্লাস জল দে। জল আনিয়া প্রমীলা দেখিল বিমল হুড়হুড় করিয়া জল ঢালিয়া স্নান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া জামা হাতে করিয়া বিমল উপরে গেল।

জলের গ্লাস তাহার হাতে দিয়া প্রমীলা বলিল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

গড়ের মাঠে শুয়েছিলাম। একটা কথা আমায় বলতে পারিস মিলি? রাত্রে শান্তাকে নিয়ে গেলে রাত্রে আর ফেরা যাবে না বলে তাড়াহুড়ো করে দিনে দিনেই ওকে নিয়ে গেল কেন ?

ও রকম নিয়ম আছে একটা।

ও রকম নিয়ম হল কেন ? রাত্রে সকলের ঘুম পাবে, ভালো করে না পুড়িয়ে ফিরে আসবে, এই ভয়ে ?

না সে জন্য নয়। নিয়মটা শুধু রাত্রির জন্য নয়। দিনে নিয়ে গেলে দিনেও ফিরতে নেই।

অদ্ভুত তো ! একটা কিছু মানে নিশ্চয় আছে। আচ্ছা, ধর এমন তো হতে পারে যে, আলোতে যে যায় অন্ধকারে সে ফিরতে পারে না ?

প্রমীলা সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। অমন ভয়ে ভয়ে ঘরের চারিদিকে বিমল তাকায় কেন !

বিমল শুইয়া পড়িয়াছিল, প্রমীলা বলিল, কে ফিরতে পারে না দাদা ?

বিমল খানিক চোখ বুজিয়া থাকিয়া বলিল, আলো কটা আজ আর নিভিয়ে কাজ নেই মিলি—জ্বলুক।

আচ্ছা।

তোকে বলতে দোষ নেই, অন্ধকারে ঘুম আসবে না।

আমি বসছি—তুমি ঘুমোও।

ঘুমটুম আমার আর কোনোদিন হবে না।

অথচ চার-পাঁচদিন পড়িয়া পড়িয়া সে শুধু ঘুমাইল। এমন আশ্চর্য ঘুম প্রমীলা জন্মে দ্যাখে নাই। প্রমথ নিজে চার টাকা ভিজিট দিয়া পাড়ার একজন ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়া আসিলেন, বিমলের জাগিয়াও ঝিমানোর সময়ে একখানা ছুটির দরখাস্ত লিখাইয়া আপিসে পাঠাইয়া দিলেন। আঁতুড়ে অনুরূপা শিশুটিকে বাঁচানোর চেষ্টার ফাঁকে ফাঁকে বড়ো ছেলের জন্য ব্যাকুল হইতে লাগিল এবং অবিলম্বে বধূ আনিবার কথাটা স্বামীর সঙ্গে দিবারাত্র আলোচনা করিল। আর সকলের সেবা করিতে করিতে মনস্থির করিয়া নগেনকে চিঠি লেখার সময় প্রমীলা করিয়া উঠিতে পারিল না।

তারপর বিমলের ঘুম স্বাভাবিক হইয়া আসিল বটে, কিন্তু কয়েকদিন ধরিয়া তাহার মেজাজ এমন রুক্ষ হইয়া রহিল যে, বাড়িসুদ্ধ সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

বিমলের মেজাজ শোধরাইল অকস্মাৎ। বিনা নোটিশে সে ঠান্ডা হইয়া গেল। কিছুতেই বিরক্ত হয় না, রাগের কারণ থাকিলেও রাগ করে না, ঘাড় গুঁজিয়া খায়, আপিস যায়, বই পড়ে আর ভাবে।

নবম পরিচ্ছেদ

শান্তার মৃত্যুর জন্য প্রমীলা মনে মনে বিমলকে অনেকখানি দায়ি করিয়াছিল। শান্তা যে খেলা করিতেছিল এটা সে পছন্দ করে নাই, শান্তাকে সে একেবারে নির্দোষ মনে করে না, কিন্তু খেলা করার অপরাধে ওকে অত বড়ো শাস্তি বিমল কী করিয়া দিল ! বিমল দৈত্য, না দানব ?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাদার অবস্থা দেখিয়া প্রমীলা অল্পবিস্তর মত পরিবর্তন করিল। সে ভিতরের খবর কতটুকু জানে যে বিচার করিতে বসিয়াছে ? শান্তা যা করিয়াছে হয়তো নিজের দায়িত্বেই করিয়াছে, কারও কাছে প্রেরণা ভিক্ষা করে নাই।

এমনকী বিমলকে সে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়া দেখিল।

বলিল, লোকের বউ মরে জান তো দাদা ? অনেকদিনের চেনা সন্তানের মা ভালোবাসার বউ ? মরে তো ?

মরে।

তার শোকও মানুষ ভুলে যায়। তোমার বউ মরেনি। তোমার এ রকম শোকের মানে কী ?

মানে নেই।

তবে ?

তবে আবার কী ? মানে নাই বা রইল, শোক থাকলেই হল।

তা কেন থাকবে ? দুঃখ থাকে থাক, শোক থাকবে কেন ?

সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না মিলি।

প্রমীলা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, আমাব কথাগুলো তুমি বড়ো হালকাভাবে নিলে দাদা।

বিমল শুধু বলিল, না। হালকাভাবে নিইনি।

প্রমীলা খানিকক্ষণ চুপ করিযা রহিল।

তুমি জান শান্তার না মবলে চলত না ?

কার চলত না ? বিমল সচকিতে জিজ্ঞাসা করিল।

শান্তাব চলত না। মরে ও মুক্তি পেয়েছে। মবণ ওর সমাপ্তি নয়, সমাধান। ও ছিল খোঁটায় বাঁধা জীব, কিন্তু এমন অবস্থাই সৃষ্টি হল, সামনে হোক, পিছনে হোক না চলে ওর উপায় রইল না। সেটা কী রকম ভয়ানক অবস্থা ভেবে দ্যাখো তো ? মরে ওর সে সমস্যার মীমাংসা হয়েছে।

খোঁটা উপড়ে গেলে আরও ভালো মীমাংসা হত।

অবুঝের মতো কথা বোলো না দাদা। ওর জীবনে সে কি সম্ভব ছিল? না দাদা, শান্তার মৃত্যুকে তুমি মেনে নাও।

না মেনে পথ কোথায় রে ?

এ ভাবে মানা নয়। মেনে নাও যে ও সহজভাবে মরেছে—আর দশটি বউয়ের মতো ওরও স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

এটা মেনে নিলে কী হবে ?

ওর জন্য তোমার শোক স্বাভাবিক হয়ে আসবে। জান দাদা, শান্তা তোমাকে ক্ষমা করে গেছে।

বিমলের স্তিমিত চোখ দুটি অনেকখানি খুলিয়া গেল। ক্ষুব্ধ কঠোর স্বরে সে বলিল, বড়ো হয়ে তুই বড়ো অসুবিধায় ফেলেছিস মিলি—তোকে ধমক দিতে বাধোবাধো ঠেকে। যা বুঝিস না, তাই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিস না, যা তুই।

প্রমীলা উঠিয়া গিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

অথচ এ সব আলোচনা অনাবশ্যক নয়। শান্তা যেভাবে মরিয়াছে, শান্তার কথা বলিতে তার ভালোলাগা উচিত। খোঁটা উপড়ানোর কথা হইতে তাহারা অনায়াসে সমাজসমস্যায় আসিয়া পড়িতে পারিত। বিমল উত্তেজিত হইয়া তীব্র তীক্ষ্ণ বাক্যের সাহায্যে তার মনোবেদনা, তার নালিশ ব্যক্ত করিতে পারিত। মানুষ তো সকল অবস্থাতেই শিশু। যে চৌকাঠে হোঁচট লাগিয়াছে সেটিকে আঘাত করিতে পারিলে মানুষ অনেকখানি তৃপ্তি পায়।

শান্তার সম্বন্ধে বিমলের এমন কঠোর বাক্‌সংযম কেন ?

কিন্তু প্রমীলা ছাড়িল না। বিকালে বিমল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে বলিল, শান্তা ক্ষমা করে গেছে বলাতে তখন চটলে যে ? ক্ষমা বললে অপরাধের কথা এসে পড়ে এই জন্য ? তুমি বলতে চাও তোমার কোনো অপরাধ ছিল না ? নিজেকে ভুলিয়ো না দাদা। খাঁচা ভাঙবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু ঘেরাটোপ তুলে তুমি খাঁচার পাখিকে আকাশ দেখিয়েছিলে।

সেটা পাখির সৌভাগ্য।

কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা কোরো না দাদা—কেঁদে ফেলব। মরুব পাখিকে তোমার সবুজ সম্পদটুকু দেখিয়ে ভোলাবার অধিকার কেউ তোমাকে দেয়নি। তুমি অন্যায় করেছিলে।

বিমল বলিল, অধিকারের কথাটা না বললে তোর উপমা জোরালো হত।

এবার প্রমীলা রাগ করিল।

তা হলে স্পষ্ট কথা বলি, তুমি ভেবো না তোমার মনের কথাটা আমি বুঝতে পারছি না। যে কীর্তি তুমি করেছ, সে বিষয়ে তোমার থিয়োরি আর প্রিনসিপল তোমারই থাক,—ও রকম করার অধিকার তোমার ছিল না। যে শিশু তাপ চায়, পুড়তে চায় না, অভিজ্ঞতার অভাবে তাপের খোঁজে সে যদি আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়তে চায়, তুমি তাকে সেখানে পৌঁছে দেবে ? শান্তা কী চেয়েছিল সে তো তুমিও জান—আমিও জানি !

বিমল ধীরে ধীরে বলিল, দূর থেকে তাপ চেয়ে কাছে এসে শান্তা যে আগুনে পুড়তে চায়নি, এটা তুই কী করে জানলি ?

বলিয়াই বোনের উপর অভিমান করিয়াই সে যেন তার কথাটাকে আদালতের যুক্তিতর্কে টানিয়া নিয়া গেল।

ও যে আমাকে পোড়াতে বাধ্য করেনি, তাই বা তুই অনুমান করলি কীসে ?

প্রমীলা থতোমতো খাইয়া গেল। বদমেজাজি বিমল যে তাহাকে এতক্ষণ বরদাস্ত করিয়াছে, এটাও এতক্ষণে তার খেয়াল হইয়াছে।

বিমলের যুক্তিটা প্রমীলা খানিকক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিল। তারপর একটু ভয়ে ভয়েই, তবু, একজনের মুহূর্তের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে—

মুহূর্তের দুর্বলতা ! বিমল সিধা হইয়া গেল, বোকার মতো কথা বলিস কেন ? মুহূর্তের দুর্বলতায় বড়ো জোর একটা কবিতা লেখা যায়, তার বেশি কিছু হয় না।

প্রমীলা আর কথা বলিবার সাহস পাইল না। দাদার কাছে এখনও তার অনেক শিখিবার আছে, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় যা তার অনেকদিন আগে শেখা উচিত ছিল। বাস্তবিক দুর্বল মানুষের আবার মুহূর্তের দুর্বলতা কী ?

বিমল বলিল, আজ সজনীবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। একটা মজার খবর শুনলাম।

কী খবর ?

তোর বিয়ে—সামনের শুক্রবার।

মানে ?

মানে, নগেন কাকিমাকে একখানা চিঠি লিখেছে। চিঠির আসল খবরটা এই যে, শুক্রবার অর্থাৎ কাল তোর বিয়ে হবে।

প্রমীলার মুখ সাদা হইয়া গেল।

এ কথা লেখার মানে কী দাদা ?

আমিও কিন্তু তাই ভাবছি। বোধ হয় কিছু শুনে থাকবে।

প্রমীলা অল্প একটু মাথা নাড়িল।

কলকাতা থেকে তুচ্ছ প্রমীলার সম্বন্ধে উড়ো খবর লখনৌ পর্যন্ত যায় না।

এটা ওর বানানো কথা।

লাবণ্যের চালও হতে পারে।

না। নিজে না জানলে কারও মুখ থেকে এ কথা শুনলে বিশ্বাস করবে না।

আমাদের বাড়ির কেউ না বললে---

বিমল আশ্চর্য হইয়া বলিল, একটা সামান্য কথা নিয়ে তুই যে খেপে গেলি মিলি !

প্রমীলা ম্লান মুখে বলিল, না, খেপিনি।

পরদিন মোটা টাকার ইনশিয়োর করা এক পার্সেল আর দুখানা চিঠি আসিল। একখানা চিঠি আর পার্সেলটি বিমলের নামে, অন্য চিঠিটা প্রমীলার। পার্সেল খুলিতে সোনা আর হিরার ঝলকে ভাইবোনের চোখ ঝলসিয়া গেল।

প্রমীলার বিবাহে নগেন উপহার পাঠাইয়াছে।

বিমলের পত্রখানা সংক্ষিপ্ত, সুরটা অপমানিত বন্ধুর। নগেন লিখিয়াছে, গোপনতার কী প্রয়োজন ছিল ? যে প্রয়োজনই থাক, প্রমীলাকে সে স্নেহ করে। তার স্নেহের নিদর্শনটি ফেরত দিয়া তাকে যেন অবহেলার উপর অপমান করা না হয়।

প্রমীলার পত্রখানা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। সুরটা আহত অভিমানী প্রেমিকের।

শেষটুকু এই : আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কী করলে তোমার পাথরের মতো শক্ত বুকে একটু আঁচড় কাটা যাবে বসে বসে তাই ভাবছি। তুমি সুখী হও, এ কামনা আমি করি, কিন্তু তোমার জন্য আমি অসহ্য মনোবেদনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছি ভেবে সারাজীবন তুমি যে অতিরিক্ত সুখ পাবে আশা করছ, সেটুকু তোমাকে দেবার মতো উদারতা আমার নেই। আমার এ হীনতাকে তুমি ক্ষমা কোরো।

বিমলের আজ ভয় হইয়াছিল।

কী লিখেছে রে ?

প্রমীলা চিঠিখানা তার হাতে দিল। পড়িয়া শেষ করিয়া সে চাপা গলায় বলিল, রাসকেল!

প্রমীলা কান্না চাপিয়া বলিল, শেষটা পড়লে দাদা ? আমি ও রকম হীন ?

বিমল নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করিল, শোন, নগেন একটা রাসকেল।

প্রমীলা এ কথার প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

এটা হল লাবণ্যকে বিয়ে করার ভূমিকা।

প্রমীলার ভাব দেখিয়া মনে হইল ইহা সে জানিত।

বিমল চকচকে গয়নাটা হাতে তুলিয়া নিল।

আর এটা হল আমার বোনের সঙ্গে খেলা করার দাম। আমার বোনকে পাঠাবার সাহস পায়নি, আমাকে পাঠিয়েছে। ওকে যে আমি রাস্তায় ধরে জুতোব না, শুধু এই অনুগ্রহের জন্য মিলি দামটা তোকে পাঠায়নি, আমায় পাঠিয়েছে।

প্রমীলার মাথা ঘুরিতেছিল। কিন্তু সে দাঁড়াইয়া রহিল।

নগেন কেন রাসকেল জানিস ? লাবণ্যকে বিয়ে করার জন্য নয়। দুর্বল মানুষ ও রকম করে। এই রকম চিঠি আর গয়না পাঠিয়েছে বলেও ওকে আমি রাসকেল বলিনি মিলি। নিজের দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্য এ রকম কাজ দুর্বল মানুষ করে। ও রাসকেল অন্য কারণে। আমরা ভূমিকাটা ধরতে পারব এ কথা জেনে এই চিঠি লিখেছে। গয়নাটা কীসের দাম বুঝতে পারব জেনে গয়না পাঠিয়েছে। ওর প্রকৃতি হল এই। আর সেই জন্যই ও রাসকেল। চোখে ধুলো দিতে পারবে না জেনেও আমাদের চোখে ধুলো না ছুঁড়েও থাকতে পারেনি—ও এতবড়ো রাসকেল !

প্রমীলাকে বিমল নিজের ঘরে টানিয়া নিযা গেল। দুই কাঁধ ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে বিছানায় বসাইয়া দিল।

আজ তোর কোনো কাজ নেই, কোনো দায়িত্ব নেই। কেউ তোকে ডাকবে না। এখানে বসে রাসকেলটার কথা ভাব আর ঘেন্না করতে শেখ। এক সপ্তাহের মধ্যে আমি তোর গরিব আর সাদাসিধে বর এনে দেব—তাকে তোর ভালোবাসতে হবে।

প্রমীলা বলিল, না।

না ! না কেন ?

প্রমীলা চুপ করিয়া রহিল।

না কেন শুনি ? তুই কী নাটক করতে চাস নাকি ? নগেনের জন্য তোর মাথাব্যথা থাকতে পারে না। রাসকেল মানুষের সঙ্গে লোকে ভুল করে, কিন্তু তাকে ভালোবাসে না।

প্রমীলা শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

মন শক্ত কর। আমি তোকে কথা দিচ্ছি বিয়ের সাতদিনের মধ্যে রাসকেলটাকে ভুলে যাবি।

প্রমীলা বলিল, না না।

না কী রকম ? আমি তোকে ঠকাব না মিলি।

সে হয় না।

বিমল নিঃশব্দে তার চেয়ারে বসিয়া পড়িল। একদিন আর একজনের মুখে সে এই কথা শুনিয়াছিল। শান্তা যে দিন তার সঙ্গে বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে রাজি হয় নাই সেদিন।

নীচে রান্নাঘরে ভাত পোড়া-লাগা পর্যন্ত দুইজনেই চুপচাপ বসিয়া রহিল। পোড়া গন্ধ নাকে লাগিতে প্রমীলা উঠিল।

বিমল বলিল, বোস।.... হয় না, না ? বেশ ! না হয় না হবে ! একজন মরে বেঁচেছে, তুই বেঁচে মরে থাক। কিন্তু নগেনকে আমি শাস্তি দেব মিলি।

কী লাভ হবে ?

লাভ না হয়, লোকসান হবে। কী এল গেল ? কী করব জানিস ? নগেনের ওপর লাবণ্যকে জয় করব। নগেনের মাথা হেঁট করে দেব। শোন, লাবণ্যকে তুই চিনিস না, ডাকলে বাসরঘর থেকেও বেরিয়ে আসবে।

ছিঃ দাদা ও সব বুদ্ধি কোরো না।

বিমল ছিটকাইয়া আসিয়া বিছানায় চিত হইয়া শুইয়া পড়িল। চোখ বুজিয়া বলিল, বুদ্ধি করা পর্যন্তই মিলি, পারব না। মেয়েদের আর বিশ্বাস করি না। লাবণ্যও হয়তো ছাত থেকে ঝাঁপ দিতে জানে।

বাজার করিয়া আসিয়া প্রমথ নীচে হাঁকাহাঁকি করিতেছিল। প্রমীলা বলিল, আমরা কিছুই করব না দাদা। চুপ করে থাকব।

বিমল বলিল, সেই ভালো। আমরা খেয়ালি, আমরা বোকা, আমরা ভীষণ ভুল করেছি—অন্যায়ও করেছি, কিন্তু আমরা রাসকেল নই। মরলে আমাদের স্বর্গে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ব্যস আমরা আর কিছু চাই না।

কিছুই তাহারা করিল না। বিমল গয়নাটা নগেনকে ফেরত পাঠাইতে যাইতেছিল প্রমীলা বারণ করিল।

কাজ কী দাদা ? কোনো মিশনে কি হাসপাতালে দিয়ে দাও।

তা হলে নগেন ভাববে আমরা নিয়েছি।

ভাবুক না ?

ঠিক ! বিমল প্যাকেটের উপর ঠিকানা লেখা কাগজটা ছিঁড়িয়া ফেলিল। একটা কাজ কিন্তু করতে পারব না মিলি। ওর দয়ার চাকরিটা করা পোষাবে না।

নাই বা করলে ? জগতে আরও ঢের চাকরি আছে।

একটা মোটর দুর্ঘটনার কথা বিমল প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ সেই ছেলেটিকে বারবার মনে পড়িতে লাগিল। সেও নগেনের কীর্তি। একটা ছোটো ছেলে মাসিক একশো পঁচিশটা টাকার বিনিময়ে এই মাটির পৃথিবীতে স্বর্গরচনার স্বপ্ন দেখিতেছিল, হাতের মোয়াটি কাড়িয়া নিয়া নগেনই ছেলেটাকে বাসের সামনে ঠেলিয়া দিয়াছে।

পরদিন বিমল বলিল, লাবণ্যের কপাল মন্দ মিলি।

আবার বলিল, নগেন সব নেবে—দাম দেবে টাকায় তাও বেশি নয়। বাজারের একটা মেয়েমানুষের জন্য যা লাগে, তার চেয়েও কম।

কথাটা বলিয়া তাহার অনুতপ্ত হইতে দেরি লাগিল না। কারণ, একেবারে নাটকীয় প্রথায় প্রমীলা মূর্ছা গেল। তার মূর্ছা নাটকীয় নয়। সে সুস্থ হইলে বিমল বলিল, আড়ালেও কাঁদিস না বুঝি ? বোকা।

দশম পরিচ্ছেদ

তারপর কিছুদিন কাটিয়া গেল। অনুরূপা পায়ে ভর দিয়া মিনিটখানেক দাঁড়াইতে পারার শক্তি অর্জন করিল, ছেলের চাকরি যাওয়ার সংবাদে প্রমথ মুষড়াইয়া পড়িল, এবং বিমল ও প্রমীলার মানসিক বিপর্যয়গুলি সুনিশ্চিতভাবে ও দ্রুতবেগে ঘটিয়া চলিল। নতুন কিছু ঘটে না, তবু প্রত্যেকদিন জীবনটা যেন নবভাবে বোধগম্য হয়। দুঃখ বদলায় না, ভোগ করিবার প্রক্রিয়াটা বদলায়। বিমল শান্তার মৃত্যুর এক-একটা নতুন দিক আবিষ্কার করে, প্রমীলার পোড়া কপালের একটা-একটা নতুন ফোসকা ফাটিয়া যায়।

দাদার জন্য প্রমীলার কখনও কান্না পায়, বোনের জন্য বিমলের বুকের ভিতরটা কখনও পুড়িয়া যায়।

দুপুর রাত্রে বিমল ডাকে, মিলি শোন—আয় আমার ঘরে।

প্রমীলা উঠিয়া যায়।

আয় দাবা খেলি।

দুজনেই চাল ভুল করে, কেন খেলিতেছে, কী খেলিতেছে দুজনেই ভুলিয়া যায়, বিমলের শ্রান্ত চোখ জ্বালা করে, প্রমীলার নিদ্রাতুর দেহে সজাগ মস্তিষ্ক দপদপ করিতে থাকে।

বিমল বলে, খেলা থাক মিলি।

প্রমীলা বলে, থাক।

তোর ঘুম পাচ্ছে ?

না। তোমার ?

আমারও না।

তবেই মুশকিল দাদা।

কী করা যায় বল তো ?

প্রমীলা বলিতে পাবে না। দুইজনে খানিকক্ষণ বোবাব মতো বসিয়া থাকে।

বিমল অপরাধীব মতো বলে, ছটফট করছিস দেখে ডেকে আনলাম, কিন্তু এ যে আরও বিশ্রী হচ্ছে রে ! একঘণ্টা তোকে ভুলিয়ে রাখার মতো ক্ষমতা আমাব নেই।

তারপর বলে, মরবি ?

না।

বল, দু মিনিটে মেরে ফেলছি। টেরও পাবি না।

না, মরবার কিছু হয়নি। প্রমীলা একটু হাসে।

তবে কী করা যায় বল তো ?

আবার তাহারা অনেকক্ষণ বোবাব মতো বসিয়া থাকে।

শেষে প্রমীলা বলে, যাই, শুইগে।

যা। তোকে আব ডাকব না মিলি। আজ যেন ঠাট্টা করলাম তোর সঙ্গে।

প্রমীলা ফিরিয়া যায়।

দুজনের কেহই টের পায় না ও বাড়িতে এক বোতল মদ গিলিয়া শান্তাব একটা শাড়ি দিয়া মাথায় পাগড়ি বাঁধিযা অধর কত আবামে ঘরের মেঝেতে ঘুমাইয়া আছে।

একদিন কেদার আসিল। সম্পর্কে তিনি মামা হন, কিন্তু কত দূব সম্পর্কে বলা কঠিন।

কেদার সম্পাদক।

বস্তা বার কর, বাছি।

ভাঙা সুটকেশ খুলিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

খালি যে রে !

যা ছিল পুড়িয়েছি।

সব ? কেদার স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

ছেলেমানুষি লেখা সব, কী হবে বেখে ?

যা হবাব হত, পোড়াতে গেলি কেন ? আমাকে দিলি না কেন ? না হয় আমি নিজের নামে ছাপতাম !

কী চাও বল না, কেদারমামা।

গল্প দে—ভালো আব ভদ্র অশ্লীল গল্প।

নেই।

টাকা দেব—দশ টাকা।

নেই মামা।

আচ্ছা, ভালো হলে পনেরোই দেবখন, ডাকাত কোথাকাব !

বিমল মাথা নাড়িল।

তবে সত্যি নেই। গাধা ?

নেই।

কবিতা ? বল তাও নেই !

কবিতা দিতে পারি একটা।

কবিতার নূতন খাতাটা সে কেদারের সামনে ফেলিয়া দিল। পাতা উলটাইয়া কেদার বলিলেন, মোটে একটা ?

ওই ছাপ না, আরও দেব।

কেদার নীরবে কবিতাটি পাঠ করিলেন। বিমলের গায়ে খাতাটা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন, তুই গোল্লায় যা।

রাগে গরগর করিতে করিতে কেদার বাহির হইয়া গেলেন।

প্রমীলা বলিল, একটা গল্প লেখ না ? এ মাসে খরচের টানাটানি পড়বে।

আমি ফরমাশি ফাঁকিবাজ সাহিত্যিক নই মিলি। তিনদিন সিগারেট না খেয়ে থেকেছি, নির্লজ্জের মতো টাকা ধরে করেছি, কিন্তু বাজে লেখা একটাও লিখিনি।

তবু—

বিমল একটু ভাবিল।

আচ্ছা লিখব।

রাত্রি তিনটা পর্যন্ত বিমল লিখিল। সমস্ত সকালটা লেখা সংশোধন করিল এবং দুপুরবেলা টাকা আনিতে গেল।

কেদার বলিলেন, সাংঘাতিক গল্প। দিস তো রে এ রকম আর একটা দুটো। মাঝে মাঝে বড়ো বিপদে পড়ি।

প্রমীলা খুশি হইয়া বলিল, লক্ষ্মী ছেলে।

খরচের টানাটানিতে তার দুর্ভাবনার সীমা ছিল না। অনুরূপা আঁতুড়ে ঢোকার পর প্রমথ সহসা প্রমীলার হাতে সংসার খরচের ভার ছাড়িয়া দিয়াছিল।

একদিন অধর আসিল। বাড়ির ভিতরে আসিয়া দাওয়ার মাদুরে বসিয়া প্রমথের সঙ্গে কথা বলিতে তার কোনো দ্বিধা দেখা গেল না।

কাল আমার বোন আর দূরসম্পর্কের পিসিমা আসবে—কিন্তু কাজটা ওদের দ্বারা নির্বাহ হবে কিনা সন্দেহ। অপঘাত মৃত্যু হল, শ্রাদ্ধটা ভালোভাবেই করব ভাবছি। প্রমীলাকে দুদিন ধার দিতে হবে, সরকার মশায়। দেখবে শুনবে, গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে আসবে।

প্রমথ বলিল, বেশ।

প্রমীলাকে ডাকিয়া অধর আবেদন জানাইল। প্রমীলা তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া গেল। যাওয়ার আগে অধর বলিল, বিমলবাবু বাড়ি নেই ?

দাদা ওপরে আছে। ডাকব ?

থাক। অধর বিদায় নিল।

খবর শুনিয়া বিমল বলিল, তুই যাবি কী রকম ?

শান্তার কাজটা ভালোভাবে না হলে মন খুঁতখুঁত করবে দাদা।

ওর বাড়ি তোকে যেতে দিতে সাহস হয় না।

ভয়ের কী আছে ? অধরবাবু গুন্ডা নয়—ভদ্রলোক।

ওকে দেখলে অবাক হয়ে যেতে। ভেতরে ভেতরে লোকটা মরে গেছে।

বিমল চিন্তিতভাবে বলিল, সেটা ভালো লক্ষণ নয়। ভেতরে মরে যারা বাইরে বেঁচে থাকে, তারা জীবন্ত ভূত। অনেক ভৌতিক কাণ্ড করতে ওরা ভালোবাসে। কিন্তু আমাকে খুঁজছিল কেন ?

কী করে বলব? কাজটার জন্য সাহায্য করতে বলত হয়তো। কিন্তু তোমার গিয়ে কাজ নেই দাদা।

পরদিন বিমল একটা খবরের কাগজের আপিসে চাকরির খোঁজে যাইতেছিল, বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া অধর তাহাকে ডাকিল।

বিমলবাবু, শুনুন।

দরজার সামনে রাস্তায় দাঁড়াইয়া বিমল বলিল, বলুন।

রাগ রাখবেন না। মনের অবস্থা কীবকম ছিল বুঝতেই পারছেন, তখন যাই বলে থাকি তার কোনো দাম নেই। বসুন না এসে ?

বিমল শান্তভাবে বলিল, না, কাজে যাচ্ছি। আপনাকে স্পষ্ট করেই বলি অধরবাবু, রাগটা দমন করতে পারি, কিন্তু ঘৃণা তো কথা শুনবে না !

অধর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আপনি শান্তার বন্ধু ছিলেন, কিন্তু আপনাদের বন্ধুত্ব আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, ভুল করেছিলাম। আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ছাড়া শান্তার স্মৃতিকে সম্মান দেখানোর আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু ঘৃণা যে কথা শোনে না এ কথা সত্যি।

শান্তাকে আপনি বাঁচাতে পারতেন—আমাকে বাঁচাতে দিতে পারতেন।

শান্তা বাঁচতে চায়নি। ও আপনাকে ভালোবাসত। ওকে বাঁচালে কী হত জানেন ? আবার ছাত থেকে ঝাঁপ দিত। মিছামিছি ওর যন্ত্রণা বাড়াতে চাইনি।

এমনিভাবে বিনা ভূমিকায় এবং সংক্ষেপে একজন কৈফিয়ত দিল এবং শান্ত অবিচলিতভাবে আর একজন শুনিয়া গেল। শত্রুতা মানুষকে এমনই অন্তরঙ্গ করিয়া দেয়। এমন কী আর কিছু বলিবার প্রয়োজনও তারা বোধ কবিল না। বিমল নীরবে চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। অধর আস্তে আস্তে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া গেল।

চাকরিটা সে পাইল না, কারণ চাকরি খালি ছিল না। কিন্তু রাস্তায় সজনীর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

তোমাকে খুঁজেছিলাম বিমল।

আমাকে ? কেন ?

তোমাকে একদিন নেমন্তন্ন করার হুকুম আছে। খাবে আর কবিতা শুনবে।

বিমল একটু হাসিয়া বলিল, বেশ তো।

কবে তোমার সুবিধা হবে ?

বিমল সবিনয়ে বলিল, সজনীকাকা, আমার সুবিধা অসুবিধার প্রশ্নই ওঠে না। তবে মঙ্গলবার হলে একটু উপকার হয়। বাড়ির পাশে সেদিন একটা বিশ্রী শ্রাদ্ধ হবে, পাড়ায় থাকতে চাই না। কিন্তু আপনি যাচ্ছিলেন কোথায় ?

বেড়াতে—গঙ্গার ধারে। যাবে ?

বিমল মাথা নাড়িল—না।

মোটরে চাপিয়া গঙ্গার ধাবে বেড়াইবার শখ বিমলের ছিল না।

মঙ্গলবার সে সকাল সকাল নিমন্ত্রণ রাখিতে গেল, পেট ভরিয়া খাইল এবং কান ভরিয়া কাকিমার কবিতা শুনিল। কাকিমার প্রতিবেশিনী বি এ ফেল একটি লাজুক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিল এবং আধঘণ্টার মধ্যে তাকে জানাইয়া দিল যে, 'তুমি আমার বোন'। কেন জানাইল কে জানে ! মেয়েটি অবাক হইয়া ভাবিল, কবিরা সত্যি অসাধারণ !

শেষে কাকিমার গোটাকুড়ি কবিতা সঙ্গে নিয়া এবং সেগুলি মাসিকে ছাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিবে কথা দিয়া বিকালে বাড়ি ফিরিল। এবং বিছানায় শুইয়া সেই অবেলায় ঘুমাইয়া পড়িল।

স্বপ্নে আসিল লাবণ্য। লাবণ্য দেখিতে অনেকটা শান্তার মতো হইয়া গিয়াছে, তার কানের দুল দুটি অনেকটা কাকিমার প্রতিবেশিনী সেই লাজুক মেয়েটির দুলের মতো। চারিদিকে কীসের একটা গোলমাল চলিতেছিল এবং কী কারণে যেন একেবারেই সময় ছিল না।

ও সব বাজে কথা। আমি তোমায় ভালোবাসি।

লাবণ্যও সঙ্গে সঙ্গে বলিল, আমি বাসি না ?

তারপর স্বপ্নটা ঝাপসা দুর্বোধ্য হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর প্রমীলা তার ঘুম ভাঙাইল। এ কী ? মরবে নাকি ?

বিমল বলিল, সারাদিনে আজ সাঁইত্রিশটা কবিতা শুনেছি—সাধারণ লোকের সাঁইত্রিশ বছরের পরিশ্রম। ঘুমের দোষ কী ?

মুখ ধোও, চা আনছি।

কড়া চা পান করিয়া বিমলেব ঘুমের জড়তা কাটিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, কী রকম শ্রাদ্ধ হল ? এখনও গোলমাল চলছে যে বে।

শ্রাদ্ধের বর্ণনা শুনে কাজ নেই দাদা।

শুনিই না। শান্তাকে স্বর্গে ঠেলে দেওয়ার মতো হয়েছে তো ?

প্রমীলা চুপ করিয়া রহিল।

বিমল সহসা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।

মরা মানুষের সঙ্গে ইয়ার্কি ! শ্রাদ্ধ হচ্ছে ! কেন, মরলে কি মানুষ অপরাধ করে নাকি ? শরীরটা পচে যাবে পুড়িয়ে ফ্যালো—শ্রাদ্ধ আবার কী ? যত সব অমানুষিক কাণ্ড—বর্বরতা।

গলা নামাইয়া বলিল, হইচই ভালো লাগে, কিন্তু ছুতোর কি অভাব আছে ? একটা বানিয়ে নিলেই হয়। জন্মালে উৎসব নেই, শাঁখটা শুধু একটু বাজে, মরলে সমারোহেব সীমা থাকে না।

অভিযোগটা সুস্পষ্ট, কিন্তু মানে বোঝা দুঃসাধ্য। শ্রাদ্ধটা সমাবোহ বটে, কিন্তু উৎসব নয়। উৎসব হইলেই বা ক্ষতি কী ? বুকে শোক থাকিলে মানুষ কি উৎসব কবিতে পারে না ? বিমলের নালিশ কীসেব ? কিন্তু কথাটা নিয়া সে ঘাঁটাঘাঁটি করিল না।

বলিল, তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি দাদা।

আমার জন্য ? কী জিনিস ?

শান্তার একটা স্মৃতিচিহ্ন।

চাইনে।

চাইনে কেন ? কী চিহ্ন আর তোমায় আমি দিতে পাবব—একটু চুলেব জটা। চুলে তো হাত দিত না, সব জট বেঁধেছিল। একটা জট বোধ হয় খোলেনি, কাঁচি দিয়ে কেটে ।। সকালে গিয়েই দেখি ওর ড্রেসিং টেবিলে আয়নায় টিপায গোঁজা আছে। খুলে নিয়ে এলাম।

বিমল বলিল, তোর কাছেই থাক।

প্রমীলার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে আশা করিতেছিল শান্তাব স্মৃতিচিহ্নের জন্য বিমল লুব্ধ হইয়া উঠিবে। চুলের জটা দেহের অংশ, অস্পষ্ট সুবাসের স্মৃতি নিয়া বহুকাল অবিকৃত থাকিবে। এর চেয়ে দামি স্মৃতিচিহ্ন আর কী হইতে পাবে ? বিমলের নিস্পৃহ প্রত্যাখ্যান প্রমীলা বুঝিতে পারিল না। সন্দিগ্ধভাবে বলিল, বাইরের স্মৃতিচিহ্নের মান নেই বুঝি তোমার কাছে ?

বিমল রাগ করিয়া বলিল, কী যে বলিস তুই। কবি হলেও আমাব কবিত্বের সীমা আছে।

তবে নেবে না কেন ? দয়া কবে নাও দাদা। জটাটা আমার অসহ্য হয়েছে। সকাল থেকে আঁচলে বেঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছি, কেবলই মনে হয়েছে কে যেন আমার আঁচল ধরে টানছে। এটা নিয়ে আমায় রেহাই দাও।

বিমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না। আমার কাছে উপযুক্ত মর্যাদা পাবে না।

প্রমীলা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, সে ভয় কোরো না দাদা। শান্তা এখন বেঁচে নেই, ওর স্মৃতিচিহ্নের যোগ্য মর্যাদা তুমি দেবে। কথাটায় আঘাত ছিল। নীরবে তাহা সহ্য কবিয়া বোনকে বিমল ক্ষমা করিল।

সে হয় না মিলি। আমার কাছে শান্তার যে স্মৃতিচিহ্ন আছে, তার কাছে আর সব স্মৃতিচিহ্ন তুচ্ছ হয়ে যাবে। আমি হয়তো ওটা হারিয়েই ফেলব।

প্রমীলা ব্যগ্র হইয়া বলিল, তোমার কাছে কী আছে দাদা ? দেখাও।

থাক। দেখে কাজ নেই। ভয় পাবি।

ভয় পাব ? স্মৃতিচিহ্ন দেখে ভয় পাব ? তুমি পাগল নাকি ?

বিমল একটু ভাবিল। তারপর বলিল, আচ্ছা, দ্যাখ তবে ?

বলিয়া বিছানার বালিশটা সে তুলিয়া নিল। তলে শান্তার রক্তমাখা ব্যান্ডেজ। চাপচাপ রক্ত কালো হইয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। উঁচু করিয়া ধরিয়া বিমল বলিল, এর কাছে তোর চুলের জটা ?

প্রমীলা দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া বলিল, ঢেকে দাও—ঢেকে দাও। আমি চাই না দেখতে ! ব্যান্ডেজটা বিমল বালিশের তলে চাপা দিল। বলিল, চোখ খোল।

চোখ খুলিয়া প্রমীলা পলকহীন দৃষ্টিতে বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দাদার কপালটা যেন বেশি চওড়া হইয়া গিয়াছে। মুখে কতগুলি রেখা দেখা দিয়াছে, আগে যার অস্তিত্ব ছিল না।

রুদ্ধশ্বাসে সে বলিল, কোথায় পেলে ?

চুরি করেছি—ডাকাতিও বলতে পারিস। শান্তাকে তখন বাইরে এনেছে। কারা যেন কপালে সিঁদুর লেপছিল। সোজা গিয়ে ব্যান্ডেজটা খুলে আনলাম সকলে হাঁ করে আমার কীর্তি দেখল।

প্রমীলা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে কাঁদিয়া বলিল, তোমার জন্য আমার ভয় করছে দাদা !

বিমল বলিল, ভয় কী ?

অধর আসে যায়, প্রমথের সঙ্গে দাবা খেলে, সাধারণ লোকের মতো কথা সাধারণভাবে বলে, শ্রান্ত অপরাধী মানুষের মতো মাথা নিচু করিয়া থাকে। গম্ভীর লোকটার ভিতরটা যেন একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, তার সহজ কথাবার্তা ওই স্তব্ধতার কল্যাণে যেন অসাধারণ হইয়া ওঠে। মনে হয় একটা অজানা সুর বাক্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, একটা অতিরিক্ত গভীর অর্থ অন্তরালে গোপন থাকিতে শুরু করিয়াছে।

তার যেন গোপন বৈরাগ্য। রাগ নাই, হিংসা নাই, শত্রু নাই, সকল মানুষ তাহার আত্মীয়, নিজের জীবনকে সে সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছে। যার এক হাত আজ তার বুকে ছুরি মারিবে, তার অন্য হাতে নিজের প্রাণকে সে সঁপিয়া দিবে। সে কারও ভালোবাসা চাহিবে না, কিন্তু সকলকে ভালোবাসিবে।

প্রমীলা মুগ্ধ হইয়া গেল। তার নিজের অবস্থা শোচনীয়, এক অদ্ভুত মানুষের অদ্ভুত খেয়াল তাকে শেষ করিয়া দিয়াছে, স্বামী থাকিতে সে কুমারী। দিন কাটিলে তার রাত কাটিতে চায় না, একটা নিষ্ঠুর ভোঁতা অশান্তি জীবনের স্বাদ নষ্ট করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তিক্ত ও বিস্বাদ করিয়া দিতে পারে নাই। কঠিন অসুখে যেমন জীবনও থাকে না, মরণও থাকে না, একটা অকথ্য অবস্থায় দিন কাটিতে থাকে, প্রমীলার অবস্থাও অনেকটা সেই রকম। তবু শান্তা যে দুটি মানুষকে ভাঙিয়া দিয়া গিয়াছে, তাদের একটু সুস্থ করিয়া তোলার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। পরের জীবনে মাধুর্য সঞ্চারিত করার শিক্ষা তাহার আদিম দিনের, মানুষের উপর শ্রদ্ধা নষ্ট হওয়ার সঙ্গে নিজেকে সে এ শিক্ষা ভুলিতে দিল না !

বিমল ও অধরের কাছে নিজেকে সে দুঃখের দিনের বান্ধবী করিয়া রাখিল।

বিমল মাঝে মাঝে আপত্তি করে। বলে, ও লোকটার সঙ্গে তোর অত মেশার দরকার কী ?

ও আমার কী করবে ? যে রকম মনে করতাম, সে রকম নয় দাদা—লোকটা ভালো।

তুই তো খুব মানুষ চিনিস।

যাই হোক, বিমল আপত্তি করে, কিন্তু বাধা দেয় না। নিজে সে অধরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে।

এমনিভাবে শরৎকালটা কাটিয়া গেল। শীতের প্রথমে নগেন ফিরিয়া আসিল। বিমল খবর পাইল লাবণ্যের কাছে।

সে নিজেই লাবণ্যের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল।

লাবণ্য টেনিস খেলিতেছিল, খেলা ফেলিয়া আসিয়া বিমলকে ড্রয়িং রুমে বসাইল। বলিল, কবিরা যেমন না বলে যায়, তেমনি না বলে আসে। ব্যাপার কী ?

নগেনটা রাসকেল।

জানি।

ছ মাস খেলা করে মেয়েদের ভুলে যাওয়া ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

তাও জানি। তুমি আমাকে সাবধান করে দিতে এসেছ ?

হ্যাঁ।

আমার জন্য তোমার ভাবনা হয় ?

হয়।

ভাবনা হয়, কিন্তু ভালোবাসা হয় না। লাবণ্যর মতো মেয়ের কাছেও তুমি একটি রহস্য হয়ে রইলে বাবু।

লাবণ্য একটু হাসিল, কিন্তু আমার জন্য ভাবনা নেই। তোমার নগেন আমার কিছু করতে পারবে না।

তুমি ওকে জান না লাবণ্য।

জানি। খুব ভালো করে জানি। ওর ঢের টাকা। লাবণ্য হাসিতে লাগিল।

বিমল আরও গম্ভীর হইয়া বলিল, সেদিক দিয়ে তোমায় ঠকাবে না। নিজেই হাজার দুই দেবে—আদায় করতে পারলে আর কিছু বেশি হতে পারে।

লাবণ্যর মুখ লাল হইয়া গেল।

আমার দাম দু হাজার টাকা।

নগেন ওই রকম দাম দেবে। ভালোবাসাটুকু ফাউ !

নগেন নিজেকে দেবে। ওর জীবনে আমি শেষ বৈচিত্র্য ?

বিমল সংক্ষেপে বলিল, ভালোই।

আমি খারাপ মেয়ে, না বিমল ?

বিমল বলিল, না। তুমি একটু দুষ্টু আর বুদ্ধিমতী।

লাবণ্য আস্তে আস্তে বলিল, প্রমীলার কথা আমি জানি। কিন্তু আমার সঙ্গে লখনৌ না গেলে নগেন বিভার সঙ্গে দার্জিলিং যেত। বিভাটা বোকা, ছ মাস পরে আর কার সঙ্গে নগেন কোথায় যেত কে জানে ! আমি এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছি। অনেকগুলি মেয়েকে বাঁচাচ্ছি, নিজের জীবনযাত্রাকে সহজ করছি। বিমল চিন্তিত হইয়া বাড়ি ফিরিল।

অগ্রহায়ণের প্রথমে প্রমথ অসুখে পড়িল। পনেরো দিন পরে সে ভালো হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সংসারে সমস্ত কাজের উপর রোগীর সেবা করাটা প্রমীলার সহিল না। প্রমথ উঠিয়া দাঁড়াইতে সে বিছানা নিল।

কিছুদিন হইতে ছেলেমেয়েদের উপর প্রমথের আশ্চর্য টান দেখা যাইতেছিল, প্রমীলার অসুখের কদিন তার এই পরিবর্তন অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সেবা সে করিতে জানে না, কিন্তু অপটু

হাতে চেষ্টার ত্রুটি রাখিল না। দুর্বল শরীর নিয়া দিবারাত্রি মেয়ের শিয়রে বসিয়া কাটাইতে আরম্ভ করিল। স্নেহপ্রবণ দুর্বল প্রকৃতির মানুষের মতো মেয়ের অসুখের সামান্য বাড়াবাড়িতেই নার্ভাস হইয়া পড়িতে লাগিল।

বাবার একটু অনুপস্থিতির সুযোগে বিমলকে ডাকিয়া প্রমীলা বলিল, বাবার হয়েছে কী ?

কিছুই হয়নি। কারও কারও হৃদয়টা চাপা থাকে, বাবারও তাই ছিল। চাপাটা আস্তে আস্তে সরে গেছে।

প্রমীলা বলিল, বাবার শরীর মন দুর্বল হয়ে পড়েছে। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, বাবা বোধ হয় বেশি দিন বাঁচবে না দাদা। মরবার আগে এমনি বদলে যায়।

আবোল-তাবোল কথা না ভাবলে কি তোর দিন যায় না ?

প্রমীলার অসুখের সময় একটা ঠাকুর আসিয়াছিল, সে ভালো হইয়া উঠিবার পরেও ঠাকুর রহিয়া গেল।

অত তুই পারবি না মিলি। ঠাকুর থাক।

চলবে কী করে বাবা ?

যাবে যাবে—এক রকম করে চলে যাবে। বিয়ের পর তুই শ্বশুরবাড়ি গেলে চলবে কী করে ?

কিন্তু ঠাকুর রাখা চলিল না। ঠিকা ঝির পরিবর্তে দিনরাত্রির একটা চাকর আনিয়া প্রমথ ঠাকুরের অভাবটা পোষাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। রান্নাঘরে আগুনের কাছে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে বলিল, শীতকালটা—গরম পড়লে ঠাকুর রাখবই। তদ্দিনে বিমলেরও একটা চাকরি-বাকরি হবে।

খানিক তামাক টানিয়া—

ও কী বলে রে ?

কে ? দাদা ? কী বলবে ?

না, তাই বলছি। চিন্তিতভাবে আরও খানিক তামাক টানিয়া—আচ্ছা, তোর কী মনে হয়, বল তো। বিয়ে দিলে শুধরে যাবে ?

কে ? দাদা ? না, এখন দাদাকে বিয়ের কথা বোলো না। চাকরির চেষ্টা করছে। চাকরি হোক, কিছুদিন চাকরি-বাকরি করুক—তখন আপনা থেকেই সংসার করার ইচ্ছা হবে।

এখন ইচ্ছে নেই ?

না।

প্রমথ তামাক টানিতে আরম্ভ করিল।

কোনোদিন মরে টরে যাব, তাই ভাবছিলাম—

প্রমীলা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল এবং তার মন কেমন করিতে লাগিল। প্রমথ কয়দিন দাড়িগোঁফ কামায় নাই, ডিবরির গাঢ় অনুজ্জ্বল আলোয় তার মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

রান্নাঘরে উনানের কাছে কাঠের পিঁড়িটা সন্ধ্যার পর প্রমথের আশ্রয় হইয়া দাঁড়াইল। সকালে রোদে মাদুর পাতিয়া বসিয়া সে পাঁচুকে পড়ায়, ছোটোমেয়েটাকে পাশে বসাইয়া রাখে, সেদিনের নবাগত শিশুটি তার কোলে হাত-পা নাড়িয়া খেলা করে। বিমলের সঙ্গে সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়া পরামর্শের তার অন্ত নাই।

বড়ো ব্যাপার নিয়াও পরামর্শ হয়।

প্রমীলার বিবাহ একটা বড়ো ব্যাপার।

অধব প্রস্তাব করিল বৈশাখে।

এবং দুদিনের মধ্যে দিনক্ষণ পর্যন্ত স্থির হইয়া গেল। অনুবূপা এবং বিমল দুজনেব সঙ্গেই প্রমথ অনেক পরামর্শ কবিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মত বজায় রাখিল নিজেব।

অনুবূপা আপত্তির কিছু দেখিতে পাইল না, স্বামীর কথাতেই আগাগোড়া সায় দিয়া গেল। যুক্তির অভাবে বিমলেব প্রবল প্রতিবাদ টিকিল না।

কী যুক্তি সে দিবে ? অবস্থা তাহাদেব এমন নয় যে, রাজপুত্র কেনা চলিবে। মেয়ে তাহাদের এমন নয় যে, বাজপুত্র ছাড়া আব কারও সঙ্গে মানাইবে না। অধবের বয়স বেশি নয়, চবিত্র খারাপ নয়, চেহারা কদর্য নয়। সে ভালো চাকরি করে, তাব বংশমর্যাদা আছে। তার সম্বন্ধে কোনো কথাই অজানা নাই, সুতরাং মেয়ের ভাগ্য সম্বন্ধে অনিশ্চিত আশা ও আশঙ্কাব দোলায় দুলিতে হইবে না। শাশুড়ি-ননদের বালাই নাই, বিবাহেব পরেই মেয়ে নিজেব সংসারে স্বাধীন হইয়া থাকিবে। অধব যে প্রমীলাকে পছন্দ করিযাছে, এটা নিছক সৌভাগ্য ছাড়া আব কিছুই নয়।

বিমল কী বলিবে ? অধবের সঙ্গে কেন পৃথিবীব সেরা পাত্রেব সঙ্গেও যে প্রমীলার বিবাহ হইতে পাবে না, তার কাবণটা খুলিয়া বলার উপায় নাই, বলিলেও লাভ নাই। এরা বুঝিবে না, শুধু চমকাইয়া উঠিবে, শুধু বিচার কবিবে, শুধু যন্ত্রণা সহিবে। নগেনেব লোভ দেখাইয়া অধরকে বাতিল কবিবার পথ নাই--নগেন ও লাবণ্যেব বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র প্রমথেব নামেই আসিয়াছে।

এ বিয়ে হয় না বাবা, কিছুতেই হয় না, জোব করিয়া এ কথা বলা ভিন্ন বিমলের কিছুই করিবার নাই।

কিছুই সে কবিতে পাবিল না। শুধু বলিল, তাড়াতাড়ি কোনো কথা দেবেন না বাবা। ভেবে দেখতে দিন।

ভাববার কী আছে ? তুই বড়ো খুঁতখুঁতে বিমল। বউটা আত্মহত্যা করেছিল বটে, কিন্তু তাতে ওব কী দোষ ?

শান্তাব কথা বিমল উল্লেখ কবে নাই ! সে নীববে নিজেব ঘরে চলিয়া গেল। ঘরে জড়োসড়ো হইযা প্রমীলা বসিযাছিল। তাব সমস্ত দেহটা যেন একটা কবুণ জিজ্ঞাসায় পবিণত হইযা গিয়াছে।

গায়ের গেঞ্জিটা বিমল টানিয়া খুলিয়া ফেলিল। শান্তাব ঘরের দিকের জানালাটা বিমল আর খোলে নাই, অস্থিরভাবে সেই পর্যন্ত সে একটা পাক দিযা আসিল। সে দারুণ উত্তেজিত হইযা উঠিয়াছে।

তুই কিছু নোস মিলি--তুই শুধু উপলক্ষ। অধব আমাকে শাস্তি দিচ্ছে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, ও ভোলেনি। আমাদেব মধ্যে মারা গেলি। আমাকে কষ্ট দেবার জন্য শান্তার মতো তোকে ও একটু একটু করে ভাঙবে।

প্রমীলা পাংশু মুখে বলিল, বাবা শুনল না ?

কেন শুনবে ? বাবা কী জানে ! তোর ভালোর জন্য বাবা তোকে হাসিমুখে ওর জাঁতিকলের মধ্যে ফেলে দেবে। বাবা কী জানে, বাবাব কী দোষ ?

প্রমীলা সভয়ে বলিল, তবে কী হবে ?

তাই ভাবছি।

দুজনে বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল।

শেষে প্রমীলা উঠিল। বলিল, যাই, বাবার অফিসের বেলা হল। ভয়ানক কিছু কোরো না দাদা।

না। কিন্তু তুই ভাবিসনে মিলি। অধরকে এবার আমি জিততে দেব না। বুঝলি, ভাবিসনে।

প্রমীলা চলিয়া যাইতেছিল, কথা বলার জন্য একটু দাঁড়াইল।

আমি আর ভাবি না দাদা। আমার ভাবনার শক্তি নেই।

তুই কী হাল ছেড়ে দিলি না কি ?

হাল আবার কবে ধরলাম যে ছেড়ে দেব ?

বিমল ঠোঁট কামড়াইল। তার আশ্বাসে প্রমীলা বিশ্বাস করে নাই, নিজের অদৃষ্টকে ও চিনিয়াছে। ওর বিপদকে কেহ ঠেকাইতে পারে, এ কথা ও আর ধারণা করিতে পারে না।

বিমল গেঞ্জি পরিল, জামা গায়ে দিল। বিছানার তলা খুঁজিয়া ছ আনা পয়সা পকেটে নিল। তারপর নীচে নামিয়া গেল।

খাওয়ার পর প্রমথ আঁচাইতেছিল। বলিল, শোন বিমল, শুনে যা।

বিমল দাঁড়াইল।

তুই অমত করছিস কেন ? মেয়েটা কাছাকাছি থাকবে, যখনতখন আসতে পাববে—দূরে বিয়ে হওয়া কি ভালো ! বুঝিস না ?

বিমল বলিল, তাতে কী ?

প্রমথ আশ্চর্য হইয়া বলিল, সর্বদা আসা-যাওয়া করতে পারবে, এটা তুই ভালো বলিস না ! কীরকম সব খেয়াল তোর কিছু বুঝি না বাপু।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সদাগরি আপিস, মাসিকের আপিস, খবরের কাগজের আপিস কোথাও ঘুরিতে বিমল বাকি রাখিল না। শেষে রাত্রি নটার সময় একটা দৈনিকের আপিসে প্রুফ দেখার কাজ জোগাড় করিয়া বাড়ি ফিরিল। মাহিনা সাতাশ টাকা।

দরজা খুলিল প্রমথ। একটু ভীতস্বরে বলিল, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই সারাদিন কোথায় ছিলি ?

এমনি ঘুরছিলাম।

প্রমথ ইতস্তত করিয়া বলিল, অধরকে পাকা কথা দিয়ে দিলাম।

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

তোর মতঅমত কোনো কিছুই বললি না। কিছু একটা হয়েছে বুঝতে পারছি—কিন্তু যাই হোক, তাতে বিয়ে আটকাবে কেন ?

বিমল সারা বাড়ি প্রমীলাকে খুঁজিল। রান্নাঘরে ভাত-তরকারি ঢাকা রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে প্রমীলা নাই। সব ঘরগুলিতে একবার করিয়া উঁকি মারিয়া সে ছাদে গেল।

চিলকুঠির গাঢ় অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সে চাহিয়া দেখিল, সমস্ত ছাদটা একবার চক্র দিয়া আসিয়া উঠানের দিকে আলিসার উপর ঝুঁকিয়া প্রমীলা কয়েক মুহূর্ত নীচের অন্ধকারের গভীরতা মাপিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং ছিটকাইয়া ছাদের মাঝখানে সরিয়া আসিতেছে।

সেখানে দাঁড়াইয়া কী যেন সে ভাবিল। হঠাৎ সোজা আগাইয়া গিয়া আলিসার উপর উঠিবার চেষ্টা করিল।

বিমল আগাইয়া গেল। শক্ত করিয়া তার হাত ধরিয়া ছাদের মাঝখানে টানিয়া আনিয়া ভর্ৎসনার সুরে বলিল, এর মানে ?

প্রমীলা জড়ানো গলায় বলিল, প্রলোভন জয় করছিলাম দাদা।

বিমল তার হাত ছাড়িয়া দিল। বলিল, এ'সব প্রলোভনের সঙ্গে খেলা করতে নেই মিলি। হঠাৎ প্রলোভনের জয় হয়ে যায়। আল্লসের ওপরে উঠে দাঁড়ালে মানুষের মাথা ঘুরে যায়, শেষে কোনদিকে জয়, কোনদিকে পরাজয় খেয়াল থাকে না।

প্রমীলা অস্পষ্টভাবে বলিল, সেই তো ভালো দাদা। আত্মহত্যার পাপ হয় না।

জীবনের জটিলতা পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

কে বললে হয় না ? তোর মতো মনের অবস্থা নিয়ে আলসেয় উঠে দাঁড়ালে আত্মহত্যার পাপ হয়।

প্রমীলা তর্ক করিল।

কিন্তু সে রকম কোনো ইচ্ছা না নিয়ে যদি উঠি ? অনিচ্ছায় মাথা ঘুরে যদি উঠোনে পড়ে যাই ?

তাতে বেশি পাপ হয়। আত্মপ্রবঞ্চনার পাপ হয়। নে, নীচে চল।

প্রমীলা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, চলো।

দোতলায় নামিয়া বিমল বলিল, তুই যদি বলিস তবে আর ছাদের দরজায় তালা দিই না।

থাক।

আয় আমার ঘরে। খেয়েছিস ?

না।

খেয়ে কাজ নেই। অসুখ করবে।

ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া বিমল দেখিল, প্রমীলার হাঁটু ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে।

নে, শুয়ে পড়।

প্রমীলার চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল, বলা মাত্র বিছানায় উঠিয়া শান্তভাবে শুইয়া পড়িল।

বিমল বলিল, শোন, তোর কোনো ভয় নেই। আমি তোর সব ভার নিলাম।

সব ভার নিলে ?

হ্যাঁ। শান্ত হয়ে ঘুমো।

প্রমীলা চোখ খুলিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আমাদের এমন হল কেন দাদা ? তোমার আর আমার ?

এ রকম হয়।

বিমল বাইরে চলিয়া গেল। এক গ্লাস জল আনিয়া প্রমীলার শিয়রে রাখিতে গিয়া দেখিল ইতিমধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

তারপর অনেক রাত্রে বিমল একবার ঘরে গেল। বালিশের তলা হইতে ব্যান্ডেজটা বাহির করিয়া নিল। এটা রাখিলে চলিবে না। তার অনেক কাজ।

প্রমীলা পাশ ফিরিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, কী দাদা ?

কিছু না। ঘুমো।

নীচে গিয়া উঠানের একপাশে ব্যান্ডেজটা বিমল পুড়াইয়া আসিল। বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া সে শুইয়া পড়িল।

জীবনের জটিলতা পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

প্রাগৈতিহাসিক

প্রাগৈতিহাসিক

সমস্ত বর্ষাকালটা ভিখু ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছে। আষাঢ় মাসের প্রথম বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করিতে গিয়া তাহাদের দলকে দল ধরা পড়িয়া যায়। এগারো জনের মধ্যে কেবল ভিখুই কাঁধে একটা বর্শার খোঁচা খাইয়া পলাইতে পারিয়াছিল। রাতারাতি দশ মাইল দূরের মাথা-ভাঙা পুলটার নীচে পৌঁছিয়া অর্ধেকটা শরীর কাদায় ডুবাইয়া শরবনের মধ্যে দিনের বেলাটা লুকাইয়া ছিল। রাত্রে আরও ন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একেবারে পেহ্লাদ বাগদির বাড়ি চিতনপুরে।

পেহ্লাদ তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই।

কাঁধটা দেখাইয়া বলিয়াছিল, ঘাওখান সহজ লয় স্যাঙাত। উটি পাকবো। গা ফুলবো। জানাজানি হইয়া গেলে আমি কনে যামু ? খুনটো যদি না করতিস—

তরেই খুন করতে মন লইতেছে পেহ্লাদ।

এই জন্মে লা, স্যাঙাত।

বন কাছেই ছিল, মাইল পাঁচেক উত্তরে। ভিখু অগত্যা বনেই আশ্রয় লইল। পেহ্লাদ নিজে বাঁশ কাটিয়া বনের একটা দুর্গম অংশে সিন্‌জুরি গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে তাহাকে একটা মাচা বাঁধিয়া দিল। তালপাতা দিয়া একটা আচ্ছাদনও করিয়া দিল। বলিল, বাদলায় বাঘ-টাঘ সব পাহাড়ের উপরে গেছেগা। সাপে যদি না কাটে তো আরাম কইরাই থাকবি ভিখু।

খামু কী ?

চিড়াগুড় দিলাম যে? দুদিন বাদে বাদে ভাত লইয়া আসুম। রোজ আইলে মাইনষে সন্দ করব।

কাঁধের ঘা-টা লতাপাতা দিয়া বাঁধিয়া আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া পেহ্লাদ চলিয়া গেল। রাত্রে ভিখুর জ্বর আসিল। পরদিন টের পাওয়া গেল পেহ্লাদের কথাই ঠিক, কাঁধের ঘা ভিখুর দুলাইয়া উঠিয়াছে। ডান হাতটি ফুলিয়া ঢোল হইয়া গিয়াছে এবং হাতটি তাহার নাড়িবার সামর্থ্য নাই।

বর্ষাকালে যে বনে বাঘ বাস করিতে চায় না এমনি অবস্থায় সেই বনে জলে ভিজিয়া মশা ও পোকার উৎপাত সহিয়া, দেহের কোনো না কোনো অংশ হইতে ঘণ্টায় একটি করিয়া জোঁক টানিয়া ছাড়াইয়া জ্বরে ও ঘায়ের ব্যথায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে ভিখু দুদিন দুরাত্রি সংকীর্ণ মাচাটুকুর উপর কাটাইয়া দিল। বৃষ্টির সময় ছাঁট লাগিয়া সে ভিজিয়া গেল, রোদের সময় ভ্যাপসা গাঢ় গুমোটে সে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া শ্বাস টানিল, পোকার অত্যাচারে দিবারাত্রি তাহার এক মুহূর্তের স্বস্তি রহিল না। পেহ্লাদ কয়েকটা বিড়ি দিয়া গিয়াছিল সেগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে। তিন-চারদিনের মতো চিড়া আছে বটে কিন্তু গুড় একটুও নাই। গুড় ফুরাইয়াছে, কিন্তু গুড়ের লোভে যে লাল পিঁপড়াগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়াছিল তাহারা এখনও মাচার উপরে ভিড় করিয়া আছে। ওদের হতাশার জ্বালা ভিখুই অবিরত ভোগ করিতেছে সর্বাঙ্গে।

মনে মনে পেহ্লাদের মৃত্যু কামনা করিতে করিতে ভিখু তবু বাঁচিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল। যেদিন পেহ্লাদের আসিবার কথা সেদিন সকালে কলসির জলটাও তাহার ফুরাইয়া গেল। বিকাল পর্যন্ত পেহ্লাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া তৃষ্ণার পীড়ন আর সহিতে না পারিয়া কলসিটা লইয়া সে যে কত কষ্টে খানিক দূরের নালা হইতে আধ কলসি জল ভরিয়া আনিয়া আবার মাচায় উঠিল তাহার বর্ণনা হয় না। অসহ্য ক্ষুধা পাইলে শুধু চিড়া চিবাইয়া সে পেট ভরাইল। একহাতে ক্রমাগত পোকা ও পিঁপড়াগুলি টিপিয়া মারিল। বিষাক্ত রস শুষিয়া লইবে বলিয়া জোঁক ধরিয়া নিজেই ঘায়ের চারিদিকে লাগাইয়া দিল। সবুজ রঙের একটা সাপকে একবার মাথার কাছে সিন্‌জুরি গাছের পাতার ফাঁকে উঁকি দিতে দেখিয়া পুরা দু ঘণ্টা লাঠি হাতে সেদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল এবং তাহার পর

দু-একঘণ্টা অন্তরই চারিদিকের ঝোপে ঝপাঝপ লাঠির বাড়ি দিয়া মুখে যথাসাধ্য শব্দ করিয়া সাপ তাড়াইতে লাগিল।

মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায়, মানুষ সে, বাঁচিবেই।

পেহ্লাদ গ্রামান্তরে কুটুম বাড়ি গিয়াছিল। পরদিনও সে আসিল না। কুটুমবাড়ির বিবাহোৎসবে তাড়ি টানিয়া বেহুঁস হইয়া পড়িয়া রহিল। বনের মধ্যে ভিখু কী ভাবে দিনরাত্রি কাটাইতেছে তিন দিনের মধ্যে সে কথা একবার তাহার মনেও পড়িল না।

ইতিমধ্যে ভিখুর ঘা পচিয়া উঠিয়া লালচে রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। শরীরও তাহার অল্প অল্প ফুলিয়াছে। জ্বরটা একটু কমিয়াছে বটে কিন্তু সর্বাঙ্গের অসহ্য বেদনা দম ছুটানো তাড়ির নেশার মতোই ভিখুকে আচ্ছন্ন, অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সে আর এখন ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করিতে পারে না। জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া শুষিয়া কচি পটোলের মতো ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই নীচে খসিয়া পড়িয়া যায়, সে টেরও পায় না। পায়ের ধাক্কায় জলের কলসিটা এক সময় নীচে পড়িয়া ভাঙিয়া যায়, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া পুঁটুলির মধ্যে চিড়াগুলি পচিতে আরম্ভ করে, রাত্রে তাহার ঘায়ের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মাচার পাশে শিয়াল ঘুরিয়া বেড়ায়।

কুটুমবাড়ি হইতে ফিরিয়া বিকালের দিকে ভিখুর খবর লইতে গিয়া ব্যাপার দেখিয়া পেহ্লাদ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। ভিখুর জন্য এক বাটি ভাত ও কয়েকটি পুঁটি মাছ ভাজা আর একটু পুঁই চচ্চড়ি সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিখুর কাছে বসিয়া থাকিয়া ও-গুলি সে নিজেই খাইয়া ফেলিল। তারপর বাড়ি গিয়া বাঁশের একটা ছোটো মই এবং তাহার বোনাই ভরতকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মইয়ে শোয়াইয়া তাহারা দুজনে ভিখুকে বাড়ি লইয়া গেল। ঘরের মাচার উপরে খড় বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল।

আর এমনি শক্ত প্রাণ ভিখুর যে শুধু এই আশ্রয়টুকু পাইয়াই বিনা চিকিৎসায় ও একরকম বিনা যত্নেই একমাস মুমূর্ষু অবস্থায় কাটাইয়া সে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত মরণকে জয় করিয়া ফেলিল। কিন্তু ডান হাতটি তাহার আর ভালো হইল না। গাছের মরা ডালের মতো শুকাইয়া গিয়া অবশ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। প্রথমে অতি কষ্টে হাতটা সে একটু নাড়িতে পারিত কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ক্ষমতাটুকুও তাহার নষ্ট হইয়া গেল।

কাঁধের ঘা শুকাইয়া আসিবার পর বাড়িতে বাহিরের লোক কেহ উপস্থিত না থাকিলে ভিখু তাহার একটি মাত্র হাতের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে বাঁশের মই বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল এবং একদিন সন্ধ্যার সময় এক কাণ্ড করিয়া বসিল।

পেহ্লাদ সে সময় বাড়ি ছিল না, ভরতের সঙ্গে তাড়ি গিলিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। পেহ্লাদের বোন গিয়াছিল ঘাটে। পেহ্লাদের বউ ছেলেকে ঘরে শোয়াইতে আসিয়া ভিখুর চাহনি দেখিয়া তাড়াতাড়ি পালাইয়া যাইতেছিল, ভিখু তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু পেহ্লাদের বউ বাগদির মেয়ে। দুর্বল শরীরে বাঁ হাতে তাহাকে আয়ত্ত করা সহজ নয়। এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া সে গাল দিতে দিতে চলিয়া গেল। পেহ্লাদ বাড়ি ফিরিলে সব বলিয়া দিল।

তাড়ির নেশায় পেহ্লাদের মনে হইল, এমন নেমকহারাম মানুষটাকে একেবারে খুন করিয়া ফেলাই কর্তব্য। হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটা বউয়ের পিঠে এক ঘা বসাইয়া দিয়া ভিখুর মাথা ফাটাইতে গিয়া নেশার মধ্যেও কিন্তু টের পাইতে তাহার বাকি রহিল না যে কাজটা যত বড়ো কর্তব্যই হোক, সম্ভব একেবারেই নয়। ভিখু তাহার ধারালো দা-টি বাঁ হাতে শক্ত করিয়া বাগাইয়া

ধরিয়া আছে। সুতবাং খুনোখুনিব পবিবর্তে তাহাদেব মধ্যে কিছু অশ্লীল কথার আদান-প্রদান হইয়া গেল।

শেষে পেহ্লাদ বলিল, তোর লাইগ্যা আমার সাত টাকা খরচ গেছে, টাকাটা দে, দিয়া বাইব আমার বাড়ির থেইকা,—দূর হ।

ভিখু বলিল, আমার কোমরে একটা বাজু বাইন্ধা বাখছিলাম, তুই চুরি কবছস। আগে আমাব বাজু ফিরাইয়া দে, তবে যামু।

তোর বাজুর খপর জানে কেডা রে ?

বাজু দে কইলাম পেহ্লাদ, ভালো চাস তো ! বাজু না দিলি সা বাড়ির মেজোকর্তার মতো গলাডা তোর একখান কোপেই দুই ফাঁক কইরা ফেলুম, এই তোরে আমি কইয়া বাখলাম। বাজু পালি আমি অখনি যামু গিয়া। কিন্তু বাজু ভিকু ফেরত পাইল না। তাহাদের বিবাদের মধ্যে ভরত আসিয়া পড়ায় দুজনে মিলিয়া ভিখুকে তাহারা কায়দা কবিয়া ফেলিল। পেহ্লাদের বাহুমূলে একটা কামড় বসাইয়া দেওয়া ছাড়া দুর্বল ও পঙ্গু ভিখু আর বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পাবিল না। পেহ্লাদ ও তাহার বোনাই তাহাকে মাবিতে মারিতে আধমরা কবিয়া ফেলিয়া বাড়িব বাহির করিয়া দিল। ভিখুব শুকাইয়া আসা ঘা ফাটিয়া বক্ত পড়িতেছিল, হাত দিয়া বক্ত মুছিতে মুছিতে ধুঁকিতে ধুঁকিতে সে চলিয়া গেল। রাত্রিব অন্ধকাবে সে কোথায় গেল কেহই তাহা জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু দুপুব বাতে পেহ্লাদের ঘব জ্বলিয়া উঠিয়া বাগদিপাড়ায় বিষম হইচই বাধাইয়া দিল।

পেহ্লাদ কপাল চাপড়াইয়া বলিতে লাগিল, হায় সর্বনাশ, হায় সর্বনাশ ! ঘরকে আমার শনি আইছিলো গো, হায় সর্বনাশ !

কিন্তু পুলিশেব টানাটানির ভয়ে মুখ ফুটিয়া বেচারি ভিখুর নামটা পর্যন্ত কবিতে পাবিল না।

সে রাত্রি হইতে ভিখুর আদিম, অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল। চিতলপুবের পাশে একটা নদী আছে। পেহ্লাদেব ঘরে আগুন দিয়া আসিয়া একটা জেলে-ডিঙি চুবি কবিয়া ভিখু নদীব স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। লগি ঠেলিবাব সামর্থ্য তাহাব ছিল না, একটা সাপটা বাঁশকে হালেব মতো করিয়া ধরিয়া রাখিয়া সে সমস্ত বাত কোনো রকমে নৌকার মুখ সিধা বাখিয়াছিল। সকাল হওয়ার আগে শুধু স্রোতেব টানে সে বেশি দূর আগাইতে পাবে নাই।

ভিখুর মনে আশঙ্কা ছিল ঘবে আগুন দেওয়ার শোধ লইতে পেহ্লাদ হয়তো তাহার নামটা প্রকাশ করিয়া দিবে, মনেব জ্বালায় নিজেব অসুবিধাব কথাটা ভাবিবে না। পুলিশ বহুদিন যাবৎ তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, বৈকুণ্ঠ সাহার বাড়িতে খুনটা হওয়ার ফলে চেষ্টা তাহাদেব বাড়িয়াছে বই কমে নাই। পেহ্লাদের কাছে খবব পাইলে পুলিশ আশেপাশে চাবিদিকেই তাহার খোঁজ কবিবে। বিশ-ত্রিশমাইলেব মধ্যে লোকালয়ে মুখ দেখানো তাহার পক্ষে বিপদেব কথা। কিন্তু ভিখু তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কাল বিকাল হইতে সে কিছু খায় নাই। দুজন জোয়ান মানুষের হাতে বেদম মার খাইয়া এখনও দুর্বল শরীরটা তাহার ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া আছে। ভোর ভোর মহকুমা শহরের ঘাটের সামনে পৌঁছিয়া সে ঘাটে নৌকা লাগাইল। নদীর জলে ডুবিয়া ডুবিয়া স্নান করিয়া গায়ের রক্তের চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া শহরের ভিতরে প্রবেশ করিল। ক্ষুধায় সে চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল। একটি পয়সাও তাহার সঙ্গে নাই যে মুড়ি কিনিয়া খায়। বাজারেব রাস্তায় প্রথম যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হইল তাহারই সামনে হাত পাতিয়া সে বলিল, দুটো পয়সা দিবান কর্তা ?

তাহার মাথার জটবাঁধা চাপ চাপ রুক্ষ ধূসর চুল, কোমরে জড়ানো মাটির মতো ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া আর দড়ির মতো শীর্ণ দোদুল্যমান হাতটি দেখিয়া ভদ্রলোকটির বুঝি দয়াই হইল। তিনি তাহাকে একটি পয়সা দান করিলেন।

ভিখু বলিল—একটা দিলেন বাবু ? আর একটা দেন।

ভদ্রলোক চটিয়া বলিলেন—একটা দিলাম, তাতে হল না,—ভাগ্ !

এক মুহূর্তের জন্য মনে হইল ভিখু বুঝি তাহাকে একটা বিশ্রী গালই দিয়া বসে। কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিল। গাল দেওয়াব বদলে আরক্ত চোখে তাহার দিকে একবার কটমট করিয়া তাকাইয়া সামনের মুড়ি মুড়কির দোকানে গিয়া পয়সাটা দিয়া মুড়ি কিনিয়া গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ কবিল।

সেই হইল তাহার ভিক্ষা করিবার হাতেখড়ি।

কয়েক দিনেব ভিতরেই সে পৃথিবীর বহু পুরাতন ব্যাবসাটির এই প্রকাশ্যতম বিভাগের আইন কানুন সব শিখিয়া ফেলিল। আবেদনের ভঙ্গি ও ভাষা তাহার জন্ম ভিখারির মতো আয়ত্ত হইয়া গেল। শরীর এখন আর সে একেবারেই সাফ করে না, মাথার চুল তাহার ক্রমেই জট বাঁধিয়া বাঁধিয়া দলা দলা হইয়া যায় এবং তাহাতে অনেকগুলি উকুন-পরিবার দিনের পর দিন বংশবৃদ্ধি করিয়া চলে। ভিখু মাঝে মাঝে খ্যাপার মতো দুই হাতে মাথা চুলকায় কিন্তু বাড়তি চুল কাটিয়া ফেলিতে ভরসা পায় না। ভিক্ষা করিয়া সে একটি ছেঁড়া কোট পাইয়াছে, কাঁধের ক্ষতচিহ্নটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য দারুণ গুমোটের সময়েও কোটটা সে গায়ে চাপাইয়া রাখে। শুকনো হাতখানা তাহার ব্যাবসার সব চেয়ে জোরালো বিজ্ঞাপন, এই অঙ্গটি ঢাকিয়া রাখিলে তাহার চলে না। কোটের ডানদিকের হাতাটি সে তাই বগলের কাছ হইতে ছিঁড়িয়া বাদ দিয়াছে। একটি টিনের মগ ও একটা লাঠিও সে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারেব কাছে বাস্তার ধারে একটা তেঁতুলগাছের নীচে বসিয়া সে ভিক্ষা করে। সকালে এক পয়সার মুড়ি খাইয়া নেয়, দুপুরে বাজারের খানিক তফাতে একটা পোড়ো বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া বটগাছের নীচে ইটের উনুনে মেটে হাঁড়িতে ভাত রান্না করে, মাটির মালসায় কোনোদিন রাঁধে ছোটো মাছ কোনোদিন তরকারি। পেট ভরিয়া খাইয়া বটগাছটাতেই হেলান দিয়া বসিয়া আরামে বিড়ি টানে। তারপর আবার তেঁতুলগাছটার নীচে গিয়া বসে।

সারাটি দিন শ্বাস টানা শ্বাস টানা। কাতরানিব সঙ্গে সে বলিয়া যায় : হেই বাবা একটা পয়সা · আমায় দিলে ভগবান দিবো : হেই বাবা একটা পয়সা—

অনেক প্রাচীন বুলির মতো, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ শ্লোকটা আসলে অসত্য। সারাদিনে ভিখুব সামনে দিয়া হাজার দেড় হাজার লোক যাতায়াত করে এবং গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনেব মধ্যে একজন তাহাকে পয়সা অথবা আধলা দেয়। আধলার সংখ্যা বেশি হইলে সারাদিনে ভিখুর পাঁচ-ছ আনা রোজগার হয়, কিন্তু সাধারণত তাহার উপার্জন আট আনার কাছাকাছি থাকে। সপ্তাহে এখানে দুদিন হাট বসে। হাটবারের উপার্জন তাহাব একটি পুরা টাকার নীচে নামে না।

এখন বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। নদীর দু তীর কাশে সাদা হইয়া উঠিয়াছে। নদীর কাছেই বিন্নুমাঝির বাড়ির পাশের ভাঙা চালাটা ভিখু মাসিক আট আনায় ভাড়া করিয়াছে। রাত্রে সে ওইখানেই শুইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ায় মৃত এক ব্যক্তির জীর্ণ কিন্তু পুরু একটি কাঁথা সে সংগ্রহ করিয়াছে, লোকের বাড়ির খড়ের গাদা হইতে চুরি করিয়া আনা খড় বিছাইয়া তাহার উপর কাঁথাটি পাতিয়া সে আবাম করিয়া ঘুমায়। মাঝে মাঝে শহরের ভিতরে গৃহস্থবাড়িতে ভিক্ষা করিতে গিয়া সে কয়েকখানা ছেঁড়া কাপড় পাইয়াছে। তাই পুঁটুলি করিয়া বালিশের মতো ব্যবহার করে। রাত্রে নদীর জোলো বাতাসে শীত করিতে থাকিলে পুঁটুলি খুলিয়া একটি কাপড় গায়ে জড়াইয়া লয়।

সুখে থাকিয়া এবং পেট ভরিয়া খাইয়া কিছুদিনের মধ্যে ভিখুর দেহে পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। তাহার ছাতি ফুলিয়া উঠিল, প্রত্যেকটি অঙ্গ সঞ্চালনে হাতের ও পিঠের মাংস-পেশি নাচিয়া উঠিতে লাগিল। অবরুদ্ধ শক্তির উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে তাহার মেজাজ উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া

পড়িল। অভ্যস্ত বুলি আওড়াইয়া কাতরভাবেই সে এখনও ভিক্ষা চায় কিন্তু ভিক্ষা না পাইলে তাহার ক্রোধের সীমা থাকে না। পথে লোকজন না থাকিলে তাহার প্রতি উদাসীন পথিককে সে অশ্লীল গাল দিয়া বসে। এক পয়সার জিনিস কিনিয়া ফাউ না পাইলে দোকানিকে মারিতে উঠে। নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করিতে নামিলে ভিক্ষা চাহিবার ছলে জলের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা ভয় পাইলে সে খুশি হয় এবং সরিয়া যাইতে বলিলে নড়ে না, দাঁত বাহির করিয়া দুর্বিনীত হাসি হাসে।

রাত্রে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে।

নারীসঙ্গ হীন এই নিরুৎসব জীবন আর তাহার ভালো লাগে না। অতীতের উদ্দাম ঘটনা-বহুল জীবনটির জন্য তাহার মন হাহাকার করে।

তাড়ির দোকানে ভাঁড়ে ভাঁড়ে তাড়ি গিলিয়া সে হল্লা করিত, টলিতে টলিতে বাসির ঘরে গিয়া উন্মত্ত রাত্রি যাপন করিত, আর মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া গভীর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ি চড়াও হইয়া সকলকে মারিয়া কাটিয়া টাকা ও গহনা লুটিয়া রাতারাতি উধাও হইয়া যাইত। স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীকে বাঁধিয়া মারিলে তাহার মুখে যে অবর্ণনীয় ভাব দেখা দিত, পুত্রের অঙ্গ হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিলে মা যেমন করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিত, মশালের আলোয় সে দৃশ্য দেখা আর সেই আর্তনাদ শোনার চেয়ে উন্মাদনাকর নেশা জগতে আর কী আছে ? পুলিশের ভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলাইয়া বেড়াইয়া আর বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াও যেন তখন সুখী ছিল। তাহার দলের অনেকেই বারবার ধরা পড়িয়া জেল খাটিয়াছে কিন্তু জীবনে একবারের বেশি পুলিশ তাহার নাগাল পায় নাই। রাখু বাগদির সঙ্গে পাহানার শ্রীপতি বিশ্বাসের বোনটাকে যেবার সে চুরি করিয়াছিল সেইবার সাতবছরের জন্য তাহার কয়েদ হইয়াছিল, কিন্তু দুবছরের বেশি কেহ তাহাকে জেলে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক বর্ষার সন্ধ্যায় জেলের প্রাচীর ডিঙাইয়া সে পলাইয়াছিল। তারপর একা সে গৃহস্থবাড়িতে ঘরের বেড়া কাটিয়া চুরি করিয়াছে, দিনে দুপুরে পুকুরঘাটে একাকিনী গৃহস্থ বধূর মুখ চাপিয়া গলার হার, হাতের বালা খুলিয়া লইয়াছে, রাখুর বউকে সঙ্গে নিয়া নোয়াখালি হইয়া সমুদ্র ডিঙাইয়া পাড়ি দিয়াছে একেবারে হাতিয়ায়। ছমাস পরে রাখুর বউকে হাতিয়ায় ফেলিয়া আসিয়া পর পর তিনবার তিনটা দল করিয়া দূরে দূরে কত গ্রামে যে ডাকাতি করিয়া বেড়াইয়াছে তাহার সবগুলির নামও এখন তাহার স্মরণ নাই। তারপর এই সেদিন বৈকুণ্ঠ সাহার মেজো ভাইটার গলাটা সে দায়ের এক কোপে দু ফাঁক করিয়া দিয়া আসিয়াছে।

কী জীবন তাহার ছিল, এখন কী হইয়াছে !

মানুষ খুন করিতে যাহার ভালো লাগিত, সে আজ ভিক্ষা না দিয়া চলিয়া গেলে পথচারীকে একটু টিটকারি দেওয়ার মধ্যে মনের জ্বালা নিঃশেষ করে। দেহের শক্তি তাহার এখনও তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। সে শক্তি প্রয়োগ করিবার উপায়টাই তাহার নাই। কত দোকানে গভীর রাত্রে সামনে টাকার থোক সাজাইয়া একা বসিয়া দোকানি হিসাব মেলায়, বিদেশগত কত পুরুষের গৃহে মেয়েরা থাকে একা। এদিকে, ধারালো একটা অস্ত্র হাতে ওদের সামনে হুমকি দিয়া পড়িয়া একদিনে বড়োলোক হওয়ার পরিবর্তে বিন্নুমাঝির চালাটার নীচে সে চুপচাপ শুইয়া থাকে।

ডান হাতটাতে অন্ধকারে হাত বুলাইয়া ভিখুর আপশোশের সীমা থাকে না। সংসারের অসংখ্য ভীরু ও দুর্বল নরনারীর মধ্যে এতবড়ো বুকের পাটা আর এমন একটা জোরালো শরীর নিয়া শুধু একটা হাতের অভাবে সে যে মরিয়া আছে। এমন কপালও মানুষের হয় ?

তবু এ দুর্ভাগ্য সে সহ্য করিতে পারে। আপশোশেই নিবৃত্তি। একা ভিখু আর থাকিতে পারে না।

বাজারে ঢুকিবার মুখেই একটি ভিখারিনি ভিক্ষা করিতে বসে। বয়স তাহার বেশি নয়, দেহের বাঁধুনিও বেশ আছে। কিন্তু একটা পায়ে হাঁটুর নীচে হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা।

এই ঘায়ের জোরে সে ভিখুর চেয়ে বেশি রোজগার করে। সে জন্য ঘা-টিকে সে বিশেষ যত্নে সারিতে দেয় না।

ভিখু মধ্যে মধ্যে গিয়া তাহার কাছে বসে। বলে, ঘা-টি সারবো না, লয় ?

ভিখারিনি বলে, খুব ! অসুদ দিলে অখনি সারে।

ভিখু সাগ্রহে বলে, সারা তবে, অসুদ দিয়া চটপট সারাইয়া ল। ঘা-টি সারলে তোর আর ভিক্ মাগতি অইবো না,—জানস্ ? আমি তোরে রাখুম।

আমি থাকলি ত।

ক্যান ? থাকবি না ক্যান ? খাওয়ামু পরামু, আরামে রাখুম, পায়ের পরনি পাটি দিয়া গাঁট হইয়া বইয়া থাকবি। না করস্ তুই বিয়ের লেগে ?

অত সহজে ভুলিবাব মেয়ে ভিখারিনি নয়। খানিকটা তামাকপাতা মুখে গুঁজিয়া সে বলে, দুদিন বাদে মোরে যখন তুই খেদাইয়া দিবি, ঘা-টি মুই তখন পামু কোয়ানে ?

ভিখু আজীবন একনিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করে, সুখে রাখিবার লোভ দেখায়। কিন্তু ভিখারিনি কোনো মতেই রাজি হয় না। ভিখু ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসে।

এদিকে আকাশে চাঁদ ওঠে, নদীতে জোয়াব ভাটা বয়, শীতের আমেজে বায়ুস্তরে মাদকতা দেখা দেয়। ভিখুর চালার পাশে কলাবাগানে চাঁপাকলার কাঁদি শেষ হইয়া আসে। বিন্নুমাঝি কলা বিক্রির পয়সায় বউকে রুপার গোট কিনিয়া দেয়। তালের রসের মধ্যে নেশা ক্রমেই ঘোরালো ও জমাট হইয়া ওঠে। ভিখুর প্রেমের উত্তাপে ঘৃণা উবিয়া যায়। নিজেকে সে আর সামলাইয়া রাখিতে পাবে না।

একদিন সকালে উঠিয়াই সে ভিখারিনির কাছে যায়। বলে, আইচ্ছা, ল, ঘা লইয়াই চল্।

ভিখারিনি বলে—আগে আইবার পার নাই ? যা, অখন মর গিয়া, আখার তলের ছালি খা গিয়া।

ক্যান ? ছালি খাওনের কথাডা কি ?

তোর লাইগা হাঁ কইরা বইসা আছি ভাবছস তুই, বটে ? আমি উই উয়ার সাথে রইছি।

ওদিকে তাকাইয়া ভিখু দেখিতে পায় তাহারই মতো জোয়ান দাড়িওলা এক খঞ্জ ভিখারি খানিক তফাতে আসন করিয়াছে। তাহার ডান হাতটির মতো ওর একটি পা হাঁটুর নীচে শুকাইয়া গিয়াছে, বিশেষ যত্নসহকারে এই অংশটুকু সামনে মেলিয়া রাখিয়া সে আল্লার নামে সকলের দয়া প্রার্থনা করিতেছে।

পাশে পড়িয়া আছে কাঠের একটা কৃত্রিম হ্রস্ব পা।

ভিখারিনি আবার বলিল—বসস্ যে ? যা, পালাইয়া যা, দেখলি খুন কইরা ফেলাইবো কইয়া দিলাম।

ভিখু বলে, আরে থো, খুন, অমন সব হালাই করতিছে। উয়ার মতো দশটা মাইন্‌ষেরে আমি একা ঘায়েল কইরা দিবার পারতাম, তা জানস ?

ভিখারিনি বলে—পারস্ তো যা না, উয়ার সাথে লাগ না গিয়া। আমার কাছে কী ?

উয়াকে তুই ছাড়ান দে। আমার কাছে চ।

ইরে সোনা ! তামুক খাবা ? ঘা দেইখা পিছাইছিলি, তোর লগে আর খাতির কিরে হালার পুত ? উয়ারে ছাড়ুম ক্যান ? উয়ার মতো কামাস তুই ? ঘর আছে তোর ? ভাগবি তো ভাগ, নাইলে গাল দিমু কইলাম।

ভিখু তখনকার মতো প্রস্থান করে কিন্তু হাল ছাড়ে না। ভিখারিনিকে একা দেখিলেই কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়া বলে, তোর নামটো কির্‍্যা ?

এমনই তাহারা পরিচয়হীন যে এত কাল পরস্পরের নাম জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই।

ভিখারিনি কালো দাঁতের ফাঁকে হাসে।

ফের লাগতে আইছস্ ? হোই ও বুড়ির কাছে যা। ভিখু তাহার কাছে উবু হইয়া বসে। পয়সার বদলে অনেকে চাল ভিক্ষা দেয় বলিয়া আজকাল সে কাঁধে একটা ঝুলি ঝুলাইয়া বেড়ায়। ঝুলির ভিতর হইতে একটা প্রকাণ্ড মর্তমান কলা বাহির করিয়া ভিখারিনির সামনে রাখিয়া বলে, খা। তোর লেগে চুরি কইরা আনছি।

ভিখারিনি তৎক্ষণাৎ খোসা ছাড়াইয়া প্রেমিকের দান আত্মসাৎ করে। খুশি হইয়া বলে, নাম শুনবার চাস ? পাঁচি কয় মোরে,—পাঁচি। তুই কলা দিছস, নাম কইলাম, এবাবে ভাগ।

ভিখু উঠিবার নাম করে না। অতবড়ো একটা কলা দিয়া শুধু নাম শুনিয়া খুশি হওয়ার মতো শৌখিন সে নয়। যতক্ষণ পারে ধুলার উপর উবু হইয়া বসিয়া পাঁচির সঙ্গে সে আলাপ করে। ওদের স্তরে নামিয়া না গেলে সে আলাপকে কেহ আলাপ বলিয়া চিনিতে পারিবে না। মনে হইবে পরস্পরকে তাহারা যেন গাল দিতেছে। পাঁচির সঙ্গীটির নাম বসির। তাহার সঙ্গেও সে একদিন আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল।

সেলাম মিয়া।

বসির বলিল—ইদিকে ঘুরাফিরা কি জন্য ? সেলাম মিয়া হতিছে ! লাঠির একঘায়ে শিরটি ছেঁচ্যা দিমু নে।

দুজনে খানিকটা গালাগালি হইয়া গেল। ভিখুর হাতে লাঠি ও বসিরের হাতে মস্ত একটা পাথর থাকায় মাবামারিটা আর হইল না।

নিজের তেঁতুলগাছেব তলায় ফিরিয়া যাওযার আগে ভিখু বলিল, র, তোরে নিপাত করতেছি।

বসির বলিল,—ফেব উয়ার সাথে বাতচিত করলি জানে মাইরা দিমু, আল্লার কিরে।

এই সময ভিখুব উপার্জন কমিয়া আসিল।

পথ দিয়া প্রত্যহ নূতন নূতন লোক যাতাযাত করে না। একেবারে প্রথমবারের জন্য যাহারা পথটি ব্যবহার করে দৈনন্দিন পথিকদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা দুই মাসের ভিতরেই মুষ্টিমেয় হইয়া আসে। ভিখুকে একবাব যাহারা একটি পয়সা দিয়াছে পুনরায় তাহাকেই দান করিবার প্রয়োজন তাহাদের অনেকেই বোধ করে না। সংসারে ভিখারির অভাব নাই।

কোনো রকমে ভিখুর পেট চলিতে লাগিল। হাটবার ছাড়া রোজগারের একটি পয়সাও সে বাঁচাইতে পারিল না। সে ভাবনায় পড়িয়া গেল।

শীত পড়িলে খোলা চালার নীচে থাকা কষ্টকর হইবে। যেখানে হোক চারিদিক ঘেরা যেমন-তেমন ঘর একখানা তাহার চাই। মাথা গুঁজিবার একটা ঠাঁই আর দুবেলা খাইতে না পাইলে কোনো যুবতি ভিখারিনিই তাহার সঙ্গে বাস করিতে রাজি হইবে না। অথচ উপার্জন তাহার যেভাবে কমিয়া আসিতেছে এ ভাবে কমিতে থাকিলে শীতকালে নিজেই হয় তো সে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে না।

যে ভাবেই হোক আয় তাহাকে বাড়াইতেই হইবে।

এখানে থাকিয়া আয় বাড়াইবার কোনো উপায়ই সে দেখিতে পায় না। চুরি ডাকাতির উপায় নাই,—মজুর খাটিবার উপায় নাই, একেবারে খুন করিয়া না ফেলিলে কাহারও কাছে অর্থ ছিনাইয়া লওয়া একহাতে সম্ভব নয়, পাঁচিকে ফেলিয়া এই শহর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না। আপনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহার চালার পাশে বিনু মাঝির সুখী পারিবারিক জীবনটা তাহাকে হিংসায় জর্জরিত করিয়া দেয়। এক-একদিন বিনুর ঘরে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য মন ছটফট করিয়া ওঠে। নদীর ধারে খ্যাপার মতো ঘুরিতে ঘুরিতে মাঝে মাঝে তাহার

মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না।

আরও কিছুকাল ভিখু এমনি অসন্তোষের মধ্যে কাটাইয়া দিল। তারপর একদিন গভীর রাত্রে ঝুলির মধ্যে তাহার সমস্ত মূল্যবান জিনিস ভরিয়া জমানো টাকা কটি কোমরের কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ভিখু তাহার চালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। নদীর ধারে একদিন সে হাতখানেক লম্বা একটা লোহার শিক কুড়াইয়া পাইয়াছিল। অবসর মতো পাথরে ঘষিয়া ঘষিয়া শিকটির একটা মুখ সে চোখা করিয়াছে। এই অস্ত্রটিও সে ঝুলির মধ্যে ভরিয়া সঙ্গে লইল।

অমাবস্যার অন্ধকারে আকাশ ভরা তারা তখন ঝিকমিক করিতেছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। বহুকাল পরে মধ্যরাত্রির জনহীন জগতে মনের মধ্যে ভয়ানক একটা কল্পনা নিয়া বিচরণ করিতে বাহির হইয়া ভিখুর সহসা অকথনীয় উল্লাস বোধ হইল। নিজের মনে অস্ফুটস্বরে সে বলিয়া উঠিল, বাঁ-টি লইয়া ডানটিরে যদি রেহাই দিতা ভগমান !

নদীর ধারে ধারে আধমাইল হাঁটিয়া গিয়া একটি সংকীর্ণ পথ দিয়া সে শহরে প্রবেশ করিল। বাজার বাঁ হাতি রাখিয়া ঘুমন্ত শহরের বুকে ছোটো ছোটো অলিগলি দিয়া শহরের অপরপ্রান্তে গিয়া পৌঁছিল। শহরে যাওয়ার পাকা রাস্তাটি এখান দিয়া শহর হইতে বাহির হইয়াছে। নদী ঘুরিয়া আসিয়া দুমাইল তফাত এই রাস্তারই পাশে পাশে মাইল খানেক রহিয়া গিয়া আবার দক্ষিণে দিক পরিবর্তন করিয়াছে।

কিছুদুর পর্যন্ত রাস্তার দুদিকে ফাঁকে ফাঁকে দু-একটি বাড়ি চোখে পড়ে। তারপর ধানের খেত ও মাঝে মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ডাঙার দেখা পাওয়া যায়। এমনি একটা জঙ্গলের ধারে খানিকটা জমি সাফ করিয়া পাঁচ-সাতখানা কুঁড়ে তুলিয়া কয়েকটা হতভাগ্য মানুষ একটি দরিদ্রতম পল্লি স্থাপিত করিয়াছে। তার মধ্যে একটি কুঁড়ে বসিরের। ভোরে উঠিয়া ঠক্‌ঠক্ শব্দে কাঠের পা ফেলিয়া সে শহরে ভিক্ষা করিতে যায়, সন্ধ্যার সময় ফিবিয়া আসে। পাঁচি গাছের পাতা জ্বালাইয়া ভাত রাঁধে, বসির টানে তামাক। রাত্রে পাঁচি পায়ের ঘায়ে ন্যাকড়ার পটি জড়ায়। বাঁশের খাটে পাশাপাশি শুইয়া তাহাদের কাটা কাটা কদর্য ভাষায় গল্প করিতে করিতে তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে। তাহাদের নীড়, তাহাদের শয্যা ও তাহাদের দেহ হইতে একটা ভ্যাপসা পচা দুর্গন্ধ উঠিয়া খড়ের চালেব ফুটা দিয়া বাহিরের বাতাসে মিশিতে থাকে।

ঘুমের ঘোরে বসির নাক ডাকায়। পাঁচি বিড়বিড় করিয়া বকে।

ভিখু একদিন ওদের পিছু পিছু আসিয়া ঘর দেখিয়া গিয়াছিল। অন্ধকারে সাবধানে ঘরের পিছনে গিয়া বেড়ার ফাঁকে কান পাতিয়া সে কিছুক্ষণ কচুবনের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ঘুরিয়া ঘরের সামনে আসিল। ভিখারির কুঁড়ে, দরজার ঝাঁপটা পাঁচি ভিতর হইতে বন্ধ করে নাই, শুধু ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। ঝাঁপটা সন্তর্পণে একপাশে সরাইয়া দিয়া ঝুলির ভিতর হইতে শিকটি বাহির করিয়া ভিখু শক্ত করিয়া ধরিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে তারার আলো ছিল, ঘরের ভিতরে সেটুকু আলোরও অভাব। দেশলাই জ্বালিবার অতিরিক্ত হাত নাই ; ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভিখু ভাবিয়া দেখিল বসিরের হৃৎপিণ্ডের অবস্থানটি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বাঁ হাতের আঘাত, ঠিক জায়গামতো না পড়িলে বসির গোলমাল করিবার সুযোগ পাইবে। তাহাতে মুশকিল অনেক।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বসিরের শিয়রের কাছে সরিয়া গিয়া একটিমাত্র আঘাতে ঘুমন্ত লোকটার তালুর মধ্যে শিকের চোখা দিকটা সে প্রায় তিন আঙুল ভিতরে ঢুকাইয়া দিল। অন্ধকারে আঘাত কতদূর মারাত্মক হইয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। শিকটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়াছে টের পাইয়াও ভিখু তাই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। একহাতে সবলে বসিরের গলা চাপিয়া ধরিল।

পাঁচিকে বলিল, চুপ থাক : চিল্লাবি তো তোরেও মাইরা ফেলামু।

পাঁচি চেঁচাইল না, ভয়ে গোঙাইতে লাগিল।

ভিখু তখন আবার বলিল, একটুকু আওয়াজ লয়, ভালা চাস ত একদম চুপ মাইরা থাক।

বসির নিস্পন্দ হইয়া গেলে ভিখু তাহার গলা হইতে হাত সরাইয়া নিল।

দম নিয়া বলিল, আলোটা জ্বাইলা দে, পাঁচি।

পাঁচি আলো জ্বালিলে ভিখু পরম তৃপ্তিব সঙ্গে নিজের কীর্তি চাহিয়া দেখিল। একটি মাত্র হাতের সাহায্যে অমন জোয়ান মানুষটাকে ঘায়েল করিয়া গর্বের তাহাব সীমা ছিল না। পাঁচির দিকে তাকাইয়া সে বলিল,—দেখছস ? কেডা কারে খুন করল দেখছস ? তখন পইপই কইরা কইলাম ; মিয়াবাই ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাইবার লারবা গো, ছারান দেও। শুইনে মিয়াবায়ের অইল গোসা ! কয় কিনা, শির ছেঁচ্চ্যা দিমু। দেন গো দেন, শিরটা আমার ছেঁচ্যাই দেন মিয়াবাই—বসিরের মৃতদেহের সামনে ব্যঙ্গভরে মাথাটা একবার নত কবিয়া ভিখু মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া হ্যা হ্যা কবিয়া হাসিতে লাগিল। সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, ঠ্যারাইন বোবা ক্যান গো ? আরে কথা ক হাড়হাবাইতা মাইয়া ! তোরেও দিমু নাকি সাবার কইরা,—অ্যাঁ ?

পাঁচি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—ইবারে কী করবি ?

দ্যাখ কী করি ! পয়সা কড়ি কনে গুইনা রাখছে, আগে তাই ক।

বসিরের গোপন সঞ্চয়ের স্থানটি পাঁচি অনেক কষ্টে আবিষ্কার করিয়াছিল। ভিখুর কাছে প্রথমে সে অজ্ঞতাব ভান করিল। কিন্তু ভিখু আসিয়া চুলেব মুঠি চাপিয়া ধরিলে প্রকাশ করিতে পথ পাইল না।

বসিরের সমস্ত জীবনেব সঞ্চয় কম নয়, টাকায় আধুলিতে একশত টাকার উপর। একটা মানুষকে হত্যা করিয়া ভিখু পূর্বে ইহার চেয়ে বেশি উপার্জন করিয়াছে। তবু সে খুশি হইল। বলিল, কী কী নিবি পুঁটলি বাঁইধা ফ্যালা পাঁচি। তারপর ল রাইত থাকতে মেলা কবি। খানিক বাদে নওমির চাঁদ উটবো, আলোয় আলোয় পথটুকু পার হমু।

পাঁচি পুঁটলি বাঁধিয়া লইল। তারপর ভিখুর হাত ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া উঠিল। পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া ভিখু বলিল, অখনই চান্দ উটবো পাঁচি।

পাঁচি বলিল, আমরা যামু কনে ?

সদব। ঘাটে না চুরি করুম। বিয়ানে ছিপতিপুরের সামনে জংলার মদ্যি ঢুইকা থাকুম রাইতে একদম সদর। পা চালাইয়া চ পাঁচি, এক কোশ পথ হাঁটন লাগব।

পায়ের ঘা নিযা তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁচির কষ্ট হইতেছিল। ভিখু সহসা একসময় দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল, পায়ে নি তুই ব্যথা পাস পাঁচি ?

হ, ব্যথা জানায়।

পিঠে চাপামু ?

পারবি ক্যান ?

পারুম, আয়।

ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচি তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথের দুদিকে ধানের খেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচি পৃথিবীতে আসিয়াছে এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনোদিন পাইবেও না।

চোর

আকস্মিক বর্ষায় ভিজিয়া ওঠা রাত্রি। বৈকালের মেঘশূন্য আকাশে সন্ধ্যার অন্ধকাবের সঙ্গে নিবিড় হইয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। মধ্যরাত্রে নিদ্রিত নিঝুম গ্রামটির উপর সে মেঘ সহসা অবিরল ধারে গলিয়া পড়িতে শুরু করিল।

গ্রামের পাশ দিয়া একটা খাল বহিয়া গিয়া রসুলপুরের কাছে বড়ো নদীতে মিশিয়াছে। খালের পুবপাড়ে গ্রামের যে অংশটুকু আছে তাহাতে ভদ্রলোকের বসতি নাই। গোয়ালাপাড়া, কুমোরপাড়া আর বাগদিপাড়া লইয়া খালের এ তীরের গ্রাম। কয়েকঘর দরিদ্র চাষা তাহার মধ্যে মাথা গুঁজিয়া আছে। খালের খানিক তফাতে প্রকাণ্ড একটা বিল। স্থানটা একটু জঙ্গলাকীর্ণ এবং অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

গোয়ালাপাড়ার শেষের দিকে, বিলের ধারের জঙ্গল ঘেঁষিয়া, পুরাতন বিবর্ণ খড়ে-ছাওয়া বাড়িটি মধু ঘোষের। তক্তপোশে মলিন দুর্গন্ধ বিছানায় মধু ঘুমাইয়াছিল। কাল সবে তাহার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। শরীরে এখনও সে ভালো কবিয়া বল পায় নাই। বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙিয়া ছেঁড়া কাঁথাটা গায়ে জড়াইয়া সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। বেড়ার গায়ে বাঁশের কঞ্চি বসানো ক্ষুদ্র জানালাটি দিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বলিল, দ্যাখ কাদু, কপালখানা দ্যাখ একবাব।

কাদু আগেই উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়াছিল। বলিল, কপালের কী হল ?

মধু বিমর্ষভাবে বলিল, এখনও পথ্যি পেলাম না, আজ শালার জল নামল। দুদিন পরে এ জলটা হলে একবার বেরোনো যেত। ভাদ্দরের শেষ, এ বছর আর জল হবে কি না ভগবান জানে !

বর্ষার রাত্রে চুরি করিবার অনেক সুবিধা আছে। অমাবস্যার রাত্রির চেয়ে অন্ধকার গাঢ় হয়, ঠান্ডায় মানুষ গভীরভাবে ঘুমায়, শত প্রয়োজনেও সহজে কেহ পথে বাহির হয় না। গ্রামের কুকুরগুলি আশ্রয় খুঁজিয়া লইয়া মাথা গুঁজিয়া থাকে, সামান্য পদশব্দেই খাঁখাঁ করিয়া উঠে না। গৃহস্থের ঘরের ভিটা বৃষ্টির জলে নরম হইয়া থাকে।.সিঁদ কাটা সহজ হইয়া পড়ে এবং শব্দ হয় কম।

মধুর সিঁদ কাটিবার বিশেষ দরকার ছিল। গত বৈশাখ মাসে রসুলপুরের মেলায় পুলিশেব লাইসেন্স লইয়া বালা খেলার ব্যবস্থা করিয়া সে কিছু টাকা পাইয়াছিল। তারপর এ পর্যন্ত তাহার আর কোনো উপার্জন হয় নাই। উপার্জনের চেষ্টাও অবশ্য সে করে নাই। হাতের টাকা একেবারে শেষ না হইয়া গেলে রোজগারের দিকে মধু নজর দিতে পারে না। এমনিভাবেই সে এতকাল কাটাইয়াছে। এই তাহার স্বভাব। বছরের কয়েকটা মাস তাহার বেশ সুখেই কাটিয়া যায়। বাকি মাসগুলি অভাবের পীড়নে তাহার ও কাদুর কষ্টের সীমা থাকে না। একেবারে অচল হইয়া পড়ার আগে মধু সহসা আবার কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া ফেলে।

বৈধ উপায়ে আজ পর্যন্ত সে একটি পয়সাও উপার্জন করেছে কি না সন্দেহ। গোপন ও প্রকাশ্য যত প্রকার উপায়ে তাহার অনিয়মিত আয় হয় তার সবগুলিই নীতিবিগর্হিত। কিন্তু কোনো রকম নীতির ধার মধু ধারে না। পয়সার জন্য সে করিতে পারে না জগতে এমন কাজ নাই। সে শিশুর গলার হার ছিনাইয়া লইয়াছে, মেলায় জুয়াড়ি সাজিয়া দরিদ্র চাষার উপার্জনে ভাগ বসাইয়াছে, পকেট মারিয়াছে, দূর গ্রামে গিয়া পিতৃদায় উদ্ধারের জন্য বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিয়াছে। কোমরে ল্যাঙট আঁটিয়া সর্বাঙ্গে তৈলাক্ত করিয়া মাঝে মাঝে গৃহস্থের ভিটায় সিঁদও সে দিয়াছে। দেহে শক্তি ও মনে সাহস থাকিলে বোধ হয় ডাকাতি করিতেও সে ছাড়িত না।

দুয়ারের কাছে প্রদীপটা নামাইয়া রাখিয়া ঝাঁপ খুলিতে খুলিতে কাদু তাহার কথার জবাবে বলিল, বেরিয়ে তো রাজা হয়ে আসতে। মজুর খাটলে মানুষ তোমার চেয়ে বেশি রোজগার করে।

মধু আহত ও উষ্ণ হইয়া বলিল, কেন, রোজগারটা কম হচ্ছে কি শুনি ? তোকে সেদিন রুপোর চুড়ি কিনে দিইনি ?

কাদু মুখ ফিরাইয়া বলিল, ও, ভারী রুপোর চুড়ি দিয়েছ ! চার বছর ঘর করছি, ক-গাছা রুপোর চুড়ি দিয়ে বাখানের আর সিমে নেই। চুলোয় গুঁজে দেব চুড়ি।

ঝাঁপ খুলিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। ঘুঁটের ঝুড়িটা বাহিরের রোয়াক হইতে ঘরের ভিতরে আনিয়া রাখিয়া বলিল, সাধ-আহ্লাদ চুলোয় গেছে। ঘুঁটে দিয়ে ঝি-গিরি করে মরলাম। দু-গাছা চুড়ি দিয়ে অত তোমার বড়াই কীসের ? অন্য কেউ হলে কত দিত !

মধু অবাক হইয়া গেল। কাদুর মুখে এই ধরনের নালিশ শুনিবার অভ্যাস তাহার ছিল না। নালিশ করিবার স্বভাব কাদুর নয়। চার বছর আগে বৃন্দাবনপুরের যতীন সাহার বাড়িতে সিঁদ দিয়া মধুর একটা মোটা রকম লাভ হইয়াছিল। মাসে দশ টাকা আর খাওয়াপরা দিলেই কুমোরপাড়ার সৌদামিনী তাহার সঙ্গে বাস করিতে তখন রাজি হইয়া যাইত, কিন্তু দুইশত টাকা পণ দিয়া কাদুকেই বিবাহ করিয়া সে ঘরে আনে। তিন-চার বছব জেলে পচিবার বিপদ মাথায় করিয়া উপার্জন করা অতগুলি টাকা দিয়া একদিনের জন্য মধু আপশোশ করে নাই। কাদুর রূপ ও গুণের তুলনায ও টাকা কিছুই নয়। হাতে টাকা থাকায় কাদুকে ঘরে আনিয়া বছর খানেক তাহার সুখেই কাটিয়া গিযাছিল। এক বছরের মধ্যে উপার্জনের জন্য মধু একেবারেই মাথা ঘামায় নাই। কাদুময় জগতে কাদুর নেশায় বিভোর হইয়া অলস অকর্মণ্য জীবনযাপন করিয়াছিল। তারপর টাকার অভাবে প্রায়ই তাহারা কষ্ট পাইয়াছে। মাঝখানে মধু তো একবাব জেলেই যাইতে বসিয়াছিল। সে সময় কাদুকে দু-একবেলা উপবাস পর্যন্ত করিতে হইয়াছে ; কিন্তু কাদু কখনও অনুযোগ করে নাই। আজ ক-দিন ধরিয়া তাহার কী হইয়াছে কে জানে।

ফুঁ দিযা আলো নিবানোর সময কাদুর আলোকোজ্জ্বল মুখখানি মধু একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, কাদুব মুখে একটা অপরিচিত ছায়া পড়িয়াছে। প্রদীপের শিখার কাছে মুখ আগাইয়া লইয়া গিয়া ফুঁ দেওয়ার আগে কাদু যেভাবে আড়চোখে তাহাব দিকে চাহিল সে ভঙ্গিও মধুর কাছে অচেনা ঠেকিল।

কাদু বিছানায় উঠিয়া আসিলে তাহাকে আদর করিবার চেষ্টা করিয়া মধু বলিল—একবার বেরোই আজ কী বলিস কাদু ?

কাদু রূঢ়ভাবে তাহার আদর প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল, তোমার খুশি। ঘুম পেয়েছে, জ্বালাতন কোরোনি বাবু, আমাকে ঘুমোতে দাও।

মধু আহত হইয়া কাঁথাটা গায়ের উপর টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল। বাহিরে ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি হইতেছে। বর্ষার শেষ অভিনয়। চার-পাঁচদিন পরেই পূর্ণিমা। কাল হয়তো মেঘশূন্য আকাশে চাঁদ উঠিবে। জ্যোৎস্নায় রাত্রিতে চলাফেরার গোপনতা যাইবে মুছিয়া। মধুর মন কেমন করিতে লাগিল। আজ রাত্রির মতো সুযোগ বহুকাল পাওয়া যাইবে না। কাদুর মুখে আবার কবে সে হাসি ফুটাইতে পারিবে কে জানে। যতদিন যাইবে অভাব ততই বাড়িয়া চলিবে। কাদুর ধৈর্য যখন একবার ভাঙিয়া গিয়াছে, রাগ এবং বিরক্তি তাহার অভাবের অনুপাতে বাড়িবে বই কমিবে না।

মধুর ঘুম আসিল না। শুইয়া শুইয়া সে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। কিছুদিন আগে সে খবর পাইয়াছিল, গ্রামের রাখাল মিত্র, অনেকগুলি নগদ টাকা সঙ্গে লইয়া বাড়ি আসিয়াছে। রাখাল মিত্রের বাড়িটা কাঁচা। রাখালের টাকা রাখিবার লোহার সিন্ধুকও নাই। মধুর লোভ হইয়াছিল। রাখাল বাড়ি আসিলে রাখালের বউ স্বামীসেবার সুবিধার জন্য একটা ঠিকা ঝি রাখে। ঘরের সন্ধান আনিবার জন্য

অনেক বলিয়া কহিয়া কাদুকে রাজি করিয়া মধু তাহাকে রাখালের বাড়ি কাজ করিতে পাঠাইয়াছিল। বলিয়াছিল, একদিনের তরে যা কাদু। খবরটা এনে দে। একদিন কাজ করে পোষাল না বলে চলে আসিস, আর তোকে যেতে হবে না। কাদু বলিয়াছিল, হে ভগবান ! শেষকালে ঝি-গিরি পর্যন্ত অদেষ্টে ছেল !

কোন ঘরের কোন দিকে রাখাল ঘুমায়, তার ছেলে পান্নালাল কোন ঘরে শোয়, রাখালের ঘরের কোথায় বাক্‌সো-প্যাঁটরা থাকে, এ সব খবর কাদু তাকে আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু সেই হইতে নিজেও সে যেন কেমন বদলাইয়া গিয়াছে।

প্রথমটা মধু অত খেয়াল করে নাই। ভাবিয়াছিল, ঝির কাজ করিতে পাঠানোয় কাদুর বুঝি রাগ হইয়াছে, সে অভিমান করিয়াছে, এ আর ক-দিন স্থায়ী হইবে ? কিন্তু আজ কাদুর সুস্পষ্ট কলহ-ভাষণ ও নিষ্ঠুর আচরণের পর তাহার পরিবর্তনের ইতিহাস মধুর আগাগোড়া মনে পড়িতে লাগিল। ইহাকে সাময়িক ক্রোধ ও বিরক্তি মনে করিয়া স্বস্তি-লাভের সাহস তাহার আর রহিল না।

সবচেয়ে বেশি করিয়া মধুর মনে পড়িতে লাগিল এই কথা যে, কাদু জ্বরের ক-দিন ভালো করিয়া তাহার সেবা করে নাই, সময়মতো খাইতে দেয় নাই, না ডাকিলে কাছে আসে নাই। সর্বদা কী রকম অন্যমনস্ক থাকিয়াছে। একদিনের বেশি তাহার দাসীবৃত্তি করিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, তবু বিশেষ করিয়া বারণ করা সত্ত্বেও তাহাকে অসুস্থ রাখিয়া সে রাখালের বাড়ি কাজ করিতে চলিয়া গিয়াছে। কৈফিয়ত দিয়াছে, হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিলে লোকে সন্দ করবে যে !

সন্দ করবে, না করবে আমি বুঝব। তুই আর যাসনে কাদু।

এ মাসের ক-টা দিন যাই। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ মানুষ কাজ ছেড়ে দেয় কী করে শুনি ?

এমনি সব কথা যার অর্থ বুঝা যায় না।

মাঝখানে একদিন রাখালের বড়ো ছেলে পান্নাবাবু আসিয়াছিল। এক অদ্ভুত প্রস্তাব লইয়া।

রাজু কাল শ্বশুরবাড়ি যাবে মধু। তোমার বউকে সঙ্গে দিতে হবে। বেশিদিনের জন্য নয়-- ধর, এই দিন পনেরো।

মধু রাজি হয় নাই।

কিন্তু রাখালের মেয়ের ঝি হইয়া তাহার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার জন্য কাদুর উৎসাহ দেখিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। যাওয়ার অনুমতি না পাইয়া দু দিন কাদু তাহার সঙ্গে ভালো করিয়া কথা বলে নাই।

দশ টাকা মাইনে দিত। দশটা টাকা তোমার জন্য জলে গেল। বলিয়া বলিয়া কয়েকদিন সে যে কেন আপশোশ করিয়া মরিয়াছিল অনেক ভাবিয়াও মধু তাহা বুঝিতে পারে না।

* * * *

অনেকক্ষণ পরে মধু টের পাইল, পাশে কাদুর চোখেও ঘুম আসে নাই।

ঘুমোসনি কাদু ?

না।

মধু আর একবার তাহাকে জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কেন ঘুমোসনি রে ? এত ঘুমকাতুরে তুই।

গরম লাগছে। ছাড়ো।

সারাদিনের গুমোট করা গরমের পর এতক্ষণে পৃথিবীর আবহাওয়ায় মনোরম শীতলতা ঘনাইয়া আসিয়াছে। কাদুর কথাটা মধু বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তোর কী হয়েছে বল তো ?

কী আর হবে ? কিছু হয়নি। জ্বর থেকে উঠেছ, রাত না জেগে ঘুমোও না বাবু।

এ অনুরোধ স্নেহের পরিচায়ক। কিন্তু কথাগুলিতে এমনি ঝাঁঝ ছিল যে মধু আবার আহত ও অবাক হইয়া গেল। কাদুর এই স্থায়ী অনমনীয় বিরক্তির কারণটা অনুমান করা অবধি তাহার মনের মধ্যে দারুণ অশান্তি হইতেছিল। বুনো শিয়ালের প্রকৃতি লইয়া ঈশ্বরের কোন বিস্ময়কর নিয়মে কাদুকে সে ভালোবাসিয়াছিল বলা যায় না। আপনার বিকৃত গোপনতা, লোভ ও সেই লোভের জন্য বিরামহীন শাস্তির আশঙ্কা এবং মৃত বিবেককে বুকে করিয়া বেড়ানোর যন্ত্রণা তাহার মনের চারিদিকে হীনতার প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে। স্বার্থ ছাড়া জগতে সে আর কিছুই বোঝে না। তবু কাদুর প্রতি তাহার অপরিসীম মমতা আছে, যে মমতার বশে কাদুর জন্য তাহার অনেকগুলি ত্যাগ সম্ভব হইয়াছে। তাহার নিস্তেজ ভীরু মন তাহার চেয়ে যারা দুর্বল তাহাদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য সর্বদা উন্মুখ হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে কাদুর সুন্দর ফাঁপা গাল দুটিতে চড় বসাইয়া দিবার জন্য মনে যে তাহার কখনও উন্মত্ত ইচ্ছা জাগে নাই এমন নয় ! কিন্তু জীবনে আর কোনো বিষয়ে লেশমাত্র সংযম না থাকিলেও এ ইচ্ছাকে সে বরাবর দমন করিয়া আসিয়াছে।

রাগের সময় চোখ রাঙাইয়াছে, দাঁতে দাঁত ঘষিয়াছে, যা-তা গাল দিয়া বসিয়াছে। কিন্তু কখনও গায়ে হাত তোলে নাই।

কাদুর চোখে জল দেখিবামাত্র নিজেও সে গলিয়া জল হইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোকে যেভাবে প্রগাঢ় আবেগের সঙ্গে, প্রেমাত্মক সুনিবিড় আত্মীয়তার সঙ্গে, ক্রন্দসী প্রিয়াকে আদর করে, তেমনিভাবে বুকে নিয়া চুমো খাইয়া গদগদ ভাষায় ভালোবাসা জানাইয়া কাদুকে সে সোহাগ করিযাছে। বলিয়াছে, তুই আমার পাঁজরা কাদু, তুই আমার চোখের মণি। আমার আঁধার ঘরের আলো তুই, মানিক তুই—মাইরি। বলিযাছে, এক লহমার জন্যে তোকে চোখের আড়াল করলে বুক ফেটে যায় কাদু।

কাদু এ ভালোবাসা কড়ায় গন্ডায় শোধ করিতে ছাড়ে নাই। মন দিয়া করিয়াছে স্নেহ, দেহ দিয়া করিয়াছে সেবা। চোরের মনটি চুরি করাব জন্য যত কলাকৌশল ছলচাতুরি সম্ভব তাহার একটিকেও সে অবহেলা করে নাই। মধুর মনে হইয়াছে, জগতে কাদুর তুলনা নাই। রূপে-গুণে স্নেহ-মমতায় সে অতুলনীয়া। অনেক তপস্যায় ওকে সে পাইয়াছে।

সেই কাদু কি আজ তাহার পর হইয়া গেল ? সোনার চুড়ির বদলে রুপার চুড়ি দিয়াছে বলিয়া সোনাব মেয়ে কি পাথর হইয়া গিয়াছে ? তাহার চেয়ে টাকাকেই ভালোবাসিতে শিখিয়াছে ?

আরও খানিকক্ষণ চুপচাপ শুইয়া থাকিবার পর মধু হঠাৎ উঠিয়া বসিল। বলিল, কাদু উঠ তো একবার।

কাদু বলিল, কেন, উঠব কী জন্যে ?

আলো জ্বাল। বেরুব।

খানিকক্ষণ কাদুর উঠিবার লক্ষণ দেখা গেল না। মনে মনে সে কী ভাবিতে লাগিল কে জানে।

তারপর নিঃশব্দে উঠিয়া দীপ জ্বালিল।

বলিল, না বেরুলেই হত আজ। জ্বর থেকে উঠেছ।

মধুর হঠাৎ রাগ হইয়া গেল।

অত সোহাগ তোকে আর জানাতে হবে না, জানলি ? ঢের হয়েছে। অন্য লোকে কত দিত ! যে দিত, যা না তার কাছে।

কাদুর হাতে নূতন চুড়িগুলিকে প্রদীপের আলোয় চিকচিক করিতে দেখিয়া মধুর রাগ এক মুহূর্তে অভিমানে পরিণত হইয়া গেল।

জ্বরগায়ে রাতদুপুরে বিষ্টি মাথায় করে কামাতে চললাম, মেয়ের মুখ তবু হাঁড়িপানা হয়েই রইল। ধরা পড়ি তো আচ্ছা হয়।

কাদু বলিল, কে যেতে বলেছে ?

তুই বলেছিস, তুই !...চুপ থাক, কাদু। রাগের সময় কথা কয়ে রাগ বাড়াস না।

কাদু একটু ভয় পাইয়া বলিল, খামখা রাগ করলে মানুষ কি করবে ?

মধু রাগে অভিমানে স্ত্রীর কথার কোনো জবাব দিল না। কেন, ও পায়ে ধরিতে পারে না ? গলা জড়াইয়া কাঁদিতে পারে না ? বলিতে পারে না, অসুখ শরীরে আজ তুমি যেও না গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কথা শোনো, লক্ষ্মী, নইলে আমি গলায় দড়ি দেব ?

মধু কোমরে ল্যাঙট আঁটিল। কোমরে যে এত ব্যথা ধরিয়া আছে শুইয়া থাকার সময় কে তাহা জানিত। ঘরের কোনায় ভুসি-রাখা জালার ভিতর হইতে সিঁদকাঠি বাহির করিয়া মধু বলিল, এ মরচে ধরে গেছে। খেয়াল করে একটু তেলও একদিন মাখিয়ে রাখতে পারিসনি ? শিলটা আন তো, একটু ঘষে নিয়ে যাই।

কাদু বলিল, বিষ্টিতে মাটি নরম হয়ে আছে। ওতেই হবে।

মধু বলিল, যেমন তেমন করে আমায় বিদেয় করতে পারলে বাঁচিস, না ? তোর এত টাকার খাঁকতি কবে থেকে হল বল তো ?

কাদু কথা কহিল না। শিলটা আনিয়া দিয়া বিছানায় বসিয়া একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

তাহার এই অপরিচিত ভঙ্গি মধুর একেবারেই ভালো লাগিল না। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, তেল মাখব তেল দে কাদু।

কাদু বলিল, তেল নেই।

নেই ? নেই কেন ?

জানিনে বাবু অত। নেই তো আমি কী করব ? গড়িয়ে আনব ?

মধু স্থিরদৃষ্টিতে কাদুর দিকে চাহিয়া রহিল। কাদুর মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা, একটা গোপন-করা চাঞ্চল্য এতক্ষণে সে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে। সে নিজে পাকা চোর, চোরের ভাবভঙ্গি তাহার অজানা নয়। কাদুর চোখে-মুখে চুরির উদ্দেশ্য সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল, তোর ভাবখানা কি বল তো-? ও-রকম করছিস কেন ?

কাদু থতোমতো খাইয়া বলিল, ভাবনা লাগছে। তোমার জন্য ভাবনা লাগছে। বাড়ির মানুষকে সজাগ দেখলে সিঁদ দিওনি বাবু, ফিরে এসো।

তবু যাইতে বারণ করিবে না। প্রথম দিন এমনিভাবে ল্যাঙট পরিয়া সারা গায়ে তেল মাখিয়া বাহির হওয়ার সময় কাদু কেবল তাহার পায়ে ধরিতে বাকি রাখিয়াছিল। সে দিনের কথাটা ভাবিতে ভাবিতে মনের মধ্যে একটা ক্ষুব্ধ অসন্তোষ লইয়া মধু ঝাঁপ খুলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

কাদুর ও তাহার নিজের শরীরের উত্তাপে উষ্ণ শয্যা ছাড়িয়া আসিয়া বৃষ্টির প্রথম স্পর্শে মধুর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। একবার সে মনে করিল ফিরিয়া যায় ; কিন্তু ফিরিয়া গেলে কাদু খুশি হইবে না স্মরণ করিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া গোয়ালাপাড়ার ভিতর দিয়া সংকীর্ণ পথ ধরিয়া সে সাবধানে গ্রামের দিকে আগাইয়া চলিল।

বৃষ্টি ধরিয়া আসিলেও আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। জলসিক্ত স্তব্ধ খড়ের ঘরগুলির পাশ দিয়া চলিতে চলিতে মধুর অসন্তোষ বাড়িয়া গেল। সব চেয়ে ভাঙাচোরা ঘরটি দেখিয়া তার মনে হইল যে এ বাড়ির বউ সাতদিন উপবাস করিয়া থাকিলেও বোধ হয় অসুস্থ স্বামীকে এই অন্ধকার বাদল রাতে ঘরের বাহির হইতে দেয় না। ওই স্বামীটির ভাগ্যের সঙ্গে তার ভাগ্যের পার্থক্য অকারণ নয়।

যত গরিব হোক, ও চোর নয়। সে চোর। তার বউ তাই নিজের সুখের জন্য তাকে বিপদের মুখে যাইতে দিতে দ্বিধা করে না। চোর-স্বামীকে অনায়াসে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া ঝাঁপ বন্ধ করিয়া ঘুমায়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মধু খালের ধারে পৌঁছিয়া গেল। বহুকাল পরে আজ সে আত্মগ্লানি অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাপপুণ্য ভালোমন্দের যে সংস্কার তাহার মরিয়া মরিয়া একেবারে নবজন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই যেন আবার আগের রূপ ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে অস্বস্তি ও বিতৃষ্ণা ছড়াইয়া দিতে লাগিল। খালের ধারে ধারে খানিক দূরের পুলটার দিকে চলিতে চলিতে বক্তাকরের মতো সহসা মধু অনুভব করিতে আরম্ভ করিল, এতকাল সে অতি ঘৃণ্য জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছে। অকথ্য কদর্য জীবন। পাপের তার সীমা নাই। নরকেও তাহার ঠাঁই হইবে না।

ভাবিয়া নিজেকে মধুর একান্ত অসহায় মনে হইতে লাগিল। একটা অভূতপূর্ব হারাইয়া যাওয়ার অনুভূতির মধ্যে তাহার সহসা যেন ভয় করিতে লাগিল। সে আবার ভাবিল, থাক, কাজ নাই চুরি করিয়া, ফিরিয়া যাওয়াই ভালো। কিন্তু কাদুকে মনে করিয়া এবারও প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছাটা তাহাকে দমন করিয়া ফেলিতে হইল। কাদুর উপরে তাহার রাগ ও অভিমানের সীমা ছিল না। তবু এমন অবস্থাতেও সে ভুলিতে পারিতেছিল না যে কাদু তাহাকে দুর্লভ রূপ-যৌবন দিয়াছে, আজ না দিক এতকাল স্নেহও দিয়াছে। সেই দাবিতে কাদু তাহার কাছে সুখ চায়। প্রার্থনাটা যত স্বার্থপরের মতো হোক, অসংগত নয়, অনুচিত নয়। কাদুকে এ সব তাহার দিতেই হইবে যে।

খানিক আগাইয়া কুমারপাড়ার ঘাট। ঘাটে চার-পাঁচটি ছোটো-বড়ো নৌকা বাঁধা আছে। একটি নৌকায় ছইয়ের মধ্যে এতরাত্রে আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া মধু একটু আশ্চর্য হইয়া গেল। এতরাত্রে খালে নৌকার মধ্যে আলো জ্বালিয়া বসিয়া আছে কে ? বহুকাল ধরিয়া অন্ধকারে পথে বিপথে বিচরণ করিযা মধুব সাপের ভয় ছিল না। ঘন কাশবনেব মধ্যে উবু হইয়া বসিযা দুই হাতে কাশ ফাঁক করিযা করিয়া ঘাটের পাশে নৌকার খুব কাছেই সে একটু একটু করিয়া আগাইয়া গেল। ভাবিল, বিদেশি পাটের দালাল হয় তো কপাল ভালো।

রসুলপুব নদীর ঘাটে এমনি এক বর্ষার রাত্রে মধু একজন মুখচেনা পাটের দালালের নৌকা হইতে একবার একটি ক্যাশবাক্সো সরাইযাছিল। বাক্সে ছিল নগদ প্রায় সাতশো টাকা। আজও ফাঁকতালে তেমনি একটা দাঁও মারা যাইবে ভাবিয়া মধু খুশি হইয়া উঠিল। ভাবিল, রাখালের ভিটায় হয়তো আজ আর তাকে সিঁদ কাটিতে হইবে না। ধরা পড়িলে রাখালেব গোঁয়াবগোবিন্দ ছেলেটার হাতে মার খাইয়া মরিবার ভয়ে থাকিয়া থাকিয়া মেরুদণ্ডেব মধ্যে শিরশির উঠিবে না।

পান্নাবাবুকে মধু বড়ো ভয় করে।

জলের স্রোতে নৌকাটি পাশাপাশি তীরের দিকে ঘেঁষিযা আসিয়াছিল। কোমর-জলে নামিয়া ছইয়ের ফুটায় চোখ দিয়া ভিতরে তাকাইতে মধুর আকাশকুসুম শূন্যে মিলাইয়া গেল। ভিতরে বিছানা পাতা আছে। মাথার কাছে আলো রাখিয়া সেই বিছানায় চিত হইয়া শুইয়া বই পড়িতেছে রাখালেবই বড়ো ছেলে পান্নাবাবু।

রাখালের বাড়িতে চুরি করিতে বাহির হইয়া রাখালের ছেলেকেই খালের নির্জন ঘাটে নৌকার মধ্যে এত রাত্রে একাকী বই পড়িতে দেখিবে মধুর ইহা কল্পনাতীতই ছিল। নৌকার ধাব ঘেঁষিয়া জলের মধ্যে খানিকক্ষণ সে অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারপর তাহার মনে হইল ব্যাপারটা হয়তো খুব আশ্চর্যজনক নয়। পান্নাবাবু কাল বোধ হয় শহরে যাইবে, আকাশে মেঘের ঘটা দেখিয়া সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া নৌকায় আসিয়া শুইয়া আছে। ভোররাত্রে মাঝিরা আসিয়া নৌকা খুলিবে।

কিন্তু রাখালের বাড়ির কাছে মজুন্দার ঘাটে নৌকা না বাঁধিয়া এতদূর উজানে আসিয়া নৌকা রাখা হইয়াছে কেন, অনেক ভাবিয়াও মধু তাহার কারণটা অনুমান করিতে পারিল না। কিন্তু এক

বিষয়ে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গেল। রাখালের বাড়িতে বুড়া রাখাল নিজে আর দুটি ছোটো ছেলে ছাড়া পুরুষ মানুষ আর কেহ নাই। তাহার আবির্ভাব প্রকাশ পাইয়া গোলমাল হইলেও সহজে তাহাকে কেহ আয়ত্ত করিতে পারিবে না।

মধু আর এ তীরে উঠিল না। সাঁতরাইয়া খাল পার হইয়া গেল। তাহার মন এখন হালকা হইয়া গিয়াছে। ভাগ্যের অনেকগুলি যোগাযোগের হিসাব করিয়া তাহার ধারণা হইয়াছে আজ রাত্রে তাহার সাফল্য অনিবার্য। আজ চুরি করিতে বাহির হইবে বলিয়া কাল তাহাব জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল। আকাশে আজ তাহার চুরির সুবিধার জন্যই মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং পান্নাবাবুকে বাড়ি ছাড়িয়া নৌকায় আসিয়া শুইতে হইয়াছে। ভাগ্যের আহ্বান উপেক্ষা করিয়া দৈহিক দুর্বলতার ছুতায় সে অলস হইয়া ঘরে শুইয়া থাকিতে পারে বলিয়া তাহাকে বাহির করার জন্য কাদুর মেজাজটাও আজই গিয়াছে বিগড়াইয়া।

আজ হয়তো তাহার লাভেরই কপাল।

মধুর দু চোখ লোভে চকচক করিয়া উঠিল। অন্ধকারেরই একটা গাঢ়তর অংশের মতো নিঃশব্দপদে সে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। থাকিয়া থাকিয়া দমকা বাতাসে মধুর শীত করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু মনে তাহার আর কোনো দুঃখ নাই। কাদুর কাছে ঘা খাইয়া ক্ষণকাল পূর্বে সে একবার নরকযাত্রা করিয়াছিল, এখন সে আবার অনায়াসে স্বর্গে উঠিয়া গিয়াছে। চুরি করার মধ্যে আর সে দোষের কিছু দেখিতে পাইল না। ভাবিল কীসের পাপ ? জগতে চোর নয় কে ? সবাই চুবি করে। কেউ করে আইন বাঁচাইয়া, কেউ আইন ভাঙে। স্বাধীনতার মূলধন লইয়া এ ব্যবসায় নামিতে যাহাদের সাহস নাই, চুরিকে পাপ বলে শুধু তাহারাই। পারিলে তাহারাও চুরি কবিত। চোরের চেয়েও তাহাবা অধম। তাহারা ভীরু কাপুরুষ।

মধু প্রচুর আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে লাগিল। উত্তেজিত লোভের মধ্যে চুবির সমর্থন তাহাব কাছে প্রায় গৌরবময় হইয়া উঠিয়াছে। এমন জীবন আর নাই। কতকাল ধরিযা কত কষ্টে বিদেশে টাকা উপার্জন করিয়া রাখাল বাড়ি আসিয়াছে, রাজার খাজনা মিটাইবে, দেনা শোধ কবিবে, জমি কিনিবে, মেয়ের বিবাহ দিবে। একরাত্রে কয়েক মিনিটের মধ্যে ওই টাকার হস্তান্তর ! মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জন করিবার সময় সাধু রাখাল কি কখনও ভাবিতেও পারিয়াছিল টাকাগুলি শেষ পর্যন্ত কাজে লাগিবে মধুর। সে তাহার কাদুর মুখের হাসি উপভোগ করিবে বলিয়া খাটিয়া মরিয়াছে রাখাল, এ যেন কৌতুক, এ যেন তাহার বাহাদুরি। মধুর ঠোঁট ভাঙিয়া হাসি ফুটিল।

অনুতাপ ও আত্মপ্রসাদ, আজ রাত্রে মধুর মনের এই ক্ষণে ক্ষণে আকাশপাতাল দোল-খাওয়াটা বিস্ময়কর কিছু নয়। চোরের অভিজ্ঞতা অতুলনীয়, হৃদয়ের বিবর্তন তাহাদের অসাধারণ।

অথচ চোরেরা জীবনে বড়ো একা। ওদের আপন কেহ নাই। কবির মতো, ভাবুকের মতো, নিজের মনের মধ্যে ওরা লুকাইয়া বাস করে। যে স্তরের অনুভূতিই ওদের থাক, যে রুক্ষ শ্রীহীন সীমানার মধ্যেই ওদের কল্পনা সীমাবদ্ধ হোক, ওদের অনুভূতি, ওদের কল্পনা ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র, পরিবর্তনশীল। অনেক ভদ্রলোকের চেয়ে ওরা বেশি চিন্তা করে। জীবনের এমন অনেক সত্যের সন্ধান ওরা পায়, বহু শিক্ষিত সুমার্জিত মনের দিগন্তে যাহার আভাস নাই। কবির নেশা নারী, চোরের নেশা চুরি। আসলে ও দুটো নেশাই মানসিক উর্বরতা বিধানের পক্ষে সমান সারবান। সংসারে এমন লক্ষ লক্ষ সাধু আছে, যাহাদের লইয়া আমি গল্প লিখিতে পারি না। জীবনে তাহাদের গল্প নাই। প্রেমিকের মতো, অন্যায় অসঙ্গত চুরি-করা প্রেমে ব্যুৎপন্ন প্রেমিকের মতো চোরের জীবন গল্পময়।

সিঁদের ফুটা দিয়া রাখালের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় মধুর হৃদয় তীব্র সতেজ উত্তেজনায় ভরপুর হইয়া গেল, তাহার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ সতর্কতায় সজাগ হইয়া রহিল। ঘরে আলো কমানো ছিল। খাটের উপর পাঁচ-ছয় বছরের ছোটো ছেলেটিকে নিয়া রাখাল শুইয়া আছে। রাখালের স্ত্রী ও বিবাহযোগ্যা মেয়েটির বিছানা হইয়াছে মেঝেতে। এদিকের অন্ধকার কোণে নিশ্বাস

রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া মধু ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। নিস্তব্ধ ঘরে ঘুমন্ত মানুষের শান্ত আবহাওয়া। এর মধ্যে আসিয়া দাঁড়ানোমাত্র মধুর উত্তেজনা আরও তীব্র, আরও উন্মাদনাকর হইয়া গিয়াছিল। বাহিরের অন্ধকার হইতে আসিয়া ঘরের মৃদু আলোতেও সে সমস্ত পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছিল। রাখালের মেয়েটির উপর চোখ পড়িতে তাহার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মেয়েটা অবিকল কাদুর মতো ভঙ্গি করিয়া ঘুমাইয়া আছে। জগতে সব মেয়েই কী এমনিভাবে ঘুমায় ?

কিন্তু কাদুর হাতে রুপার চুড়ি। মেয়েটা সোনার চুড়ি পরিয়াছে। কাদুর মতো ও মোটাও নয়, এখনও দেহটি ওর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার সময় পায় নাই। ক্ষীণ কটিতটে দেহরেখা ওর ধনুকের মতো বাঁকিয়া আছে। মুখখানা কচি। ফুলের মতন কোমল। কাদুর মুখের মতো পাকিয়া যায় নাই। গায়ের রং গোধূলির মতো মনোরম, প্রভাতের মতো উজ্জ্বল।

এই মেয়ের বিবাহের জন্যই বিশেষ করিয়া রাখাল টাকা লইয়া বাড়ি আসিয়াছে। কাদুকে তাহার টাকা দিয়া কিনিতে হইয়াছিল। টাকা দিয়া মেয়েকে রাখাল বিলাইয়া দিবে।

মধু নিজেই মাথা নাড়িল। এক মুহূর্তের জন্য তার মুখের ভাব বিষণ্ণ ও করুণ দেখাইল। কামনা করিবার অধিকার জগতে সকলেরই আছে। কোনো অবস্থাতেই কেহ নিজেকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিতও করে না। রাখালের ঘুমন্ত মেয়েটার জন্য একটা প্রগাঢ় অস্থায়ী প্রেম অনুভব করিতে মধুর হৃদয় কোনো বাধাই পাইল না। হৃদয়ের এই আকস্মিক আবেগসঞ্চার তাহার নূতন নয়। গহনার দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া এমনই আকস্মিক হৃদয়োচ্ছ্বাস সে অনুভব করিয়াছে। দোকানের সুরক্ষিত গহনাগুলিকে দুর্লভ জানিয়া সে যেমন ব্যথা পাইয়াছে, আজ তাহার এই কলঙ্কিত নিশীথ-অভিযানের উগ্র ভয়কাতর উপলব্ধিগুলির মধ্যে আকাশের চাঁদের মতো দুষ্প্রাপ্য শিথিলবসনা মেয়েটির জন্য ক্ষণিকের নিবিড় ব্যর্থ প্রেমে তেমনই একটা বেদনা অনুভব করিল। তাহার সাধ হইল, মেয়েটিকে একবার সে স্পর্শ করে। পরম আগ্রহে কম্পিত ব্যাকুল বাহুতে কাদুর মতো ওকে একবার সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া পলাইয়া যায়। টাকা দিয়া তাহার কাজ নাই।

স্বর্গচ্যুত অভিশপ্ত দেবতা হঠাৎ চোখ মেলিয়া অদূরে স্বর্গের ছবি দেখিলে যেমন করিয়া অশান্ত ও বিচলিত হইয়া পড়ে, মধুর বিকৃত মন নিষ্পাপ সুন্দরী মেয়েটির একটু স্পর্শ লাভের জন্য তেমনইভাবে কাঁদিয়া উঠিল। মরুপথিকের সামনে এ যেন সরোবরের আবির্ভাব। মরীচিকার মতো মিলাইয়া যাইবে জানিয়াই ঝাঁপ দেওয়ার সাধ যেন কমে না, বাড়িয়া যায়।

মধু জোরে নিশ্বাস ফেলিল। দেবমন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া অশান্ত আত্মার ধূপগন্ধী বায়ুকে নিশ্বাসে গ্রহণ করার মতো শ্বাস টানিয়া লইয়া আপনার জলসিক্ত অর্ধ উলঙ্গপ্রায় দেহের দিকে চাহিয়া তার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

সে যে নরকে বাস করে, আজ পর্যন্ত সে যে এক মুহূর্তের জন্য শান্তি পায় নাই, এ কথা হঠাৎ আবার তাহার মনে পড়িয়াছে। তার নোংরা দুর্গন্ধ ঘর, স্থূলাঙ্গী টাকা-দিয়া-কেনা হীনচেতা স্ত্রী, তার লোভ ও ভয়ে ভরা একটানা অস্বাভাবিক জীবন। ভদ্রলোকে কীভাবে বাঁচে মধুর তাহা অজানা নয়। সৎ ধর্মভীরু গৃহস্থের জীবনযাত্রা প্রণালির সঙ্গে তার পরিচয় আছে। তেমনই একটি ঘুমন্ত পরিবারকে চোখের সামনে রাখিয়া, একটি কিশলয়ের মতো কোমল কিশোরীকে ভালোবাসিয়া (কয়েক মুহূর্ত পরে মধুর অনুভূতি একেবারে লোপ পাইবে, তবু ইহা ভালোবাসাই) মনে মনে মধু নিজের জীবনের সঙ্গে সংসারে যারা চোর নয়, তাদের জীবনের তুলনা করিল। হিংসায় ক্ষোভে হতাশায় সে জর্জরিত হইয়া গেল। ভাবিল, ফিরিয়া যায়। কাজ নাই তাহার চুরি করিয়া।

ফিরিয়া গিয়া নতুন করিয়া জীবন আরম্ভ করে। সংযত সুন্দর পবিত্র জীবন। ঈশ্বরকে আর কি ভক্তি করা যায় না ? কাদুকে শেখানো যায় না লোভ করিতে নাই, নোংরা থাকিতে নাই, অবাধ্য হইতে নাই, কলহ করিতে নাই ? সোনার চুড়ির চেয়ে রুপার চুড়িতে সুখ বেশি এ কি কাদুকে

বোঝানো যায় না ? পরকালের কথা ভাবিয়া পরদ্রব্যে লোভ করা কি তাহারা দুইজনে বন্ধ করিতে পারে না ? সে মজুর খাটিবে। গোরু কিনিয়া দুধ বেচিবে। জমি কিনিয়া চাষ করিবে। না হয় গ্রামের মধ্যে মনোহারি দোকান দিবে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলিয়া তাহারা মন্ত্র গ্রহণ করিবে। সকালে উঠিয়া দিনের দেবতাকে প্রণাম করিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবিকার্জনের জন্য খাটিয়া সন্ধ্যার পর একাগ্রচিত্তে তাহারা মালা জপ করিবে। আস্তে কথা কহিতে শিখিবে। দুঃখে বিচলিত হইবে না। হৃদয়ের শান্তিতে সকল অবস্থায় শান্ত হইয়া থাকিবে। কাদুর একটি ছেলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—কাদুরই অসাবধানতায়। এবার ছেলেমেয়ে হইলে বাঁচিবে। তাহাদের লইয়া সুখে তাহারা ঘরসংসার করিবে।

এতকাল সে তো চুরি করিয়াছে। চুরি করিয়া লাভ কোথায় ?

প্রত্যেক চোর মধ্যে মধ্যে নিজেকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তবু চুরি করিতে ছাড়ে না। চোর চুরি না করিয়া করিবে কী ? চুরি ছাড়া চোরের জীবনে আর সবই যে আকাশকুসুম।

মধুর এত অনুতাপ, রাখালের মেয়ের জন্য এত ভালোবাসা, সৎ হওয়ার এত ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলাইয়া আসিল। রাখালের তোরঙ্গটি সিঁদের ফাঁক দিয়া একটু পরে চলিয়া গেল বাহিরে। বেশি টাকা রাখিবার উপযুক্ত ওই একটি তোরঙ্গই রাখালের ছিল।

কিছু দূরে একটি আমবাগানে ঢুকিয়া মধু তোরঙ্গটি ভাঙিল। রাখালের বোধ হয় টাকা রাখিবার থলি ছিল না, নোট আর টাকাগুলি সে একটা বালিশের খোলে ভরিয়া বাক্‌সে রাখিয়াছিল। অনেকগুলি খুচরা টাকা থাকায় টাকার পুঁটুলিটি কম ভারী হয় নাই। হাতে করিয়া আনন্দে মধুর মন নাচিয়া উঠিল।

খাল পার হওয়ার সময় একবার তার মনে হইল, টাকার অভাবে রাখাল হয়তো মেয়েটার বিবাহ দিতে পারিবে না। কিন্তু কথাটা তাহার মনের মধ্যে একেবারেই আমল পাইল না। রাখালের মেয়ের জন্য তাহার বুকে আর বিন্দুমাত্র প্রেমও অবশিষ্ট ছিল না। রাখালের মেয়েকে সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

মধু জানিত, কুমারপাড়ার ঘাটে পান্নাবাবুর নৌকা বাঁধা আছে। কিন্তু ঘাটের কাছে আসিয়া ইতিমধ্যে নৌকাটি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ভাবিল, এত রাত্রে নৌকা ছেড়ে পান্নাবাবু গেল কোথায় ?

বাড়ি পৌঁছিয়া ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া মধু খুশি হইল। ভাবিল, কাদু তাহারই প্রতীক্ষায় দরজা খুলিয়া বসিয়া আছে।

আমি এসেছি, কাদু। আলো জ্বাল।

সে আসিয়াছে, কাদুকে সোনার চুড়ি দিবার ব্যবস্থা করিয়া, একবছর দেড়বছর আরামে দিন কাটানোর উপায় করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কাদু কত খুশি হইবে।

কাদুর সাড়া না পাইয়া সে ঘুমাইয়া আছে মনে করিয়া মধুর আনন্দ একটু কমিল। নিজেই সে কাঠের বাক্‌সের উপরটা হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দিয়াশলাই খুঁজিয়া প্রদীপ জ্বালিল। পরমুহূর্তে দীপালোকে ঘরের শূন্যতা প্রকট হইয়া গেল।

দুচোখে অপার বিস্ময় ও আশঙ্কা নিয়া মধু ঘরের শূন্যতাকে প্রত্যক্ষ করিল। এতরাত্রে মানুষের ঘর যে কী করিয়া এমনভাবে খালি হইয়া যায়, এ যেন হঠাৎ সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। বিছানায় কাদু নাই। দড়িতে কাদুর কাপড় দুখানা নাই। বড়ো টিনের তোরঙ্গটির উপর বেতের ছোটো ঝাঁপটিও নাই। মধু সহসা ব্যাকুলভাবে টিনের তোরঙ্গটি খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে কাদুর ক-খানা ভালো কাপড় ছিল, একটা পিতলের পানের ডিবায় সোনার মাকড়ি ছিল, আংটি ছিল। সেগুলিও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

মধুর মনের উত্তেজিত আনন্দ সহসা নিঝুম হইয়া গেল। টাকা ও নোটে ভরা বালিশের খোলটি পায়ের কাছে মাটিতে পড়িয়াছিল। সেদিকে তাকাইয়া তাহার মনে হইল আবার তাহার জ্বর আসিতেছে। সহসা মধু বীভৎস হাসি হাসিল। রাখালের ঘরের দিকে চলিবার সময় যে যুক্তি দিয়া নিজের চৌর্যবৃত্তিকে সে সমর্থন করিয়াছিল, সেই কথাটি হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে। জগতে চোর নয় কে ? সবাই চুরি করে।

যাত্রা

বৈশাখের সপ্তমী তিথিতেই এ বাড়িতে আজ বিজয়া আসিয়াছে !

চারিদিকে বিচ্ছেদ বেদনার একটি করুণ ছায়াপাত হইয়াছে। কারণটা সম্ভবত এই যে, সকলেই অল্পাধিক শ্রান্ত।

অথচ উৎসবের জের এখনও মেটে নাই।

বাড়ি এখনও আত্মীয়স্বজনে ভরিয়া আছে, ছেলেমেয়েদের কলরব কালকের চেয়ে আজ কোনো অংশেই কম নয়। অকেজো লোকের অকারণ চলাফেরা, কাজের লোকের অসহিষ্ণু ব্যস্ততা, খাওয়া, খাওয়ানো, মাছ কোটা, তরকারি কোটা, হলুদ বাটা ও রান্নার সমারোহ সবই পুরাদমে চলিতেছে। উঠানের কোণে নিম আর আমগাছের মেশানো ছায়ায় পাতা চৌকিতে বয়স্ক প্রতিবেশীদের হুঁকা টানার বিরাম নাই। তা, ইহা স্বাভাবিক বইকী। এতগুলি মানুষের মধ্যে ধরিতে গেলে কয়জনেরই বা বুকের ভিতরটা আজ ভারী হইয়া উঠিয়াছে, চোখের আড়ালে অশ্রু জমিয়াছে ? দৈনন্দিন জীবনটা নিরুৎসব সকলেরই, সে জীবন পিছনে ফেলিয়া উৎসবের নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছে আজ যাহারা, দাবি তাহাদের আনন্দ আর বৈচিত্র্য, বরকনে বিদায় ব্যাপারটা তাহাদের কাছে বিদায়-উৎসব ভিন্ন আর কিছুই নয়, মা ও মেয়ের কান্নাকাটি তাহারই আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানমাত্র।

তবু বেশ বুঝিতে পারা যায়, সমস্ত বাড়িটাই কেমন যেন ঝিমাইয়া পড়িয়াছে ; আছে সবই কেমন যেন বেমানান হইয়া আছে।

খানিক আগে কুড়াইয়া পাওয়া মালকোশকে ঠিকমতো আয়ত্ত করিতে না পারিয়া সানাই এখন, এই বেলা এগারোটার সময়, সহসা পূরবী ধরিয়া ফেলিয়াছে ; অনাবশ্যক দীর্ঘ টানগুলির মধ্যে পূরবীত্ব কিছু কম থাকিলেও বিলাপ আছে প্রচুর। সদর দরজার দুইপাশে কলাগাছ দুটি পাতা এলাইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, একটি মঙ্গল কলসের আম্রপল্লব কাল বোধ হয় ছাগলেই অর্ধেক খাইয়া ফেলিয়াছিল, এখন পর্যন্ত তাহা বদলাইয়া দেওয়া হয় নাই। আর হইবেও না। আর আধঘণ্টা পরে বাড়ির দুয়ারে মঙ্গল কলসেরই বা কী প্রয়োজন, তাহাতে অক্ষত আম্রপল্লব না থাকিলেই বা কী আসিয়া যাইবে !

ক্ষেন্তিই বিশেষ বন্ধু। ছেলে কোলে সকাল হইতে সে ইন্দুর কাছে থাকিয়াছে, নানা গল্প করিয়াছে, আশ্বাস, উপদেশ, সান্ত্বনা, নিজের প্রথম স্বামীগৃহে যাওয়ার বিশদ বর্ণনা, বলিতে কিছুই বাকি রাখে নাই। তবু যেন কথা ফুরাইতেছিল না।

না ফুরাইবার কথা।

নেপথ্যে ভবিষ্যতের ব্যথা জমিয়াছে। আবার কবে দেখা হইবে কে জানে ? এক সময়ে দুজনে বাপের বাড়ি আসিতে পারে তবেই তো। ক্ষেন্তির ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছে, আর দিন তিনেক, তারপর বছর খানেকের মতো নিশ্চিন্ত।

নিজের কথার সূত্র ধরিয়া ক্ষেন্তি বলিয়া চলিল—

নিজেকে দুভাগ করে ফেলতে হবে ভাই, একভাগ শাশুড়ি ননদ দেওর এদের জন্য, আর একভাগ বরের জন্য। যদি দেখিস শাশুড়ি ননদ একটু বেশি বেশি শত্তুর ভাবছে, প্রথম প্রথম বরের ভাগটা ছোটো করে ওদের ভাগটা বড়ো করে ফেলবি। তোর বরকে ভালোই মনে হল, অল্পেই তুষ্ট থাকবে।

ইন্দু সলজ্জে একটু হাসিল। ভালো, না ছাই ! কী লজ্জাতেই ফেলিয়াছিল কাল ? আড়িপাতার ব্যাপার জানে না কোন দেশের মানুষ ও ?

ক্ষেন্তি বলিল, হাসিস কি লো ? ও বাড়ির পুষি বেড়ালটার পর্যন্ত যখন মন জুগিয়ে চলতে হবে তখন টের পাবি। এবার অবশ্য তেমন ভাবনা নেই, যে কটা দিন থাকিস বয়েস আর রূপের সমালোচনা শুনে আর যে যা করতে বলে করে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসবি। ঠ্যালা বুঝবি পরের বার। কেউ আপন করবার চেষ্টাটুকুও করবে না—এক বর ছাড়া, তা বরও যে খুব বেশি চেষ্টা করবে মনেও করিস না—নিজে নিজে তোকে সকলের আপন হতে হবে! বাব্বা, সে এক তপস্যা। লোক যদি ওরা মোটামুটি ভালো হয় তা হলে বছর খানেকের তপস্যাতেই এক রকম ঠিক হয়ে আসে, পান থেকে খসা চুনটুকু নিয়ে আর কেলেঙ্কারি কাণ্ড বেধে যায় না, গরম মেজাজি কেউ থাকলেই চিত্তির ! একটা ফ্যাকড়া যদি বাধে আর কী, রইল তা চিরস্থায়ী হয়ে, দোষ সে তোমাবই হোক আর যারই হোক ! আমার মেজো ননদ ? কী রাগ বাবা, তাওয়ার মতো তেতেই আছে ! আমাকে গাল না দিয়ে আজও কি সে জল খায় ? খায় না ! শাশুড়ি মাগি লোক মন্দ নয় তাই রক্ষা, নইলে গিয়েছিলাম আর কী ! মেজো ননদের সঙ্গে কবে কী তুচ্ছ ব্যাপাব নিয়া খুঁটিনাটি বাধিয়াছিল, ক্ষেন্তি তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাখিল করিল ; শেষে বলিল, তা শোন, পরেব বার যখন যাবি একটা কথা মনে রাখিস যে, ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত যত মুখ বুজে খাটবি সবাই তত ভালো বলবে, আর রাত জেগে বরের সঙ্গে যত গুজগাজ ফিসফাস করতে পারবি বর তত খুশি থাকবে। বলিয়া ক্ষেন্তি হাসিল।

ইন্দু মৃদুস্বরে বলিল, শেষেরটাতেই ভয় ভাই। যে ঘুমকাতুরে আমি জানিস তো।

ঘুম আর চোখে থাকবে না লো, থাকবে না, বরঞ্চ মনে হবে, পোড়া বিধাতার কী বিবেচনা মরে যাই, এত ছোটো করেছে রাত, তার উপর আবার ঘুমের ব্যবস্থা !

ঘটনার ঘনঘটায় ইন্দুর মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল, সখীর পবিহাসে সে অল্প একটু হাসিল বটে, কিন্তু কৌতুক অনুভব করিল আবও কম। হরেন (ইন্দুর বরেব নাম ; মানুষটার চেয়ে নামটির সঙ্গেই ইন্দুর পরিচয় বেশিদিনের ; নাম ও নামীকে সে এখনও একত্র জড়াইয়া ভাবে) অনেকক্ষণ খাইতে বসিয়াছে, নতুন জামাইয়ের খাইতে সময় লাগে, কিন্তু সে আর কতক্ষণ, হরেনের খাওয়া হইলেই যাত্রা।

অজানা অচেনা মানুষের সঙ্গে সেই তালশিমুলির উদ্দেশে যাত্রা, সেখানে যাইতে হইলে তেরো মাইল পালকিতে গিয়া স্টিমার ধরিতে হয় ; রাত দশটায় সে স্টিমার কোন স্টিমার ঘাটে নামাইয়া দেয় কে জানে, তারপর রাত বারোটা অবধি পাড়ি জমাইতে হয় নৌকায়। মালপতি হইতে তালশিমুলি অনেক দূর—এতই দূর যে ব্যবধানটা ইন্দুর মনে দিকহীন রাইঘোষাণির মাঠের মতো ধুধু করিতে থাকে—বৈশাখের খররৌদ্রে যে মাঠের তৃণগুলি ঝলসাইয়া গিয়াছে, এখন যাহার দিকে তাকাইলে আগুনের হলকায় দুচোখ টনটন করিবে।

রাইঘোষাণির মাঠ ঘেঁষিয়া স্টিমার ঘাটের পথটা অনেক দূর অবধি সিধা চলিয়া গিয়াছে, তারপর ডাইনে বাঁকিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে সাতগাঁয়ে। ওই গ্রামে স্বরূপ চক্রবর্তীর বাড়ি। স্বরূপ চক্রবর্তীর ছেলের সঙ্গে ইন্দুর সম্বন্ধ হইতেছিল, কেন ভাঙিয়া গেল কে জানে ! ওখানে বিবাহ হইলে একদিক দিয়া ভালোই হইত ইন্দুর। যখন-তখন সে বাপের বাড়ি আসিতে পারিত, সোমবারে বিষ্যুদবারে বাবা আর দাদা মালসিপুকুরের হাটে যাইবার সময় তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতে পারিত, স্বরূপ চক্রবর্তীর বাড়ির পিছনের ধান খেতটা পার হইয়া আসিয়া দাঁড়াইলে মালপতির গাছপালা তাহার চোখে পড়িত ; সবচেয়ে উঁচু তালগাছটার নীচেই তাহাদের এই বাড়ি। ছেলে কালো তো কী হইয়াছে ? বরের রং ধুইয়া সে কি জল খাইত ?

তা ছাড়া, স্বরূপ চক্রবর্তী আর তাহার ছেলে দুজনেই তাকে বউ করিবার জন্য কি রকম ব্যগ্র হইয়াছিল ? চক্রবর্তী-গিন্নিকেও সে দেখিয়াছে, ভারী শান্ত অমায়িক মানুষ। ওখানে বিবাহ হইলে শ্বশুরবাড়ির আদর জুটিবে, কী অনাদর জুটিবে এই নিয়া ইন্দুকে আর এমন দুর্ভাবনায় পড়িতে হইত না। তাহাকে বউ পাইলে উহারা বর্তিয়া যাইত।

তবে কিশোর মহাদেবের মতো এমন বরটি তাহার জুটিত না, এই যা আপশোশের কথা।

মার অবসর কম, খুব ভোরে আধঘণ্টাখানেক মেয়েকে বুঝাইবার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন, তারপর মাঝে মাঝে নানা ছলে মেয়ের ম্লান মুখখানি দেখিয়া যাওয়ার বেশি সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এখন আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। নূতন জামাইকে আদর করিয়া খাওয়াইবার লোক আবশ্যকের অতিরিক্তই ছিল তথাপি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, যা তো মা ক্ষেন্তি, জামায়ের খাওয়াটা একটু দ্যাখ তো গিয়ে।

সে কি মাসিমা ? জামাই একা খাচ্ছে নাকি ? ছেলেকে কাঁখে তুলিয়া ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি চলিযা গেল।

মা বলিলেন, পাতের কাছে বসলি আর উঠে এলি কিছুই তো খেলি না ইন্দু ? একটু দুধ এনে দি চুমুক দিয়ে খেয়ে ফ্যাল মা, খিদেয় নইলে যে সারা হয়ে যাবি ?

মার গলার স্বর এমন করুণ শোনাইল যে, দুধ খাইতে ইন্দু অস্বীকার করিতে পারিল না, বলিল, এখন না মা, পরে খাবখন।

পরে আর কখন খাবি মা, পর কি আর আছে ? জামায়ের খাওয়া হলে সবাই তোকে আবার ছেঁকে ধরবে, তখন কি আর খেতে পারবি ? এখুনি খেয়ে নে।

আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না মা !

মার চোখ সজল হইয়া উঠিল—তা কী আমি বুঝি না মা, তবু খেতে হবে। রাস্তায় তুই খিদেয় কষ্ট পাচ্ছিস ভেবে আমি এখানে কী করে থাকব বল দেখি ? একটু দুধ তুই খা ইন্দু, লক্ষ্মী মা আমার।

একটু মানে এক বাটি এবং বাটিটাও নেহাত ছোটো নয়। দুধের পরিমাণ দেখিয়া ইন্দু ভয় পাইল। মার মুখ চাহিয়া সবখানি দুধ কোনোমতে যে গেলা যায় না এমন নয়, কিন্তু রাস্তায় বমি হওয়ার আশঙ্কা আছে। তবু খাইতে হইল তাহাকে সবটাই। সে যেন অবোধ অবাধ্য শিশু এমনিভাবে গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া তোষামোদ করিয়া বকিয়া মা তাহাকে সবটুকু দুধ খাওয়াইলেন, ভিজা হাত মুখে বুলাইয়া নিজের আঁচলে মুখ মুছাইয়া দিলেন, চুপিচুপি বলিলেন, এক কাজ করবি ইন্দু ? খানিকটা সন্দেশ দলা করে কলাপাতায় মুড়ে দিচ্ছি, সঙ্গে নিবি ? রাস্তায় যদি খিদে পায়—

মাগো, মেয়েকে যে তিনি এত ভালোবাসেন আগে তাহা কে জানিত ! দুদিন আগেও ইহাকে কারণে অকারণে কত মুখঝামটা দিয়াছেন, কত লাঞ্ছনা করিয়াছেন। সে সব কথা ভাবিলেও আজ চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চায়। দেখিতে দেখিতে মেয়ের দেহ দিঘল হইয়া উঠিল, দুধ না, ভালো মাছটুকু না ; তবু যেন কলাগাছের মতো হুহু করিয়া বাড়িয়া চলে, অথচ বর জোটে না। মেয়ের দিকে তাকাইলেও বুকের ভিতরটা যেন তাহার হিম হইয়া যাইত। এক বছর ধরিয়া পেটের মেয়ে যেন শত্রুরও বাড়া হইয়াছিল। এমন রাজরানির মতো আজ ইহাকে মানাইয়াছে, এমন গড়ন, এমন মাজা রং, এমন লাবণ্য—কিছুই কী তখন চোখে পড়িত ছাই ! মনে হইত, এমন কুরূপা মেয়ে ভূভারতে আর জন্মায় নাই।

চিবুক ধরিয়া উঁচু করিয়া মা ইন্দুর লজ্জিত মুখখানি অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখিয়া ভাবিলেন, বড়ো অন্যায় হইয়াছিল, বিনা দোষে মুখ বুজিয়া কত দুঃখই এ মেয়ে তাহা সহিয়াছে ! বিন্দুর বেলা সাবধান থাকিবেন, আর অমন করিয়া যখন তখন বকিবেন না, যা তা খোঁটা দিবেন না।

আশ্চর্য এই, মেয়ে যে প্রায় আধাআধি সর্বনাশ করিয়া চলিল এ কথা মার মনেও পড়িল না। তেরো বিঘা ধানের জমি একেবারেই গিয়াছে, স্বামী-পুত্র লইয়া মাথা গুঁজিবার এই ঠাঁইটুকু এগারো শো টাকায় বাঁধা পড়িয়াছে। কত মাস, কত বছর ধরিয়া স্বামীর অল্প আয়ের অধিকাংশ গ্রাস করিয়া এ বাড়ি মুক্ত হইবে কে জানে। কেমন করিয়া সংসার চলিবে, পাঁচ-ছয় বছর পরেই বিন্দুর বিবাহ দিতে হইবে, তখন কী উপায় হইবে এ সব ভাবিলেও মাথা ঘুরিয়া যাওয়ার কথা, মা কিন্তু এখন ও-সব কিছুই ভাবিতেছিলেন না। ভাবিবার সময় অনেক জুটিবে, মেয়ে যে আজ তাঁহার মহাসমারোহে পর হইয়া যাইতেছে।

ইন্দু আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ মা, খোকার ঘুম ভাঙেনি ?

জানিনে। ওর দিকে তাকাবারও সময় পেয়েছি কি সকাল থেকে ? সময়মতো ওষুধও আজ বোধ হয় খাওয়ানো হয়নি।

ইন্দু বলিল, আমি খাইয়েছি ওষুধ। বিকালে ডাক্তারবাবুকে আর একবার আনিয়ো মা। দেখে আসি খোকাকে একবার—

ওদিকের ছোটো ঘরটিতে পাঁচ-ছয় বছরের একটি ছেলে শুইয়াছিল, সাত-আটদিন ক্রমাগত জ্বরে ভুগিয়া জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সাত মাইল দূরের গ্রাম হইতে ডাক্তারকে বার দুই আনা হইয়াছিল, জ্বরটা তিনি ঠিক ধরিতে পারেন নাই, কিন্তু দুই-চারদিনের মধ্যে কমিয়া যাইবে বলিয়া খুব জোরালো আশ্বাস ও ঝাঁঝালো ওষুধ দিয়াছেন। খোকা জাগিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছিল, মাকে দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে, সে সন্দেশ খাইবে।

মা বুঝাইয়া বলিলেন, আজ দিদি চলে যাবে, আজকেই তুই সন্দেশ খাবি খোকা ? দিদিকে তুই ভালোবাসিসনে বুঝি ? তুই কাঁদিস তো ইন্দু—খুব কাঁদিস পালকিতে উঠে।

খোকা সভয়ে কান্না থামাইয়া বলিল, আমি দিদির সঙ্গে যাব।

যাস। আগে তবে বার্লি খা। বার্লি না খেলে দিদি সঙ্গে নেবে না।—নিবি ইন্দু ?

ইন্দু কান্না চাপিয়া বলিল, না।

মা বার্লি আনিতে চলিয়া গেলেন।

এ ঘরখানা খুবই ছোটো, পুরোনো চাঁচের বেড়া, বিবর্ণ টিনের চাল। এককোণে এক বোঝা প্যাঁকাটি ঠেস দিয়া রাখা হইয়াছিল, কখন কাত হইয়া পড়িয়াছে, বাঁশের তৈরি চৌকির তলে সারি সারি গুড়ের হাঁড়ি সাজানো। দরজার বাহিরেই বাড়ির কিষান গোরুর জন্য বিচালি কাটে, ঘরের মধ্যে খড়ের টুকরা উড়িয়া আসিয়া পড়িয়াছে।

এই ঘরেই খোকা জন্মিয়াছিল। ইন্দুর সহসা সে কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার আকস্মিক ও অপরিমিত আশঙ্কার মধ্যে যুক্তির সম্পূর্ণ তিরোভাব ঘটিল। মনে হইল, বিবাহের গোলমালে রোগা ছেলেটাকে যে এ ঘরে সরাইয়া আনা হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় নিয়তির হাত ছিল, ফলটা হয়তো ইহার শুভ হইবে না।

মনে মনে ইন্দু ভয় পাইল। কয়েক সেকেন্ডের কল্পনায় সে যেন ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ফেলিয়াছে। কুলুঙ্গিতে তিন-চারিটা ওষুধের শিশি, চোখ তুলিয়া ইন্দু সেগুলি ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিল, উপরের তাকে খোকার ময়লা রবারের বলটা কে যেন তুলিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের বুড়োটে খেয়ালের ঠিক উপরেই খোকার ছেলেখেলা।

তোর বলটা তাকে কে তুলে রাখলে রে খোকা ?

গদাইদা রেখেছে। খেলিতে খেলিতে খোকার হাত যখন ব্যথা হইয়া গেল, গদাইদা তখন বলটা তুলিয়া রাখিল।—শুয়ে শুয়ে বল খেলা বিচ্ছিরি, না দিদি ?

হ্যাঁ। আচ্ছা খোকা, বল খেলতে তুই খুব ভালোবাসিস ?

বল খেলিতে ভালোবাসে না ! বাসেই তো !

দাঁড়া তবে, আসবার সময় পোড়াবাড়ি ঘাটের সেই মনোহারি দোকান থেকে তোর জন্যে দুটো বল কিনে আনব, তেমন বল তুই কখনও দেখিসনি খোকা, তোর এটা তো ছোট্ট, সেগুলি এর ঠিক দুনো হবে—দেখিস। আর সাদা যেন ধপ্‌ধপ্‌ করছে ! ভালো হয়ে একসঙ্গে তিনটে বল নিয়ে মজা করে খেলবি, কেমন ?

একটু উৎসুক উদগ্রীব সুরেই ইন্দু কথাগুলি বলিল, বলের বর্ণনা শুনিয়া খোকার লুব্ধতা চরমে উঠিয়া যাইবে এ রকম একটা আশা যেন তাহার আছে। তাহার ফিরিয়া আসা অবধি বলের লোভে খোকা অশুভকে ঠেকাইয়া রাখিবে এমন যুক্তিহীন কথাও ইন্দু আজ এই একান্ত অসময়ে সম্ভব মনে না করিয়া পারিল না।

ঘরের পিছনেই ছিটাল, গোটা দুই কণ্টকাকীর্ণ বাবলা গাছের গোড়া হইতে ডোবার পাড়টা ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে। ডোবায় এখন জল নাই, শুধু আগাছা আর কাদার একটু তলানি। একটা চাপা বাষ্পীয় দুর্গন্ধ ওখান হইতে উঠিয়া আসিতেছিল, কী যেন পচিয়া গিয়াছিল এখন রোদের তেজে শুকাইয়া উঠিতেছে। ইন্দুর মনে পড়িল বছর তিনেক আগে মাব যখন কঠিন অসুখ হইয়াছিল তখন খোকাকে কাছে লইয়া শুইয়া প্রথম কয়েক রাত্রি যে গন্ধে তাহার ঘুম আসে নাই, এই দুর্গন্ধ যেন তাহারই অনুরূপ। আজ দুপুরে সেই ক-টি রাতদুপুরের নিরুপায় ক্রোধ ও বিরক্তি যেন স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

এতক্ষণে ইন্দুর ভালো করিয়া কান্না আসিল, উচ্ছল উচ্ছ্বসিত কান্না ; চাপিবার চেষ্টা করিয়াও সে চাপিতে পারিল না, খোকাকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। চোখে চাপা দেওয়া আঁচল তাহাব চোখেব জলে ভিজিয়া গেল।

কিন্তু বেশিক্ষণ সে কাঁদিল না, অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রান্ত ও নিস্তেজ হইয়া থামিয়া গেল। মনে হইল, একটু ঘুমাইতে পারিলে সে যেন বাঁচিত। খোকার পাশে শুইয়া খোকাব শীর্ণ তপ্ত দেহটি বুকে জড়াইয়া খানিকক্ষণের জন্য চোখ বুজিবার লোভ ইন্দুকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। বরের খাওয়া বোধ হয় এতক্ষণে হইয়া গিয়াছে, আঁচাইয়া পান মুখে দিতে তাহার যতটুকু সময় লাগিবে, ঠিক ততটুকু সময় ইন্দু তাহার ছোটো ভাইটিব বিছানায় একটু শুইতে চায় আজ।

বিদায় সত্যই সমারোহের ব্যাপার।

কয়েকটি অনুষ্ঠান আছে। সুন্দর কয়েকটি মেয়েলি আচার যথাবিহিত পালন করিতে হয়। প্রণামের ঘটাও কম নয়। উচ্চারিত অনুচ্চারিত আশীর্বচন লিপিবদ্ধ করিলে একখানি চটি বই হয়।

প্রতিবেশিনীদের মন্তব্যগুলি (পরস্পরের প্রতি ফিসফিস করিয়া কিন্তু বরকনে এবং অন্যান্য অনেকেরই সুশ্রাব্য স্বরে) চটি বইয়ে কুলায় না।

ইহাদের মধ্যে বয়স্করা স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারেন তিনটি ছেলেমেয়ে কোলে লইয়াও শ্বশুরবাড়ি আসিতে তাঁহারা কত কাঁদিয়াছিলেন, যাহারা ছোটো শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় খুব একচোট কাঁদিবার ভরসা তাহারা রাখে। ইন্দু যে কাঁদিল না, ইহাদের সকলের কাছেই তাই তাহা অসহ্য ঠেকিল। শব্দ করিয়া না কাঁদুক, ঘন ঘন চোখও কি মুছিতে পারে না মেয়েটা ?

দেখলে রাঙামাসি ? মেয়ে ধাড়ি করে বিয়ে দেবার ফলটা একবার দেখলে ? বর পেয়ে বর্তেছেন ! একফোঁটা জল নেই গা মেয়ের চোখে ?

প্রতিবাদ করে ক্ষেন্তি।

রাঙামাসি আবার কী দেখবে কালো পিসি ? ওর চোখ দুটোর দিকে তুমিই চেয়ে দ্যাখো। সকাল থেকে কেঁদে কেঁদে চোখ যে ওর জবাফুল হয়ে আছে এ তো কানাও দেখতে পায়।

কালো পিসি মুখ কালো করিয়া বলেন, কী জানি বাছা, কেঁদে, না রাত জেগে চোখ জবাফুল হয়েছে—আজকালকার মেয়ে তোরাই ও সব ভালো বুঝিস !

মুখ মুছিবার ছলে হরেন হাসি গোপন করে।

অথচ যে চোখ দুটির জবাফুল হওয়া নিয়া এই কৌতুক তাহা ঘোমটার আড়ালে গোপন হইয়াই থাকে, সে চোখে জল, না কাজল, ঘোমটা না তুলিলে তাহা আর নজরে পড়ে না। তা এই পুরোনো মুখে ঘোমটাই এখানে দ্রষ্টব্য, ঘোমটা তুলিবার কৌতূহল ইহাদের কম। স্বামীগৃহে পা দিবামাত্র সেখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে যে কৌতূহলের প্রাচুর্য ইন্দুর মুখখানিতে মুহুর্মুহু সিঁদুর ছড়াইয়া দিতে থাকিবে।

রওনা হওয়ার সময় হইয়া আসে, কিন্তু বিদায় দিয়াও বিদায় দেওয়া হয় না, বরকর্তা তাগিদ দিতে দিতে উষ্ণ হইয়া ওঠেন, চারিদিক হইতে এই হল, এই হল রব উঠিয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্ত করে, কনের বাবা ঠ্যাঙানো জন্তুর মতো উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ক্রমাগত হাত কচলান, ওদিকে দিদির সঙ্গে যাওয়ার বায়না নিয়া খোকার কান্না আর থামে না।

ইন্দুর ইচ্ছা হয় এই অসহ্য অত্যাচারের হাত এড়াইতে ছুটিয়া পালকিতে উঠিয়া পড়ে। বেদনার এ বিরাট ভূমিকা কেন ? থাকিবার যখন উপায় নাই, তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো। উঠানে দাঁড়াইয়া না থাকা, না যাওয়ার যন্ত্রণাটা এমন সমারোহের সহিত ভোগ না করিলে কি নয় ?

দাঁড়াইয়া থাকিতে ইন্দুর কষ্ট হয়। সর্বাঙ্গ যেন অবশ হইয়া আসিতেছে।

অঙ্গন-লগ্ন ছায়াটিই ইন্দু দেখিতে পাইতেছে, তাহাও ঘোমটার ভিতর দিয়া কয়েক হাত পরিধির মধ্যে অংশটুকু, কিন্তু মাথার উপরে যে প্রকাণ্ড আমগাছটি চাঁদোয়ার মতো নিজেকে ডালপালায় ছড়াইয়া দিয়াছে তার সর্বাঙ্গ ছাইয়া মুকুলের সমারোহ সে স্পষ্ট কল্পনা করিতে পারে। আষাঢ়ের শেষাশেষি এ গাছের ফল পাকিবে—খাইয়া শেষ করা যায় না এত ফল। কে জানে সে তখন থাকিবে কোথায় ?

খোকা কাঁদিতেছে, খুব আস্তে কাঁদিতেছে, পায়ের নীচের ঘন ছায়া কেমন গাঢ় নীল হইযা উঠিল, ঘোমটার প্রান্ত হইতে একটা ধোঁয়াটে কুয়াশা উঠান পর্যন্ত নামিয়া যাইতেছে—তবু খোকা কাঁদিতেছে, অনেক দূরে তালশিমুলির চেয়ে অনেক দূরে ঝিঁঝির ডাকের মতো কেমন ঝিমাইযা ঝিমাইয়া খোকা কাঁদিতেছে, শুনিতে শুনিতে ইন্দুর মাথার মধ্যে একটা দুর্বোধ্য ঝমঝম শব্দ আরম্ভ হইল এবং পর মুহূর্তে সমস্ত উঠানটা বার কয়েক দুলিয়া শব্দহীন অন্ধকারে তলাইয়া গেল।

দুই হাত বাড়াইয়া উঠানটা ধরিতে গিয়া সে উঠানেই টলিয়া পড়িয়া গেল।

হরেনই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, কিন্তু ধরিয়া রাখিল না। আস্তে আস্তে উঠানে নামাইয়া দিয়া বাকি কর্তব্যের ভার অন্য সকলের উপর ছাড়িয়া দিয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল।

চারিদিকে ভারী চেঁচামেচি আরম্ভ হইল। কী হইল এবং যা হইল তা কেমন করিয়া হইল জানিতে চাহিয়া, জল ও পাখার দাবি জানাইয়া সকলে বিষম হট্টগোল বাধাইয়া দিল, ভূলুণ্ঠিতা কন্যার মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া মা বারবার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, মেয়েরা একবাক্যে হা-হুতাশ করিল।

তারপর জল আসিল, পাখা আসিল, ইন্দুর সিঁথির আলগা সিঁদুর জলে ধুইয়া গেল, তাহার রাঙা চেলিতে উঠানের কাদা লাগিল এবং প্রায় চার মিনিট সময় সকলকে ভীতসন্ত্রস্ত বিহ্বল ও উত্তেজিত করিয়া রাখিয়া ইন্দু চোখ মেলিয়া তাকাইল। চারিদিকে চাহিয়া সে বলপ্রয়োগে উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মার দৃঢ় আলিঙ্গন ছাড়াইতে পারিল না।

মা বলিলেন, শুয়ে থাক মা, শুয়ে থাক ; ও শ্রীহরি ও মধুসূদন, একি বিপদ ঘটালে !

যাত্রা আধঘণ্টা খানিক পিছাইয়া গেল।

ইন্দুর আকস্মিক মূর্ছার কারণ সম্বন্ধে গবেষণা হইল প্রচুর। উপবাস, দুর্বলতা, মনোকষ্ট, গ্রীষ্মাতিশয্য, ঢং লো ঢং, ঢং করে মেয়ে মূর্ছা গেলেন, এ আর বুঝি না, এই অনুমান কয়টিই প্রাধান্য

পাইল বেশি। অবশেষে সাব্যস্ত হইল যে, দুর্বলতা নয়, অমন স্বাস্থ্যবতী মেয়ের আবার দুর্বলতা কীসের, গরমটাই আসল কারণ। সহজ গরমটা পড়িয়াছে আজ ? বসিয়া থাকিতে থাকিতেই লোকের ভিরমি লাগিবার উপক্রম হয়।

ছেলের বাবা কিন্তু গরমের অপরাধটা মানিয়া লইয়া মেয়ের বাবাকে অত সহজে রেহাই দিলেন না। বলিলেন, একী কাণ্ড মশাই ? ফাঁকি দিয়ে একটা মৃগী রোগীকে ঘাড়ে চাপালেন ?

ইন্দুর বাবা ভয়ে ভয়ে বলিলেন, আজ্ঞে মৃগী রোগী নয়, জীবনে আব কখনও ওর ফিট হয়নি। আজ গরমে—

গরম ! কীসের গরম ! গরম বলিয়াই ফিট হইবে নাকি ?—বলি, গরম লাগিল কি একার আপনার মেয়ের ? কই, এই তো এতগুলি মানুষ আছে এখানে আর কারও তো ফিট হল না, বেয়াই মশাই ?

পাত্রপক্ষের জনৈক মাতব্বর যোগ দিলেন। বেহায়া মশায় বলুন, দাদা। বাবা, এ যে দিনে ডাকাতি !

এ সমস্তেব আব জবাব কী, ক্রুদ্ধ বৈবাহিকের সামনে বিপাকে-পড়া নৌকার মতো ইন্দুর বাবা টলমল করিতে লাগিলেন, তাঁর বংশ মৃগীরোগীর বংশ নয়, শুধু এই অস্বীকৃতির হালে কোনো মতে সামলানো গেল না। রফা হইল তিনশো টাকায়। বরের বাবা পাষণ্ড নন, মূর্ছার ব্যারাম আছে বলিযাই পুত্রবধূকে তিনি ত্যাগ করিতে পাবিবেন না, চিকিৎসা কবিয়া বউকে তিনি আরাম করিবেন। মেয়ের চিকিৎসার খরচ মেয়ের বাবা যৎকিঞ্চিৎ আগাম দিবেন ইহা কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়।

তা নিশ্চয় নয়, কিন্তু সঙ্গতি ? মুখর জনতার মধ্যে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ইন্দুব বাবা ভাবিতে লাগিলেন যে, মেয়ের শুভবিবাহে শুভ যে কাহার হইল তাহাই ভাবনার বিষয়।

উত্তেজিত বেদনায় হৃদয় ভাঙিয়া যাওয়াব সময চার মিনিট তাহাকে ক্লোরোফর্ম করিয়া বাখাব জন্য ভাগ্য ডাক্তারকে যে তিনশো টাকা ঘুষ দিতে হইয়াছে ইন্দু তাহা জানিতে পারিল না। জানাইয়া যাহারা দিত মেয়েকে একপ্রকার কোলে কবিযা পালকিতে তুলিয়া দেওয়া পর্যন্ত মা তাহাদের সংযত রাখিয়াছিলেন। তাঁহাব মর্মবেদনার ব্যূহ ভেদ করিয়া আর কেহ ইন্দুর নাগাল পায় নাই।

পালকির মধ্যে হরেনের সান্নিধ্যে মূর্ছার জন্য ইন্দু তাই কেবল লজ্জাতেই মরিয়া যাইতেছিল—বাধ্য হইয়া একটু একটু চেনা বরের কোলে মাথা রাখিয়া শুইবার মধুর লজ্জা।

পালকি তখন আটজন বেহারার কাঁধে রাইঘোষাণিব মাঠ ঘেঁষিয়া চলিয়াছে। অন্য পালকি চারখানা পিছাইয়া পড়িয়াছিল, হরেন পালকির দরজা খুলিয়া দিল। বলিল, ঘামে সেদ্ধ হওযাব চেয়ে গরম বাতাসও ভালো। কি বল ?

ইন্দু কিছুই বলিল না, উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল।

বাধা দিয়া হরেন বলিল, না না, উঠো না, শুয়ে থাকো।

ইন্দু জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, আপনার কষ্ট হচ্ছে।

একদিকে তরুলতাহীন প্রান্তর, অন্যদিকে গ্রাম ও খেতখামার, ইহারই মধ্য দিয়া অসময়ের যাত্রী দুটি এমনিভাবে সর্বপ্রথম পরস্পরের সুখ-সুবিধার কথা ভাবিতে আরম্ভ করিল। পালকি বেহারাদের পায়ে পায়ে যে ধুলা উঠিল, রাইঘোষাণির মাঠের বাতাস তাহা কোনদিকে উড়াইয়া দিতে লাগিল তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না।

খানিক পরে পালকি সাতগাঁয়ে প্রবেশ করিল।

হরেন জিজ্ঞাসা করিল, এ গাঁয়ের নাম জানো, ইন্দু ? আসবার সময় শুনেছিলাম, ভুলে গেছি।

পালকির কোণে জড়োসড়ো ইন্দু জবাব দিল, সাতগাঁ।

গ্রামটিকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য হরেন পালকির বাহিরে মুখ বাড়াইল। দেখিল, একটা ময়রার দোকানের পরে পথের ধারে প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছের তলে একটি কালো ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে একখানা বই। বকুলগাছের ছায়ায় বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে পালকির শব্দ শুনিয়া ছেলেটি কৌতূহলবশে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, হরেন এইরূপ অনুমান করিল।

তারপর আরও কত গ্রাম, কত মাঠ পার হইয়া সন্ধ্যার একটু আগে পালকি স্টিমারঘাটে পৌঁছিল। স্টিমার তখন সবে আসিয়া নোঙর ফেলিয়াছে। নদীর অপর তীরে একটি চিতা প্রায় নিবিয়া আসিতেছিল। আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া হরেন বলিল, পথে চিতা দেখলে শুভ হয়। তোমার আমার খুব মনের মিল হবে, হবে না ?

যেন পথে চিতা না দেখিলে তাহাদের মনের মিল হইতে বাকি থাকিত !

প্রকৃতি

দশ বছর পরে দেশে ফেরাটা সাধারণত যথেষ্ট উত্তেজনার ব্যাপার। তবে সকলের পক্ষে নয়। সংসারে এমন অনেক মানুষ থাকে, জীবন যাহাদেব এমন শিক্ষাই দেয় যে প্রত্যাশা করিতে তারা ভুলিয়া যায়। দেশ-বিদেশ, আপন-পরের পার্থক্য ঘুচিয়া যায়। যেখানে বাস করে তাই হয় তাহাদের দেশ, কারণে অকারণে যাহাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, তাহারাই হয় আত্মীয়বন্ধু।

হাওড়া স্টেশনে নামিয়া দাঁড়ানোর সময় বিশেষভাবে বিচলিত হওয়াই অমৃতের পক্ষে উচিত ছিল। সর্বস্ব হারাইয়া একদিন যে দেশ সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, আজ আবার সেই সর্বস্বের তিনগুণ সঞ্চয় লইয়া দেশে ফিরিয়াছে। কত বিচিত্র অনুভূতি জাগিতে পারিত অমৃতের, কত বিভিন্ন ভাবাবেগে সে উদ্‌বেল হইয়া উঠিতে পারিত। সে সব কিছুই হইল না। শুধু এই কথাটা তার মনে পড়িয়া গেল যে একদিন এই স্টেশনেই থার্ডক্লাসে উঠিয়া সে দেশত্যাগ করিয়াছিল, আজ এইখানে নামিতেছে ফার্স্টক্লাস হইতে। বিশেষ করিয়া এই কথাটা কেন মনে পড়িল কে জানে ! হঠাৎ পথের ভিখারি হইয়া দেশ ছাড়িবার চেয়ে থার্ডক্লাসে উঠিয়া দেশ ছাড়াটাই কি তার কাছে বড়ো দুর্ভাগ্য হইয়া উঠিয়াছিল ? ইংরাজ সহযাত্রীটির নিকট বিদায় লইবার সময় আজ যেন সেদিনকার সেই বোঝাই কামবায় অপরিচ্ছন্ন ঘর্মাক্ত মানুষগুলির মধ্যে বসিয়া থাকিতে তার যে অসহ্য কষ্ট হইয়াছিল এটুকু ছাড়া স্মরণ করিবার আর কিছুই সে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

গরিব হইয়া সে ছিল প্রায় বছর তিনেক। এই তিন বছরের ইতিহাস স্মরণ করিতে গেলে এই ধরনের স্মৃতিগুলিই যেন সবচেয়ে স্পষ্টভাবে মনে পড়ে—কবে কোথায় নোংরা মানুষেব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে তার অসহ্য কষ্ট হইয়াছিল। মনের মধ্যে যে একটা বিস্ময়কর রহস্যের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, এ কী আশ্চর্য প্রকৃতি তার যে, দারিদ্র্যের চেয়ে দরিদ্রকে সহ্য করিতে তার কষ্ট হইযাছিল বেশি ?

অধিকাংশ মালপত্র এবং গাড়িটা অমৃত আগেই কলিকাতায় চালান করিয়া দিয়াছিল। সোফার গাড়ি আনিয়াছে। গাড়িতে উঠিয়া শহরতলিতে সদ্যক্রীত নিজের পুরাতন বাড়িটার দিকে চলিতে চলিতে এই কথাটাই অমৃত ভাবিতে লাগিল। টাকার অভিশাপ তার অজানা নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা যাদের আছে তাদের সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে। প্রয়োজনের উপযুক্ত টাকা যাদের নাই তাদেরও তো সে সহিতে পাবে না !

তবে ওদের জন্য একটা অনাবিল শ্রদ্ধা সে আজ দশ বছর মনের মধ্যে পোষণ করিয়া রাখিয়াছে—বিশেষ করিয়া তার দেশের গরিব মধ্যবিত্ত মানুষগুলির জন্য। টাকার জন্য আজীবন ওরা লালায়িত থাকে, টাকাব কাছে মাথা নিচু করিয়া জীবনের অনেক কিছু মহার্ঘ ওরা বিসর্জন দেয়, তবু টাকাকেই ওরা মানুষের একমাত্র মূল্য বলিয়া ধরিয়া রাখে না—মনুষ্যত্বের অন্য মর্যাদাও বোঝে। নিজের জীবনে অমৃত এ জ্ঞান আহরণ করিযাছে। এবং তার কটু স্বাদ আজও সে ভুলিতে পারে নাই। টাকার সঙ্গে কত সহজে সে টাকাওয়ালা বন্ধুদে' হারাইয়াছিল ! সুসময়ের বন্ধুদের সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদবাক্যটা জানে সকলেই, কিন্তু নিজের জীবনে সেটা ঘটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সে জানার অনেক পার্থক্য। ধনী সমাজটার প্রতি চিরস্থায়ী বিদ্বেষে অমৃতের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বিদেশে এই বিদ্বেষের তীব্রতা কম ছিল। ভাষা ও সামাজিক রীতিনীতির পার্থক্য যেন বিদেশি ধনীদের পক্ষে একটু ওকালতি করিত, মনে হইত ওরা ঠিক তার দেশের সেই টাকাওয়ালা মানুষগুলির মতো নয়, যাদের কাছে মানুষের খাতির শুধু ব্যাঙ্কের টাকার অঙ্কটার অনুপাতে। রাখাল হালদার,

যার টেনিস কোর্টে যার ছেলেমেয়ের সঙ্গে টেনিস খেলিয়া তার কম পক্ষে সাত জোড়া জুতা ক্ষয় পাইয়াছে, অথচ শেষবার যার বাড়ি গিয়া একেবারে বাহিরতম বসিবার ঘরটি পার হইবার অনুমতি সে পায় নাই, তার সঙ্গে বিদেশের নানা জাতি ও ধর্মের পরিচিত ধনী লোকগুলির একজনের সাদৃশ্য সে খুঁজিয়া পাইত না। ওদের সঙ্গে তাই সে মিশিতে পারিত, তার জ্বালাভরা বিদ্বেষ তাকে দূরে সরাইয়া রাখিত না। দু-একজন অবস্থাপন্ন বাঙালি সেখানে যারা ছিল, শুধু তাদের সঙ্গেই ছিল তার বিরোধ। একটা ঠান্ডা উপেক্ষাপূর্ণ ভদ্রতা দিয়া এদের সে ঠেকাইয়া রাখিত, এতটুকু ঘনিষ্ঠতার সুযোগ দিত না। ওরা বাঙালি বলিয়া নয়, ওদের টাকা ছিল বলিয়া।

ভাগ্যের বিপরীত বায়ুপ্রবাহে মনের আবেগ প্রায় শীতল হইয়া আসিলেও বাংলা ও বাঙালির জন্য একটা প্রশান্ত সহজ মমতা অমৃতের ছিল। দেশে আসিলেই যে জীবনটা তাহার আনন্দ ও সার্থকতায় ভরিয়া উঠিবে এ আশা অমৃতের এতটুকু নাই, তবু বাকি জীবনটা দেশে কাটানোই সে স্থির করিয়াছে। বাংলার জল বায়ু আর বাঙালির সাহচর্য—মধ্যবিত্ত বাঙালির। একটা ক্ষীণ ভীবু সংকল্পও অমৃতের মনে আছে, কোনো এক বাড়ির গৃহস্থের সংসার হইতে শান্ত সেবাপরায়ণা সাদাসিধে একটি মেয়েকে হয়তো একদিন সে ঘরে আনিবে।

নিজের এই বাড়িখানা অমৃত একদিন বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল, ফিরিয়া আবার কিনিতে তাহাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই, টাকাও দিতে হইয়াছে অনেক বেশি। তা হোক, এ বাড়ির গেট হইতে তার নাম লেখা পিতলের পাতখানা একদিন খসিয়া পড়িয়াছিল, আজ আবার তেমনই একখানা পিতলের ফলক সেখানে আঁটিয়া দিতে পারার মধ্যে যে গর্ব ও আনন্দ আছে তার জন্য যে কোনো মূল্য দিতেই সে কুণ্ঠিত হইত না। তার পুরোনো আসবাবপত্রও অনেক রহিয়া গিয়াছে। সমস্ত বাড়ি ঘুরিয়া দেখিয়া অমৃত অত্যন্ত আরাম বোধ করিল। মনে হইল এমনিভাবে আবার এ বাড়িটা দখল করিবার জন্য দশ বছর ধরিয়া তার ভিতরে যে কতবড়ো জোরালো আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া ছিল, এতকাল সে তাহা ধরিতে পারে নাই। পুরোনো দিনের পুরোনো প্রথায় বাঁচিবার সাধ সে ত্যাগ করিয়াছে, তবু এ কী আশ্চর্য যে শুধু তার পুরোনো বাড়ি আর পুরোনো আসবাবগুলি তাকে এতখানি খুশি করিয়া তুলিতে পারিয়াছে ! তা এমনি হইবে হয়তো। এখানে বাস করিবার সময় যে মানুষগুলির সঙ্গে তার ভান-করা প্রীতির সম্পর্ক ছিল, ঘৃণা সে করে তাদের। এখানকার জড় পদার্থের নীরব অভ্যর্থনাকে সে সাগ্রহে গ্রহণ করিবে না কেন ? এই গৃহ ও আসবাবের বিরহে সে কী একদিন কম কাতর হইয়াছিল !

দোতলায় সামনের দিকের প্রশস্ত বারান্দায় দাঁড়াইয়া অমৃত চারিদিকে তাকায়, কয়েকটা নতুন বাড়ি উঠিয়াছে, আশেপাশে, গিরিনবাবুর প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িটাকে প্রায় আড়াল করিয়া কে যেন আরও বড়ো আরও উঁচু একটা বাড়ি তুলিয়াছে। গিরিনবাবু ! অমৃতের প্রতি কত গভীর স্নেহ ছিল বলিয়া তিনি তার এগারো হাজার টাকার গাড়িটা একেবারে হাতে-হাতে নগদ পাঁচ হাজার দিয়া কিনিয়া লইয়াছিলেন ! যে রকম সাবধানি সতর্ক মানুষ গিরিনবাবু, দু-তিন হাজার লাভ রাখিয়া বেচিতে না পারিয়া থাকিলে হয়তো আজও সেই গাড়িতে তিনি চাপিয়া বেড়ান ! রাস্তায় মোড়ে রামলালের পানের দোকানটা এখনও আছে, রামলাল একদিন ছিল অমৃতের বেয়ারা। দীনবেশে পায়ে হাঁটিয়া চোরের মতো অমৃত যেদিন শেষবার এখানে আসিয়াছিল, রামলাল ঝুঁকিয়া তাকে সেলাম করিয়াছিল। সম্মুখ দিয়া যাওয়ার সময় মোটর থামাইয়া ওর সঙ্গে অমৃত কিছুক্ষণ কথা বলিবে। ওর সেই অযাচিত সেলামটি তো ভুলিবার নয়।

কার কার বাড়ি গিয়া দেখা করিয়া আসিবে, অমৃত তা অনেক আগেই ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল, পরদিন সকালে সে বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই গেল আলিপুরের উকিল প্রমথবাবুর বাড়ি। অমৃতের শেষ মামলাটা প্রমথবাবুই বিনা ফি-তে করিয়া দিয়াছিলেন, তারপর অসুস্থ অমৃতকে

ছ মাস বাড়িতে রাখিয়া করিয়াছিলেন চিকিৎসা। প্রমথবাবুর পসাব তেমন ভালো ছিল না, কোনোমতে সংসার চালাইতেন। অমৃত তাকে অনেকবার নানা উপলক্ষে টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে প্রমথবাবুর টাকা চাহিবার ভনিতায় এবং টাকা পাইয়া উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা জানাইয়া চিঠি লিখিবার কায়দায় অমৃতের মনে আঘাত লাগিয়াছে বটে, কিন্তু সে আঘাত সে জোর করিয়া ভুলিয়া গিয়াছে। নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছে যে হয়তো ওদের চিঠি লিখিবার প্রথাই এই রকম।

পথচারীদের দুদিকেব বাড়ির গায়ে ঠেলিয়া দিয়া সংকীর্ণ গলিতে সন্তর্পণে গাড়ি প্রমথবাবুব বাড়ির সামনে দাঁড়াইল। প্রমথবাবু নিজে বাহিবে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া অমৃতকে বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁর বড়ো ছেলে অবিনাশ বাংলা কাগজ পড়িতেছিল, অমৃতকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই যে দাঁড়াইল, মনে হইল আব সে বসিবে না। বয়সে সে অমৃতের সমবয়সিই হইবে, অমৃত যখন এ বাড়িতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল সাতদিনের মধ্যে ওর সঙ্গে তার নিবিড় অন্তরঙ্গতা জন্মিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তারপর দশ বছব কাটিয়া গিয়াছে এবং আজ তো অমৃত আশ্রয়ভিখারি হইয়া আসে নাই। আজ অমৃতের সঙ্গে বন্ধুর মতো কথা বলা ওর পক্ষে বড়ো কঠিন।

প্রমথবাবুর সমস্ত চুল ধবধবে সাদা হইয়া গিয়াছে, দশ বছরে তিনি এত বুড়া হইয়া পড়িবেন অমৃত তা ভাবিতেও পাবে নাই। সংকোচ ও সম্ভ্রমের পীড়নে ওদের অস্বস্তি দেখিয়া অমৃত নিজেই কথা আরম্ভ করিল, সকলের খবরাখবর জিজ্ঞাসা কবিল। কিছুক্ষণ পবে আলাপ-আলোচনা অনেকটা সহজ হইয়া আসিল বটে কিন্তু একেবারে স্বাভাবিক হইতে পারিল না। তখন সহসা অমৃতের মনে পড়িল, সেবারও এমনই হইয়াছিল, সে যখন এ বাড়িতে আশ্রয় লইতে আসিয়াছিল। কথা বলিতে গিয়া সে যেমন সব সময় সতর্ক হইয়া থাকিত কী বলা উচিত আর কী বলা উচিত নয়, তেমনই সাবধানতা আজ ওদের মুখের কথাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

ক্ষণকালের জন্য অমৃতের মুখে একটা বিপন্ন ভাব ফুটিয়া উঠিল। হাতে মুখে ও উঁচু পেটে ভাত-মাখা অবস্থায় বছর চারেকের একটা উলঙ্গ ছেলে হঠাৎ ঘরে ঢুকিবামাত্র শাঁখাপরা দুটি শীর্ণ হাত তাহাকে ছিনাইয়া ভিতরে লইয়া গেল। ঘরের মেঝেটা স্যাঁতসেঁতে—একটা সোঁদা গন্ধ অমৃতের নাকে লাগিতেছিল। সে আসিবে বলিয়া যে বাড়িঘব একটু সাফ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়—তবু চারিদিক অপরিচ্ছন্ন, নোংরা। শুধু ঝুল পরিষ্কার করিয়া কে বিবর্ণ দেযালে শুভ্রতা আনিতে পারে ? ঝাঁটাইয়া সাফ কবিতে পাবে মেঝেব গর্ত ? কেমন একটা দুর্বোধ্য কষ্ট হইতে থাকে অমৃতের, ছোটো সাইজের পোশাকের মতো কী একটা কঠিন আবরণ যেন তাকে শক্ত করিযা চাপিয়া রাখে। তার রুমালে মৃদু দামি গন্ধটা যেন হঠাৎ উগ্র হইয়া তাঁকে ঘিরিযা জড়ো হইতে থাকে, এখানকার অপরিচিত ও অস্বস্তিকর গন্ধকে আমল দিবে না। নিজেব বসিবার ভঙ্গিতে সহসা সে আবিষ্কার করে একটা আয়েস-শূন্য সন্তর্পণ সাবধানতা,—চেয়ারের হাতায় হাত রাখিতে, কালো তৈলাক্ত পিঠটায় ঠেস দিতে প্রথম হইতে সে সংকুচিত হইয়া আছে। এমন করিলে তো চলিবে না ! এখানে সে আপনজনকে খুঁজিতে আসিয়াছে, সর্বদা আসিবে যাইবে, প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা করিবে, তার নিঃসঙ্গ জীবনে এ বাড়িব মানুষগুলি হইবে সঙ্গী। এমন কাঠ হইযা ওদের কাঠের চেয়ারে বসিয়া থাকিলে ওদের সে আপন করিতে পারিবে কেন ?

প্রতিমুহূর্তে অমৃত অন্দরে যাওয়ার আহ্বান প্রত্যাশা করিতেছিল কিন্তু কেউ ডাকিল না। বার দুই ভিতরে আসা-যাওয়া করিয়া অবিনাশ এক রেকাবি খাবার ও এক গ্লাস জল লইয়া আসিল, তারপর আনিল চা। এখানে খাইতে হইবে জানিয়া অমৃত কিছু খাইয়া আসে নাই, ক্ষুধা পাইয়াছিল। সামনে খাবার দেখিয়া জাগিয়া ওঠার বদলে সে ক্ষুধা যেন ঘুমাইয়া মরিয়া গেল। এঁটো বাসন ছড়ানো শ্যাওলা ধরা কলতলায় ছাই দিয়া মাজিয়া ময়লা ন্যাকড়া বুলাইয়া রেকাবি গ্লাস ধোয়া হইয়াছে, চায়ের কাপটার

বাঁকানো হাতলটার খাঁজে লাগিয়া আছে বাদামি রঙের একটু শুকনো সর। চা যে তৈরি করিয়াছে, কে জানে কোলে তার ছোটো ছেলে কি না, যার মুখ দিয়া লালা ঝরে আর নাক দিয়া জল ?

মৃদু একটু হাসিয়া অমৃত বলিল, আমি তো কিছু খাব না কাকা। খেয়ে বেরিয়েছি। মুখের কুঁচকানো চামড়া আরও কুঁচকাইয়া প্রমথও সবিনয়ে হাসিয়া বলিলেন, তোমার উপযুক্ত আদর-যত্ন করি সে ক্ষমতা তো নেই বাবা, সামান্য কিছু মুখে দাও ?

অবিনাশ বলিল, মিষ্টিফিষ্টি খেতে বোধ হয় ভালোবাসেন না আপনি, বরং কেকটা খান, ভালো কেক।

অর্ধেকটা মন প্রতিবাদ করিতেছিল,—এ চলিবে না, দশ বছর ধরিয়া সংকল্প করিয়া রাখিয়াছ, এ বাড়িতে ঢুকিয়া ঘরের ছেলের মতো চাহিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া খাবার খাইবে, সেই আশায় সকালে চা পর্যন্ত পান কর নাই : এ সব তোমাকে খাইতেই হইবে। কিন্তু খাবারগুলি মুখে কবার কথা ভাবিতেও গা যেন অমৃতের ঘিনঘিন করিয়া উঠিতেছিল। তার বাবুর্চিখানায় এক কণা ধূলি জমিতে পায় না, তার বাবুর্চিরা ধবধবে উর্দি পরে, তার খাদ্য কারও হাতের স্পর্শ পায় না, তার থালা, বাটি, কাপ, ডিশ, সাবান সোডা গরম জলে ধোয়া হয়। ময়রার দোকানের এ সব খাবার, বুটির দোকানের এ কেক সে মুখে তুলিবে কী করিয়া ? সাত দিনের বাসি সর-লাগানো চায়ের কাপে কেমন করিয়া চুমুক দিবে ?

এবার অমৃতের হাসিটা ক্লিষ্ট দেখায়। বলে, খাবার জন্য ভাবছেন কাকা ? কত আসব কত খাব, আজ খিদে নেই, নাইবা খেলাম ? শরীরটা আমার তেমন ভালো নয়। একটু খাওয়ার অনিয়ম হলে অসুখ করে।

প্রমথ কাতর ভাবে বলিলেন, চা-টা খাও ?

চা ? চা তো আমি খাই না।

চাও সে খাইবে না অমৃত এই কথা বলিতে যাইতেছিল, তার বদলে এতবড়ো মিথ্যাটা সে যে কেন বলিয়া ফেলিল ! সব কেমন ওলট-পালট হইয়া যাইতেছে, দশ বছরের পোষণ করা সংকল্পগুলি হইয়া উঠিতেছে অর্থহীন। তবু, প্রিয় কল্পনাগুলির এই শোচনীয় পরিণতির জন্য মনে যে বিষাদ আসিয়াছে, অম্লানবদনে একটা মিথ্যা কথা বলিয়া যতখানি অনুতাপ জাগিয়াছে, তার মধ্যেও যদি সে ভুলিতে পারিত অবিনাশের গলার খাঁজে মাটির রেখাটি দেখিতে পাওয়ার বিতৃষ্ণা ! যাকে সে নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু করিবে ভাবিয়াছিল গলায় তার সূক্ষ্ম একটি মাটির রেখা থাকিলে কী আসিয়া যায় ? সাবানে ধোয়া সযত্নে মাজা-ঘষা মানুষ তো সে চায় না, চায় সরল মনের অকৃত্রিম প্রীতি, যে মনে টাকা বিছানো নাই। তা ছাড়া এ তো জানা কথাই যে বেশি টাকা যার নাই, জীবিকা অর্জনের কঠোর তপস্যায় সকল সময় সে গলার খাঁজের ময়লা তুলিবার সময় পায় না। এ সব যদি সে বরদাস্ত করিতে না পারে, গরিব মধ্যবিত্তদের মধ্যে নিজের সামাজিক জীবনটি সে গড়িয়া তুলিতে পারিবে কেন ?

হঠাৎ অতিমাত্রায় আগ্রহ দেখাইয়া অমৃত বলিল, চলুন, কাকিমার সঙ্গে দেখা করে আসি। বলিয়াই অন্দরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া অমৃত উঠিয়া দাঁড়াইল। বোঝা গেল তার এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে পিতাপুত্র একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। কিছু না বলিয়া অবিনাশ ভিতরে চলিয়া গেল। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, চলুন।

অবিনাশের মা তাড়াতাড়ি মটকার শাড়িখানা পরিয়া ফেলিতেছিলেন, অমৃত যখন গিয়া প্রণাম করিল তখনও শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কী আশীর্বাদ করিলেন অথবা একেবারে করিলেন কী না বোঝা গেল না। পাটি বিছাইয়া আগন্তুককে বসিতে দিলেন। কপালের সীমানায় কাঁচা পাকা চুলের প্রান্তে ছোটো আবটি পর্যন্ত ঘোমটা কমাইয়া বলিলেন, ভালো আছ বাবা ?

অমৃত সহজভাবে বলিল, ভালোই আছি কাকিমা। আর সকলে গেল কোথায় ?

সুনীতির কথা বলছ ? সে বোধ হয় রান্না ঘরে।

অমৃত বলিল, ডাকুন না, দেখি কেমন বড়ো-সড়ো হয়েছে।

সুনীতি আসিল, ভাতমাখা উলঙ্গ ছেলেটাকে বাহিরের ঘর হইতে যে দুখানা শাঁখা-পরা হাত ছিনাইয়া আনিয়াছিল, সেই দুহাতে আধ ময়লা শাড়ির আঁচল ধরিয়া। এর বিবাহে অমৃত দুবারে প্রায় পাঁচশো টাকা পাঠাইয়াছিল। টাকাটা সার্থক হইয়াছে কী না সুনীতিকে দেখিয়া তা অনুমান করা গেল না। মনে মনে হিসাব করিয়া অমৃত দেখিল, তেরো আর দশে সুনীতির তেইশ বছর বয়স হইয়াছে। বয়সটা পূর্ণ যৌবনের যাব ভাঙা একটা অংশও সুনীতির নাই।

এদিকে, আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রমথ ও অবিনাশের কী যে পরামর্শ চলিতেছিল, খানিক পবে একটি আধাবয়সি বউ, একটি বছর পনেরো বয়সের মেয়ে এবং একটি সুনীতির সমবয়সি বিধবা মেয়ে একে একে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, আর আসিল গুটিকতক ছোটোবড়ো ছেলেমেয়ে। কারও মুখে ভয়ের ছাপ, কারও চোখ দুটি কৌতূহলী। কিন্তু মুখে কারও কথা নাই। অমৃতের আবির্ভাবে এ বাড়ির স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থমকিয়া থামিয়া গিযাছে।

অমৃত বুঝিতে পারিল, বাড়ির মেয়েদের তার সামনে বাহির করিবার সংকোচটা বাড়িব কর্তা দুজন এতক্ষণে কাটাইয়া উঠিয়াছেন।

সুনীতির ছোটোবোন সুমতিকে দেখিয়া অমৃতের মানসিক বিপর্যয় বাড়িয়া গেল সবচেয়ে বেশি। অনেক বয়স হইয়াছে সুমতির, এবার বিবাহ না দিলেই নয়, ইতিপূর্বে চিঠিতে অমৃতকে এই কথাটা প্রমথ আভাসে ইঙ্গিতে জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। সাহায্য চাহিবার সেটা ভূমিকা। মধ্যবিত্ত সংসারের সাদাসিধে একটি মেয়েকে ঘরে আনিবাব যে মৃদু কামনা অমৃতের মনে আসিয়াছিল, তারই প্রেরণায় সে কি সুমতিকে নিজের চোখে দেখিবার জন্য একটু বিশেষভাবে উৎসুক হইয়াছিল ? দেখিতে সুমতি মন্দ নয়, পরনে একখানা আধময়লা শাড়ি থাকিলেও এই বয়সেব স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতার অভাব যে তাব নাই তা বোঝা যায়, সলাজ নম্র ভাবটিও তার মনোরম, তবু যেন অমৃত মনে মনে ভযানক নিরাশ হইযা গেল। কেমন করিয়া সে যেন বুঝিতে পারিল, সুমতির আগাগোড়া সবটাই ফাঁকি, এ তাব চোখ-ভুলানো অস্থায়ী অভিনয়েব মূর্তি, কোনো মতে যাহাতে কারও বউ হইতে পাবে কিছুদিনের জন্য তাই সে এ সব সংগ্রহ করিয়াছে—ওর আসল চেহাবা অবিকল সুনীতির মতো, দেহ এবং মনের। কপালে সিঁদুর উঠিলে দেখিতে দেখিতে ওর লাবণ্য ঝরিয়া যাইবে, নম্রতা হইবে তোষামোদ, স্নেহ হইবে পাগলামি, কিশোর বয়সের ভাবপ্রবণ সারল্য ঘুচিয়া গিযা দেখা দিবে স্বার্থরক্ষার নিখুঁত কুটিলতা। এই বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টি যেন আলোর মতো অমৃতের মনে ফুটিয়া উঠে, সুমতিকে যাচাই করিতে আসিয়া সে পরীক্ষা করে সুনীতিকে। আধঘণ্টা আগে কুণ্ঠিত পদে ঘবে ঢুকিয়াছিল সুনীতি, আধঘণ্টার মধ্যে তাব বুকে মমতার বান ডাকিয়াছে। শুধু তাই ডাকিযা যদি ক্ষান্ত থাকিত, চোখবোজা অন্ধের মতো অমৃত নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত, কিছু দেখিত না, কিছু বুঝিতে চাহিত না।

শুধু তা তো নয়।

অমৃতের লম্বা পাঞ্জাবির তলার পকেট হইতে মানিব্যাগটা পাটির উপর পড়িয়া গিয়াছিল, সুনীতির আঁচলের তলে সেটা চাপা পড়িয়াছে। মুখখানা পাংশু সুনীতির, কথা ও হাসি যেন হিস্টিরিয়া ! সুনীতির স্বামীর চাকরি নাই ? না থাক, সে নিজে এবং তার স্বামীপুত্র কোনোদিন অনাহারে মরিবে না।

সুনীতিই যে সুমতির একমাত্র অবশ্যম্ভাবী পরিণতি শুধু এই বিশ্বাসটি আঁকড়াইয়া থাকিবার মতো নির্বোধ অমৃত নয়। এ কথা কোনোমতেই ভোলা চলে না যে, অনেককাল সুনীতির স্বামীর চাকরি নাই। এবং সে যদি সুমতিকে বিবাহ করে এমন দিন হয়তো কখনও আসিবে না, সুমতিব মুখের একটা অনুরোধ যখন সুনীতির স্বামীর মতো দু-একজনকে চাকরি জোগাইয়া কৃতার্থ করিতে পারিবে না। সে সুমতিকে গ্রহণ করিলে সুমতি একদিন সুনীতি হইয়া উঠিবে এ আশঙ্কা গাড়িতে উঠিয়া বসিবার আগেই

অমৃতের মন হইতে মিলাইয়া গেল। তবে সুমতির সম্বন্ধেও আশা ভরসা করিবার কিছু থাকিবে কী না সন্দেহ। বিপরীত কারণে সেও এক নূতন রকম শোচনীয় পরিণতি লাভ করিবে। মধ্যবিত্ত সংসারের সরল কল্পনাপ্রবর লাজুক কিশোরী সুনীতি অভাবে যদি এমন হইয়া থাকে, প্রাচুর্য সুমতিকে কী করিয়া দিবে কে জানে ! দারিদ্র্য যদি সুনীতির সহ্য না হইয়া থাকে, টাকা সুমতির সহিবে কেন ? টাকা না থাকার চেয়ে টাকা থাকা তো কম ভয়ংকর নয় ! অমৃতের চেয়ে কে তা ভালো করিয়া জানে ?

অফিসের বেলা হইয়াছে। রাস্তায় গাড়ি ও ফুটপাতে মানুষের ভিড়। গাড়ি কখনও জোরে, কখনও আস্তে চলিতেছিল। গাড়ির গতি শ্লথ হইয়া আসিলে দুপাশের জনস্রোতের মুখগুলিতে অমৃত যেন আজ শুধু ক্ষোভ ও ক্ষুধা আবিষ্কার করিতে লাগিল। আজ যেন নগ্নদেহগুলি বিশেষভাবে চোখে পড়িতেছে, একটি ভিখারির চেহারা আড়াল করিয়া রাখিতেছে হাজার মানুষকে। ওদের জন্য অমৃতের মনে গভীর মমতা আছে, আর আছে ওদের সান্নিধ্যের প্রতি নিবিড় ঘৃণা। হঠাৎ গাড়ি থামাইয়া দূর হইতে একটি ভিখারিকে সে একটা টাকা ছুঁড়িয়া দিল। আর একজনকে ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে তাড়াতাড়ি কাছে আসিতে দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্তের মতো ব্যাকুলভাবে সোফারকে তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাইতে বলিল। এবং তার গাড়িব মতো প্রকাণ্ড আর একটা গাড়ি পিছন হইতে আসিয়া ভিখারিটাকে চাপা দিলে একটু স্বস্তিই যেন সে বোধ করিল। ওই গাড়ির সুবেশধারী স্থূলকায় আরোহীটিকে সে বিস্ময়কর তীব্রতার সঙ্গে ঘৃণা করে, কিন্তু ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে ভিখারিটি গাড়ির দিকে আগাইয়া আসিবার সময় সে যেভাবে শিহরিয়া উঠিয়াছিল ওর গাড়িখানা আগাইয়া আসিয়া পাশে থামিয়া গেলে দুহাত দূরের মধ্যে এই মোটা ঘৃণ্য ধনীটিকে দেখিয়া অত্যন্ত মৃদুভাবেও তো তেমন শিহরন তার জাগিল না ? অর্থের অন্যায় অসমান বিতরণের পাপ যাদের দিয়া জীবনব্যাপী বীভৎস প্রায়শ্চিত্ত করায়, লাখ টাকার শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাদের মধ্যে তাদের ভালোবাসিয়া তাদেরই একজন হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার উদ্দেশে. দশবৎসরব্যাপী তপস্যার এ কী পরিণাম ! দূর হইতে ওদের মমতা করিবার মানসিক বিলাসিতাটুকু কমবেশি কার না থাকে ? এই বিপুলদেহ ধনীটার সঙ্গে, মেনকার বাবা রাখাল হালদারের সঙ্গে তার তবে পার্থক্য রহিল কোথায় ?

অমৃত নামিয়া গেল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া ভিখারির নিষ্পেষিত দেহটা দুহাতে বুকে তুলিয়া মোটরে শোয়াইয়া দিল। কাঁধের কাছে ভিখারির বহুদিনের পুরাতন যে ক্ষত হইতে রক্ত চোযাইয়া পড়িতেছিল, হাতের তালুতে সেটা চাপা দিয়া রাখিয়া সোফারকে বলিল, হাসপাতাল।

না, হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া অমৃতের মন আত্মপ্রসাদে হালকা হইয়া গেল না। সাময়িক উন্মত্ততা, যে সুনিবিড় জ্বালা আনিয়াছিল, সেটা জুড়াইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাখা জামা কাপড়ের স্পর্শে শরীরটা যেন তার কুঁকড়াইয়া যাইতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল সে যেন খানায় পড়িয়া গিয়াছিল, ডাস্টবিনে। জোরে গাড়ি হাঁকাইয়া সোফার তাহাকে বাড়ি লইয়া গেল। অমৃত ছুটিয়া গিয়া প্রবেশ করিল বাথরুমে।

সারাদিন দেহটা তার অশুচি মনে হইতে লাগিল, স্নায়বিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের মতো নিজের স্নাত ও পবিত্র শরীরটাব সেই আধঘণ্টার অপব্যবহারকে সে যেন কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না। সন্ধ্যার পর বিষণ্ণ বিরক্ত ও হতাশ মনে সে দোতলার বসিবার ঘরে বসিয়াছিল, বেয়ারা কার্ড আনিয়া দিল রাখাল হালদারের।

মৃদু একটু হাসিল অমৃত। সে জানিত রাখাল হালদার আসিবে। সে জানে সকলেই আসিবে— আজ অথবা কাল। ওদের লজ্জা নাই, দুর্বলতা নাই। হালদার ঘরে ঢুকিলে অমৃত সাগ্রহে তার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। কতকাল নিঃসঙ্গ কাটিয়াছে। মানুষের সাহচর্য ছাড়া কি মানুষ বাঁচে, ঘৃণা করিয়া, ভালো না বাসিয়া ? অন্তত তার একটা খুব বাস্তব অভিনয় বিনা ? হোক মিথ্যা, হোক ফাঁকি, মানুষের এই রকম প্রকৃতি।

ফাঁসি

সন্দেহ নাই যে, ব্যাপারটা বড়োই শোচনীয়। কে কল্পনা করিতে পারিত, বত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্বাভাবিক শান্ত জীবন যাপন করিবার পর গণপতি শেষপর্যন্ত এমন একটা ভয়ানক ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িবে ! শিক্ষিত সদ্‌বংশের ছেলে, কথায়, ব্যবহারে ভদ্র ও নিরীহ, জীবনে ধরিতে গেলে, একরকম সব দিক দিয়াই সুখী, সে কি না একটা লজ্জাকর হত্যাকাণ্ডের আসামি হিসাবে ধরা পড়িল ! লোকে একেবারে থ বনিয়া গেল। চরিত্রবান সংযত প্রকৃতির ভদ্রলোকের মুখোশ পরিয়া কী ভাবেই সকলকে এতদিন খুনিটা ঠকাইয়া আসিয়াছিল ! কী সাংঘাতিক মানুষ,—আঁা ? জগতে এমন মানুষও থাকে ?

গণপতিকে পুলিশে ধরিবার পর ভীত-বিব্রত ও লজ্জায় দুঃখে আধ-মরা আত্মীয়স্বজনের চেয়ে পরিচিত ও অর্ধপরিচিত অনাত্মীয় মানুষগুলির উত্তেজনাই যেন মনে হইতে লাগিল প্রখরতর। বিচারের দিন আদালতে ভিড় যা জমিতে লাগিল বলিবার নয় ! টিকিট কিনিয়া রঙ্গমঞ্চে মিথ্যা নাটকের অভিনয় দেখার চেয়ে আদালতে নারীঘটিত খুনি মকদ্দমার বিচার দেখা যে কত বেশি মুখরোচক, সে শুধু তারাই জানে—রোজ খবরের কাগজে আগের দিনের আইন-আদালতের কার্যকলাপের বিবরণ পড়িয়াও যাদের কৌতূহল মেটে না, বেলা দশটায় খাওয়া-দাওয়া সারিয়া উকিল মোক্তারের মতো যারা আদালতে ছুটিয়া যায়।

বাড়িতেই গণপতির তিনজন উকিল। তার বাবা রাজেন্দ্রনাথ এককালে মস্ত উকিল ছিলেন, মাসে একসময় তিনি দশহাজার টাকাও উপার্জন করিয়াছেন—এখন, সত্তর বৎসর বয়সে আর কোর্টে যান না। বড়োছেলে পশুপতি বছর বারো প্র্যাকটিস করিতেছে,—বাপের মতো না হোক নামডাক তারও মন্দ নয়। গণপতির ছোটো ভাই মহীপতিও উকিল, তবে আনকোরা নতুন ! বড়ো উকিলের বড়ো উকিল বন্ধু থাকে—সমব্যবসায়ী কিনা ! গণপতির পক্ষসমর্থনের জন্য অনেকগুলি নামকরা আইনজ্ঞ মানুষ একত্রিত হইলেন, যে তাতেও মামলার গুরুত্ব গুরুতর রকম বাড়িয়া গেল। তবে গণপতিকে শেষপর্যন্ত বাঁচানো চলিবে কিনা সে বিষয়ে ভরসা করিবার সাহস এঁদেরও রহিল কম। মুশকিল হইল এই যে, মামলাটা একেবারেই জটিল নয়। মামলা যত জটিল হয়, আইনের বড়ো মাথাওয়ালা লোক মামলাকে জটিলতর করিয়া খুশিমতো মীমাংসার দিকে ঠেলিয়া দিবার সুযোগ পান তত বেশি !

সহজ সরল ঘটনা। বাহির হইতে ঘরে শিকল তোলা ছিল আর স্বয়ং পুলিশ গিয়া খুলিয়াছিল—সে শিকল। ভিতরে ছিল মাত্র রক্তমাখা মৃতদেহটা আর ভয়ে আধ-পাগলা গণপতি। গোটা দুই টিকটিকি আর কয়েকটা মশা ছাড়া ঘরে আর দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না। মশা অবশ্য মানুষ মারে,—মানুষ যত মানুষ মারে তার চেয়েও ঢের ঢের বেশি, তবু কেন যেন এই খুনের অপরাধটা মশার ঘাড়ে চাপানোর কথাটা গণপতির পক্ষের উকিলেরা একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না। তারা শুধু প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, মৃতদেহটা আগেই ঘরের মধ্যে ছিল, পরে গণপতিকে ফাঁকি দিয়া ঘরে ঢুকাইয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দেওয়া হয়।

বড়ো বিপদ, দয়া করে শিগগির একবার আসবেন ?—এই কথা বলিয়া গণপতিকে ফাঁকি দিয়াছিল একটি লোক, যার বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ, পরনে ছিল কোঁচানো ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি আর পালিশ করা ডার্বি শু। গোঁফ দাড়ি কামানো, চোখে পুরু কাঁচের চশমা, বিবর্ণ ফরসা রং—লোকটাকে দেখতে নাকি অনেকটা ছিল কলেজের প্রফেসারের মতো। (কলেজের প্রফেসার হইলেই মানুষের

চেহারা কোনো বৈশিষ্ট্য অর্জন করে কি না গণপতিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে সে জবাব দিতে পারে নাই, বোকার মতো হাঁ করিয়া বিচারকের দিকে চাহিয়া ছিল।) এই লোকটি ছাড়া আরও তিনজন লোককে গণপতি দেখিতে পাইয়াছিল, বাড়ির সরু লম্বা বারান্দাটার শেষে। তিনতলার সিঁড়ির নীচে অন্ধকারে কারা দাঁড়াইয়াছিল। (অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকিলে গণপতি তাদের দেখিতে পাইল কেমন করিয়া ?—বিচারক এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে গণপতি এতক্ষণ বোকার মতো চুপ করিয়া থাকিয়া জবাব দিয়াছিল যে বিচাবক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাইয়াছিলেন।)

গণপতি যে কৈফিয়ত দিল, সেটা যে একেবারে অসম্ভব—তা অবশ্য বলা যায় না, অমন কত মজার ব্যাপার এই মজার জগতে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আট-দশজন দেশ-প্রসিদ্ধ উকিল ব্যারিস্টারের চেষ্টাতেও এটা ভালোমতো প্রমাণ করা গেল না। গণপতির ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল !

ফাঁসি ! বিচারক হুকুমটা দিলেন ইংরাজিতে, বাংলায় যার মোটামুটি চুম্বক এই যে গলায় দড়ির ফাঁস পরাইয়া গণপতিকে যথাবিধি ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে, যতক্ষণ সে না মরে। তবে হুকুমটা যদি গণপতির পছন্দ না হয়, সে ইচ্ছা করিলে আপিল করিতে পারে।

বুড়া রাজেন্দ্রনাথের ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দুটি কাঁদিতে কাঁদিতে প্রায় অন্ধ হইয়া গেল। গণপতির বোনেরা ও বউদিরা যে কান্নার রোল তুলিল—সমস্ত পাড়ার আবহাওয়াটা যেন তাতে বিষণ্ণ হইয়া আসিল। গণপতির বউ রমার এত ঘনঘন মূর্ছা হইতে লাগিল যে, তার যে গাল দুটি লজ্জা না পাইলেও সারাক্ষণ গোলাপের মতো আরক্ত দেখাইত, একেবারে কাগজের মতো ফ্যাকাশে বিবর্ণ হইয়া রহিল। গণপতির বিধবা পিসি ঠাকুরঘরে এত জোরে মাথা খুঁড়িলেন যে ফাটা কপালের রক্তে চোখের জল তাহার খানিক খানিক ধুইয়া গেল।

যথাসময়ে করা হইল আপিল।

অনেক চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের দ্বারা গণপতির পক্ষে আরও কয়েকটি সাক্ষী এবং প্রমাণও সংগ্রহ করা হইল। তার ফলে, সন্দেহের সুযোগে গণপতি পাইল মুক্তি। যে লোকটিকে খুন করার জন্য গণপতির ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল, তাহাকে কে বা কাহারা খুন করিয়াছে—পুলিশ তাহারই খোঁজ করিতে লাগিল।

বাড়ি ফিরিবার অধিকার জুটিল অপরাহ্নে—আকাশ ভরিয়া তখন মেঘ করিয়াছে। অপরাহ্নে খুব ঘটা করিয়া মেঘ করিলে মনে হয় বইকী যে, এ আর কিছুই নয়, রাত্রিরই বাড়াবাড়ি। গণপতির কান্না আসিতেছিল। আনন্দে নয়, শ্রান্তিতে নয়, বিগলিত মানসিক ভাবপ্রবণতার জন্য নয়, সম্পূর্ণ অকারণে—একটা চিন্তাহীন স্তব্ধ অন্যমনস্কতায়। বন্ধুবান্ধবের হাত এড়াইয়া সে পশুপতির সঙ্গে ব্যারিস্টার মিস্টার দের মোটরে উঠিয়া বসিল। মোটরের কোণে গা এলাইয়া দিয়া পশুপতি ফোঁস করিয়া ফেলিল একটা নিশ্বাস, তারপর নিজেই মিস্টার দের পকেটে হাত ঢুকাইয়া মোটা একটা সিগার সংগ্রহ করিয়া সাদা ধবধবে দাঁতে কামড়াইয়া ধরিল। মিস্টার দে একগাল হাসিয়া বলিলেন,—যাক্।

কী যে তাহার যাওয়ার অনুমতি পাইল বোঝা গেল না। হয়তো গণপতির দুর্ভোগ, নয়তো অসংখ্য মানুষের পাগলামি ভরা দিনটা—আর নয়তো পশুপতি যে সিগারটা ধরাইয়াছে—তাই। গণপতি পাংশু মুখ তুলিয়া একবার তাহার পরিতৃপ্ত উদার মুখের দিকে চাহিল, তারপর তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল বাহিরের দিকে, একবার এই গাড়িতেই সে মিস্টার দের সঙ্গে বসিয়াছিল, কোথায় যাওয়ার জন্য আজ সে কথা ঠিক মনে নাই। গাড়ি ছাড়িবার আগে মিস্টার দে হঠাৎ হাত বাড়াইয়া ফুটপাতের একটা ভিখারির দিকে একটা আনি ছুঁড়িয়া দিয়াছিলেন। দানের পুণ্য আলোর মতো সেদিন যেভাবে মিস্টার দের মুখখানিকে উল্লাসিত করিয়া তুলিয়াছিল আজ জীবনদানের পুণ্য

তো তার চেয়ে প্রখর জ্যোতির রূপ লইয়া ফুটিয়া নাই ! অবিকল তেমনই মুখভঙ্গি মিস্টার দের— ভিখারিকে একটা আনি দিয়া তিনি যেমন করেন।

মানুষের অনুভূতির জগতের রীতিই হয়তো এইরকম—মুড়িমুড়কির এক দর ! জীবন ফিরিয়া পাইয়া তার নিজেরও তেমন উল্লাস হইল কই ? জীবনের কত অসংখ্য ছোটো ছোটো পাওনা তাকে এর চেয়ে শতগুণে উত্তেজিত করিয়াছে, নিবিড় শান্তি দিয়াছে, আনিয়া দিয়াছে দীর্ঘস্থায়ী মনোরম উপভোগ ! সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া বাঁচিয়া থাকিবার প্রত্যর্পিত অধিকারটা যতভাবে যতদিক দিয়াই সে কল্পনা করিবার চেষ্টা করুক, জ্যোৎস্নালোকে ছাদে বসিয়া রমার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলিবার কল্পনা তার চেয়ে কত ব্যাপক, কত গাঢ়তব রসে রসালো।

দুভাইকে বাড়ির দরজায় নামাইয়া দিয়া মিস্টার দে চলিয়া গেলেন। তখন ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। গাড়িবারান্দার সিঁড়িতে বাড়ির সকলে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; বৃষ্টি না নামিলে হয়তো প্রতিবেশীরাও অনেকে আসিত। গণপতি নামিয়া প্রথমে রাজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিবে, পিসিমা তাই সে পর্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। গণপতির প্রণাম শেষ হইতেই তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া হুহু করিয়া উঠিলেন কাঁদিয়া। এ কান্না অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়, সকলেই জানিত পিসিমা এমনিভাবে কাঁদিবেন ! তাই খানিকক্ষণ সকলেই চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহাকে কাঁদিতে দিল। গণপতির কেমন একটা অস্বাভাবিক লজ্জা বোধ হইতেছিল। বাড়ি আসিবার জন্য মিস্টার দের গাড়িতে উঠিয়া কাঁদিবার যে জোরালো ইচ্ছা তাহার হইয়াছিল, হঠাৎ কখন তাহা লোপ পাইয়া গিয়াছে। নিজেকে লুকাইতে পারিলে এখন যেন সে বাঁচিয়া যায়। নিজের বাড়িতে আপনাব জনেব আবেষ্টনীর মধ্যে ক্রন্দনশীলা পিসিমাব বক্ষলগ্ন হইয়া থাকিবাব সময় জেলখানায় তাহার সেই নিভৃত সেলটির জন্য গণপতির সমস্ত মনটা লোলুপ হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে, আব কিছুক্ষণ এমনিভাবে কাটিলে তার মাথার মধ্যে একটা কিছু ছিঁড়িয়া যাইবে !

আর কেহ কাঁদিতেছে না দেখিয়া পিসিমা একটু পরে আত্মসংবরণ করিলেন। তখন পশুপতিব স্ত্রী পরিমল বলিল, কী চেহারাই তোমার হয়েছে ঠাকুরপো !

গণপতি গলা সাফ করিয়া মৃদু একটু হাসিয়া বিনয়ের সঙ্গে বলিল, আর চেহারা.. ?

যার জীবন যাইতে বসিয়াছিল, চেহারা দিয়া সে কী করিবে—এই কথাটাই গণপতি এমনিভাবে বলিতে চাহিয়াছিল ; কিন্তু শোনাইল অন্যরকম, মনে হইল, বউদির স্নেহপূর্ণ উৎকণ্ঠার জবাবে সে যেন ভারী রূঢ় একটা ভদ্রতা করিয়াছে। গণপতিও হঠাৎ তাহা খেয়াল কবিয়া মনে মনে অবাক হইয়া গেল। এমন শোনাইল কেন কথাটা ? রোগ হইয়া যার জীবন যাইতে বসে, সে ভালো হইয়া উঠিলে এমনিভাবে যখন কেহ তাহার চেহারা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে, তখন অবিকল এমনিভাবেই তো জবাব দিতে হয় ! চেহারা কেন খারাপ হইয়াছে, উভয় পক্ষেরই যখন তাহা জানা থাকে, চেহাবা সম্বন্ধে এই তো তখন বলাবলির রীতি ! অথচ আজ এই কথোপকথন তার এতগুলি আপনার জনেব কানে গিয়া আঘাত করিয়াছে।

কারণটা গণপতি যেন বুঝিতে পারিল, রোগে যে রোগা হয়, চেহারা খারাপ হওয়ার অধিকার তাহার আছে, সেটা তার দোষ নয়। কিন্তু খুনের দায়ে জেলে গিয়া রোগা হইয়া আসিবার অধিকার এ জগতে কারও তো নাই—সে তো পাপের ফল,—অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া তার দুর্বল দেহ ও পাংশু মুখ যে শুধু এই কথাটাই ঘোষণা করিতেছে,—অতি লজ্জাকর একটা খুনের দায়ে সে পুলিশেব হাতে ধরা পড়িয়াছিল।

মাথাটা ঘুরিতেছিল, গণপতি একবার বিহ্বলের মতো সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। এতক্ষণে তাহার চোখ পড়িল রমার দিকে। আর সকলে তাহার চারিদিকে ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রমা কিন্তু কাছে আসে নাই, পাশের লাইব্রেরি ঘবে ঢুকিবার দরজাটার আড়ালে সে

পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হইয়া আছে,—অনেক দূরে.... দীর্ঘ ব্যবধানে। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ব্যবধানটা যেন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, তারপর লুপ্ত হইয়া গেল অন্ধকারে।

বাড়ি ফিরিয়া পরিমলের সঙ্গে একটা কথা বলিয়াই গণপতি যে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল—এতে কারও অবাক হওয়ার কারণ ছিল না। আহা, প্রায় ছমাস ধরিয়া বেচারা কী কম সহ্য করিয়াছে ! কারাগারের পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে নিজের জীবন লইয়া ভাগ্যের লটারি খেলাব অনিশ্চিত ফলাফলের প্রতীক্ষায় একাকী দিন কাটানো তো শুধু নয়,—বাহিরের অদৃশ্য জগতের কাছে ঘাড় মোচড়ানো অফুরন্ত কাল্পনিক লজ্জা ভোগ-করাও তো শুধু নয়, গণপতি যে অনেকগুলি দিন ধরিয়া ফাঁসির দিনও গুনিয়াছে। ফাঁসি ! ভাবিতে গেলেও নিরাপদ সহজ মানুষের দম আটকাইয়া আসে না ? মূর্ছিত হইয়া পড়িবে বই কী গণপতি। অনেক আগেই তার দুবার মূর্ছা যাওয়া উচিত ছিল। একবার যখন সে নিজের ফাঁসির হুকুম শোনে—আর একবার যখন সে জানিতে পারে, এ জীবনেব মতো ফাঁসিটা তাহার বাতিল হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্যরকম শক্ত মানুষ বলিয়াই না মূর্ছাটা সে এতক্ষণ ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল !

সহ্যশক্তি রমারও কম নয়। আজ কতকাল সে খুনি আসামির বউ হইয়া বাঁচিয়া আছে—অপাপবিদ্ধ পবিত্র মানুষের ঘরকন্নার মধ্যে পাড়ার একপাল ভদ্রমহিলার কৌতুক ও কৌতূহল মেশানো সহানুভূতির আকণ্ঠ আবর্তে ! কতদিন ধরিয়া সে অহোরাত্রি যাপন করিয়াছে—স্বামীব আগামী ফাঁসির তারিখেব বৈধব্যকে ক্রমাগত বরণ করিয়া কবিয়া ! আপিল যদি না করা হইত—আজ রাত্রি প্রভাত হইলে কারও সাধ্য ছিল না রমাকে বউ করিয়া রাখে। তবু এখনও লাইব্রেবি ঘবে ঢুকিবার দরজার আড়ালে পাষাণ-প্রতিমার মতো তাহার দাঁড়াইয়া থাকিবাব ভঙ্গি দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। না আছে চোখে ভয়, না আছে দেহে শিহরন ! পাষাণ-প্রতিমার মতোই তার কাঠিন্য যেন অকৃত্রিম। গণপতি যে মূর্ছিত হইযা পড়িয়া গেল, তাতেও যেন তাব কিছু আসিয়া গেল না। এক-পা আগানো দূরে থাক এক-পা পিছাইয়া লাইব্রেরি ঘবের ভিতরে আত্মগোপন করাটাই সে যেন ভালো মনে করিল। স্বামীর,—সত্যবানের মতোই যে স্বামী তাঁহার—মৃত্যুর কবল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই স্বামীর মূর্ছা ভাঙিবার কী আয়োজন হইল, একবার তাহা চাহিয়া দেখিবার শখটাও অন্তত পক্ষে রমার গেল কোথায় ? এ কৌতূহল যে মেয়েমানুষ দমন করিতে পারে—ধরিত্রীর মতো তার সহ্যশক্তিও সত্যই অতুলনীয়—মৃত ও অসাড়।

মাথায় জল দিতে দিতে অল্পক্ষণ পবেই গণপতির জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। জামা কাপড় বদলাইয়া একবাটি গরম দুধ খাইয়া সে সকলের সঙ্গে ভিতরের বড়ো ঘরে গিযা বসিল। পশুপতি একবার প্রস্তাব করিয়াছিল যে, গণপতি নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া বিশ্রাম করুক। গণপতি নিজেই তাহাতে রাজি হইল না। মূর্ছা ভাঙিবার পর নিজেকে লুকানোর ইচ্ছাটা কী কারণে যেন তাহার কমিয়া গিয়াছে ! অনেক জল ঢালার ফলে মাথাটা বোধ হয় তাহার ঠান্ডা হইয়া আসিয়াছিল, সকলের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য এতক্ষণে সে একটু একটু আগ্রহই বরং বোধ করিতে লাগিল।

অল্পে অল্পে এ কথা সে কথা হইতে হইতে কথাবার্তা অনেকটা সহজ হইয়া আসিল। ছমাসের মধ্যে আত্মীয়স্বজন অনেকের সঙ্গেই বহুবার গণপতির দেখা হইয়াছে, তবু সে এমনভাবে কথা বলিতে লাগিল, যেন ওই সময়কার পারিবারিক ইতিহাসটা ঘুণাক্ষরে জানিবার উপায়ও তাহার ছিল না। তিনমাস আগে জেলে বসিয়া পশুপতির কাছে বাড়ির যে ঘটনার কথা শুনিয়া সে নবজাগ্রত বিস্ময় বোধ করিল, এমনকী—যে ব্যাপার এখানে সে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া জেলে গিয়াছিল—পরিমল তার বর্ণনা দিতে আরম্ভ করিলে, আজই যেন প্রথম শুনিতেছে এমনিভাবে শুনিয়া গেল। স্মৃতি, চিন্তা, অনুভূতি, কল্পনা প্রভৃতি গণপতির ভিতরে কমবেশি জড়াইয়া গিয়াছে সত্য, তবু জানা কথা ভুলিবার

মতো অন্যমনস্কতা তো ফাঁসির আসামিরও আসিবার কথা নয় ! কিন্তু এই অভিনয়ই গণপতির ভালো লাগিতেছিল। এমনই উৎসুকভাবে এ কথা সে কথা জানিতে চাহিলে এবং তার জবাবে যে যা-ই বলুক গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাই শুনিয়া গেলে, ক্রমে ক্রমে তার নিজের ও অন্যান্য সকলেরই যেন বিশ্বাস জন্মিয়া যাইবে দীর্ঘকালের জন্য সে দূরদেশে বেড়াইতে গিয়াছিল। এতদিন তার গৃহে অনুপস্থিত থাকিবার আসল কারণটা সকলে ভুলিয়া যাইবে।

হয়তো তাই যাইতে লাগিল এবং সেই জন্য হয়তো যখন আবার ওই আসল কারণটা মনে পড়িবার অনিবার্য কারণ ঘটিতে লাগিল, সকলেই যেন তখন হঠাৎ একটু একটু চমকাইয়া উঠিতে লাগিল। গণপতিকে পুলিশে ধরিবার অল্প কিছুদিন আগে মহাসমারোহে তার ছোটোবোন রেণুর বিবাহ হইয়াছিল। গণপতি একসময় রেণুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে সকলের এমনই সচকিতভাব দেখা গেল ! এ ওর মুখের দিকে চাহিল—কিন্তু বয়স্ক কেহ জবাব দিল না। শুধু পশুপতির সাতবছরের মেয়ে মায়া বলিল, পিসিমাকে শ্বশুরবাড়িতে রোজ মারে, কাকা।

গণপতি অবাক হইযা বলিল, মারে ?

মায়া বলিল, তুমি মানুষ মেরেছ কি না তাই জন্যে।

তিন-চারজন একসঙ্গে ধমক দিতে মায়া সভয়ে চুপ করিয়া গেল। মনে হইল, ধমকটা যেন গণপতিকেই দেওয়া হইয়াছে। কারণ, মায়ার চেয়েও তার মুখখানা শুকাইয়া গেল বেশি। আবার কিছুক্ষণ এখন তাহার কারও মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবার ক্ষমতা হইবে না।

পশুপতি গলা সাফ করিল। বলিল, ঠিক যে মারে তা নয়, তবে ওরা ব্যবহারটা ভালো করছে না।

বড়ো বোন বেণু বলিল, বিয়ের পর সেই যে নিয়ে গেল মেয়েটাকে এ পর্যন্ত আর একবারও পাঠায়নি। মহী দুবার আনতে গেছল।

মহীপতি বলিল, আমার সঙ্গে একবার দেখা করতেও দেযনি। বললে—

রাজেন্দ্রনাথ কাঁপা গলায় বলিলেন, আহা, থাক না ও সব কথা, বাড়িতে ঢুকতে না-ঢুকতে ওকে ও-সব শোনাবার দরকার কী ! ও তো আর পালিয়ে যাবে না।

খানিকক্ষণ সকলে চুপ করিয়া রহিল। বাহিরে বাদল মাঝখানে একটু কমিয়াছিল, এখন আবার আরও জোরের সঙ্গে বর্ষণ শুরু হইয়াছে। ঘরের মধ্যেও এখন ভিজা বাতাসের গাঢতম স্পর্শ মেলে। রমা এবারও ঘরে আসে নাই, এবারও সে নিজেকে আড়াল করিযা রাখিযাছে—পাশের ঘরের দরজার ওদিকে। তবে এবার আর সে দাঁড়াইয়া নাই, মেঝেতে বসিয়াছে। একতলার রান্নাঘর হইতে ডাল সম্ভারের গন্ধ ভিজা বাতাসকে আশ্রয় করিযা আসিয়া এ ঘরে জমা হইযাছে, বেণুর বড়ো মেয়ে শৌখিন সুহাসের অঙ্গ হইতে এসেন্সের যে গন্ধ এতক্ষণ পাওয়া যাইতেছিল তাও গিয়াছে ঢাকিয়া। পিসিমা কয়েক মিনিটের জন্য ঠাকুর ঘরে গিয়াছিলেন, প্রসাদ ও প্রসাদি ফুলের রেকাবি হাতে তিনি এই সময় ফিরিয়া আসিলেন। সকলের আগে গণপতিকে বলিলেন, জুতো থেকে পা টা খোল তো বাবা।

জুতার স্পর্শ ত্যাগ করিয়া গণপতি পবিত্র হইলে, পিসিমা প্রসাদি ফুল লইয়া তাহার কপালে ঠেকাইলেন, তার পর হাতে দিলেন প্রসাদ এবং আজও আধা-মমতা আধা-ধমকের সুরে তাহার চিরন্তন অনুযোগটা শুনাইয়া দিলেন—ঠাকুরদেবতা কিছু তো মানবি নে, শুধু অনাচার করে বেড়াবি।

এ ঘরে কেহ কিছু বলিল না ; কিন্তু পাশের ঘরের দরজায় ওদিক হইতে অস্ফুট কণ্ঠে শোনা গেল, মাগো !

পিসিমা চমকাইয়া বলিলেন, কে গো ওখানে বউমা ?

পরিমল জিজ্ঞাসা করিল, কী হল রে, রমা ?

রমার আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। পরিমলের কোলের ছেলেটি মেঝেতে হামা দিতে দিতে নাগালের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, গণপতি হাত বাড়াইয়া তাকে কোলে তুলিয়া লইল—ওকে আদর করিবার ছলে মাথা হেঁট করিয়া থাকা সহজ। রাজেন্দ্রনাথ কাঁপা গলায় বলিলেন, দ্যাখ তো সুহাস, মেজো-বউমার কী হল ? ফিট-টিট হল নাকি ?

পরিমল বলিল, তুই বোস আমি দেখছি।

উঠিয়া গিয়া নিচুগলায় রমাকে কী যেন জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সে ফিরিয়া আসিল ; বলিল, না কিছু হয়নি।

কিছু না। একেবারেই কিছু হয় নাই। কী হইবে ওই পাথরের মতো শক্ত মেয়েমানুষটার ? এই যে এতকাল গণপতি জেলখানায় আটক ছিল, ফাঁসি এড়ানোর ভরসা কয়েকদিন আগেও তাহার ছিল না,—রমা কি একদিন আবেগে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে ননদ, জা কারও বুকে একবার আশ্রয় খুঁজিয়াছিল, কারওকে টের পাইতে দিয়াছিল—তার কিছুমাত্র সান্ত্বনার প্রয়োজন আছে ? এ কথা সত্য যে, যেদিন হইতে গণপতিকে পুলিশে ধরিয়াছিল, সেদিন হইতে সে হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে, দিনের পর দিন কথা কমাইয়া কমাইয়া প্রায় বোবা হইয়া গিয়াছে, রোগা হইতে হইতে সোনার বরন তাহার হইয়া গিয়াছে কালি ! তা সেটা আর এমন কী বেশি ! দুঃখের ভাগ তো সে দেয় নাই, সান্ত্বনা তো নেয় নাই, লুটাইয়া বুকফাটা কান্না তো কাঁদে নাই !

একদিন বুঝি কাঁদিয়াছিল। শুধু একদিন !

গভীর রাত্রে বাড়ির সকলে তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,—সুহাস ছাড়া। সেদিন সুহাসের বর আসিয়াছিল, তাই বর বউ দুজনেরই হইয়াছিল অনিদ্রা-রোগ। অত রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া রমার ঘরের সামনে দিয়া তাদের কোথায় যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল—সে কথা বলা মিছে। নিজের ঘরে রমা একা থাকিত, এখনও তাই থাকে। অনেক বলিয়া—অনেক বকিয়াও তাকে কারও সঙ্গে শুইতে রাজি করা যায় নাই। এমন কী শ্বশুরের অনুরোধেও না।

যাই হোক, রমার ঘরের সামনে সুহাস থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কান পাতিয়া ঘরের মধ্যে বিশ্রী একটা গোঙানির আওয়াজ শুনিয়া ভয়ে বেচারির স্বামী-সোহাগে তাতানো দেহটা হইয়া গিযাছিল হিম। বরকে ঘরে পাঠাইয়া, তারপর সে ডাকিয়া তুলিয়াছিল---পরিমলকে ; বলিয়াছিল, বড়োমামি, ঘরের মধ্যে মেজোমামি গোঙাচ্ছে, শিগগির এসো।

গোঙাচ্ছে ? ডাক ডাক তোর মামাকে ডেকে তোল, সুহাস।—কী হবে মা গো !

পশুপতিকে পিছনে করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া পরিমল খানিকক্ষণ বুদ্ধ দরজায় কান পাতিয়া রমার গোঙানি শুনিয়াছিল। তারপর জোরে জোরে দরজা ঠেলিয়া ডাকিয়াছিল, মেজোবউ, শিগগির দরজা খোলো।

প্রথম ডাকেই গোঙানি থামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তারপর অনেক ডাকাডাকিতেও রমা প্রথমে সাড়া দেয় নাই। শেষে ধরা গলায় বলিয়াছিল,—কে ?

আমি। দরজা খোলো তো মেজোবউ, শিগগির।

কেন দিদি ?

পরিমল অবশ্য সে কৈফিয়ত দেয় নাই, আরও জোরে ধমক দিয়া আবার দরজাই খুলিতে বলিয়াছিল। রমারও আর দরজা না খুলিয়া উপায় থাকে নাই।

কী হয়েছে দিদি ?

তুই গোঙাচ্ছিলি কেন রে, মেজোবউ ?

রমা বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিয়াছিল, গোঙাচ্ছিলাম ? কে বললে ?

বারান্দার আলোয় রমার মুখে চোখের জলের দাগগুলি স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল। একটু থামিয়া ঢোঁক গিলিয়া পরিমল বলিয়াছিল, আমি নিজে শুনেছি, তুই তবে কাঁদছিলি ?

না কাঁদিনি তো ! কে বললে কাঁদছিলাম ?—বলিয়া পশুপতির দিকে নজব পড়ায় বমা লম্বা ঘোমটা টানিয়া দিযাছিল।

তখন পরিমল বলিয়াছিল, আমি আজ তোর ঘরে শোব রমা ?

রমা বলিয়াছিল, কেন ?

কী কৈফিয়তই যে মেয়েটা দাবি করিতে জানে !—অফুরন্ত !

পরিমল ইতস্তত করিয়া বলিয়াছিল,—ভয়টয় যদি পাস—

রমা বলিয়াছিল, ভয় পাব কেন ? আমার অত ভয় নেই,...বড্ড ঘুম পাচ্ছে দিদি।

বলিয়া সকলের মুখের উপর দরজা বন্ধ করিযা দিয়াছিল। কী রূঢ় ব্যবহার ! মনে করিলে আজও পবিমলের গা জ্বালা কবে।

যাই হোক তারপর হইতে বাত্রে বাহিরে গেলে বাড়ির অনেকেই চুপিচুপি রমার ঘরের দরজায় কান পাতিয়া ভিতবেব শব্দ শুনিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আর কোনোদিন কিছু শোনা যায় নাই !

শোনা যাইবে কী, রমা কি সহজ মেয়ে। হোক না স্বামীর ফাঁসি, সে দিব্যি মস্ত একটা ঘরে সাবারাত একা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে পাবে। আজ হঠাৎ অস্ফুটস্বরে একবার মাগো বলিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই ওর যে কিছু হইয়াছে—এ কথা মনে করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

মিস্টার দের কড়া সিগার টানিয়া পশুপতির বোধ হয় গলাটা খুসখুস করিতেছিল, সে আর একবার গলা সাফ করিয়া বলিল, রেণুব জন্য তুমি ভেবো না গনু। ওকে আসতে দেয়নি বটে, কিন্তু ওকে কষ্ট ওরা দেয় না।

বিবাহের পব প্রথম শ্বশুববাড়ি গিয়া আব আসিতে না দিলে, ষোলো বছরের মেয়েকে কষ্ট দেওয়া হয় কি না, গণপতি ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল না ; কিন্তু বোনটার জন্য তার নিজের বড়ো কষ্ট হইতে লাগিল। মৃদুস্বরে সে বলিল, ওকে একটা তার করে দিলে হত না ?

পশুপতি বলিল, তোমার কথা ? থাকগে, কাজ নেই, কী আর হবে ওতে ? মাঝখান থেকে বাড়ির লোকে হয়তো অসন্তুষ্ট হবে। কাল খবরের কাগজেই সব পড়তে পারবে।

খবরেব কাগজ ? তা ঠিক, খবরের কাগজে কাল সব খবরই বাহির হইবে বটে। কিন্তু রেণু কি খবরের কাগজ পড়িতে পায় ? ভাই খুনের দায়ে ধবা পড়িয়াছে বলিয়া অতটুকু মেয়েকে যাবা আটক করিয়া রাখিতে পারে—এতখানি উদারতা কি তাদের হওয়া সম্ভব ? গণপতি পরিমলের ছেলেকে মেঝেতে নামাইয়া দিয়া বলিল, তবু আপিলের ফলটা আগে থাকতে জানতে পারলে—

বাজেন্দ্র বলিলেন, তাই বরং দাও পশু, রেণুর শ্বশুরকে একটা তার করে দাও। লিখে দিযো প্লিজ ইনফর্ম বেণু—নযতো সে ব্যাটা হয়তো মেয়েটাকে কিছু জানাবে না।

তার লিখিতে পশুপতি আপিস ঘবে গেল।

মানুষের মধ্যে খোঁজ করিলে সব সময়েই মানুষকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, পাশবিকতা দিয়া হোক, দেবত্ব দিয়া হোক, কে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া রাখিতে পারে ? বত্রিশ বছর যে পরিবারে গণপতি সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপন করিযাছে, আজ সেখানে একটা বীভৎস অসাধারণত্ব অর্জন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে যে বিশেষভাবে অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠিবে এবং এতগুলি মানুষের মধ্যে ক্রমাগত মানুষকে খুঁজিয়া পাইতে থাকিবে—তাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। পলকে পলকে সে টের পাইতে লাগিল, এরা ভুলিতে পারিতেছে না। বিচার নয়, বিশ্লেষণ নয়, বিরাগ অথবা ক্ষমাও নয়, শুধু স্মরণ করিয়া রাখা—

স্মরণ করিয়া রাখা যে, তাদের এই গণপতির অকথ্য কলঙ্ক রটিয়াছে, দেশের ও দশের কাছে সে পরিবারের মাথা হেঁট করিয়া দিয়াছে। আইনের আদালতে ভালোরকম প্রমাণ না হোক, মানুষের আদালতে তার পাশবিকতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ফাঁসির হুকুম রদ হোক, এ ব্যাপারের এইখানে শেষ নয়, এখনও অনেক বাকি,—অনেক মন ও মানের লড়াই ! প্রত্যেকের ভিতরের মানুষটি এই অনিবার্য ক্ষতি ও বিপদের চিন্তায় ভীত ও বিমর্ষ হইয়া আছে, এই যে মানুষ, ভিতরের মানুষ, এ বড়ো দুর্বল, বড়ো স্বার্থপর—তাই এ কথাটাও কে না ভাবিয়া থাকিতে পারিয়াছে যে, এর চেয়ে ফাঁসি হইয়া গেলেই অনেক সহজে সব চুকিয়া যাইতে পারিত ! যে নাই, কতকাল কে তার কলঙ্ক কাহিনি মনে করিয়া রাখে ? মনে করিয়া রাখিলেই বা কী ? গণপতি না থাকিলে, এ বাড়িতে কেন তার কলঙ্কের ছায়াপাত হইবে ? সেটা নিয়ম নয়। লোকে শুধু এই পর্যন্ত ভাবিতে পারিত যে, এ বাড়িতে একটা বদলোক থাকিত, যে একটা স্ত্রীলোক ঘটিত অপরাধে জড়িত হইয়া একটা মানুষ খুন করিয়া ফেলিয়াছিল—কিন্তু সে লোকটা এখন আর নাই, এই বাড়ির আবহাওয়া এখন আবার পবিত্র, এ বাড়ির মানুষগুলি ভালো।

আর তা হইবার নয় ! দুষ্ট মানুষ ঘরে আসিয়াছে, তার দোষে ঘরের আবহাওয়া দূষিত হইয়াছে, দূষিত আবহাওয়া মানুষগুলিকে করিয়াছে মন্দ ! অন্তত লোকে তো তা-ই ভাবিবে।

এত স্পষ্টভাবে না হোক, মোটামুটি এই চিন্তাগুলিই গণপতির অনুসন্ধান তার মনে আনিয়া দিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সহসা রমার জন্য তার মনে দেখা দিল—গভীর মমতা ! জেলে বসিয়া রমার কথা ভাবিয়া তার খুব কষ্ট হইত, কিন্তু সে ছিল শুধু তার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া—রমা যে যাতনা ভোগ করিতেছে, তাই ভাবার কষ্ট ! কিন্তু এখন হঠাৎ সে বুঝিতে পারিল, স্বামীর জন্য শুধু ভাবিয়াই রমা রেহাই পায় নাই, নিজের অন্ধকার ভবিষ্যৎটার পীড়ন সহিয়াই তার মহাশক্তির পরীক্ষা শেষ হয় নাই, আরও অনেক কিছু জুটিয়াছে। বাহিরের জগৎ নরঘাতকের স্ত্রীকে যা দেয় ! সে সব যে কী এবং সে সব সহ্য করিতে একটি নিরুপায় ভীরু বধূর যে কতখানি কষ্ট হইতে পারে—ধারণা করিবার মতো কল্পনাশক্তি গণপতির ছিল না। যেটুকু সে অনুমান করিতে পারিল—তাতেই বুকের ভিতরটা তাহার তোলপাড় করিতে লাগিল।

নিজেকে সে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, যাক, রমার একটা প্রকাণ্ড দুর্ভাবনা তো দূর হইয়াছে ! স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়া আজ তো মনে তার আনন্দের বান ডাকিয়াছে ! এতদিন সে যদি অকথ্য দুঃখ পাইয়াই থাকে—আজ আর সে কথা ভাবিয়া লাভ কী ? প্রতিকারের উপায়ও তাহার হাতে ছিল না যে, রমার দুঃখ কমানোর চেষ্টা না করার জন্য আজ আপশোশ করিলে চলিবে। জেলে বসিয়া রমার দুঃখটা সে ঠিকমতো পরিমাপ করিতে পারে নাই : অন্যায় যদি কিছু হইয়া থাকে—তা শুধু এই। তা এ অন্যায়ের জন্য রমার আর কী আসিয়া গিয়াছে ! সে বুঝিলেই তো রমার দুঃখ কমিত না।

রাত্রি নটার সময় বৃষ্টি বন্ধ হইলে, পাড়ার দু-একজন ভদ্রলোক এবং পাড়ার বাহিরের দু-চার জন বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিলেন। পশুপতির ইচ্ছা ছিল, গণপতি আজ কারও সঙ্গে দেখা না করে—সেই সকলকে বলিয়া দেয় যে, গণপতির শরীর খুব খারাপ, সে শুইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু গণপতি এ কথা কানে তুলিল না, নীচে গিয়া সকলের সঙ্গে দেখা ও বসিয়া আলাপ করিল। রমার কথা নূতনভাবে ভাবিতে আরম্ভ করিবার পর গণপতি নিজের মধ্যে একটা নূতন তেজের আবির্ভাব অনুভব করিতেছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল, যা-ই ঘটিয়া থাক, ভীরু ও দুর্বলের মতো হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না ; নিজের জোরে আবার তাহাকে নিজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভূমিকম্পে বাড়ি অল্পবিস্তর জখম হইয়াছে বলিয়া মাঠে বাস করিলে তো তাহার চলিবে না ? বাড়িটা আবার মেরামত করিয়া লইতে হইবে। লজ্জায় সে যদি এখন মুখ লুকায়, তার লজ্জার কারণটা যে লোকে আরও বেশি সত্য বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিবে, আরও বড়ো বলিয়া ভাবিতে থাকিবে।

যাঁরা আসিয়াছিলেন, গণপতির মুক্তিতে আনন্দ জানানোর ছলে কৌতূহল মিটাইতেই তাদের আগমন। গণপতিব সঙ্গে কথা বলিয়া সকলে একটু অবাক হইয়াই বাড়ি গেলেন। মানুষ ভাঙিয়া-চুরিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু খুব যে নীচে নামিয়াছে—কারও তা মনে হইল না। সে নিজেই এক রকম চেষ্টা করিয়া প্রথম আলাপের আড়ষ্টতা কাটাইয়া আনিল। বেশি বকিল না, বেশি গম্ভীর হইয়া থাকিল না, গোঁয়ারের মতো ফাঁসির হুকুম পাওয়ার ব্যাপারটাকে অবহেলা করিয়া একেবারে উড়াইয়াও দিল না, আবাব এমন ভাবও দেখাইল না যে, ফাঁসির হাত এড়ানোর আনন্দে বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে ! ভগবান তো আছেন, বিনা দোষে একজনকে তিনি কি শাস্তি দিতে পারেন ?—এমন আশ্চর্য সরলতার সঙ্গে এমনভাবে গণপতি একবার এই কথাগুলি বলিল যে, শ্রোতাদের মনে তার প্রতি সত্যসত্যই একটু শ্রদ্ধার ভাব দেখা দিল, মনে হইল—আসিবার সময় লোকটার সম্বন্ধে যে ধারণা তাদের ছিল, লোকটা হয়তো সত্যই অতটা খাবাপ নয়।

আগন্তুকদের মধ্যে এই পরিবর্তনটুকু টের পাইতে গণপতির বাকি রহিল না। জয়ের গর্বে ও আশার আনন্দে তার বুক ভরিয়া গেল। এবার তাহার বিশ্বাস হইতে লাগিল যে, সে পারিবে, তাব ভাঙা মানসম্ভ্রমকে আবার সে নিটোল করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে। তার নামে চারিদিকে যে ঢি-ঢি শব্দ পড়িয়া গিয়াছে—ক্রমে ক্রমে একদিন সে শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়া একেবারে মিলাইয়া যাইবে। তার সম্বন্ধে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাব মরিয়া গিয়া মানুষের মনে আবার জাগিয়া উঠিবে প্রীতি ও শ্রদ্ধা—মানুষের মাঝখানে মানুষের মতো বাঁচিয়া থাকিতে আর তার কোনো অসুবিধা থাকিবে না।

রাত্রি পড়িয়া যাইতেছিল, বাহিরেব সকলে চলিয়া গেলে, গণপতি আর বেশি দেবি না করিয়া সামান্য কিছু খাইয়া নিজের ঘরে শুইতে গেল। নবজীবনের সূচনা করিতে বাহিরের কয়েকটি লোকের কাছে খানিক আগে সে যে সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তখনও তার মন হইতে তার মাদকতাভবা মোহ কাটিয়া যায় নাই এবং খানিক পরে সেই জন্যই বমার সঙ্গে তার বাধিল বিবাদ।

বিবাদ ? এমন প্রত্যাবর্তনের পব রমার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার বাত্রে—বিবাদ ? হযতো ঠিক তা নয় ; কিন্তু বমা ঘরে আসিবার ঘণ্টাখানেক পরে দুজনের মধ্যে যে সব কথার আদান-প্রদান হইল, সেগুলি বিবাদের মতোই একটা কিছু হইবে।

আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবাব সাহস দুজনের কাহারও ছিল না। ঘবে ঢুকিয়া রমা তাই যেমন ধীর পদে তার কাছে আসিল—সেও তেমনই ধীর ভাবেই তাহাকে বুকের মধ্যে গ্রহণ করিল। রমার ওজন অর্ধেক হালকা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু গণপতি সেটা ভালো রকম টের পাইল না। তার গায়ের জোরও যে অর্ধেক কমিয়া গিযাছে !

রমার দু চোখ দিয়া আস্তে আস্তে জলের ফোঁটা নামিতেছিল। খানিকক্ষণ পরে সে বলিল, তোমায় ফিরে পাব ভাবিনি।

গণপতি তার মাথাটা কাঁধের পাশে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমিও ভাবিনি আবার এ ঘরে তোমার কাছে ফিরে আসতে পাব।

শুধু রমার কাছে নয়, এ ঘরে রমার কাছে ফিবিয়া আসিবার সাধ ! রমাকে দেখিবার ফাঁকে ফাঁকে এখনও গণপতি ঘরখানাকেও দেখিতেছিল। প্রায় কিছুই বদলায় নাই ঘরের ! বাগানের দিকে দুটি জানালার কাছে, যে-খানে যে-ভাবে খাট পাতা ছিল—আজও সেইখানে তেমনইভাবে পাতা আছে। ও কোণে দেওয়ালে বসানো আলোটার ঠিক নীচে রমার প্রসাধনের টেবিল,—ছমাস কি সে প্রসাধন কবিয়াছিল ? এখানে খাটে বসিয়া আজও আয়নাটাতে তাদের প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে। রমা আগে মাঝে মাঝে কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, ওরা কে গো ? আমাদের দেখছে না তো ? দেওয়ালে তাদের বিবাহের বেশে তোলা ফটো এবং এ বাড়ির ও রমার বাড়ির কয়েকজনের ফটো টাঙানো আছে। কেবল পুরোনো যে তিনটি দামি ক্যালেন্ডার ছিল তার একটির বদলে আসিয়াছে দুটি সাধারণ

ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার। তার অনুপস্থিতির সময়ের মধ্যে একটা বছর কাবার হইয়া গিয়া নতুন একটা বছর যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ! আরও একটা পরিবর্তন হইয়াছে ঘরের। ঘরের ঔজ্জ্বল্য কমিয়া গিয়াছে। মেঝেটা সে রকম ঝকঝকে নয়, ফটো আর ছবিগুলিতে অল্প অল্প ধুলা আর ঝুল পড়িয়াছে, চারিদিকে আরও যেন আসিয়া জুটিয়াছে কত অদৃশ্য মলিনতা।

কী দেখছ ?—রমা এক সময় জিজ্ঞাসা করিল। প্রায় একঘণ্টা পরে।

গণপতি বলিল, ঘর দেখছি।

রমা বলিল, ঘর দেখে আর কী হবে ? এ ঘরে তো আমরা থাকব না।

থাকব না ? কোন ঘরে যাব তবে ?

আমরা চলে যাব।

রমা বিছানায় নামিয়া একটু সরিয়া ভালো করিয়া বসিল। বিবাদ শুরু হইয়া গিয়াছে।

গণপতি একটু বিস্মিত হইয়া বলিল,—কোথায় চলে যাব রমা ?...

অনেক বিনিদ্র রাত্রি ব্যাপিয়া রমা এ প্রশ্নের জবাব ভাবিয়া রাখিয়াছে, সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, যে দিকে দু চোখ যায়,—অনেক দূর অচেনা দেশে, কেউ যেখানে আমাদের চেনে না, নামধাম জানে না—সেখানে গিয়ে আমরা বাসা বাঁধব। আজ রাত্রেই সব বেঁধেছেঁদে রাখি, কাল সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব, কেমন ? আর একটা দিনও আমি এখানে থাকতে পারব না।

গণপতি বোকার মতো জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

রমা স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, বুঝতে পারছ না ? সবাই আমাদের ঘেন্না করবে—আমরা এখানে থাকব কী করে ?

এমনিভাবে শুরু হইল তাহাদের কথা কাটাকাটি। গণপতি বলিল যে, এমন পাগলের মতো কি কথা বলিতে আছে, বাড়িঘর আত্মীয়স্বজন অর্থোপার্জন সব ফেলিয়া গেলেই কি চলে ? কীই বা দরকার যাওয়ার ? দু-চারদিন লোকে হয়তো একটু কেমন কেমন ব্যবহার করিতে পারে, তারপর সব ঠিক হইয়া যাইবে। এত ভাবিতেছে কেন রমা ? বিবাদ করার মতো করিয়া নয়, আদর করিয়া—খুব মিষ্টি ভাষাতেই গণপতি তাহাকে কথাগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বাহিরের ঘরে, বাহিরের কয়েকটি লোকের মন হইতে অশ্রদ্ধার ভাব সে যে মোটে আধঘণ্টার চেষ্টাতে প্রায় দূর করিয়া দিয়াছিল, এ কথা গণপতি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। দেশ ছাড়িয়া চিরদিনের জন্য বহুদূর দেশে—অজানা লোকের মাঝে আত্মগোপন করিয়া থাকিবার ইচ্ছাটা রমার, তাই তার মনে হইতেছিল ছেলেমানুষি।

রমা শেষে হতাশ হইয়া বলিল,—যাবে না ?

গণপতি তাহাকে বুকে টানিয়া আনিল, সস্নেহে তাহার পাংশু কপোলে চুম্বন করিয়া বলিল,—যাব না বলেছি, পাগলি ? চল না দুজনে দু-চারমাসের জন্য কোথা থেকে বেড়িয়ে আসি।

রমা অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, দু-চারমাসের জন্য আমি কোথাও যাব না। চিরদিনের জন্যে।

আচ্ছা, কাল এ সব কথা হবে রমা।

না, আজকে বলো যাবে কি না, এখুনি বলো। কাল ভোরে উঠে আমরা চলে যাব।

গণপতি এবার হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—আচ্ছা, তোমার কী হয়েছে বলো তো ? এমন করে কেউ কখনও যায় ? রমা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—আচ্ছা, তবে থাক।

গণপতি আরও খানিকক্ষণ তাহাকে আদর করিল, আরও খানিকক্ষণ বুঝাইল। কিন্তু দুর্বল শরীরটা তাহার শ্রান্তিতে ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তাই আধঘণ্টাখানেক পরে ছেলেমানুষ বউকে আদর করা ও বোঝানো দুটাই যথেষ্ট হইয়াছে, মনে করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে রাজেন্দ্র উকিলের বাড়িতে একটা বিরাট হইচই শোনা গেল। বাড়ির মেজোবউ রমা নাকি গলায় ফাঁসি দিয়া মরিয়াছে।

ভূমিকম্প

মাঝরাতে বাসুকী একবার মাথা নাড়িলেন।

প্রসন্ন অঘোরে ঘুমাইতেছিল। কাল গরমে তাহার ভালো ঘুম হয় নাই, আজ নটা বাজিতে না বাজিতে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। খাইয়া উঠিয়া দশ মিনিট কালও সে আজ বসিতে পারে নাই। অমন চাঁদ উঠিয়াছিল আজ, টুকরা টুকরা গতিশীল মেঘে অমন অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল আকাশ, ওদিকে তাকাইবার অবসরও তাহার ছিল না। চোখে ঘুম লইয়া সে শুইয়াছিল এবং শোওয়ামাত্র ঘুমাইয়াছিল।

তারপর মাঝরাত্রে প্রকৃতির এই কাণ্ড।

প্রসন্নের ঘুম ভাঙিল আতঙ্কে। তখন চাঁদ অস্ত গিয়াছে, [illegible] ভিতর অন্ধকার এমন গাঢ় যে চোখেব পাতাটি পর্যন্ত দেখা যায় না। চৌকিটা বেতালে দুলিতেছে, টিনের চালে ঝনঝন শব্দ উঠিয়াছে, বাহিরের আকাশ শঙ্খের আর্তনাদে মুখর। কোণ ছিঁড়িয়া মশারির একটা দিক গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া বুঝিবার জো নাই যে এই কোমল অবাধ্য আলিঙ্গন মশারিরই, একটা নাম-না-জানা ভয়ানক কোনো কিছু নয়।

প্রসন্নেব মনে হইল, সে মরিয়া গিয়াছে। ভয়েব এতগুলি সমন্বয় মানুষেব জীবনে বাঁচিয়া থাকিতে ঘটে না।

হঠাৎ প্রসন্ন সচেতন হইয়া উঠিল, কে যেন উঠানে তারস্বরে হাঁকিতেছে, প্রসন্ন ওঠ শিগগিব, ভূমিকম্প হচ্ছে। ওরে প্রসন্ন, প্রসন্ন ?

ভয়ের মধ্যে পলায়নের প্রেরণা থাকে, কত যুগযুগান্ত ধরিয়া যে ভয়েব আগে আগে সে পলাইয়া বেড়াইতেছিল তাহার ঠিকানা নাই, কিছু না জানিয়া কিছু না বুঝিয়া ও ভাবে পালানোর মতো ভয়ানক আর কিছু নাই, এবার প্রসন্ন বাঁচিল। মশারির আলিঙ্গন ছাড়াইয়া সে চৌকির নীচে নামিয়া পড়িল।

কিন্তু পলাইতে আরম্ভ করার মধ্যে যে পরিত্রাণ নাই সে কথা বোঝা গেল মুহূর্তের মধ্যেই। প্রসন্ন দরজা খুঁজিয়া পাইল না। তাহার ধাবণা-মতো যেখানে দবজা থাকার কথা সেখানটা হাতড়াইয়া শুধু দরমার বেড়াই তাহার হাতে ঠেকিল। আজ এই একান্ত অসময়ে সে দরজার অবস্থান ভুলিয়া গিয়াছে। এ কী অসহায় অবস্থা !

ভূমিকম্পের চেয়ে হৃৎকম্পই এবার তাহার বড়ো বিপদ হইয়া উঠিল। মাটির সঙ্গে কাঁপিতে গিয়া সাজানো ইটের বাড়ি যেভাবে ভাঙিতে থাকে প্রসন্ন তেমনইভাবে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। নাড়া খাইয়া তাহার মগ্ন চেতনা হইতে যে কত দুঃখ ভয় ও উত্তেজনার তলানি উঠিয়া আসিয়া তাহার বর্তমান আতঙ্কের সঙ্গে মিশিয়া গেল তাহার হিসাব হয় না।

বাহিরে শঙ্খের শব্দ, হুলুধ্বনি ও আত্মীয়স্বজনের ব্যাকুল ডাকাডাকির বিরাম নাই। পৃথিবীর যেখানে যত মমতা আছে, সব যেন তাহার বিপদে একসঙ্গে আপশোশ জুড়িয়া দিয়াছে, সে বাহির হইতে না পারিলে শেষ পর্যন্ত ওদের বুকও তাহার বুকের মতোই ভাঙিয়া যাইবে।

দরজা কই, দরজা ?

এইখানে দরজা, এইখানে—মার হাতের বালা ঠকাঠক শব্দে দরজায় মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

প্রসন্ন দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। বাঁচিবার অনন্ত অবকাশ লইয়া উঠানের কোণে ভাঙা চৌকিটাতে সে বসিয়া পড়িল। এই রুক্ষ কঠোর মাটির পৃথিবীর সঙ্গে অসমান যুদ্ধে সে জয়লাভ করিয়াছে, কিন্তু সে দারুণ আহত।

সেই ভূমিকম্পের পর প্রায় দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসন্নের মস্তিষ্কে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলে, অন্যমনস্ক অবস্থায় হঠাৎ কেহ জোরে নাম ধরিয়া ডাকিলে তাহার মাথার মধ্যে একটা কালো পর্দা দুলিতে আরম্ভ করে। পর্দাটির প্রান্তগুলি পবল পরল অন্ধকার দিয়া দরমার বেড়ার মতো করিয়া বোনা এবং ঝাপসা অন্ধকারের দেয়ালে আটকানো। দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া জোরে জোরে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়া পর্দা সবানো যায় না, অতীত জীবনের চেনা অথচ অজানা রহস্যের মতো দুলিতে থাকে। চেষ্টা স্থগিত করিলে হঠাৎ এক সময় পর্দাটা অন্তর্হিত হইয়া যায়। আশ্চর্য এই, তখন আর পর্দাটির ভূতপূর্ব অস্তিত্বে প্রসন্ন বিশ্বাস করে না। মাথার মধ্যে যে মাঝে মাঝে তাহার অমন খাপছাড়া অভিনয় হয় সে কথাটাও সে বেশ ভুলিয়া থাকে।

বছর দুই পরে চাকরির চেষ্টায় একবার মাদ্রাজ ঘুরিয়া আসিয়া পর্দাটা তাহার মাথা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু রাখিয়া গেল অন্য উপসর্গ।

মাদ্রাজ যাওয়ার সময় তাহার সঙ্গে একটি সুটকেসে খান দুই ধুতি ও একটি জামা ছিল, ওই সামান্য জিনিস চুরি যাওয়ার ভয়ে সমস্ত পথ সে চোখ বুঝিতে পারে নাই। রূপান্তর লইয়া এই ভয় তাহার মনে কায়েমি হইয়া রহিল। প্রত্যেক রাত্রে সমস্ত রাত্রির জন্য নিজের অচেতন অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া তাহার ঘুম টুটিয়া যাইতে লাগিল। কৌতূহলের ছোটোবড়ো সমস্ত বিষয় ঘুমের রহস্যের মতোই তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। যাহা গোপন, যাহা সে বোঝে না তাহাই ভয়ানক, তাহাই নিষ্ঠুর। একদিন ছেলেদের পুরানো মাসিকে একটা সামান্য ধাঁধার জবাব বাহিব করিতে না পারিয়া ক্রোধে ক্ষোভে সে এমন বিচলিত হইয়া পড়িল যে, পরে ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা করিয়া দেখিয়া তাহার দুঃখ ও লজ্জার সীমা রহিল না।

তখন দিনের আলো নিবিয়া আসিয়াছে, চারিদিকে আনন্দের দীনতা। কপালের ঘাম বাতাসেই শুকাইয়াছে, তথাপি কাপড় দিয়া কপাল মুছিয়া প্রসন্ন ভাবিতে লাগিল, সে যে পাগল নয় তার প্রমাণের সংখ্যাগুলি যদি এমনিভাবে কমিয়া আসে তাহা হইলে উপায় হইবে কী?

অথচ প্রতিকার নাই। সে সবই বুঝিতে পারে, কিন্তু নিজেকে কিছুই বুঝাইতে পারে না। রাত্রে মশারি গুঁজিয়া শুইয়া তাহার মনে হয় ভালো করিয়া বুঝি গোঁজা হয় নাই, কোথায় ফাঁক রহিয়াছে, মশা ঢুকিবে। এ যে ভুল বুঝিতে পারিলেও তিন-চারবার সন্তর্পণে তোশকের চারিপ্রান্ত না হাতড়াইলে তাহার স্বস্তি থাকে না। বসিবার ঘরে তালা দিয়া বারবার টানিয়া দেখিয়া আসিলেও তাহাকে আবার ফিরিয়া গিয়া তালা ঠিকমতো লাগানো সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হয়। চৌকির নীচে রোজই সে চোর খোঁজে।

এমনই সব অন্তহীন পাগলামি। মাঝে মাঝে সে বিদ্রোহ করে, কিন্তু তাহাতে ফল আরও খারাপ হয়। যুদ্ধ করিয়া হার মানিতে জ্বালা যেন বাড়িয়া যায়। নিজের কাছে নিজের সে কী নির্মম অপমান!

প্রসন্নের হৃদয়বৃত্তিগুলি ক্রমে তীক্ষ্ণ ও সতেজ হইয়া উঠিল, অনুভবশক্তি আশ্চর্যরকম বাড়িয়া গেল —তাহার মধ্যে ভাবপ্রবণতা দেখা দিল। ছোটো দুঃখ তাহার কাছে এখন আর ছোটো নয়, প্রাত্যহিক জীবনের যে-সব সূক্ষ্ম ও কোমল সুর তাহার মতো অকবির কানে পশিবার কথা নয় এখন সেগুলি সে বেশ ধরিতে পারে। কল্পনাকে—অবাস্তব কল্পনাকে, আমল দিতে তাহার ভালো লাগে।

সময় সময় সে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়ে। জীবনের দেনাপাওনার কড়া হিসাবি সে নয়, তবু সে টের পায় জীবনটা অর্থহীন। বাঁচিয়া থাকার কোনো মানেই সে খুঁজিয়া পায় না।

জীবনের যে মানে সে খোঁজে তাহা অসাধারণ বৈচিত্র্য, উত্তেজনা, ভূমিকম্প, রোগশোক ও আতঙ্কের সমারোহ ভিন্ন আর কিছু নয়। মদের তৃষ্ণা জলে মিটিবে কেন ? নিত্য পাত্র ভরিয়া তীব্র সুরা সম্মুখে ধরিবে মানুষের জীবন তেমন সাকিও নয়।

রাত্রে প্রসন্ন আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে।

একটা খাড়া উঁচু পাহাড়। তার উপরে প্রসন্নের স্কুল। অনেক বয়সে স্কুলে পড়িতেছে বলিয়া প্রসন্নের বড়ো লজ্জা, টিফিনের ছুটির সময় স্কুলের সামনে পাহাড়ের একেবারে ধারে সে চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে। হঠাৎ একটা ছেলে তাহাকে এমন ধাক্কাই দিল যে পাহাড়ের নীচে আছড়াইয়া না পড়িয়া প্রসন্নের আর উপায় নাই ; কারণ আজ শাড়ি পরিয়া স্কুলে আসিয়াছে বলিয়া উড়িবার প্রক্রিয়াটা সে ভুলিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের ঠিক নীচে একটা ইঁদারা, শূন্যে পড়িতে পড়িতে প্রসন্ন বিবেচনা করিয়া দেখিল ইচ্ছা করিলে ইঁদারার মধ্যেও পড়া যায় অথবা একটু বাঁকিয়া ইঁদারার পাকা বাঁধানো পাড়ের উপরেও আছড়ানো চলে। কী করা উচিত ?

আধাআধি পড়িয়া সে মনস্থির করিয়া ফেলিল। ইঁদারার জলে পড়িলে লাগিবে না বটে, কিন্তু ওর মধ্যে আবছা অন্ধকার, ওর মধ্যে অজানা রহস্য। তাছাড়া নিজের চেষ্টায় উঠিয়া আসিতে না পারিলে ওর মধ্যেই তাহাকে বাকি জীবনটা কাটাইতে হইবে। হেডমাস্টার নিয়ম করিয়াছেন কোনো ছেলে ইঁদারায় পড়িলে তাহাকে আর তোলা হইবে না।

নৌকার হালের মতো হাতের খাতায় বাতাস কাটিয়া প্রসন্ন ইঁদারার পাড়ে আছড়াইয়া পড়িল।

হাত-পা ভাঙিল না বটে, কিন্তু আঘাত লাগিল, সত্যিকারের আছাড় খাওয়ার সমানই। স্বপ্নে আর বাস্তবে ও ছাড়া আর তফাত আছে কি ? ভালোবাসিয়া যাহাকে পাই নাই, স্বপ্নে সে পাশে আসিয়া বসিলে এই স্বপ্নে পাওয়ার মধ্যে শুধু বাস্তবতার ফাঁকিটুকুই থাকে বলিয়া বাঁচা সম্ভব হইয়াছে। স্বপ্নকে তাহার ন্যায্য মূল্য দিতেই হইবে।

প্রসন্ন উঠিয়া আলো জ্বালিল। জল খাইয়া গায়ে একটা চাদর জড়াইয়া চুপচাপ বিছানায় বসিয়া রহিল। শুধু বাড়ি নয়, সমস্ত পাড়াটা নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে। আলোটা ভয়ে ভয়ে মিটিমিটি জ্বলিতেছে, রাস্তার আলো এতখানি অন্তরালে যে অস্তিত্বের মৃদু প্রমাণটাই বিস্ময়কর।

এ যেন রাত্রি নয়, শঙ্কার কুয়াশা।

প্রসন্ন ভাবিতে লাগিল, একটা বউ থাকিলে এ সময় কাজ দিত। প্রেমালাপ, মানুষের সঙ্গে দুটি সাধারণ কথা বলিবার এত বড়ো প্রয়োজন কি সচরাচর আসে ? বউ নিশ্চয় তাহার ভয়ের ভাগ লইত, দু চোখ বড়ো বড়ো করিয়া ভীতকণ্ঠে বলিত, কী গো কী? সে বলিত, কিছু না, বড্ড মশা লাগছে। উঠে মশারিটা একবার ঝাড় না ? আলোটা বাড়িয়ে দাও, আমার বড়ো ভয় করছে। আমি রয়েছি ভয় কী ? বলিয়া সে হাসিত। বউ তথাপি বলিত, না না, আলোটা তুমি বাড়িয়ে দাও।

মা কেমন করিয়া টের পাইয়াছিলেন, উঠিয়া আসিয়া জানালা দিয়া প্রশ্ন করিলেন, রাতদুপুরে আলো জ্বেলে বসে রয়েছিস যে ?

একটা দুঃস্বপ্ন দেখলাম, মা।

তা দেখবি না ? যে অনাচারটাই তুই করিস। কাপড়ে ভাত পড়ল, পইপই করে বারণ করলাম কানে তুললি না, সেই কাপড়ে এসে শুলি। নে, মা দুর্গাকে ডেকে আলো নিবিয়ে ঘুমো।

পরদিন সকালে মা বলিলেন, এবার একটা বিয়ে কর বাবা, মাথা খাস। রোজগারপাতি করছিস—

সকালে বউয়ের প্রয়োজন মিটিয়া গিয়াছে, খবরের কাগজটা নামাইয়া প্রসন্ন বলিল, কানপুরে কী ভয়ানক কাণ্ড হয়েছে জানো মা ? একটা আপিসের ছাদ ভেঙে সাতজন কেরানি মারা গেছে, পনেরো জন জখম হয়েছে।

মোটা হেডিংটা দেখিয়া মা বলিলেন, ওই লিখেছে বুঝি ?

না, ওটা যুদ্ধের খবর।

পড় তো শুনি।

যুদ্ধের খবর আর কী শুনবে মা ? কানপুরের কাণ্ডটা কী ভয়ানক বলো তো ! আপন মনে সবাই কাজ করছে, কেউ কিছু জানে না, হঠাৎ হুড়মুড় করে ছাদ ভেঙে সাতজনের কবর হয়ে গেল, পনেরো জন জখম হল। ভাবলে গা শিউরে ওঠে।

বলিয়া প্রসন্ন উপরের দিকে তাকাইল। এ বাড়ির কড়িবরগা সমস্তই লোহার। ছাদ ভাঙিবার সম্ভাবনা তেমন নাই। সে মৃদু মৃদু হাসিল। ভাবিল, খবরের কাগজের খবরগুলিও ওষুধের বিজ্ঞাপনের মতো এমন হিপ্‌নটিক ! স্টোভ-দুর্ঘটনার বিবরণ পড়া অবধি আজকাল সে কত ভয়ে ভয়ে স্টোভ জ্বালায়, মাকে জ্বালাইতে দেয় না, চাকরকেও না।

চাকরি পিতৃবন্ধু-র কল্যাণে। পিতৃবন্ধু আপিসের বড়োবাবু। ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় প্রসন্নকে তিনি ভালোবাসেন। দোষ করিলে ধমকান না, মাঝে মাঝে ডাকিয়া উপদেশাদি দেন এবং কামানো চিবুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কী যেন ভাবেন।

ঠিক যেন ভাবেন না, দুশ্চিন্তা করেন।

সুতরাং অল্পকালের মধ্যে প্রসন্নর প্রমোশন হইল। সব দিক দিয়াই সে উপরে উঠিল। তাহার মাহিনা যেমন বাড়িল সত্তর হইতে আশি টাকায়, তাহাকে কাজ করিতে হইল একতলা হইতে একেবারে চারতলায় উঠিয়া গিয়া। বড়োবাবুর পক্ষপাতভরা দরদ প্রসন্নকে এমন বিচলিত করিল বলিবার নয়।

বড়োবাবু ডাকিয়া বলিলেন, তোমার বয়স কত হল হে প্রসন্ন ?

আজ্ঞে, সাতাশ।

বল কী, সাতাশ ! বিয়েটিয়ে করে এবার সংসারী হও ? না, ও সব ইচ্ছা নেই ?

প্রসন্ন চোখ নামাইয়া বলিল, আজ্ঞে সামান্য আয়—

বড়োবাবু কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি যখন বিবাহ করেন তাঁহার এক পয়সা আয় ছিল না। স্ত্রী কি তাঁহার খাইতে পায় নাই ? প্রসন্ন আশি টাকা বেতন পায়, দেশে বাড়িঘর জমি-জায়গা আছে, বিবাহ করিতে হইলে কি রাজা হইতে হয় না কী ? তারপর—

আমি যদ্দিন এখানে বড়োবাবু আছি, মাইনে বাড়ার ভাবনাটা তোমার ভাবতে হবে না বাপু। বলিয়া বড়োবাবু হাসিলেন।

এ তো শুধু চুম্বক, কথা তিনি কম বলেন নাই। দুর্ভাবনায় ঘামে হাতের তেলো ভিজাইয়া প্রসন্ন নীরবে আগাগোড়া সবটাই শুনিল। বড়োবাবুর কন্যাটিকে সে দেখিয়াছে। লোভ করা যায় এমন সে মেয়ে, তাছাড়া বাপ তার বড়োবাবু। হইলে সব দিক দিয়া ভালোই হয়। প্রসন্ন কিন্তু কিছুমাত্র উৎসাহ পাইতেছিল না। এমন একরাশি কালো চুল পিঠে ছড়াইয়া অল্প বিরক্তিতে ভ্রু-দুটি অমনভাবে একটুখানি কুঁচকাইয়া যে মেয়ে ও রকম আশ্চর্যকণ্ঠে বলিতে পারে, 'বাবা বাড়ি নেই' তাহাকে বিবাহ করা কী ভয়ের কথা ? ও মেয়ের সঙ্গে একা একঘরে বসিয়া আছে কল্পনা করিলেও তাহার বুকের মধ্যে টিপটিপ করিতে থাকে। ওকে বিপদ বলিয়া ভাবা যায়, বউ বলিয়া কোনোমতেই যেন ভাবা যায় না।

এদিকে বড়োবাবুকে না বলিবার সাহসই বা সে কোথায় পায় ?

বড়োবাবুর বুদ্ধি-বিবেচনার উপর প্রসন্নর শ্রদ্ধা কমিয়া গেল। নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া সে ভাবিতে লাগিল, নিজের মেয়ের উপরেও কি লোকটার কিছুমাত্র মমতা নাই ? অমন মেয়েকে কী বলিয়া তাহার মতো লোকের হাতে সঁপিয়া দিতে চায় ? দেশে কি সুপাত্রের অভাব ঘটিয়াছে ?

যেখানে বসিয়া প্রসন্ন কাজ করে তার পাশেই প্রকাণ্ড একটা জানালা। পাঁচ-সাতজন মানুষ একসঙ্গে গলিয়া যাইতে পারে জানালাটা এত বড়ো। শিক নাই। তা তিনতলার জানালায় শিকের কী প্রয়োজন ? গলিয়া পড়া সহজ বলিয়া কে আর তিনতলার জানালা দিয়া গলিয়া নীচে পড়িতেছে ? মানুষ তো পাগল নয় !

কাজ করিতে করিতে প্রসন্ন বারবার জানালায় উঠিয়া যায়। শহরটা ইটের বটে। পথ দিয়া গাড়িঘোড়ার আর মানুষের স্রোত বহিয়া যায়, পথটা যেন নদী। নিচু ফুটপাতটার দিকে চাহিয়া প্রসন্নর গা একটু ছমছম করে।

লিফটে উঠিবার সময় যেমন হয় তেমনই একটা অনুভূতি, কেবল তীব্রতা কম। গভীর কিন্তু তীব্র নয়।

আজ বিচলিত মন লইয়া খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া প্রসন্ন প্রথম অনুভব করিল যে, ফুটপাতটা আসলে বেশি নিচু নয়, তিনতলার মানুষের অনায়াস মরণ বিছানো আছে বলিয়াই অত নিচু মনে হয়। ফুটপাতের চৌকা পাথরের প্রান্তগুলি সে বেশ দেখিতে পাইতেছে, একটা কলার খোসা পড়িয়া আছে ইহাও তাহার লক্ষ এড়ায় নাই। প্রসন্ন একদৃষ্টিতে কলার খোসাটার দিকে চাহিয়া রহিল। তিনতলা হইতে লাফাইয়া পড়িলে মানুষ বাঁচে কি না এই কৌতুককর সমস্যাটা তাহাকে হঠাৎ আজ বিব্রত করিয়াছে।

মরিবেই যে এমন কোনো মানে নাই। বাড়িতে আগুন লাগিলে ইহার চেয়ে উঁচু হইতে লাফাইয়া মানুষ প্রাণ বাঁচাইযাছে, আর এই জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িলে বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকিবে না ? বাড়িতে আগুন লাগিয়া হোক, ছাদটা ধসিয়া পড়ার উপক্রমেই হোক, প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহাকেই যদি এই জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িতে হয়, তাহাকে মরিতেই হইবে ?

প্রথমটা ক্ষুব্ধ হইয়া শেষে প্রসন্ন শান্ত হইল। মরেও যদি, মন্দ হয় না। তাহাকে ঘিরিয়া রাস্তায় ভিড় জমে, আপিসসুদ্ধ সকলে ছুটিয়া নীচে নামে, চকিতের জন্য বড়োবাবুর মনে কন্যার বৈধব্য সংঘটিত হয়, অ্যাম্বুলেনস আসে, সমারোহের আর সীমা থাকে না। বৃদ্ধ বয়সে রোগশয্যায় শুইয়া মরার চেয়ে এ মৃত্যুতে বেশ খানিকটা অভিনবত্ব থাকে।

সেদিন কাজে আর তার মন বসিল না। বারবার উঠিয়া গিয়া সে দেখিয়া আসিতে লাগিল, কলার খোসাটা তখনও পড়িয়া আছে কি না। তাহার বড়োই ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, তাহার চোখের সামনে একজন খোসাটায় পা দিয়া পিছলাইয়া পড়ে, মনের আনন্দে সে খানিকক্ষণ হাস্য করে। এত লোক চলিতেছে পথে, কারও পা কি খোসাটায় পড়ে না ? এমনই সব সাবধানি পথিক যে পা পিছলাইয়া পড়াটাও সকলে সাবধানে বাঁচাইয়া চলে ?

কলার খোসার সদ্‌গতিই হইল। প্রসন্নর চোখের সামনে একটা গোরু সেটা খাইয়া গেল ! ক্ষুণ্ণমনে সে টেবিলে ফিরিয়া গেল। সেদিন আর জানালায় উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা তাহার হইল না। কলার খোসার অপচয়কে উপলক্ষ করিয়া জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িতে না পাবায় দুঃখ তাহার মনে মৃদু বিষের মতো প্রভাব বিস্তার করিল, আকাশের রহস্যভরা সুনীল রূপ দিগন্তবিস্তৃত ইটের স্তূপের গম্ভীর মহিমা, আর জানালার ঠিক নীচে পাথর-বাঁধানো ফুটপাত প্রসন্নের কাছে সমস্ত আকর্ষণ হারাইয়া ফেলিল। কাহার উপর অভিমান করা উচিত সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল কে যেন তাহাকে ঠকাইতেছে, ক্রমাগতই ঠকাইতেছে।

প্রসন্ন চমকাইয়া উঠিল। বড়োবাবু কাঁধে হাত রাখিয়াছেন।

মাকে বোলো হে, রবিবার দেখা করতে যাব।

আজ্ঞে বলব।

তিনতলায় কাজ আরম্ভ করা অবধি প্রসন্ন নানা ছলে লিফ্‌টে উঠানামা করিয়াছে। একটা ছোটোখাটো ঘর, মেঝে আছে, দেয়াল আছে, ছাদ আছে, তার মধ্যে মিনিটখানেক বন্দী থাকিয়া সোঁ

করিয়া উপরে ওঠা নীচে নামা কী রোমাঞ্চকর রোমান্স ! আজ সে সিঁড়ি দিয়াই নীচে নামিল। লিফ্‌টের মোহ আজ তাহার নাই। যার এমন বিপদ ঘটিতে বসিয়াছে অত শখে তাহার কাজ কী ? জীবনে সহসা যে সমস্যা দেখা দিয়াছে এখন গভীরভাবে সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। মেয়েটাকে আর একবার দেখিতে পারিলে ভালো হইত। একবারমাত্র দেখিয়া ওকে যেন বেশি রহস্যময়ী মনে হইতেছে। অল্প বিরক্তিতে ঠিক কীভাবে সে ভ্রু-দুটি কুঞ্চিত করে আর একবার না দেখিয়া ও-মেয়েকে বিবাহ করা বোধ হয় সুবিবেচনার কাজ হইবে না।

অন্যমনে বাসে উঠিতে গিয়া প্রসন্ন পড়িতে পড়িতে অল্পের জন্য বাঁচিয়া গেল। ভিতরে বসিয়া লজ্জায় সে কাহারও দিকে চাহিতে পারিল না। অপরাধ সে কারও কাছে করে নাই, কিন্তু সেজন্য শাস্তি আটকায় না, এমনই মন্দ তাহার কপাল। রাত্রে ঘুমাইতে সে যে কষ্টটা পাইল তাহার তুলনা হয় না। বড়োবাবুর মেয়েটি যেন কড়া নেশা, তাহার কল্পনা সেই নেশারই অবসাদ ; নিস্তেজ অথচ নির্মম ; তাহার বেশ ঘুম আসিতে থাকে, শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া চিন্তাগুলি পরস্পরের সঙ্গে জট পাকাইয়া যায়, ঘুমাইয়া পড়িতে আর বিলম্ব নাই—সহসা সে পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত হইয়া ওঠে। জাগরণ এমন আকস্মিক হয় যেন চমক লাগে। সার্কাসের তাঁবুতে পাঁচ-ছয়টা উঁচু দোলনার একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিয়া দুলিবার কসরত করিতে করিতে এ কী ঘুম ভাঙা !

এমনিভাবে তাহার রাত্রি প্রভাত হইল। সকালে সে মাকে বলিল, তাড়াহুড়ো করে বাঁধবার দরকার নেই মা। আজ আপিস যাব না।

মা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রসন্ন বলিল, রাত্রে তাহার জ্বর আসিয়াছিল। মা চিন্তিত হইয়া বলিলেন, ওষুধপত্তর কিছু খা বাবা তুই। বড়ো খারাপ হয়ে যাচ্ছে তোর চেহারা।

প্রসন্ন মৃদু হাসিয়া বলিল, ওষুধপত্রের ব্যবস্থাই হচ্ছে মা।

বিবাহের প্রক্রিয়াটা প্রসন্ন সাহসী পুরুষের মতোই সহ্য করিল। বিশেষ কঠিন নয়, কারণ নিজের তাহার কিছুই করিবার নাই, যাহা দরকার অন্যে করাইয়া লয়। তাহার ভয় ছিল বাসরে। একগাদা মেয়ে যখন তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিবে হালভাঙা নৌকার মতো টলমল করিলে চলিবে না, নিজেকেই তাহার চারিদিক সামলাইয়া চলিতে হইবে। ঘর নির্জন হইলে বউয়ের সঙ্গে ভাবও করিতে হইবে তাহাকেই।

বাসর বসিতে রাত বারোটা বাজিয়া গেল। মেয়েরা হাসিল, ফাজলামি করিল, গান গাহিল, রাত্রি আড়াইটা পর্যন্ত। তবু কি তাহারা উঠিতে চায়—এই যে আরম্ভ এ যাহার শেষ হইয়া গিয়াছে, কারণে অকারণে স্বামী এখন যার বকে, অসুস্থ শিশু যার দিবারাত্র ককায়, পরের জীবনে এই আরম্ভকে সেও ঘাঁটিতে চায়, ইহাকে প্রকাশ্য ও সাধারণ করিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কম নয়। বাসরে বিবাহিতা মেয়েরাই ভিড় করে বেশি। বিবাহোৎসবে সধবা নারী অপরিহার্য এবং সে নিয়ম তাহাদেরই তৈরি।

প্রসন্ন ইহাদের চিনিতে পারিল না। সংসারের সংস্রবে সে এত বড়ো হইয়াছে, ইহাদের জীবনী তাহার অজানা নয়, এত উল্লাস ইহাদের আসে কোথা হইতে ? অবাধে ইহারা আনন্দ করিতেছে, হাসি ইহাদের আন্তরিক, দেখিয়া মনে হয় না জীবনে ইহাদের কোনোদিন দুঃখের ছায়াপাতও হইয়াছিল। একে একে প্রসন্ন উপস্থিত প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, কারও চোখ দুটিতে পর্যন্ত বিষণ্ণতার আভাসটুকু নাই, খুব যে নিরীহ সেও হাসিমুখে অন্যের পরিহাস উপভোগ করিতেছে, দু চোখ খুশিতে চপল। প্রসন্ন সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল, সংসারে শোকতাপ নাই এ কথা সত্য নয়, তার বড়ো ভাগটা মেয়েরাই গ্রহণ করিয়া থাকে ; কিন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ব্যক্তিগত জীবনকে কিছুকালের জন্য অতিক্রম করিয়া যাওয়ার প্রক্রিয়াটা ইহাদের বোধ হয় জানা আছে।

ভাবিয়া প্রসন্ন খুশি হইল। খানিক পরে যে স্ত্রীর সঙ্গে তাহার আলাপ করিতে হইবে সে ইহাদের স্বজাতীয়া। যে প্রকৃতিগত দুর্বলতার দরুন ইহারা কান্নার সময় প্রাণ দিয়া কাঁদিয়া হাসিবার

সময় নির্বিকার চিত্তে হাসিতে পারে, বড়োবাবুর মেয়ের মধ্যেও সে দুর্বলতা নিশ্চয় আছে। সকল নারীর মতো তাব বউও জীবনকে যাচাই করিবে না, হাসিকান্না যাহাই আসুক বিনা প্রতিবাদে দ্বিধামাত্র না করিয়া গ্রহণ করিবে, এমনই একটা সান্ত্বনা প্রসন্নকে খানিক আশ্বস্ত করিল। আড়চোখে সে একবার চেলি-পরা বউকে দেখিয়া লইল। বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিলেও সে বিশ্বাস করিল দুঃখ এবং আনন্দের মতো স্বামীকেও সমগ্র সত্তা দিয়া গ্রহণ করিবার শিক্ষা এ মেয়েব হইয়াছে, স্বামীকে ভালোবাসা হাসা-কাঁদার মতোই ইহাব পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক।

ইহার অস্থিমজ্জায় নিঃসন্দেহে স্বামীপ্রেম আছে এবং সে প্রেমে শ্রদ্ধাভক্তির অংশটা অন্য মেয়েব চেয়ে কম নয়।

ক্রমে মেয়েরা বিদায় লইল। বাহিব হইতে কে যেন দরজায় শিকল তুলিয়া দিল।

প্রসন্ন মুহূর্তে পাংশু হইয়া গেল।

যে মেয়েটি শিকল দিয়াছিল বাহিব হইতে সে পরিহাস করিয়া বলিল, কই গো বর, খিল চড়াবার শব্দটা পাচ্ছি না যে ? আমাদের ভদ্রতায় এতখানি বিশ্বাস কোরো না, ঠকে যাবে।

প্রসন্ন এতক্ষণে উঠিযা গিয়া বাবান্দার দিকেব বন্ধ জানালাটা খুলিয়া ফেলিযাছে। তাহাব হৃৎপিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইতেছিল। চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলিল, শিকল দিলেন কেন ? খুলে দিন।

বউ ঘোমটা ফাঁক কবিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া বহিল। এ কী রকম বর ?

বাবান্দার মেয়েটি চলিযা যাইতে যাইতে হাসিয়া বলিয়া গেল, কাল সকালে খুলব।

কাল সকাল ! সমস্ত বাত তাহাকে এই ঘবে বন্দী হইযা থাকিতে হইবে, ইচ্ছা কবিলেও বাহিরে যাইতে পাবিবে না ? কী ভযানক ! প্রসন্ন মিনতি করিয়া বলিল, না না, এখুনি খুলে দিন। আমি একবার বাইবে যাব। দেখুন তো কী করছেন আপনি !

ছোটো একটি কিল দেখাইয়া মেয়েটি হাসিমুখে চলিয়া গেল।

প্রসন্ন খাটে গিয়া বসিল। তাহাব কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম বাহির হইযাছে। ঘবেব বাতাস তাহাব নিশ্বাস লওয়ার পক্ষে অপ্রচুব।

কত জল্পনাকল্পনাই সে কবিয়া রাখিযাছিল ! সে সব কিছুই হইল না। বিপন্ন হইয়া প্রসন্ন এই বলিয়া স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম আলাপ আরম্ভ করিল—

তোমার ভাইটাই কাউকে ডেকে বলো না শিকলটা খুলে দিক।

বউ মৃদুস্বরে বলিল, একটু পরেই খুলে দেবে !

প্রসন্ন তাহা জানে। এ যে কৌতুক, দশ-পনেরো মিনিট পরে মেয়েটি যে পা টিপিয়া টিপিযা আসিয়া শিকল খুলিয়া দিয়া যাইবে ইহাতে তাহার একটুও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে স্বস্তি মেলে না। বন্ধ ঘরে এক মুহূর্ত থাকাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহাব দম আটকাইয়া আসে। যদি এখনই একটা অঘটন ঘটিয়া বসে সে কী কবিয়া ঘরেব বাহিব হইবে ? অপমান হইতে রক্ষা পাইবে কী কবিয়া ?

না, এখুনি খুলে দিতে বলো। এ সব কী ? এ সব আমি ভালোবাসি না।

নিরুপায় বউ চুপ কবিয়া বহিল।

অন্ধ

একটি মেয়ে ছিল সনাতন চক্রবর্তীর—মোহিনী। একটা বাড়িও ছিল সনাতনের—বেশ বড়ো দোতলা বাড়ি আর ছিল কিছু নগদ টাকা—কয়েক হাজার। মেয়ের বিবাহ দিবার অনেক আগেই মনে মনে একটা মতলব করিয়া রাখিয়াছিল সনাতন : ঠিক মতলব নয়, হিসাব—উত্তরাধিকারিণী হিসাবে তার মৃত্যুর পর মেয়েটাই যখন তার বাড়িটা পাইবে, বিবাহের সময় পণ হিসাবে জামাইকে সে দিবে না একটি পয়সাও। মেয়েকে গয়নাগাঁটিও দিবে কম, যত কম দিয়া পাবা যায়। বুড়া বয়সে যখন তার চাকরি থাকিবে না, জমানো টাকা কয়েকটা তখন মদের খরচ বাবদ লাগিবে না তাহার ? কেউ কি তখন একটি পয়সাও তাকে দিবে মদের জন্য ? বুড়া হইতে বা আর বাকিই কত !

মদ সনাতন কিছু কিছু খাইত সন্ধ্যার পর। মাতাল সে হইত না একদিনও। মনের ভুলে অনামনস্ক অবস্থায়, এমনকী মৃতা স্ত্রীর কথা ভাবিতে ভাবিতে পর্যন্ত নয়। তবু মদ সে খাইত রোজ।

কী ভয়ানক মনের জোর যে ছিল সনাতন চক্রবর্তীর ! কী অপরিমিত ছিল যে তার হৃদয়-দৌর্বল্য ! বছর কাটিত একটির পর একটি, জীবনকে কাটিয়া কাটিয়া বছরগুলি যথা-নিয়মে যেমন কাটে, ধারালো এবং ভোঁতা—অনেকদিনের মৃতা স্ত্রীর জন্য হৃদয়টা রোজ নিয়মিতভাবে কেমন একটা বিশ্রী, শোচনীয় এবং অদ্ভুত কাণ্ড করিত বলিয়া মদ সে খাইত রোজ, মেয়ের মনে আঘাত লাগিবে বলিয়া একদিনও সে হইত না মাতাল, আইন মতে মেয়েটার যা প্রাপ্য শুধু তার লোভ দেখাইয়া চেষ্টা করিত জামাই সংগ্রহের আর আত্মতৃপ্তির জন্য প্রাণপণে প্রায়শ্চিত্ত করিত অতীত ও বর্তমানের প্রত্যেকটি পাপের।

পাপ ? কী পাপ করিত সনাতন ? পাপের মধ্যে যে চরম পাপ সেই পাপ—মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া সনাতনের অন্তর্যামী হিসাবে আমি, এই কাহিনির লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এইখানে চুপিচুপি একটা কথা বলিয়া রাখি। সনাতনের অন্তরে একটা অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত অনেকদিন বাসা বাঁধিয়া আছে—এ জগতে সবাই পাপী। অন্য পাপ যে করে না, মানুষের মনে ব্যথা তো অন্তত সে দেয়, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, জানিয়া হোক, না জানিয়া হোক, মানুষের মনে ব্যথা দেওয়াব চেয়ে বড়ো পাপ মানুষকে খুন করাও নয়। মানুষকে যে দুঃখ দেয় না সে দেবতার চেয়ে বড়ো ; কারণ, দুঃখই মানুষের দেবতাকে জন্ম দিয়াছে : সুখটা মানুষের নিজস্ব কীর্তি, দুঃখের দায়িত্ব দেবতার।

পাপপুণ্যের প্রশ্ন এই কৌশলময় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাব মধ্যে তলাইয়া দিলেও একটা প্রশ্ন থাকিয়া যায়। প্রায়শ্চিত্ত? কী প্রায়শ্চিত্ত করিত সনাতন ? পাপের যা একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত আছে—অনুতাপ। প্রায় আধঘণ্টা কী তারও বেশি সময় ব্যাপিয়া নিয়মিতভাবে গম্ভীর আন্তরিক অনুতাপ, ফাঁকি নয়। তপস্যা করার মতো নিবিষ্টচিত্তে অনুতাপ করিত সনাতন, রাত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুম আসা পর্যন্ত আর সকালে ঘুম ভাঙিয়া বিছানা ছাড়িয়া ওঠা পর্যন্ত। যেদিন রাত্রে সহজে ঘুম আসিত না সনাতনের, স্নায়বিক চাঞ্চল্য আনিয়া দিত সাময়িক অনিদ্রা রোগ, সেদিন তার অনুতাপের আর তুলনা থাকিত না, অনুতাপের তীব্রতায় তার মাথা দিয়া ছুটিতে থাকিত আগুন। বুকে তার যে জ্বালা ছিল, এটা সম্ভবত তারই হলকা। হায়, অনুতাপেই যখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত, মেয়ের মনে ব্যথা দিবার অতিরিক্ত পাপটুকু করিয়া কেন সনাতন বেশি মদ গিলিয়া অজ্ঞান হইয়া যাইতে পারিত না ? রাগে, দুঃখে, অভিমানে তার প্রাণের জ্বালায় সনাতন হাঁকিত, মোহিনী ! হ্যাঁ মা, শুনছিস ?

কী বাবা ?

আর একটু তাড়াতাড়ি বড়ো হতে পারিস না তুই ? বিয়ে দিয়ে তোকে বিদেয় করি ? তোর জন্যে আমি যে গেলাম !

মোহিনীর চোখে জল আসিত —আমাকে বিদেয় করার জন্যে...

সনাতন থতোমতো খাইয়া বলিত, কাঁদতে আরম্ভ করার আগেই তোর চোখ দিয়ে জল পড়ে, তোর মতো মেয়ে আমি দেখিনি বাপু !

মেয়ের জামাই সংগ্রহ করা সনাতন যতটুকু সহজ ভাবিয়াছিল আসলে দেখা গিয়াছিল ততখানি সহজ নয় ব্যাপারটা। ছেলেদের বাপেরা বোকা নয়, তারাও হিসাব জানে। কতদিনে সনাতন মরিবে, (লম্বাচওড়া পালোয়ানের মতো চেহারা ছিল সনাতনের এবং জারো আগা নামে একটা মানুষ, না হোক সে বাঙালি, আয়ুর দৈর্ঘ্যেই পৃথিবীকে চমক দিয়াছে) মরার আগে মতিচ্ছন্নতার দরুন আবার বিবাহাদি করার ফলে তার যদি ছেলেমেয়ে হয় বাড়িটা তবে ফসকাইয়া যাইবে, তা ছাড়া যখন খুশি বাড়িটা বিক্রি করিয়া দিলেই বা তাকে রুখিবে কে !

এ সব যুক্তিতর্কের জবাবে সনাতন বলিত, আরে মশায়, সংসার করার ইচ্ছে থাকলে অ্যাদ্দিন চুপ করে বসে থাকতাম? ষাট বছরের বেশি আমি কিছুতে বাঁচব না দেখবেন, কুষ্ঠিতে লিখেছে।

কেউ কেউ বলিত, বেশ, ছেলের নামে দলিল লিখে দিন, যে বিয়ের পণ হিসাবে. .

সনাতন বলিত, না মশায়, আমাকে যে বিশ্বাস করে না তার ছেলের হাতে আমি মেয়ে দিই না। আচ্ছা আসি, নমস্কার।

শেষে সামান্য কিছু পণ দিয়া মোহিনীর জন্য যে জামাই পাওয়া গিয়াছিল তার নাম গিরিজাকুমার—আইন পড়িতেছিল। গিরিজা সংসারের আইন-কানুনগুলি ভুলিয়া জীবনে কিছু নিষিদ্ধ কাব্যরস আমদানি করার চেষ্টা আরম্ভ করায় তার বাবা একটু তাড়াহুড়া করিয়াই দিয়া ফেলিয়াছিলেন ছেলের বিবাহ, পরে করিয়াছিলেন আপশোশ। দেনা-পাওনা এবং বউ কোনোটাই তার পছন্দ হয় নাই, বাড়ির অন্যান্য সকলেরও নয়। শ্বশুর, শাশুড়ি, দেবর, ননদ সবই ছিল মোহিনীর, তাই বিবাহের পর সে বড়ো যন্ত্রণা পাইয়াছিল কয়েক বছর—অনেক ধমক, অনেক খোঁচা, অনেক দায়িত্ব।

শুনিয়া সনাতন বলিল, তা হোক, পরে সুখ পাবে। প্রথমে যে বউ দুঃখ পায় পরে তার সুখ নির্ঘাত। আমার বউ সাত বছর রাজরানির মতো সুখ পেয়েছিল বলেই না—

স্ত্রীকে সাত বছর রাজরানির মতো সুখও জোগাইয়াছিল সনাতন, তারপর ভিখারিনির মতো দুঃখও দিয়াছিল সে। এই বাড়ি করার ঝোঁকে এমনই হয়। প্রথমে রাজরানির মতো সুখ পাইয়াছিল বলিয়াই না তার রাজরানিত্ব খসাইয়া একটা ইটের বাড়ি করার ঝোঁক ভগবান সনাতনের মধ্যে জাগাইয়া দিয়াছিলেন। স্ত্রীর বদলে বাড়ি। সাত বছর যাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মনে হইত বুকের পাঁজর ফাঁক করিয়া একেবারে হৃদয়ে চালান করিয়া দিতে না পারিলে সাধ মিটিবে না, সেই স্ত্রীর বদলে একটা চুন-সুরকি ঢাকা সাজানো ইটের স্তূপ ! সুখের পর দুঃখ আর দুঃখের পর সুখ শুধু এই নিয়মটা বজায় রাখার জন্য ছাড়া কেন ভগবান তার মনে উদ্ভট বাড়ি-প্রেম আনিয়া দিবেন, রামচন্দ্রের প্রজানুরাগের মতো ?

শ্বশুর স্বর্গে যাওয়ার পর স্বামীগৃহে মোহিনীর কিছু প্রতিপত্তি অর্জন করিতে করিতে সনাতনের বয়স হইয়া গিয়াছিল চুয়ান্ন। ওকালতিতে গিরিজার ভালো পসার হয় নাই, বাপ মারা যাওয়ায় চাকরি করিয়া তিনি যা আনিতেন তাও বন্ধ হইয়াছিল। গিরিজা নিজে এবং তার তাগিদে মোহিনী সনাতনকে ক্রমাগত তোষামোদ করিতেছিল যে এবার তারা এ বাড়িতে আসিয়া থাকুক না ? এত বড়ো বাড়িতে একা আছে সে ; আহা না জানি কত তাঁর অসুবিধা হয় ! সেবার দরকার তো এই বয়সেই মানুষের বেশি। সনাতন রাজি হইত না ; বলিত, না বাপু, না—যেদিন মরব সেদিন আসিস। আমি জন্মের মতো বেরিয়ে যাব, তোরা জন্মের মতো ভেতরে ঢুকবি—সে পর্যন্ত শান্তিতে একটু থাকতে দে আমায়।

একাকিত্বের বোঝা বহিয়া শান্তিতে থাকার অর্থ সনাতন হয়তো বুঝিত নির্বিবাদে মাতাল হইতে পারা তাও ডাক্তারের বারণ না মানিয়া। চোখের ডাক্তার ; দৃষ্টি সনাতনের ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। ডাক্তার স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছিলেন, মদ না ছাড়িলে চোখ দুটি তাকে ছাড়িতে হইবে। তবু, অভদ্র রকমের মাতাল হওয়ার মতো মদ না খাইলে অন্ধ হইতে হয়তো কিছু সময় লাগিত সনাতনের। অন্ধ হওয়ার আগেই মরণের অন্ধকারটার নাগাল পাওয়াও তার পক্ষে কিছুমাত্র আশ্চর্য ছিল না। কিন্তু এ সব কিছুই সে মানিত না, নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে মাতাল হইত, মাতাল হইতে হইতে হইয়া যাইত একেবারে অচৈতন্য।

একটা আশ্চর্য যুক্তি ছিল সনাতনের, আত্মসমর্থনের একটা অখণ্ডনীয় দার্শনিকতা, কার জন্য মাতাল হইবে না, কেন হইবে না ? এই যুক্তিতে সে যদি মাতাল হইতে পারে ; কার জন্য অন্ধ হইবে না, কেন হইবে না ? এই যুক্তিতে সে অন্ধ হইতে পারিবে না কেন ?

নিজের জন্য ? এ জগতে মানুষের যে সবচেয়ে বেশি আপন, সেই নিজেটার জন্য ? অন্ধ হওয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও মদ যে সে গিলিত সে তো নিজের জন্যই ? নিজের জন্য ছাড়া সব রকমে নিজেকে কেউ ধ্বংস করে ?

ছাপ্পান্ন বছর বয়সে, জমানো টাকাগুলি প্রায় শেষ করিয়া সে যখন সবে ধার করিয়া বোতল-রসায়ন পান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সনাতন হইয়া গিয়াছিল অন্ধ ! ছাপ্পান্ন বছর আগে চোখ মেলিয়াই সনাতন দেখিতে পাইয়াছিল আলো,—ছোটো একটা ঘরের আধ ভেজানো জানালার ফাঁক দিয়া ঢোকা দুপুরবেলার রাগি সূর্যের মৃদু প্রীতিময়, প্রতিফলিত আলো, ছায়ার রসে ভেজা—এতদিনে যবনিকা সেই দেখার !

পুরানো ইতিহাস এ সব, ভূমিকা। আগাগোড়া ক্রিয়াপদগুলি অবশ্য ব্যবহার করিয়াছি অতীতকালের, তবু বলিয়া দিলাম। বলিয়া না দিলে অনেকেই ইতিহাস ও কাহিনির পার্থক্য বোঝে না। অথচ মুশকিল এই যে, সব কাহিনিই ঐতিহাসিক, অতীতকালের নিছক ধারাবাহিকতা।

ছাপ্পান্ন বছর বয়সে সনাতন করিল কী, জামাইকে পাঠাইয়া দিল একখানা চিঠি। চিঠিখানা সে লেখাইল তার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়কে দিয়া। আত্মীয় বেচারি সনাতনের চিঠি লিখিবার জন্য অবশ্য আসে নাই, সনাতনকে সমবেদনা জানানোর জন্যও নয়। গোটা পাঁচেক টাকা যদি আদায় হয় এই ক্ষীণ আশা বুকে করিয়া তাগিদ দিতে আসিয়াছিল একশো টাকার ঋণ পরিশোধের।

চিঠি পাওয়ার তিনদিনের মধ্যে ভাড়াটে বাড়ি ত্যাগ করিয়া গিরিজাকুমার সপরিবারে আসিয়া এ বাড়িতে আস্তানা গাড়িল। মোহিনীর বিবাহের সময় যত বড়ো ছিল তার চেয়ে অনেক ছোটো হইয়া গিয়াছে গিরিজার পরিবারটি। স্বর্গে গিয়াছে গিরিজার বাবা, কাকা, পিসি এবং কাকার একমাত্র ছেলেটি শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, একরকম জন্মের মতোই, গিরিজার নিজের তিনটি বোন, গিরিজার মেজোভাইটি চাকরি করিতে গিয়াছে পাটনায়, আধ-পাগলা ভাইটি হইয়া গিয়াছে নিরুদ্দেশ এবং দূরসম্পর্কের একটি যে বিধবা আত্মীয়া আশ্রিতা হিসাবে ছিল তাকে দেওয়া হইয়াছে তাড়াইয়া (দূর দূর করিয়া নয়, কৌশলে)। অত দূরসম্পর্কিতাদের আশ্রয় দিলে গিরিজার চলিবে কেন ? কাকার ছোটো মেয়েটাকে যে থাকিতে দিয়াছে তাই ঢের।

এতকাল পরে বড়ো বউটার (হতচ্ছাড়ি) বাপটার (ঠক, জুয়াচোর) সুমতি হওয়ায় গিরিজার মা শীতলা খুশি হইয়াছিল। বাতে পঙ্গু শীতলা। এখন একরকম শয্যাশায়ী। গাড়ি হইতে নামাইয়া সকলে চ্যাংদোলা করিয়া তাকে নীচের তলায় কোনার দিকের একটা ঘরে শোয়াইয়া দেওয়ার পর খানিকক্ষণ সে শুধু হাঁপাইল, তারপর আরও খানিকক্ষণ ধরিয়া করিল পথের কাঁটা দূর। গিরিজা মোহিনী প্রভৃতি সকলে উপরে নীচে ঘরদুয়ার প্রভৃতি ঠিকঠাক করিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিতে

ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল—তাড়াতাড়ি জাঁকিয়া আস্তানা গাড়িয়া বসা ভালো, কে জানে কখন আবার পাগলা সনাতনের মতিচ্ছন্ন হয়। শীতলার কাছে কেউ ছিল না, কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর ভারী মোটঘাট নাড়াচাড়া করার পরিশ্রমে ঘামে-ভেজা লাল মুখ যে মেয়েটা ঘরে আসিল তার নাম আনু। গিরিজার কাকার সে ছোটো মেয়ে।

শীতলা বলিল, ডেকে মরছি কখন থেকে, কানে যায় না বুঝি হারামজাদি ? ডাক তো একবার তোর বউদির বাপটাকে—কী রকম মানুষ বাবা ! এতকাল পরে মেয়ে-জামাই এল, বেয়ান এল বাড়িতে, না একবার নামল নীচে, না জিজ্ঞেস করল একটা কথা ! এমনি বাপ না হলে অমন মেয়ে হয়। বড়ো বউটার মতো, অমন লক্ষ্মীছাড়া পেট রোগা—

সে অনেক কথা, শোনাও কঠিন, লেখাও অভদ্রতা। আনু ভয়ে ভয়ে বলিল, বউদির বাবা যে অন্ধ জেঠিমা, নীচে নামবেন কী করে ?

সে ভাবনা তোর কেন লো ছুঁড়ি ? ডাকতে বললাম, ডেকে আনগে তুই, কানের কাছে বকবক করে জ্বালাসনি আমায়। এমনি বলে মরছি আমি নিজের—

দরজার বাহিরে চমক দেওয়া গম্ভীর গলা-খাঁকারির আওয়াজে শীতলা থামিয়া গেল, আনু উঠিল চমকাইয়া।

এদিক ওদিক লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে ঘরে ঢুকিল সনাতন। মেয়েকে তার অনেক যন্ত্রণা দিয়াছে শীতলা, তবু বাড়িতে যখন আসিয়াছে মানুষটা একটু অভ্যর্থনা জানানো কি উচিত নয় ? ছোটো অন্ধকার ঘর, জানালাগুলি প্রায় সবই বন্ধ। তবে আলো-অন্ধকার সনাতনের কাছে সমান হইয়া গিয়াছে। আগাইতে আগাইতে সে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছেন বেয়ান ?

এ বড়ো প্রিয় প্রশ্ন শীতলার। সবিস্তারে এ প্রশ্নের জবাব দিতে সে বড়ো ভালোবাসে, কিন্তু কৌতূহলও শীতলার বড়ো কম জোরালো নয়।

নিজে নিজে নীচে নামলেন নাকি বেয়াই, অ্যাঁ ? কী অবাক কাণ্ড মা ! একটু একটু বুঝি দেখতে পান চোখে তা হলে, ঝাপসা ঝাপসা মতো ?

সনাতন মাথা নাড়িল, একটুও দেখতে পাই না বেয়ান। একদম অন্ধ হয়ে গেছি।

মেঝেতেই বিছানা হইয়াছিল শীতলার, ও বেলা না হয় কাল চৌকি আসিবে। সনাতন দাঁড়াইয়াছিল একেবারে বিছানার পাশেই, কথা বলিয়া এক পা আগাতেই (একেবারে যে অন্ধ হইয়া গিয়াছে তার পা বাড়ানো একটু সৃষ্টিছাড়া রকমের বলিয়াই বোধ হয়) পা-টা গিয়া পড়িল শীতলার বাত-ব্যথিত হাঁটুর উপরে। সনাতন ভর দিয়া দাঁড়াইলে হাঁটুটা হয়তো শীতলার ভাঙিয়াই যাইত—দু মন তেত্রিশ সের ওজন সনাতনের।

শীতলার আর্তনাদে সে পিছাইয়া গেল।

লাগল বেয়ান ? অ্যাঁ লাগল ?

শীতলার সরু গলার চেঁচানি কলের বাঁশির মতো দিগদিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। গিরিজা আসিল, মোহিনী আসিল, বাড়ির মাঝবয়সি দাসীটি আসিল। সেবা, সমবেদনা, কৈফিয়ত, তোষামোদ এ সব অনেক দরকার হইল শীতলাকে শীতল করিতে। সময়ও লাগিল কম নয়। শীতল হইয়াও শীতলা বলিল, ইচ্ছে করে নয় তো কী ? দিব্যি নেমে এল ওপর থেকে, একটু হোঁচট পর্যন্ত লাগল না একবার, আর আমার গায়ের ওপর উঠে দাঁড়াবার বেলা—

সনাতন অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, শোনেন বেয়ান, শোনেন। ব্যাপার কি জানেন ? অনেককাল এ-বাড়িতে চলাফেরা করছি কি না, দেখতে না পেলেও চলে ফিরে বেড়াতে পারি ; আমার অজান্তে কোথাও কিছু পড়ে থাকলে কিন্তু মাঝে মাঝে হোঁচট খাই, মাড়িয়ে দি। এবার জানতে পেলাম আপনি কোনখানে শুয়ে আছেন, দেখবেন আর কখনও আপনার গায়ে গিয়ে পড়ব না। ইস্ ! হাঁটুর বদলে

মুখটা যদি মাড়িয়ে দিতাম আপনার ! কী আপশোশের কথাই তা হলে হত ! মোহিনীর কাছে শুনেছি তো আপনার কথা সব। এমন ভালোমানুষ আপনার মতো আর সংসারে আছে ?

শীতলা খুশি হইয়া বলিল, যাকগে ও কথা, দেখতে পেলে কি আর ও রকম করতেন ? কেমন আছি জিজ্ঞেস করছিলেন, আমার আবার থাকাথাকি, বাতে একেবারে সেরেছে আমাকে, না পারি উঠতে না পারি—

সনাতন বলিল, আর উঠতে পাবা না পারা। চোখ দুটো গিয়ে থেকে আমার ওঠা না ওঠা সব সমান হয়ে গিয়েছে। আন্দাজে আন্দাজে মানুষ আর কাঁহাতক—

শীতলা বলিল, আর বছরও এতটা বাড়েনি, এ বছর বর্ষা নামতে—

একজন বাতে পঙ্গু, একজন অন্ধ। নিজের কথা বলার আগ্রহ বনাম পাগলামি দুজনেরই থাকা স্বাভাবিক। তবে এ রোগটা সনাতনের দেখা দিয়াছে আজ। এক নিশ্বাসে যতগুলি কথা বলা যায় তাও শীতলা বলিতে পাইতেছিল না, নিশ্বাস শেষ হইয়া আসিলে একটা রোমাঞ্চকর গভীব শ্বাস টানার সুযোগ পাওয়া তো দূরেব কথা।

সনাতন বলিল, তবে একটা দয়া ভগবান করেছেন, চোখ দুটো গিয়েছে আমার কানে। পিঁপড়ে চললে শুনতে পাই। ঘবের জিনিসপত্র অ্যাদ্দিন নইলে কি কিছু থাকত ? সব চুরি হয়ে যেত না ? কানের জন্য সব বজায় আছে, চুরির মতলবে কেউ ঘরে আসুক অমনি বলে দেব কে এল, কেন এল।

মোহিনী ও গিরিজা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। কথা শেষ করিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া সনাতন একটু হাসিল। ভদ্রতার নিবীহ হাসি কিন্তু মুখভরা দাড়ি-গোঁফেব জঙ্গল থাকায় হাসিটা দেখাইল বিশ্রী—ভ্যাংচানোর মতো। ঘাড় কাত করিয়া শুনিবার মতো ভঙ্গি কবিয়া বলিল, নিশ্বাসেব শব্দে মানুষ চিনি বেয়ান। ঘরে একটি ছোটো মেয়ে আছে, নয় ? কী নাম গো তোমাব খুকি।

খুকি সত্রাসে বলিল, আনু।

শীতলা বলিল, আনু ? কেউ জিগ্যেস করলে অণিমা বলতে বলেছি হাজারবার—আনু ? এ লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটাকে নিয়ে, জানেন বেয়াই—

সনাতন চাপা গলায় বলিল, চুপ।

লোকটার ভঙ্গি দেখিয়া শীতলা থ বনিয়া গেল। অদ্ভুত হাস্যকর কান পাতিয়া শ্রবণাতীত কী একটা শব্দ সে যেন শুনিবেই, ভগবানের চোখের দৃষ্টি কানে দেওয়ার দয়াকে ব্যর্থ হইতে দিবে না। মাথা কাত করিয়া, মুখের চামড়া কুঁচকাইয়া, অদ্ভুত অস্বাভাবিক মনোযোগের সঙ্গে কী সেই দৃশ্যমান শোনার প্রক্রিয়া!

একটু ভয়ে ভয়েই শীতলা বলিল, কী হল বেয়াই ?

সনাতন ফিসফিস করিয়া বলিল, একটা বেড়াল এসেছে না ঘরে, কালো একটা বেড়াল? রোজ ব্যাটা মাছ-দুধ খেয়ে যায়। একেবারে পাত থেকে তুলে নিয়ে পালায়, কানা মানুষ কি না গ্রাহ্যও করে না। আচ্ছা করে ব্যাটাকে একদিন মারতে পারলে—

অন্ধের হাতে যে লাঠি থাকে তার নাম অন্ধের নড়ি। হঠাৎ সেটা তুলিয়া অনাগত অদৃশ্য ও কাল্পনিক কালো বিড়ালটিকে সনাতন এমন মারিয়া বসিল যে সাদা-কালো চুলে ঢাকা শীতলার মাথাটা প্রায় ফাটিয়া গেল ; অন্তত তাই মনে হইল শীতলার ঘর ফাটানো আর্তনাদে। আগে শীতলার ভয়ানক লাঞ্ছনায় মাথা ফাটিত না বলিয়া মোহিনী কাঁদিত শুধু মৃদুস্বরে, মাথা না ফাটিয়া থাকিলে এমন চিৎকার শীতলা কোন যুক্তিতে করিবে ?

তবে যুক্তি মানার মতো অভিজাত মহিলা শীতলা নয়। তাই শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়াছিল, মাথাটা তার ফাটে নাই, শুধু চামড়া ফাটিয়া গিয়াছিল কপালের, অনেক রক্ত পড়িয়াছিল আর বেজায়

ফুলিয়াছিল। বিড়ালের বদলে মাননীয়া বৈবাহিকার মাথায় লাঠি মারিয়া বসিয়াছে শুনিয়া সনাতন যে হা-হুতাশ আরম্ভ করিয়াছিল সেটা আন্তরিক কি না ঠিক বলা না গেলেও অন্যান্য বিষয়ে তার আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনো কারণ ছিল না কারও।

শীতলার কপালের ফুলা কমিয়া ব্যথাও যখন প্রায় মিলাইয়া আসিয়াছে তখনও সনাতনের অনুশোচনা কমিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, সময় নাই, অসময় নাই, শীতলাব ঘরে আসিয়া হাজির হয়, মরণাপন্ন রোগিণীর সঙ্গে কথা বলার মতো গলাব সুর করিয়া জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছেন বেয়ান ?

তিন-চারদিন অভিশাপ দিয়াও সনাতনকে কাবু করিতে না পারিয়া ক্ষুন্ন মনে শীতলা ক্ষান্ত হইয়াছিল। তাছাড়া, যতদিন না মবিবে এ বাড়িটাও সনাতনেরই। শীতলা তাই মনেব সাধে অন্ধ মানুষটাকে মুখ ভ্যাংচাইয়া বলে, বেশ আছি, খাসা আছি, দিব্বি আছি।

সনাতন বলে, বেশ, বেশ বিড়েল মারতে গিয়ে আপনাকে মেরে অবধি জানেন বেয়ান, মনে একদণ্ড স্বস্তি নেই।

আনু বলে, ও বকম মুখ করছ কেন জেঠিমা, কষ্ট হচ্ছে ?

সনাতন বলে, ফুলোটা বুঝি কমেনি এখনও ? দেখি একবার—

অন্ধের দেখা মানে হাতড়ানো। শীতলার চোখে তাতে আঙুলের খোঁচা লাগিয়া যায়। বেশ জোরেই লাগে। আবার চেঁচায় শীতলা, দেখিতে দেখিতে চোখটা হয়ে যায় টকটকে লাল, গিরিজা ও মোহিনী ছুটিয়া আসে। গিবিজা ভর্ৎসনাব সুবে বলে, কী যে কবেন আপনি বুঝতে পারি না কিছু।

সনাতন প্রচণ্ড দুঃখেব সঙ্গে বলে, চোখ দুটো গিয়ে থেকে আমার সর্বনাশ হয়েছে বাবা, চোখে না দেখতে পেলে মানুষ সংসারে বাঁচতে পারে ? কেন যে এমন শাস্তি আমার অদেষ্টে জুটল। সময় সময় আমাব কী সাধ যায় জান গিবিজা ? সাধ যায় লোকালয় ছেড়ে বনে-জঙ্গলে কোথাও চলে যাই, এমন কবে বেঁচে থেকে কী হবে !

সনাতনেব কথা শুনলে চোখে জল আসে। আহা, তাইতো, সে যে অন্ধ ! শীতলার খোঁচা লাগা চোখ দিয়া দরদর করিয়া যে জল পড়ে, মনে হয় সে যেন সমবেদনাব অশ্রুধাবা। তার হাঁটু মাড়ানো, কপালে লাঠি মাবা আর চোখে খোঁচা দেওযাব অপরাধগুলি সনাতনের যেন কীসে এবং কীভাবে ধুইয়া-মুছিয়া সাফ হইযা যায়, আড়াল হইযা যায় সনাতনের পাহাড়-সমান দুঃখের পিছনে।

মোহিনী গোপনে স্বামীকে বলে, আহা, একে তো অন্ধ হয়েছেন, তারপর আবার এ সব করে বসছেন। সত্যি, বাবার যে কী অদেষ্ট ?

সকলে চলিয়া গেলে শীতলার চোখে জলপটি দিতে দিতে আনু বলে, তালুই মশায় ডাকাত জেঠিমা। দেখলে আমার এমন ভয় করে।

শীতলা বলে, এক কাজ করতে পারিস আনু ? সিঁড়ি দিয়ে যখন নামতে যাবে ধাক্কা দিযে ফেলে দিতে পারিস একদিন ? নয় তো, সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকবে মাথায় একটা থান ইট মেরে পালিয়ে আসতে পারিস ? ও তো আর দেখতে পাবে না কে মারল ! আমি বলব, তুই সারাক্ষণ আমার কাছে ছিলি, এক মিনিটের জন্যেও যাসনি কোথাও। পারবি ?

আমার ভয় করবে জেঠিমা।

মর তুই ভীবু হাবা মেয়ে।

ডাকাত তালুই মহাশয়কে দেখিয়া আনুর অকারণ ভয় সকারণ কৃতজ্ঞতায় তলাইয়া যায়। সনাতনের মধ্যে যত কিছু ভীতিকর, এক হিসাবে সে সব হইয়া দাঁড়ায় তার বর্ম। সকলের বিশেষ করিয়া মোহিনীর আক্রমণগুলি যাতে ঠেকিয়া থামিয়া যায়, আনুর নাগাল পায় না।

প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া থাকার বৈজ্ঞানিক শাসনে মোহিনী শাশুড়ি-ননদের কাছে একদিন যা পাইয়াছিল, এখন আনুকে তা ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করে। কথা বলে কড়া সুরে, শাসন করে চড়া মেজাজে, বিচার-বিবেচনার ধার ধারে না। বাধা দেয় সনাতন।

বলে, আহা, কেন মারছিস মোহিনী ?

বলে, আঃ গাল দিচ্ছিস কী জন্যে শুনি ?

বলে, ধুত্তোর ! অত বড়ো মেয়েকে মারতে যাস, তোর লজ্জা নেই মোহিনী ?

সনাতনের বলাতেই আনু বাঁচিয়া যায় আর কৃতজ্ঞ হয় সনাতনের কাছে, আর বেশি বেশি সেবা করে সনাতনের। অনেক সময় শুধু সনাতনের নাম দিয়াই মিথ্যা কৈফিয়তের আড়াল রচিয়া নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টাও আনু করে।

মোহিনী বলে, ধিঙ্গি মেয়ে, তুই থাকিস থাকিস যাস কোথা হতচ্ছাড়ি। ভাত যে এদিকে পোড়া লাগল—

আনু বলে, তালুই মশায়ের ঘাড়ে ব্যথা হয়েছে, আমায় বললেন, একটু টিপে দে তো মা আনু, তাইতো আমি—

ফের মিছে বলছিস ! বাবার ঘরে ছিলি তুই আর ডেকে ডেকে আমার গলা চিরে গেল শুনতে পেলি না ? চল তো বাবার কাছে জিজ্ঞেস করি। মিছে কথা হলে পিঠের চামড়া তোর—

আনু তা জানে। ভাত পোড়া লাগা আর মিছে কথার সমন্বয়ে পিঠের চামড়া কারও আস্ত থাকা সম্ভব নয়। তাই সনাতনের ঘরে ঢুকিয়া মোহিনী মুখ খুলিবার আগেই সে গড়গড় করিয়া বলিয়া যায়, আচ্ছা তালুই মশায়, আপনার ঘাড়ে ব্যথা হয়নি ? আমি এতক্ষণ টিপে দিইনি আপনার ঘাড় ? বউদি ডাকছিল শুনতে পেয়েছিলাম আমরা ? বউদি বলছে মেরে আমার—সনাতন হাঁকে, মোহিনী ! মোহিনী !

আনু হাঁফ ছাড়িয়া বলে, এই যে বউদি এখানে তালুই মশায়।

সনাতন বলে, মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলিস না মোহিনী, জ্যান্তে মরে থাকবি শেষকালে। আমার এ দুর্দশা কি জন্যে ? তোর মাকে—দে তো ঘাড়টা একটু টিপে দে তো আমার।

সনাতন চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, মোহিনী আস্তে আস্তে তার ঘাড় টিপিয়া দেয়, আনুর দিকে মাঝে মাঝে তাকায় মোহিনী। কত কথা, কত গালমন্দই যে মানুষের চোখ বলিতে পারে।

আনুর ভয় হয়, ভাবনা হয়। একটু ভাবিয়া সে বলে, আমি টিপে দিচ্ছি বউদি, তোমার ঘাড় ব্যথা করবে।

মোহিনী কথা বলে না।

আনু আবার বলে; খোকা যদি কেঁদে ওঠে বউদি ? তুমি বরং নীচে যাও।

মোহিনী বলে, চুপ কর তুই। ফফরদালালিতে কাজ নেই।

এবার সনাতন বলে, হাতে তুই বালা পরেছিস, না মোহিনী ? ঘাড়ে তাই লাগছে। যা, তুই নীচেই যা।

বালায় ঘাড়ে লাগে না মানুষের, আঁটো বালা খুলিতে গেলে হাত ছুলিয়া যায়। খুব কি লাগিয়াছিল সনাতনের স্ত্রীর বালা কাড়িয়া নেওয়ার সময় ? লাগিয়া থাকিলেও সে কি সনাতনের দোষ ? এমন স্বামী জগতে কে আছে যে স্ত্রীর কোমল হাত দুটি অক্ষত রাখিয়া আঁটো বালা গায়ের জোরে কাড়িয়া নিতে পারে ! এমন স্ত্রীও কি এ জগতে আছে মারধর করিয়া স্বামী গয়না কাড়িয়া নিলে যে পলাইয়া যায় আর মরিয়া যায় ? এমন মেয়েও কি কারও থাকে যে মেয়েমানুষকে মারে আর বাপের ঘাড়ে বালা দিয়া আঘাত করে ? সবই আশ্চর্য এ জগতে, সবই অদ্ভুত ! খাপছাড়া

তলোয়ারের মতো একদিকে ধার একদিক ভোঁতা। ভাবিয়া দ্যাখো কথাটা। তাই যদি না হয়, বালা পরার জন্য মেয়েকে কেউ ঘেন্না করে ? শুধু বালা পরার জন্য ?

সনাতন বলে, আনু, ওমা আনু !

আনু বলে, কী বলছেন, তালুই মশায় ?

হাতে তুমি কী পরেছ, আনু ? বালা নয় তো ?

না, তালুই মশায় কাচের চুড়ি।

বেঁচে থাকো মা, লক্ষ্মী মেয়ে।

গিরিজা বড়ো কৃপণ, টাকার জন্য মোহিনীর বড়ো দরদ।

ইতিমধ্যে মোটে দুবার সনাতনকে কিছু টাকা দিয়াই ওরা আর উপুড়হস্ত করিতে চাহিতেছে না। একদিন মেয়ে-জামাইকে কাছে ডাকিয়া সনাতন বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, এ রকম অন্যায় করা কি তাদের উচিত ? এ বাড়িতে আসিয়া থাকিতে দিয়া ওদের কত বছরের বাড়ি ভাড়া সে বাঁচাইয়া দিয়াছে সে খেয়াল কি ওদের আছে ? মাঝে মাঝে তাকে পাঁচ-দশটা টাকা দিতে ওদের প্রাণে সহিতেছে না।

গিরিজার মধ্যে এ ধরনের চালাকি বেশ চোখা হইয়া উঠিয়াছে। সে বলে টাকা পেলেই আপনি যে ও সব ছাইপাঁশ খান। আপনার যে রকম শরীরের অবস্থা তাতে—

সনাতন বলে, টাকা দেবার নামেই আমার শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে তোমার দুর্ভাবনা গজিয়ে উঠল আগে তো ছিল না বাপু ? তবু হিসেব তোমার ভুল হয়েছে বাবা, অতি চালাক কি না। ছাইপাঁশ খেলে দু-এক বছরের মধ্যেই আমি পটল তুলব, না খেলে বিশ বছর বাঁচব আরও—এটা খেয়াল করেছ ?

গিরিজার চেয়েও মোহিনী চালাক। সে কাঁদো কাঁদো হইয়া বলে, অমন করে বললে তোমাকে কি করে টাকা দেব বাবা ? তুমি কি ভাব আমরা চাই তুমি তাড়াতাড়ি মরে যাও ? তোমার সেবাযত্ন করব বলেই না আমরা—

সনাতন হাত বাড়াইয়া মেয়ের চোখের তলাটা পরীক্ষা করিয়া বলে, তুই যখন কাঁদিস—তোর চোখ দিয়ে বুঝি জল পড়ে না মোহিনী ?

শুনিয়া মোহিনীর আটকাইয়া আসে দম, গিরিজার মুখটা হইয়া যায় হাঁ। আর তাহারা কথা বলিতে পারে না।

সনাতন ধীরে ধীরে বলে, তা ছাড়া, কি জান গিরিজা, ছাইপাঁশ না খেতে পেলে আমি লোকজন সইতে পারি না, আমার একা থাকতে ইচ্ছা হয় খালি বাড়িতে—স্পষ্ট বলে দিলাম বাপু, বুঝেসুঝে কাজ করো।

তারপর দশটা টাকা আনিয়া গিরিজা শ্বশুরের হাতে দেয়, ক্ষুব্ধস্বরে বলে, আপনাকে দরকার মতো টাকা দিতে কি আমার ইচ্ছে করে না বাবা ? কী করব বলুন, একেবারে উপার্জনপত্র নেই। আদালতে মোকদ্দমা যা কমে গেছে এ বছর, লোকে খেতে পায় না—

সনাতন বলে, লোকে খেতে না পেলেও আদালতে মোকদ্দমা কমে না বাপু। তুমি মামলা পাও না তাই বল, আদালতের দোষ দিয়ো না।

এক মুহূর্ত থামে সনাতন। নিজের বুকে একবার হাত বুলায়। চেনা মানুষের কলঙ্কের কাহিনি বলার মতো গলা নামাইয়া ফিসফিস করিয়া বলে, নিজের দোষ দেখতে শেখো, গিরিজা, নিজের দোষ স্বীকার করতে শেখো। শিখে অনুতাপ করো। অনুতাপ আরম্ভ করলেই দেখবে জীবন আর নিশার স্বপন নয়, বড়ো মজাদার। যে অনুতাপের জ্বালায় জ্বলে না তার জীবনটাই বৃথা।

গিরিজা বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কত লোকে দোষ করে, পাপ করে, কিন্তু দোষ করা পাপ করাই সার ! অনুতাপ করার জন্যেই যে ও সব করা এটুকু কাণ্ডজ্ঞানও নেই।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আনু আসিয়া বাধা দেয়।

দশটায় খাবেন বলেছিলেন দশটা বেজে গেছে দাদা।

গিরিজা মুখ খিচাইয়া বলে, বেজে গেছে দাদা। বাজবার আগে বলতে পারনি ?

সনাতন বলে, নিজের দোষে আবার পরকে বকলে ? আমি অন্ধ মানুষ আমি নিজের দোষ দেখতে পাই, তুমি কেন পাও না বাপু ? দোষ করলেও মেয়েমানুষকে বকতে নেই গিবিজা, গলায় ভাত আটকে যায়।

গিরিজার তা আটকায় না, নাকে-মুখে ভাত গুঁজিয়া সে আদালতে চলিয়া যায়। সনাতন বসিয়া বসিয়া ভাবে। বেলার আন্দাজ সনাতনের নিখুঁত, বারোটায সময় সে হাঁকে—আনু, ওমা আনু ?

কী বলছেন, তালুই মশায় ?

এবার চান করব, আনু।

চলুন।

স্নানের চেয়ে আহারের হাঙ্গামা সনাতনেব বেশি। ভাতের থালা দোতলায় বাহিয়া নিয়া যাইতে হয়, হাত ধরিয়া একে একে জলের গেলাস, ডালের বাটি, মাছের বাটি, থালায ভাত তবকাবি ছোঁয়াইয়া, ছোঁয়াইয়া চিনাইয়া দিতে হয়, কাছে বসিয়া মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করিতে হয় খাওয়া। যথাসময়ে লেবুর রস নিংড়াইয়া নিতে হয়, কাপড়ে ভাত পড়িলে ঝাড়িতে হয়, মাছের বাটিব জন্য হাতড়াইতে আরম্ভ করিলে কব্জি ধবিয়া আবার সেটাকে স্পর্শ কবাইয়া দিতে হয়।

আনু, ওমা আনু।

কী বলছেন তালুই মশায় ?

কোন শালি আজ ডাল রেঁধেছে ?

আমি রেঁধেছি তালুই মশায়।

তুমি রেঁধেছ ? ছি ছি আগে বলতে হয়। কী বলে ফেললাম দ্যাখো দিকি ! বাম বাম, তুমি যে আমার মেয়ে ! কিছু মনে কোরো না।

আনু প্রথমে শুধু মাথা নাড়ে, তারপর বলে, না, জেনে তো বলেননি।

সনাতনও মাথা নাড়ে, না জেনে বললেও দোষ হয় আনু। বললেই দোষ হয়। আমাব সন্দেশ কই ?

সন্দেশ তো নেই আজ।

দুধের বদলে সনাতন দুটি করিয়া সন্দেশ খায়, এ বেলা দুটি, ও বেলা দুটি। দুধে তার বমি আসে।

নেই ! সন্দেশ নেই ! কোন বজ্জাত আমার সন্দেশ খেল ? মোহিনী ! এই মোহিনী ! ওলো কালি-মোহিনী !

বউদির মাথা ধরেছে, তালুই মশায় শুয়েছে।

শুয়েছে ? জন্মের মতো শুক !

জন্মের মতো যে শুয়েছে সেও সনাতনের হাঁক শুনিয়া শুইয়া থাকিতে পারে কিনা সন্দেহ। সনাতন আর একবার হাঁক আরম্ভ করিবার আগেই আসে মোহিনী। কী ব্যাপার ? সন্দেশ নাই ? কে বলিল সন্দেশ নাই ! মোড়ের দোকানি রোজ সন্দেশ পাঠাইয়া দেয়, রোজ মোহিনী যত্ন করিয়া সন্দেশ তুলিয়া রাখে, বলিলেই হইল সন্দেশ নাই ? আনুর মতো মিথ্যাবাদী বজ্জাত—

সন্দেশ আনিয়া মোহিনী সনাতনের পাতে দেয়।

আনু বলে, কোথায় ছিল বউদি ?

রোজ যেখানে থাকে !

আমি তো খুঁজে পাইনি।

তা পাবি কেন ? জানো বাবা, ছুঁড়ি সন্দেশ নেই বলছিল কী জন্যে ? নিজে খাবে বলে। মাথা ধরে আজ একটু শুয়েছি কিনা আমি, বাস আর কোথায় যাবে, যত্ন করে সন্দেশ রাখলাম তোমার জন্যে, তবু সন্দেশ নেই। এমন বেহায়া, হ্যাংলা মেয়ে—

আনু ক্ষীণসুরে বলে, তুমি বললে না বউদি, আজ সন্দেশ দিয়ে যায়নি ?

মোহিনী অবাক !—অন্ধ সনাতনও টের পায় এমনই সশব্দ অবাক।

বললাম ? সন্দেশ দিয়ে যায়নি বললাম ? তোর কথা শুনলে গা জ্বলে যায় আনু। এমন ছোটো মন তোর ? দুটো সন্দেশের জন্যে এমনই হ্যাংলাপনা ? বাপের জন্মে আমি তোর মতো—

সনাতন বলে, তোর না মাথা ধরেছে মোহিনী ? যা শো গিয়ে।

মাথাধরা কমেছে।

কমুক। যা, শুবি যা। যাঃ—

মোহিনী যায়।

আনু প্রায় কাঁদে। বুক ওঠে-নামে আনুর, ঠোঁট কাঁপে, চোখ ছলছল করে—বেশ দেখায় আনুকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না কাঁদিয়া নাক সিটকানোর দরুন মুখের বিষণ্ণতার শ্রীটুকু নষ্ট হইয়া যায়, অকথ্য রকমের বিশ্রী দেখায় আনুকে, এ সব কিছুই সনাতন দেখিতে পায় না। কেবল নাক সিটকানোর পর আনুর জোরে নাক টানার শব্দে অনুমান করে। বলে, আনু, ওমা আনু ? সব জানি আমি, আমার মেয়েটা মিথ্যুক। ওই আমার সন্দেশ গাপ করার ফিকিরে ছিল। একদিন দিয়ে, দুদিন না দিয়ে, আস্তে আস্তে শেষে একদম বন্ধ করে দিত। তুমি কিছু মনে কোরো না মা। শুধু ওর গালমন্দ শুনে নয়, যে যা বলুক সব হেসে উড়িয়ে দিয়ো। তুমি আর আমি ছাড়া এ বাড়ির সবকটা পাগল, সবকটার মাথার ছিট আছে। তোমার মাউই-মা যখন বেঁচেছিল—

এমনভাবে কথা বন্ধ করে সনাতন যে তার দু-পাটি দাঁতে খট করিয়া শব্দ হয়। দাঁতের গেট বন্ধ করিয়া সে যেন কথাগুলিকে ভিতরে আটকাইয়া রাখে।

আনু বলে, তালুই মশায় সন্দেশ খেতে আমার বমি আসে। বউদি তা জানে তবু আমায় দুষল। আমি এবার মরব বিষ খেয়ে।

শুনিয়া কী বিবর্ণই যে হইয়া যায় সনাতনের মুখ। সভয়ে, গলায় আটকাইয়া যাইতে পারে এমন গাঢ়স্বরে সে বলে, না আনু না, কখনও বিষ খেয়ে মরো না মা, কক্‌খনো নয়। এমনিই মরো না, মরতে কি আছে ? তুমি একা মরলে একজন দুজন চারজন কতজনকে জ্যান্ত মেরে রেখে যাবে তার কি ঠিক আছে ! এমন কথা মনেও এনো না বাছা। কীসে কী হয় সে জ্ঞান কি তোমার আছে, ছেলেমানুষ তুমি ? লক্ষ্মী হয়ে শান্ত হয়ে থেকো, দেখবে তোমার মতো সুখী কেউ নেই। তা না করে যদি মরে যাও বিষটিষ খেয়ে—

বিষ খাইয়া মরিলে যে সুখী বা দুঃখী হওয়ার প্রশ্ন শেষ হয় এ কথা মনে পড়ায় সনাতন থামিয়া যায় না, আনুকে সে তো যুক্তিতর্কের কথা বলিতেছিল না। আনুকে এ সব কথা বলিতে নাই বলিয়াই সে থামে। এ সব বক্তৃতা কি এতটুকু মেয়েকে শোনাতে আছে !

খানিকক্ষণ ঝিম ধরিয়া থাকে সনাতন, তারপর অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে, কী বলতে গিয়ে কী সব বলছিলাম তোমায়, তুমি বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে আনু, বড়ো ভালো মেয়ে তুমি—আনু ? চলে গেছ নাকি ?—আনু, ওমা আনু !

কী বলছেন তালুই মশায় ?

এবার আঁচাব।

সন্দেশ খান ?

খাইনি সন্দেশ ? কী পোড়া মন হয়েছে আমার !

সন্দেশ খাইয়া আঁচাইয়া সনাতন উপরে যায়। খাটে বসিয়া চুপচাপ ভাবিতে থাকে। ভাবিতে ভাবিতে রাগ হয় সনাতনের, রাগ হইতে হইতে মাথা গরম হইয়া ওঠে।

ঘর ফাটাইয়া সে হাঁক দেয়, আনু, ও আনু ! মোহিনী ! ওলো মোহিনী !

দুজনেই সাড়া দিয়া ঘরে আসে।

সনাতন বলে, আনুকে তুই বকিস কেন লো মোহিনী, কেন যা-তা বলিস ? সন্দেশ চুরির মতলব করবি তুই, আর গাল দিবি ওকে ! ফের যদি এ রকম করবি তো দূর দূর করে বাড়ি থেকে খেদিয়ে দেব তোকে—গলা ধাক্কা দিয়ে খেদিয়ে দেব।

রাগে দুঃখে আর অপমানে মোহিনী কাঁদিয়া ফেলে। ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে বলে, ওব কথা শুনে ওর সামনে আমাকে তুমি এমনি অপমান করবে বাবা ? ওর কথা বিশ্বেস করে আমাকে অবিশ্বাস করবে ? আমি ওর গুরুজন, মায়ের মতো আমি ওকে খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি মানুষ করছি, এমনিভাবে ওর কাছে আমার মাথা হেঁট করাবে ? আমি তোমাব মেয়ে, ও তোমার কে ?

সনাতন বলে, আনু, ওমা আনু ?

আনু বলে, কী বলছেন তালুই মশায় ?

মোহিনীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে ?

পড়ছে তালুই মশায়।

সনাতন হঠাৎ খুব শান্ত হইয়া যায়। স্বাভাবিক চড়া গলা ঝাপসা হইয়া আসে। মেয়েকে কাছে ডাকিয়া তার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে আরম্ভ করে সনাতন। আহা ! ওর মা যখন ওকে ফেলিয়া চলিয়া যায়, ওর বয়স ছিল মোটে সাত বছর। মার জন্য কী কান্নাই তখন মোহিনী কাঁদিত ! ঝরঝর করিয়া কী জলটাই ঝরিত দু চোখ দিয়া ! মোহিনীর গলার হারে হাত পড়ায় সনাতন চমকাইয়া ওঠে। মেয়ের একটা হাত তুলিয়া চুড়ি ও বালা স্পর্শ করিয়া হাতটা সে ছুঁড়িয়া দেয়। গয়না ! গয়নাব শোকে যে স্বামী সন্তানকে ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গিয়াছিল তার মেয়ে কত গয়না পরিয়াছে দ্যাখো। নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে !

যা তোরা। যা এ ঘর থেকে।

আনু ও মোহিনী চলিয়া গেলে একা একা খানিকক্ষণ ঝিমায সনাতন, খানিকক্ষণ বিড়বিড় করিয়া আপন মনে বকে, খানিকক্ষণ ছটফট করে। তারপর হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া আলমারি খুলিয়া একটা বোতল বাহির করিয়া আনে। গেলাস সনাতনের দরকার হয় না।

এতকাল দিনের মর্যাদা রাখিয়াছিল সনাতন, দিনরাত্রির ভেদ ঘুচিয়া যাওয়ার পরেও—কিন্তু কী করা যায়। অন্ধ তো শুধু অন্ধই নয়।

চাকরি

গাড়ি নূতন, বউ নূতন, চাকরি নূতন। চাকরিটা জুটিয়াছে কৌশলে, শোভারাণীকে পাশে বসাইয়া শহরের বাহিরে প্রকৃতির শোভা দেখিতে আর ফাঁকা হাওয়া খাইতে বাহির হওয়াটাও ঘটিয়াছে কৌশলেই। কাল বিকালে বাড়ির সকলে গিয়াছে এক ভাইপোর বিবাহ উপলক্ষে বর্ধমান, শোভারাণীর বাপের বানানো অসুখের ছুতায় তারা দুজনে থাকিয়া গিয়াছে। আজ বারাসতে বাপের অবস্থা দেখিয়া হয় শোভা যাইবে বর্ধমান, না হয় শোভা যাইবে না ; এই হইয়াছে ব্যবস্থা।

মনটা বড়ো খুশি ছিল মহেন্দ্রজিতের। মিথ্যার অস্ত্রে দুদিনের সংক্ষিপ্ত 'হানিমুন'টুকু আয়ত্ত করার জন্য যতটা নয়, চাকরিটার জন্য তার চেয়ে ঢের বেশি। থাকিয়া থাকিয়া অকারণেই সে হর্নটা টিপিয়া দিতেছিল প্যাঁক প্যাঁক। মন খুব খুশি থাকিলে শ্বশুর... ...ড়ব হর্ন টিপিতে যেন মজা লাগে।

চাকরির জন্য মনটা খুশি আছে এ কথাটা বলিতে শ্বশু... বউটি কিন্তু মুখ বাঁকাইয়া হাসিল। —ভারী তো চাকরি তার জন্য আবার আনন্দ ! নাই বা করতে তুমি চাকরি ? একমাস খেটে একশোটা টাকা—পুৎ !

কোঁচকানো ঠোঁটের 'পুৎ' মহেন্দ্রজিৎকে আরও খুশি করিয়া দিল। সে হাসিয়া বলিল, প্রথমেই লোকে বুঝি হাজার টাকার চাকরি পায় ? থাক বাড়ির মধ্যে, চাকরির বাজারের ব্যাপার তুমি কী জানবে। তাও বাবার জন্যে পেলাম, বাবা ব্যবস্থা না করলে ভূষণবাবু আমায় কলা দেখিয়ে বিদেয় করে দিতেন। একশোতে ঢুকলাম এখন, দু-একবছর যাক, কাজকর্ম শিখি, আস্তে আস্তে ভূষণবাবুই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

যদি না করেন ?

যাবেন কোথা না করে ? আমার জন্যে উনি কিছু না করলে ওর ছেলের জন্যও বাবা কিছু করবেন না, কলা দেখিয়ে দেবেন।

কথায় কথায় 'কলা দেখানো'টা মহেন্দ্রজিতের মুদ্রাদোষ। আরও কিছুদিন পরে শোভারাণী হয়তো একেবারেই খেয়াল করিবে না, এখন মাঝে মাঝে তার হাসি পায়।

কলা, কলা, কলা ! মাগো মা, কী কলাটাই তুমি দেখাতে পার।—আচ্ছা, এমনিভাবে একজনের ছেলেকে আর একজনের আপিসে না নিয়ে, যার যার ছেলেকে নিজের নিজের আপিসে নিলেই তো হত ?

সরল হাসি ও সবল প্রশ্নে মহেন্দ্রজিতের ভর্তি বুকটা আরও কীসের আবির্ভাবে যেন ছাপাইয়া গেল। নতুন গাড়িটার স্বচ্ছন্দ গতির চেয়েও সহজ ও আরামপ্রদ গতিতে কী আনন্দেই এই স্ত্রীর সঙ্গে আগানো চলিবে জীবনের পথে ! গাড়ির গতিবেগ সে শ্লথ করিয়া আনিল।

তাই কি হয় ? যা তা বলত না লোকে ? দুজন ডিরেক্টর বাবাকে পছন্দ করে না, তারা গোলমাল করত। তা ছাড়া এরপর যখন ওপরে ওঠাতে হবে তখন ? কত লোক আছে আপিসে, তাদের ডিঙিয়ে শুধু নিজের ছেলেকে—

কথাটা সে শেষ করিল প্রাণ-বাঁচানোর বদলে রাস্তার একটা কুকুরকে বিশ্রী একটা গাল দিয়া। গালটা শুনিয়া শোভারাণী মুচকিয়া একটু হাসিল। শহরের শেষপ্রান্তও তারা কিছুক্ষণ আগে পার হইয়া আসিয়াছে। এদিকে মহেন্দ্রজিৎ আগে আর কখনও আসে নাই। মোটর হাঁকাইয়া বেড়ানোর ফ্যাশন প্রচলিত করার আভিজাত্য এ পথটির নাই, সে রকম প্রশস্তও নয় পথটা, কিন্তু ভারী নির্জন। কয়েকটা

সাধারণ গ্রাম পার হওয়ার পর গরিবদের শহরতলির খানিকটা ছিটকানো অংশের মতো একটা গ্রাম পাওয়া গেল। শরৎকালের শিশু-সূর্যের কিরণ দামি সোনার বর্ণচ্ছটার মতো দুপাশের ঘরবাড়িতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যে সব বাড়িতে মেয়েদের গায়ের দু-চারখানা গয়না ছাড়া কমদামি সোনারও বড়ো অভাব। ডাকাতি রাহাজানির ভয়ে শোভারাণী গায়ের অনেক সোনা বাড়িতে খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। গায়ে তার যে সোনা আছে, একা একা স্বামীর পাশে বসিয়া মোটরে হাওয়া খাওয়ার পক্ষে তাই যথেষ্ট, কিন্তু মনের ভুলে সরু চেন-হারটির বদলে বিছাহারটি না পরিয়া আসায় মনটা বড়ো খুঁতখুঁত করিতেছিল শোভারাণীর। পথের পথিক, বিশেষত দুপাশের বাড়ির মেয়েরা কেউ কেউ মুহূর্তের জন্য হইলেও, দেখিতে তো পাইতেছে তাকে। এই সরু ছোটো বাজে হারটা নজরে পড়িলে না জানি কী ভাবিতেছে তারা !

জান মনটা খুঁতখুঁত করছে। বিছেহারটা পর্যন্ত পরে আসতে ভুলে গেছি। এমন খালি খালি লাগছে গলাটা !

মহেন্দ্রজিৎ পরিহাস করিয়া বলিল, ভালোই হয়েছে, বিছেহার যদি কামড়ে দিত ?

শোভারাণী অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, তুমি তো ঠাট্টা করবেই, নিজে তো দিব্যি সোনার ঘড়িটি লাগিয়ে এসেছ বিয়ের।—ও মা ! ঘড়িটাও যে আনিনি আমি ! কী হয়েছে আমার আজ ? হাতটাও তাই এমন খালি খালি লাগছে !

বিছাহার ও হাতঘড়িটি না আনার আপশোশ ফুরাইবার আগেই গ্রাম ফুরাইয়া গেল। কিন্তু, একটা লাইট রেলওয়ের লাইন পার হওয়ার পর দেখা গেল গ্রামটিব এতদূব তফাতে একটি গ্রামতলি গড়িয়া উঠিয়াছে। ভিন্ন একটা গ্রামই হয়তো হইবে, কিন্তু এমন অসম্বন্ধভাবে পাড়া কয়েকটি ছড়াইয়া আছে, খেত, আমবাগান প্রভৃতির ব্যবধানে এমন কতগুলি ছাড়া ছাড়া বাড়ি আছে যে. গ্রামতলি সংজ্ঞাটিই মানায় ভালো। এমনই একটি প্রায় নিঃসঙ্গ ইট-বাহির করা ছোটো একতলা বাড়ির সামনে পাঁচকোনা ছোটো বাগানটির চিকলি চারার বেড়ার গায়ে বসানো বাঁশের বাতা দিযা তৈরি গেটটি ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া একজন প্রায় ছ-ফুট লম্বা যুবক বিড়ি টানিতেছিল। সম্মুখ দিয়া মোটরটা হুস করিয়া পার হইয়া যাওয়ার সময় মুখ হইতে বিড়িটা নামাইয়া সে এমন একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি কবিয়া শোভারাণীকে একটা খাপছাড়া নজর দিল যে, গলা ও বাঁ হাতের কবজির শূন্যতা যেন বিছার মতোই কামড় দিতে লাগিল তাকে।

মহেন্দ্রজিৎ বলিল, ওর বাড়িটা যে এদিকে, ভুলেই গিয়েছিলাম।

কার বাড়ি ?

জয়গোপালের। ওই যে লম্বামতো ছেলেটা দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল,—ও। ওর কাছেই তো চাকরিটার খবর পেয়েছিলাম। বাবাও জানতেন না ভূষণবাবুর আপিসে লোক নেওয়া হবে। বাবাব একটা চিঠির জন্য জয়গোপাল আমার কাছে গিয়েছিল। আমি তো নিয়ে গেলাম বাবার কাছে, বাবা শুনেই ওকে কলা দেখিয়ে বললেন, না বাপু, চাকরির জন্য আমি কাউকে রেকমেন্ডেশন লেটার দিই না। বলেই ছুটলেন ভূষণবাবুর কাছে।

তোমার বন্ধু বুঝি ও ?

বন্ধু না ছাই। সেই কবে ছেলেবেলা দু-একবছর একসঙ্গে স্কুলে পড়েছিলাম।

ফিরিবার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটিয়া গেল, এই বাড়িটির সম্মুখেই। মোটর যে হাঁকায়, সেই জানে কত আশ্চর্য রকমের হাঁদা ও অসাবধান মানুষ বাস করে পৃথিবীতে। কিন্তু, এ অভিজ্ঞতা এখনও মহেন্দ্রজিতের জন্মে নাই যে, এমন মানুষও এ জগতে থাকিতে পারে, কয়েক হাত তফাতে সজোরে ও সশব্দে গাড়িটা আসিতেছে, সটান তার সামনে আসিয়া দাঁড়ানোর মতো সাংঘাতিক দুর্বুদ্ধিতে যার মগজটা ঠাসা। কুকুর,

বিড়াল হইলে চাপা দিয়াই সে চলিয়া যাইত, মানুষ বিশেষত চেনা মানুষ, বলিয়া হঠাৎ সে এমন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল যে, যা সম্ভব ছিল না, করিতে গেল তাই। ব্রেক কষিবার সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত বাধাটির পাশ কাটাইয়া যাওয়ার জন্য স্টিয়ারিং হুইলটাও দিল অনেকখানি ঘুরাইয়া। ফলে, জয়গোপালদের চিকলি চারার বেড়া চুরমার করিয়া একটা ডিগবাজি খাইয়া গাড়িটা স্থিতিলাভ করিল বাগানেব মাঝখানে। কাত হইয়া স্থিতিলাভ করার জন্য দুটি চাকা উঠিয়া রহিল শূন্যে।

মানুষকে মাঝে মাঝে খুন-জখমের উত্তেজনা সরবরাহ করাও মোটরগাড়ির একটা কর্তব্যের মধ্যে। উত্তেজনাটা এমন উপভোগ্য যে, সব সময় জোটে না বলিয়া অনেকে আপশোশ পর্যন্ত করে। প্রচণ্ড শব্দ, তীব্র আর্তনাদ, জমজমাট ভিড়, প্রশ্ন, মন্তব্য আর উপদেশের কোলাহল, পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্সের আবির্ভাব : রাজধানীর রাজপথে আদর্শ মোটর দুর্ঘটনার এইগুলি প্রধান অঙ্গ। আমাদের এই দুর্ঘটনাটি যদিও ও সব বড়ো বড়ো দুর্ঘটনার তুলনায় এক রকম কিছুই নয়, তবু পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্সের আবির্ভাব ছাড়া বাকি সমস্তই একে একে গেল ঘটিয়া। শব্দ শুনিয়া জয়গোপালেব বাড়ির সকলে, পাড়ার কয়েক বাড়ির প্রতিবেশী ও পথের পথিক আসিয়া জোটায় ভিড় জমিল নেহাত মন্দ নয়। গাড়ির ভিতর হইতে দুজনকে টানিয়া বাহির করার পর বুঝা গেল, কিছু কিছু জখম হইলেও মারাত্মক আঘাত সম্ভবত কারও লাগে নাই। শরীরেব অনেক স্থানেই কাটিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে দুজনের ; মহেন্দ্রজিতের কপালে একটা ক্ষত হইতে রক্ত ঝরিতেছে বেশি, শোভারাণীর প্রায়-বোঁচা নাকটা একেবারে ছেঁচিয়া গিয়াছে।

জয়গোপাল মহেন্দ্রজিৎকে জিজ্ঞাসা কবিল, কোথায় বেশি লেগেছে, বুঝতে পারছ ?

মহেন্দ্রজিৎ বোকার মতো বলিল, না।—তুমি অমনভাবে গাড়ির সামনে গিয়ে পড়লে কেন ?

এ প্রশ্নের কী জবাব দিত জয়গোপাল, সেই তা জানে, দুজনের হাত-পা কিছু ভাঙিয়াছে কি না, অবিলম্বে সেটা জানিবার প্রয়োজনের তলে প্রশ্নটা চাপা পড়িয়া গেল। তা ছাড়া, চারিদিক হইতে যে প্রশ্ন বর্ষিত হইতেছিল, বৃষ্টিধারা হইলে বাগানে বন্যা আসিত। প্রতিবেশী একটি ছেলেকে লাইট রেলওয়ে লাইনের ওপারে অম্বিকা ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইয়া জয়গোপাল নিজের বন্ধুর হাত-পা যতটা পারে নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিল, দেহের অন্য কোনো অংশ যদি তার গুঁড়াও হইয়া গিয়া থাকে, এই অঙ্গ কয়েকটি আস্তই আছে। শোভারাণীর নাকের যন্ত্রণা কিন্তু তার শরীরের অন্য অংশগুলির অবস্থানির্ণয়ের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। জয়গোপাল বলিল, মা, ওকে ভিতরে নিয়ে যাও।

রক্ত দেখিযাই মা উপক্রম করিয়াছিলেন কাঁদিয়া ফেলিবার, কিন্তু দু-চোখ শক্ত কবিয়া বন্ধ কবিয়া ফেলায় কান্নাটা পরিণত হইয়াছিল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া থরথর কাঁপুনিতে। ছেলের ডাকে তিনি চোখ মেলিলেন, একবার শিহরিয়া উঠিলেন, তারপর একাই জড়াইয়া ধরিয়া শোভারাণীকে তুলিতে গেলেন কোলে। তিন বছরের ছোটো মেয়েটাকে কোলে তুলিতেই যার কষ্ট হয়, শোভারাণীকে তিনি কেন তুলিতে পারিবেন ? সেজো মেয়ে কনক ও জয়গোপালের বউ বীণা সাহায্য করায় তিনটি ক্ষীণাঙ্গী বাহিকার সমবেত শক্তি শোভারাণীর আহত দেহটিকে অন্দরে লইয়া যাইতে পারিল। মহেন্দ্রজিৎ ভিতরে গেল জয়গোপালের কাঁধে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে।

হতভম্ব ভাবটা তার দ্রুত কাটিয়া যাইতেছিল। জয়গোপালের ঘরে চৌকিতে গুটানো বিছানার নীচেকার ময়লা শতরঞ্চিতে বসিয়া হঠাৎ সে ভয়ানক রাগ করিয়া বলিল, দেখ দিকি কী কাণ্ড করলে তুমি ! তোমার মতো 'কেয়ারলেস্' হাঁদা,—ও কোথায় গেল ?

সাদা জামা-কাপড়ের এখানে ওখানে রক্তের ছাপ, বসিবার ভঙ্গিতে একটা অদ্ভুত অসহায় ভাব, বাঁ গাল বাহিয়া কেঁচোর মতো রক্তের রেখাটির আঁকাবাঁকা ধীর নিম্নগতি—এ সমস্তের সঙ্গে তার মুখের এতক্ষণের সকাতর ভয় ও থতোমতো ভাবটা বেশ মানাইয়াছিল। এবার পরপর এই আকস্মিক ক্রোধ

ও উদ্‌বেগের ছায়া পড়ায় তাব মুখখানা যেন তারই নিজস্ব সর্বাঙ্গীণ বিপন্নতার আবেষ্টনীতে অভিনেতার মুখের মতো খাপছাড়া হইয়া গেল। স্ত্রীর সম্বন্ধে এতক্ষণ তার কিছুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না খেয়াল করিয়া, জয়গোপালের মুখে যে মৃদু হাসিটুকু দেখা দিল, সেটা কিন্তু দেখাইল আরও বেমানান, আরও অস্বাভাবিক।

তুমি হাসছ ! আমার এমন সর্বনাশ করে তোমার হাসি পাচ্ছে ?

জয়গোপাল মাথা নাড়িয়া বলিল, না ভাই, হাসিনি। হাসব কেন ? তোমার স্ত্রীর বেশি লাগেনি। একবার দেখে আসি চলো।

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মহেন্দ্রজিৎ পাশের ঘরে গেল। এ বাড়ির মধ্যে এই ঘরখানাই একটু সাজানো, যে কয়েকটি দামি জিনিস আছে বাড়িতে, ঘরে ঘরে ভাগ না করিয়া এই ঘরেই জমাইয়া রাখা হইয়াছে। মেয়েরা বেড়াইতে আসিলে তাই এ ঘরেই তাদেব বসিতে দেওয়া হয়। দেয়ালে ছবি ও ফটো টাঙানো আছে দক্ষিণেব দেয়াল ঘেঁষিয়া পাতা আছে তিনপুরুষের একটি খাট, উত্তরেব দেযাল স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে একটি আলমারি এবং একটা বেঞ্চির উপরে গোটাদুই নূতন ও কয়েকটি পুরানো বিবর্ণ বাক্‌সো। এ ছাড়া দুখানা নূতন চেয়াব ও একটি টেবিলও ঘরে আছে। চুন ও রঙের বিরহে বিমর্ষ দেয়াল ও জানালা-কপাট, সেকেলে খাটটিতে ছেঁড়া তোশকের বিছানা, কোণে টাঙানো দড়িতে ময়লা কাপড়-জামা ঝুলানো, সময়ের অনাচারে আত্মহারা বাক্‌সো-প্যাটরা, এ সমস্তের মাঝখানে জয়গোপালের বিবাহের নূতন চকচকে আসবাব কয়েকটিকে যেমন খাপছাড়া দেখায়, এ বাড়ির মেয়েদের মধ্যে শোভারাণীও পাইয়াছে তেমনই একটি বৈশিষ্ট্য। এক গামলা ঠান্ডা জলের উপর সে ঝুঁকিয়া আছে, অঞ্জলি ভরিয়া তার নাকে জল দিতেছে বীণা। স্বামীকে দেখিয়া বীণা তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল, শোভারাণী সকাতর গুমরানিব সঙ্গে বলিল, ওগো, আমাব নাকটা একেবাবে গেছে, কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ ?

মহেন্দ্রজিৎ উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কবিল, আর কোথাও লাগেনি তো তোমার ?

লাগেনি ? সমস্ত শরীর চুরমার হয়ে গেছে।

মৃদুস্বরে মহেন্দ্রজিৎ বলিল, হাড় বোধ হয় ভাঙেনি কোথাও, কেটে ছিঁড়ে গেছে। নাকেই বেশি লেগেছে।

শোভারাণী রাগিয়া তীক্ষ্ণ খোনা গলায় বলিল, তুমি তো সব জানো, মস্ত ডাক্তাব তুমি ! ওগো মাগো, কী কুক্ষণেই আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। তোমারও যে সারা গায়ে রক্ত লেগেছে, কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে। কিছু হয়নি তো তোমার ?

মহেন্দ্রজিৎ বলিল, **এই** পায়ে আর এই হাতে খুব চোট লেগেছে, আব অনেকটা জায়গা কেটে গেছে। নাকটা বুঝি খুব টনটন করছে তোমার ?

নাকের কনকনানিতে শোভারাণীর দু-চোখ দিয়া টসটস করিয়া গামলার লাল জলে জল ঝরিয়া পড়িতেছিল, সম্ভবত, এই জলের পর্দায় তার দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই এর আগে স্বামীব অবস্থাটা নজরে পড়ে নাই। বীণা এক অঞ্জলি জল তার নাকে প্রয়োগ করায় সে মুখেও স্বামীর কথার জবাব দিতে পারিল না, মাথাটাও নাড়িতে পারিল না।

জয়গোপালের মা বলিলেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবা তুমি ? বসো এই চেয়ারটাতে, নয় শুয়ে পড়বে তো তাই পড়ো। কী বাঁচানটাই ভগবান আজ বাঁচিয়েছেন ! এখনও আমার বুকটা ধড়ফড় করছে। সওয়া পাঁচ আনার বাতাসা এনে ওবেলা হরির লুট দেব, মানত করেছি। অ্যাদ্দিন পরে এমনভাবে তুমি আবার এ বাড়িতে আসবে, তা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি বাবা। কত বড়ো হয়ে গেছ তুমি ! প্রথমে চিনতেই পারিনি তোমাকে, চিনতে পেরেই,—না বাবা তুমি শোও, বড়ো যন্ত্রণা হচ্ছে তোমার।

বলিতে বলিতে মলিন আঁচলে সস্নেহে সন্তর্পণে মহেন্দ্রজিতের কপালের রক্ত মুছিয়া লইলেন। ছেলের সঙ্গে স্কুলে পড়িবার সময় নিজের বাড়িতে নিষিদ্ধ অনাচারগুলি করার ও আচার প্রভৃতি কতকগুলি অখাদ্য খাওয়ার সুবিধার জন্য যে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসিত, তাকে মাসি বলিয়া ডাকিত এবং স্নেহ করিবার অধিকার দিত, তার কপালের রক্ত বলিয়াই বোধ হয় মার মনের স্বাভাবিক রক্তের আতঙ্কটা মাথা তুলিতে পারিল না।

অম্বিকা ডাক্তার আসিতে আসিতে বাজিয়া গেল এগারোটা। মোটর দুর্ঘটনায় এত কম আঘাত লাগিয়াছে দেখিয়া অম্বিকা ডাক্তার যেন ক্ষুণ্ণ হইয়া গেলেন। মাথা নাড়িয়া বলিলেন যে, না ডাকিলেই হইত তাকে, যেখানে যেখানে কাটিয়া গিয়াছে, একটু টিনচার আইডিন, আর শোভাবাণীর নাকে যেমন জল দেওয়া হইতেছে, ব্যথা না কমা পর্যন্ত তেমনই দিয়া গেলেই ব্যাপার চুকিয়া যাইত। তবু, কয়েকটা ব্যান্ডেজ তিনি বাঁধিলেন এবং যাওয়ার সময় জয়গোপালকে আড়ালে ডাকিয়া দাবি করিয়া বসিলেন ফি। এ বাড়িতে আগে তিনবার আসার দরুন তাঁর তিন দুগুণে ছ-টাকা ফি বাকি আছে, আজ তিনি কোনোমতেই ধারে কারবার করিবেন না।

অম্বিকা ডাক্তার একটা হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, না চলবে না। এই বসলাম আমি, টাকা পেলে উঠব। আগের টাকা দেবে না জানি, আজকের ফি-টা আমার চাই।

জয়গোপাল তখন টাকার সন্ধানে গেল। ছাদে উঠিবার সিঁড়ির নীচে আবছা অন্ধকার ঘুপচির মধ্যে ছোটো একটি জলচৌকির উপরে দেওয়ালে ঠেস দিয়া শ্রীকৃষ্ণের একটি বাঁধানো ছবি আছে, ছবিটির সামনে বসিয়া তার বাবা নন্দগোপাল ধ্যান করিতেছিলেন। সংসারে তাঁর মন নাই, চাকরি ছাড়ার পর আজ পাঁচ বছর একবেলা হবিষ্য করেন, কৃষ্ণচিন্তায় দিন কাটান, মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কাঁদেনও। বছর সাতেক আগে, সাতাশি টাকার চাকরিটা বজায় ছিল এবং জীবনবিমার হাজার দুই টাকা পাইয়া নিজেকে মস্ত বড়োলোক ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, দেড়টাকা সুদে একজন প্রতিবেশীকে তখন শ-চারেক টাকা কর্জ দিয়াছিলেন। এতকাল প্রতিবেশীটি এক পয়সা সুদও দেয় নাই, আসলও দেয় নাই, কিন্তু পাড়ায় নন্দগোপালের ধ্যান-ধারণার খ্যাতি রটিবার পর হঠাৎ একটি মেয়ে মারা যাওয়ায় প্রতিবেশীটির মনে আসিয়াছিল অস্বস্তি, কয়েকমাস আগে একটা বড়ো মোকদ্দমায় হারিয়া সে অস্বস্তি দাঁড়াইয়া গিয়াছে ভয়ে। মাঝে মাঝে অযাচিতভাবে সে দু-পাঁচ টাকা নন্দগোপালকে দিয়া যায়, খোলামকুচির মতো নন্দগোপাল টাকা কটিকে ঠেলিয়া দেন জলচৌকির নীচে। বাড়ির কেউ প্রার্থনা জানাইলে জলচৌকির তলাটা হাতড়াইয়া টাকা থাকিলে বাহির করিয়া দেন, না থাকিলে একগাল হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলেন, টাকা তো নেই !

কাল বাজার করার পয়সা না থাকায় একবার জলচৌকির বাক্সো হাতড়ানো হইয়াছিল। তবু জয়গোপাল প্রথমে বাবার কাছেই টাকার খোঁজে গেল। আগে একবার চুপিচুপি জলচৌকিটি উঁচু করিয়া কোণের দিকে সে দুটি টাকা পাইয়াছিল, নন্দগোপাল হাতড়াইয়া যার সন্ধান পান নাই।

বলা মাত্র নন্দগোপাল চৌকির তলে হাত ঢুকাইয়া দিলেন, তারপর হাত বাহির করিয়া আনিয়া যেমন ছিলেন তেমনই হইয়া গেলেন। আজ তিনি হাসিলেন না, মাথা নাড়িলেন না, কথাও বলিলেন না।

আমি একবার খুঁজে দেখি বাবা।

কী যে বলিস। মাছ খাস, মাংস খাস, নোংরা হয়ে থাকিস, ঠাকুরকে ছুঁবি তুই ? ছুঁয়েছিস নাকি কখনও ?

পনেরো দিনের মধ্যে মাছ-মাংস চোখেও দেখে নাই বলিয়া প্রতিবাদ জানানোর বদলে জয়গোপাল তাড়াতাড়ি বলিল, না না, তাই কখনও পারি ? আমার বুদ্ধি নেই ? চৌকিটা একটু উঁচু করে তুমিই একবার দেখ না বাবা, আড়ালে টাড়ালে যদি দু-একটা থাকে ?

নন্দগোপাল আহত-বিস্ময়ে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠাকুরের আসন উঁচু করে টাকা খুঁজব ? তুই খেপে গেছিস, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে তোর। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। চোখ বুজিয়া বলিলেন, কলেজে পড়ার সময় তোর কত তেজ ছিল, সাহস ছিল, তুই এ রকম হয়ে যাবি ভাবিনি বাপু। ন্যায়সঙ্গত কাজ করতে আগে তো তোর লজ্জা হত না ? যাদের জন্য অম্বিকা এসেছে, তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওর ফি দিয়ে দিবি, এতে তোর সঙ্কোচ হচ্ছে কীসের ? ভিক্ষা তো চাইছিস না ?

এ ভাবে এত কথা নন্দগোপাল কদাচিৎ বলেন। কিন্তু, সে জন্য নয়, জয়গোপাল অবাক হইয়া গেল এই ভাবিয়া যে, এখানে ধ্যানে বসিয়া নন্দগোপাল কী করিয়া জানিলেন, অম্বিকা ডাক্তারের জন্য হঠাৎ টাকার দরকার হইয়াছে। সেইখানে বসিয়া একটু ভাবে জয়গোপাল। মনে আজকের মোটর দুর্ঘটনার মতো একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া যায়। সংসারের প্রত্যেক খুঁটিনাটি তবে এখানে বসিয়া টের পান নন্দগোপাল ? তাঁর কৃষ্ণচিন্তার ব্যাকুলতা মাঝে মাঝে দু-চোখে জল ফেলা, এ সমস্তের কারণ স্ত্রী-পুত্রের দুঃখদুর্দশা হওয়াও অসম্ভব নয়। পরলোকের জন্য নয়, ইহলোকের আপনজনেরা সবদিন দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না বলিয়া সব সময় অশান্তি জাগিয়া থাকে, তাই সব সময় এমনিভাবে শান্তি খোঁজেন।

তা-ই স্বাভাবিক। অশান্তি অসহ্য হইয়া উঠিলে যে যে ভাবে পারে শান্তি খোঁজে। কয়েক ঘণ্টা আগে সেও হয়তো শান্তির খোঁজেই মহেন্দ্রজিতের মোটরের সামনে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল ? তা ছাড়া ও পাগলামির আর কী মানে হয় ?

মহেন্দ্রজিতের হাঁটুতে চোট লাগিয়াছিল জোরেই। ধীরে ধীরে হাঁটু ফুলিয়া উঠিতেছিল, ব্যথাও বাড়িতেছিল। এখন আর রক্ত লাগিয়া বিছানা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল না, তাই জয়গোপালের বিছানাটি পাতিয়া তাকে শুইতে দেওয়া হইয়াছে। ময়লা চাদরটি বদলাইয়া একটি ছেঁড়া কিন্তু পরিষ্কার ধুতি ভাঁজ করিয়া পাতিয়া দেওয়া হইযাছে বিছানায়। একটি সিগারেট ধরাইয়া মহেন্দ্রজিৎ দুভাঁজ ধুতির নীচে ওয়াড়বিহীন তেল-চটচটে বালিশে মাথা দেওয়ার অস্বস্তি আর হাঁটুর যন্ত্রণা দমন করার চেষ্টা করিতেছিল, জয়গোপাল আসিয়াই বিনা ভূমিকায় দাবি করিয়া বসিল, ডাক্তারের ফি টা দিতে হবে ভাই।

মহেন্দ্রজিৎ চমকাইয়া বলিল, আমার মানিব্যাগ ? দেখ তো জামাটার পকেটে আছে না কি ?

দেয়ালে মশারি টাঙানোর পেরেকে তার রক্তমাখা পাঞ্জাবিটি ঝুলিতেছিল। পকেটগুলি খুজিযা দেখিয়া জয়গোপাল বলিল, **নেই**।

মহেন্দ্রজিৎ ব্যস্ত হইয়া বলিল, নেই ? বুক পকেটে ছিল, কোথায় গেল তবে ব্যাগটা ? অনেকগুলি টাকা ছিল ভাই ব্যাগে, তিরিশের কম নয়। গাড়িতে পড়ে গেছে না কি, গাড়িটা যখন উলটে গেল তখন ?

জয়গোপালের দৃষ্টির অস্বাভাবিকতা বছরখানেক হল চোখে পড়ার মতো স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—মনোবেদনায় জ্বলজ্বল, আর বুকের জ্বালায় ছলছল এই দু রকম দৃষ্টি। তার এখনকার দৃষ্টি দেখিয়া মহেন্দ্রজিৎ ভড়কাইয়া গেল।

নয় তো কোথায় যাবে তোমার ব্যাগ, তোমার তিরিশ টাকার ব্যাগ ? আমি তোমাকে গাড়ি থেকে টেনে বের করেছি, বাড়ির মধ্যে এনেছি। বাড়িতে কোথাও পড়ে গিয়েছে। ভেবো না, বাড়ির কেউ কুড়িয়ে নিয়েছে। সুযোগ পেলেই আমরা পরের ঘাড় ভাঙি না, তা জেনে রেখো।

তাই বললাম আমি ?

কী জানি, বললে কি না। তোমাদের বলা আর করার মানে বুঝা দায়।

আর, তোমাদের বলা আর করাব খুব মানে বুঝা যায়, না ? গাড়ি উলটে দিয়ে তুমি আমাদের খুন করার ফিকিবে ছিলে।

জয়গোপাল প্রথমটা অবাক হইয়া গেল, তাব পব হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল। ভর্ৎসনাব ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়া বলিল, কোণঠাসা হলে মানুষ এমনই আবোল-তাবোল বলে। ছেলেবেলাযও তুই এ রকম ছিলি মহেন। দোষ করে ধবা পড়লে এমন সব অদ্ভুত কৈফিয়ত দিতিস যে হাসতে হাসতে লোকের দম আটকে যেত। এই জন্যই তো ভালোবাসতাম তোকে। যে মোটর-চাপা পড়ে সে বেঁচে থাকে, আর, যারা চাপা দেয় তারা খুন হয়, না ?

জয়গোপাল হাসিল, হঠাৎ তুই বলা, আর ভালোবাসাব কথা ঘোষণা কবা, এই তিনটি নূতন অস্ত্রে, মহেন্দ্রজিৎ একেবাবে কাবু হইযা গেল। সময়ের কবরে বন্ধুত্বকে পুঁতিয়া ফেলা যায়, কিন্তু সুযোগ পাইয়া সে বন্ধুত্ব ভৌতিক উপদ্রব শুবু কবিলেই মুশকিল। আর কিছু বলাব ছিল না, তবু মহেন্দ্রজিৎ জোর করিয়া বলিল, তোকে বাঁচাতে গিয়েই তো গাড়িটা উলটে গেল। আমরা তো মবেও যেতে পারতাম।

জয়গোপাল গম্ভীবমুখে বলিল, কেন বাঁচাতে গেলি ? একবাব উপোস কবিয়ে মেরে ফেলাব ব্যবস্থা কর্বাব, একবার বাঁচাবার জন্য নিজেব প্রাণ দিতে যাবি, তুই কি খেলা পেয়েছিস না কী আমাব সঙ্গে ? এ রকম ছেলেমানুষি কবতে নেই, বয়স তো হয়েছে। দেখে আসি খুঁজে, ব্যাগটা কোথায় পড়ল।

গাড়িতেই ব্যাগটা পাওয়া গেল। অম্বিকা ডাক্তার ধৈর্য ধবিযা বসিয়া ছিলেন, একদিনেব বদলে একেবারে চাবদিনের ফি পাওযাব আনন্দে তিনি জযগোপালকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, বেঁচে থাকো বাবা। মহেন্দ্রজিৎকে ব্যাগটা ফেরত দিযা জয়গোপাল বলিল, আট টাকা নিযেছি।

তেল-চটচটে বালিশেব নীচে ব্যাগটা গুঁজিয়া দিযা মহেন্দ্রজিৎ বলিল, আমাব কিন্তু দোয ছিল না, ভাই। চাকরি কবাব একটুও ইচ্ছা আমার ছিল না, বাবা জোব কবে নেওযালেন। এত যে রাগ করছিস তুই, তোর যে চাকরিটা হতই, তার কী মানে আছে ?

জয়গোপাল বলিল, হত কি, হয়ে গিয়েছিল। তবে, রাগটাগ আমি করিনি, ভাই। আব কেউ হলে, অবশ্য বাগ হত, কিন্তু তুই হলি আমাব ছেলেবেলার বন্ধু, এই সামান্য কাবণে তোব ওপরে রাগ করব ? জয়গোপাল চৌকির প্রান্তে বসিল। মহেন্দ্রজিতেব হাঁটুটা ভালো করিয়া দেখিয়া বলিল, তোর মনে আছে, মহেন, একদিন দুপুববেলায় স্কুল পালিয়ে দুজনে কাঁচা আম খেতে এসেছিলাম, গাছ থেকে পড়ে তোর হাঁটু ভেঙে গিয়েছিল ?

মহেন্দ্রজিৎ ভ্রু কুঁচকাইয়া বলিল, কবে ?

মনে নেই ? তোর কিছু মনে থাকে না, মহেন। হয়তো এই হাঁটুটাই ভেঙেছিল।

হাঁটু ভাঙিয়া থাকিলে সে কথা মনে না থাকিবার কারণ মহেন্দ্রজিৎ ভাবিযা পায় না। অস্বীকার করাও অসম্ভব। হাঁটু ভাঙিযাছিল কি ভাঙে নাই, তাই লইয়া তর্ক করার জন্য জযগোপাল পুবানো দিনের কথা তোলে নাই। স্কুল পলাইয়া যারা কাঁচা আম খাইতে আমগাছে উঠিত, তাদেব মধ্যে কী নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল, জয়গোপাল শুধু সেই কথাটা মনে করাইয়া দিতে চায়। গাছ হইতে পড়ার কথাটা কল্পনা হইতে পারে, দুজনের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য বন্ধন ছিল, সেটা সত্য।

খাওয়ার ব্যাপারটা সংক্ষেপেই চুকিয়া গেল। ডাল, ভাত আর তরকাবি। দুটি শিশুর জন্য যেটুকু দুধ ছিল বাড়িতে, তাও দুজনকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। ওবেলা দুধ আসে তো আসিবে, না আসিলেও ক্ষতি নাই। এ বাড়ির কচি ছেলেমেয়েরা দু-একদিন বার্লি বা শটি খাইয়া থাকিতে জানে।

শুইয়া শুইয়াই মহেন্দ্রজিৎ ভাত খাইতেছিল, উঠিবার ক্ষমতা ছিল না। একটা সিগাবেট ধরাইয়া সে ভাবিতেছিল বাড়ি ফেরার কথা। গাড়িটা চলিলেও গাড়ি চালানো তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু,

যে ভাবেই হোক যাওয়া চাই। এ বাড়িতে একটা দিনও সে অতিথি হইয়া থাকিতে পারে না। প্রতিমুহূর্তে তার মন যেন বেশি মুষড়াইয়া যাইতেছে, মনের অস্বস্তি বাড়িতেছে।

জয়গোপাল খাইয়া আসিল। যাওয়ার কথা শুনিয়া সে আশ্চর্য ও আহত হইল। অনুযোগ দিয়া বলিল, একটা দিন গরিব বন্ধুর বাড়ি থাকতে তোর কষ্ট হবে ? একটু সুস্থ না হয়ে এ অবস্থায় চলে যাবি ?

মহেন্দ্রজিৎ বলিল, সে জন্য নয়, হাঁটুটার একটা ভালো ব্যবস্থা না করলে---

ডাক্তার সেঁক দিতে বলে গেলেন, মেয়েদের খাওয়া হলেই সেঁক দেবার ব্যবস্থা করে দেব।

এ কথার জবাব নাই। জয়গোপালের ক্ষুব্ধ অনুযোগে মহেন্দ্রজিতের মন যেন আরও মুষড়াইয়া গেল। কোনো এক অজানা জগতের মানুষ যেন জয়গোপাল, আগাগোড়া সে যেন অদ্ভুত দুর্বোধ্য নিয়ম মানিয়া চলিতেছে। অল্প বয়সের প্রীতির সম্পর্ক কি ইস্পাতে তৈরি হয় যে, বছরের পর বছর চলিয়া গেলেও অবিকৃত থাকিয়া যাইবে ? চাকরি কাড়িয়া লওয়ার অভিমানে বন্ধুর মোটরের নীচে জীবন বিসর্জন দিতে গিয়াছিল ভাবিলেই গা ছমছম করে। ডাক্তারের ফি দেওয়ার জন্য নিঃসংকোচে টাকা দাবি করা, কলহ করিতে করিতে 'তুমি'র বদলে 'তুই'-কে স্বাভাবিক করিয়া তোলা, অতীত দিনের কথা বলিতে বলিতে সমস্ত মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া ওঠা আরও কত কী, স্থূল এবং সূক্ষ্ম, স্পষ্ট ইঙ্গিত। গরিব বন্ধু ! গরিব বন্ধুদের চুলোয় পাঠাইয়া তার তো কোনোদিন ভাবনা হয় নাই, মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে থাকে নাই। আজ একদিনে জয়গোপাল একাই কি তার জীবনের এই চিরন্তন রীতি উলটাইয়া দিবে ?

* * * *

ঘরের ঠিক বাহিরে বারান্দায় মেয়েরা খাইতে বসিল। বীণা, কনক আর শোভারাণী। পেটের জ্বালাতেই হোক, আর অম্বিকা ডাক্তার নাকে দেওয়ার জলের সঙ্গে মিশানোর জন্য যে ওষুধটা দিয়া গিয়াছিলেন, তার গুণেই হোক, শোভারাণীর নাকের যন্ত্রণা বোধ হয় কমিয়াছে। কারণ, খাইতে বসিয়া মৃদু একটু খোনা সুরে তাকে বেশ কথাবার্তা বলিতে শোনা গেল। গয়নার কথা উঠিল খুবই সহজে, তার নিজেরই একটা প্রশ্নের সূত্রে।

তোমাদের হাতে শুধু একটি করে চুড়ি কেন, ভাই ?

বীণা ও কনক ভাতের গ্রাস গিলিয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। একটা অতিরিক্ত ঢোক গিলিয়া কথাটার জবাব দিল বীণা।

বেশি গয়না পরতে আমাদের ভালো লাগে না। সব বাক্সে তোলা আছে।

শোভারাণী সায় দিয়া বলিল, আমারও তাই। দেখ না, বাইরে বেরিয়েছি তবুও এই সরু ফিনফিনে হারটি বদলে বিছেহারটি পরে আসিনি। এমন ভারী আমার সেই হারটা ! সোনা আছে সতেরো না আঠারো ভরি। নেকলেসটা গলায় দিতে যদি বা সাধ হয়, সেই হারটা পরতে একটুও ইচ্ছে করে না। কটা বাজছে এখন ? সাড়ে বারোটা হবে, না ? এমন ভুলো মন ভাই আমার, ঘড়িটা হাতে লাগিয়ে আসতে পর্যন্ত ভুলে গেছি !

সোনার ঘড়ি বুঝি ? কনক জিজ্ঞাসা করিল।

হ্যাঁ,—কাঁটা আর দাগগুলোতে কী যেন বলে, তাও মাখানো আছে, অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে। তোমার স্বামী কি করেন ?

স্বামী কিছু করে না বলিয়া হয়তো নয়. নূতন বউ বলিয়াই স্বামীর কথায় কনক বোধ হয় লজ্জা পাইল। বীণা বলিল, দাদা কিছু করে না, চাকরি-বাকরি খুঁজছে। কদিন আগে একটা ভালো চাকরি

হয়েছিল, ছেলেবেলার এক বন্ধু বজ্জাতি করে নিজে চাকরিটা ভাঁওতা দিয়ে নিয়ে নিলে। তোমার নেকলেসে ক ভরি সোনা আছে তা তো বললে না ?

* * * *

ঘরের মধ্যে জয়গোপাল বলিল, একটা সিগারেট দে তো মহেন, দেখি কেমন লাগে টানতে।

সিগারেট ফুরিয়ে গেছে।

তোর তো তা হলে ভারী অসুবিধা হবে। পয়সা দে আনিয়ে দিচ্ছি।

মহেন্দ্রজিতের বিহ্বল দৃষ্টি কড়িকাঠের দৈর্ঘ্য মাপিতেছিল, এ কথার সে জবাব দিল না। তারপর বারান্দায় মেয়েরা না শুনিতে পায় এ রকম নিচু গলায় বলিল, চাকরি করবি জয় ?

করব না ! চাকরি না করলে খাব কী ?

আমার কাছে যাস, বাবার আফিসে ঢুকিয়ে দেব। প্রথমটা মাইনে খুব কম বলে যদি আপত্তি করিস, তা হলে কিন্তু চলবে না। বিপিন বাবু বলে একজন বুড়ো ভদ্রলোককে বছর শেষ হলে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে। সে পোস্টটা আমি তোকে দেওয়াব। বাবা অবশ্য গোলমাল করবেন, কলা দেখাবার চেষ্টা করবেন প্রথমটা, কিন্তু আমি জোর জবরদস্তি করলে—

কোঁচার খুঁটে মুখ মুছিয়া জয়গোপাল সজোরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তার ঘুম আসিতেছিল। বাঁচিয়া থাকাটাই এ জগতে সব চেয়ে পরিশ্রমের কাজ, কাজ না থাকিলে যৌবনেই এমন গভীর শ্রান্তি আসে। পেটে ভাত পড়িলেই চোখে ঘুম আসিয়া প্রমাণ করিয়া দেয়, অকালবার্ধক্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তবে, আজকের মতো দুর্ঘটনা, ঘটনা ও উত্তেজনায় ঠাসা দিনটিতে চোখে তার ঘুম আসা উচিত হয় নাই। মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া জয়গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, কবে যাব তোর কাছে ?

আট-দশদিন পরে যাস, বাবাকে বলে কয়ে রাখব, আমার হাঁটুর ব্যথাটাও কমবে।

জয়গোপাল হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। বীণার শিশু যখন জন্মায়, বাড়িতে কিছু কাঠকয়লা আসিয়াছিল। দু-একদিন এ বাড়ির ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া শিশুটি পলাইয়া গিয়াছে, কাঠকয়লাগুলি আছে। একটা ভাঙা কড়াইয়ে, সেই কয়লার আগুন করিয়া জয়গোপাল নিজেই মহেন্দ্রজিতের হাঁটুতে সেঁক দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। এমন কী, এখনও ব্যবহারযোগ্য পুরানো একটি আলোয়ান ভাঁজ করিয়া সেঁক দেওয়ার কাজে লাগাইতেও তার কিছুমাত্র দ্বিধা জাগিল না। সেঁক দিতে দিতে নিচু গলায় বলিল, আমার আর একটা উপকার করতে হবে ভাই তোকে। ওই যে আমার বোনকে দেখলি, তোর স্ত্রীর নাকে যে জল লাগাচ্ছিল, ওর স্বামীর জন্যও একটা কাজ জুটিয়ে দিতে হবে। পঁচিশ, ত্রিশ টাকার যেমন তেমন একটা কাজ। তুই একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে।

সেঁক দিতে আরম্ভ করা মাত্র মহেন্দ্রজিৎ আরাম বোধ করিতেছিল, মনের অস্বস্তিও তার অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। সে চোখ বুজিয়া বলিল, আচ্ছা, দেখব। কিন্তু, ওর নাকে যে জল দিচ্ছিল, সে কি তোর বোন ?

জয়গোপাল একটু ভাবিয়া বলিল, তুই যখন দেখতে গিয়েছিলি তখন যে দিচ্ছিল, সে নয়। পরে যে দিচ্ছিল সে।

কথাটা বানানো নয়। জয়গোপালের নির্দেশে সত্যসত্যই কনকের বদলে বীণা শোভারাণীর সেবা আরম্ভ করিয়াছিল। সে নিজে যখন মহেন্দ্রজিৎকে লইয়া পড়িয়াছে, স্ত্রীকে তার স্ত্রীর সেবা করিতে দেওয়াটা জয়গোপালের মনে হইয়াছিল বাহুল্য, সেবার অপচয়। তার চেয়ে অনুপস্থিত স্বামীর প্রতিনিধি হিসাবে বীণা কিছু দাবি সৃষ্টি করিয়া রাখিলে হয়তো কাজে লাগিতে পারে।

এটুকু বুঝিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। যে মন এ ভাবে চিন্তা করে, সে মনের যে কী অবস্থা হইয়াছে, ভাবিতে গিয়া মহেন্দ্রজিতের মানসিক অস্বস্তি আবার পূর্বের মতো প্রবল হইয়া উঠিল। এ বাড়ির যে খাদ্য পেটে গিয়াছিল, আবার যেন সে তার তিক্ত স্বাদটা অনুভব করিতে লাগিল। কড়াইয়ে কাঠকয়লা পুড়িবার গন্ধে বাতাস এত ভারী হইয়া উঠিয়াছে যে, টানিয়া টানিয়া শ্বাস গ্রহণ না করিলে দম যেন আটকাইয়া যাইবে। জয়গোপালের মনের অবস্থা যে রকমই হইয়া থাক, অন্য কোনো রকম হওয়া যে সম্ভব ছিল না, নিজেব অসমাপ্ত বিকৃত অনুভূতিগুলি যেন তার অকাট্য প্রমাণের মতো মহেন্দ্রজিৎকে অতিরিক্ত নির্মমতার সঙ্গে পীড়ন করিতে থাকে। কয়েকঘণ্টার মধ্যে এ বাড়ির আবহাওয়া তাকে যদি এমন করিয়া দিতে পাবে, দিনের পর দিন এখানে বাস করিতে কবিতে জয়গোপালের আরও বেশি খাপছাড়া হওযা উচিত ছিল। কিন্তু, মিনিটে মিনিটে তার জয়গোপাল নব নব যন্ত্রণা আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছে কেন ? সে তো স্বীকার করিয়াছে, ওদের চাকরি করিযা দিবে।

মহেন্দ্রজিৎ চোখ মেলিল। কোণঠাসা অসহায় শত্রুর চরম অস্ত্র প্রয়োগ কবার মতো অস্বাভাবিক জোর দিয়া বলিল, বুঝলি জয়, যেমন করে পারি তোর আর তোর বোনের স্বামীর চাকরি আমি করে দেবই। যদি না দিই—

বারান্দায় শোভারাণী বীণাকে বলিতেছিল, আজ সারাদিন বেড়িয়ে কাল সকালে আমরা মোটরেই বর্ধমান চলে যেতাম। কে জানত এমন কাণ্ড হবে ! তবু প্রাণে যে বেঁচে গেছি তাও আমাদের ভাগ্যি !

মাথার রহস্য

শেষ বয়সে একসঙ্গে থোক দুই হাজার টাকা হারানোর পর পতিতপাবনের মাথাটা একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল।

বেচারি গরিব মানুষ। সারাজীবন সামান্য মাহিনায় চাকরি করিয়া অতিকষ্টে ছেলেদের মানুষ করিয়াছে, ধারকর্জ করিয়া স্ত্রীর গহনা বেচিয়া মেয়ে দুটির বিবাহ দিয়াছে, জীবনে একটিবারের জন্যও কোনোদিন দুই হাজাব টাকা নিজের বলিয়া দাবি করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। পেনশন নেওয়ার পর মাসে মাসে সাঁইত্রিশ টাকা পেনশন আর জীবনবিমার ওই দুই হাজার টাকা ছাড়া পতিতপাবনের আর কিছুই ছিল না। টাকা তো নয়, গায়ের রক্তের চেয়েও বেশি। কলিকাতা শহরের ভোজবাজিতে এক মিনিটের মধ্যেই সেই টাকাটা যে কোথায় উড়িয়া গেল !

ব্যাপারটা যে কী হইযাছিল বাড়িব লোকে ঠিক জানে না। নন্দিগ্রামে পতিতপাবনের বাড়ি। পাওনা টাকাটা আদায় করিয়া ব্যাঙ্কে জমা দিয়া আসিবার জন্য সে কলিকাতায় গিয়াছিল। তিনদিন পরে সে গম্ভীবমুখে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। জীবনযুদ্ধে হাসিখুশি ভাবটা পতিতপাবনের অনেকদিন উবিয়া গিয়াছে, তবু সাধারণত সে এ বকম খাপছাড়া গাম্ভীর্যের ধাব ধারে না। চোখের চাউনিও যেন একটু কেমন কেমন।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, টাকা পেলে ?

পেয়েছি।

কোন ব্যাঙ্কে জমা দিলে ? সরকারি ব্যাঙ্কে তো ?

পতিতপাবন আশ্চর্য হইয়া বলিল, ব্যাঙ্কে জমা দেব কেন ? আমি কি সে রকম হাবা না কী ? পুঁতে বেখেছি।

পুঁতে বেখেছ ! কোথায় পুঁতে রেখেছ ?

তা দিয়ে তোমার কী দরকার ? যেখানে হোক রেখেছি।

তারপর ধীরে ধীরে মোটামুটি ব্যাপারটা বোঝা গেল। টাকাটা পতিতপাবন যথারীতি আদায় করিয়াছিলেন, তারপর কী যেন হইয়াছে। টাকাটা হয় কোথাও পড়িয়া গিয়াছে, নয় কেউ পকেট মারিয়াছে, নয় ভাঁওতা দিয়া বাগাইয়া লইয়াছে, নয় অন্যভাবে গিয়াছে চুরি।

বাড়ি ফিরিবার পরদিন পতিতপাবনের মাথাটা কিছুক্ষণের জন্য একটু সাফ হইয়া আসিয়াছিল, সেই সময়ে তার কথাবার্তা হইতে এই পর্যন্ত অনুমান করা গিয়াছে।

বড়ো ছেলে মাধব যা করার ছিল করিয়া দেখিল। বাপকে জেরা করিল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, যে টিনের সুটকেস সঙ্গে লইয়া পতিতপাবন কলিকাতায় গিয়াছিল তন্নতন্ন করিয়া সেটি খোঁজাখুঁজি করিল, কলিকাতা গিয়া এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিল, তারপর বাড়ি ফিরিয়া বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, ও টাকা গেছে মা।

অন্নপূর্ণা কাঁদিতে লাগিল, কী অদেষ্ট করেই জন্মেছিলাম আমি। টাকাকে টাকা গেল, এদিকে আবার কী সর্বনাশ হল দ্যাখ ! হ্যাঁ রে মাধু, টাকার শোকে মানুষ কি সত্যি পাগল হয়ে যায় ? আস্তে আস্তে কমে যাবে তো ?

মাধব মুখ খিঁচাইয়া বলিল, যাবে না ? ও তো বাবার ঢং। টাকাগুলো বিসর্জন দিয়ে এসে কী আর করেন, মাথাখারাপ হওয়ার ভান করছেন।

অন্নপূর্ণা আরও বেশি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তোরও মাথা খারাপ হয়েছে মাধু, নইলে ওঁর নামে তুই অমন কথা বলিস ? ঢং করবার মানুষ উনি ?

মাধব মুখ ভার করিয়া বলিল, আমি এবার কাগজ বার করব কী দিয়ে ? কত বললাম, বাবা আমি সঙ্গে যাই, অতগুলি টাকা একা তুমি সামলাতে পারবে না, তখন সে কথা কানে তোলা হল না। এবার ? এবার কী করব আমি ? কাগজের জন্য কার কাছে গিয়ে হাত পাতব ?

এদিকে এমন সর্বনাশ হয়ে গেল, আর কাগজের ভাবনাটাই তোর কাছে বড়ো হল মাধু ?

হবে না ? জান, এ সময় আমার মনের মতো একটা মাসিক বার করতে পারলে এক বছরে বড়োলোক হয়ে যেতাম ? এবার অন্য লোকে মেরে নেবে।

দু হাজারের মধ্যে পাঁচশো টাকা মাধবকে দেওয়ার কথা ছিল, সেই শোকেই তাকে বিশেষ রকম কাবু হইয়া পড়িতে দেখা গেল। আর, স্বামীর রকম-সকম দেখিয়া অন্নপূর্ণার যত বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল, অবিবাহিতা কন্যা পুঁচকির দিকে চাহিয়া তত উথলিয়া উঠিতে লাগিল টাকার শোক।

পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করে, কাঁদছ কেন ?

অন্নপূর্ণা বলে, ওগো আমাদের পুঁচকির বিয়ে দেব কী করে ?

পতিতপাবন আশ্চর্য হইয়া বলে, পুঁচকির বিয়ে ? সেদিন না পুঁচকির বিয়ে দিলাম ? আবার বিয়ে কীসের।

মাধবের বউ শাশুড়ির দেখাদেখি এতক্ষণ যে চোখ মুছিতেছিল, এবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া মুখে আঁচল চাপা দেয়। বেকারের বউ, কিন্তু সংসারের ভাবনাচিন্তা না থাকায় আর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু না থাকায় সংসারে হাসিকান্নার স্রোতেই গা এলাইয়া ভাসিয়া বেড়ায়। তবে একটা আশ্চর্যের বিষয় এই, পরের দেখাদেখি সে কাঁদে বটে, হাসির কথায় হাসে কিন্তু নিজে নিজেই।

পতিতপাবন হাঁকিতে আরম্ভ করে, পুঁচকি ! পুঁচকি !

পিছন হইতে সামনে আসিয়া পুঁচকি বলে, কী বাবা ?

তুই কেমন মেয়ে রে পুঁচকি ? দুবছর আগে অত খরচপত্র করে তোর বিয়ে দিলাম, আবার তোর বিয়ে কীসের ? ইয়ার্কি পেয়েছিস নাকি ?

ঠাহর করিয়া দেখিয়া পতিতপাবন রাগিয়া আগুন হইয়া যায়।

সিন্দুর দিসনে যে তুই ? কেন দিসনি হারামজাদি ? আর একবার আমার দফা নিকেশ করবার মতলব করেছ, না ? একবারে সাধ মেটেনি।

মেজোছেলে যাদব অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, সে চোখের ইশারা করিতে হতভম্ব পুঁচকি পলাইয়া যায়। পতিতপাবন নিজের মনে বিড়বিড় করিয়া বকিতে থাকে যে, সে আর পারিয়া উঠিল না, এত কষ্টে যদি বা হাজার দুই টাকা জোগাড় করিয়াছে, সকলের নজর ওই টাকাটার উপরে ওটা যতক্ষণ না শেষ করিতে পারিতেছে, কারও আর স্বস্তি নাই।

যাদব বলে, তোমার টাকা কোথায় পোঁতা আছে আমরা কেউ তো তা জানিও না, বাবা ?

জানবার জন্যে মতলব তো বাগাচ্ছ হাজার রকমের।

তাই বা কেন বাগাব ? টাকা দিয়ে আমাদের কী দরকার ? তোমার টাকা যেখানে আছে সেখানে থাক।

মাথার ভিতরে যার গোল বাধিয়া গিয়াছে, কে তাকে বুঝাইবে ? এ বাড়িতে সকলের চেয়ে মাথাটা বেশি পরিষ্কার যাদবের। সংসারে মানুষের কাণ্ডকারখানাগুলি সে যেমন বুঝিতে পারে, বুঝাইতেও পারে তেমনি। জোরালো একটি ব্যক্তিত্ব থাকার জন্য তার কথাগুলি লোকে বুঝিতেও চায়। কিন্তু বাপকে বুঝাইতে গিয়া সেও হার মানিয়া যায়। তার বিকৃত মাথাটা কিছুতেই ছেলের ভালো মাথাটার এ ভাব স্বীকার করিতে চায় না। এক একটা সূত্র ধরিয়া এক একদিকে নিজের বিকৃত কল্পনার রথটি চালাইতে থাকে।

তার সমস্ত বিকারের ভিত্তি ওই দুহাজার টাকা !

কোন চুলায় গিয়াছে সে টাকা ভগবান জানেন, দিবারাত্রি তার মনের মধ্যে ওই টাকার চিন্তা পাক খাইয়া বেড়ায়। কখনও নিজের মনে ভাবে, কখনও ভাবনাগুলি শোনাইয়া বেড়ায় দশজনকে। অন্য লোকে নিজেদের মধ্যে যখন যে বিষয়েই আলোচনা করুক পতিতপাবন সে আলোচনায় যোগ দিলে দুহাজার টাকার কথা টানিয়া আনে—যে টাকাটা সে পুঁতিয়া রাখিয়াছে, আর যে টাকাটার দিকে পৃথিবীসুদ্ধ সকলের লোভ, আর যে টাকাটা দিয়া সে একদিন এই করিবে, ওই করিবে, তাই করিবে।

টাকাটা যদি কোথাও পড়িয়া গিয়া থাকে, আর এমন কেহ যদি পাইয়া থাকে যে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া দুহাজার টাকার লোভও সামলাতে পারে, এই আশায় কয়েকটা কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। কেমন করিয়া একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়িয়া যাওয়ায় পতিতপাবন চটিয়াই লাল। মাধবকে ডাকিয়া বলিল, কে দিয়েছে বিজ্ঞাপন, তুই ?

হ্যাঁ। ভাবলাম, যদি কেউ কুড়িয়ে পেয়ে থাকে—

কুড়িয়ে পেয়ে থাকে ! তোর কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে না কি রে, অ্যাঁ ? বলছি পুঁতে রেখেছি, কুড়িয়ে পাবে কী করে ?

পুঁতে রেখেছ তো বুঝলাম—

বুঝলাম, কী বুঝলাম ? বল পাজি বুঝলাম মানে কী, তোকে বলতে হবে।

পুঁতে যদি রেখে থাক, দেখাও দিকি কোথায় পুঁতে রেখেছ ? একবারটি শুধু দেখাও, তারপর তোমার যেখানে খুশি রেখে দিয়ো টুঁ শব্দটি করব না। খালি মুখে বললেই তো হবে না পুঁতে রেখেছি !

রাগে পতিতপাবনের মুখের চামড়া কুঁচকাইয়া গেল। সে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, তুই শয়তানের একশেষ মাধু, বজ্জাতের একশেষ। ভেবেছিস এমনি ফিকির করে টাকার খোঁজটা জেনে নিবি, বটে ? বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দে মাধু ভালো চাস তো, আর শোন বলি তোকে, খবরদার আমার টাকার কথা তুই মুখে আনবি না। আমার টাকা, আমি যা খুশি করব, তোর কী ?

যাদবও ভাবিয়া চিন্তিয়া টাকার সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিতে বাড়ির লোককে বারণ করিয়া দিল। মিছামিছি পতিতপাবনকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়া লাভ কী ? ক্ষতি যা হওয়ার তা হইয়াছে, আর তা ফিরিবে না। টাকাটা যে কোথাও পোঁতা আছে, এ ভুল ভাঙিয়া গেলে বরং পতিতপাবনের মাথা আরও বিগড়াইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। তার চেয়ে তার এই ভুল ধারণাতে সায় দিয়া চলাই সকলের উচিত, হয়তো ধীরে ধীরে একদিন সে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে।

অন্য ছুতায় অন্য পরিচয়ে বাড়িতে আসিয়া একজন ডাক্তার একদিন পতিতপাবনের ব্যাপারখানা দেখিয়া গেলেন। বলিলেন যে, হঠাৎ মনে আঘাত লাগিয়া যে পাগলামি আসে, সেটা সাধারণত স্থায়ী হয় না, আস্তে আস্তে চলিয়া যায়। এমনও অনেক দেখা গিয়াছে যে, একবার একটা আঘাতে হঠাৎ যে বদ্ধ পাগল হইয়া গিয়াছে, আর একবার অন্য একটা আঘাতে তেমনই হঠাৎ সে হইয়া উঠিয়াছে সুস্থ। যাদব বুঝি সেই পাগলের গল্প জানে না ? সিঁড়িতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া মাথা ফাটিয়া যে অজ্ঞান হইয়া ছিল তিনদিন, তারপর যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ ? বড়ো আশ্চর্য জিনিস মানুষের মাথাটা, বড়ো খাপছাড়া, বড়ো রহস্যময়। কীসে যে কখন কী হয়, কারও তা বলার ক্ষমতা নাই।

ডাক্তারির পর একটু কবিরাজি চিকিৎসা হইল। কখনও একটু ভালো মনে হইল পতিতপাবনকে, কখনও মনে হইল পাগলামি যেন বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু, বিশেষ কিছু উন্নতি কোনো চিকিৎসাতেই দেখা গেল না। বাড়ির সকলের মন খারাপ হইয়া রহিল এবং উপদেশ ও পরামর্শ দিবার মস্ত একটা বিষয়বস্তু জুটিয়া গেল পাড়ার লোকের। পূজা, মানত ও মাদুলির মধ্যে পূজা আর মানতগুলিই

দেখা গেল সম্ভব, পতিতপাবনকে মাদুলি ধারণ করানোর কোনো উপায় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কে তাকে বলিবে যে, তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে, এই মাদুলিটা ধারণ করো, সারিয়া যাইবে ?

ভয়ানক কিছু করিবার ঝোঁকও পতিতপাবনের আসে না, কতকগুলি বিষয়ে মাথাটাও সে মোটামুটি ঠিক রাখিয়া চলে,—এই যা একটা ভরসার কথা। অন্য পাগলের মতো বাঁধিয়া রাখিতে হইলেই হইয়াছিল ! প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে নিয়মমতো পেনশনটাও সে লইয়া আসে, সময়মতো স্নানাহার করে, সংসারের স্বাভাবিক গতিতে এমন বাধা জন্মায় না, যে জন্য সকলকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হয়। রাত্রে যদি না ঘুমায়, অন্য কারও ঘুমের সে ব্যাঘাত করে না, বিড়বিড় যখন যা বকে, এত আস্তে জড়াইয়া জড়াইয়া কথাগুলি বলে যে সাধ করিয়া কান পাতিয়া না শুনিলে কারোর শুনিবার দরকার হয় না। দাড়িগোঁফে পতিতপাবনের মুখখানা একরকম ঢাকিয়া গিয়াছে, তার চোখের দিকে চাহিলে কিন্তু একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। কেমন একটা জটিল দুর্বোধ্য রহস্য তাহার দুটি চোখে একটা অস্বাভাবিক বিচ্ছিন্ন জ্যোতির মতো ঘনাইয়া আসিযাছে ; শিশুর চোখে যেন ফুটিয়া আছে শ্মশানচারী কাপালিকের দৃষ্টি।

পাগলামি পাগলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। পতিতপাবনের পাগলামি এমন বেমানান মনে হয় ! এ অস্বাভাবিকতা যেন তার পক্ষে একান্ত অস্বাভাবিক, অনুচিত কিছু।

যাদব বলে, বাবা ভালো হয়ে যাবে, মা।

আমার যেমন অদেষ্ট !

সত্যি ভালো হয়ে যাবে। আমি একটা বুদ্ধি করেছি। কোনো রকমে আমি যদি দুই হাজার টাকা জোগাড় করতে পারতাম !

মাধব একটা পঞ্চাশ টাকার চাকরি যোগাড় করিতে পারিল বটে, যাদবের পক্ষে দু হাজার টাকা জোগাড় করার কোনো ভরসাই দেখা গেল না। মাধবের চাকরি হওয়ায় ভাবিয়া চিন্তিয়া যাদব আর পড়া ছাড়িল না, কলিকাতায় এক কাকার অমত সত্ত্বেও তার বাসায় উঠিয়া কলেজের কাটা নামটা জোড়া লাগাইয়া ভয়ংকর পড়া আরম্ভ করিয়া দিল।

পড়িয়া পড়িয়া মরিয়া গেলেও টাকা হয় না যাদব তা জানে, কিন্তু কী আর করা যায়, আর কোনো পথের সন্ধান.তো সে রাখে না। কাকার বাড়ি ফাইফরমাস খাটিতে বলিলে যাদব খাটে না, গালাগালি দিলে শোনে না, খাইতে না ডাকিলে নিজে পাত পাড়িয়া বসিয়া খায় আর সপ্তাহে দু সের ওজন কমানোর মতো পড়ে। এমন অসাধারণ ভালো একটি ছেলে বাড়িতে থাকিলে যদি বাড়ির পাঠবিমুখ আড্ডাধারী ছেলে দুটির কিছু ভালো হয়, এই আশায় কাকার বাড়ির সকলে শেষে যাদবের অপরাধগুলি ক্ষমা করিয়া ফেলে। এমন কী, কাকিমা একদিন মুখখানা হাসি হাসি করিয়া পর্যন্ত বলে, আচ্ছা বাবা তুই পড়, তোকে আর বাজারে যেতে হবে না।

ধরাবাঁধা একটা নিয়মই আছে যে, পড়িতে পড়িতে যে যত রোগা হইতে পারিবে, সে তত ভালোভাবে পাশ করিবে। সুতরাং যাদবের পরীক্ষার ফলটা হয় চমৎকার।

গ্র্যাজুয়েটত্ব অর্জন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখাইয়া যাদব পণপ্রথার বিরুদ্ধে যত আন্দোলন উঠিয়াছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ভালো মেয়ে যদি পাওয়া যায় তো ভালোই, যদি না পাওয়া যায় তাতেও ক্ষতি নাই—আর সমস্ত তার গন্ডায় গন্ডায় বুঝিয়া পাওয়া চাই, আর চাই নগদ টাকা থোক দু হাজার।

এক হাজার নশো নিরানব্বই হইলেও চলিবে না, পুরোপুরি দু হাজার।

যাদবের ভাবসাব দেখিলেও যেন কেমন কেমন লাগে। যেমন চেহারা ছিল, স্বভাব ছিল, সে রকম চেহারাও নাই, স্বভাবও নাই। আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে। শান্তশিষ্ট ধীর প্রকৃতির ছেলেটার মধ্যে কেমন যেন একটা চাঞ্চল্য আসিয়াছে শেঝা যায়, জীবনটা যার কাছে এতদিন ছিল সহজ ও

সাধারণ, হঠাৎ তার যেন জীবন সম্বন্ধে গুরুতর একটা নেশা জন্মিয়া গিয়াছে, সহজ বুদ্ধিবিবেচনার মধ্যে মাথা তুলিয়াছে জোরালো ভাবপ্রবণতা।

মাধব বলে, তুই বড়ো বেহায়া, যদু ! নিজের বিয়ের সম্বন্ধে এমন কবে—

যাদব বলে, তুমি বোঝ না, দাদা ! বিয়ের জন্য বিয়ে করছি না কি আমি ? টাকার জন্য।

টাকার জন্য বিবাহ করিলে নিজের বিবাহ সম্বন্ধে যত দূর খুশি নির্লজ্জ হওয়া যায় এই রকম একটা ধারণা যাদবের মনে আছে। সে তাই মহোৎসাহে নিজের বিবাহের কথা আলোচনা করে, দেনাপাওনার ফর্দ দাখিল করে। ফর্দ দেখিলেই বোঝা যায়, হাজার চারের কমে মেয়ের বাপের আর রেহাই নাই।

তা হোক। বাড়ি-ঘর না থাক, বাড়ির অবস্থা ভালো না হোক, ছেলের বাপের মাথার ব্যারাম থাক, পরীক্ষা পাশ করিতে তো ছেলে অসাধারণ পটু। ঘটক একেবারে পাঁচ হাজার টাকাব এক বলি আনিয়া হাজির করে। ভদ্রলোক নগদ দিতে রাজি থাকেন তিন হাজার, ঘটকের তিনশো বাদ দিলে যাহা হইতে বাকি থাকিবে দু হাজাব সাতশো।

যাদব বলে. ঠিক, এই তো চাই।

ছেলের বিবাহেও যে টাকা খরচ হয় এটা এতদিন ঃ খেয়াল হয় নাই কেন ভাবিয়া সে আশ্চর্য হইয়া যায়। এই বেশ হইয়াছে। সাতশো টাকা যা বেশি পাওয়া গেল সেই টাকার মধ্যেই বউভাত ইত্যাদির খরচ মিটিয়া যাইবে, হাতে থাকিবে পুরোপুরি দু হাজার। কেবল দু হাজার নগদ নিলে যে কাজেব জন্য এত কাণ্ড করা সেই কাজটাই যে তার হইত না, দু হাজারেব কত খরচ হইয়া যাইত কে জানে !

যথাবীতি বিবাহ হইয়া গেল। বউ অবশ্য সুবিধাব হইল না, সবদিকে সুবিধা হয়ও না। রং একটু কালো, বউযেব দেহ একটু স্থূল, মুখখানা একটু চ্যাপ্টা, আর বাঁ চোখটা এত ছোটো যে, এ চোখে তাব দৃষ্টি নাই। নামটা পর্যন্ত ভালো নয় বউয়ের। কালিদাসী।

যাদব আগেই মেয়ে দেখিযাছিল, তবু বিবাহের রাত্রে চোখে পলক ফেলিতে তার যেন একটু একটু কষ্ট হইতে লাগিল। উপবাস আর অনিদ্রায় যে রকম হয় তাব চেয়ে অন্যরকম কষ্ট।

তোমাব ঘুম পেযেছে ?

বউ মাথা নাড়িল।

তোমার গালে কাটা দাগটা কীসের ?

ফোঁড়া হয়েছিল।

বোঝা গেল, মেয়ে দেখার সময় যেমন মনে হইয়াছিল বউয়ের গলা তাব চেযেও কর্কশ। অতিবিক্ত লজ্জার ভেজালটা উপিয়া গেলে ও গলার স্বর কেমন শোনাইবে কে জানে !

একটা নিশ্বাস ফেলিতে গিয়া নিশ্বাসটা যাদব চাপিয়া গেল, কিন্তু প্রকাণ্ড হাইটাকে কোনোমতে দমন করা গেল না।

বউভাতের হাঙ্গামা চুকিয়া যাওয়ার পরদিন সকালবেলা পতিতপাবন বাড়িব সামনে দাওয়ায় বসিযা গম্ভীরমুখে তামাক টানিতেছিল। বাড়িতে বিবাহের গন্ডগোল শুরু হওয়ার পর হইতে সে কেমন চুপচাপ হইয়া আসিয়াছিল, কেমন একপ্রকার বিস্মিত দৃষ্টিতে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সকলের চলাফেরা হইচই লক্ষ করিয়া দেখিতেছিল। কাল সারাদিন সে যেখানে ভোজ রান্না হইতেছিল, সেইখানে একখানা পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া কাটাইয়া দিয়াছে, সন্ধ্যার পর হইতে বারান্দার এককোণে একটা টুলে ঠায় বসিয়া থাকিয়াছে অনেক রাত অবধি। বাড়ির লোক অথবা নিমন্ত্রিতেরা কেহ কথা কহিলে কথার জবাবও দেয় নাই।

আজ সকালে অনেক দেরিতে উঠিয়া নীরবে প্রাতঃকৃত্য সারিয়া চা-জলখাবার খাইয়া বাহিরে আসিয়া বসিয়াছে। চা সে কোনোদিন খায় না, আজ চাহিয়া খাইয়াছে। সকলে একটু অবাক হইয়া ভাবিয়াছে যে, না জানি এ আবার তার কোন নূতন ধরনের পাগলামির পরিচয় !

তামাক টানিতে টানিতে সে কী ভাবিতেছিল সেই জানে, পুঁচকি আসিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলিল, বাবা ! বাবা ! শিগগির এসো, দেখে যাও কী কাণ্ড হয়েছে।

কী হয়েছে রে, পুঁচকি ?

হুঁকা রাখিয়া ব্যস্তভাবে পতিতপাবন উঠিয়া দাঁড়াইল। পুঁচকির সঙ্গে উঠানে আসিয়া দেখিতে পাইল, উঠানের এককোণে যাদব শাবল দিয়া মাটি খুঁড়িতেছে, আর চারিদিকে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া সকলে তাই-চাহিয়া দেখিতেছে, কাছে গিয়া পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করিল, কী হয়েছে রে, যদু ?

যাদব বলিল, বাবা, তোমার সেই দু হাজার টাকা খুঁজে পেয়েছি। বাঁশ পুঁতবে বলে কানাই এখানে গর্ত খুঁড়ছিল, হঠাৎ কীসে যেন শাবল লেগে শব্দ হল, টং—

বলিতে বলিতে গর্তের ভিতরে হাত ঢুকাইয়া যাদব একটা বড়ো কাঁসার ঘটি বাহির করিয়া আনিল। ঘটির মুখ শিলমোহর করা।

এর মধ্যে তোমার সেই দু হাজার টাকা রেখেছিলে তো ?

পতিতপাবন খানিকটা হতভম্বের মতো বলিল, আমার সেই দু হাজার টাকা ?

এর মুখের দিকে তাকায় পতিতপাবন, ওর মুখের দিকে তাকায়, ভ্রু কুঁচকাইয়া কী যেন ভাবিবার চেষ্টা করে।

আমার সে টাকা এখানে কোত্থেকে আসবে ? সে টাকা তো ব্যাঙ্কে জমা দেবার সময় চুরি গিয়াছে ?

সকালে স্তম্ভিত বিস্ময়ে পতিতপাবনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যাদব শুষ্কমুখে বলিল, তুমি যে বল টাকা পুঁতে রেখেছ ?

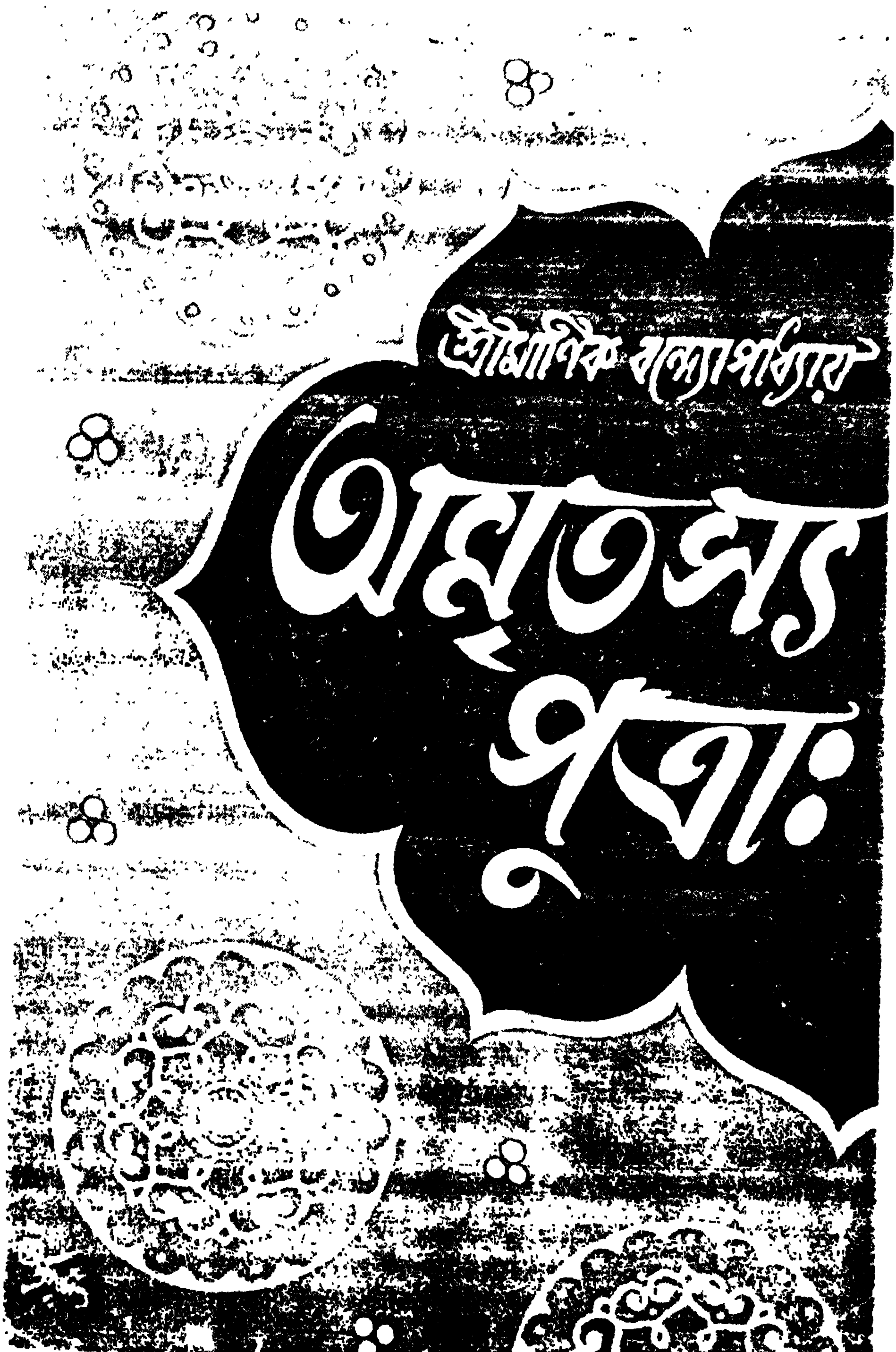
পতিতপাবনের কুঁচকানো ভ্রু আরও বেশি কুঁচকাইয়া গেল। সে চিন্তিতভাবে বলিল, বলি না কি ? আমারও ওইরকম একটা কথা মনে হচ্ছিল। মাথাটা আমার যেন একটু কেমন কেমন লাগছিল কদিন থেকে, আমার অসুখবিসুখ কিছু করেছিল না কি রে ?

যাদব উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেখান হইতে সোজা দেখা যায়, নূতন বউ মস্ত দেহখানি লইয়া কৌতূহলভরে ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মোটা মোটা আঙুল দিয়া ঘোমটা ফাঁক করিয়া উঠানের ব্যাপারটা চাহিয়া দেখিতেছে।

যাদবের চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি একবার চারিদিক ঘুরিয়া আসিতে দুচোখ তার হইয়া উঠিল জবাফুলের মতো টকটকে লাল। বাপের মুখের দিকে কটকট করিয়া তাকাইয়া দাঁতে দাঁত ঘষিয়া সে বলিল, অসুখ ? তোমার মতো লোকের আবার অসুখ হয় ? সব তোমার ঢং।

অন্য ছুতায় অন্য পরিচয়ে বাড়িতে আসিয়া সেই ডাক্তার একদিন যাদবের ব্যাপারখানা দেখিয়া গেলেন। বলিলেন যে, হঠাৎ মনে আঘাত লাগিয়া যে পাগলামি আসে সেটা সাধারণত স্থায়ী হয় না, আস্তে আস্তে কমিয়া যায়। এমনও অনেক দেখা গিয়াছে যে, একবার একটা আঘাতে হঠাৎ যে বদ্ধ পাগল হইয়া গিয়াছে, আর একবার অন্য একটা আঘাতে তেমনি হঠাৎ সে হইয়া উঠিয়াছে সুস্থ ! পতিতপাবন বুঝি সেই পাগলের গল্প জানে না ? সিঁড়িতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া মাথা ফাটিয়া যে অজ্ঞান হইয়াছিল তিনদিন, তারপর যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ ? বড়ো আশ্চর্য জিনিস মানুষের মাথাটা, বড়ো খাপছাড়া, বড়ো রহস্যময়। কীসে যে কখন কী হয় কারও তা বলার ক্ষমতা নাই।

অমৃতস্য পুত্রাঃ



অমৃতস্য পুত্রাঃ প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

এক

জনপূর্ণ পৃথিবীতে জনতাই স্বাভাবিক। মানুষের মধ্যে সমাজ-গঠনের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও অনেকগুলি মানুষ মিলিয়া একসঙ্গে জমাট বাঁধিবার আর নিশ্বাস, গায়ের গন্ধ, সংক্রামক রোগ, কড়া কথা, এই সব আদানপ্রদান করিবার সাধ মানুষের কেন থাকিবে, সে কথাটা যারা ঘরের কোনায় বসিয়া ছাপানো কাগজের পাতা হইতে দু চোখ দিয়া জ্ঞান শুষিয়া শুষিয়া হয় মানবতত্ত্ববিদ্, তাদের বিবেচ্য। পিঁপড়াও ভিড় জমায়, কেবল গুড়ের চারিদিকে নয়, সকলে মিলিয়া সকলের চেষ্টায় যাতে সকলে বাঁচিতে পারে, সেই জন্য। পাখা ওঠার পর একা একা পাখায় ভর দিয়া পিঁপড়া তাই স্বর্গে যায়।

যেখানে যত বেশি মানুষ যত বেশি জমাট বাঁধে আর প্রত্যেক দিন যত বেশি উপলক্ষে যত বেশি জনতা হইয়া আসে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ, সেখানটা তত বড়ো শহর। স্কুল কলেজে ক্লাস বসে রোজ, দশটায় খোলে আপিস, সভাসমিতির অধিবেশন হয় হরদম, খেলার মাঠে দশ বিশ পঁচিশ রকমের খেলা বাদ যায় না একদিনও, প্রত্যেকটি সিনেমায় প্রত্যেক দিন একটি প্রবেশপত্র কিনিতে চায় দশজনে, রেস্তরাঁয় চা চপ খায় সকলে, কাফে-ডি-অমুকে দু-একটা ভঙ্গুর বোতলের অবাস্তবতার স্বর্গে উঠিয়া প্যাডোচ্চ-মধ্যা সমতল-বক্ষা উর্বশীর সঙ্গে নাচে অনেকেই, বাজারে চলিতে থাকে আলু-পটল বিক্রি, দাওয়ায় বা বাহিরের ঘরে চলিতে থাকে আড্ডা, অন্তঃপুরে একটা মানুষের দশভাগের একভাগ থাকিতে পারে যে স্থানটুকুতে সেখানে বাস করে দশজন—

দশজনের একজনও পুরা মানুষ নয়, তাই রক্ষা।

হয়তো মানুষ নয়।

অনুপম আর শঙ্কর দুজনেই কলেজ যাইতেছিল। অনুপম যাইতেছিল বাসে আর শঙ্কর যাইতেছিল বাড়ির মোটরে। একটা প্রকৃত ও প্রকাণ্ড চৌমাথায়, চারিদিকের চারটি পথবাহী গাড়িঘোড়া ও মানুষের দ্রুতগতির মধ্যেই যেখানে প্রগতির লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, আর যেখানে কাগজ ফেরিওয়ালাদের বগলে দু-চার পয়সা দামের সংবাদরূপী বিশ্বকে কিনিতে পাওয়া যায় দু-চার পয়সা দাম দিয়া, সেই চৌমাথায় লাল আলোর ইঙ্গিতে বাস আর মোটরটি পাশাপাশি থামিয়া গেল।

প্রকাণ্ড দোতলা বাস, বসিবার আসনগুলি বাদ দিলে একটি পরিবারের চমৎকার বাসগৃহ হইতে পারে। অনুপম কোণে বসে নাই, নীচের তলায় মাঝখানের একটি আসনে কোণঠাসা অবস্থায় জানালা দিয়া চাহিয়াছিল পথের দিকে। মোটরটির পিছনের সিটে ট্রাউজার-ঢাকা দুই হাঁটুর উপর কনুই আর কামানো গালে হাতের তালু রাখিয়া বসিয়া ছিল শঙ্কর আর তার পাশে বসিয়াছিলেন তার সাড়ে তিয়াত্তর বছরের ঠাকুরদাদা বীরেশ্বর।

কয়েক হাত তফাতে বাসের জানালায় অনুপমের মুখখানি দেখিয়া ঠাকুরদাদা বীরেশ্বর চিনিতে পারিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, অনুপম না ? ও অনুপম !

চোখাচোখি হইয়াছিল কয়েক সেকেন্ড আগেই। বাসের জনতায় অজ্ঞাতবাসী অনুপম মানুষ চেনার ব্যাপারে একটু কাঁচা, এতগুলি মানুষের মধ্যে এতক্ষণ সে যে নিজেকে স্বতন্ত্র, একা, অসহায় আর ছেলেমানুষ বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে চেনা জগতের কাছে অজ্ঞাতবাসীর নিজেকে অচেনা করিয়া রাখার মতো, নিজের মনের সুপরিচিত অংশটুকুর কাছে নিজেকে অপরিচিত করিয়া তুলিতেছিল,

বছর তিনেক আগে দেখা একজন বুড়োকে এতকাল পরে চোখে দেখামাত্র মনে পড়ার মানসিক প্রক্রিয়াটিকে সে ভাবনা একটুও প্রশ্রয় দেয় না।

অনুপম বলিল, আপনি কে ?

বীরেশ্বর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, আগে নেমে আয়, তারপর বলছি আমি কে। নাম, নাম, শিগগির নাম।

জীবনে আর কখনও তো এমন ঘটনা ঘটে নাই। এমন দামি মোটরের আরোহী, ধূসর রঙের দামি কাপড়ে তৈরি চাপকানের মতো লম্বা এ রকম কোট গায়ে সাদা গোঁফদাড়িতে এ রকম ঋষির মতো মুখওয়ালা, এমন সম্ভ্রান্ত চেহারার বৃদ্ধ জীবনে আর কবে অনুপমকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বাস হইতে নামিতে বলিয়াছে ? যানবাহনের গতি-নিযামক যন্ত্রেব লাল আলো এতক্ষণে নীল রঙে পরিবর্তিত হইয়া যাওয়ায় বাস চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অনুপম নামিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিল। মানুষ ঠেলিয়া বাস হইতে নামিবার অভ্যাস তার অনেক দিনের, তবু, মোড়ের অন্যপ্রান্তে পৌঁছোনোর আগে মাটিতে পা দেওয়া সেও সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিল না। হাতে বই, মুখে ব্রণ, কালো একটি মেয়ের কাছে মাথা তার কাটা গিয়াছে লজ্জায়, পা মাড়াইয়া দেওয়ায় একজন প্রৌঢ়বয়সি ভদ্রলোক ছোটোলোকের মতো কী যেন বলিযাছেন অপমানকর, বাস হইতে নামার জন্য বীরেশ্বরের হুকুমেব অজানা বহস্য মনের মধ্যে হইয়া উঠিয়াছে আরও গভীব, তবু বাসের টিকিটের পযসা ক-টা নষ্ট হওয়াব কথাটাই যেন খচখচ বিঁধিতে লাগিল অনুপমের মনে। আবার টিকিট করিতে হইবে। আবার দিতে হইবে চার চারটা পয়সা।

মোটর গাড়িটি বাসের পিছুপিছু আগাইয়া আসিযাছিল, পাশে থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের কুড়ি-বাইশটা গাড়ির হর্নে বাজিয়া উঠিল বিরক্তির আওয়াজ।

বীরেশ্বব বলিলেন, আয় অনুপম, ভেতরে আয়।

অনুপম ভিতরে গিয়া বসিল। চেনা মানুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু চেনা যায় না কেন ? এতক্ষণ এটা খেয়াল থাকে নাই, এবার পাশে বসিয়া বীরেশ্বরের গোঁফদাড়িতে ঢাকা মুখখানায় অপরিচয়ের আবরণ সরাইতে না পারিয়া হঠাৎ লজ্জায় অনুপম একেবারে যেন কাবু হইয়া গেল।

চেনা মানুষকে না চিনিতে পারার লজ্জা। প্রণম্যকে প্রণাম করার বদলে মনের ভুলে তার গালে একটা চড় বসাইয়া দেওয়ার মতো এ যেন একটা সাংঘাতিক অপরাধ।

বীরেশ্বর বলিলেন, আমি চিনলাম, তুই আমাকে চিনতে পারলি না অনু ? আজকালকার ছেলে তোরা, তোদের কাণ্ডই আলাদা। মনের মধ্যে হাজার রকম চিন্তা আর স্মৃতির খিচুড়ি পাকাস, একটাও স্পষ্ট হতে পারে না। আমি হলাম তোর ঠাকুরদা।

একটু হাসিলেন বীরেশ্বর, অত দাড়িগোঁফের জঙ্গলেও হাসিটা দেখা গেল। হঠাৎ খুশি হইয়া অনুপম বলিল, চিনেছি।

কে বল তো আমি ?

আপনি সীতা পিসিমার বাবা।

তোর বাবার বাবা নই ?

এটা পরিহাস। নিজের কথায় বীরেশ্বর নিজেই হাসিলেন, কিন্তু অনুপমের অত সহজে হাসি আসে না। মনের মধ্যে হাসির যে কারখানা আছে সেটার অনেকগুলি কল বিগড়াইয়া গিয়াছে, মনটাও কি হইয়া যায় নাই গোলকধাঁধার মতো এলোমেলো রকমের বাঁকা ? সংক্ষেপে সে শুধু বলিল, হ্যাঁ।

হ্যাঁ ? শুধু হ্যাঁ ? আমি হলাম তোর ঠাকুরদা, শুধু হ্যাঁ বলে আমার কথার জবাব দিলে পাপ হয়।—এ তোর রামলাল কাকার ছেলে শঙ্কর। কাকার ছেলের সঙ্গে কী সম্পর্ক হয়, তা তো

জানিস ? কে জানে বাবা, কী যে জানিস আর কী কী যে জানিস না, ভগবানও তা জানেন না। বলেই দিই,—কাকার ছেলে হয় খুড়তুতো ভাই। দুজনে যে হাঁ করে তাকিয়ে রইলি মুখের দিকে ?

শঙ্কর বলিল, আপনাকে দেখেছি মনে হচ্ছে।

অনুপম বলিল, আমারও মনে হচ্ছে আপনাকে দেখেছি।

শঙ্কর বলিল, আপনার কোন ইয়ার ?

অনুপম বলিল, ফোর্থ ইয়ার—সাইন্স। আপনার ?

শঙ্কর বলিল, আমারও ফোর্থ ইয়ার—আর্টস।

বীরেশ্বর দুজনের আলাপ শুনিতেছিলেন। হঠাৎ ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরাইয়া বাড়ি ফিরিবার হুকুম দিলেন।

শঙ্কর ব্যস্ত হইয়া বলিল, কলেজ যাব না ?

বীরেশ্বর গম্ভীর মুখে বলিলেন, চুলোয় যাক তোর কলেজ। বাড়ি ফিরে দুজনকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দেব। যতক্ষণ আপনি আপনি করে তোরা কথা বলবি, তালা খুলব না। আমার নাতি তোরা, ভাইকে আপনি বলতে লজ্জা করে না তোদের ? বয়সের কত তফাত জানিস তোদের ? একুশ দিন।

তাদের মধ্যে কে একুশ দিনের বড়ো কে একুশ দিনের ছোটো, বীরেশ্বরকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সাধ অনুপমেরও দেখা গেল না, শঙ্করেরও দেখা গেল না। বাসের চারটা পয়সা নষ্ট হওয়ার শোক অনুপমের মনে মিলাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কলেজ না গেলে যে পার্সেন্টেজগুলি আজ নষ্ট হইবে, সে অপচয় তার কাছে আরও শোচনীয়। অসুখে ভুগিয়া তার অনেক পার্সেন্টেজ নষ্ট হইয়াছে, নন-কলেজিয়েট হইয়া পরীক্ষা দিতে হইলে দুঃখের সীমা থাকিবে না অনুপমের, দশটা টাকাও বেশি লাগিবে। তবু, প্রতিবাদ করার বদলে সে চুপ করিয়া রহিল, গাড়ি ফিরিয়া চলিল যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে। ক্ষতি ? ক্ষতির ভাবনাকেই আজ অনুপমের উপভোগ্য মনে হইতেছে। জীবনে একদিন বেহিসাবি কাজ করিয়া লোকসান হইয়াছে বলিয়া জীবনটা কি একদিনের জন্য ধন্য হইয়া যাইবে না ? কলেজের পার্সেন্টেজের ক্ষতির চেয়ে বড়ো রকম একটা ক্ষতি আজ হইতে পারে না ? পকেটে একটা দশ টাকার নোটও নাই যে রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় ! পকেটে হাত ঢুকাইয়া নস্যের কৌটাটি বাহির করিয়া আনিতে গিয়া আবার খালি হাতটাই অনুপম বাহির করিয়া আনিল।

সে জানে, এ সাময়িক বৈরাগ্য নয়, অস্থায়ী পাগলামি, মন অস্থির হইলে এ রকম হয়। নস্যের ডিবা ছুঁড়িয়া নয়, মানসিক অস্থিরতা চরমে উঠিয়া কত মানুষের কাছে সন্ন্যাসী হওয়া সহজ করিয়া দিয়াছে।

বড়ো তিনতলা বাড়ি, সামনে ছোটো একটা বাগান। শহরের এই অংশ নির্জন ও গম্ভীর, কারণ, একটা বাড়িও বাগানবাড়ি নয়, পথের দুদিকের প্রায় সবগুলিই সামনে বাগানওয়ালা বাড়ি। বাড়িগুলি যেমনই হোক, বাগানগুলি যেন বেঁটে বেঁটে উদ্ভিদের সাজানো গোছানো দোকান, অল্প একটু জায়গায় যতগুলি সম্ভব অরণ্যানীর প্রতিনিধিকে ঠাঁই দেওয়া হইয়াছে। দেখিয়া হয়তো কারও চোখ জুড়ায়। জগতে অন্ধ যত আছে, চোখ-থাকিতে-অন্ধের সংখ্যা তো তার চেয়ে কম নয়।

ইতিমধ্যে অনুপম ও শঙ্কর পরস্পরকে তুমি বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় দুজনকে একটা ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখার সংকল্প বীরেশ্বরের আর দেখা গেল না। দুজনকে তিনি লইয়া গেলেন দোতলার অন্দরে, যেটা আসবাবে ঠাসা প্রকাণ্ড একটা ঘর এবং যেখানে দুপুরবেলা বাড়ির মেয়েরা খেলে তাস এবং পাড়ার মেয়েরা বেড়াইতে আসিলে বসে মজলিশ।

সীতা পিসিমাই আগে আসিলেন। মাঝবয়সি বিধবা মানুষ তিনি, পরনে তাই ধবধবে সাদা হাতকাটা শেমিজ আর ধবধবে সাদা চুলপাড় ধুতি। কপালে চামড়ার ভাঁজে সৃষ্টি লম্বা রেখাটি অত্যন্ত

স্পষ্ট। বেখাটি দুশ্চিন্তার নয়, চিন্তাব। সাত বছর আগে সধবা অবস্থায় তিনি যখন পড়িতেনও কম, ভাবিতেনও কম, তখনও এই রেখাটি ছিল, তবে এত অস্পষ্ট যে, লোকে দেখিয়াও দেখিত না। তারপর বিধবা হইয়া তিনি পড়াশোনা করেন—মনস্তত্ত্ব আর দেহতত্ত্ব ছাড়া মানুষের সম্বন্ধে যত কিছু পড়িবার ও শুনিবার আছে সব। এ রকম পড়াশোনায় গভীর চিন্তাও বোধ হয় দবকার হয়। সাত বছরের চিন্তায় কপালের রেখাটি তাই স্পষ্ট আর গভীর হইয়া কপালটিকে তার দুভাগে ভাগ কবিয়া ফেলিয়াছে। মাঝে মাঝে বাঁ হাতের তর্জনীর ডগা দিয়া রেখাটিকে তিনি এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘষিয়া দেন। হয়তো তোয়াজ করেন, হয়তো মিলাইয়া দিতে চান।

পরিচয় পাওয়ার পরেই অনুপমকে তিনি চিনিতে পারিলেন। বলিলেন, ওমা ! তুমি সেই অনুপম ! জলপাইগুড়িতে তোমাকে যে আমি কদিন ধবে দেখেছি, তবু চিনতে পারলাম না দেখে ? কী আশ্চর্য মন মানুষের ! তবে অনেকদিন আগে তোমায় দেখেছিলাম, দশ-এগারো বছরের কম নয়, ছোটো ছিলে তখন তুমি। কত বয়েস তোমার এখন ? উনিশ ? দশ-এগারো বছর আগে যদি তোমায় দেখে থাকি,—ধরা যাক এগাবো বছর, তাহলে তখন তোমার বয়েস ছিল—

কপালের বেখায় চামড়ার ভাঁজ পড়িয়া গেল, নিজে নিজেই অবাক হইয়া সীতা বলিলেন, কী আশ্চর্য মন মানুষের ! উনিশ থেকে এগারো বাদ গেলে কত যেন থাকে ? দশ বাদ গেলে থাকে নয়, তাহলে এগারো বাদ গেলে থাকবে আট। হ্যাঁ আট। তোমার তখন আট বছব বয়েস ছিল, না ?

অনুপম বলিল, আমার ঠিক মনে নেই।

সীতা বলিলেন, আমার চেয়ে কত ছোটো তুমি, আমার মনে নেই, তোমার মনে থাকবে ? তোমবা এখন কলকাতাতেই থাক, না ? কোথায় থাক ? বড়দা এখানেই আছেন, না ?

অনুপম বলিল, বাবা আর বছর মাবা গেছেন।

বীরেশ্বর আবামকেদারায় কাত হইয়া পিসি-ভাইপোর আলাপ শুনিতেছিলেন, অনুপমেব কথা শুনিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। তারপর তাঁর স্তব্ধ নিশ্চল ভাব দেখিয়া মনে হইল, সোজা হইয়া বসিবার অতিবিক্ত আর সব ক্ষমতা তাঁর শেষ হইয়া গিয়াছে।

বড়দা নেই ! বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিতে একটু সময লাগিল সীতার। জীবনে একবাব মাত্র কয়েক দিনের জন্য যে ভাইকে তিনি চোখে দেখিয়াছিলেন, সেই কয়েক দিনের মধ্যে একবারও যার কাছে ছোটো বোনের মতো ব্যবহার পান নাই, যে ধরিতে গেলে একরকম অজানা অচেনা অপরিচিত মানুষ, আর বছব সে মারা গিয়াছে এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেউ কি কাঁদিতে পারে ? চেয়াবে বসিয়া সীতা কাঁদিতে লাগিলেন, আর বীরেশ্বর চুপচাপ শুধু বসিয়া রহিলেন।

একুশ বছর বয়সে যে ছেলে জন্ম লইয়াছিল, আর পঁচিশ বছব বয়সে যে ছেলের সঙ্গে তাঁর হইয়াছিল বিচ্ছেদ, আজ তিয়াত্তর বছর বয়সে পাওয়া গেল তার মৃত্যুসংবাদ, সেই ছেলেরই ছেলের মুখে। পুত্রশোকের অভিজ্ঞতা বীরেশ্বরের ছিল না। তিয়াত্তর বছরের জীবনে অনেক পিতাকেই তিনি পুত্রশোক পাইতে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু পরের শোক দেখিয়া এমন ভয়ানক ব্যাপারের অভিজ্ঞতা কি মানুষের হয় !

শঙ্কর ঘরে ছিল না। পিতামহ ও পিসিমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া অনুপম মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। বীরেশ্বরের স্তব্ধভাব দেখিয়া আর সীতার মৃদু কান্না শুনিয়া হঠাৎ তার মনে জ্বালা ধরিয়া গিয়াছে। আপনজন এরা ? এই প্রকাণ্ড অট্টালিকায় এত দামি আসবাবপত্রে সাজানো ঘরে বসিযা তার বাবার মরণের খবরে এদের কাতর হইবার অধিকার কি আছে, কেবল ওই অর্গ্যানটা বেচিয়া সেই টাকায় চিকিৎসা হইলে তার বাবার যখন না মরিবার সম্ভাবনা ছিল ?

একে একে বাড়ির অন্য সকলে ঘরে আসিতে থাকে। শঙ্কর, তার মা, শঙ্করের তিনটি বোন ও ছোটো একটি ভাই, শঙ্করের এক মামা এবং এ বাড়িতে আশ্রিত ও আশ্রিতা তিনটি দূরসম্পর্কের

মানুষ। আর আসে সাত-আট বছরের একটি ছেলে। শঙ্করের বড়ো বোনটি যখন বছর খানেক আগে মারা গিয়াছিল, তার এই ছেলেটি তখন মানুষ হইতে আসিয়াছিল মামাব বাড়ি।

দুমদাম শব্দে পা ফেলিতে ফেলিতে ঘবে ঢুকিয়া ছেলেটি সকলের ভাবভঙ্গি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সীতার কান্না সকলকে যেন নির্বোধ ও নিশ্চল পুতুলে পরিণত কবিয়া দিয়াছে। কেউ জানে না ব্যাপারখানা কী, তবু সীতাব মতো মাঝবয়সি নারীর এ রকম মৃদু ও মার্জিত কান্নাব যে বড়ো রকমের একটা কারণ থাকে এটুকু তো সকলে বোঝে ! তা ছাড়া ঘরের আবহাওয়াটা যেন কেমন বিগড়াইয়া গিয়াছে। একটি অপরিচিত যুবকের উপস্থিতি, সীতার শোক আর বীরেশ্বরের স্তব্ধভাব ছাড়া আরও কী যেন একটা শোচনীয় রকমের খাপছাড়া বিষাদ ঘরেব মধ্যে সৃষ্টি কবিয়া রাখিয়াছে সহজবোধ্য অস্বাভাবিকতা।

শঙ্করের স্বর্গীয়া দিদির ছেলেটি একবার চারিদিকে চোখ বুলাইয়া হাসিয়া ফেলিল। এইবকম স্বভাব ছেলেটাব, খাপছাড়া কিছু দেখিলেই সে হাসে। ছোটো বড়ো যত কিছু অসঙ্গতি আছে জগতে, সব যেন তাকে সুড়সুড়ি দেয়।

শঙ্করের মা বলিলেন, ওকি সতু, ছি !

শঙ্কর বলিল, ফের যদি হাসবি তো কান মলে লাল কবে দেব।

হুমকিতে থামিবার মতো হাসি সতু হাসে না। মামাব বাড়িতে মা মরা ছেলেকে কে মারিবে ? হুমকি যে শুধু হুমকি সে তা জানে। তাই হাসি তাব থামে না, কিন্তু তার হাসির চাপে সীতাব কান্না বন্ধ হইয়া যায় !

সতু নাগালের মধ্যেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হাত বাড়াইয়া তাকে কাছে টানিয়া অনুপম বীরেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, এ ছেলেটি কে ?—আর এক পা সামনে আগাইয়া শঙ্কবেব মা সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হয়েছে ঠাকুরঝি ?

অনুপমের কথার জবাবে বীরেশ্বর বলিলেন, ও শঙ্কবের দিদি মাধুবীব ছেলে। আর বছব মাধুবী মারা গেছে।

শঙ্কবের মার কথাব জবাবে সীতা বলিলেন, বউদি, বড়দা আব বছব মারা গেছে।

ঘরের এতগুলি লোকের সকলের মধ্যেই কমবেশি ফাঁক ছিল, অনুপম সতুকে কাছে টানিয়া লইল, তাদের একজনের মা ও অপর জনের বাবার মৃত্যুতে এতগুলি দুঃখিত মানুষেব মধ্যে ওবা পৃথক হইয়া যাইতে চায় ; দুইজনে একসঙ্গে।

কিছুক্ষণের জন্য তাই তারা গেল। হাত ধরিয়া উপবে টানিযা অনুপমকে লইযা সতু হইযা গেল উধাও। বেশি দূরে কোথাও নয় পাশেব ঘরে,—যে ঘরে সতুকে বুকে কবিয়া সীতা ঘুমান। বুকে অবশ্য সতুকে তিনি করেন সে যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন, জাগিযা থাকিলে ও সব সতু ভালোবাসে না, শীতের রাত্রেও নয়। মানুযের বুক ? যার মধ্যে কী একটা আশ্চর্য যন্ত্র ঢিপঢিপ কবে আর ছোটো ছেলেকে নাগালের মধ্যে পাইলেই মানুষ যেখানে চাপিয়া ধরে প্রাণপণে, সেই মানুষের বুক ? সতু কখনও ও সব বুককে প্রশ্রয় দেয় না। তবে অনুপমের কথা ভিন্ন। আর কোনোদিন তো অনুপম তাকে বুকে পিষিবার জন্য ব্যাকুল হয় নাই।

বুকে পিষিয়া চুমা খাইয়া নাম জিজ্ঞাসা করিবার পর অনুপম বুঝিতে পারে, সতু এক অদ্ভুত রকমের অস্বাভাবিক ছেলে, নূতন টাইপের পাগলা।

নাম জিজ্ঞাসা করার জবাবে সতু বলে, নাম ? জানো সীতাও আমার সঙ্গে এমনি করে।

তা বলি নি। তোমার নাম জিজ্ঞেস করেছি।

বলছি। সীতা রোজ এমনি করে। যটা করে চুমু খেতে দেব বলেছি, দিনে সব শোধ করে নেয়। রাত্তিরে চুপিচুপি ডাকে, সতু ঘুমুলি ? আমি মটকা মেরে পড়ে থাকি, জবাব দিই না। তারপর

আমাকে জড়িয়ে ধরে খালি চুমু খায়। কী বলে জান ? বলে, আরও ছেলেবেলা তোকে যদি পেতাম সতু ! তোর মা যদি কবছর আগে মরত সতু !

সোজা স্পষ্ট অনর্গল কথা। বয়স্ক মানুষের পরিষ্কার শুদ্ধ ভাষা, এতটুকু ছেলেমানুষির ছাপ নাই, কী যেন বুঝাইতে চায় সতু তাহাকে, তার সমবযসি অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো, আজ গ্রেটা গার্বোর ছবি দেখিতে না গেলে জীবনটা মাটি হওয়ার মতো অসঙ্গতিপূর্ণ দুর্বোধ্য একটা ব্যাপার।

অনুপম কথা বলিতে পারে না, বলার সুযোগও ঠিকমতো পায় না। সতু পালটা প্রশ্ন করিয়া তার নাম জানিতে চায়।

অনুপম বলে, তোমার নাম আগে বলো, তবে বলব।

বললাম যে নাম ?

কখন বললে ?

ওই যে বললাম, রাত্তিরে সীতা চুপিচুপি ডাকে, সতু, ও সতু ঘুমুলি ? নাম বলব বলেই তো ও কথা বললাম। তোমার একদম বুদ্ধি নেই !

তাই মনে হয় অনুপমের। মনে হয়, এই বয়সেই মনোবিকারের ফলে বুদ্ধির এমন বিকাশ ঘটিয়াছে ছেলেটার যে, তুলনায় তার নিজের বুদ্ধি বলিয়া কিছু নাই, যা আছে সেটা শুধু বোকামি গোপন করার কায়দা।

সীতা আসিলেন। বলিলেন, তোমরা এ ঘরে বসে চুপিচুপি গল্প করছ ! কী আশ্চর্য মন মানুষের ! আমি ভাবলাম, দুজনে গেল কোথায় ? এটা আমার শোবার ঘর, আমি আর সতু ওই খাটে শুই। আমি ছাড়া আর কারও কাছে ও শুতে পারে না। একবার আমার জ্বর হয়েছে, ডাক্তার কাছে শুতে বারণ করলে, ও শুলো গিয়ে তোমার বউদির কাছে ! রাত দুপুরে চুপিচুপি উঠে এসে—

সতু দুহাতে শক্ত করিয়া অনুপমের একটা হাত ধরিয়াছিল। হাতে একটা ঝাঁকি দিয়া বলিল, জানো সীতা খালি মিথ্যা কথা বলে।

সীতা তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন, মিথ্যা কথা বলি ! তুই কি রে সতু, অ্যাঁ ! যা তা বলছিস আমার নামে ? রাত দুপুরে উঠে আসিসনি সেদিন তুই ?

সতু অনুপমকে চোখের ইশারা করিয়া বলিল, এসেছিলাম তো।

তবে ?

সতু নির্বিকারভাবে বলিল, কী হয় এলে ?

সীতা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, মুহূর্তে নরম হইয়া গিয়া নিজের মৃদু ও মার্জিত গলায় বলিলেন, তাই বল ! এক এক সময় তোর কথা শুনে গায়ে যেন জ্বর আসে।

হঠাৎ অনুপমের একটা আশ্চর্য কথা মনে হয়। মনে হয়, তার সীতা পিসিমা তার পরিচিতা কোনো একটি মহিলাকে যেন নকল করিতেছেন। কিন্তু কে যে সেই পরিচিতা মহিলা, অনুপম কিছুতেই তাহা স্মরণ করিয়া উঠিতে পারে না।

ঘণ্টা তিনেক কোনো রকমে কাটানো গেল, তারপর অনুপমের মন করিতে লাগিল কেমন কেমন। এ বাড়িতে অকারণে মানুষের মনে বড়ো কষ্ট। কোনো অভাব না থাকায় সকলের স্বভাব গিয়াছে বিগড়াইয়া, জীবনে রসকষ যা আছে সব শক্ত, জমজমাট, যেমন তেমন উত্তাপে গলিয়া জীবনকে রসাল করিতে চায় না। কোন দৃষ্টিতে ইহাদের দেখিতে হইবে, বিচার করিতে হইবে, বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া অনুপম শেষ পর্যন্ত অপরিচয়ের সংকোচ কাটাইয়া উঠিতে পারে না। শঙ্করের মাকে কারও মা মনে করিতে তার রীতিমতো কষ্ট হয়। মুখে তিনি এখনও ক্রিম পাউডার মাখেন বলিয়া নয়, সাজগোজ করিয়া এখনও তিনি নিজের অপূর্ব রূপশ্রী নষ্ট করেন বলিয়া নয়, নিজের

চারিদিকে একটা গভীর বিষাদের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া নিজের চরম স্বার্থপরতাকে তিনি পরিস্ফুট করিয়া রাখেন বলিয়া। তাঁর দৃষ্টি বিষণ্ণ, কথা বিষণ্ণ, মুখের ভাব বিষণ্ণ, বিষণ্ণতার ভারে মন্থর ও ভারাক্রান্ত তাঁহার চালচলন, ভাবভঙ্গি।

প্রথমে শোকের আবহাওয়াব মধ্যে তিনি যখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, একমাত্র তাঁকেই অনুপমের মনে হইয়াছিল প্রকৃত শোকাতুরা, কিন্তু জিনিসটা খাঁটি মনে হইলেও বিষাদের বাড়াবাড়িতে সে একটু ক্ষুণ্ণ ও আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল, তাবপর ধীরে ধীরে সকলের ব্যথিত ভাব কাটিয়া যাইতে লাগিল। এ-কথা সে-কথায় চাপা পড়িয়া যাইতে লাগিল অনুপমের পিতাব মৃত্যুর কথা, এই সংসারের যে নিজস্ব গতিটি আছে সেই গতি কম বা বেশি সময়ের জন্য দাবি করিতে লাগিল একে আর ওকে,—আকাশপাতাল যাতায়াত কবিতে লাগিল যাবা অনুপমের আশেপাশে বহিল তাদের মুখের আলোচনা, কিন্তু শঙ্করের মার কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। বীরেশ্বরের কথায় কয়েকবার সকলে যখন হাসিয়া পর্যন্ত উঠিল, তখনও তিনি হইয়া রহিলেন নিরবচ্ছিন্ন বিষাদের প্রতিমা। বাত্রির অন্ধকারে ঘরেব যে অন্ধকার কোণ মিশ খাইয়া গিয়াছিল, দিনের আলোতেও সে কোণ হইয়া রহিল অন্ধকার, বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র এবং স্পষ্ট।

এ শখ অনুপমেব কেন চাপিয়াছিল বলা যায় না, একবার সে বলিয়াছিল, আপনাকে প্রণাম করা হয়নি।

বলিয়া শঙ্করেব মাকে করিয়াছিল প্রণাম।

শঙ্করেব মা বলিয়াছিলেন, আমাকে আবাব প্রণাম !

আর কেউ নন, তিনি কাকিমা। সে হিসাবে অনুপমের প্রণাম শুধু তাঁর প্রাপ্য নয়, গ্রহণীয়। কিন্তু তার মধ্যে অনুপমের প্রণামের প্রতিক্রিয়া আর তাঁর মুখের কথা শুনিয়া কে বলিবে পথেব ভিখারিনি তিনি নন, একটা পয়সাব বদলে প্রণাম পাইযা তিনি মরিয়া যান নাই মরমে !

অনুপমেব মনে হইতে লাগিল, প্রণাম সে করে নাই শঙ্করের প্রণম্যা মাকে, মবা একটা মানুষকে খাঁড়ার ঘা দিয়াছে।

শঙ্করের মাব এই খাপছাড়া চিরস্থায়ী বিষাদ অনুপমের মন-কেমন করাকে আরও বেশি বাড়াইয়া দিযাছে। তিন ঘণ্টায় তিনশোবার তাব মনে হইয়াছে পলাইয়া যাওযার কথা। কিন্তু যাওয়াব কথা বীরেশ্বর কানে তুলিতে চান না, হাসিয়া উড়াইযা দেন। আর দেন খোঁচা ! এ কি পবের বাড়ি যে যাওয়ার জন্য অনুপম ব্যাকুল ?

তা নয়, কাজ আছে।

কী কাজ ? কলেজ আজ তোমার যাওয়া হবে না।

কলেজ নয়, বাড়ি যাব।

সে তো আমিও যাব। বেলা পড়ুক, দুজনে মিলে যাওয়া যাবে একসঙ্গে।

আপনি আমাদের বাড়ি যাবেন ?

হঠাৎ বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিয়াই অনুপম লজ্জা বোধ করে। তার প্রশ্নের মধ্যে বীরেশ্বরের এতকাল তাদের বাড়ি না যাওয়াব ইঙ্গিতটা এমন কদর্য শোনায !

বীরেশ্বর মৃদুস্বরে বলেন, তোর বাবা আমাকে তোদের বাড়ি যেতে দিত না অনু।

এটা ঠিক কী ধরনের কৈফিয়ত ঠাহর করিতে না পারিয়া অনুপম চুপ করিয়া থাকে।

দুই

বীরেশ্বর, শঙ্কর, অনুপম আর সতু এই চারজনে যখন অনুপমের বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল, রোদ পড়িয়া আসিয়াছে। শঙ্করের আসিবার ইচ্ছা ছিল না, বীরেশ্বর তাহাকে জোর করিয়া আনিয়াছেন। সতুকে কারও সঙ্গে আনিবার ইচ্ছা ছিল না, সে জোর করিয়া সঙ্গে আসিয়াছে।

রং-চটা সদর দরজা, খড়ি দিয়া নম্বর লেখা, তাও কাঁচা হাতের। বাড়ির বাহির হওয়ার সময় হইতে শঙ্কর অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, বড়ো রাস্তায় গাড়ি রাখিয়া গলিতে প্রবেশ করার পর সে অস্বস্তি হুহু করিয়া বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। নোংরা গলি বলিয়া নয়, গরিব আত্মীয়ের বাড়ির কাছে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া। একটি গরিব বন্ধু ছিল শঙ্করের, একদিন তাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল সেই গরিব বন্ধুটি। সে অভিজ্ঞতা শঙ্কর জীবনে ভুলিবে না। গরিব বন্ধুটি কিন্তু তার বাড়িতে আসিয়া চমৎকার মিশ খাইয়া যাইত সকলের সঙ্গে, যেটুকু মিশ খাইত না সেটুকুও আপশোশ করার মতো কিছু নয়। কিন্তু গরিবের অন্তঃপুরে শঙ্কর বিদেশি, বেমানান। কথা ও ভদ্রতার আদানপ্রদানে সেখানে নিজেও সে হোঁচট খায় বারবার, অন্যান্য সকলকেও হোঁচট খাওয়ায়। গরিব মানুষকে বড়ো ভয় করে শঙ্কর, গরিব মানুষের অন্দরমহলে সে জেলখানার কয়েদি, আধঘণ্টা সেখানে থাকিলে তার নিজেকে বাড়ির ছেলেবুড়ো সকলের ঘৃণা-মেশানো কৃপার পাত্র বলিয়া মনে হইতে থাকে।

কড়া নাড়িতে অনুপমের মা সাধনা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। দেখিবা মাত্র বীরেশ্বরকে তিনি যে চিনিতে পারিয়াছেন সেটা এমন স্পষ্ট বোঝা গেল যে, অনুপম কথা বলা দবকার মনে কবিল না। সাধনা মাথায় কাপড় তুলিয়া দিলেন, সকলের প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া একটু ভাবিলেন, তারপর একপাশে সরিয়া বলিলেন, আসুন।

বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া শঙ্কর একটু আশ্চর্য হইয়া গেল। মনে মনে সে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, নোংরা স্যাঁতসেঁতে একটা বাড়ির, যেখানে বাতাসে মেশানো থাকে ভোঁতা দুর্গন্ধ, মানুষের মুখে থাকে ব্যর্থ লোভের ছাপ, চারিদিকে ছড়ানো থাকে ভাঙা জীবনকে জোড়াতালি দিয়া দিন কাটানোর আয়োজন। এ বাড়ির উঠান ভিজা কিন্তু স্যাঁতসেঁতে নয়, এ বাড়ির বাতাসে গন্ধ শুধু রান্নার, এ বাড়ির মানুষের মুখে ছাপ শুধু অভাবের, এ বাড়িতে দিন কাটানোর আয়োজন শুধু কম দামি।

তাছাড়া এত ছোটো একটা বাড়িতে এত তুচ্ছ সব আসবাব ও জিনিসপত্রগুলিকে কেহ যে এত যত্নে গুছাইয়া রাখিতে পারে, শঙ্করের সে ধারণা ছিল না। মেঝের যেখানে যে জিনিসটি থাকার কথা সেইখানে সেই জিনিসটি রাখা হইয়াছে, একচুল এদিক ওদিক নয়। জানালার জিনিস আছে জানালায়, তাকের জিনিস আছে তাকে, দেয়ালের জিনিস আছে দেয়ালে,—দেখিলেই বুঝা যায় সর্বদা একটি সতর্ক দৃষ্টি এই ছোটোবড়ো স্থাবর পদার্থগুলিকে পাহারা দেয়, জানালায় পানের ডাবরের ডানদিকে রাখা কুচানো সুপারির ছোটো পিতলের বাটিটি যেন বাঁ দিকে কখনও না আসে তাই দেখিবার জন্য।

বসিতে দেওয়ার জন্য মাদুর বিছানোর সময় প্রমাণ পাওয়া গেল, এ সতর্ক দৃষ্টি কার।

রোগা লম্বা একটি মেয়ে মাদুরটা বিছাইয়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ানোমাত্র সাধনা বলিলেন, অর্ধেক মাদুর যে ভাঁজ হয়ে রইল নিমি ?

ভাঁজ খুলিয়া মাদুরটা টান করিয়া পাতিয়া দিয়া নিমি সোজা হইয়া দাঁড়ানো মাত্র সাধনা আবার বলিলেন, অতগুলি দেশলায়ের কাঠি আবার ঘরে এল কোত্থেকে ? কুড়িয়ে ফেলে দিয়ে আয় বাইরে।

তিনটি পোড়া দেশলায়ের কাঠি কুড়াইয়া নিমি আবার যেই সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সাধনা আবার বলিলেন, ইনি তোর ঠাকুরদা নিমি, প্রণাম করে যা।

বলিয়া এতক্ষণ পরে নিজেও বীরেশ্বরকে প্রণাম করিলেন।

এত যত্নে মাদুর পাতা হইল, কিন্তু বীরেশ্বর ছাড়া মাদুরে কেহ বসিল না। ঘরে ছোটো একটা টুল ছিল, সেটাতে বসিয়া শঙ্কর উশখুশ করিতে লাগিল আর সতু ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল ঘরের সর্বত্র। বসানোর চেষ্টা করিয়াও তাকে বসাইতে পারা গেল না। সাধনা মৃদুস্বরে বলিলেন, বড়ো অবাধ্য ছেলে তো।

হঠাৎ রাগে শঙ্করের গা যেন জ্বলিয়া উঠিল। জোরে ধমক দিয়া বলিল, বসলি সতু ? কান মুলে ছিঁড়ে ফেলব তোর।

সাধনা বলিলেন, আহা, অমন করে ধমকাতে আছে ওইটুকু ছেলেকে ? হঠাৎ একবার ধমক দিয়ে মারধোর করলেই কি ছেলেপিলে বাধ্য হয় বাবা ? বাধ্যতা শেখাতে হয়। স্বভাব নিয়ে তো জন্মায় না ছেলেমেয়ে, চাদ্দিকে যারা থাকে তারা তার স্বভাব গড়ে তোলে।—ওমা, ধমক খেয়ে ও যে হাসছে !

বীরেশ্বর বলিলেন, হাসি ওর একটা ব্যারাম, ধমকালেও হাসে, না ধমকালেও হাসে।

এমন ছেলে তো দেখিনি কখনও !

বলিয়া সাধনা বোধ হয় ভালো করিয়া দেখিবার জন্যই সতুকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু একবার তার মুখখানার দিকে চাহিয়া সতু ছিটকাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সাধনা মৃদুস্বরে বলিলেন, খুব দুরন্ত, নয় ?

বীরেশ্বর বলিলেন, হ্যাঁ।

বীরেশ্বরের এই জবাবে ঘরের মানুষগুলির কথা বলার সব প্রয়োজন যেন ফুরাইয়া গেল, কারও কিছু জিজ্ঞাস্য নাই, কারও কিছু জবাব দিবার নাই। এ রকম অবস্থা শঙ্কর আরও সৃষ্টি হইতে দেখিয়াছে, তার বন্ধু-পরিবারের গৃহে। কিন্তু সে সব পরিবারে তাল সামলানোর মানুষ থাকে। হয় বাড়ির গৃহিণী, নয় তার পাকাপোক্ত মেয়ে মৃদু একটু হাসে, খাপছাড়া একটা কথাকে যেখান হইতে পারে টানিয়া আনিয়া আলাপ জুড়িয়া দেয়, স্বাভাবিক স্তব্ধতার বাধাকে ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া চলিতে থাকে সকলের কথোপকথন। কিন্তু আজ ? আজ কে এই আত্মীয়-আত্মীয়ার বৈঠকে আলাপের ভূমিকা রচনা করিবে ? আজ যখন প্রথম সংবাদ পাইয়াছেন, ধরিতে গেলে আজই বীরেশ্বরের ছেলে মরিয়া গিয়াছে,—কয়েক ঘণ্টা আগে। সেই ছেলের বিধবাবেশধারিণী বধূর সামনে বসিয়া কার পক্ষে আজ কী বলা সম্ভব ? বলার কথা অবশ্য আছে অনেক, কিন্তু সে সব কথা মানুষকে রাখিতে হয় নেপথ্যে, কারণ, হৃদয় চিরদিন নেপথ্যবাসী, হৃদয়ের কথা বাহিরে আনা ছেলেমানুষি কাজ।

সাধনা বলিলেন, আপনার শরীর বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে, বাবা।

বীরেশ্বর বলিলেন, শরীর দুর্বল হবার বয়সে এসে পৌঁছেছি, মা। তবু যা সবল আছি তাতেই ভাবনা ধরেছে, আরও কতকাল এ পারে আটকে থাকব।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তুমি তো আমার ঠিকানা জানতে বউমা, আমাকে একটা খবরও দিলে না ?

সাধনা নতমুখে বলিলেন, বারণ করে গিয়েছিলেন।

বীরেশ্বর মৃদুস্বরে বলিলেন, তুমি তো গোড়া থেকে সবই জান বউমা, তোমার স্বামীর কাছে আমি কোনো অপরাধ করিনি। অপরাধ যদি করে থাকি, তার মার কাছে করেছিলাম। তবু শেষ সময়েও আমায় সে ক্ষমা করে যেতে পারল না ?

সাধনা বলিলেন, তা নয় বাবা, তিনি বলে গিয়েছিলেন, সারাজীবন আপনাকে অকারণে অনেক কষ্ট দিয়েছেন, এ খবরটা গোপন রাখাই ভালো।

অকারণে ! বীরেশ্বর সোজা হইয়া বসিলেন।

তাই বলে গিয়েছিলেন। আমিও ভেবে দেখলাম এই বয়সে আপনাকে আর—

খবরটা পাবার আগেই আমি হয়তো চোখ বুজতে পারি ভেবে তুমিও চুপ করে ছিলে, না বউমা ?

মনে হয় বীরেশ্বর রাগ করিয়াছেন। এক বছর তাঁহাকে পুত্রশোকের স্বাদ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবার অপরাধ তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না। সাধনা কথা বলিলেন না। শঙ্কর শঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার বীরেশ্বরের দিকে, একবার সাধনার দিকে চাহিতে লাগিল। অতীতের গহ্বর হইতে কীসের যেন আবির্ভাব ঘটিয়াছে এই ক্ষুদ্র ঘরখানিতে, এতকাল মানুষের হৃদয়কে যা শোষণ করিয়াছে,—কয়েকটি সম্পর্কিত মানুষের হৃদয়। অনুপম ও নিমি ঘরে ছিল, তাদের শঙ্কর দেখিতে পাইল না, ওরা অশরীরী অতীতের আড়ালে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বীরেশ্বরের রাগ যদি হইয়া থাকে, অনুপম যখন বাড়িতে খবরটা দিয়াছিল তখন রাগ হয় নাই কেন ? অনুপমের মার উপরে রাগ করিবার কী কারণ আছে বীরেশ্বরের ?

বীরেশ্বর দাড়ি মুঠা করিয়া ধরিয়া বলিলেন, তুমি কলেজে পড়েছিলে, না বউমা ?

হ্যাঁ।

এতদিন সংসারে বাস করছ, একা এতকাল সংসার চালিয়ে এলে, সাংসারিক জ্ঞানও তো তোমার আছে ? তুমি তো বুদ্ধিমতী ?

এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন ?

করব না ? নিজের বুদ্ধি খাটাতে গিয়ে তুমি কতগুলি মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছ, ভাবতে পার ? একটা খবর পেয়ে শেষ সময়ে আমি যদি আসতে পারতাম, একদিনে পঁচিশ বছরের গন্ডগোল মিটে যেত। ছেলের শোক ? কীসের শোক আমার ? ছেলে আমার যেখানে গেছে, আজ বাদে কাল আমি সেখানে চলে যাব। তার চেয়ে আমার ভুলটা সংশোধন করার সুযোগ দিলে কি তুমি আমাকে বেশি দয়া দেখাতে না বউমা ?

সাধনা তেমনি মৃদুস্বরে বলিলেন, তা হত না বাবা।

হত না ? কেন হত না ?

সাধনা চুপ করিয়া থাকেন, শঙ্কর অসহায়ের মতো বীরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। এবার কী করিবেন বীরেশ্বর ? তিয়াত্তর বছরের জীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া আজ কি বীরেশ্বর ধমক দিবেন পঁচিশ বছর যে ছেলের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না, সেই ছেলের মাঝবয়সি স্ত্রীকে ? এ কী কলহ আজ বাধিয়া গেল এঁদের !

বীরেশ্বর আবার বলিলেন, ছেলেমানুষি কোরো না বউমা। কেন হত না স্পষ্ট করে বলো।

বলে কী হবে বাবা ? অনর্থক মনে কষ্ট পাবেন।

তুমি বুঝি ভেবেছ, মনে আমি কোনোদিন কষ্ট পাইনি, তুমি যে কষ্ট দেবে সইতে পারব না ? আমার কষ্টের কথা ছেড়ে দাও, তোমার যা বলবার আছে তাই বলো সোজা ভাষায়, আমি হাতজোড় করছি তোমার কাছে।

সাধনা মৃদুস্বরে বলিলেন, আমি হতে দিতাম না বাবা।

তুমি হতে দিতে না ?

না। হতে দিতাম না, কোনোদিন দেবও না।

বীরেশ্বর ঝিমাইয়া পড়িলেন। শঙ্কর জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিতে পাইল, কাদের দোতলা বাড়ির উপরের ঘরের একটি আয়নায় প্রতিফলিত হইয়া শেষ বেলার রোদ এ বাড়ির ভিজা উঠানের সেইখানে আসিয়া পড়িয়াছে, যেখানে এইমাত্র নিমির সমবয়সি একটি বিধবা মেয়ে এঁটো বাসন মাজিতে বসিল।

আয়নায় প্রতিফলিত রোদ আসিয়া পড়িবার কোনো দরকার ছিল না, মেয়েটির এঁটো বাসন মাজিতে বসিবার ভঙ্গিতেই যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল শঙ্করের। ঘরে তার ঠাকুরদাদা আর জেঠাইমার মধ্যে যে সবাক নাটকের অভিনয় চলিয়াছে, সে নাটক গড়িয়া উঠিতে সময় লাগিয়াছে এক শতাব্দীর চার ভাগের এক ভাগ, চৌবাচ্চা হইতে আর এক বালতি জল তুলিয়া এঁটো বাসন মাজিতে বসিয়া উঠানে মেয়েটি তার চেয়েও জমকালো নাটকের সূচনা করিয়া দিল এক মিনিটে। লম্বা-চওড়া অ-বাঙালি মেয়ের মতো শরীর, স্বাভাবিক রঙিন রং, পরনে অতিরিক্ত সাদা থান, এ সবের জন্য নয়, এ সব মিলিয়া জমকালো হইয়াছে শুধু মানুষটা,—নাটকীয় তার অকথ্য অবর্ণনীয় রাজবানির ভঙ্গিতে বাসন মাজিতে বসা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয় করিয়া আর যেন কাজ খুঁজিয়া পায় নাই, তাই রাগেব মাথায় বাসন মাজিতে বসিয়াছে। রাগ কমিলেই সিংহাসনে গিয়া বসিবে।

বাসন মাজা শেষ করিয়া সে কিন্তু আসিয়া বসিল শঙ্করের কাছেই, চারিটি পায়া-লাগানো এক টুকরা কাঠের তক্তায়। বসিবার জন্য অবশ্য সে আসে নাই, আসিয়াছিল ভাঁড়ার ঘরেব চাবি চাহিতে, আর কিছু নয়। ঘরে অন্য মানুষ আছে কি না কে তা জানে ! কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছিলেন বীরেশ্বর বোধ হয়, মৃত পুত্রকে লইয়া পুত্রবধূর সঙ্গে উচ্ছ্বাসের আদানপ্রদান বন্ধ করিবার জন্য।

মেয়েটি কে বউমা ?

ও ? তরঙ্গ।

তরঙ্গিনী ?

জবাব দিয়াছিল মেয়েটি নিজেই, না, শুধু তরঙ্গ।

রসিকতা জমে না, কিছুক্ষণ জমিবেও না। তবু বীরেশ্বর রসিকতার ভঙ্গিতে বলিয়াছিলেন তরঙ্গ আমাদের কে ?

সম্পর্কের কথা বলছেন ? সম্পর্ক কিছু নেই, আমি এখানে থাকি।

স্পষ্ট বলে দিলে দিদি সম্পর্ক নেই ! আমি যে তোমার দাদু ?

তরঙ্গ বলিয়াছিল, ঠাকুরদা না দাদামশায় ?

তখন সাধনা করিয়া দিয়াছিলেন পরিচয়। তরঙ্গকে বলিয়াছিলেন, ইনি আমার শ্বশুর তরঙ্গ, আর এ অনুপমের ভাই শঙ্করলাল। আর বীরেশ্বরকে বলিয়াছিলেন, রজনী ঠাকুরপোকে আপনার বোধ হয় মনে নেই বাবা, তরঙ্গ তার সেজো মেয়ে।

অতি খাপছাড়া ভাবে তরঙ্গ তখন নমস্কার করিয়াছিল দুজনকে, হাততালি দেওয়ার মতো জোরে দু-হাতের তালু সে একত্র করিয়াছিল বটে, কিন্তু সুখের বিষয় হাত দুটি তার কোমল বলিয়া আওয়াজটা জোরালো হয় নাই। তারপর সাধনার হুকুম হইয়াছিল বসিবার। সহজ, স্বাভাবিক, সুশ্রাব্য হুকুম, মিনতি করার মতো।

বসছি। সব কাজ কিন্তু পড়ে রইল জেঠিমা।

ছি, তরঙ্গ ! কতবার তোমায় বলেছি, বাড়িতে বাইরের লোক এলে মেয়েদের কোনো কাজ থাকে না, যাঁরা এলেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করা, তাঁদের সুখ-সুবিধা দেখা, এই শুধু তখন মেয়েদের কাজ। এরা না হয় আত্মীয়, অন্য কেউ হলে কী রকম অস্বস্তি বোধ করতেন বল তো ? ভাবতেন যে এসে সংসারের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন, বেশিক্ষণ বসা চলবে না। যে বাড়িতে এসে মানুষ স্বস্তি পায় না, সেটা কি বাড়ি, না, সে বাড়িতে কাজ বলে কোনো কিছু আছে ! দরকার হলে সারাদিন অন্য কর্তব্য করে যে মেয়ে সংসারের সব কাজ করতে পারে সেই তো কাজের মেয়ে। জানালা দিয়ে দেখলাম তুমি বাসন মাজতে বসলে, তখন কিছু বলিনি ! কিন্তু আর কোনোদিন এ রকম কোরো না তবু, এত করে যা শেখাই, তা যদি ভুলে যাও, বড্ড কষ্ট হয় আমার।—কটা বাজল রে নিমি ? সাড়ে পাঁচ। ও মা, এখুনি কলে জল চলে যাবে !

খাবার জলটা তুলে রেখে আসব জেঠিমা ?

সাধনা একটু ভাবিয়া বলিলেন, না, তুমি বোসো। নিমি জল তুলতে যাক। বড়ো পিতলের কলসিটা কলতলায় নিয়ে যাস না নিমি, আনতে পারবি না। ছোটো কলসিতে কলের জল ভরে নিয়ে গিয়ে ও কলসিটা ভরিস। ঢাকনিগুলো তিনদিন ধোওয়া হয়নি, একটু সাবান দিয়ে ধুয়ে দিস। গায়ে মাখার সাবান নয় কিন্তু কাপড়কাচা সাবান। বাথরুমের খোপে দেখবি দু-টুকরো সাবান আছে, কাপড়কাচা, ছোটো টুকরোটা নিস। আর শোন—সব কথা না শুনেই চলে যাস কেন বল তো ? তোদের শিখিয়ে শিখিয়ে আর পারলাম না নিমি—একটা কথা কতবার করে শেখাব ? কী বলছিলাম ? যা, সব গোল পাকিয়ে গেল !

মৃদু একটু হাসিলেন সাধনা, হাসির সঙ্গে সখেদে বলিলেন, কী যেন হয়েছে আমার মাথাটায়, চারিদিকে আর নজর রাখতে পারি না, সংসারের কথা ভাবতে ভাবতে মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে ওঠে।—হ্যাঁ, খাবার জল তুলে স্টোভটা ধরিয়ে আমায় ডাকিস নিমি। আবার সব কথা না শুনে চলে যায় ! তোর আজ কী হয়েছে বল তো নিমি ? স্টোভ ধরাবার সময় স্পিরিট জ্বলবার আগে দুধের কড়াটাই বসিয়ে দিস স্টোভে। কড়ায়ের ঢাকা নামিয়ে যেন আমায় ডাকতে আসিস না, বেড়ালে মুখ দেবে।

দুধ যদি ফুটে ওঠে মা ?

ফুটে উঠবে ! স্পিরিটটুকু জ্বলবে আর পাম্প করে আমায় ডাকবি, তার মধ্যে দেড় সের দুধ ফুটে উঠবে ? আজ তোকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না নিমি, তোর মাথার ঠিক নেই। তুই বোস, আমি যাই।

নিমি ব্যাকুলভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, না, তোমার যেতে হবে না, আমি পারব।

সাধনা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, ছি, নিমি। আমি যা বলছি, তা কি না ভেবে না হিসেব করে বলছি ? কথা শোনো, এইখানে বোসো, এঁদের দুখানা গান শুনিয়ে দাও তোমরা দুজনে ততক্ষণ, আমি চোখের পলকে কাজ ক-টা সেরে আসছি, ও আর কতক্ষণের কাজ ? নিমি আগে গেয়ো,—বাইরে উঠেছে ঝাঁঝালো রোদ। তবু তুমি কী গাইবে ? আকাশের সীমা বাতাসের নীল, আলো দূরে, বহুদূরে ?

তরঙ্গ বলিল, আচ্ছা।

সাধনা বীরেশ্বরকে বলিলেন, আমি যাই বাবা ? ওদের গান শেষ হতে না হতে আসব।

সাধনা চাহিলেন অনুমতি, অনুমতি দেওয়ার বদলে বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ওদের গান শিখিয়েছ, না বউমা ?

হ্যাঁ। নিমিকে ছেলেবেলা থেকে শিখিয়েছি, ও ভালো গাইতে পারে, কিন্তু গলাটা তেমন মিষ্টি নয়। তবু অল্পদিন শিখছে, গানের কায়দা এখনও নিখুঁত হয়নি, তবে গলা ভারী মিষ্টি। নিমির চেয়ে ওর গান আপনাদের ভালো লাগবে, তাইতো আগে নিমিকে তারপর তবুকে গাইতে বললাম। কলের জল চলে যাবে বাবা, আমি আসছি।

কলের জল যায় এবং আসে, সময় যায় এবং থাকে। সত্যই থাকে,—সব সময়। মানুষের জীবনকাহিনি সাময়িক, কিন্তু বোকামি যাদের ব্যাধি, আবর্তন ও পরিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে পূর্বানুবৃত্তি আর ক্রমশ ছাড়া বুঝিতে পারা তাদের পক্ষে অপরাধ। অন্তত বুদ্ধিমানেরা তাই স্থির করিয়া দিয়াছে বোকাদের জন্য। তরঙ্গ কাছে আসিয়া বসা মাত্র শঙ্করের মনে যে ভাবতরঙ্গ উঠিয়াছিল, তার মধ্যে মিশিয়াছিল অনেকখানি অস্বাভাবিকতা। কিন্তু সেটুকু বুঝিবার মতো মন তো শঙ্করের নয়, দশদিন তরঙ্গের সঙ্গে দেখাশোনা হওয়ার পর এটা ঘটিলে তবু সে বুঝিতে পারিত ভাবাবেগের এতখানি অস্বাভাবিকতার ইতিহাস আছে এবং সেই জন্য এই অস্বাভাবিকতার খানিকটা স্বাভাবিক,

কিন্তু তরঙ্গাকে দেখিয়াই বিচলিত হওয়ার জন্য নিজেকে নির্লজ্জ মনে করিয়া সে বড়ো কষ্ট পাইতেছিল। একবার সতুকে পাওয়া গেল। নিমি বাহিরে ঝাঁঝালো রোদ উঠিবার গান গাহিল, তরঙ্গের গানে নীল আকাশের সীমানা পাওয়া গেল বাতাসে। তবু অপরাধের ভয়ে শঙ্করের মনে শান্তি রহিল না।

বীরেশ্বরের মনেও শান্তি ছিল না, প্রায় একই ধরনের নারী সংক্রান্ত অপরাধের অনুভূতিতে। অথচ কতদূর স্বাভাবিক ও সামাজিক ছিল তাঁর অপরাধ !—দুবার বেশি বিবাহ করা। অভিজ্ঞতার জন্য যতটুকু দরকার তার বেশি অসংযম বীরেশ্বরের জীবনে কোনোদিন আসিতে পারে নাই। পুরুষ মানুষের পক্ষে তিনবার বিবাহ করায় কী অন্যায় থাকিতে পারে এখনও তিনি তাহা ভালো করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তবু এ বাড়িতে বহুদিন ধরিয়া সঞ্চিত অব্যক্ত ধিক্কার অনুভব করিয়া তিনি কাবু হইয়া পড়িয়াছেন। এমনিভাবে একদিন তিনি তাঁর বংশের প্রায় অজানা শাখাটির সঙ্গে পরিচিত হইতে আসিবেন, এই ক্ষুদ্র ঘরখানির মৃদু অজানা সুবাস মেশানো বাতাস নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণ বাঁচিতে বাধ্য হইবেন, এ কথা জানিয়াই যেন তাঁকে শান্তি দিবার জন্য অনুপমের বাবা আর ঠাকুরমা তাঁর মনের স্থায়ী অশান্তির সঙ্গে পাপের উপলব্ধি মিশিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে !

ক্ষোভে বীরেশ্বরের চোখে জল আসিতে চায়। বিপরীত অস্বাভাবিক শাসন-পীড়ন মানুষের জীবনে ? স্বামীত্যাগের অপরাধ করিল অনুপমের ঠাকুরমা, আর সমস্ত জীবন মনঃকষ্ট সহ্য করিয়াও তাঁর নিস্তার হইল না, আত্মমর্যাদাটুকু পর্যন্ত আজ হারাইতে হইবে !

সাধনার সঙ্গে চা জলখাবার আসিল। জলখাবার বিশেষ কিছু নয়, ঘিয়ে ভাজা, দুধে সিদ্ধ চিনি-মেশানো সুজি আব কয়েকখানা বিস্কুট। বীরেশ্বর এ সব কিছু খানও না, সন্ধ্যা না করিয়া কিছু খাইবেনও না। এখানে সন্ধ্যা করিয়া কিছু খাওয়া ? না, সন্ধ্যার সময় তিনি যাইবেন, আহ্নিক করিবেন অনেকক্ষণ, তাবপব কিছু না খাইয়াই শুইয়া পড়িবেন।

সন্ধ্যা আসিতে আসিতে গভীর ক্লান্তি আসিল। বীরেশ্বর উঠিলেন। সকলে একসঙ্গে নামিয়া গেল নীচের উঠানে। সেখানে বীরেশ্বর শ্রান্ত সুরে সাধনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ও বাড়িতে যাবে না বউমা ?

কেন যাব না বাবা ?

একদিন গিয়ে সংসারটা দেখে আর মানুষগুলির সঙ্গে পরিচয় করে এসো। তারপর তোমাকে একটা অনুরোধ জানাব।

কী অনুরোধ করবেন বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার মনে হয় না সেটা সম্ভব হবে। আমার পক্ষে আপনার ওখানে গিয়ে থাকা—

বছরখানেক আগে যে মরিয়া গিয়াছে তাকে লইয়া আজ দুজনের মধ্যে যে কলহ বাধিয়াছিল, শঙ্করলালের একবার ভয় হইযাছিল বীরেশ্বর বুঝি ধমক দিয়া বসেন সাধনাকে। তখন বীরেশ্বর আত্মসংবরণ করিয়াছিলেন, এখন বিদায় নেওয়াব সময় সাধনার কথা শুনিবা মাত্র রাগে আগুন হইয়া এত জোরে তিনি ধমক দিয়া উঠিলেন যে, মনে হইল সাধনার তখনকার প্রাপ্য ধমকটাই সুদে আসলে তিনি দান করিয়া যাইতেছেন।

তোমার বুদ্ধি খুব টনটনে, সব তুমি বুঝতে পার, তা জানি বউমা। কিন্তু আমি কী বলব শুনে তারপর পাকামি কোরো, এখন থামো। তোমাদের পাকামির চোটে সংসারে মানুষের টিকে থাকা দায় হয়ে উঠেছে।

হনহন করিয়া তিনি চলিয়া যান, সাধনা ডাকিয়া বলিলেন, একটু দাঁড়ান বাবা, প্রণাম করব।

আমার বাড়িতে গিয়ে কোরো।

দড়াম করিয়া সদরের দরজা খুলিয়া বীরেশ্বর বাহির হইয়া গেলেন, পিছনে গেল শঙ্কর। গলির মোড়ে মোটরে উঠিবার সময় সেই খেয়াল করিল যে, সতুকে ফেলিয়া আসা হইয়াছে।

সতু রয়ে গেছে দাদা।

বীরেশ্বর গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। বলিলেন, নিয়ে আয়। শিগগির আসিস।

সদর দরজা বন্ধ হয় নাই। ভিতরে ঢুকিয়া শঙ্কর দেখিতে পাইল, এইটুকু সময়ের মধ্যেই উনানে আঁচ পড়িয়াছে, সাধনা তরকারি কাটিতে বসিয়াছেন, নিমি আটা মাখিতেছে আর তরঙ্গ বসিয়াছে মশলা বাটিতে। তরঙ্গের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া সতু যেন তাকে কী বলিতেছিল, শঙ্করকে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল।

শঙ্কর বলিল, সতু আয়।

সতু বলিল, না।

এতটুকু সময়ের মধ্যে কী করিয়া যে তরঙ্গের সঙ্গে এত ভাব জমিয়া গেল সতুর ! শঙ্কর আরও দুপা আগাইয়া আসা মাত্র সে দুই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিল তরঙ্গের।

তরঙ্গ বলিল, আপনারা যখন উপরে বসেছিলেন, চিলেকুঠিতে গিয়ে খোকা আমার সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছে আপনাদের সঙ্গে যাবে না, এখানে থাকবে।

সাধনা বলিলেন, যেতে যখন চাইছে না, আজ থাক। কাল আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব।

কাল আপনারা যাবেন ?

বাবা যেরকম রাগ করে গেলেন, কাল যাওয়াই ভালো। উনি বলে গিয়েছেন, বাবার মনে যেন কষ্ট না দিই। জান শঙ্কর, আমার হয়েছে বিপদ। এমন কতকগুলি উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন উনি, যার একটা রাখতে গেলে আর একটা রাখা যায় না। দোটানায় দোটানায় প্রাণ আমার বেরিয়ে গেল বাবা।

সাধনার আপশোশে নীরবতার সায় দিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, কাল কখন গাড়ি পাঠিয়ে দেব ?

সাধনা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, গাড়ি কি হবে ? বিষ্যুদবার তো কাল ? অনুপম কাল দেরিতে কলেজে যাবে, ওর সঙ্গেই আমরা যেতে পারব।

তরঙ্গ বলিল, সতু আমাকে যেতে বারণ করছে জেঠিমা, বলছে নিজেও যাবে না, আমাকেও যেতে দেবে না।

হাসিমুখে সাধনাকে এ কথা বলিয়া শঙ্করের দিকে চাহিয়াই তরঙ্গ গম্ভীর হইয়া গেল।

এমনিভাবে একই বংশের দুটি শাখা কাছাকাছি আসিল, কিন্তু মিলিত হইল না। বীরেশ্বরের একটি পুত্রবধূ স্টোভ ধরাইতে হিসাব করিয়া স্পিরিটের উত্তাপটুকুর অপচয় পর্যন্ত বাঁচাইয়া চলিতে লাগিলেন এবং একটি পুত্রবধূ বিষাদের বেহিসাবি প্ররোচনায় মুখে খাবলা খাবলা মাখিতে লাগিলেন দশ বোতল স্পিরিটের দামের এক কৌটা ক্রিম। বীরেশ্বরের একটি নাতির বাজেটে এক পয়সার পান খাওয়া হইয়া রহিল বিলাসিতার খরচ এবং একটি নাতি একটার পর একটা পুড়াইয়া চলিল দশটা পানের দামের সিগারেট।

যদি বীরেশ্বরের মনে কষ্ট না দিবার আদেশটাই শুধু অনুপমের বাবা দিয়া যাইতেন, যদি বলিয়া যাইতেন যে, বীরেশ্বরের একটি পয়সা যেন তাঁর বংশের কেউ গ্রহণ না করে, তবে হয়তো সাধনা বীরেশ্বরের তর্কবিতর্ক, আদেশ, অনুরোধ ও মিনতির মধ্যে অন্তত শেষেরটাকে মানিয়া লইয়া উঠিয়া যাইতেন বীরেশ্বরের বাড়িতে, আর হাঁপ ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত মনে এলাইয়া পড়িতেন ফ্যানের তলার নরম শোফায়। কিন্তু এই স্বতন্ত্র পরিবারটি গড়িয়া উঠিয়াছে বীরেশ্বরকে চিরদিনের জন্য বর্জনীয় করিয়া রাখিবার প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে, এই পরিবারের মানুষগুলির মেরুদণ্ড সোজা হইয়া আছে

চাওয়া মাত্র বীরেশ্বরের টাকার যে ভাগ পাওয়া যায় সেই টাকার লোভ জয় করিবার সাধনায়, আজ কি সে সব বাতিল করিয়া দেওয়া চলে ? শুধু মৃত স্বামীর হুকুম অমান্য করা নয়, সাধনার পক্ষে ভোলা কঠিন যে, বিবাহের পর হইতে মন্ত্র জপের মতো স্বামী তাকে শোনাইতেন, আমি যদি হঠাৎ মরে যাই সাধনা, আর তোমার টাকার দরকার হয়, বাবার কাছে হাত পাতার বদলে তুমি অসতী হয়ে যেয়ো, তোমার রূপ আছে, কলকাতা শহরে বড়োলোকও আছে অনেক। কী কুৎসিত কথা ! কিন্তু কী আবেগের সঙ্গে কথাগুলি তিনি বলিতেন ! স্বামী যে পাগলাটে ছিলেন, সাধনা তা জানেন। যে উন্মাদিনী জননীর হাতে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন, তাতে পাগলাটে হওয়ার বদলে একেবারে যে পাগল হইয়া যান নাই তিনি, তাই আশ্চর্য !

তা ছাড়া, কী হইবে বেশি টাকা দিয়া ? এ তাদের নিজের বাড়ি, সুতরাং থাকার ভাবনা নাই। যে টাকা হাতে আছে, সে টাকা শেষ হওয়ার আগেই অনুপম টাকা আনিতে পারিবে।

প্রথমে আসা-যাওয়া একটু বেশি ছিল, তারপর গেল কমিয়া। বীরেশ্বর দু-চারদিন পরে পরেই গাড়ি লইয়া আসিতেন, খানিকক্ষণ এ বাড়িতে থাকিয়া সকলকে লইয়া যাইতেন নিজের বাড়ি। সেখানে রান্নাবান্নার আয়োজন সেদিন হইত খানিকটা উৎসবের মতো, বীরেশ্বরের সভাপতিত্বে সকলে একসঙ্গে বানাইত কথা গল্প হাসি আনন্দের সভা, মনে হইত সত্যই যেন মিলনোৎসব। কিন্তু এক তরফা যাওয়া আর আসা সাধনা কতদিন চালাইবেন ? অথচ বীরেশ্বরের বাড়ির সকলে আসিলে যে রকম খরচ করিতে হয়, ঘনঘন সে রকম খরচ করিবার ক্ষমতাও সাধনার নাই। তা ছাড়া, বীরেশ্বরের বাড়িতে দুটি পরিবারের মিলনে যত হাসি-আনন্দই সৃষ্টি হোক, বারবার এ কথা কার না মনে পড়িতে থাকে যে, এ বাড়িতে যাদের চিরদিন এ বাড়িরই লোক হইয়া বাস করিবার কথা তাহারা বেড়াইতে আসিয়াছে সাময়িক অতিথির মতো এবং তাহারা আসিয়াছে বলিয়াই এ বাড়িতে আজ এই অতিরিক্ত হাসি-আনন্দের সৃষ্টি ? এদিকে সাধনার বাড়িতে আসিয়া বীরেশ্বরের বাড়ির সকলে নড়াচড়া করিবার স্থান পায় না, বাড়িতে যেন জনতার সৃষ্টি হইয়াছে ! সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় শঙ্করের মার। সাতাশ টাকার চেয়ে কম দামি শাড়ি পড়িয়া বাড়ির বাহির হইলে তার বিষাদের সঙ্গে মিশিয়া যায় মাথা-কাটা-যাওয়া লজ্জা অথচ সাতাশ টাকার শাড়ি যে তাকে ভ্যাংচায় এ অনুভূতিটা অন্য সব জায়গায় অস্পষ্ট থাকিলেও সাধনার বাড়িতে ঢোকা মাত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ পরেই আর যেন সহ্য হইতে চায় না সাতাশ টাকার শাড়ি দিয়া নিজেকে নিজের ভ্যাংচানো।

বড়ো মাথা ধরেছে দিদি। কাপড়টা ছেড়ে ফেলি, কেমন ? মাথা ধরার সঙ্গে কাপড় ছাড়ার সম্পর্কটা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া সাধনা তাকে নিমির একখানা শাড়ি দেন। নিমির শাড়ি পরিয়া আরও বিপদ হয় শঙ্করের মার, নিজেকে ভিখারিনি মনে করিবার যে অনুভূতিটা প্রায় সব সময়েই স্পষ্ট হইয়া থাকে তার মনে, সেটা হইয়া উঠে উগ্র এবং নিজেকে নিজের ভেংচি কাটার চেয়েও অসহ্য।

আমার শরীর কেমন করছে দিদি। আমি বরং বাড়ি চলে যাই। যাব ?

একটু শোবে ? শুয়েই থাক একটু।

কিন্তু শোবার সঙ্গে মনের বিকারের সম্পর্ক নাই। অবস্থাবিশেষে বরং কষ্ট তাতে আরও বাড়ে। শরীর ভালো নয় বলিয়া শঙ্করলালের মা শুইয়া পড়িয়াছেন শুনিয়া সকলে কমবেশি ব্যস্ত হয়, কী হইয়াছে, কেন হইয়াছে, এখন কেমন লাগিতেছে শরীর, এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। সাধনার বিছানায় শুইয়া শঙ্করলালের মার যেন নিশ্বাস আটকাইয়া আসে। ছি ! সকলকে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন তিনি ! এর চেয়ে মরাও যে তাঁর ভালো ?

শঙ্করলাল এ বাড়িতে আসে একটা অদ্ভুত নিয়মে। আসে সে একা এবং পরপর তিন-চারদিন আসিয়া আট-দশদিন একেবারে আসে না। মনে হয়, পরপর তিন-চারদিন আসিলেই এ বাড়িতে আসিবার শখ তার মিটিয়া যায় এবং আট-দশদিন না আসিলে এ বাড়িতে আসিবার এমন একটা শখ তার জাগে যে, পরপর তিন-চারদিন আসিয়া সে শখটা তাকে মিটাইতে হয়। প্রথম দিন শঙ্করলালের মুখ দেখিয়া হাসিভরা মুখখানা তরঙ্গ গম্ভীর করিয়া ফেলিয়াছিল, এখন মমতাময়ী রাজরানির মতো শঙ্করলালের ছেলেমানুষি দৃষ্টিপাতকে ক্ষমা করিয়া হাসিমুখেই সে কথা বলে।

দিনকে দিন রোগা হয়ে যাচ্ছেন।

পরীক্ষা আসছে যে।

পড়ে পড়ে রোগা হচ্ছেন ? বেশ ! এ রকম রেটে রোগা হয়ে চললে পরীক্ষা পর্যন্ত টিকবেন তো ?

শ্লেষ নয়, শ্লেষ তরঙ্গ জানেও না, শ্লেষ তার মুখে মানায় না। স্নেহ করিয়াই সে কথাগুলি বলে। কিন্তু সেবার শঙ্করলালের এ বাড়িতে না আসিবার আট-দশদিনের মেয়াদটা বাড়িয়া পনেরো দিনে গিয়া দাঁড়ায়। পনেরো দিন পরে আবার যখন সে আসে, দেখা যায় সে আরও রোগা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তরঙ্গ আর তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু বলে না। শঙ্করলালও এ বাড়িতে আসিবার মেয়াদটা সেবার বাড়াইয়া করে চারদিন।

সতু মাঝে মাঝে আসে আর দু-একদিন এ বাড়িতে থাকিয়া যায়। আসিতে সে চায় প্রত্যেক দিন এবং আসিয়া থাকিয়া যাইতে চায় চিরদিনের জন্য, কিন্তু রোজ তাকে কেউ আনেও না, দু-একদিনের বেশি এ বাড়িতে থাকিতেও দেয় না।

আসেন না শুধু শঙ্করলালের বাবা রামলাল। তিনি আদালতে ওকালতি করেন আর এখানে-ওখানে মদ খান। বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন, নিজের ঘরে থাকেন একা। বাড়ির লোককে তিনি বিরক্ত করেন না, বাড়ির লোকও তাঁকে বিরক্ত করে না। বীরেশ্বরের সঙ্গে মাসে তাঁর যে কটি কথার আদানপ্রদান হয়, তা বোধ হয় আঙুলে গুনিয়া ফেলা যায়।

রাত দুটোর সময় বাড়ি ফিরিয়া রামলাল যদি দেখিতে পান যে শঙ্করলাল পড়িতেছে, স্থির পদে হোক, টলিতে টলিতে হোক, রামলাল তখন একবার ছেলের ঘরে যান।

বলেন, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ো শঙ্কর।

শঙ্করলাল বিনা বাক্যব্যয়ে আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়ে।

তিন

পরীক্ষার জন্য কে যে বেশি রাত জাগে শঙ্করলাল না অনুপম, ঠিক করিয়া বলা শক্ত। সাধ দুজনেরই সমান উগ্র, স্বপ্ন দুজনেরই সমান জটিল। শঙ্কর হইবে বিদ্বান আর অনুপম হইবে বৈজ্ঞানিক। জগতে তাদের তুলনা যদিও থাকে, অমর কীর্তি থাকিবে দুজনেরই, এত বড়ো হইবে দুজনেই যে, শ্রদ্ধায়, ভয়ে বিস্ময়ে মানুষ থ বনিয়া থাকিবে।

শঙ্করের পরীক্ষাই শেষ হইয়া গেল আগে, গরমে ও গুমোটে ভ্যাপসা একটা দিনের মাঝামাঝি। শেষ প্রশ্নের জবাবটা লিখিয়া তরঙ্গ ছাড়া এ জগতে আর কেউ নাই মনে হওয়ায় মনটা কেমন যেন তার হইয়া গেল বিভ্রান্ত। বাড়ি খালি পড়িয়া আছে জানিবামাত্র চোরের যেমন মনে হয় ভারী একটা সুযোগ পাওয়া গিয়াছে, ঠিক সেই রকম মনে হইতে লাগিল শঙ্করের। রোজ কি মানুষ এত স্পষ্টভাবে অনুভব করার সুযোগ পায় যে, তরঙ্গ ছাড়া পৃথিবীটা যখন ফাঁকা অথবা ফাঁকি, তরঙ্গকে তখন অবশ্যই পাওয়া দরকার ?

অনুপমদের বাড়ি পৌছিতে বেলা চারটা বাজিয়া গেল। প্রথামতো কলতলায় তরঙ্গ বাসন মাজিতে বসিয়াছিল, ছাইমাখা হাতে উঠিয়া আসিয়া কনুয়ের ঠেলায় সে খুলিয়া দিল সদরের খিল। তারপর শঙ্করের সিল্কের জামায় ছাই লাগা বাঁচানোর জন্য তাকেও ঠেলিয়া দিল কনুই দিয়াই। তাতে জামায় ছাই লাগা বাঁচিল বটে, আবেগের সঙ্গে তরঙ্গের হাত চাপিয়া ধরায় দু হাতেই কিন্তু শঙ্করের ছাই লাগিয়া গেল।

তরঙ্গ বলিল, মনে হচ্ছে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

শঙ্করের শীর্ণ দেহ, বিবর্ণ মুখ আর উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি দেখিলে মনে হয়, শুধু মাথা নয়, দেহের সমস্ত কলকবজাও যেন তাব খারাপ হইয়া গিয়াছে। প্রথম যেদিন প্রায় এমনই সময় অনিচ্ছার সঙ্গে সে এ বাড়িতে ঢুকিয়াছিল, সেদিনের সঙ্গে তাকে আজ মিলাইয়া না দেখিলেও সন্দেহ হয়, ইতিমধ্যে ভয়ানক একটা অসুখে সে ভুগিয়াছে। পরলোকে না গিয়া এ বাড়িতে তরঙ্গের ছাই-মাখা হাত চাপিয়া ধরিতে সে যে আসিতে পারিয়াছে, তাই পরমাশ্চর্য। তবে কথা শুনিলে আর ভাবভঙ্গি দেখিলে বোঝা যায়, পরলোকের কোনো একটি অগ্রদূত, সোজা কথায় যাদের লোকে ভূত বলে, এখনও তার ঘাড়ে চাপিয়া আছে।

তরঙ্গ ভাবিয়া-চিন্তিয়া শঙ্করকে বাড়ি হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিল। বলিল, আপনি বাড়ি যান। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল, কটা দিন এখন সময়মতো নেয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে নিজেকে সামলে নিন গিয়ে। তখন বুঝতে পারবেন আজ কী রকম পাগলামি করছেন।

শঙ্কর ভালোবাসা জানাইতেও জানে না, কেউ ভালোবাসে কিনা বুঝিতেও জানে না। তরঙ্গের কথাও সে তাই বুঝিতে চায় না, কিছু জানিতেও চায় না। ফাঁকা উঠানে দাঁড়াইয়া এমনভাবে এমন সব কথা বলিতে থাকে যে, আসল কথাটা বুঝিলেও কথাগুলি তরঙ্গের মাথায় ঢোকে না। শেষ পরীক্ষা দিয়া সে যে আজ বাড়ি ফেরে নাই, এই গরমে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে,—এইটাই নাকি তরঙ্গকে সে যে ভীষণ ভালোবাসে, তার অকাট্য প্রমাণ।

তরঙ্গ সায় দিয়া বলে, তাই তো বলছি বাড়ি যান, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন গে।

শঙ্কর এ সব কথা শুনিতে আসে নাই, তরঙ্গের কথা সে কানেও তোলে না, নিজেব পক্ষেই ওকালতি করিয়া চলে ক্রমাগত। তরঙ্গের জন্য তার পড়ার ক্ষতি হইয়াছে, তরঙ্গের জন্য সে ভালো লিখিতে পারে নাই, তরঙ্গের জন্য সে বড়ো কষ্ট পাইয়াছে। এই সমস্ত ক্ষতির পূরণ হিসাবেই সে যেন তরঙ্গের হাত দুটিকে শক্ত করিয়া ধরিয়া আছে, কোনোদিন ছাড়িয়া দিবে না। তরঙ্গ একবাব হাত ছাড়িয়া দিবার দাবি জানায়, হয়তো শঙ্কর সেই অনুরোধ শুনিতে পায়, হয়তো পায় না, হাত একভাবেই ধরা থাকে। তরঙ্গের মুখ তাতে গম্ভীর হইয়া যায়। তাকে ভালোবাসা জানাইতে আসিয়া তাকেই শঙ্কর অবহেলা করিতেছে, একটা কথা শুনিতেছে না, কেবল এই জন্য নয়, কোনো অবস্থাতেই কারও অবহেলা তরঙ্গ সহ্য করিতে পারে না।

হাতটা ছেড়ে দিতে বলছি, শুনতে পাচ্ছেন ? গায়ে তো জোর নেই একফোঁটা, এত জোর খাটাচ্ছেন কেন ?

জোর খাটাচ্ছি ?

তা নয় ? থাকলে জোর খাটাতেন মানাত, এদিকে কাঁপছেন ঠকঠক করে, কিন্তু হাত ধরেছেন এমনভাবে যেন আমার সঙ্গে কুস্তি করবেন। চলুন তো বারান্দায় ছায়াতে যাই, শুনি আপনাব কী বলবার আছে।

তরঙ্গের ধমকে মুষ্টি শিথিল হইয়া গিয়াছিল শঙ্করের, এবার তরঙ্গই তার হাত ধরিয়া একটা জড়বস্তুকে টানিয়া লইয়া যাওয়ার মতো বারান্দায় লইয়া গেল। একটা টুল দেখাইয়া হুকুম দিল, বসুন।

হুকুম পালনে দেরি দেখিয়া শঙ্করের সিল্কের জামার জন্য যেটুকু মমতা তরঙ্গের ছিল, তাও যেন এবার উপিয়া গেল। দুই কাঁধে ছাই-মাখা হাত রাখিয়া জোর করিয়া শঙ্করকে সে বসাইয়া দিল টুলে, তারপর কলতলায় গিয়া একটা মাজা গেলাসের সঙ্গে ধুইয়া ফেলিল হাত। গেলাসে ঠান্ডা জল ভরিয়া আনিয়া বলিল, জল খেয়ে নিন, গলায় কথা আটকে যাচ্ছিল। তারপর বলুন তো এতক্ষণ কী বলছিলেন, ভালো করে গুছিয়ে বলুন।

বুঝতে পারনি ?

কেন বুঝব ? এত বয়সে একটা মেয়েকে দুটো মনের কথা জানাতে যে ছেলে হিমসিম খেয়ে যায়, তার আবোল-তাবোল কথা বুঝেও বুঝতে নেই।

শঙ্কর এবার রাগ করিয়া বলিল, তোমার মতো বয়সে যে মেয়ে এমন করে কথা বলতে পারে, তাদের ঘেন্না করতে হয়।

রাজরানির মতো যে বাসন মাজিতে পারে, এত সহজে তাকে কাবু করা যায় না। তরঙ্গ মৃদু হাসিয়া বলিল, সে আলাদা কথা।

তুমি পাগল তবু।

কে পাগল, আমি ? কীসে পাগল হলাম ? আপনাব সঙ্গে সমান তালে পাগলামি করছি না বলে ?

শঙ্কব খেপিয়া যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া তরঙ্গ তাড়াতাড়ি বিনয় করিয়া বলিল, আমার কথা বাদ দিন। আপনার কথা হচ্ছিল, তাই হোক। একটা কথা শুনবেন আমার ? আজ বাড়ি চলে যান। আজ যা বলতে চাইছিলেন মাসখানেক পরে এসে বলবেন। এ কদিন সময়মতো নেয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে সুস্থ হলেই দেখবেন, নিজেই চমৎকার বুঝতে পারবেন কত সহজ একটা ব্যাপারকে কী রকম ঘোরালো করে তুলছেন।

গ্রামোফোন বাজার মতো নির্ভুল, পরিবর্তনহীন উপদেশ। শঙ্করের মনে হয় গ্রামোফোনেব হৃদয় না থাক, এমন নির্লজ্জ হওয়ার ক্ষমতা গ্রামোফোনেবও নাই।

তোমার খুব মজা লাগছে, না·?

তরঙ্গ তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া বলিল, না, দুঃখ হচ্ছে। এগ্‌জামিনের চাপে আপনার মতো ছেলে এ রকম হয়ে যেতে পারেন ভাবলে আমার বড়ো কষ্ট হয়।

নভেল পড়ে পড়ে তোমার মতো মেয়ে এ রকম বেহায়া হয়ে যেতে পারে ভাবলে আমারও কষ্ট হয়।

দুজনেরই যখন কষ্ট হচ্ছে, আপনি বাড়ি যান।

বাড়ি গিয়ে সময়মতো নেয়ে খেয়ে ঘুমোব তো ?

আকাশের দেবীকে মানুষের অপমান করার চেষ্টার মতো শঙ্করের খোঁচা দেওয়া প্রশ্ন কোনো কাজে লাগিল না, অনেক চেষ্টায় কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব যেন শিষ্যেব মাথায় ঢুকাইয়া দিতে পারিয়াছে এইরকম ভাবে খুশি হইয়া তরঙ্গ বলিল, নিশ্চয়। শরীর মন সুস্থ হলে আসবেন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। আজকের কথা ভেবে যেন আবার পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবেন না লজ্জায়।

উঠানে নামিয়া গিয়া শঙ্কর বলিল, আর কোনোদিন তোমাদের বাড়ি আসব না।

তরঙ্গ বলিল, এটা আমার বাড়ি নয়।

গলিটা নূতনত্ব পাইয়াছে, গলির শেষে রাজপথের পারিপার্শ্বিকতায় আবির্ভাব ঘটিয়াছে অভিনবত্বের। দেওয়ালে মাথা ঠোকার চেয়ে হয়তো কিছু বেশি সময় লাগিয়াছে তরঙ্গকে প্রেম নিবেদন করিতে, ফলটা হইয়াছে একই রকম। জগৎটা গিয়াছে বদলাইয়া। জগৎ যে মানুষের মাথায় থাকে এতদিন কি শঙ্কর তা জানিত ? পথ চলিতে চলিতে শঙ্কর অনুভব করিতে লাগিল

সে হঠাৎ মহাজ্ঞানী, মহাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছে ; কারণ পরীক্ষা শেষ হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে যেমন মনে হইতেছিল যে বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজনটাও শেষ হইয়া গিয়াছে, তবঙ্গের খাপছাড়া প্রত্যাখ্যানের পর এখনও ঠিক সেইবকম মনে হইতেছে এবং এটুকু বুঝিতে আব তাব বাকি নাই যে, পবীক্ষাব সঙ্গে জীবন শেষ হওয়ার অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য ও অর্থহীন অনুভূতিটাকেই শুধু স্পষ্ট কবিয়া দিয়াছে তরঙ্গ, আর কিছু নয়।

কে তরঙ্গ ? কেউ নয় ! জগৎ কী ? মস্তিষ্কেব কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। জীবন কী ? যা মনে করা যায় তাই।

অতএব কষ্ট পাওয়ার কোনো কাবণ নাই। তবু অকাবণে এ রকম কষ্ট সে পাইতেছে কেন ? আস্তে হাঁটার জন্য ? জোরে হাঁটে শঙ্কর, কোনো লাভ হয় না। শরীরেব খানিকটা ঘাম শুধু বাহির হইয়া যায়। তৃষ্ণা পাইয়াছে বলিয়া ? পানেব দোকানে ডাব খাইয়া তৃষ্ণা মেটানোব সঙ্গে একবাব রোমাঞ্চ হয় শঙ্করের, জগৎ-ঠাসা মাথাটা বোঁ করিয়া ঘুবিয়া যায, শব্দটা পর্যন্ত শঙ্কর যেন শুনিতে পায়, তরঙ্গের কাছে আমল না পাওয়ায় ভিতরে যাই ঘটুক সেটা তবু বোধগম্য ব্যাপার, এ সমস্ত কোন দেশি প্রতিক্রিয়া ? হাতে এখনও ছাই লাগিয়া আছে। খানিকটা ডাবের জলেই শঙ্কব হাত ধুইয়া ফেলিল। এও এক ধরনের বসিকতা তবঙ্গেব, নিজেকে দেওযাব বদলে খানিকটা ছাই দিযাছে। কী শয়তান মেয়েটা, কী চমৎকার আয়ত্ত কবিয়াছে মানুষ ঠকানো বিদ্যা !

বন্যাব মতো তরঙ্গের শয়তানি পৃথিবী ভাসাইয়া দিযাছে। পানওয়ালা পর্যন্ত টাকার ভাঙানিতে একটা অচল সিকি চালাইবাব চেষ্টা কবে, তরঙ্গেব জন্য শঙ্কবের যেন অচল সিকি চেনাব শক্তিও লোপ পাইযাছে। গাল দেওয়ার পব পানওয়ালার অন্যায় বাগ দেখিয়া এক চড়ও শঙ্কব তাকে মারিয়া বসে। তাতে কিছুক্ষণেব জন্য একটা গন্ডগোলের সৃষ্টি হয। তা হোক, ব্যাপারটা যে অন্তত স্বাভাবিক তাই শঙ্কবের ঢের। তা ছাড়া দামি জামাকাপড়-পরা ভদ্রলোক পানওয়ালাকে গাল দিয়া চড় মারিলে ব্যাপাব আব কতদূর গড়াইতে পাবে ? একটু হইচই হইয়াই শেষ।

যেদিকেব ফুটপাতে রোদ পড়িয়াছে সেদিক দিয়াই খানিকক্ষণ হাঁটিবার পর শঙ্করেব খেয়াল হয়, এতক্ষণে মনটা বেশ শান্ত হইযাছে। ভযানক কিছু একটা কবিবাব জন্য ছটফট অবশ্য করিতেছে মনটা, তবু এতক্ষণ যেমন বিভ্রান্ত হইয়া ছিল, তার তুলনায় একেবাবে জুড়াইয়া ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে। আর ভাবনা নাই, এবার সে ধীরভাবে চারিদিক বিবেচনা করিয়া কাজ কবিতে পাবিবে, কোনো কারণে এতটুকু উত্তেজনা জাগিবে না, অবসাদ প্রশ্রয় পাইবে না, কথায় ব্যবহাবে সহজ সৌম্য ভাবটি অনায়াসে বজায় রাখিয়া চলিতে পারিবে।

এই অবস্থা ফিরিয়া পাইলে তবঙ্গ তাকে ফিবিয়া যাইতে বলিযাছিল, না ? কয়েকদিন সময়মতো নাওয়া-খাওয়া-ঘুমেব বদলে মনের জোরে আধঘণ্টার মধ্যেই যদি সে নিজের এই পরিবর্তন ঘটাইতে পারে, তাতে কী বলাব আছে তরঙ্গের ? যদি কিছু বলাব থাকে বক্তব্যটা শুনিযা আসিতেই বা দোষ কি ? এ সব ব্যাপাবে নিঃসন্দেহ হওয়া ভালো। কোন কথার জবাবে তরঙ্গ কী বলিয়াছিল, কী কথা বলিবার ভঙ্গিতে তবঙ্গ কী ইঙ্গিত করিয়াছিল, এ সব কিছু কি সে লক্ষ করিয়াছে ? আগাগোড়া হয়তো ভুল বুঝিয়া আসিয়াছে তবঙ্গকে। হয়তো খেলা করিতেছিল তবঙ্গ। এই গরমে বাসন মাজা কাজটা তো মধুর নয়, সেই কাজেব মাঝখানে তাকে পাইযা হয়তো একটু মাধুর্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিল,—এখন মনে মনে বুক চাপড়াইয়া আপশোশ করিতেছে। বড়ো বড়ো চোখ দুটি জলে ভরিয়া গিয়া টপটপ করিয়া ছাই-মাখা বাসনে ঝরিয়া পড়িতেছে তার চোখের জল। মেয়েদের কথার আড়ালে যে সব কথা থাকে তার একটাও যে লোকটা ধরিতে পারে না, তার বোকামির কথা ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়ের হয়তো অন্ত থাকিতেছে না তরঙ্গের। 'আজকের কথা ভেবে লজ্জায় যেন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবেন না' এই অনুরোধের আসল মানে সে বুঝিতে পারিবে

কি না ভাবিয়া দুর্ভাবনায় বুক হয়তো দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে তরঙ্গের, আরও স্পষ্টভাবে কথাটা তাকে বুঝাইয়া না দেওয়ার জন্য মাথা খুঁড়িয়া মরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা হইতেছে।

বুক যে আবার টিপটিপ করিতেছে, সে জ্ঞান শঙ্করের রহিল না, গালে চড়-মারা পানওয়ালার দোকানের সম্মুখ দিয়া ফিরিয়া যাওয়ার সময় সেই দোকান হইতেই এক প্যাকেট সিগারেট সে কিনিয়া লইল, পানওয়ালা যে এতক্ষণে তার পাগলামির হদিস পাইয়াছে, সেটুকু বুঝিতে পারিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, জোরে হাঁটিয়া ঘামিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া ভাড়া করিল একটা রিকশা।

এবার দরজা খুলিল অনুপম। কোন চুলায় সে গিয়াছিল কে জানে, এইটুকু সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। তরঙ্গকে আর একা পাওয়ার উপায় নাই। তরঙ্গ বাসন মাজা শেষ করিয়া কলসিতে জল ভরিতেছিল, শঙ্করকে দেখিয়া কিছু বলিল না।

অনুপম সলজ্জ বিব্রতভাবে বলিল, তোমার সঙ্গে তো কথা বলতে পারব না ভাই, কাল আমার ফিজিক্স হবে। একদিনে দু পেপার।

একটু হাসে অনুপম। হাত কচলায়। রাত কি সেও কম জাগিয়াছে।

শঙ্কর বলিল, না না, তুমি পড়োগে যাও।

পড়ার ঘরে গিয়া অনুপম খিল দেয় বটে, তরঙ্গকে কিন্তু একা পাওয়া যায় না। উপর হইতে নামিয়া আসেন সাধনা, নীচের তলার একটা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে নিমি। সাধনা শঙ্করকে বসিতে বলেন, নিমি আবদার করিয়া বলে, স্টোভটা ধরিয়ে দেবেন শঙ্করদা ?

তাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সাধনা বলেন, ও রকম প্যানপ্যান করে কথা বলিস না নিমি, বিচ্ছিরি শোনায়। তুই ধরাতে পারিস না স্টোভ ? শঙ্করকে কেন ?

শঙ্করদা ভালো পারেন।

সাধনা এ কথায় আরও অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন, শঙ্করদা বলতে না তোকে বারণ করেছি নিমি ? তাও এমন করে বলিস যেন ওর নামটা নিয়ে তামাশা করছিস। অনুর চেয়ে শঙ্কর বড়ো, ওকে বড়দা বলিস।

এদিকে কলসি ভরিয়া যায় তরঙ্গের, কিন্তু চোখে জল কই তার, যে জল টপটপ করিয়া মাজা বাসনে পড়া উচিত ছিল ? চোখ পর্যন্ত ছলছল নয়, মুখ পর্যন্ত ম্লান নয়। তাকে দেখিয়া একটু চাপা হাসিও যদি তরঙ্গ হাসিত ! একটু আড়চোখেও অন্তত যদি সে চাহিত বারেকের জন্য !

জলের কলসি তুলিয়া রাখিয়া তরঙ্গ কী কাজে যেন উপরে গেল, সাধনা কী একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু প্রশ্নটা কানে না তুলিয়া গোঁয়ারের মতো শঙ্করও তার পিছু পিছু দোতলায় উঠিয়া গিয়া বোকার মতো জিজ্ঞাসা করিল, রাগ করেছ নাকি ?

তরঙ্গ বলিল, আপনাকে না বাড়ি যেতে বলেছিলাম ?

শঙ্কর আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবের অভিনয় করিয়া সহজভাবে বলিল, তা বলেছিলে।

কেন তবে আমাকে জ্বালাতন করছেন ?

জ্বালাতন করছি ?

এত করে বোঝানোর পরও তা মাথায় ঢোকেনি ? আপনি কি হাবা ? এত সোজা একটা কথা, তাও কি মাথায় লাঠি মেরে না বোঝালে বুঝতে পারেন না ? কেন যে আপনারা পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মান ! জানেন, আপনাদের জন্যে দেশটা রসাতলে গেল।

আরও অনেক কথা। তরঙ্গ যে বক্তৃতাও দিতে জানে, মেয়ে হইয়াও সে যে মেয়ে নয়, সে আজ মরিয়া গেলেও যে তরঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে না, এই ধরনের অনেকগুলি সত্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে আবিষ্কার করিয়া শঙ্কর আবার নামিয়া আসিল পথে। মাথার জগৎটা এবার বাহিরে আসিয়াছে, ছোটো ছোটো চৌকা ঘর-কাটা ফুটপাতে পানের পিক, নোংরা জল, ছেঁড়া কাগজ, ছেঁড়া

পাতা, কুকুর, মানুষ, গোরু, ঘোড়া, গাড়ি, বাড়িঘর, আকাশ, যেখানে যা কিছু আছে সমস্তের মধ্যে, কারণ জগৎটা তাই,—মাথার ফাঁকির খেলার মধ্যেও বাহিরে সবকিছু থাকার রহস্য। শঙ্করের কি আর বুঝিতে বাকি আছে, বাস্তবতা কাকে বলে ? তরঙ্গ ঠিক বলিয়াছে, মানুষ হইয়া যে একজন দুজন মানুষের জন্য কাঁদে, সে অমানুষ। কাঁদিতে যদি হয় তো বৃহত্তর কোনো কিছুর জন্য কাঁদা উচিত, সে কান্নাই প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ, আর সব ন্যাকামি। আরও যেন কী সব বলিয়াছে তরঙ্গ। বড়ো বড়ো চোখ দুটি আরও বড়ো বড়ো করিয়া তরঙ্গ যত বড়ো বড়ো কথা বলিয়াছিল, ইতিমধ্যে প্রায় তার সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছে দেখিয়া শঙ্কর আশ্চর্য হইয়া যায়। এত বই পড়িয়া এত কথা এতকাল ধরিয়া মনে রাখিতে পারিয়াছে, শুধু তরঙ্গের কথাগুলি দশ মিনিটের মধ্যে ভুলিয়া গেল ? সে যে অপদার্থ তাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু কে অপদার্থ নয় ? দৃষ্টিতে যেন তার নূতন একটা রশ্মি সঞ্চারিত হইয়াছে, মানুষের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া একেবারে ভিতরটা খানাতল্লাশ করিবার শক্তি জন্মিয়াছে,—এমনকী একশো দেড়শো গজ দূরে দাঁড়াইয়া যে লোকটা চুরুট টানিতে টানিতে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তার ভিতরটা পর্যন্ত শঙ্করের দৃষ্টির আলোতে সুস্পষ্ট। লোকটার কাছাকাছি যাইতে যাইতে ট্রাম আসিয়া পড়িল, শঙ্করও উঠিয়া পড়িল ট্রামে। ট্রামের দেশি আর বিদেশি নরনারীগুলিও সব অপদার্থ। কারও মুখে মনুষ্যত্বের ছাপ নাই, বৃহত্তর মহত্তর কিছুর জন্য কাঁদা দূরে থাক, দু-একজন মানুষের জন্য পর্যন্ত তারা কেউ কাঁদিতে রাজি কিনা সন্দেহ, ট্রামের টিকিট কেনার পয়সা খরচ করার দুঃখ সহ্য করিতেই যেন সকলের প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। এখন বাড়ি ফিরিবার ইচ্ছা শঙ্করের ছিল না। তবু বাড়ি ফিরিতে হইলে একটা পার্কের যে কোণে নামিয়া তাকে বাসে উঠিতে হইবে, সেইখানে সে নামিয়া পড়িল। পার্কে একটা সভা হইতেছে, সভায় না ঢুকিয়াই বোঝা যায় দেশের নামে দেশের লোকের সভা, কারণ, সমগ্রভাবে সভার চেহারাটা কুড়ানো আবর্জনার স্তূপের মতো,—হুজুগের ঝাঁটা অকেজো, ফেলনা কতকগুলি মানুষকে একত্র করিয়াছে। তরঙ্গের সঙ্গে সমস্ত জগৎ তাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, ভিতরে এই রকম একটা অনুভূতির প্রাবল্য থাকায় ভাঙাবাড়ির পুরানো ইট পাটকেলের স্তূপের মতো এতগুলি মানুষের ভিড়ের জন্য শঙ্কর একটু আকর্ষণ বোধ করিল। পার্কে ঢুকিয়া সে মিশিয়া গেল ভিড়ে। লোক বড়ো কম জমে নাই, হাজার তিনেক হইবে বোধ হয়। বাহির হইতে সভার যে বৈশিষ্ট্য শঙ্করের চোখে পড়িয়াছিল, ভিতরে ঢুকিয়া সে দেখিল আশেপাশে যে কজনের মুখ ভালো করিয়া দেখা যায়, তাদের প্রত্যেকের মুখে সেই বৈশিষ্ট্যেরই ব্যক্তিগত ছাপ। বেশ বোঝা যায়, কেউ আপিস হইতে ফেরার পথে বিনামূল্যে একটু বৈচিত্র্য সংগ্রহ করিতেছে, কেউ উদ্দেশ্যহীন ঘুরিয়া বেড়ানো স্থগিত রাখিয়া ভিড়ে মিশিয়াছে, কেউ নিদারুণ আত্মগ্লানিকে একটু ফাঁকি দিবার আশায় দেশের জন্য আহূত সভায় যোগ দেওয়ার মতো মহৎ কাজের আত্মপ্রসাদটুকু লাভ করিতে আসিয়াছে, কেউ আসিয়াছে এইভাবে সভায় সভায় উচ্ছ্বাসের রোমাঞ্চ ও শিহরন পাওয়ার নেশা মিটাইতে ! ডাইনের বুড়ো মানুষটি ক্রমাগত মাথা নাড়িয়া যাইতেছেন, মুদ্রাদোষের জন্য অথবা বক্তৃতায় সায় দিবার জন্য বোঝা যায় না। বাঁদিকের প্রৌঢ় লোকটি বোবা-হাবার মতো প্রায় হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন বক্তৃতামঞ্চের দিকে, মনে হয়, বক্তৃতার যে কথাগুলি তার কানে ঢুকিয়াছে, তার মানে বুঝিবার চেষ্টা করিতে করিতে বক্তার এখনকার কথাগুলি কানে ঢুকাইয়া চলিয়াছেন। সামনের যুবকটি বোধ হয় যৌবনচর্চার ফলেই নিজের দেহে বাস করিবার অধিকার হারাইয়া ফেলায় ছটফট করিতেছে, কিন্তু দেশে বাস করার অধিকারটুকু বজায় রাখার জন্য সভা ছাড়িয়া চলিয়াও যাইতে পারিতেছে না।

চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া মানুষগুলিকেই শঙ্করের দেখিতে ইচ্ছা হইতেছিল। বক্তৃতামঞ্চের দিকে জোর করিয়া চোখ রাখিয়া সে বক্তার কথাগুলি শুনিবার চেষ্টা করিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে

হইল, সে যেন তরঙ্গের কথা শুনিতেছে। তরঙ্গই যেন পুরুষ সাজিয়া গলা মোটা করিয়া মঞ্চে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া বলিতেছে, আর সমস্ত কান্না ন্যাকামি, দেশের জন্য, দশের জন্য যে কান্না সেই কান্নাই আসল কান্না।

একেবারে বক্তৃতামঞ্চে গিয়া চড়াও হওয়ার খেয়ালটা শঙ্করের চাপিল দু নম্বর বক্তাকে দেখিয়া। ভদ্রলোক শঙ্করের চেনা। তবে তিনি যে একা তারই চেনা নন, আরও অনেকেই যে তাঁকে চেনে, সেটা বোঝা গেল তিনি উঠিয়া দাঁড়ানো মাত্র সভায় মৃদু একটা জয়ধ্বনি উঠায়। ব্যাপারটা বড়ো আশ্চর্য মনে হইল শঙ্করের। বছরখানেক আগেও যিনি ফাঁকি দিয়া—সাধারণ জুয়াচুরির চেয়েও খারাপ আইনসঙ্গত জুয়াচুরি করিয়া—বীরেশ্বরের হাজার তিনেক টাকা মারিয়া দিয়াছিলেন, তাকে দেখিয়া জনতার উল্লাস ? কাগজে সম্প্রতি একজন লীলাময় ঘোষের নাম দেখা যাইতেছিল বটে মাঝে মাঝে, তিনিই কি ইনি ? পাশবালিশের মতো গোলগাল লীলাময়ের এ তো এক অপরূপ লীলা !

মঞ্চে উঠিবার অধিকার শঙ্করের ছিল না, কিন্তু রাজসিংহাসনে উঠিবার অধিকারও শুধু অপেক্ষা রাখে অর্জনের। বাধা মানিবার মতো মন তাব ছিল না, বাধা সে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল দু হাতে, গম্ভীর মুখে একটু মাথা হেলাইয়া সমস্ত প্রতিবাদে সায় দিয়া বসিয়া পড়িল লীলাময় ঘোষেরই খালি চেয়ারটিতে। উদাস মধুব সজল কান্নার সুবে লীলাময় তখন বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। সুর যেমনই হোক থাকিয়া থাকিয়া এমন সব বিশ্রী হাসির কথা তিনি বলিতে লাগিলেন যে, সভায় চাপা হাসির গুঞ্জন উঠিতে লাগিল। বক্তৃতার এ একটা টেকনিক,—'কাঁদো'-'কাঁদো' গোপাল ভাঁড় মানুষকে মুগ্ধ করে বেশি।

একবার হাসিটা হইল প্রবল, মিনিটখানেক গোলমাল থামিল না। সেই অবসরে লীলাময় জিজ্ঞাসা করিলেন, কী খবব শঙ্কব ?

আমি কিছু বলব।

বলবে ? আমাকে না সভায় ?

সভায়।

কী সর্বনাশ ! ও সব দুর্বুদ্ধি কোরো না।

লীলাময়েব বক্তৃতা শেষ হওয়ার মাত্র শঙ্কর বিনা ভূমিকায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রাণপণে চিৎকার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, বন্ধুগণ, অনাহূতভাবে আমি আপনাদের একটা সুপরামর্শ দিচ্ছি, আপনাবা ন্যাকামি ছাড়ুন। আপনারা সকলেই ন্যাকা। কেন জানেন ? আপনারা সকলে একেব জন্য, দুয়েব জন্য, তিনের জন্য কাঁদেন, দশের জন্য কাঁদেন না। আপনারা অমানুষ, পশু, অসভ্য, বর্বব। আপনাদের লজ্জা করছে না এখানে বসে থাকতে ? ঘরের কোণেব একজন দুজন তিনজনের জন্য নিজেকে আপনারা উৎসর্গ কবে দিয়েছেন জানোয়ারের মতো, এই সভায় এসে ভিড় করবার কী অধিকার আপনাদের আছে ? আমি যদি বলি আপনাদের মাঝখানে এখন একটা বোমা ছুঁড়ে মারব, আপনারা যে যার প্রাণ নিয়ে পালাবার জন্য পাগল হয়ে উঠবেন, বড়ো জোর সঙ্গে নেবার চেষ্টা করবে একজন দুজন কি তিনজনকে, অথচ এমন জমাট বেঁধে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন, এমন গলাগলি মাখামাখি ভাব আপনাদের,—থামানোর চেষ্টা, টানিয়া বসানোর চেষ্টা, স্বয়ং সভাপতির উঠিয়া দাঁড়াইয়া শ্রোতাদের ব্যাপারটা বুঝানোর চেষ্টা সব ব্যর্থ হইয়া গেল। চার-পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া যখন একসঙ্গে শঙ্করকে চাপিয়া ধরিল, সে গলা ফাটাইয়া শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করিল,—এঁরা আমায় বসিয়ে দিচ্ছেন, আপনারা আমার কথা শুনবেন না ?

গালাগালি-মুগ্ধ শ্রোতারা বলিল :

শুনব ! শুনব !

বেশ তো বলছিল বাপু, বলুক না।

এই ভলান্টিয়ার শালারা, ছেড়ে দে পাগলাটাকে।

বন্দেমাতরম্ !

আস্তে ! আস্তে ! বড়ো গোল হচ্ছে !

পাগলাটার নাম কী ?

বার করে দাও পাগলাটাকে—মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দাও।

কী বলছিল, বলুক না শুনি।

চার-পাঁচজন নেতার হাতগুলি মিনিট পাঁচেক শূন্যে আন্দোলিত হওয়ার পর গোলমাল একটু কমিল। তারপর লীলাময় উঠিয়া বুকের কাছে দুটি হাত একত্র করিয়া ধীরে ধীরে নিজেকে কেন্দ্র করিয়া বার সাতেক চারিদিকে পাক খাওয়ার পর গোলমাল থামিয়া গেল। তখন সভাপতি ধীরে ধীরে নিবেদন করিলেন যে, সকলে গোলমাল করিলে তো সভার কাজ হয় না, অতএব সকলে অনুগ্রহ করিয়া তাঁর সবিনয় নিবেদন মন দিয়া শেষ পর্যন্ত শুনুন। এই যে এই লোকটি বলা নাই, কওযা নাই বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইনি কে কেউ তা জানে না, এ সভায় এঁর বক্তৃতা দিবার কোনো কথা ছিল না, তা ছাড়া এ সভা যে জন্য আহ্বান করা হইয়াছে তার সঙ্গে এ ভদ্রলোকের বক্তব্যের কোনো সম্পর্ক নাই, আর এ ভাবে যার যখন খুশি যা ইচ্ছা তাই বলিয়া গেলে কোনো সভার কাজ হয় না, তবু সভার সকলে যদি এই ভদ্রলোকের কথা শুনিতে চান, সভাপতি হিসাবে তিনি সকলের ইচ্ছার মর্যাদা রাখিয়া এঁকে বক্তৃতা প্রদানের অনুমতি দিবেন, মুখে কিছু না বলিয়া যাঁরা এঁর বক্তৃতা শুনিতে চান যদি দয়া করিয়া হাত তোলেন—

হাত উঠিল অনেকগুলি এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে শঙ্কর সভায় বলিবার অনুমতি পাইল। এবার কিন্তু সে না পাইল কথা খুঁজিয়া, না পারিল উদ্ধত উন্মাদনার সঙ্গে গগনভেদী চিৎকার করিতে। প্রত্যেকটা শব্দ যেন গলায় আটকাইয়া যাইতে লাগিল। একবার ভাবিল, উপস্থিত সকলকে আরেকবার জানোয়ার বলিয়া গাল দেয়, অন্তত অমানুষ বলে। কিন্তু হিসাব করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া এতগুলি মানুষকে ও সব কথা বলিবার সাহস সে কোথায় পাইবে ? ভদ্রভাবে নিচু গলায় জড়াইয়া জড়াইয়া কয়েক মিনিট কী যে সে বলিল, সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। তারপর আচমকা বক্তৃতা থামাইয়া বসিয়া পড়িল। দুই কানে তখন তার আগুন ধরিয়া গিয়াছে, মনে জাগিয়াছে সীতাদেবীর সেই সাধ, যে সাধের মর্যাদা রাখিতে প্রকাশ্য সভাভূমিতেই ধরিত্রী দ্বিধা হইয়া গিয়াছিলেন।

এক সময় সভার কাজ শেষ হইয়া গেল। লীলাময় ডাকিতেই সে কলের পুতুলেব মতো তার পিছু পিছু দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোকের প্রকাণ্ড গাড়িতে গিয়া উঠিল। লীলাময় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ব্যাপার কিছু বুঝলাম না বাপু, এ রকম কেলেঙ্কারি করলে কেন ?

শঙ্কর বোকার মতো বলিল, কী জানি।

দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, তা ঠিক, জানলে কি আর করতে ?

লীলাময় পরিচয় করিয়া দিলেন। দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের নাম কেদারনাথ রায়, মফস্বলে কিছু জমিদারি আছে, কলিকাতায় কয়েকখানি বাড়ি আছে।

কাগজে মাঝে মাঝে নাম দেখ না শঙ্কর ? দেখবে কী, খবরের কাগজ কি আর পড় ! হাতের কাছে যদি একখানা কাগজ পেলে তো নারীহরণ, সিনেমা আর খেলাধুলা সংবাদ পড়েই খতম। বেশ নাম হচ্ছে কেদারবাবুর, আর বছরখানেক বছর দুই যাক, লোকের মুখে মুখে ওঁর নাম ঘুরবে। নেতা হওয়া কি সহজ ? কত হিসাব করে কত ভেবেচিন্তে প্রত্যেকটি পা ফেলতে হয়। তোমার মতো বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ সভায় এসে গলাবাজি করলেই কি হয় ! আজ তিন বছর ধরে কেদারবাবু কত চেষ্টা করেছেন, তবে আজ মিটিং-এ একটু খাতির পান।

আজ তো উনি কিছু বললেন না ?

বললেন বইকী, সকলের আগে উনি বলেছেন, ওঁকে আগে বলতে দিতে একটু আপত্তি হয়েছিল, হিংসুটে লোকের তো অভাব নেই, সভার রিপোর্টে কাগজে আগে ওঁর নামটা বেরুবে, তাতেও লোকের গা জ্বলে। আমি কিন্তু ছাড়বার ছেলে নই বাবা, স্পষ্ট বলে দিলাম প্রথমে বলতে না দিলে উনি যে একশো টাকা চাঁদার কথা বলেছেন সেটা ক্যানসেল হয়ে যাবে। শুনে সবাই চুপ।

কেদারনাথ একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলিলেন,—একশো !

শঙ্কর দেখিতে পাইল কেদারের উরুতে আঙুলের খোঁচা দিয়া লীলাময় কী যেন ইঙ্গিত করিলেন, কেদার আর কথা বলিলেন না।

লীলাময় খুশি হইয়া শঙ্করকে বলিলেন, কিন্তু তোমার কাণ্ড দেখে আমি কিন্তু থ বনে গেছি ভাই। ইচ্ছাটা কী বল তো ? এই বয়সে বড়ো হওয়ার শখ চেপেছে না কি ?

শঙ্কর ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল, তবু গায়ের জোরে উদ্ধতভাব বজায় রাখিয়া বলিল, বড়ো হওয়ার শখ কোন বয়সে থাকে না ?

কিন্তু ও ভাবে কি বড়ো হওয়া যায় বে দাদা ! তার ধরাবাঁধা মেথড আছে। এই যে এত কাণ্ড করলে, তুমি ভাবছ কাল কাগজে কাগজে তোমার নাম বেরিয়ে যাবে ? সে গুড়ে বালি।—এক লাইন শুধু লিখে দেবে, একজন পাগলাটে ইয়ংম্যান মিটিংয়ে গোলমাল করেছিল। তোমার নামটি পর্যন্ত করবে না।—কী করছ তুমি এখন ?

কিছু না।

এ লাইনে আসবে ?

বলিয়া শঙ্করেব জবাবের জন্য অপেক্ষা না কবিযাই খুশিতে উচ্ছ্বসিত হইযা উঠিলেন, শঙ্করের হাত নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, বেশ, কিছু ভেবো না তুমি, আমার উপব সব ভার ছেড়ে দাও, আমি সব ঠিক করে দেব। কিন্তু সে তো দু-একদিনের ব্যাপাব নয়, দু-এক কথাতে সব ঠিক হয়ে যাবে না। এক কাজ করো তুমি, কাল দুপুরবেলা একবার এসো আমার বাড়িতে— কথাবার্তা কওয়া যাবে। হ্যাঁ কেদারদা, এই সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে যাব ? কোথাও একটু কিছু—একজন ইয়ংম্যান সঙ্গে রয়েছে, আজ বেশ জমত। অ্যাঁ ?

কেদার বলিলেন, কনকের ওখানে—?

শঙ্কর আবার দেখিতে পাইল, কেদারের উরুতে আঙুলের একটা খোঁচা দিয়া লীলাময় আবার কী যেন ইঙ্গিত করিলেন, কেদার আর কথা বলিলেন না। একটা অদ্ভুত অবর্ণনীয় অনুভূতি শঙ্করের ভিতরে ম্যাজিকওয়ালার চারাগাছের মতো গজাইয়া উঠিতেছিল। জীবনে যেন হঠাৎ একটা বহস্যময় অ্যাডভেঞ্চার শুরু হইয়া গিয়াছে। কনক যে কে এবং কেন যে সে বাতিল হইয়া গেল বুঝিতে শঙ্করের বিশেষ কষ্ট হইল না। ছেলে সে কেমন, কনক নামধেয়ার স্ফূর্তির বাজারে সওদা কিনিতে যাওয়াটা সে কীভাবে গ্রহণ করিবে, এখনও লীলাময় তার হদিস পান নাই। চালাক-চতুর মানুষ, হিসাব না করিয়া এক পা চলেন না, কনককে তাই এখনকার মতো আড়ালেই রাখিযা দিলেন।

চৌরঙ্গির এক হোটেলে গিয়া সামনে ধরিলেন শুধু একটা পেগ। শুকনো নীরস জীবন মানুষের, কঠিন বাস্তবতার ধুধু প্রান্তর পার হইয়া চলিতে হয় মানুষকে— হয় না ভাই শঙ্কর ? বিষ—জীবনে শুধু বিষ। মাঝে মাঝে তাই একটু অমৃত চাই মানুষের—চাই না ভাই শঙ্কর ?

শঙ্কর সায় দিয়া বলিল, নিশ্চয়।

বলিয়া এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করিয়া নিজের হাতে নিজের গলা চাপিয়া ধরিয়া শঙ্করের মুখ বাঁকানোর রকম দেখিয়া লীলাময় ও কেদার দুজনেই হাসিলেন। কিন্তু গ্লাসে চুমুক সে যে দিয়াছে, দলে সে যে ভিড়িয়াছে, ইহাতে পরম স্বস্তিও দুজনে যে পাইয়াছেন, সেটা বেশ বোঝা গেল।

কেদার বলিলেন, আনাড়ি।

লীলাময় রসিকতা করিয়া বলিলেন, নাড়িজ্ঞান পাবে কোথায় দাদা, নাড়ি কি কখনও ধরেছ !

নাড়িজ্ঞানী কেহ তখন শঙ্করের নাড়ি ধরিলে ভয়ে ভয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ বাড়ি পাঠাইয়া দিতেন। ভিতরের জ্বালাটা কীসের বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কর একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। মাথাটাও ঝিমঝিম করিতেছে। বিনা আয়োজনে, বিনা প্রয়োজনে আজ সন্ধ্যায় সে এ কী চমৎকার নবজীবন আরম্ভ কবিয়া দিল ! মিটিংয়ের লীলাময়েব মুখোশ এখনও খসে নাই, উপর হইতে একটা পর্দা সরিয়া গিয়াছে মাত্র। এখনও লীলাময়ের মুখ দেখিলে মনে হয়, রসে টইটুম্বুর একটা মানুষ কান্নার ভানকবা রসিকতায় ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। কেদার কী বক্তৃতা দিয়াছিলেন শঙ্কর শোনে নাই, লীলাময়েব কথাগুলি তাব মনে আছে। এখন যে সুবাস বাসা বাঁধিয়াছে লীলাময়েব মুখে, মিটিংয়ের কথাগুলিব সঙ্গে সেটা মিশিযা থাকিলে না জানি আরও কত শ্রুতিমধুর হইত তার বক্তৃতা, আরও কত মুগ্ধ হইয়া যাইত সভার লোক ! ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল।

লীলাময় গদগদ হইয়া বলিলেন, এন্‌জয় করছ ? দাঁড়াও দাঁড়াও, এই সবে সন্ধে !

তাই কী ? জীবনের এটা কোন তিথির সন্ধ্যা বুঝিবার চেষ্টা কবা বৃথা। এমনই সাধারণ তিথিটা আজ কী ছিল, শঙ্কব তাই মনে করিবার চেষ্টা করিল। পূর্ণিমার কাছাকাছি হইবে, হয় এদিক নয় ওদিক। মনটা কেমন কবিতে লাগিল শঙ্করের। পরীক্ষার পড়া করিতে করিতে কতবার জানালা দিযা বাহিবের জ্যোৎস্না দেখিয়া, ছাদে হোক, মাঠে হোক, ঘাটে হোক জ্যোৎস্নায় চুপচাপ অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার যে সাধটা দুর্দমনীয় হইয়া উঠিত, কত কষ্টে পরীক্ষা শেষ হওয়ার জন্য সাধটা সে তখন সংযম করিত। হোক না ছেলেমানুষি, এ সব চিবন্তন ছেলেমানুযিব দাম কোনোদিন কমে না মানুযের। এখানে সে কেন আসিযাছে ? এই কড়া আলো, চডা নির্লজ্জতা, কুৎসিত গুন্ডামিব আবহাওযায ? কোমলতা বিসর্জন দিতে ? নিজের যে কোমলতাব জন্য তবঙ্গেব কথা ভাবিযা এখনও তার মন কেমন কবিতেছে ?

বাকি সকলেও কি এই উদ্দেশ্যে আসিযাছে এখানে, এই নাবী-পুরুষেব দল ? নিজের কোমলতা যে নিজেকে কষ্ট দেয়, এই বোগেব চিকিৎসা কবিতে ?

মাঝবযসি মাংসল মেয়েবাও যে এখানে আসিযা বোগটার হাত হইতে বেহাই চান, একটু পরেই শঙ্কর তা চমৎকার বুঝিতে পাবিল। বিদেশি পোশাক-পবা একটা হ্যাংলা পোকার সঙ্গে যে মহিলাটি সটান তাদের টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মুখের রং তাঁব খাঁটি রং। মিসেস সেন তিনি, নমিতা নাম। লীলাময়ের যে তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেটা বোঝা গেল খাপছাড়া অভ্যর্থনার জবাবে লীলাময়ের ঘাড়ে তাঁর ছোটো একটি চড় মারায।

আড়চোখে শঙ্করেব দিকে চাহিয়া তিনি বসিলেন। উঠিলেন একঘণ্টা পরে। বলিলেন, আপনার গাড়িটা বাইরে দেখছিলাম কেদারবাবু, এ সব তো অনেক খেলাম, একটু হাওয়া খাওয়াবেন ?

কেদারনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

মিসেস সেন গাড়িতে উঠিলেন আগে, উঠিয়াই বলিলেন, আসুন শঙ্করবাবু আপনি, আপনার সঙ্গে আজ প্রথম আলাপ হল, আপনি আমাব পাশে বসবেন। ডায়মন্ডহারবারেব দিকে যাওয়া যাক, কেমন ?

শহরে চাঁদের আলো নাই, শহরের বাহিরে চাঁদের আলোর ছড়াছড়ি। পথের ধারে লাইট রেলওয়ের লাইন পাতা, দুদিকে মাঠ, মাঝে মাঝে বাড়িঘর ও গাছপালায় জমাটবাঁধা আবছা আবছা গ্রাম। কোমলতা-ব্যারামের চিকিৎসাটা জীবনে আজ প্রথম হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় শঙ্করের স্রেফ কান্না আসিতে লাগিল। এমন অদ্ভুত রকমের কোমল মনে হইতে লাগিল নিজেকে যে, বাঁদিকে লীলাময়েব পকেটের সিগারেটের কেসটার চেয়ে ডাইনে মিসেস সেনের কোমল শরীরটা বেশি বিঁধিতে লাগিল তার দেহে। ডাইনির নখের মতো।

মিসেস সেন বলিলেন, একবার এদিকে এসে তালের রস খেয়ে গিয়েছিলাম মনে আছে কেদারবাবু ? আহা কী স্বাদ টাটকা তালের রসের !—আজও জিভে জড়িয়ে আছে, কেবল গন্ধটা ভারী বিশ্রী।

মিসেস সেনের জড়ানো জিভে তালের রসের স্বাদ জড়াইয়া থাকা আশ্চর্য নয়, শঙ্করের হৃদয় কিন্তু একবার স্পন্দিত হইতে ভুলিয়া গেল।

মিসেস সেন আবার বলিলেন, গ্রামটা চিনতে পারবেন ? কাছাকাছি এসে পড়েছি নিশ্চয়। চলুন না একটু চেখে আসি ? রাত্তির বেলা তালের রস—কী মজাই হবে।

বস্তুতান্ত্রিকতার এই রোমান্সের পরিচয় শঙ্কর ভাসাভাসা ভাবে রাখিত—লোকের মুখে শুনিয়াছে, মনস্তত্ত্ববিদের মুখে। রোজ যে পাঁচসিকা দামের সাবান মাখে, ধুলায় গড়াগড়ি দেওয়া নাকি তার কাছে রোমান্সের চরম। অপরাহ্ণ হইতেই নিজের মনের মধ্যে বসিয়া নিজেকে শঙ্কর ঘৃণা করিতেছিল, এখন রীতিমতো চাবুক মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবু, সেই যন্ত্রণাতেই যেন সে একটা অদ্ভুত বেপরোয়া ভাব অনুভব করিতে লাগিল, বোধ করিতে লাগিল নিজেকে নিজে পীড়ন করার মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবার তাগিদ। মেরুদণ্ড টান করিয়া এতক্ষণ সে সোজা হইয়া বসিয়াছিল, এবার মিসেস সেনের দিকে একটু ঠেসান দিয়া বসিল। তাতে খুশি হইয়া মিসেস সেন হোটেলে লীলাময়ের ঘাড়ে যেমন একটা চড় মরিয়াছিলেন, শঙ্করকেও তেমনই একটা চড় মারিয়া আদর করিলেন। লীলাময়ের সিগারেটের আগুনে তার আংটির পাথরটা বিপদজ্ঞাপক লাল আলোর মতোই চমকাইয়া উঠিল।

মাইল দেড়েক গিয়া পাওয়া গেল একটা গ্রাম। তখনও গ্রামের আলো নেভে নাই, পথের ধারে ছোটো ছোটো দোকানগুলি বন্ধ হয় নাই। তাড়ির দোকানটা গ্রাম পার হইয়া একটু তফাতে। দেখা গেল, দোকানের খানিক দূরে ছোটোখাটো একটি ভিড় জমিয়াছে, দোকানের সামনে পুলিশ।

লীলাময় সভয়ে বলিলেন, পিকেটিং হচ্ছে।

পিকেটিং ?—মিসেস সেনের শিহরন অনুভব করিয়া শঙ্করের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

মিসেস সেন আবার বলিলেন, কাজ নেই তালেব রসে বাবা, মানে মানে এখন ফিরে যাওয়া যাক।

গাড়ি ফিরাইতে ফিরাইতে দেখা গেল, ষোলো-সতেরো বছর বয়সের একটি ছেলে পিকেটিং করিতে গিয়া পুলিশের হাতে পড়িল।

ব্যাক করিবাব সময় গাড়ির পিছনের চাকা নর্দমাব কাদায় ডুবিয়া গেল। কেদার ড্রাইভারকে এমন একটা গাল দিলেন যে অদূরে তাড়ির আড্ডায় যারা রোজ তাড়ির সঙ্গে গালাগালির রসও উপভোগ করে, শুনিলে তারা নিশ্চয় সমস্বরে বলিত, সাবাস ! এখানে কেউ কিছু বলিল না, মিসেস সেন শুধু খিলখিল করিয়া একটু হাসিলেন। নর্দমা ছাড়িয়া উঠিবার চেষ্টায় গাড়ির ইঞ্জিন পরক্ষণে গর্জন করিয়া উঠিল, শঙ্করের মনে হইল মিসেস সেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়া গাড়িটাও যেন হাসিতেছে।

মাথার মধ্যে সব ওলট-পালট হইয়া যাইতেছিল শঙ্করের। সবই সে বুঝিতে পারিতেছে, তবু যেন সব আবছা, এলোমেলো—কোথায় ছিল সে, কী করিয়া কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে সব তার মনে আছে, তবু যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, কিছুই স্মরণ হইতেছে না। কয়েক ঘণ্টা আগের অতীত একান্ত অবাধ্য হইয়া ভবিষ্যতের কল্পনার মতো স্মৃতির আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আর ভিতরে একটা কষ্ট হইতেছে অকথ্য। একসঙ্গে আগুনে পোড়া আর শীতে জমিয়া যাওয়ার মতো অদ্ভুত যন্ত্রণা।

গাড়ি নর্দমা হইতে উঠিয়া ফিরিয়া চলিল। গ্রাম পার হইয়া যাওয়ার পর শঙ্কর বলিল, আমার গা কেমন করছে।

মিসেস সেন সভয়ে বলিলেন, সেরেছে ! সরুন, সরুন, ওদিকে সরুন, ওদিক দিয়ে মুখ বার করুন।

গাড়ি বাঁধিতে বলিয়া ব্যাকুলভাবে শঙ্করকে তিনি দুহাতে দূরে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গাড়ি থামামাত্র দরজা খুলিয়া টুক করিয়া নামিয়া গেলেন। শঙ্করকে বলিলেন, আপনি নেমে আসুন তো।

শঙ্কর পথে নামিয়া দাঁড়াইলে মিসেস সেন বলিলেন, পথের ধারে বসে বমি করে নিন। একটু সরে যান, বমিকে আমি বড্ড ঘেন্না করি। আপনারা নামুন না একজন কেউ, একটু হেলপ্ করুন না ওঁকে ? আচ্ছা, তুমিও তো নামতে পার ? নামো, আমি সামনের সিটে বসব।

মিসেস সেনের সেই সঙ্গী চুপচাপ সম্মুখের আসনে বসিয়াছিলেন, চুপচাপ নামিয়া আসিলেন। মিসেস সেন সেখানে উঠিয়া বসিলেন।

শঙ্কর বলিল, আপনিও উঠে বসুন আমি হেলপ্ চাই না।

মিসেস সেন মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, বমি করবেন বললেন যে ?

কখন বললাম ?

তবে গাড়িতে উঠুন, তাড়াতাড়ি এখন টাউনে ফিরতে পারলে বাঁচি।

আপনারা যান, আমি গ্রামে ফিরে যাব।

বলিয়া শঙ্কর গ্রামের দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

লীলাময় হাঁকিয়া বলিলেন, পাগলামি কোরো না শঙ্কর, গ্রামে গিয়ে কী করবে ?

পিকেটিং করব।

আরও কয়েকটা আহ্বান আসিল, শঙ্কর কানে তুলিল না, একটু টলিতে টলিতে সোজা আগাইয়া চলিল। খানিকদূর গিয়া গাড়ি ছাড়িবার শব্দ কানে আসিতে সে মুখ ফিরাইয়া চাহিল। তারপর আবার গ্রামের দিকে আগাইয়া চলিল। এবার চলিল আস্তে। গ্রাম বেশি দূরে নয়। এই নাম-না-জানা গ্রামের তাড়িখানায় পিকেটিং করিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে যতটুকু সময় পারা যায় পরীক্ষা শেষের জন্য তুলিয়া রাখা এই জ্যোৎস্নাকে একটু উপভোগ করা যাক। আজই তো তার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে।

কিন্তু পিকেটিং শঙ্কর কেন করিবে ? কে মাথার দিব্য দিয়াছে ? শঙ্কর তা জানে না। তার কেবল মনে হইতেছিল, আজ সারাদিন সে অনেক সুখ উপভোগ করিযাছে, এবার কিছু দুঃখ তাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে।

চার

সাধনার যে বিজন ঠাকুরপো তরঙ্গের বাবা, তিনি ছিলেন প্রফেসর। বছর দুই তরঙ্গ যে স্বামীর ঘর করিয়াছে, তিনিও ছিলেন প্রফেসর—তরঙ্গের বাবার চেয়ে বড়ো ডিগ্রিধারী আর বেশি নামকরা। দুজন প্রফেসরের কাছে কত কিছুই যে তরঙ্গ শিখিয়াছে। তবে বাঙালির মেয়ে-বউ যা কিছু শেখে শুধু কল্পনা করার জন্যই শেখে—এবং কল্পনা করিতে করিতে কারও কারও কল্পনা আকাশপাতাল ছাড়াইয়া ও ছড়াইয়া যায়। যন্ত্রের মতো এটা করিয়া গেলে কেউ বিশেষ কিছু মনে করে না, বড়ো জোর আনমনা উড়ুউড়ু স্বভাবের জন্য একটু নিন্দা রটে। লোকে বলাবলি করে যে, এর বড়ো আনমনা উড়ুউড়ু স্বভাব, এ যদি সর্বনাশ না করে ছাড়ে তো আমার কান কেটে নিয়ো ! কিন্তু এমন

উদ্‌ভ্রান্ত যদি কারও কল্পনা হয় যে, লোকের বলাবলির ভয় না করিয়া কল্পনাটা পরিণত করিতে যায় কাজে, তখন বাধে সাংঘাতিক গোলমাল। এমন গোলমাল বাধে যে, তরঙ্গের স্বামীর মতো পুরাপুরি আধুনিক স্বর্গীয় স্বামীর আধা-আধুনিক আত্মীয়স্বজনের আশ্রয়ে সে টিকিতে পাবে না।

তার উপর যখন বাপের বাড়ি বলিয়া কিছু না থাকে, আর অন্য কোনো আত্মীয়ের বাড়ি বাস করা যে সম্ভব হইবে না তাও ভালো করিয়া জানা থাকে, তখন তরঙ্গের মতো মেয়ে সাধনাব মতো কারও বাড়িতে আসিয়া বাস করে,—যার সঙ্গে সম্পর্কটা আসলও নয়, নকলও নয়, তবু অতীব ঘনিষ্ঠ।

তবে আশ্রিতা হিসাবে নয়, খরচ দিয়া। প্রফেসর বাবা, প্রফেসর স্বামী তরঙ্গের জন্য কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্বশুর-শাশুড়ির জন্য দেবর-ভাসুরের প্রকাণ্ড সংসার ছাড়িয়া তরঙ্গ তার কাছে আসিয়া থাকিতে চায় শুনিয়া সাধনা যেমন আশ্চর্য হইয়াছিলেন, মাসেমাসে নিজের খবচ বাবদ সে টাকা দিবে শুনিয়া হইয়াছিলেন তেমনি আহত।

কেন ? একবেলা দুটি খাবে, তাও আমি তোমায় দিতে পাবব না তবু ?

তরঙ্গ একটু হাসিয়া বলিয়াছিল, একবেলা তো খাব না খুড়িমা। চারবেলা খাব। খাওয়াদাওয়া চলাফেরার সব নিয়মকানুন আমি ঠিক করে ফেলেছি। আমাব নিজের নিয়ম মেনে চলতে চাইলাম বলেই তো ওখানে সবাই খেপে গেল। তবে আমি যাই করি খুড়িমা, তোমাব কোনো অসুবিধা হবে না, তোমার অত কুসংস্কার নেই জানি বলেই তো তোমার কাছে এলাম।

সাধনা বলিয়াছেন, সংসারে যা খুশি তাই করলে কি চলে তবু ?

সে রকম যা খুশি তাই করা তো নয়,—অসংযমের কথা ভাবছ তো ? আমাব সংযম দেখে তুমি ভয় পেয়ে যাবে খুড়িমা। যা দরকার নেই তা কবব না, যা দরকাব নেই তা খাব না, যা দবকাব নেই তা ভাবব না—

অনেকক্ষণ ধরিয়া তরঙ্গ সাধনাকে বুঝাইতেছিল,—তাব জীবনেব লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সাধনাব কথা। স্তরে স্তরে জীবনকে সে ভোগ করিয়া ফেলিবে, এখন তো উনিশ বছর বয়স তার, চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত ঘরের কোণে সে দেহমনকে বশ করিবার শক্তি অর্জনের জন্য তপস্যা কবিবে, ত্রিশ বছব বয়স পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি শুধু অন্তঃপুরে ঘুরিয়া মেয়েদেব বাঁচিয়া থাকিতে শিখাইবে, আর সেই সঙ্গে নিজেও শিখিয়া লইবে কী করিয়া অজানা-অচেনা মেয়েদের নানা কথা শিখাইতে হয়, তাবপর আরম্ভ করিবে আসল কাজ—প্রবল প্রকাশ্য আন্দোলন, দেশকে যা ভাসাইয়া লইযা যাইবে, ঘরে ঘবে হইচই বাধাইয়া দিবে।—একটু বয়েস না হলে তো কেউ আমার কথা শুনবে না খুড়িমা।

শুনিতে শুনিতে সাধনার ধাঁধা লাগিযা গিয়াছিল, মনে হইয়াছিল, আহা, এই বয়সে শোকে তাপে মাথাটা খারাপ হইয়া গিয়াছে মেয়েটার। ওকে তো একটু স্নেহমমতা করা দরকাব !

সেদিন তিনি তর্ক করেন নাই, প্রতিবাদও করেন নাই, শুধু বলিয়াছিলেন, আচ্ছা সে তো পরের কথা—যে ভাবে ভালো লাগে, তুমি সেই ভাবে এখানে থেকো তবু, কিন্তু টাকাপয়সার কথাটা তুলো না, তুমি আমার মেয়ের মতো, খাইখরচ বাবদ তুমি আমায় টাকা দেবে, আমার তা সইবে না বাছা।

তরঙ্গ বলিয়াছিল, কেন সইবে না খুড়িমা ? আমার যদি না থাকত, তা হলে অন্য কথা ছিল। তা ছাড়া, তুমি যদি খরচ না নাও, আমি এখানে থাকব না।

সাধনা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এও তরঙ্গের মাথা খারাপ হওয়ার একটা লক্ষণ। আর কিছু তিনি বলেন নাই।

কিন্তু স্নেহমমতা করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন, তরঙ্গ ও সব চায়ও না, তরঙ্গের ও সব প্রয়োজনও নাই। দৈনন্দিন জীবনযাপনের যে প্রণালি সে ঠিক করিয়াছে, তার মধ্যে হৃদয়টা গিয়াছে

একেবারে বাদ। সুখ, সুবিধা, আলস্য, আনন্দ, উপভোগ, এ সমস্তের জন্য এতটুকু ফাঁক সে প্রতিদিনকার জীবনে রাখে নাই। ঠিকাঝিকে তরঙ্গ দুদিনের মধ্যে বিদায় দিল, নর্দমা আর বাড়ির নর্দমার চেয়ে নোংরা অংশ সাফ করিবার জন্য যে মেথর আসিত, তারও আসা বারণ হইয়া গেল।

না খুড়িমা বাধা দিও না। এ সব আমার দরকার।

বাসন মাজা, জল তোলা, মশলা বাটা, রান্না করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কাপড় কাচা, বিছানা তোলা, জামা সেলাই কবা, যত কিছু কাজ আছে বাড়িতে, মনে হইল সব যেন তরঙ্গ একা অধিকার করিতে চায়।

না খুড়িমা, বাধা দিয়ো না এ সব আমাব দরকার।

এত কাজ করে কেউ বাঁচে তবু ? রাত জেগে তুমি আবাব বই পড়।

অতিরিক্ত কিছু তো করব না খুড়িমা। কতটা কাজ আমার সইবে তা জানি না, কী নিয়মে কখন কী করলে ভালো হয় তা তো জানি না,—তাই পরীক্ষা করার মতো এ ভাবে আরম্ভ করেছি। আস্তে আস্তে কমিয়ে বাড়িয়ে সময় বদলে খাপ খাইয়ে নেব খুড়িমা, কিছু ভেব না। রাত জেগে পড়া চলবে না, সেটা বুঝতে পেরেছি। আজ থেকে দুপুরে সেলাই না করে পড়ব।

ধীবে ধীরে তাই করিযাছে তরঙ্গ, খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে। কয়েকটা কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে, অসহিষ্ণু ব্যস্ততার সঙ্গে অতিবিক্ত কম সময়ে যে সব প্রয়োজনীয় কাজ করিত, সে সব কাজে সময় দিতে আরম্ভ করিয়াছে, সকালের কোনো কাজ লইয়া গিয়াছে বিকালে, বিকালের কোনো কাজ লইয়া আসিয়াছে সকালে।

মাস তিনেক পরে বাড়িতে মেথরকে আসিবার অনুমতিও দিয়াছে।

এমন যে তরঙ্গ তাব জন্য একদিনে শঙ্কর কম কাণ্ড করে নাই। গরমে ও গুমোটে ভ্যাপসা একটা দিনে পরীক্ষাব হলে বসিয়া তিন ঘণ্টা ধবিয়া লিখিয়াছে প্রশ্নপত্রের জবাব, হৃদয় বিনিময় করিতে গিয়া তরঙ্গের সঙ্গে করিযাছে মাথা ঠোকাঠুকি, তিন হাজার লোকের সামনে পরিচয় দিয়াছে মাথা খারাপ হওয়ার, হোটেলে গিযা জীবনে প্রথম টানিয়াছে পেগ, তারপর শহরের অনেক দূবে তাড়ির দোকানে পিকেটিং করিয়া গিয়াছে জেলে।

অথচ অনুপমের মাবফতে খবরটা শুনিয়া তবঙ্গ শুধু বলিল, মোটে একুশ দিন !

সাধনা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, শঙ্করের আবও বেশি দিন জেল হলে তুমি বুঝি খুশি হতে তবু ?

তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে বলিল, তা হতাম। এ তো জেল নয় খুড়িমা, ওষুধ। একুশ দিন জেলে থেকে ভাবপ্রবণতা যদি একটু কমে তো শঙ্কবদা বাঁচবে।

কী যে বলো তুমি ঠিক নেই।

ঠিক কথাই বলি। শুনতে ভালো লাগে না।

সাধনা গম্ভীব মুখে বলিলেন, নাই বা বললে ঠিক কথা ? যা শুনতে ভালো লাগে না মিছিমিছি তা বলবার দরকার ? মিষ্টি কথা বলা আর দশজনের সঙ্গে মানিয়ে চলা হল মেয়েমানুষের কাজ, এমন কথা যদি খালি খালি তুমি বল যা শুনলে মানুষের রাগ হয়, তোমায় তো কেউ দুচোখে দেখতে পারবে না বাছা !

কিন্তু কেউ যদি ঠিক কথা না বলে, সব যে তাহলে বেঠিক হয়ে যাবে ?

তুমি ঠিক কথা বললেই কি সব ঠিক হয়ে যাবে ভাব ?

খানিকটা তো হবে।

সাধনা রাগ করিতে ভালোবাসেন না। প্রুফ রিডারের মতো তিনি শুধু সংশোধন করিয়া যান,—মানুষকে আর সংসারকে। বানান-না-জানা প্রুফ রিডারের মতো হয়তো ভুলের সংশোধনেও

তাঁর ভুল হয়, যা ভুল হয় তার সংশোধনও ভুল হয়, কিন্তু সে জন্য তিনি সংশোধন করিতে কোনো অসুবিধা বোধ করেন না। কারণ, তিনি নিজে তো জানেন, তিনি যা সংশোধন করিয়াছেন তাই ঠিক। কিন্তু বাংলা প্রুফ রিডারের সংস্কৃত প্রুফ দেখার মতো, তরঙ্গের বেলায় তিনি পড়েন বিপদে। তরঙ্গকে শোধরাইতে গেলেই তাঁর মনে হয়, নিমি আর অনুপমের বেলা যে জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা তিনি কাজে লাগান, এর বেলা সে সব কাজে লাগিবে না। সংসারে কী নিয়মে চলা উচিত সে উপদেশ তিনি যেন দিতে বসিয়াছেন সন্ন্যাসিনীকে !

তরঙ্গ তর্ক তুলিলেই সাধনার উপদেশ তাই পরিণত হয় মিনতি ও আপশোশে। মাথা নাড়িয়া তিনি বলেন, না তরু, তোমার কথাবার্তা চালচলন দেখে আমার বড়ো ভাবনা হয়। কারও-না-কারও আশ্রয়ে মেয়েমানুষকে থাকতেই হবে, সবাই যদি তোমার কথা শুনে বিরক্ত হয়—

তরঙ্গ আর তর্ক করে না, করে কাজ। সাধনা কাজের খুঁত ধরিলে নীরবে সায় দিয়া খুঁত সংশোধন করে। কিন্তু গভীর একটা জ্বালা বোধ করে তরঙ্গ, একটা অচিন্তিত আত্মগ্লানি জাগে। এখন তার তপস্যার সময়, বিরাট এক ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে সে তৈরি করিতেছে তবু, সাধনাব মতো মানুষকে এই সব তুচ্ছ ছোটো ছোটো কথাগুলিও যদি সে এখন বুঝাইতে না পারে, তপস্যা সাঙ্গ করিয়া সাধনার চেয়েও অপদার্থ হাজার হাজার মানুষকে আরও বড়ো, আরও ব্যাপক কথাগুলি সে কি বুঝাইতে পারিবে ? প্রতিদিন এত যে কষ্ট সে করিতেছে, শেষ পর্যন্ত হয়তো তার কোনো ফলই ফলিবে না। মানুষের মধ্যে নিজে সে কেবল হইয়া থাকিবে অদ্ভুত, বেমানান।

ভাতের হাঁড়িতে চাল দিয়া চিংড়িমাছ সিদ্ধ রাঁধিবার জন্য সরিষা বাটিতে বসিয়া তরঙ্গ এই গ্লানি ও হতাশার ভাব দমন করিবার চেষ্টা করে, এ চেষ্টাও তার তপস্যার অঙ্গ। দুঃখ, বেদনা ও হতাশাকে সে মনে স্থান দিবে না বলিয়া নয়, সমস্ত বাহুল্য মনোভাবকে, সমস্ত বাহুল্য সহানুভূতিকে ইচ্ছামতো দমন করিবার ক্ষমতা তার চাই। হাজার হাজার নরনারী একদিন তাহার কথা শুনিতে বাজি হইবে কি না, এ সমস্যাব বিচার করিতে সে রাজি আছে, কারণ সেটা প্রয়োজনীয় চিন্তা, কিন্তু সমস্যার বিচারের সঙ্গে মনটা খারাপ করিয়া ফেলিতে সে রাজি নয়। কী লাভ আছে মন খারাপ করিয়া ? তার জীবনে তার জীবনের পরিকল্পিত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে, মন খারাপ করা কোন কাজে লাগিবে ? কী যুক্তিই বা আছে মন খারাপ করিবার ? এই অনাবশ্যক বাহুল্য মানসিক অবস্থাটাকে কেন সে প্রশ্রয় দিবে ?

সরিষা বাটা শেষ হইয়া যায়, তবু তরঙ্গের মন কিন্তু ভালো হয় না। সে একটু আশ্চর্য হইয়া যায়, ভাবে যে, প্রায় দুবছর চেষ্টা করিয়া নিজের মনকে সে এটুকু বশও করিতে পারে নাই কি ? ভাবিয়া আরও বেশি খারাপ হইয়া যায় মন। তখন তরঙ্গ বুঝিতে পারে, মনের একটা চাপাপড়া জটিল আবর্ত আজ মুক্তি পাইয়াছে। মন খারাপ হওয়া দমন করিবার চেষ্টার মধ্যে আজ পর্যন্ত তার মন খারাপ হওয়ার কারণের কারখানা বসিয়াছে। আজ তার মহা পরীক্ষার দিন।

গরমের দিন। রান্নাঘরে আরও বেশি গরম। তরঙ্গ ঘামে ভিজিয়া যায়। গরমের দিনে উনানের গরমে ঘামে ভিজিবার একটা কষ্ট আছে, এতদিন এ কষ্ট সহ্য করিতে তরঙ্গ গর্ব বোধ করিয়াছে, আজ তার মনে হইতে লাগিল, এ সব অকারণ, যাচিয়া এ কষ্ট সহ্য নিছক বোকামি। এ রকম কথা মনে হওয়ার জন্য রাগে তরঙ্গের গা জ্বালা করিতে লাগিল। গা জ্বালা করিবার জন্য নিজের উপর তার অভিমানের সীমা রহিল না। আর অভিমানের সীমা না থাকায়—

একটা বেতের মোড়া আনিয়া অনুপম রান্নাঘরে বসিল।

ঘামলে তোমায় যেন কী রকম দেখায় তরঙ্গ।

কী রকম দেখায় ?

রোদের মধ্যে বৃষ্টি হলে যেমন দেখায় তেমনই।

তরঙ্গ ভাত টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল ভাত সিদ্ধ হইয়াছে কি না। হাত ধুইয়া একদিকের দেয়ালে বসানো লম্বা কাঠের তাক হইতে এক প্লেট কাসুন্দি-মাখা জাম পাড়িয়া অনুপমকে দিল। তারপর ঢাকনি-লাগানো অ্যালুমিনিয়মের পাত্রে চিংড়িমাছে নুন-মশলা মাখিতে মাখিতে বলিল, আর কেউ এ রকম কবিত্ব করলে আমার গা জ্বলে যায়, কিন্তু তোমার মুখে শুনলে খারাপ লাগে না। কবিত্ব করাটা বোধ হয় তোমার পক্ষে স্বাভাবিক অনুদা।

অনুপম জামের বীচি উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, কবিত্ব করলাম বুঝি ? কথাটা মনে হল, তাই বললাম।

এ রকম কথা মনে হওয়া আর বলাকেই কবিত্ব করা বলে। সরল ভাবে কবিত্ব কর বলেই বোধ হয় তোমাকে সইতে পারি। তা ছাড়া, তোমার আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। দুবছর ধরে বলে বলে তোমার সিগারেটটা পর্যন্ত ছাড়াতে পারলাম না !

অনুপম হাসিয়া বলিল, তুমি বল বলেই একেবারে ছাড়িনি। তোমার হুকুম শুনব কেন ?

তরঙ্গ মুখ তুলিয়া বলিল, হুকুম আবার কীসের ? খুড়িমাকে এত হিসেব করে সংসার চালাতে হয়, তোমার একটা পয়সা নষ্ট করা উচিত নয়।

মার পয়সা তো নষ্ট করি না, আমাব টিউশনির টাকায় খাই।

তাই বা খাবে কেন ? সিগারেটে যে টাকা উড়িয়ে দাও, খুড়িমাকে সে টাকাটা দিতে পার না।

অনুপম একটু অস্বস্তি বোধ করিযা বলে, সেই জন্যেই তো কমিয়ে দিয়েছি, একটা-দুটোর বেশি খাই না।

তরঙ্গ মুখ নামাইয়া বলে, একটা দুটো নয়। কাল বেলা দশটার সময় এক প্যাকেট কিনে এনেছিলে, রাত্রে ঘুমোন পর্যন্ত ছটা খেয়েছ।

এ কথায় লজ্জা পাওয়ার বদলে অনুপম আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুমি গুনে দেখেছ না কি ?

গুনব না ? আলো জ্বেলে ঘুমোও কেন ?

আমি আলো জ্বেলে ঘুমোই বলে কটা সিগারেট খেয়েছি গুনে দেখেছ, ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢুকল না।

তরঙ্গ এবার হাসিল।

কাল আলো নেভাতে গিয়ে তোমার পকেট থেকে প্যাকেট বার করে গুনে দেখেছি।

অনুপম গম্ভীব হইয়া বলিল, তুমি তা হলে চুপিচুপি আমার পকেট হাতড়াও ?

চুরি করার জন্য হাতড়াই না কিন্তু।

অনুপম গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ তবঙ্গের ঘামে-ভেজা মুখখানা নিরীক্ষণ করে,—আবিষ্কারকের দৃষ্টিতে। তারপর মৃদুস্বরে বলে, মাঝে মাঝে আমাব পকেটে খুচরো পয়সা বেড়ে যায় তা জান ?

জানি বইকী। আমি বাড়িয়ে দিই, আমি জানব না তো কে জানবে ?

কেন বাড়াও ?

খুড়িমার জন্যে। পকেটে পয়সা না থাকলেই তো খুড়িমার কাছে হাত পাতবে।

রান্নাঘরের গরমে নয়, অপমানে মুখ লাল করিয়া অনুপম বসিয়া থাকে।

তরঙ্গ নীরবে নির্বিকার চিত্তে চিংড়ি-াছ সিদ্ধ করার পাত্রটির ঢাকনি ভালো করিয়া বন্ধ করে, তাকের উপর হইতে সরু খানিকটা তার লইয়া পাত্রটি জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধে। তখনও অনুপমের মুখে লালাভ মেঘ সঞ্চারিত হইয়া আছে দেখিয়া বলে, এতে রাগ করার কী আছে ? সহজ সরল ব্যাপারকে ঘোরালো কোরো না অনুদা। আমি প্রত্যেকটি পয়সার হিসেব রেখেছি, যখন রোজগার করবে শোধ দিয়ে দিয়ো—না হয় সুদও দিয়ো কিছু, তিন কি চার পারসেন্ট। আমি তোমায় দান করিনি, ধার দিয়েছি।

অনুপম রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল, তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলো না, খপরদার !

রাত্রে অনুপম আলো জ্বালিয়া রাখিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। আলো নিভাইতে গিয়া তরঙ্গ আলো নেভানোর বদলে বিছানার কাছে গিয়া অনুপমের ঘুমন্ত মুখখানা একটু দেখিয়া বলিল, ঘুম আসেনি, চোখের পাতা কাঁপছে।

শ্লেষ নয়, তরঙ্গ শ্লেষ করিতে জানে না !

অনুপম চোখ মেলিয়া বলিল, কেন জ্বালাতন করছ ? তোমার জ্বালায় একটু ঘুমোতেও পাব না ?

আমারও ঘুম আসছে না। চলো একটু বেড়িয়ে আসি।

এত রাত্রে ?

রাত্রি ছাড়া শহরের রাস্তায় ভিড় ঠেলে বেড়ানো যায় ? ওঠো, জামা পরে নাও।

তবঙ্গেব মুখে এমন শ্রান্ত গাম্ভীর্য অনুপম কোনোদিন দেখে নাই। আর কথা বলিবার সাহস তার হইল না। উঠিয়া জামাটা গায়ে দিয়া পাম্পশুতে পা ঢুকাইয়া সে প্রস্তুত হইয়া লইল।

সাধনার তন্দ্রা আসিয়াছিল। তরঙ্গ তাঁকে ডাকিয়া তুলিল।

আমরা একটু বেড়াতে যাচ্ছি খুড়িমা।

এত রাত্রে !

গরমে শবীরটা কেমন করছে।

সাধনা মাথা নাড়িযা বলিলেন, বেড়াতে হয ছাতে গিযে পাযচারি করো। এত রাত্রে রাস্তায বেড়াতে যেতে হবে না।

তরঙ্গ উদ্ধত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, কেন ?

কেন তাও তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে ? এটুকু বুঝবার ক্ষমতা তোমার নেই ?

একা তো যাচ্ছি না, অনুদার সঙ্গে যাচ্ছি।

অনু যাবে না।

তবে আমি একাই যাব। দরজাটা দিয়ে যাও তো অনুদা।

সোজা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া তবঙ্গ বাহির হইয়া গেল। একটু দ্বিধা করিয়া সাধনা বলিলেন, সঙ্গে যা অনু। কাল ওকে স্পষ্ট বলে দেব আমাব বাড়িতে ওব আর থাকা চলবে না।

এ বাড়িতে আত্মীয়েরা সংবাদ পাইয়াছে কেবল শঙ্করের শেষ কীর্তিটির। কারও লাগিয়াছে চমক, কেউ হইয়াছে অবাক, কারও লাগিয়াছে মজা, কেউ করিয়াছে আপশোশ। কারণটা অনুমান করিতে পারিয়াছে সকলেই। পরীক্ষা খারাপ হওয়ার প্রতিক্রিয়া। লজ্জা ঠিক নয়,—লজ্জার জন্য হইলে শেষদিনের পরীক্ষা দিয়া শঙ্কর এ কাজ করিত না, এখন তো আর কেউ জানে না সে কেমন পরীক্ষা দিয়াছে ! আত্মীয়স্বজনকে মুখ না দেখানোর জন্য হইলে শঙ্কর জেলে যাইত পরীক্ষার ফল বাহির হইলে,—তাব এখন অনেক দেরি। একাজের প্রেরণা শঙ্করকে দিয়াছে, দুঃখ, গ্লানি, যন্ত্রণা—'রিঅ্যাকশন'। কিন্তু শঙ্করের মতো ছেলে এমন পাগলামি করিল কেন ? এত যে ফিটফাট থাকা তার স্বভাব, অসংখ্য ছোটোবড়ো আরাম ছাড়া যে তার দিন চলে না—জেলে সে এ সব পাইবে কোথায় ? আহা বড়ো কষ্ট হইবে ছেলেটার।

শঙ্করের মা একটু কাঁদিলেন, বীরেশ্বরকে বলিলেন, চুরি-ডাকাতির জন্যে তো নয়, জেলে ওকে চা খেতে দেবে তো বাবা ?

সীতা পিসিমা বলিলেন, উঃ ! কী আশ্চর্য মন মানুযের ! পড়তে পড়তে আমায় বলত, এগজামিন শেষ হলে রোজ তিনবার করে সিনেমায় যাবে, আর যেই না এগজামিন শেষ হওয়া,

পিকেটিং করে বাবু গেলেন জেলে ! বুঝতে পারছ বউ, মানুষের মন কী রকম আশ্চর্য জিনিস ? সাধ ছিল সিনেমা দেখার, সাধ মেটাল জেলে গিয়ে !

দেখা গেল, শঙ্করের কীর্তিতে সব চেয়ে বিচলিত হইয়াছেন রামলাল।

রামলালের দোষ নাই। সেদিন সন্ধ্যায় রামলালও সেই হোটেলে ছিলেন—প্রায়ই থাকেন। ছেলেকে তিনি হোটেলে ঢুকিতে দেখিয়াছিলেন, পেগ টানিতেও দেখিয়াছিলেন। এ অবস্থায় বাপের পক্ষে একটু বিচলিত হওয়াই স্বাভাবিক।

রামলালের অনুভূতি বড়ো ভোঁতা, মানুষটা তিনি তাই নির্বিকার। এত বেশি নির্বিকার যে মদে তাঁর না হয় নেশা, না জাগে বিকার। কেবল সাধারণ অবস্থায় কিছু ভালো-না-লাগা আর কিছু খারাপ-না-লাগার অস্বাভাবিক স্থায়ী সমন্বয়ের মধ্যে, কিছু ভালো-না-লাগাটা মদের শাসনে স্বাভাবিক হইয়া ওঠে,—তিনি মনে করেন, তাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট বৈচিত্র্য, পরম লাভ। জীবনে তাঁর কোনো স্বাদ নাই, জীবনটা তাই সাধারণভাবে বিস্বাদ করিয়াই তিনি কৃতার্থ,—সকলের জীবন যতটুকু বিস্বাদ। এ বিষয়ে তিনি নিরুপায়। চামড়া যাঁর এত মোটা যে, জীবনদেবতার গায়ে হাত-বুলান আদর টেরও পান না, প্রহার ছাড়া তাঁর চলিবে কেন ?

কিন্তু ছেলে মদ টানিতেছে, এ প্রহার নয়।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া থাকিয়া সেদিন তিনি হোটেল হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। যে উপায়ে নিয়মিত ভাবে জীবনটা তিনি যতটুকু বিস্বাদ করেন, কল্পনাতীত রূপে সেদিন তার চেয়ে বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল,—কড়া এবং ঝাঁঝালো। কতকাল পরে যে এ রকম কড়া ও ঝাঁঝালো কষ্ট পাইলেন, রামলালের মনেও ছিল না। শঙ্কর তাঁকে দেখিতে পাইয়াছে কি না এ বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল, শঙ্করের জেলে যাওয়ার খবরে এ সন্দেহ মিটিয়া গেল। একটু খুশিও তিনি হইলেন, তাঁকে দেখিয়াছিল বলিয়া নিজের অপকীর্তির লজ্জা এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল শঙ্করের যে, জেলে না গিয়া সে থাকিতে পারে নাই—এ যেন একটা সান্ত্বনা, এ যেন একটা প্রমাণ যে শঙ্কর বেশি বিগড়াইয়া যায় নাই, এ যেন শঙ্করের পরোক্ষ ঘোষণা যে, আর কখনও এমন কাজ সে করিবে না।

কিন্তু এ সান্ত্বনা, প্রমাণ বা পরোক্ষ ঘোষণা রামলালের কাজে লাগিল না, এতকালের ভোঁতা অনুভূতি হঠাৎ বিদ্রোহ করিয়া তাঁকে অনভ্যস্ত কষ্ট দিতে লাগিল। এ কাজ শঙ্কর করিয়াছে কেন, একটি ছাড়া, এ প্রশ্নের জবাব রামলাল খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁর মতো লোক যার বাপ, সে এই রকমই করে। জীবজগতের নিয়মই এই। শঙ্করকে তিনি দোষ দিতে পারেন না, জন্ম তিনি শঙ্করকে যেমন দিয়াছেন, মদের গ্লাস হাতে করার কামনাও তেমনই তাঁরই দান।

রামলাল নিজেও যেমন বাড়ির মানুষগুলি সম্বন্ধে নির্বিকার, বাড়ির মানুষগুলিও তাঁর সম্বন্ধে তেমনই উদাসীন। কিন্তু হঠাৎ রামলালের পরিবর্তন দেখিয়া বাড়ির লোকে অবাক হইয়া গেল। সন্ধ্যার আগে রামলাল বাড়ি ফেরেন, এ ঘরে ও ঘরে ছটফট করিয়া বেড়ান, যাচিয়া সকলের সঙ্গে কথা বলেন, নিজের সুখসুবিধার দাবি জানান, কারণে অকারণে রাগেন আর বকেন এবং পরক্ষণে অনুতপ্ত হইয়া, বড়ো মানুষকে বকিয়া থাকিলে আদর করেন বাড়ির কয়েকটি শিশুর যে কোনো একটিকে, ছোটো মানুষকে বকিয়া থাকিলে বড়ো মানুষের যে কোনো একজনের সঙ্গে মিষ্টি করিয়া কথা বলেন—অবান্তর খাপছাড়া সব কথা। রামলাল মদ খাইলেও টের পাওয়া কঠিন, তবু সকলেই এখন টের পায় মদ তিনি খান নাই—মদ তিনি খাইতেছেন না।

কদিনের জন্যই বা শঙ্কর জেলে গিয়াছে, তাতেই এত ? রামলালের এমন পুত্রস্নেহের খবর তো ইহারা রাখিত না !

সীতা বলেন, কেন এত ভাবছ দাদা ? দু-চারবছরের জেল তো হয়নি !

জেলের জন্য নয় ! ওর আমি কী সর্বনাশ করেছি বল তো ?

সর্বনাশ ! কীসের সর্বনাশ ?

সে তুই বুঝবি না। মানুষের মধ্যে বংশগত প্রভাব কত জোরালো হতে পারে, তুই তার কী জানিস ?

সীতা আহতা হইয়া বলেন, আমি জানি না ? মানুষের মন সম্বন্ধে এত বই পড়ি, এত ভাবি, আমি বংশগত প্রভাবের কথা জানি না ! আমাকে মুখ্যু ভাব বুঝি তুমি ?

সীতার ভাবোচ্ছ্বাস ঠেকাইবার জন্য রামলাল তাড়াতাড়ি বলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তুই জানিস, সব জানিস।

সীতা বলেন, মানুষের মন কী আশ্চর্য দেখলে তো ? এই বললে জানিস না, আবার বলছ জানিস ! মানুষের মনের কথা যখন ভাবতে আরম্ভ করি দাদা—

রামলাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, মনে মনে ভাবতে পারিস না ? তোর মনের কথা শুনতে শুনতে মানুষের গায়ে জ্বর আসে।

শঙ্করকে পেগ টানিতে দেখিয়া রামলালের যেমন হইয়াছিল, এ কথায় সীতাও তেমনই হতভম্ব হইয়া গেলেন। মুখের চামড়া কুঁচকাইয়া কপালের স্থায়ী রেখাটি ছাড়া আরও অনেকগুলি রেখা দেখা দিল—এক মুহূর্তে সীতার যেন বার্ধক্য আসিয়াছে। চলন্ত গাড়ির বাঁক ঘুরিবার মতো অর্ধচক্রাকারে একটা পাক দিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, গেলেন বীরেশ্বরের কাছে। কপালের স্থায়ী রেখাটিকে বাঁহাতের আঙুলের ডগা দিয়া সজোরে ঘষিতে ঘষিতে নালিশ করিলেন। এখানে আমার তো আর থাকা হয় না বাবা !

বীরেশ্বর শান্তভাবে বলিলেন, কেন ?

কী করে থাকি ? তুমি বুড়ো হয়েছ, আজ বাদে কাল চোখ বুজবে। দাদা তখন আমায় দূর দূর করে খেদিয়ে দেবে না ?

এখনও তো চোখ বুজিনি। আগে চোখ বুজি, তারপর সে কথা ভাবিস।

তখন ভেবে কী হবে ? ভবিষ্যতের কথা আগে থেকে ভাবতে হয়। মানুষের মন কী রকম আশ্চর্য জিনিস তুমি জান না বাবা, আমার নামে কটা টাকা লিখে দিয়েছ বলে আমার কথা শুনতে দাদার এখন গায়ে জ্বর আসে। কটা টাকাই বা তুমি আমাকে দিয়েছ ? তাও দাদার সইছে না। আমি এখানে থাকব না বাবা।

বীরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আরও কিছু তোকে দিয়ে যাব সীতা, ভবিষ্যতের জন্য তোকে ভাবতে হবে না। এখানেই থাক তুই।

সীতাকে এখানে থাকিতে বলা বাহুল্যমাত্র, কারণ থাকিতে না বলিলেও যে তিনি এখানে থাকিবেন না, এমন কোনো প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে থাকিতে বলাটাই বীরেশ্বরের স্বভাব।

পরদিন সকালে তরঙ্গ আসিয়া যখন বলিল, দাদু, আপনার এখানে আমায় থাকতে দেবেন ? তখনও কেন, কী বৃত্তান্ত—কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাকেও তিনি থাকিতেই বলিলেন।

কৈফিয়ত দাবি করিতে গেলেন সাধনার কাছে।

সাধনা বলিলেন, আমার কোনো দোষ নেই বাবা। আমি শুধু বলেছি, এ রকম করলে আমার এখানে থাকতে পারবে না। মেয়ে অমনি হুট করে চলে গেলেন।

তাই বা কেন বললে ?

বলব না ? আমার বাড়িতে থেকে আমার ছেলেমেয়ের মাথা খাবে, আমি চুপ করে বসে থাকব ? এতকাল সয়ে এসেছি, কিন্তু মানুষের কতকাল সয় ? রাত বারোটার সময় মেয়ে গটগট করে হাওয়া খেতে বেরোবেন রাস্তায় !

বীরেশ্বর গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলেন। সাধনা নতমুখে আঁচল জড়াইয়া হঠাৎ কাঁদোকাঁদো হইয়া বলিলেন, আমি চলে যেতে বলিনি বাবা, ভাবিও নি ওই কথাতে রাগ করে চলে যাবে। বাড়িটা আমার খালি হয়ে গেছে।

বীরেশ্বর গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

জেল হইতে শঙ্কর বাড়ি ফিরিল গম্ভীর মুখেই।

তরঙ্গকে কেহ সহ্য করতে পারে না।

যে কেবল নিজের নিয়ম মানিয়া চলে, অথচ পিছনে লাগে সকলের, কে তাকে সহ্য করিতে পারিবে ? না করিবে সে সহজভাবে একটা কাজ, না বলিবে সহজভাবে একটা কথা। অনবরত নিজের অস্বাভাবিক অসাধাবণত্বকে সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু এমন উদাসীন, শান্ত, সংযমের সঙ্গে কাজটা সে করিবে যে, সকলের মনে হইবে, এটা হয় তার ছেলেখেলা, নয় লীলাখেলা। বাড়ির আর পাড়ার মেয়েবা নিজেদের মধ্যে তরঙ্গের কথা বলাবলি করে। এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকে না যে, পাঁচ মিনিট তরঙ্গের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে বড়ো শাস্তি আর নাই। অথচ এমন একটা আকর্ষণ আছে তরঙ্গের পীড়াদায়ক সঙ্গেব যে, দুপুরবেলা তরঙ্গের ঘরে ভিড় জমিয়া যায় পাড়ার আর বাড়ির মেয়েদের।

তরঙ্গ একাই যেন একটা যাত্রাভিনয় অথবা থিয়েটাব।

আসলে এইটুকুই তরঙ্গের আকর্ষণ। সে যা বলে আব করে, তার এতটুকু দাম কারও কাছে নেই, কেন আর কীভাবে সে কোন কথাটা বলে আর কোন কাজটা করে, শুধু সেইটুকু লক্ষ করিবার জন্য সকলে গভীর কৌতূহল অনুভব করে। মেয়েদেব মধ্যে বৃহত্তর মহত্তর কিছু—কিছুটা যে কী, এখনও তরঙ্গ অবশ্য নিজেই তা ভালো করিয়া বোঝে না—সঞ্চারিত করিতে চাহিয়া তরঙ্গ শুধু সঞ্চারিত করে কৌতূহল। সভয় দৃষ্টিতে সাপুড়ের সাপ নাচানো দেখিবাব কৌতূহল এবং সে কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য যাত্রা-থিয়েটার দেখিতে যাওয়ার মতো প্রচণ্ড উৎসাহ !

এই উৎসাহটা তরঙ্গকে মুগ্ধ করে। সে ভাবে, ইতিমধ্যেই কি তার জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হইতে আরম্ভ করিয়াছে ? কী শুভক্ষণেই সে সাধনার বাড়ি ছাড়িয়া এ বাড়িতে বাস করিতে আসিয়াছিল ! কই, সেখানে তো পাড়ার মেয়েরা এমনভাবে তার কাছে আসিয়া তাব কথা শুনিবার জন্য এত ব্যাকুল হয় নাই ? এখানে যে একবার তার কাছে আসিয়াছে ঘনঘন না আসিয়া সে পারে না। সে তবু কতটুকুই বা নিজেকে এখানে প্রকাশ করিয়াছে ? মেয়েদের জীবনকে নূতন ছাঁচে ঢালিবার জন্য কতটুকু চেষ্টাই বা সে করিয়াছে ?

তরঙ্গ রীতিমতো গর্ব অনুভব করে। কিন্তু নিজেই সে নিজেকে গর্ব অনুভব করিতে বারণ করিয়া দিয়াছে, তাই গর্বটাকে সে ধরিয়া লইয়াছে আনন্দ বলিয়া। যত বেশি গর্ব হয় তরঙ্গের, নিজেকে সে তত বেশি আনন্দিত মনে করে।

এ কথাটা তার মনেও থাকে না যে, আনন্দ অনুভব করাটাও তার নিজের নিয়মে নিষেধ।

কেবল তাই নয়, এ কথাটাও তরঙ্গ বুঝিতে পারে না যে, কেউ তাকে সহ্য করিতে পারে না। যাকে সহ্য হয় না, তার সঙ্গেও যে মানুষের যাচিয়া কথা বলিবার সাধ জাগা সম্ভব, এটা বুঝিবার মতো বুদ্ধি হয়তো তরঙ্গের আছে, কিন্তু বুঝিবার ইচ্ছাও নাই, চেষ্টাও নাই। চারিদিকে অজস্র সংকেত আছে যে, সে কারও প্রিয়া নয়, কিন্তু একটা সংকেত সে গ্রহণও করে না, গ্রাহ্যও করে না। মনেব জোর কি সাধারণ তরঙ্গের !

দেখা গেল, শঙ্করও যেন তরঙ্গকে আর পছন্দ করিতেছে না।

প্রেমে যেন ভাটা পড়িয়া গিয়াছে শঙ্করের, জোয়ার আসিয়াছে পড়িবার নেশার। আকাশে চাঁদ থাকে, বাড়িব কোনো একটা ঘরে তরঙ্গ থাকে, অথচ শঙ্করের ঘরে অনেক রাত্রি পর্যন্ত জ্বলে আলো। কিছুই কবে না শঙ্কর,—চিরকাল যা করিয়া আসিয়াছে তার অতিরিক্ত কিছু। খায় দায় ঘুমায়, আর রাত জাগিয়া পড়ে।

দেখিয়া রামলাল স্বস্তি পান, নিশ্চিন্ত মনে আবার এখানে ওখানে পিপাসা নিবারণ কবিয়া গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরিবাব পুরাতন প্রথাটা ফিরাইয়া আনেন, কিন্তু শঙ্করকে আর আলো নিভাইয়া শুইযা পড়িতে বলেন না !

হয়তো ভাবেন যে, তাঁর হুকুমে সাধ মিটাইয়া রাত জাগিতে পারিত না বলিযাই শঙ্কর কেবল হোটেলে গিয়া পেগ টানিয়াছিল ! জাগুক, হোটেলে যাওয়াব বদলে বাড়িতে যতখুশি রাত জাগুক।

তরঙ্গ বলে, এখন আবার এত পড়া কেন ?

শঙ্কর বলে, পড়ার আবার এখন তখন আছে না কি ?

পরীক্ষা তো নেই।

আমি পরীক্ষার জন্য পড়ি না।

তরঙ্গ মৃদু হাসিয়া বলে, সব সময় আত্মপ্রবঞ্চনা নিয়ে থাকবেন, আপনাদেব নিয়ে আমি কী যে করি !

আমাদের নিয়ে তোমার কিছু করতে হবে না।—বলিয়া শঙ্কর এমনভাবে স্থান ত্যাগ করে যে, অন্য মেয়ে হইলে রীতিমতো অপমান বোধ করিত। জটিল বোধশক্তি লইয়া তরঙ্গ যা বোধ কবে, তার কোনো সংজ্ঞা নাই।

তবে অনুপম আসিলে এবং চলিয়া গেলে তরঙ্গ যা অনুভব কবে, তাব মধ্যে অস্পষ্টতা থাকে না। অনুপমকে দেখিলে তার আনন্দ হয়, অনুপম চলিয়া গেলে হয কষ্ট। বাত্রে এখন আব অনুপমেব ঘরে আলো নিভাইবাব উপায় নাই, নিজের ঘরের আলোটা নিভাইয়া দিবাব সময বোধ হয সেই জন্যই তরঙ্গের মনে হয় অনুপমের আসিয়া চলিযা যাওয়াটা কোনো-একদিক দিয়া যেন ঘবে আলোটা জ্বালিয়া নিভাইয়া দিবার শামিল।

অনুপমের জন্য চোখে অন্ধকার দেখে বলিযা অবশ্য এ কথা মনে হয় না তরঙ্গেব,—সে ভাবে চোখে অন্ধকার দেখিবার একটা সুবিধা আছে, আসল ব্যাপারটা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অনুপমেব আসা-যাওয়ার সঙ্গে নিজের এ রকম স্পষ্ট আনন্দ ও নিরানন্দ বোধ করিবার সম্পর্কটা বুঝিবাব জন্য তরঙ্গকে নিজের মনের অন্ধকার হাতড়াইতে হয়।

সে জন্য অনুপমের কথাটা তরঙ্গ অনেক সময় ভাবে। প্রায় সর্বদাই।

অনুপমের কথা সব সময় ভাবিতে সাধ হয় বলিয়া ভাবে না। ছি, ও সব দুর্বলতা তরঙ্গের নাই, সে কী আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতো যে কিছুদিন একটা কলেজে পড়া সিগারেট-টানা আধা-কবি ছোকরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিল বলিয়া, রাত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুমানোর বদলে সেই ছোকরার স্বপ্ন দেখিবে ? অনুপমের জন্য মনটা একটু কেমন করে বলিয়া, কেন অনুপমের জন্য মনটা একটু কেমন করে, শুধু এইটুকু বুঝিবার জন্য সে অনুপমের কথা ভাবে আর কোনো কারণ নাই।

এ বাড়িতে লোক অনেক। অনুপম আসিলে তার সঙ্গে একা কথা বলার সুযোগ বড়ো কম। সে জন্য তরঙ্গের রাগ হয়।

কেন রাগ হয় সেটা বুঝিবার জন্যও তরঙ্গ অনুপমের কথা ভাবে। নিজেকে না বুঝিলে তার চলিবে কেন ? জীবনের স্তরে স্তরে নিজের সাধনালব্ধ অসীম শক্তিকে সঞ্চারিত করিয়া সৃষ্টি-বিপর্যয়ের অস্থায়ী কল্যাণকর বিপ্লব আনিয়া বৃহত্তর মহত্তর জীবনের স্তর সৃষ্টি করা যার জীবনের উদ্দেশ্য, জীবনে কালবৈশাখীর মতো ভ্রান্ত ঝড়ঝাপটা আসিলেও হৃদয়মনকে নিস্তরঙ্গ করিয়া

রাখিবার ক্ষমতা অর্জন যার দিবারাত্রিব তপস্যা, একজনের সঙ্গে নির্জনে আলাপ করাব সুযোগ না পাওয়ায় রাগ যদি তার হয়, সে রাগের কারণ খুঁজিয়া বাহির না করিলে তার চলিবে কেন ? আর এ কারণটা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে, যার সঙ্গে আলাপ করিতে না পারায় রাগের জন্ম, তার কথাটা না ভাবিলেও বা চলিবে কেন ?

একটু উদাস মনে হয় তরঙ্গাকে। একটু শিথিল মনে হয় তার জীবনযাপনেব কঠোর অনমনীয় নিয়মপালন।

একটু শ্রান্ত মনে হয় তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন।

একটু উৎসুক মনে হয় তাব দৃষ্টি।

এই পরিবর্তনেব সঙ্গে তরঙ্গের অদ্ভুত খাপছাড়া চালচলনের উগ্রতাও কমিযা আসে। তাব ফলে তবঙ্গের মধ্যে কিছু কিছু নমনীযতা আর কোমলতার আবির্ভাব ঘটিলেও অন্যদিকে ফলটা হয় বড়ো খাবাপ। মেয়েদের কাছে তবঙ্গের সৃষ্টিছাড়া নূতনত্বেব অসাধাবণত্ব বড়ো তাড়াতাড়ি কমিযা আসে। তার আনমনা ভাবটা অবশ্য একেবারে আনকোরা নতুন, কিন্তু আনমনা মেয়ের কী অভাব আছে জগতে ? যার কথা শুনিলে মনে মনে বাগ হয়, ভিতরে একটা বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার ভাব জাগে, সংসারের দুটো সুখদুঃখেব কথা বলা যার সঙ্গে অসম্ভব, তার পীড়াদায়ক সঙ্গ উপভোগ করিতে মানুষকে টানিয়া আনাব মতো আকর্ষণ কাবও আনমনা ভাবের থাকিতে পারে না।

পাড়ার ও বাড়ির মেয়েরা নিজেদের মধ্যে তবঙ্গেব কথা বলাবলি করে কম। তবঙ্গের কাছে আসা-যাওযাতে তাদের ভাটা পড়িয়া আসে। রাজরানির মতো রূপ লইয়া চাকরানিব মতো খাটিয়া যাওযা, ভিখারিনির মতো বিনয় লইয়া মাস্টাবনিব মতো উপদেশ দেওয়া, মানিবাব নিযম না মানিযা যত সব উদ্ভট নিয়ম মানিয়া চলা,—তরঙ্গের মধ্যে এ সমস্তের সমন্বয়ের আকর্ষণ কমিযা আসাব সঙ্গে তাব সম্বন্ধে সকলের বিরাগেব ভাবটাই মাথা চাড়া দিযা উঠিতে থাকে।

তরঙ্গের ঘরে দুপুরেব সভাটি আর জমকালো হয় না। তরঙ্গ বিস্মিত আহত দৃষ্টিতে সভাটিকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতব হইযা আসিতে দেখে, মেযেরা অনেকে যে তাকে এড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এটা অনুভব করিয়া মনে তাব জ্বালা ধবিযা যায়।

কারও কাছে উপদেশ গ্রহণ না করিয়া, পথের সন্ধান না চাহিয়া নিজেব অহংকারী আত্মবিশ্বাসের সাহায্যে এতদিন ধরিয়া সে যে নিজের মধ্যে সংযম জমা করিয়াছে, মনে হয় শুকনো খড়েব গাদার মতো তাতেই বুঝি আগুন ধবিয়া গেল !

একদিন সাধনা আসিয়া বলেন, ফিবে যাবি তরু ? চল না ?

না।

আমি কিন্তু তোকে তাড়িয়ে দিইনি। দিযেছি ?

না।

তবে রাগ করে চলে এলি কেন ? ফিবে চল !

না !

না ! না ! না !—ছোটো মেয়ে হলে মেরে তোর হাড় গুঁড়ো করে দিতাম।

রাগে দুঃখে অভিমানে অপমানে সাধনার চোখে জল আসিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। এ কী অদ্ভুত মেয়ে ! বিনা বাক্যব্যয়ে এতদিনের আশ্রয় ছাড়িয়া পরের বাড়ি চলিয়া আসিল, এতটুকু অস্বস্তি বোধ না করিয়া পরের বাড়ি জাঁকিয়া বসিয়া দিন কাটাইতে আরম্ভ করিল। ভাব দেখিযা মনে হয়, তার বাড়িতে এতকাল সে যে বাস করিয়াছিল, কথাটা তার স্মরণ পর্যন্ত নাই।

তরঙ্গ গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, তার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, অনুদা আসে না কেন খুড়িমা ?

নানা কাজে ব্যস্ত থাকে, সময় পায় না।

কথাটা শুনিয়াই তরঙ্গ রাগে আগুন হইয়া ওঠে। মনে হয়, আজ এই রকম একটা তুচ্ছ কথায় বোমার মতো ফাটিয়া যাওয়ার জনাই সে যেন এতকাল আত্মসংযম অভ্যাস করিয়াছে !

কাজে ব্যস্ত থাকে, না ? সময় পায় না, না ? বোলো, খুড়িমা তাকে, আমিও কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি, কোনোদিন যদি আমায় জ্বালাতে আসে, ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দেব—যদি না দিই তো—

দুমদুম পা ফেলিয়া তরঙ্গ চলিয়া যায়। সাধনার হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করে। তরঙ্গকে আজ স্পষ্ট চেনা গেল। কিন্তু অনুপম ? তার ছেলে অনুপম ?

সীতা বলেন, মেয়েটা পাগল। কিন্তু কী আশ্চর্য মন মানুষের, পাগল মনে হলেও ওকে পাগল মনে হয় না।

সাধনা মুখ কালি করিয়া বাড়ি ফিরিয়া যান।

নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া তরঙ্গ শুইয়া পড়ে বিছানায়। রাগের মাথায় দুমদুম পা ফেলিয়া নিজের ঘরে আসিতে তার যে বিশেষ কিছু পরিশ্রম হইয়াছে তা নয়, তবু হাঁপানোর মতো সে জোরে জোবে নিশ্বাস টানে। উত্তেজনা শান্ত হইয়া আসিবার সঙ্গে ভিতরে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে থাকে—এ বাড়িতে চলিয়া আসিবার আগেব দিন সাধনার বাড়িতে সে যে আত্মগ্লানি অনুভব করিয়াছিল তার চেয়ে প্রবল এবং কড়া আত্মগ্লানি !

সেদিন রাত্রে খাইতে বসিলে সাধনা অনুপমকে বলিলেন, শঙ্করদেব বাড়িতে বেশি আসা-যাওয়া করিস না অনু।

কেন ?

সাধনা কৈফিয়ত না দিয়া শুধু বলিলেন, কী দরকার ?

অনুপম বলিল, শঙ্করদের বাড়ি যাবার দরকার কিছু নেই তা বুঝলাম, তবু যেতে যখন বারণ করছ, কারণ তো আছে ?

সাধনা একটু ভাবিয়া বলিলেন, বড়োলোক আত্মীয়ের বাড়ি বেশি না যাওয়াই তো ভালো।

অনুপম খাওয়া বন্ধ করিয়া বলিল, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, কিছু একটা ঘটেছে, আমার কাছে চেপে যাচ্ছ। খুলে বলো তো, শুনি কী হয়েছে ? আমার কাছে গোপন না করলেও চলবে।

সাধনা বিব্রত হইয়া বলিলেন, কী আবার হবে ? কিছুই হয়নি ।

শিগগির বলো মা, যতক্ষণ না বলবে হাত গুটিয়ে বসে থাকব, খাব না।

সাধনা একটু ভাবিলেন, বলিলেন, বিশেষ কিছু নয়, আজ গিয়েছিলাম তো শঙ্করদের বাড়ি—ওদের কথাবার্তা শুনে ভাবভঙ্গি দেখে কেমন মনে হল, আমরা ও বাড়িতে যাই, এটা ওরা পছন্দ করে না।

তার মানে ওরা তোমায় অপমান করেছে ?

অপমান আবার কে করবে ? ওদের চালচলন দেখে কথাটা আমার মনে হল, এইমাত্র।

এমনি ও কথা মনে হবে কেন ? নিশ্চয় তোমাকে অপমান করেছে মা, তুমি লুকোচ্ছ।

বিব্রত সাধনা এবার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, বাবারে বাবা, তোর সঙ্গে আর পারি না অনু, একটা কথা বললে কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণান্ত। অপমান করেছে তো বেশ করেছে, তোর কী ? তুই আর ওদের বাড়ি যাস না, তাতেই হবে। বকবক না করে খা তো এখন।

সুতরাং পরদিন সকালেই অনুপম শঙ্করের বাড়ি গেল। কারও সঙ্গে কথা না বলিয়া গম্ভীর মুখে সতুকে জিজ্ঞাসা করিল, তরঙ্গ কোথায় রে সতু ?

সংবাদ দিতে সতু তেমন পটু নয়। তবু অনুপম বুঝিতে পারিল যে, কাল বিকালে এক সময় তরঙ্গ নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়াছিল, এখন পর্যন্ত দরজা খুলিয়া বাহিরে আসে নাই, হাজার ডাকাডাকিতেও না।

অনুপমকে বেশি ডাকিতে হইল না, তরঙ্গ দরজা খুলিয়া দিল। মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে তরঙ্গের, দেখিলে মনে হয় সারারাত ঘরের মধ্যে কাটানোর বদলে সে যেন এই মাত্র কড়া রোদে টো টো টহল দিয়া আসিল।

তবু একটু হাসিতে ছাড়িল না তরঙ্গ।

কী খবর অনুদা !

অনুপম বলিল, তোমার কাছেই খবর জানতে এসেছি। মাকে না কি কাল এ বাড়িতে অপমান করেছে ?

অপমান করেছে ? কে অপমান করেছে ? আমি তো কিছু জানি না !—ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি অপমান করেছি।

তুমি ?

অবাক হয়ে গেলে দেখছি, আমি কি কাউকে অপমান করতে পারি না অনুদা ? কাল কী হল জান, আমি খুড়িমাকে জিজ্ঞেস করলাম, অনুদা আসে না কেন খুড়িমা ? খুড়িমা বললেন, কাজের ভিড়ে সময় পায় না—শুনেই আমি রেগে গেলাম।

কেন ? ও কথায় রাগের কী আছে ?

সেই তো মজা, আমিও কাল সারারাত তাই ভেবেছি। ভেবে কী আবিষ্কার করেছি, সেটা আজ আর তোমার শুনে কাজ নেই, তারপর কী হল শোনো। খুড়িমার কথা শুনে আমি রেগে বললাম, অনুদা যদি কোনোদিন এ বাড়িতে আসে ঝেঁটিয়ে অনুদাকে দূর করে দেব। তা হলেই বুঝতে পারছ, খুড়িমাকে আমি অপমান করিনি, অপমান করেছি তোমাকে। কিন্তু তুমি ছেলে কি না, অপমানটা তাই খুড়িমার বুকে বেজেছে।

অনুপম হাসিয়া বলিল, এই ব্যাপার ? কই আমাকে তো ঝেঁটিয়ে দূর কবে দিলে না ?

তরঙ্গও হাসিয়া বলিল, ঝেঁটিয়ে দূর না করি, এমনি তোমায় আজ দূর করে দেব। কয়েকমাস তুমি এ বাড়িতে এস না।

কিছু বুঝতে পারছি না তরঙ্গ, সব হেঁয়ালি লাগছে।

আমি যখন মরব, তখন সব বুঝতে পারবে। তোমায় সব বুঝিয়ে একখানা চিঠি লিখে রেখে যাব।

মরব মানে ?

মরব মানে ? মরব মানে আত্মহত্যা করব। কড়িকাঠে দড়ি বেঁধে হোক, বিষ খেয়ে হোক, সটান স্বর্গে চলে যাব। মাস দুই তুমি কিন্তু এসো না অনুদা। দেখি যদি না মরে চলে।

মাস দুই। দুমাস অনুপমকে না দেখিলেই মনের অসুখটা সারাইয়া ফেলিতে পারিবে, এ রকম আশা পোষণ করা তরঙ্গের মতো অহঙ্কারী মেয়ের পক্ষে আশ্চর্য নয়। এদিকে অনুপমও বোকা নয়। দুমাসের মধ্যে কতবার সে যে তরঙ্গের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। কিন্তু তরঙ্গ না দিল তাকে এতটুকু আমল, না বলিতে চাহিল তার সঙ্গে ভালো করিয়া কথা। তারপর একদিন নিজের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চড়া মেজাজে এমন কড়া ধমকই সে দিল অনুপমকে যে, তারপর মাস দুই আর সে এ মুখো হইল না।

মাস দুই পরে যখন আসিল, তরঙ্গ তখন নিজের ঘরে কড়িকাঠে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলিতেছে, পুলিশ আসিবার প্রতীক্ষায় তাকে নামানো পর্যন্ত হয় নাই। অনুপমের নামে চিঠি লিখিয়া রাখিয়া যাইতে

কিন্তু সে ভোলে নাই। অনুপমের নাম লেখা খামখানা সীতার জিম্মায় ছিল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে খামখানা অনুপমের হাতে দিল। মোটা ভারী খাম। হাতে করিলেই বুঝা যায়, তরঙ্গ অনুপমের নামে শুধু চিঠি লিখিয়া রাখিয়া যায় নাই, মস্ত চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

ছয়

অনুপম,

তোমার জন্য গলায় দড়ি দিয়েছি ? তোমায় ভালোবাসি বলে ? কী গভীর আনন্দই না জানি তুমি উপভোগ করছ ! কিন্তু এ জন্য বেশি অনুতাপ কোরো না, আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হোয়ো না। পার তো গোপনে একটু কাঁদাকাটা কোরো আমার জন্য। চেষ্টা করতে দোষ কী ? তবে গভীর শোকের মধ্যে, তোমার জন্য আমি মরছি ভেবে যদি গভীরতর আনন্দ উপভোগ কর, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিজের মনকে বিশ্লেষণ করতে বোসো। আমার তো মনে হয় যে কোনো জার্মান মনস্তত্ত্ববিদের যে কোনো একখানা বই খুলে আত্মপরীক্ষায় বসলেই ফুল মার্কস পাবে। তোমার বোকামির প্রতিভা আছে।

গলায় দড়ি দেওয়া ভালো নয়। তবু অনেকেই গলায় দড়ি দেয়। গলায় দড়ি দেবে, কি দেবে না ভাবতে ভাবতে অন্যমনে কখন যে গলায় দড়ি দিয়ে বসে টেরও পায না। টের পায় না মানে—মানে তুমি নিশ্চয বুঝতে পারছ—গলায দড়ি দিলে আর কি করে টের পাবে ? কিন্তু তোমার জ্বালায় আর দশজনের মতো স্বাভাবিকভাবে গলায় দড়ি পর্যন্ত আমার দেওয়া হল না। তুমি আমার শনিগ্রহ, মরবার আগে এত লোক থাকতে তোমার উপরেই রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে। আমি গলায় দড়ি দেব আর তুমি ভাববে তোমার জন্য আমার হৃদয়ে প্রেমের ক্যান্সার হয়েছিল, যাতনা সহ্য করতে না পেরে কয়েক হাত লম্বা একটা দড়ি ধরেই স্বর্গে চলে গেলাম—এ কথা ভাবছি আর সাধ হচ্ছে আগে তোমাকে খুন করে তাবপর নিজের যা হয় ব্যবস্থা কবি। আমাকে নিয়ে অনেক আলোচনা, অনেক গবেষণা চলবে জানি, অনেকে অনেক রকম থিয়োবি বার করবে, কিন্তু আমি তা গ্রাহ্যও করি না। যার যা খুশি ভাবুক, যা খুশি কল্পনা করুক—কিন্তু এ জগতে একজনও যদি বিশ্বাস করে যে, প্রেমের জন্য তরঙ্গ গলায় দড়ি দিয়েছে, গলায় দড়ি দিয়ে তবে তরঙ্গের লাভ কী ?

তুমি আমাকে অনেকদিন থেকে ঘনিষ্ঠভাবে জান, অন্তত তোমার বোঝা উচিত প্রেমের জন্য বুকভরা ঘেন্না পোষণ করা ছাড়া তরঙ্গের পক্ষে আব কিছু কবা সম্ভব নয় অথচ তুমিই বিশ্বাস করবে, তরঙ্গ আত্মহত্যা করেছে প্রেমের জন্য ! তুমি এত বড়ো হাঁদা।

এত লোক থাকতে এই জন্যই তোমার নামে এত বড়ো একখানা চিঠি আমাকে লিখে রেখে যেতে হল। চিঠিখানা ঠিক কত বড়ো হবে এখন অবশ্য আমি তা জানি না, কিন্তু মস্ত বড়োই যে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত পোড়ো। তোমার মতো বোকা হাবাকে, কী জন্য গলায় দড়ি দিলাম, দু-চার কথায় বোঝানো আমার কর্ম নয়। ভুল বোঝার পাথরে শাণ দিতে দিতে তোমার বুদ্ধির তরোয়ালের ধারালো দিকটা এমন ভোঁতা হয়ে গিয়েছে যে, ভোঁতা দিকটার ধার বেশি হওয়ায় বুদ্ধিকে তোমার উলটোভাবে ব্যবহার না করে উপায় নাই।

রাগ করলে ? রাগ কোরো না। যেমন বুদ্ধিই হোক তোমার বুদ্ধি আছে এইটুকু যে স্বীকার করে নিয়েছি তাই খুব বড়ো প্রশংসা বলে ধরে নিয়ো। কে জানে, হয়তো তোমাকে একটু মায়া করি বলেই তোমাকে বুদ্ধিমান মনে করতে ইচ্ছা হচ্ছে। মমতাই মানুষের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা।

অনুপম, মায়ামমতার নামেই মেয়েদের মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে, আর ওঠে মেয়েছেলেদের মন, যারা ছেলে, কিন্তু পুরুষ নয়। তোমার মনটা যদি আমার এই মায়া করার কথায় ছ্যাঁৎ করে ওঠে, একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজের গায়ে একটা ছ্যাঁকা দিয়ো। এ মায়ামমতা প্রেম নয়। তরঙ্গ প্রেমের ধার ধারে না।

তোমার কাছে এ কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, কী করে যে কী হল, আমি ভালো বুঝতে পারছি না। কেবল এটুকু বুঝতে পারছি, অনেক যত্নে যে তাসের ঘর রচনা করেছিলাম, আমার নিজের নিশ্বাসে হুড়মুড় করে সে ঘর ভেঙে গিয়েছে। আমি এমন সৃষ্টিছাড়া কালনাগিনী যে, নিজের লেজ কামড়ে নিজের মাথার বিষে নিজেই আমি মরে গেলাম। বিষটা মাথায় থাকলে হয়তো বাঁচতাম, অমন অনেকেই বেঁচে আছে, বিষটা তাদের কাছে অমৃতের সমান, কারণ, ওই বিষ দিয়ে অপরকে মেরে ফেলা যায়—এই হিংসার যুগে এত বড়ো পরিতৃপ্তি যা দিতে পারে সে বিষ অমৃত বইকী! কিন্তু আমার মাথাটা খারাপ কিনা, নিজের বিষদাঁত তাই নিজের উপরেই ব্যবহার করে নূতন একস্‌পেরিমেন্ট করতে গেলাম।

তুমি জান আমার জীবনটা কী রকম খাপছাড়া। আমি নিজে খাপছাড়া মানুষ বলে আমার জীবনটা খাপছাড়া হয়েছে অথবা আমার জীবনটা খাপছাড়া বলে আমি খাপছাড়া হয়েছি, এ সব ধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এ সব হল আমার নিজস্ব ধাঁধা। আমার ধাঁধা আমারই থাক, সময়মতো দড়ির ফাঁসে আচ্ছা করে বাঁধব। তোমার প্রেম ছাড়া আমার গলায় দড়ি দেওয়ার আর কী কারণ থাকতে পারে—এ ধাঁধাটা তোমার। তোমার ধাঁধাটার জবাব শুধু আমি দিয়ে যাব।

আমি জবাব দিয়ে না গেলে তুমি নিজে নিজে যে জবাবটা ঠিক করে নেবে, মরে গেলেও আমার তা সহ্য হবে না অনুপম।

বাবা মোটা মোটা বই পড়তেন, মোটা মোটা কথা বলতেন। বইয়ের কথা কলেজের ছেলেদের বলার জন্য পারিশ্রমিকও পেতেন মোটা। মেজাজটাও বাবার ছিল তাই গরম। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা লাগিয়ে বাবা যখন হাইস্পিডে সমাজ, ধর্ম, সভ্যতা, জীবন, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসের তত্ত্বকথা আমার ভবিষ্যৎ স্বামীকে শোনাতে শোনাতে রেগে আগুন হয়ে উঠতেন, আর আমার ভবিষ্যৎ স্বামী ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, জীবন, সভ্যতা, ধর্ম, সমাজের তত্ত্বকথা বাবাকে শোনাতে শোনাতে খেপে যেতেন, তখন দুজনকে দেখেই আমি হয়ে যেতাম মুগ্ধ। বাবার জন্য অনুভব করতাম গভীর শ্রদ্ধা, ভবিষ্যৎ স্বামীর জন্য অনুভব করতাম গভীর প্রেম। না, প্রেম বলতে তুমি যা বোঝ, সে প্রেম নয়। আমার বাবা অথবা আমার ভবিষ্যৎ স্বামী দুজনের একজনও, প্রেম বলতে তুমি যা বোঝ, সে প্রেমে বিশ্বাস করতেন না। প্রেম সম্বন্ধে বাবার মত ছিল, সাতজন জার্মান প্রেম-বিশেষজ্ঞের মতো বাতিল করা নূতন একটা মত, আর স্বামীর মত ছিল ওই সাতজন জার্মান ভদ্রলোকের মতকে স্বদেশি ছাঁচে ঢেলে নিলে যা দাঁড়ায়, তাই। অর্থাৎ অনুবাদ নয়, মর্মানুবাদ। এই জন্য ভবিষ্যৎ স্বামীর মতটাই আমার বেশি ভালো লাগত।

কেবল প্রেম নয়, সব বিষয়েই আমার ভবিষ্যৎ স্বামীর এ রকম মর্মানুবাদের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। আসলে, এই জন্যই সে মহাত্মাকে আমি আমার স্বামী হবার অধিকার দিয়েছিলাম।

নতুবা তরঙ্গ হেন মেয়ে, জগতে আর জোড়া নেই, পৃথিবীর আর সব মেয়ে বক হলে যাকে কেবল হংসী নয়, রাজহংসী বলা ছাড়া উপায় থাকে না, সেই তরঙ্গের স্বামী কি যে কেউ হতে পারে, ও রকম মহাপুরুষ ছাড়া ?

হে সিগারেটপায়ী অভিমানী বালক অনুপম, কোথায় লাগো তুমি আমার সেই স্বামীর কাছে ! তার তুলনায় তুমি কীটাণুকীট। তুমি হলে খবরের কাগজে নিউজ ট্রানস্লেটরের ইংরেজি খবরের ট্রানস্লেশন, আমার তিনি ছিলেন গল্পে কবিতায় সাহিত্যিকের ইংরেজি সাহিত্যের মর্মানুবাদ। রূপকটা বুঝতে পারলে ? আর একটু পরিষ্কার করেই বুঝিয়ে দিচ্ছি। তখন আমি খাঁটি ভারতীয় প্রথায় খাঁটি বিলাতি ফিল্মের স্টারদের মতো হাসতে পারতাম বলে তিনি আমার প্রেমে পড়েছিলেন, আর তুমি আমার প্রেমে পড়লে আমি যখন খাঁটি বিলাতি প্রথায় দেশি ফিল্মের স্টারদের মতো হাসতে শিখেছি।

বাড়িয়ে বলিনি। ভবিষ্যৎ স্বামীর জন্মদিনে ভবিষ্যৎ স্বামী আমায় বললেন, জন্মদিনে একটা প্রেজেন্ট চাই তরঙ্গ।

আমি বললাম, কী চাই ? মোটে তো বেজেছে নটা, আমি নিজে গিয়ে কিনে নিয়ে আসব।

তিনি বললেন, ও সব প্রেজেন্ট নয়। আমার সঙ্গে একা সিনেমায় যেতে হবে।

আমি বললাম, চলুন।

তিনি বললেন, তোমার বাবাকে বলো।

আমি মুচকে হেসে বললাম, বাবাকে আবার কী বলব ? আমার তেমন বাবা নন যে, খারাপ লোকের সঙ্গে সাড়ে নটার শোতে সিনেমায় গিয়ে নিজের ভালোত্ব বজায় রাখতে পারব না ভেবে ছটফট করবেন। জানেন, আমি বাবার হাতের মানুষ করা তরঙ্গ ?

সিনেমা দেখিয়ে মাঠে নিয়ে গিয়ে তিনি প্রোপোজ করলেন। বললেন, আমার হাসি অমুকের মতো, কাশি অমুকের মতো, চোখ অমুকের মতো, মুখ অমুকের মতো, কথা অমুকের মতো, চলন অমুকের মতো। অমুকরা সবাই ফিল্‌মস্টার নয় বলে নাম করলাম না।

তারপর তুমি কবে আমার কাছে প্রথম বিহ্বল হয়েছিলে মনে আছে ? আমাকে দেশি ফিল্‌ম দেখিয়ে যেদিন বাড়ি ফিরতে চাওনি, শহরতলিতে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলে। তুমিও সেদিন গদগদ হয়ে বলেছিলে, আমি নাকি অনেকটা অমুকের মতো।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার অমুকটির ফি কত করে ?

তাতে কী গভীর আঘাতই তোমার লেগেছিল।

একবার গঙ্গার ঘাটে ছোটো একটা ছেলে জলে ডুবে মরবার আবদার ধরায় তার মাকে তার গালে চড় মারতে দেখেছিলাম। ছেলেটা যেভাবে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে উঠবার উপক্রম করেও কাঁদেনি, ভাবপ্রবণতায় ডুবে মরতে গিয়ে আমার কথার মার খেয়ে তুমিও সেদিন তেমনই মুখভঙ্গি করেছিলে।

আজ আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমি গলায় দড়ি দিয়েছি শুনে তুমি নিশ্চয়ই সেই রকম মুখভঙ্গি করবে।

যদি একবার দেখতে পেতাম !—

মনে কোরো না যে, দেখতে পেলেও কৌতূহল নিবৃত্তি ছাড়া আমার আর কোনো লাভ হত। রোমান্টিসিজমের মিথ্যা মানস সরোবরে ডুবতে না দিলেই যে তোমার মহা উপকার সাধন করা হবে, সে ভুল ধারণা আমার ভেঙে গেছে। ও রকম ডুবে মরবার সঙ্গে রিয়ালিজমের কঠিন পাথরে মাথা ঠুকে ঠুকে মরার তফাত আছে, কিন্তু দুটোই অপমৃত্যু। আমার গলায দড়ি দিয়ে মরা আর দুদিন পরে তোমার টিবি হয়ে রক্তবমি করতে করতে মরার মধ্যে কত তফাত—অথচ দুটোই কী শোচনীয় অপমৃত্যু ! আমি গলায় দড়ি দিয়েছি শুনে তুমি প্রচণ্ড একটা আঘাত পাবে, সে আঘাতে অসার অর্থহীন অবাস্তব কল্পনার জগৎ থেকে তুমি অন্তত কিছুদিনের জন্য মাটির পৃথিবীতে নেমে আসবে—আগে এ কল্পনায় আমার আনন্দ জাগত, চড়-খাওযা ছেলের মতো তোমার মুখভঙ্গি দেখে আমার লাভ হত এই যে, মনে ভাবতাম এ জগতে অন্তত একজনের একটু কাজে লেগেছি, আর দশজনের মতো আগাগোড়া ব্যর্থ জীবন আমার নয় !

কিন্তু আজ আমি বুঝতে পারছি, ও ভাবে তোমাকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনার কোনো দাম নেই, আনবার অধিকার আমার নেই। তোমাকে বাঁচবার পথ আমি দেখাতে পারব না। আমি নিজেই সে পথ জানি না। আমি নিজে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছি, তোমাকে আমি কী করে বলব ওই কাব্যের ঝংকারময় ফুল-বিছানো পথ ধরে যেয়ো না, এই কার্যের কোলাহলময় বন্ধুর পথ ধরে এসো, এই পথে জীবনের সার্থকতা ? কোনটা কাব্যের ঝংকার, কোনটা কার্যের কোলাহল, কোনটা ফুল, কোনটা পাথর, কোনটা বিপথ, কোনটা জীবনের সার্থকতা, কোনটা ব্যর্থতা, এ সব

আমার কাছে গোলমাল হয়ে গেছে—মানুষ কী, মানুষ মানুষ কেন, জীবনে মানুষ কী চায়, আর কেন চায়, কী পায়, আর কেন পায়, কী চাওয়া উচিত, আর কেন চাওয়া উচিত, এ সব এমন উদ্ভট সমস্যায় পরিণত হয়ে গেছে যে, আমি বুঝতেও পারছি না, এগুলি সত্যই সমস্যা না আমার মাথার মধ্যে এমন কোনো পাগলামি বাসা বেঁধেছে, যার জন্য সহজ সোজা কথাগুলিকে বিকৃত করে দেখছি ! অথচ কিছুদিন আগেও আমি ভাবতাম জীবনের অনেকগুলি ধাঁধার জবাব আবিষ্কার করেছি, আর কিছুদিন চেষ্টা করলে বাকিগুলিও আবিষ্কার করে ফেলতে পারব। কিছুদিন আগে আমার মনে যখন আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রথম সন্দেহ জাগে, তখনও কী রকম অদ্ভুত কথা সব ভাবতাম শোনো। ভাবতাম, জীবনকে ধাঁধা না জেনে ধাঁধাগুলি সত্যই জীবনের, না পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ধাঁধা সে হিসাব না করে, ধাঁধার জবাব আবিষ্কাব করার মতো এই বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়েই কি আমি জন্মেছি ? আমার রক্তের মধ্যেই কি এই অসাধারণ ক্ষমতা মিশে ছিল ? অথবা আমি জন্মে থেকে যে শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে মানুষ হয়েছি, তাই আমাকে এমন অসম্ভব রকমের ক্ষণজন্মা নারীতে পবিণত করেছে ?

আজ কিন্তু নিজেকে হাজারবার প্রশ্ন কবে একটা অতি সহজ ধাঁধারও জবাব পাই না অনুপম। কিছুকাল ধরে একটা জিজ্ঞাসা আমার মনকে লাঙলের মতো চষে বেড়াচ্ছে। অথচ কারও কাছে এ জিজ্ঞাসার জবাব পাবাব ভরসা আমার নেই। আমি কী ভাবছি জান ? ভাবছি, যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে যে বকম শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে আমি বড়ো হয়েছি, সে সব তো সৃষ্টিছাড়া নয়, অনেকেই তো ও রকম অবস্থায় ও বকমভাবে মানুষ হয়, তবে কেবল আমার বেলাতেই এ রকম অঘটন ঘটল কেন ? আমি কেন এমন সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলাম আমার যা আয়ত্তের বাইরে, বুদ্ধির অগম্য, সাধ্যের অতীত ? কেন আজ আমার মানসিক অবস্থার এমন বিপর্যয় ঘটল যে, পৃথিবীতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে নিজেকে আমার মেরে ফেলতে হচ্ছে ?

অনুপম, তোমাকে এই কথাগুলি লিখতে লিখতে আমার বুকের মধ্যে টিপটিপ করছে। সত্যই কি আমি এ রকম হয়ে গেছি ? খানিক আগে নিজেকে আমি যে খাপছাড়া বলেছি, সত্যই কি আমি তাই ?

যে সব কারণ আমাকে এ বকম কবেছে, হয়তো আরও অনেককে সেই সব কাবণেই আমার মতো করে তুলেছে ? তাদের সঙ্গে আমাব পার্থক্য হয়তো কেবল তুচ্ছ খুঁটিনাটিব—সমস্ত মানুষের মূর্তি একরকম হলেও প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের সর্বাঙ্গীণ পার্থক্য থাকে, সেইবকম একটা স্বাতন্ত্র্য ? অনুপম, কে জানে হযতো আমাব গলায় দড়ি দেবার আসল কারণ যা, আজ পর্যন্ত আরও অনেকের গলায় দড়ি দেবার কাবণও তাই ছিল ? হয়তো যে শক্তি আমাকে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি দিয়েছে, সেই শক্তি তাদেরও আত্মহত্যাব প্রেরণা জুগিয়েছিল—আমরাই কেবল ধরতে পারছি না, সেই শক্তিটার স্বরূপ কী এবং কীভাবে, কখন, কোথায় কীসের ছদ্মবেশে সে কাজ করে ?

আমি তোমাদের বাড়িতে থাকবার সময় পাড়ার ভূদেববাবুদের বাড়িতে একটা ছেলে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মরেছিল। তুমি আমায় এসে বলেছিলে, ছেলেটার কুৎসিত রোগ হয়েছিল বলে সুইসাইড করেছে তরঙ্গ। ভালোই করেছে। ও রকম ছেলের মরাই ভালো।

আমি মুচকে হেসে বলেছিলাম, হয়তো তা নয় অনুদা, হয়তো ক-বছর ধরে পবের অন্নজল পেটে দিয়ে দিয়ে আর ভালো না লাগায় মুখ বদলাতে স্বর্গে গেছে। কুৎসিত রোগ আবার কীসের ? দেখতে, উপার্জনের উপায় থাকলে কুৎসিত রোগ নিয়েই বিয়ে-থা করে ছোঁড়া দিবি সংসার করত।

আরও কী যেন সব তোমায় বলেছিলাম। অনুপম, হয়তো সেই ছেলেটা যে জন্য আত্মহত্যা করেছিল, আমিও সেই জন্যই আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি ? আমার কুৎসিত রোগ নেই, পরের অন্নজল আমায় পেটে দিতে হয় না, কিন্তু আমি ভাবছি কী জান, সংসারে আমি তো একা নই, দশজনের

মধ্যে আমার বাস, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব আর দশজনের মধ্যে যেভাবে কাজ করে, আমার মধ্যেও তেমনইভাবে কাজ করে। এ হিসাবে ধরলে জগতের সমস্ত মানুষের ভাগ্য পরস্পরের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত ; জগতের কোথাও একটিমাত্র মানুষ যদি না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করে সেটাকে আমরা বিভিন্ন স্বতন্ত্র ঘটনা বলে গ্রহণ করতে পারি না, তার আত্মহত্যার কারণ সমগ্র জগতে নানারকম রূপ নিয়ে ছড়িয়ে থাকবেই থাকবে। তাই যদি হয় অনুপম, তা হলে হয়তো ভূদেববাবুর বাড়ির ওই বেকার ছেলেটার জীবনে তার জন্ম থেকে,—হয়তো তার জন্মের অনেক যুগ আগে থেকেই যে সব কার্যকারণের সমাবেশ শেষ পর্যন্ত তার আত্মহত্যায় পরিণতি লাভ করেছিল—আমার জীবনেও সেই কার্যকারণগুলির সমাবেশ আমাকেও আত্মঘাতিনী করাতে চলেছে ? কিন্তু কোথায় এই যোগসূত্র ? সেই ছেলেটার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সমস্ত পৃথিবীর নবনারী পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বৃক্ষলতা জলবায়ু মাটি—এমনকী, হয়তো সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও—মধ্যস্থতায় প্রকৃতির নিয়মে স্থাপিত হয়ে আছে, কী তার স্বরূপ ? আমি তো তা জানি না অনুপম ! তোমাকে এই কথা কটা লিখতে গিয়েই আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। আমার সে বুদ্ধি কই যা দিয়ে আমি এই যোগসূত্রের মূলতত্ত্ব জানব ? জানি না বলেই মনটা আমার খুঁতখুঁত করছে যে, হয়তো যা ভেবে আমি গলায় দড়ি দিতে চলেছি, তাও ভুল—কী যে ভুল নয়, আমার তা বুঝবারও ক্ষমতা নেই। আছে ?

তবে কী জান অনুপম, বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব, এইটুকু সান্ত্বনা আমার আছে। যে সব কারণে গলায় দড়ি দেওয়া আমি উচিত মনে করেছি, তার সবগুলি ভুল হলেও এ কথাটা সত্য যে, তোমাদের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে বেঁচে থাকার মতো শিক্ষা আমাকে কেউ দেয়নি, আমাকে মরতেই হবে।

এতদিন সংস্কারের ও সংশোধনের কল্পনা নিয়ে চারিদিকে তাকাতাম, তাই যা দেখতাম তা সহ্য হত, সাময়িক বলে অনেক কিছু স্বীকার করে নিতাম, ভাবতাম আমি যেটুকু দেখছি, সংসারে তার চেয়ে খুব বেশি শ্রী ও সামঞ্জস্যের অভাব থাকা সম্ভব নয়, মানুষ আসলে মানুষই আছে, বাঁচবার নিয়মও মানুষ মোটামুটি জানে, কেবল নিজের বোকামির দোষে মানুষ কিছু মনুষ্যত্ব হারিয়ে পেয়েছে কিছু পাশবিকতা, আর বাঁচবার কয়েকটা নিয়ম পালন করতে ভুল করে জীবনে এনেছে কিছু গন্ডগোল।

ও মা, শেষে দেখলাম ভুলটা আমারই !

সকলের জীবনেই আজ অন্যায় বেশি, অভাব বেশি, অপরাধ বেশি, অনাচার বেশি, বিশৃঙ্খলা বেশি। মানুষ যদি সজ্ঞানে জীবনে এ সব সঞ্চয় করত, তারও একটা মানে বোঝা যেত, না জেনে না বুঝে মানুষ নিজের জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, মহা আড়ম্বরের সঙ্গে করছে নিজের সর্বনাশ। অন্ধ পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে অন্ধকে। যারা এ রকম করছে তারাই আবার দশজনকে উপদেশ দিচ্ছে, এই করো, ওই করো, তাই করো। কী অবস্থায় আজ আমরা এসে পড়েছি জান অনুপম ? জীবনকে যে সুন্দর করতে চায়, নিখুঁত করতে চায়, পরিপূর্ণ করতে চায়, তার সমস্ত চেষ্টা পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে—জীবনে সার্থকতা লাভের পথটিও খুঁজে পাচ্ছে না, তার নিজের ভিতরের আর বাইরের অসংখ্য বিরুদ্ধ-শক্তি ঘাড় ধরে তাকে বিপথে ঠেলে নিয়ে গেলে বাধাও সে দিতে পারছে না।

যেমন আমি।

কী শিক্ষাই আমার বাবা আর আমার স্বামী আমাকে দিলেন। জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠল আলেয়ার মতো, না লাগল সে আলো জগতের কারও কাজে, না লাগল আমার নিজের কোনো উপকারে। বিপথে বিপথে ঘুরিয়ে, শেষ পর্যন্ত আমাকেই টেনে নিয়ে চলল অপমৃত্যুর দিকে।

তরঙ্গের চিঠিখানা অসমাপ্ত।

বেশ বোঝা যায়, তরঙ্গ আরও অনেক কথা লিখিয়াছিল, কিন্তু কে যেন চিঠির বাকি অংশ ছিঁড়িয়া লইয়াছে। খামটি খোলা ছিল, কী বন্ধ ছিল, প্রথমে অনুপম লক্ষ করে নাই। এবার খামখানা একটু ভালো করিয়া দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল, কে যেন অপটু হাতে জল দিয়া ভিজাইয়া খামটি খুলিয়াছিল, তারপর একান্ত অবহেলার সঙ্গে আবার বন্ধ করিয়াছে।

সীতা স্বীকার করিলেন, হ্যাঁ, আমি খুলেছিলাম চিঠিটা। কিছু মনে করছ না তো ? কদিনে যা ভালোবেসেছিলাম মেয়েটাকে অনু, না খুলে থাকতে পারলাম না।

অনুপম বলিল, চিঠির শেষটা কোথায় গেল ?

সীতা নির্বিবাদে বলিলেন, আমি ছিঁড়ে নিয়েছি।

কেন ?

মরবার সময় ঝোঁকের মাথায় একটা মেয়ে যা-তা লিখে রেখে গেছে, সকলকে কী তাই পড়তে দেওয়া যায় ? তুমিই বল, যায় ?

কিন্তু লিখে তো গিয়েছিল আমাকে ? আমার চিঠি আপনি খুলে পড়লেন, আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করলেন না ! তারপর আবার চিঠির অর্ধেকটা রেখে দিলেন ছিঁড়ে ! নিয়ে আসুন, কোথায় রেখেছেন।

সীতা নির্বিবাদে বলিলেন, সে কি আর আছে ? সে আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।

তরঙ্গের মৃত্যুর আঘাতটাই খিলের মতো এতক্ষণ অনুপমের মনের রাগটাকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল, এবার সে যেন রাগে দিশেহারা হইয়া গেল। ক্রোধের বশে মানুষ খুন করিবার আগে খুনি যেভাবে তাকায়, তেমন দৃষ্টিতে সীতা পিসিমার দিকে চাহিয়া সে বলিল, পুড়িয়ে ফেলেছেন ? ইয়ার্কি পেয়েছেন না কি আপনি, অ্যাঁ ?

সীতা যে গুরুজন সে কথা ভুলিয়া একটা বিশ্রী গালও অনুপমের জিভের ডগায় আসিয়াছিল, কত কষ্টেই সে গালটা সে চাপিয়া রাখিল !

সীতা পিসিমার আজ ভাবান্তর আসিয়াছে। আজ যেন তিনি শান্ত, সহিষ্ণু, বুদ্ধিমতী মহিলা—কথায় ব্যবহারে কোনো রকম পাগলামি নাই, বরং তরঙ্গের চিঠির শেষাংশ ছিঁড়িয়া লওয়ার জন্য অনুপম যে রাগারাগি করার মতো ছেলেমানুষি পাগলামি আরম্ভ করিবে, অনেকদিন আগে হইতে, তরঙ্গের গলায় দড়ি দেওয়ারও আগে হইতে, তিনি যেন তাহা জানিতেন এবং অনুপমকে সামলাইবার ভারটাও তখন হইতেই তিনি যেন গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছেন। ধীর স্থির গম্ভীর গলায় বলিলেন, ছেলেমানুষি কোরো না, অনুপম। তরঙ্গ চিঠিখানা আমার জিম্মায় রেখে গিয়েছিল, ইচ্ছে করলে সমস্ত চিঠিটাই তো আমি তোমাকে না দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে পারতাম ? তাই ইচ্ছে ছিল আমার, নেহাত তরঙ্গের শেষ কথাটা একেবারে ঠেলতে পারলাম না বলে অর্ধেকটা তোমায় দিয়েছি। হ্যাঁ অনুপম, তরঙ্গ যে এ ভাবে আমাদের ছেড়ে গেল, তার চেয়ে তরঙ্গের চিঠির খানিকটা পড়তে পারলে না, এটাই কি তোমার কাছে বড়ো হল ?

অনুপম ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, এমনিভাবে ছেড়ে গেল বলেই তো চিঠির সবটা পড়বার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। কী লিখেছিল বাকিটাতে ?

সে তোমার জেনে কাজ নেই।

সীতাকে কোনোমতেই বলানো গেল না। পেটে কথা রাখা সীতার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু অনুপমকে চিঠির বাকি অংশে তরঙ্গ যে সব কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, সেই কথাগুলি তিনি বোধ হয় একেবারে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন, ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিতে পারিল না।

কেবল এইটুকু জানা গেল, তরঙ্গের বাকি কথাগুলি ভালো নয়। নিজেকে আর জগৎসুদ্ধ মানুষকে সে বড়ো খারাপভাবে গালাগালি দিয়াছে। নিজের সম্বন্ধেও এমন কতকগুলি কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে যে—

কী সেই কথাগুলি ?

আমি তা বলতে পারব না বাবু।

তরঙ্গের প্রকৃতি যে স্বাভাবিক ছিল না, সীতা দয়া করিয়া অনুপমকে তার চিঠির যেটুকু অংশ দিয়াছিলেন, সেটুকু পড়িলেই তা বেশ বোঝা যায়। আরও অনেকের মাথাও যেন তরঙ্গ কমবেশি খারাপ করিয়া দিয়া গেল। সকলের জীবনে এমন একটা সমস্যা, এমন একটা রহস্য, এমন একটা অভূতপূর্ব প্রভাব সে বিস্তার করিয়াছিল যে, সকলের মনের তলে তলে তার নাটকীয় আত্মলোপের আঘাতটা যেন—তার কথা ভুলিয়া থাকিবার সময়ও—চোরের মতো সিঁদ কাটিয়া বেড়াইতে লাগিল, সুখশান্তি যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে কারও মনে, অপহরণ করিবে।

অন্য কারও মনে সুখশান্তি থাক বা নাই থাক, অনুপমের মনে অশান্তি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। কী লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল তরঙ্গ ? যে ধাঁধা তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে, তার কি মীমাংসা সে নিজেই করিয়া দিয়া গিয়াছিল, সীতা পিসিমা যাহা আগুনে সঁপিয়া দিয়াছেন ? ক্রমে ক্রমে সীতা পিসিমার কথাই যেন সত্য হইয়া দাঁড়ায়, তরঙ্গ যে এ ভাবে তাহাদের ছাড়িয়া গিয়াছে, তার চেয়ে তরঙ্গের শেষ চিঠির শেষটা যে সে পড়িতে পারিল না, এটাই অনুপমের কাছে বড়ো হইয়া উঠে। সীতা পিসিমার কাছে সে মিনতি করে, রাগারাগি করে, ভয় দেখায়, আবোল-তাবোল বকে—কিন্তু দেখা যায়, সীতা এ বিষয়ে বড়ো শক্ত।

না আমি বলব না। কেন এ রকম করছ অনুপম ?

সবটা না হয়, আভাসে একটু বলুন ?

তাও বলব না।

শঙ্কর কয়েকদিন ঝিমাইল। তরঙ্গ অনুপমকে চিঠি লিখিয়া গিয়াছে দেখিয়া হঠাৎ শঙ্করের মনে প্রবল আঘাত লাগিয়াছে, তরঙ্গকে কিছুদিন হইতে তার ভালো লাগিতেছিল না—তবু সে থাকিতে অনুপমকে চিঠি কেন ? তবে কী অনুপমের জন্যই তরঙ্গ তাকে অপমান করিয়াছিল ? সে থাকিতে অনুপমকে যখন চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তখন আর কী অর্থ হয় তরঙ্গের ব্যবহারের ?

মনটা যখন শঙ্করের এই সব কথা ভাবিয়া অত্যন্ত খারাপ, একদিন লীলাময় ব্যস্তসমস্তভাবে আসিয়া বলিলেন, টাকা আছে শঙ্কর ? মিসেস সেন কিছু টাকা চাচ্ছেন।

মিসেস সেন কোথায় ?

সেইখানে। তোমাকেও যেতে বললেন।

কত টাকা চাচ্ছেন ?

এমনভাবে শঙ্কর কথাটা জিজ্ঞাসা করিল, যেন টাকার ভান্ডার তাহার অফুরন্ত, যত চাও ততই পাইবে।

লীলাময় একগাল হাসিয়া বলিলেন, কিছু বেশি করে নিয়ে যেতে বললেন, বললেন, বড্ড দরকার, সাত দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেবেন।

সেই হোটেলের সেই ঘরে সেই আবহাওয়া সেই রকম আনন্দোচ্ছল মিসেস সেন বন্ধুবান্ধবকে আমোদ জোগাইতেছিলেন। লীলাময়ের চোখের ইশারায় একটু আড়ালে আসিলেন।

শঙ্কর স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, কত টাকা চাই ?

মিসেস সেন মধুর হাসিয়া বলিলেন, দরকার তো ছিল অনেক টাকার, তুমি কত দিতে পার তাই বলো না !

একশো।

মোটে ? আচ্ছা তাই দাও।

শঙ্কর বলিল, আজ তো সঙ্গে নেই। কাল দেব।

কাল কখন ?

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটা মিটিং আছে না কাল—আপনিও তো লেকচার দেবেন দেখলাম খবরের কাগজে—দেবেন না ?

মিসেস সেন মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইলেন।

শঙ্কর বলিল, আমিও একটা লেকচার দেব ভাবছি। লেকচার দিয়ে আপনাকে টাকাটা দেব।

শুনিয়া মিসেস সেন গম্ভীরমুখে লীলাময়ের দিকে চাহিলেন। লীলাময় অস্বস্তির সঙ্গে বলিলেন, কী বলবে না বলবে আগে থেকে ঠিক না করে এ রকম হঠাৎ লেকচার দেওয়া—

শঙ্কর শান্তভাবেই বলিল, পাগলামি করব না, ভয় নেই। যা বলা চলে তাই বলব, আপনাদের লেকচারের দাম কমবে না। ও সব ছেলেমানুষি আমার কেটে গেছে।

লীলাময় তবু বিপন্নভাবে বলিলেন, কালকের মিটিংটা থাক না ? এর পরের মিটিংটাতে তোমায় যদি বলতে না দিই, তা হলে কী বলছি। সেই ভালো হবে কেমন ? আগে থেকে খবরের কাগজে তোমার নাম বার করে দেব, যা বলবে পরদিন কাগজে সভার রিপোর্টে তারও খানিকটা—

শঙ্কর বলিল, কেবল কথায় কি চিরকাল চিঁড়ে ভেজে লীলাময়বাবু ! দিন না, এখুনি ফোন করে দিন না কাগজের আপিসে, আমার নামটা আপনাদের নামের সঙ্গে বক্তার লিস্টে ছাপিয়ে দিতে। পরশু যদি মিটিংয়ের রিপোর্টে আমার নামটাও যায়, আর কিছু টাকা না হয় বেশিই দেব।

মিসেস সেন আর লীলাময়ের চোখে চোখে কথা হইয়া গেল। মিসেস সেন শঙ্করের বাহুমূল ধরিয়া আদরের আর আবদারের সুরে বলিলেন, কেন এ রকম করছ শঙ্কর ? কালকের মিটিংটা থাক না ? এমন কত মিটিং হবে। আমি নিজে—

কিন্তু শঙ্কর একটু পাথর বনিয়া গিয়াছে, তাকে কোনো রকমেই দমানো গেল না। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। কেবল খবরের কাগজের আপিসে ফোন করলেই চলে না, দলের আরও যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গেও একটু কথাবার্তা হওয়া দরকার—কাল যদি তাঁহারা দলের বাহিরের এক ছোকরাকে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া ছেলেখেলা করিতে দিতে আপত্তি করেন, যদি লীলাময়ের উপর সকলে চটিয়া যান ?

চিন্তিত মুখে লীলাময় বলিলেন, বড়ো হাঙ্গামায় ফেললে। অনেকগুলো ফোন করতে হবে। এখানে তো মাগনা ফোন নেই।

শঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিল, চলুন না ফোন করবেন, ফোনের পয়সা আমি দেব।

মিসেস সেনও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আর আজকের ফুর্তির পয়সা ?

শঙ্কর বলিল, তাও দেব।

পাকিয়া যেন একেবারে ঝানু হইয়া গিয়াছে শঙ্কর। নাম করার, বড়ো হওয়ার, প্রসিদ্ধিলাভের সমস্ত কলাকৌশল যেন তার নখদর্পণে। সে জানে, আরও অনেক কিছুই লীলাময়, মিসেস সেন আর তার সাঙ্গোপাঙ্গের পাবলিক লাইফের পিছনে আছে—আরও কদর্য, আরও কুৎসিত, আরও জটিল।

কিন্তু এ কথাও সে জানে যে, যতটুকু জ্ঞান সে অর্জন করিতে পারিয়াছে, সেটুকু ঠিকমতো প্রয়োগ করিতে পারিলে, ক্রমে ক্রমে আরও যত কিছু জানিবার আছে, সবই সে জানিতে পারিবে এবং জানিতে পারিয়া প্রয়োগ করিতে পারিবে নিজের প্রগতির উদ্দেশ্য।

প্রগতি ? ভাবপ্রবণ মন শঙ্করের, মিসেস সেনের ঈষৎ বিস্মিত দুষ্টামিভরা চাহনি ও হাসি সাঙ্গোপাঙ্গের বীভৎস রসিকতা এবং অতৃপ্ত ক্ষুধিত অন্তরকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য তিলে তিলে আত্মহত্যা—সব একটা বিপরীত ভাব জাগাইয়া তোলে শঙ্করের মনে—গায়ের জোরে যে মনের ক্রিয়াকে এখানে সে ঘটাইয়া চলিয়াছে, অতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়াও মন জুড়িয়া দাপাদাপি করিতেছে। এই কি প্রগতি ? একদিন না হয় সে নিজেকে করিয়া তুলিবে খ্যাতনামা, লোকে না হয় কয়েক মিনিট মনে রাখিবার জন্য সাগ্রহে তার কথা শুনিবে, কিন্তু কী হইবে সেই সাফল্যে ? দামি পোশাক গায়ে দিবার জন্য সর্বাগ্রে কুৎসিত ব্যাধিই যদি তাকে সঞ্চয় করিতে হয়, কী করিবে সে দামি পোশাক দিয়া ?

গভীর রাত্রে গভীর বেদনায় শঙ্করের ঘুম আসে না। এখন শুধু প্রতিক্রিয়া চলিতেছে কি না, বিষাদটা তাই বড়ো কটু। জীবনের রাজপথ খুঁজিয়া না পাইয়াও গলিঘুঁজি দিয়াই তো এতকাল সে খুশি মনে আগাইয়া আসিয়াছে, আজ শ্যাওলা-পিছিল নর্দমা দিয়া হাঁটিবার শখ মিটাইতে গিয়া একটি মাত্র আছাড় খাইয়াই যেন সর্বাঙ্গে টনটনে বেদনা ধরিয়া গেল।

শঙ্করের মা তরঙ্গের ব্যাপারটা লইয়া খেপিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া দিলেন। একেই একটু স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত মানুষ, সর্বদা অস্বাভাবিকতার মধ্যে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাটা চাপিয়া চলিতে চলিতেই তাহার প্রাণান্ত হয়, তার উপর এত বড়ো একটা সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। বিনা অসুখে কয়েক দিনের মধ্যে তিনি শীর্ণ হইয়া গেলেন, তারপর হঠাৎ আরম্ভ করিয়া দিলেন—রাগারাগি, চেঁচামেচি, গালাগালি আর মাথা কপাল কোটা। এটা শঙ্করের মার পক্ষে অভিনব। ভীরু, ভোঁতা, জীবনীশক্তির অভাবগ্রস্তা অকালবৃদ্ধা মানুষ তিনি, তাঁর পক্ষে এ রকম প্রচণ্ড উগ্রতা বেমানান এবং ভীতিকর।

ডাক্তার ওষুধ দিলেন। কিন্তু ওষুধে কী হইবে ? ওষুধের নেশায় শঙ্করের মা কেবল মড়ার মতো বিছানায় শুইয়া রাত্রিটা কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। ওষুধটা অবশ্য ঘুমের, শঙ্করের মার মড়ার মতো পড়িয়া থাকাটাও অবশ্য সকলে ঘুম বলিয়া ধরিয়া লইলেন, কিন্তু প্রকৃতি দেবী যার নিদ্রা কাড়িয়া লইয়াছেন, কার ক্ষমতা আছে তাকে প্রকৃত নিদ্রা দান করিবে ?

ডাক্তার বলিলেন, চেঞ্জে পাঠাতে পারলে মন্দ হত না। এ সব রোগীর পক্ষে শহরের গোলমাল বড়ো খারাপ—বেশ একটু শান্ত নির্জন অ্যাটমসফিয়ারে—

চেঞ্জের ব্যবস্থা হইল। নামকরা একটা স্বাস্থ্যকর স্থানে—যেখানে এত লোক এত রকমের ব্যারাম লইয়া চেঞ্জে যায় যে, স্থানটি হইয়া থাকে রোগের আড়ত আর রুগ্ণ নরনারীর ভিড়ে শহরের মতোই জনপূর্ণ।

শঙ্করের মা বলিলেন, আমি দেশে যাব। দেশের জন্য আমার মন কেমন করছে।

বলিয়া বীরেশ্বরের পা ধরিয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বীরেশ্বর বলিলেন, কেঁদো না মা, কেঁদো না, দেশে যাবার জন্য কাঁদবার কী হয়েছে ? কালকেই আমরা দেশে রওনা হব।

ডাক্তার এ প্রস্তাবে সায় দিলেন। বীরেশ্বর নিজে, শঙ্করের মা, সীতা আর শঙ্করকে সঙ্গে করিয়া গেলেন দেশে।

দিন তিনেকের জন্য শঙ্কর অসুস্থা জননীর সঙ্গে দেশে গেল। একটা সভায় তার বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, কিন্তু আর কী করা যায়, মার জন্য এটুকু ত্যাগ স্বীকার না করিলে চলে না।

ছেলেকে ছাড়িয়া দেশে যাইতে শঙ্করের মা কিছুতেই রাজি হইলেন না, কাঁদিয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া ভয়ানক ব্যাপার আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এবং ছেলের সঙ্গে দেশে যাওয়া মাত্র হইয়া গেলেন জড় পদার্থের মতো শান্ত ও নির্জীব। দেশের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেককাল আগে একবার যে সলজ্জ নম্রতার সঙ্গে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন, এতকাল পরে আবার সেই বাড়িতে সেই আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া প্রথম বধূজীবনের সরমস্নিগ্ধ নম্রতাই যেন নির্জীবতায় রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার মধ্যে ফিরিয়া আসিল।

দেশ দেখিয়া শঙ্কর কিন্তু পাইল আঘাত।

গ্রাম শঙ্কর দেখিয়াছে। ছেলেবেলায় এই গ্রামেও কয়েকবার সে আসিয়াছিল, ঝাপসা মনেও যেন আছে। তা ছাড়া, শহরতলির গ্রামে কতবার সে বেড়াইতে গিয়াছে, ট্রেনে কোথাও যাওয়ার সময় দুদিকে কত অফুরন্ত গ্রাম তার নজরে পড়িয়াছে, গ্রাম সম্বন্ধে কত বই সে পড়িয়াছে !

এ কী গ্রাম ? পথ-ঘাট বাড়ি-ঘর বন-জঙ্গল ডোবা-পুকুর এ সব কিছুই মনেব মধ্যে গ্রামের যে ছবিটি আছে তার সঙ্গে মেলে না, এখানকার মানুষগুলি তার মনের মধ্যে গ্রামের যে মানুষগুলি বাস করে তাদের স্বজাতি নয়, গ্রাম্য জীবনের যে রোমান্টিক কল্পনা মনের মধ্যে এতকাল সযত্নে পোষণ করিয়াছে, এই গ্রামে গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে তার পার্থক্য যেন কবিতার বই আর খবরের কাগজের।

বরং শহরের সঙ্গে এক বিষয়ে এ গ্রামের মিল আছে। এখানেও মানুষ তরঙ্গের মতো আত্মহত্যা করে।

তরঙ্গের বয়সি একটি বউ, তবে তরঙ্গেব মতো রূপসিও নয়, স্বাস্থ্যবতীও নয়। বাড়ির সম্মুখে জঙ্গল, বাড়ির পিছনে গ্রামের অধিকাংশ মানুষের মতোই রুগ্ণ ধানের খেতে স্বাস্থ্যহীন ধানগাছ, ডাইনে আমবাগান, বাঁয়ে প্রতিবেশীর বাড়ির চার ভিটার চারখানা পড়োপড়ো ঘরের মধ্যে একখানা ঘর কবে পড়িয়া গিয়াছে আর তোলা হয় নাই। এই অপূর্ব প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেদের প্রকাণ্ড জীর্ণ গৃহের গোয়ালঘরটিতে বউটি তরঙ্গকে অনুকরণ করিয়াছে।

গোয়ালঘরে আজ যে অনেক কাল ধরিয়া গোরু বাস করে না, সেটা অনুমান করা শক্ত নয়। এ বাড়ির লোক দুধ খায় না। এমনকী, গোয়ালঘরের সম্মুখে বয়স্কা রমণীর কোলে পাঁচ-ছ মাসেব যে কাঠির মতো ক্ষীণ খোকাটি ক্ষীণস্বরে কাঁদিতেছে, সেও খায় না। কোথায় পাইবে ? গোয়ালঘরে দড়িতে তার যে কঙ্কালসার জননী ঝুলিতেছে, তার শুষ্ক, আলগা চামড়ার মতো স্তন দুটিতে দুধ থাকা সম্ভব নয়।

সাত

গ্রামে আসিয়া শহরের আসল রূপটা এতদিন যেন শঙ্কবের চোখে ধরা পড়িল—শহব একটা বিবাট আশ্রম, তাপসদের আড্ডাখানা। ধ্বংসের তপস্যা করিতে মানুষ শহরে যায়, ছোটোবড়ো অপমৃত্যুর লোভে মানুষ শহরে বাস করিতে ভালোবাসে। জীবন বিস্বাদ হইলে মানুষের আসে বৈরাগ্য, জীবন বিযাক্ত হইলে মানুষের আসে শহুরে জীবনের লোভ।

শহরে যারা যাইতে পারে না, গ্রামে যাদের বঞ্চিত বন্দী জীবনযাপন করিতে হয়, নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া তারা গ্রাম্য জীবনেও আনিবার চেষ্টা করে যতখানি পারে শহুরে ভাব। শহরবাসী সকলের মতো গ্রামবাসীরা সকলে জানিয়া শুনিয়া এটা করে না, মানুষের অত বিবেচনাশক্তি নাই, না শহুরে মানুষ, না গ্রামের। না জানিয়া বুঝিয়া মূর্খের মতো নিজেকে, নিজের ভবিষ্যৎ বংশধরকে

তিল তিল করিয়া বিনাশ করিয়া ভাবে জীবনযাপন করিতেছি—যথা নিয়মে, যুগধর্ম অনুসারে—সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক বিধানের জোড়াতালি দেওয়া ফাঁদে পড়িয়া থাকার প্রয়োজন মিটানোর গভীর নিরানন্দে।

গ্রামের মানুষ দেখিয়া, মাটি দেখিয়া, গাছপালা দেখিয়া, মাঠের ফসল দেখিয়া, গোরু-ছাগল, কুকুর-বিড়াল দেখিয়া, কেবল মানুষের জন্য শঙ্করের মনটা খারাপ হইয়া যায়, একটা অদ্ভুত যন্ত্রণাবোধের সঙ্গে তার মনে হয়, বাঁচিবার জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসিয়াছে, অথচ মানুষ যেন বাঁচিতে চায় না। শহর ও গ্রাম কোথাও মানুষের জীবনযুদ্ধের নিয়ম, সংকেত ও কৌশলগুলি জানিবার বা শিখিবার ইচ্ছা নাই, জীবনের আসল উদ্দেশ্যের কথা ভুলিয়া গিয়া সকলে নেহাত অনিচ্ছার সঙ্গে একটা উদ্ভট খাপছাড়া অভিনয় করিয়া চলিয়াছে।

বাঁচিবার উপায় ও পথ থাকিতে তাহা গ্রহণ না করার আর কী মানে হয় ?

কী সে উপায় ও পথ ? সে নিজেও তো তার সন্ধান জানে না !

নিজের চিন্তার এইখানে যেন একটা ফাঁদ পাতা আছে—বড়ো কবির জীবনদেবতার মতো কৌশলী মন-ধরা জীবন-ব্যাধের আশ্চর্য ফাঁদ ! নিজের মনটাকে শঙ্কর কত বড়ো মনে করে, কিন্তু চিন্তার এই ফাঁদে পড়িয়া মনটা তার কবিতে থাকে চড়ুই পাখির মতো কিচিরমিচির !

বীরেশ্বর গম্ভীর মুখে পরিহাসের সুরে ডাকেন, শঙ্করবাবু !

আজ্ঞে বলুন।

আজ্ঞে বলুন ! জীবনে তো তোমার মুখে কখনও বলুন শুনিনি দাদু।

শঙ্কর একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে, গাঁয়ে এসে শিখেছি।

আর কী শিখেছিস গাঁয়ে এসে ?

শিখেছি যে বেঁচে থাকতে হলে আধপেটা খেতে হয়, ঝগড়া মারামারি করতে হয়, খাবার পয়সা দিয়ে বিলাসিতা নেশা আর পাপ করতে হয়- –

বীরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, থাম শালা, থাম। তাই তো বলি তোকে স্বদেশি রোগে ধরেছে। তুই দেশের লোকের ভাবনা ভাবছিস ! আমি এদিকে ভাবছিলাম, যার জন্যে ভেবে ভেবে কাহিল হচ্ছিস, সে ছুঁড়িটা কে ! দেশসুদ্ধ লোকের জন্য দরদ দিয়ে তুই যে বুকটা ফাটিয়ে ফেলছিস, তা কি জানতাম। এই জন্য তুই লীলাময়ের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করেছিস।

দেশের কথা ভাবাটা অন্যায় নাকি ?

তোর পক্ষে অন্যায়।

কেন? দেশের কথা ভাববার অধিকার আমার নেই ?

বীরেশ্বর তৎক্ষণাৎ বলিলেন, না।

শঙ্কর তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

তোরা যত দেশের কথা ভাববি, তত দেশের সর্বনাশ হবে বলে, বিনা চিকিৎসায় যত রোগী মরে, হাতুড়ের চিকিৎসায় তার চেয়ে ঢের বেশি মরে বলে। ভাবতে জানিস তুই, ভাবতে শিখেছিস ? মন তোর সুস্থ, স্বাভাবিক ? আজ পর্যন্ত এমন একটা কাজ তুই করেছিস, যাতে প্রমাণ হতে পারে, একটা দিনের জন্যও তোর পক্ষে অতি সাধারণ, কিন্তু খাঁটি মানুষের বাচ্ছা হয়ে থাকা সম্ভব ? কবিতা লিখতে চাস লেখ, প্রেম করতে চাস কর, বিদ্বান হতে চাস হ, দেশের জন্য কেঁদে কেঁদে আর খ্যাপার মতো আবোল-তাবোল কাজ করতে চাস কর—কিন্তু খবরদার দেশের কথা ভাবিস না। তোদের মন হল জল, দেশের ভাবনা হল তেল—তোদের মনে ও ভাবনা মিশ খাবে না। আজ হোক, কাল হোক তোরা চুলোয় যাবিই, দেশের ভাবনা যারা ভাবতে পারবে তারা একদিন উদয় হবেই, হয়তো দু-একজন এরই মধ্যেই হয়েছে—দেশের ভাবনাটা ভাববার বরাত তাদের হাতেই ছেড়ে দে। দেশের

গায়ে বিষফোড়ার মতো উঠছিস, স্বদেশিয়ানা মলম দিয়ে নিজেকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করিস না, দোহাই তোর, পেকে উঠে ফেটে যা, দেশের একটু খারাপ পুঁজরক্ত বেরিয়ে যাক !

ধরিতে গেলে বীরেশ্বরের এটা বক্তৃতা বইকী। কথাগুলিতে জ্বালা আছে, উত্তেজনা আছে, তবু সুরটা যেন তামাশার, মুখখানা বীরেশ্বরের শান্ত অথচ গম্ভীর। জীবনে শঙ্কর তাঁকে কোনোদিন এ ভাবে এ ধরনের কথা বলিতে শোনে নাই। খানিকক্ষণ অভিভূতের মতো সে বীরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিজেকে কেমন মনে হইতে লাগিল ছেলেমানুষ, অনভিজ্ঞ অপবিত্র।

আমি একা তো বিষফোঁড়া নই ?

বীরেশ্বর যেন সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, তা হলে আর দেশের ভাবনা কী ছিল ভাই ? দুটো-একটা বিষফোঁড়ায় দেশের কী আসে যায় ?

শঙ্কর চুপচাপ খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, বিষফোঁড়ার তো চিকিৎসা দরকার ? উচিত তো চিকিৎসা করা ?

ফোঁড়াটা যাতে শরীরে বসে যায়, সেই চিকিৎসা ? তার চেয়ে চিকিৎসা না হওয়াই ভালো। জানিস শঙ্কর, পাপীকে দিয়ে পুণ্য কাজ করাতে নেই—তাতে পাপটাও জমে থাকে, পুণ্য কাজটাও নষ্ট হয়।

কিন্তু সবাই যদি পাপী হয়, আর পাপীকে যদি পাপ ছাড়া আর কিছু করতে দেওয়া না হয়, তা হলে তো মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার !

পাপীকে যদি পাপ ছাড়া আর কিছু করতে দেওয়া না হত, মানুষের ভবিষ্যতে তা হলে ডে-লাইট জ্বলে উঠত।—বীরেশ্বর হঠাৎ হাসিলেন, মৃদু ক্ষোভের হাসি। কথার মারপ্যাঁচের মজাটা তিনি জানেন, বাঁদরের মতো মানুষকে নাচানোর এমন কৌশল আর নাই, মানুষকে বাঁচানোর এমন উপায়ও আর নাই। কিন্তু কেবল কথার মারপ্যাঁচে নয়, জোর করিয়া কেহ কিছু বলিলেই এই তেজস্বী নাতিটি তাঁর বিচলিত হইয়া দ্বিধা সন্দেহে দোল খাইতে আরম্ভ করে, এমনই সে মহাপুরুষ ! অথচ নিজের সম্বন্ধে কত বড়ো ধারণাই সে আত্মপ্রতারণার রসে দিনের পর দিন বাড়াইয়া আসিয়াছে। আমিত্ববোধের বন্যায় কোথায় যে ভাসিয়া গিয়াছে তার আমিত্ব !

দোতলার বারান্দায় বসিয়া বীরেশ্বর শঙ্করের সঙ্গে কথা বলিতেছেন, নীচের তলায় যে ঘরে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেই ঘরের অঙ্গনে একটা খেঁকিকুকুর তাড়াতাড়ি কী যেন একটা অখাদ্য বস্তু গলাধঃকরণ করিতেছিল। কুকুরটার খাওয়া দেখিতে দেখিতে বীরেশ্বরের হাসির ক্ষোভটুকু মিলাইয়া গেল। শঙ্কর মুখ খুলিবার উপক্রম করিতেছিল, তাহাকে সে সুযোগ না দিয়া তিনি আবার বলিলেন, পাপের ক্ষয় হয় প্রায়শ্চিত্তে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী জানিস শঙ্কর ? পাপ। পাপ করার চেয়ে বড়ো শাস্তি পাপীর আর কিছু আছে ? এক যুগে হোক, একশো যুগে হোক, পাপ করে করে পাপীর পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। বিষফোঁড়া উঠে উঠে দেশের বিষও একদিন ক্ষয় হয়ে যায়।

শঙ্কর হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল, আপনি মহাপাপী দাদু।

কীসে জানলি ?

দেশের কথা নিয়ে কবিত্ব আর তামাশা করছেন।

সীতা পিসিমাও বলেন, তুই যেন কী রকম হয়ে যাচ্ছিস শঙ্কর।

নিজের কথাটাই আরও স্পষ্ট করিবার জন্য আবার বলেন, মুখখানা কী রকম শুকনো দেখাচ্ছে তোর।

একটা ঢোঁক গিলিয়াই চোখ নামাইয়া লজ্জার সঙ্গে বলেন, তোর সঙ্গে এ সব কথা বলা অবশ্য আমার উচিত নয়, তবু, না বলেই বা কী করি বল ? তরঙ্গের জন্য মন খারাপ করিস না শঙ্কর। যে কীর্তি করেছিল মেয়েটা, ও যে গেছে ভালোই হয়েছে। আমি জানি, আমার কথা শোন, তরঙ্গের জন্য মন খারাপ করিস না।

শঙ্কর একটু কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা মন খারাপ করব না। কিন্তু তরঙ্গ কী কীর্তি করেছিল শুনি ?

আমি তা বলতে পারব না বাপু।

সীতা পিসিমার ভারী একটা মজার খেলা জুটিয়াছে। নানা ছলে একে একে সকলকেই তিনি জানাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, তরঙ্গের সম্বন্ধে তিনি একটা ভয়ংকর কথা জানেন, কিন্তু কথাটা যে কী, তা তিনি বলতে পারবেন না বাপু। তরঙ্গের কথা ভাবিয়া মনটা হয়তো সীতা পিসিমার সত্যই খারাপ হইয়া যায়, চোখে জলও দেখা যায় মাঝে মাঝে, কিন্তু কী করিবেন, এত বড়ো একটা নাটকীয় ব্যাপারকে ঠিকমতো কাজে লাগাইতে না পারিলেই বা তাঁর চলিবে কেন ? এ কী অভাবনীয় সৌভাগ্য তাঁর যে, তরঙ্গের একটা গভীর রহস্যময় গোপন কথা এ জগতে কেবল তিনিই জানেন, আর কেহ জানে না! ভাবিলেও সীতা পিসিমার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে।

তরঙ্গকে কড়িকাঠে বাঁধা দড়িতে ঝুলিতে দেখিয়াও তাঁর সে রকম শিহরন জাগে নাই !

শঙ্করের সঙ্গেই নানা ছুতায় তরঙ্গের কথা আলোচনা করিবার জন্য সীতা পিসিমার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। শঙ্করের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথাটাও যেন তাঁর স্মরণ থাকে না। মরে তরঙ্গ বেঁচেছে শঙ্কর। ছুঁড়ি যদি বেঁচে থাকত— এই ধরনের আলাপ আরম্ভ করিয়া শঙ্করের মুখে বেদনার ছায়াপাত হইতে দেখিলে সীতা পিসিমাব মন গভীব তৃপ্তিতে ভবিয়া যায়। শঙ্করের জন্য অকস্মাৎ তাঁর হৃদয়ে মমতা করার এই উগ্র অনুভূতির স্বাদ তাঁকে পাইতে হয় বটে, কিন্তু কী করিবেন তিনি, জীবনের সাধারণ সহজ অনুভূতিতে সাধ যে তাঁর মেটে না, তৃপ্তি যে তিনি পান না।

শেষ পর্যন্ত সীতা পিসিমার হাত এড়াইবার জন্যই শঙ্কর পলাইয়া যায় কলিকাতায়।

একটা বড়ো সভায় শঙ্করের অবশ্য বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, মাব জন্য একটা বক্তৃতার সুযোগ সে নষ্ট করিয়াছে, এবার যথাসময়ে কলিকাতায় সে চলিয়া আসিতই। কিন্তু বক্তৃতার কয়েকটা দিন দেরি ছিল। সীতা পিসিমা যেভাবে তাকে মমতা করিয়া আনন্দ সংগ্রহ করিতেছিলেন, গ্রামের বঞ্চিত নরনারীকে তেমনিভাবে মমতা করিয়া সেও তেমন আনন্দই অনুভব কবিতেছিল। সীতা পিসিমা পিছনে না লাগিলে আরও কয়েকটা দিন গ্রামে সে থাকিত।

বক্তৃতা দিবার কায়দা সে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, সুরে সুর মিলাইয়া উঁচু-নিচু গলায় সে চমৎকার বলিতে পারে। অনেক হাততালিও পায় ! কয়েকবারের অভিজ্ঞতা হইতে সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, শ্রোতাদের বালক কল্পনা করিয়া ভয় আর লজ্জা ত্যাগ করিতে পারিলেই দেখা যায়, বলাটা অতি সহজ।

শঙ্কর চলিয়া যাওয়ার দুদিন পরেই হঠাৎ অনুপমের সঙ্গে সাধনা গ্রামে আসিয়া হাজির হইলেন। শঙ্করের মার মতো তাঁরও নাকি দেশে আসিবার জন্য মনটা কেমন করিতেছিল, সকলে দেশে আসিয়াছে শুনিয়া তাই দু-একটা দিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছেন।

কিন্তু সাধনার ভাব দেখিয়া মনে হইল, দেশের জন্য তাঁর মন কেমন করে নাই, কয়েকদিন বীরেশ্বরের কাছে আসিয়া থাকিবার জন্যই মন কেমন করিয়াছিল। কলিকাতার বাড়িতে শ্বশুরের কাছে থাকিবার তাঁর উপায় নাই, স্বর্গীয় স্বামীর নিষেধটা স্পষ্টভাবে অবহেলা করিতে সাধনার তেজস্বিতা আর আত্মমর্যাদাজ্ঞানে বাধে। তবে দেশের কথা আলাদা। দেশের বাড়ির কথা স্বামী কিছু বলিয়া যান নাই, কিছুদিন আগে পুরানো কলহ-বিবাদের কথা ভুলিয়া নিজের বাড়িতে গিয়া থাকিবার জন্য বীরেশ্বরের নিমন্ত্রণটা রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিবার সঙ্গেও দেশের এই বাড়িতে আসার কোনো সামঞ্জস্য নাই।

অনুকে নিয়ে বড়ো ভাবনায় পড়েছি বাবা।

অনুপমকে দেখিলেই বোঝা যায়, তার জন্য ভাবনায় পড়া তার মার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়।

বীরেশ্বর বলিলেন, আস্তে আস্তে হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে মা।

দিনরাত বসে বসে কী যেন ভাবে, আর নয়তো পথেঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। নাওয়া-খাওয়ার দিকে নজর নেই, রাতে ঘুমোয় কিনা সন্দেহ—কী রকম চেহারা হয়েছে দেখেছেন তো ?

বীরেশ্বর নীরবে সায় দিলেন !

চাপা আর্তনাদের সুরে সাধনা বলিলেন, পাগল-টাগল হয়ে যাবে না তো ?

পাগল বলেই তো এ রকম করছে।

সাধনার সবটুকু আত্মবিশ্বাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মানুষটা যেন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। সকাতর অনুনয়ের সুরে তিনি বলিতে লাগিলেন, আপনি কিছু করুন বাবা ওর জন্যে, আমি হার মেনেছি। আপনি ছাড়া কেউ ওকে সামলাতে পারবে না। এত অশান্তি আমার আর সহ্য হয় না বাবা, তরঙ্গের মতো আমিও শেষে গলায় দড়ি দিয়ে বসব।

অনুপম এই বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যে ঘরটিতে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেই ঘরেই। দোতলার এই বারান্দা হইতে অনেক দূর পর্যন্ত গ্রামের কাঁচা ঘরবাড়ি দেখা যায়, মাঝে মাঝে দুটি-একটি ছোটোবড়ো দালান। ঘরবাড়িগুলির অধিবাসীদের কারও মনে শান্তি আছে কিনা সন্দেহ, গ্রামের আবহাওয়াটি কিন্তু বড়োই শান্ত। শান্তিপূর্ণ শ্রীহীনতা চারিদিকে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে যে অনভ্যস্তের রীতিমতো অস্বস্তি বোধ হয়। আজ আবার কোথা হইতে একটা পচা গন্ধ নাকে আসিয়া লাগিতেছিল—বায়ু আজ হঠাৎ দিক পরিবর্তন করিয়াছে। এতদিন বাতাস কেবল বদ্ধ ঘরের ভ্যাপসা বাতাসের মতো ছিল—এমন কটু পীড়াদায়ক গন্ধ বহিয়া আনে নাই।

বীরেশ্বর ম্লান মুখে বসিযা বসিয়া ভাবেন। অনুপমকে বুঝাইয়া শান্ত, সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ করিবার ক্ষমতা কী তাঁর আছে ? এ পাগলামি অনুপমের কোনোদিন কমিবার নয়—কেবল এখন বাড়াবাড়ি দেখা দিয়াছে, সেটুকু ধীরে ধীরে কমিয়া যাইবে, যদি আবার বাড়াবাড়ি করিবার নূতন কোনো কারণ না ঘটে। কী বলিবেন তিনি অনুপমকে ? নিজের জীবনের ইতিহাস বীরেশ্বরের টুকরা টুকরা মনে পড়িতে থাকে—অন্যভাবে তিনিও জীবনে অনেক পাগলামি করিয়াছেন। অসাধারণ অবস্থায় কখনও কখনও কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া পাগলামি তাঁর এমনই বাড়াবাড়িতেও পরিণত হইয়াছে অনেকবার—অন্য সময় নানাভাবে নানা উপলক্ষে নানা বিষয়ে কমবেশি প্রকাশ পাইয়াছে। তবে রামলাল, শ্যামলাল, সীতা, শঙ্কর, অনুপম এদের মতো এতখানি বিভ্রান্ত ও বিধ্বস্ত তিনি ছিলেন না। তাঁর সময়ে পারিপার্শ্বিকতার জাঁতায় এমন ভীষণভাবে মানুষ নিষ্পেষিত হইত না, মানুষের জীবন এমনভাবে গুঁড়া হইয়া যাইত না।

শঙ্কর ও অনুপমের ছেলেমেয়েরা না জানি কী রকম হইবে ?

অনুপমের সঙ্গে কথা বলিয়া বীরেশ্বর দেখিলেন, তাকে কিছু বোঝানো অসম্ভব। সে এমন ধীর, স্থির ও অন্যমনস্ক যে, কোনো কথাই এক রকম তার কানে যায় না।

তা ছাড়া সে ভয়ংকর নির্লজ্জও হইয়া পড়িয়াছে।

তরঙ্গ আমার সব দিক দিয়ে সর্বনাশ করে গেছে দাদামশায়।

কথা বলিবার সময় লজ্জায় অনুপম মাথা তুলিতে পারে না, কিন্তু বীরেশ্বরের মনে হয় এমন নির্লজ্জ মানুষ জীবনে তিনি আর দেখেন নাই।

তা হোক, ছেলে অনুপম ভালো—পড়াশোনায়। সাধনা যেমন মনে করিয়াছিলেন, আর অনুপম যেমন কল্পনা করিয়াছিল, সে রকম না হইলেও পরীক্ষার ফলটা তাহার ভালোই হইয়াছে দেখা গেল। তরঙ্গের জন্য কিছুদিন সে যে রকম হইয়া গিয়াছিল, সে হিসাব ধরিলে এ একটা রীতিমতো বাহাদুরি বলিতে হইবে বইকী।

শঙ্করের মার গাঁয়ে থাকার শখ মিটিয়া যাওয়ার পর সকলে আবার শহরে ফিরিয়া আসিলে, ছেলের পরীক্ষার ভালো ফল হওয়া উপলক্ষে সাধনা একদিন সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। বীরেশ্বরকে এক ফাঁকে বলিলেন, আপনার কথাই ঠিক হল বাবা, নিজে নিজেই আস্তে আস্তে বেশ সামলে উঠেছে।

অনুপম সাধনার বিশেষ অনুরোধে বীরেশ্বরকে একটু ঘটা করিয়াই প্রণাম করিল। বীরেশ্বর মনে মনে কোনো আশীর্বাদ করিলেন কিনা বোঝা গেল না, মুখে শুধু বলিলেন, ঠিকমতো প্রণাম করতে কোথায় শিখলি রে শালা ?

সীতা পিসিমা কিন্তু অনুপমের শরীর ভালো হইয়াছে আর পাগলামি কমিয়াছে দেখিয়া যেন বড়োই ক্ষুণ্ণ হইয়া গেলেন।

তাঁর কেবলই মনে হইতে লাগিল, অনুপম যেন ফাঁকি দিয়াছে, তাঁকে ঠকাইয়াছে। ভারী একটা অন্যায় কাজ করিয়াছে অনুপম। একেবারে অমার্জনীয় অপরাধ। তরঙ্গ না অনুপমকে অত বড়ো একটা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল ? কয়েক মাসের মধ্যে এভাবে তরঙ্গাকে অনুপম ভুলিয়া যায় কোন সাহসে ? সংসারে কি ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত বলিয়া কিছু নাই ? সীতা পিসিমার বিশেষ কষ্ট হয় এই জন্য যে, তিনি যে রকম কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে রকম কিছুই ঘটিল না। অনুপম গোপনে ক্রমাগত অশ্রুপাত করিবে, সকালে দেখা যাইবে বালিশটা তার ভিজিয়া চপচপ করিতেছে, প্রকাশ্যে থাকিয়া থাকিয়া অনুপমের চোখ ছলছল করিবে, দিনদিন শুকাইতে শুকাইতে সে হইয়া যাইবে কাঠ, চালচলন ভাবভঙ্গি দেখিয়া প্রতিনিয়ত মনে হইতে থাকিবে, আর সহ্য করিতে না পারিয়া এই বুঝি সে গেরুয়া পরিয়া হইয়া গেল সন্ন্যাসী ! তার বদলে এ কী খাপছাড়া কাণ্ডকারখানা অনুপমের ! কিছুদিন জ্বরে ভুগিয়া মানুষ যেমন ভালো হইয়া ওঠে, সে যেন তেমনইভাবে ধীরে ধীরে গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে !

বাড়িতে লোকজন আসায় অনুপমের সত্যই বেশ ভালো লাগিতেছিল। সকলের সঙ্গে সস্মিতমুখে সে কথাবার্তা বলে, পাড়ায় কয়েকটি বন্ধুশ্রেণির ছেলের সঙ্গে হাসিতামাশা করে, তাদের সঙ্গে খাইতে বসিয়া একপেট খায়, বিকেলের দিকে কারও অনুরোধের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজেই বাড়িতে ছোটোখাটো একটি গানের আসর বসায়। মনে হয় বাড়িতে যেন উৎসবের আমেজ লাগিযাছে।

সাধনার মুখে হাসি ফুটে। সীতা পিসিমার বুক ফাটিয়া যাইতে থাকে।

কেন এমন হইল ? কেন অনুপম তাঁকে পাশে বসিয়া গায়ে মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে ধরা গলায় বলিবার সুযোগ দিল না যে, তরঙ্গ অনেক করিয়া তাঁকেই দেখিতে বলিয়া গিয়াছে, অনুপম যেন ভয়ানক মুষড়াইয়া না যায়, খাপছাড়া কিছু না করে ? হায়, তরঙ্গ যে নাটকীয় কাজের ভার তাঁকে দিয়া গিয়াছে, সেটা করিবার সুযোগ বুঝি অনুপম আর তাঁকে দিল না।

সন্ধ্যার সময় সীতা পিসিমার আর সহ্য হয় না ! মানুষের পক্ষে প্রায় অব্যবহার্য অস্বাস্থ্যকর যে ঘুপচির মতো ঘরটির মধ্যে তরঙ্গ শখ করিয়া বাস করিত, অনুপমকে সেইখানে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলেন, আর তো তোমায় না বলে থাকতে পারছি না অনু।

কী পিসিমা ?

পাড়ায় কোথায় শাঁখ বাজে, পরপর তিনবার।

তরঙ্গ যা লিখে রেখে গিয়েছিল—চিঠির যেটুকু আমি পুড়িয়ে ফেলেছিলাম, তাতে। তুই কতবার জানতে চেয়েছিলি, বলিনি—বলতে পারিনি। আজ তোর মুখ দেখে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে অনু।

অনুপম বিবর্ণ হইয়া যায়। আবছা অন্ধকারে তার মুখের ভাব পরিবর্তন যতটুকু চোখে পড়ে, তাতেই সীতা পিসিমার বুক দুরদুর করে।

অনুপম প্রশ্ন করিবে, এই প্রতীক্ষায় তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন। অনুপম কিন্তু চুপ করিয়া থাকে, তরঙ্গের চিঠির গোপন রহস্য জানিবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে না।

অগত্যা সীতা পিসিমা নিজেই বলেন, তরঙ্গ শঙ্করকে ভালোবাসত।

অনুপম তবু চুপ করিয়া থাকে।

শঙ্করের জন্যই তো তোদের বাড়ি ছেড়ে হঠাৎ ও বাড়িতে চলে গেল।

তরঙ্গের হৃদয়ের গোপন রহস্য ব্যক্ত করিলেন, কথাটা যে সত্য তার প্রমাণও দিলেন, তবু অনুপম একটা অস্ফুট আর্তনাদ পর্যন্ত করিয়া উঠিল না দেখিয়া সীতা পিসিমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। হঠাৎ অনুপমকে ঠেলিয়া দিয়া তরঙ্গের সেই চোরাকুঠি হইতে নামিয়া আসিতে গিয়া পায়ে পা জড়াইয়া তিনি গেলেন পড়িয়া। গড়াইতে গড়াইতে অর্ধেকটা সিঁড়ির বাঁকের মুখে রেলিংয়ে তিনি আটকাইয়া থাকিলেন।

সীতা পিসিমা আর্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং প্রতিবেশী আর একটা বাড়িতে শাঁখ বাজিল। পাড়ায় তিন-চারটি বাড়িতে আজও শাঁখ বাজাইয়া সন্ধ্যার বন্দনা হয়।

আট

...যে চণ্ডীপাঠ করতে পারে সেও সাধারণ লোক, যে জুতা সেলাই করতে পারে সেও সাধারণ লোক, কিন্তু যে চণ্ডীপাঠও করতে পারে, জুতা সেলাইও করতে পারে, তার অসাধারণ প্রতিভায় মানুষ মুগ্ধ হয়ে যায়। মোহ মানুষকে এইভাবে আক্রমণ করে। মানুষের মনে থাকে বিকার এবং চিরন্তন বা সাময়িক রীতিতে পরিচালিত জগতে আপাত-বিপরীতের সমন্বয় মানুষকে সহজে কাবু করে ফেলে। চণ্ডীপাঠ করতে জানে বলে কারও জুতা সেলাই করতে না জানার কোনো কারণ নেই, তবু চণ্ডীপাঠ থেকে জুতা সেলাই পর্যন্ত যে জানে, আমাদের কাছে সে মহাপুরুষ : মানুষকে দেবতা বলে পূজা করাটা আমাদের কাছে কঠিন নয়, মানুষকে পশু বলে ঘৃণা করাটা আরও সহজ, কিন্তু মানুষকে মুখে চণ্ডীপাঠ করে হাতে জুতা সেলাই করতে দেওয়া আমাদের কাছে সৃষ্টিছাড়া খাপছাড়া ব্যাপার।

এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার যে, এ বিষয়ে আমরা একটা চলতি ব্যঙ্গ সৃষ্টি করে ভাষার ব্যবহার করি। আমরা ব্যঙ্গপ্রিয় জাতি। আপনারা জানেন, সেই ব্যঙ্গই সবচেয়ে জোরালো হয়, যে ব্যঙ্গে আপাত-বিপরীতের সমন্বয়টা খুব স্পষ্ট—আকাশ বললে যখন পাতাল বোঝায়, তখন ব্যঙ্গটা ক্ষীরের মতো জমাট বাঁধে। ভিখারিকে রাজা বলার চেয়ে বড়ো ব্যঙ্গ আর কী আছে ? একজন চণ্ডীপাঠ থেকে জুতা সেলাই পর্যন্ত জানে বললে সোজাসুজি অর্থটা দাঁড়ায় এই যে, লোকটা জানে না এমন কাজ নেই, কিন্তু আমরা কী তাই বোঝাতে চাই ? আমরা বোঝাতে চাই যে, লোকটা কিস্সু জানে না ! এখন স্কুলে-কলেজে আমরা যে শিক্ষা পাই, তাও অনেকটা চণ্ডীপাঠ থেকে জুতা সেলাই করতে শেখার মতো, অথচ আশ্চর্য এই—

শ্রোতারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে না, প্রাণপণে হাততালি দেয় ! কলেজের প্রকাণ্ড হলটা হাততালির আওয়াজে গমগম করিতে থাকে। ছেলেদের মধ্যে যাদের স্নায়ু একটু বেশি দুর্বল, তারা রোমাঞ্চও অনুভব করে। তাদের কলেজের একজন একস্‌স্টুডেন্ট এমন সুন্দর ভাবিতে পারে ভাবিয়া কতকগুলি তরুণ বক্ষই যে ব্যথিত গৌরবে ভরিয়া যায় !

কিন্তু হাততালিতে অনুপমের যেন চমক ভাঙে। কলেজে পুরাতন ছাত্রদের বাৎসরিক মিলনোৎসবে যোগ দিবার কোনো ইচ্ছা তাহার ছিল না, দুটি উৎসাহী ছেলের টানাটানিতে আসিয়াছে। কলেজের ছেলেদেরই কবিতাপাঠ, ক্যারিকেচার, মাসল কন্ট্রোল ইত্যাদি দিয়া যে মিলন-সভায় নিমন্ত্রিতদের এন্টারটেন করা হইয়াছে, সেই সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিবারও কোনো ইচ্ছা তাহার

ছিল না, সেই উৎসাহী ছেলে দুটির ঠেলাঠেলিতেই কিছু বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু চণ্ডীপাঠ আর জুতা সেলাই করা সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা তার ছিল না, স্কুলকলেজের শিক্ষার সমালোচনা করার কথাও সে ভাবে নাই। ও সব বলাও রীতি নয়—কলেজ জীবনের স্মৃতি সে জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না, আজ এই মিলনোৎসবে যোগ দিতে পারিয়া গভীর আনন্দে মুখে তার ভালো করিয়া কথা সরিতেছে না—জড়াইয়া জড়াইয়া এই ধরনের কিছু বলিলে শোনাইতও ভালো, নিয়ম রক্ষাও হইত।

তার বদলে এ সব সে কী বলিতে আরম্ভ করিয়াছে ? আবোল-তাবোল কথাগুলি শুনিয়া ছেলেরাই বা এত খুশি হইল কেন ? অভিযোগের ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ করিয়া কিছু বলিলেই বোধ হয় ছেলেদের ভালো লাগে—খেইহারা রসাল নিন্দা আর সমালোচনা !

কথাটা অনুপমের অসম্ভব মনে হয় না। যে ধরনেব গান, কবিতাপাঠ, ক্যারিকেচার আর মাসল কন্ট্রোল সকলের হাততালি আদায় করিয়াছে !

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, প্রফেসর ও নিমন্ত্রিত বয়স্ক ভদ্রলোকেরা বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিতেছেন বুঝিতে পারিয়াও অনুপম কিন্তু থামে না, বেশ করিয়া কলেজের শিক্ষা আর কলেজে শিক্ষিত ছেলেদের একচোট গালাগালি দেয়। শুনিয়া ছেলেদের সে কী উল্লাস ! একপাশে জন ত্রিশেক মেয়ে বসিয়াছিল, তাদের মধ্যেও অনেকের চোখদুটি উত্তেজনায় ছলছল করিতে থাকে, আনন্দের আতিশয্যে ঠোঁট চাপিয়া হাসিতে ভুলিয়া যাওয়ায় কারও কারও অসমান নোংরা দাঁতগুলিও আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে।

সেই হইল সূত্রপাত। পরদিন দুটি সমিতি অনুপমকে সদস্য করিয়া লইল। একটি সমিতির নাম 'দি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেকশন অব এভরিবডিজ রাইট্স ইনক্লুডিং স্টুডেন্টস' অপরটির নাম 'শিক্ষা সমাজ ও সাহিত্য সংস্কার সমিতি'। প্রথমটির প্রেসিডেন্ট একজন অল্পবয়সি অধ্যাপক, অন্তত চেহারা দেখিলে মনে হয়, বয়স ভদ্রলোকেব বেশি নয়। একটা বিলাতি উপাধি আছে, কিন্তু সবজান্তার নিবিড় বিনয়ে সর্বদা টইটম্বুর হইয়া থাকেন। ছাত্র এবং ছাত্রীদের বড়ো ভালোবাসেন, তাদের সমস্ত সভাসমিতি উৎসব অনুষ্ঠানে হাজিরও থাকেন। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ সভাসমিতি উৎসব-অনুষ্ঠানের গোড়াপত্তনের সময় ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কাছে পবামর্শের জন্য ছুটিয়া আসে।

জন দুই ভক্ত ও সমিতির সদস্য এবং ছাপানো প্যাম্ফলেট, কার্ড ইত্যাদি অস্ত্র লইয়া নিজেই তিনি অনুপমকে আক্রমণ করিতে তাঁর বাড়িতে আসিয়া হাজির হন। অমায়িক হাসি হাসিয়া বলেন, আমি দি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেকশন অব এভরিবডিজ রাইটস ইনক্লুডিং স্টুডেন্টস-র প্রেসিডেন্ট সরসীলাল ভাদুড়ী।

শুনিলে মনে হয় তাঁর জগদ্‌বিখ্যাত নামটি যদি এ পর্যন্ত অনুপমের কানে না পৌঁছিয়া থাকে, অনুপম যে জগতে সবচেয়ে অপদার্থ লোক, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন।

বসিতে বলিয়া ভদ্রতা করার উপায় ছিল না, কারণ ভদ্রলোক আগেই বসিয়াছিলেন। অনুপম তাই বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমাকে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার হতে হবে !

বেশ।

দ্বিতীয় সমিতিটির সম্পাদক একটি ছাত্র। নাম ব্রহ্মানন্দ চক্রবর্তী, বয়স বছর চব্বিশ, চেহারা আশ্চর্য রকমের সুন্দর। সর্বদা ক্রুদ্ধ হইয়া আছে, কিন্তু ক্রোধটা যে কাহার বা কীসের উপর নিজেও ভালো বোঝে না, অপরকেও বুঝাইতে পারে না। বুঝাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেই ক্রুদ্ধ মুখখানি তাহার ক্রোধে একেবারে টকটকে লাল হইয়া যায়।

আপনারাও যদি আমাদের সমিতিতে যোগ না দেন, যদি দশজনের মতো কেবল নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করাটাই জীবনে একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করেন—

অনুপম বলে, আমি কি বলেছি যোগ দেব না ?

কিন্তু এত সহজে ব্রহ্মানন্দের ক্রোধের উপশম হয় না। সহজে কেন, কিছুতেই হয় না।

আপনি না বলতে পারেন, আপনার মতো অনেকেই বলে। লেখাপড়া শিখে কোনো রকমে একটা চাকরি বাগিয়ে বিয়েটিয়ে করে ঘরসংসার করাটাই যেন মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য !

আপনি বিয়ে করেছেন ?

আমি ? আমি বিয়ে করব !

ব্রহ্মানন্দের মুখ দিয়ে কথা সরে না।

এইভাবে অনুপমের জীবনের গতিও শঙ্করের জীবনের গতির সঙ্গে একাভিমুখী হইয়া গেল। শঙ্কর যাত্রা আরম্ভ করিল একেবারে প্রকাশ্য রাজপথে—স্বেচ্ছায়। অনুপম যাত্রা আরম্ভ করিল সরু গলিতে—পরের ইচ্ছায়। শঙ্করকে ভিড়ের মধ্যে নিজের পথ করিয়া লইতে হইল ধাপ্পাবাজির জোরে—অনুপমকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল একদল ছেলেমানুষের নির্বোধ উচ্ছ্বাস।

কিন্তু দেখা গেল, অনুপমের পসার জমিতেছে তাড়াতাড়ি, শঙ্কর যেখানে আর দশজন মহাপুরুষের সঙ্গে বিচরণ করিবার অধিকার লাভের জন্য প্রাণপাত করিতেছে, বিনা চেষ্টায় অনুপমও আগাইয়া চলিয়াছে সেইখানেই। ছেলেরা অনুপমকে পছন্দ করে, ছাত্রছাত্রীমহলে তার নাম ছড়াইয়া পড়িতেছে। যে কোনো অনুষ্ঠানই হোক, ছেলেরা তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়। কিছু বলিতে হয় অনুপমকে। কী যে সে বলে ভালো বোঝা যায় না, কারণ, মনে যা আসে তাই সে বলিয়া যায়। কিন্তু স্কুলে মাস্টার আর কলেজে প্রফেসরদের ব্যাখ্যামূলক লেকচার শুনিতে অভ্যস্ত ছেলেদের কাছে তার ঈষৎ ভয়ে ভয়ে আবোল-তাবোল কথা বলাটাই মনোহর লাগে। অনুপমের দাঁড়ানোর ভঙ্গি, কথা বলার সময় মুখ ছাড়া হাত প্রভৃতি শরীরের বাড়তি অঙ্গগুলি লইয়া অস্বস্তি বোধ করিবার ভঙ্গি, মাঝে মাঝে নাকের ডগা চুলকানো, এ সব দেখিয়া ছেলেদের একটা গভীর মমত্ববোধ জাগে। অনুপমকে মনে হয় ঘরের লোক। ছাত্রীরা সাধারণত মুচকি মুচকি হাসে, তবে কারও কারও মধ্যে বাৎসল্যের সঞ্চারও হয়।

অন্তত আশালতার যে হয় তাতে সন্দেহ নাই।

পছন্দসই ছেলে দেখিলে একদিন, খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, তার শুধু প্রেমেরই সঞ্চার হইত। কিন্তু একবার শুধু একটু অসাবধানতার জন্য, তাও বড়ো বেশি দিনের কথা নয়, মাতৃত্বের পথে মাস তিনেক আগাইবার সুযোগ পাওয়ার পর, বাৎসল্য ভিন্ন আর কিছুই সে অনুভব করিতে পারে না।

নিজে যাচিয়া সে অনুপমের সঙ্গে পরিচয় করিল।

আপনাকে দেখলেই বোঝা যায় আপনার মধ্যে এমন কিছু আছে, আজকাল মানুষের মধ্যে যা খুঁজেই পাওয়া যায় না। সরলতা, তেজ, আদর্শ, অনুরাগ, ন্যাচুরেল পোইজ—

মনে হয়, যেন অনুপমের পিঠ চাপড়াইয়া দিবে !

একদিন আসবেন আমাদের বাড়ি ? আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করতাম।

নিশ্চয় যাব।

আজকেই চলুন না ? এখনও আটটা বাজেনি।

অনুপম মুখে বিষাদের ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আজ ? আজ আমায় মাপ করতে হবে। বাড়িতে মার শরীর ভালো নয়—

আশালতা দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া বলিল, মার শরীর খারাপ ? যান যান শিগগির বাড়ি যান। আমিও রইলাম, আপনিও রইলেন, একদিন গেলেই হবেখন আমাদের বাড়ি। মাকে ফেলে কী করে যে এলেন !

সাধারণ জ্বর হইয়াছিল। সামান্য জ্বর। দুপুরে একবার শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিকালে আবার উঠিয়াছেন। অন্যদিন অনুপম কিছুই বলিত না, আজ সদ্য সদ্য আশালতার ব্যাকুলতা কানে বাজিতেছিল কি না, তাই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, জ্বর গায়ে উঠেছ যে ?

ঘরের কাজ করবে কে ?

ঝি আসেনি ?

ঝি রাঁধবে নাকি ?

বললাম একটা ঠাকুর রাখো—

নবাবের মতো কথা বলিস না অনু।

বোঝা গেল জ্বর যত না হোক, সাধনার রাগ হইয়াছে অনেক বেশি। রান্না শেষ হইয়া গিয়াছিল, নিজের জন্য সাধনা বার্লি জ্বাল দিতেছিলেন।

অনুপম একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, নিমিকে কয়েকদিনের জন্য এনে রাখলে হত না ?

সাধনা বলিলেন, তুই কী ভাবিস বল তো ? এখানে এনে রাখবার জন্য আমি নিমির বিয়ে দিয়েছিলাম, না ?

এ কথার কোনো জবাব নাই, কারণ কথাটার পিছনে আরও অনেক কথা আছে। সাধনার বার্লি জ্বাল দেওয়া হইয়া গেলে অনুপম নিজেই একটা আসন পাতিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

ভাত বাড়িয়া দিয়া সাধনা বলিলেন, আজ কত বছর বাইরে থেকে একটি পয়সা ঘরে আসেনি, কখনও ভেবে দেখেছিস অনু ? উনি টাকার গাছ পুঁতে রেখে যাননি।

অনুপম নীরবে খাইয়া যায়।

এ ভাবে নষ্ট করবার মতো সময় কি তোর আছে অনু ? শঙ্করের সাজে, তার ঠাকুরদা বড়োলোক, তোর সাজে না। আরও পড়তে চাস পড়, ভবিষ্যতে যাতে উন্নতি হয় এমন কিছু করতে চাস কর, আমি যেভাবেই হোক চালিয়ে যাব। একটা মাস্টারি খালি আছে, তাই না হয় করব কবছর। কিন্তু তুই যদি এ রকম উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াস—

সাধনা ঢোক গিলিয়া বলেন, হাত গুটোস নে, খা। জ্বর গায়ে রেঁধেছি, না খেয়ে উঠলে ভালো হবে না বলে রাখছি।

সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া অনুপম অন্তত হাজারবার নিজের মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবে না। পরদিন বিকালে সে যে ভালো জামাকাপড় পরিয়া আশালতার বাড়িতে গেল, সেটা ঠিক উদ্দেশ্যহীন ঘুরিয়া বেড়ানোর পর্যায়ে পড়ে না। আশালতার বাড়িতে যাওয়াও তো একটা উদ্দেশ্য।

আজ আপনি আসবেন ভাবতেও পারিনি।

আশালতা যেন একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছে। এ রকম ব্যাকুলভাবে তার কাছে যারা ছুটিয়া আসে, তাদের কাছে আশা করার যে কিছু নাই, অনেক অভিজ্ঞতায় আশালতার এইটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছে। বাঁধা পড়িবার মতো ভদ্রতাজ্ঞান যাদের থাকে, একদিন সভায় কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হইলে পরদিনই তার বাড়ি গিয়া হাজির না হইবার মতো ভদ্রতাজ্ঞানও তাদের থাকে। চোরডাকাত ছাড়া সুযোগ পাওয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ সুযোগ গ্রহণ করার প্রতিভা সরল, আদর্শে অনুরাগী, ন্যাচুরেল পোইজ্-বিশিষ্ট মানুষ কোথায় পাইবে ?

তবু, আদর-অভ্যর্থনার ত্রুটি আশালতা করিল না। বাড়িখানা ছোটো। ছোটো বসিবার ঘরখানাতে মোটামুটি একটু আধুনিকতা আমদানি করিতে গৃহকর্তার যে প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে, সেটা বেশ বোঝা যায়। কারণ, পুরাতন সোফাটিতে বসিলে জানালার ফাঁক দিয়া অন্দরের যেটুকু অংশ চোখে পড়ে, সেখানে বাড়ির লোকের আর্থিক অবস্থা ঢাকিবার কোনো প্রচেষ্টাই নাই।

জানালার ফাঁকটুকু কে যেন একফাঁকে বন্ধ করিয়া দিল।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের এ-সব ফাঁকি অনুপমের জানা আছে, সে বিচলিত হয় না। সারা বছর যে বাড়ির মেয়েরা ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বাসন মাজে, ঘর লেপে আর রান্না করে এবং অবসর সময়ে পরস্পরের চুলের অরণ্য হইতে উকুন বাছিয়া নখ দিয়া টিপিয়া টিপিয়া মারে, সেই বাড়ির মেয়েরা ঠাকুর দেখিতে যাওয়ার সময় অতি জমকালো শাড়ি অতি জমকালোভাবে পরিয়াছে দেখিলে যেমন অস্বাভাবিক মনে হয় না, গরিবের বাড়িতে বাহিরের ঘরের এই সস্তা বড়োলোকত্বের ভাবও তেমনই অনুপমের খাপছাড়া ঠেকে না। ইহাই নিয়ম, ইহাই প্রথা।

আপনার মা কেমন আছেন ?

মা ? মা ভালো আছেন।

অনুপম একটু বিস্ময়ের সঙ্গে আশালতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। মুখখানা বড়ো গম্ভীর আশালতার।

তার সঙ্গে পরিচয় একদিনের, তার মাকে এখনও সে চোখে দেখে নাই। তার মার জন্য আশালতার এই আশ্চর্য দুর্ভাবনার কারণটা অনুপম ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

কিন্তু আশালতাব মুখেব গাম্ভীর্য ক্ষণস্থায়ী। অন্যমনে বিষাদের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্বাসটা টানিবার সময়েই সে অপূর্ব কৌশলে হাসিয়া ফেলে, একটা কথা ভাবছিলাম।

তাবপর প্রতি সপ্তাহে এক এক ধাপ করিয়া আশালতার সঙ্গে অনুপমের ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে থাকে, ধাপগুলি অনুপমের অপবিচিত। কীসেব সিঁড়ি বাহিয়া কোথায় উঠিতেছে সে বুঝিতে পারে না, কিন্তু সেই জন্যই উঠিতে যেন আরও মজা লাগে।

আশালতা তার সঙ্গে আলাপ কবে নানা বিষয়ে—সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য, কিছুই বাদ যায় না। এই সব আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে একটি-দুটি করিয়া সে প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা কবে।

এবার কী কববেন ভাবছেন ?

অনুপম ভাসাভাসা ভাবে জবাব দেয়, কী আর কবব, চাকরিবাকরি খুঁজছি। শুনিয়া আশালতা খুশি হইতে পারে না।

আরও পড়ুন না ? এখন চাকবি করলে তো কেরানিগিরি, না হয় মাস্টারি। বরাবর ভালো রেজাল্ট করে আসছেন, ফিউচারটা নষ্ট করবেন না।

আরও সপ্তাহখানেক অনুপম আসল অবস্থাটা গোপন করিয়া রাখে, তাবপর কেন যে সব কথা খুলিয়া বলিয়া ফেলে, নিজেই বুঝিতে পাবে না।

আশালতা গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ ভাবে। ভাবিতে ভাবিতেই অনুপমের চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া চাহিয়া দেখে এবং একটি বিস্কুট নিজের হাতে তার মুখে তুলিয়া দেয়।

আপনার ঠাকুরদা আপনাদের ত্যাগ করেননি, আপনাব বাবাই আপনার ঠাকুরদাকে ত্যাগ করেছিলেন, না ?

অনুপম নীরবে সায় দিয়া যায়।

আপনার ঠাকুরদা এখন আর আপনাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন না ? সাহায্য করতে চান না ?

চাইলে কি হবে ? মা রাজি নন।

আশালতা নিজের হাতে আর একখানা বিস্কুট অনুপমের মুখে তুলিয়া দেয়।

আপনি যদি আপনার ঠাকুরদার কাছে গিয়ে পড়ার জন্যে টাকা চান, দেবেন না ?

দেবেন, কিন্তু—

এমনিই যদি টাকা চান, দেবেন না ?

দেবেন, কিন্তু—

আপনি যদি গিয়ে বলেন, ঠাকুরদা, আমি বিলেত যাব আমায় হাজার দশেক টাকা দিন, একসঙ্গে নয়, দশ মাসে পাঁচ সাতশো করে দিন—তিনি দেবেন ? ,

দেবেন, কিন্তু—

কিন্তু কী ?

মা জানতে পারলে আমার মুখ দেখবেন না।

আশালতা মৃদু হাসিয়া বলিল, মা কখনও ছেলের মুখ না দেখে থাকতে পারে ? আপনি বড্ড ছেলেমানুষ।

অনুপম ঘাড় উঁচু করিয়া বলে, মার মনে আমি কষ্ট দিতে পারব না। তা ছাড়া বাবা মরবার সময় যা বলে গেছেন, তারও তো একটা দাম আছে ? আমি বরং সারাজীবন কেরানিগিরি করব, তবু ঠাকুরদার টাকা নিয়ে—

আশালতা শান্তভাবে বলে, ছি, তাই কি আপনি পারেন ? আপনাকে চিনি না আমি ? মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে জীবনে বড়ো হওয়ার চেয়ে কেরানিগিরি অনেক ভালো।

অনুপমের মুখে একটা কালোমেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল, সে মেঘ কাটিয়া যায়। পকেটে রুমাল খুঁজিতে খুঁজিতে আশালতা নিজের আঁচলে তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া চকিতে বাড়ি চলিয়া যাওয়ায় নিজেকে সে কৃতার্থও মনে করে।

সপ্তাহ দুই পরে একদিন ছাত্রসমাজের এক সাধারণসভায় আশালতার সঙ্গে হাজির হইয়া সে দেখিতে পায়, বক্তৃতামঞ্চে ছোটোবড়ো, চেনাঅচেনা নেতাদের মধ্যে শঙ্করও বসিয়া আছে।

ছাত্রসভা হইলেও ধরিতে গেলে এটা প্রকাশ্য জনসভা। এখানে কিছু বলিবার সাহসও অনুপমের ছিল না, সাধও ছিল না। ব্রহ্মানন্দের পাল্লায় পড়িয়া তাকে কিছু বলিতে হইল। ব্রহ্মানন্দ তাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই এক সময় উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিয়া দিল যে, আলোচ্য বিষয়ে শিক্ষা-সমাজ-সাহিত্য সংস্কার সমিতির মতামত সুবিখ্যাত ছাত্রনেতা শ্রীযুক্ত অনুপমবাবু সভায় ব্যাখ্যা করিবেন। ঘোষণা করিয়া আরক্ত মুখখানা অনুপমের মুখের কাছে আনিয়া চাপা গলায় সে বলিল, আপনার পদবিটা ভুলে গেছি। —বসে রইলেন যে ? উঠুন, বলুন কিছু ?

অনুপম ভয়ার্ত কণ্ঠে বলিল, আপনি সমিতির প্রেসিডেন্ট, আপনিই বলুন না ?

ব্রহ্মানন্দ ক্রোধে আরও লাল হইয়া বলিল, আমি বলতে পারলে কি আপনাকে বলতে বলতাম ? শিগগির উঠুন।

বলাটা ভালো হইল না অনুপমের। নিজের ভাঙা থামা থামা কথা শুনিতে শুনিতে নিজের কান দুইটি তাহার গরম হইয়া উঠিতে লাগিল। দু-একবার মনে হইল সভার ভিতর হইতে যেন দুই-চারটা টিটকারিও কানে আসিয়া বাজিতেছে। শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কার সমিতির উদ্দেশ্য আর আদর্শ সম্বন্ধে যা মনে পড়িল, কয়েক মিনিটের মধ্যে কোনোরকমে তাই অতি দুর্বোধ্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সে থামিয়া গেল।

বসিতে গিয়া দেখিল, আশালতার পাশে তার আসনটি ব্রহ্মানন্দ বেদখল করিয়া ফেলিয়াছে। কী যেন সে বলিতেছে আশালতাকে, আশালতা মুগ্ধ বিস্ময়ে তার সুন্দর মুখখানার দিকে চাহিয়া আছে। খানিক তফাতে বসিয়া অনুপম বিবর্ণ মুখে দুজনের দিকে চাহিয়া রহিল। রাগে দুঃখে অভিমানে তার মনে হইতে লাগিল, যে কোনো উপায়েই হোক তরঙ্গ আজ মহাশূন্যের যেখানে অদৃশ্য হইয়া মিশিয়া আছে সটান সেইখানে চলিয়া যায়।

অনুপমের মুখ দেখিয়া আশালতা ব্রহ্মানন্দের দিকে আরও খানিকটা ঝুঁকিয়া আরও খানিকটা নিবিড়ভাবে আলাপ জুড়িয়া দিল।

অনুপম উঠিয়া চলিয়া যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় বক্তৃতা দিতে উঠিল শঙ্কর। কী চমৎকার বক্তৃতাই যে শঙ্কর দিল ! কী হাততালিটাই থাকিয়া থাকিয়া সভায় উঠিতে লাগিল !

উঠুক, আশালতা অনুপমকে আগেই মারিয়া ফেলিয়াছে, এগুলি শুধু খাঁড়ার ঘা। তবু, মরা মানুষও যে খাঁড়ার ঘায়ে এত কষ্ট পাইতে পারে, তা কি অনুপম জানিত ! তাদের বাড়িতে চিলেকোঠার ঘরে সন্ধ্যার ঘনায়মান আবছা অন্ধকারে সীতা পিসিমা তরঙ্গ ও শঙ্করের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, অনুপমের মনে পড়িয়া যায়। সেই শঙ্কর এমন চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে ? তাও আবার সেই সভায়, যেখানে খানিক আগে অতি সাধারণ কয়েকটা কথা বলিতে গিয়া সে লোক হাসাইয়াছে ! অনুপমের মনে হয়, এত ভালো করিয়া বলা যেন তাকে অপদস্থ করার জন্য শঙ্করের ইচ্ছাকৃত বাহাদুরি।

সভা ভাঙিলে আশালতা অনুপমকে বলিল, চলুন, আমরা যাই।

ব্রহ্মানন্দ বলিল, বাড়ি যাবেন তো ? চলুন আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

আশালতা শুষ্কস্বরে বলিল, কিছু মনে করবেন না ব্রহ্মানন্দবাবু, আমাদের একবার মার্কেটে যেতে হবে।

ব্রহ্মানন্দ বলিল, আমিও তো মার্কেটে যাব।

আশালতা বলিল, আমরা একজনদের বাড়ি হয়ে যাব—আপনার সঙ্গে যেতে পারছি না।

কারও বাড়ি নয় মার্কেট নয়—মাঠ। ব্রহ্মানন্দকে প্রত্যাখ্যান করার মৃতসঞ্জীবনীতেও অনুপমের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হইতেছে না দেখিয়া আশালতা বলিল, এসো, একটু বসি।

একটা গাছের নীচে আবছা অন্ধকারে অনুপমের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া সে বলিল, তুমি বড্ড ছেলেমানুষ।

সুতরাং দিন দশেক পরে আশালতার সঙ্গে অনুপমের বিবাহ হইয়া গেল।

অনুপম কিছুদিন অপেক্ষা করার কথা বলিয়াছিল, বলিয়াছিল, একটা চাকরিবাকরি ঠিক করে নিই আগে ?

আশালতা বলিয়াছিল, হবে, হবে, সব হবে।

কী যে হইবে জানিলে হয়তো অনুপম ভয়ে শিহরিয়া উঠিত, কিন্তু বিপদটা ঠেকাইতে পারিত কি না সন্দেহ।

নয়

কিছুদিন সাধনার মনের মতো হইবার চেষ্টা করিয়া আশালতা দেখিল, কাজটা বড়ো কঠিন। সাধনার কাছে ফাঁকি চলে না। মানুষটা সহজ, শান্ত ও মমতাময়ী বটে, কিন্তু গোঁজামিলের ব্যাপারে বড়ো কড়া। খারাপ লোককে খারাপ লোক হিসাবে যদি বা খানিক কাছে ঘেঁষিতে দেন, ভালোমানুষ সাজিয়া আপন হইবার চেষ্টা করিলে খারাপ লোক তাঁর কাছে একেবারেই প্রশ্রয় পায় না।

মানুষ বশ করিবার যত উপায় জানা ছিল, তার সবগুলিই আশালতা খাটাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিল। কিন্তু দেখা গেল, ফলটা আরও খারাপ হইয়াছে। কোনো চেষ্টা না করিলেই বরং ভালো হইত ; সাধনার মনের মতো হইতে গিয়াই সাধনার কাছে নিজের পরিচয়টা আরও বেশি পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে।

নিজের বোকামিতে আশালতা ক্ষুব্ধ হয়, রাগও করে। রাগটা হয় তার সাধনার উপর। তার প্রত্যেকটি চালাকি ধরিয়া ফেলিবার মতো চালাক মানুষ যদি সাধনা হন, এ রকম সাদাসিধে সাধারণ ভালোমানুষ সাজিয়া থাকিয়া তার মনে ভুল ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া কি সাধনার উচিত হইয়াছে ? সে হইল পুত্রবধূ, একমাত্র ছেলের একমাত্র বউ, তাকে এ ভাবে ঠকানো কি ভালো ?

তাকে বিবাহ করার জন্যে সাধনার কাছে অনুপম ছেলেমানুষের মতো অপরাধী সাজিয়া থাকে দেখিয়াও আশালতার গা জ্বলিয়া যায়। কেন, তাকে বিবাহ করার জন্য সে কি অনুপমের পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল ? তার বয়স একটু বেশি, চালচলন সাধনার মনের মতো নয়, কিন্তু সে জন্য দায়ি কি সে ? নিজে দেখিয়া, নিজে পছন্দ করিয়া, নিজে ভালোবাসিয়া নিজে প্রস্তাব করিয়া অনুপম তাকে বিবাহ করে নাই ?

তা ছাড়া, ধরিতে গেলে সেই তো অনুপমকে অনুগ্রহ করিয়াছে। যেমন অবস্থা বাড়ির, তেমনই অবস্থা অনুপমের নিজের, জানিয়া-শুনিয়া সে অনুপমকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছিল, এটাই কি তার অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় নয়, তার বৃহৎ আত্মত্যাগের পরিচয় নয়, তার উদার প্রেমেব পরিচয় নয়—যে প্রেম মানবীকে দেবীতে পরিণত করে ?

কিন্তু যতই রাগ হোক, যতই গা জ্বালা করুক, বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার মতো বোকা আশালতা নয়। সাধনাকে জয় করিবার চেষ্টা সে ছাড়িয়া দেয় বটে, কিন্তু কোনো রকম বিবোধ সৃষ্টি করে না। ছেলের কীর্তিতে মর্মাহত সাধনার সমস্ত উপেক্ষা ও অবহেলা নীরবে সহ্য করিয়া যায়, মনের গোপন কোণে বিদ্বেষ জমাইয়া রাখে।

সাধনার স্বাভাবিক স্বচ্ছ প্রকৃতির দর্পণে নিজের হীনতা ও সংকীর্ণতা আশালতা বারবার প্রতিবিম্বিত হইতে দেখিতে পায়, কিন্তু সে জন্য সে বিশেষ বিচলিত হয় না। তার সর্বাপেক্ষা জ্বালা বোধ হয়, দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ, অতি সামান্য ঘটনায় অনুপমের জন্য সাধনার অগাধ বাৎসল্যের অতি সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ অভিব্যঞ্জনা সে যখন অনুভব করিতে পারে।

মা ছেলেকে ভালোবাসিবে, এই সহজ সত্যটির বিরুদ্ধে আশালতার নালিশ নাই, অনুপমের জন্য সাধনার স্নেহ যখন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, তখন আশালতার কষ্টও হয় না, সাধনাকে শত্রু বলিয়া মনেও হয় না। কিন্তু সাধনার বাৎসল্যের সেই অভিব্যক্তিগুলি আশালতাকে একটা অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য যন্ত্রণা দেয় যে অভিব্যক্তিগুলি একমাত্র বাৎসল্যের অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া আর কোনো দৃষ্টিতেই ধরা পড়িবার নয়। তখন সাধনাকে আশালতার মনে হয় শত্রু, মনে হয় সাধনা যেন তার ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাকে বঞ্চিত করিয়া তার সর্বাপেক্ষা অমূল্য সম্পদটি আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন।

নিজের মনের এই ব্যাপারটা আশালতা ভালো বুঝিতে পারে না। সে জানে, তার কাছ হইতে অনুপমকে কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা সাধনার নাই, সাধনাকে অনুপম যতই ভয় করুক, সাধনার মনে কষ্ট দিতে অনুপমের যতই আপত্তি থাক, মনের জোর অনুপমের নাই, সাধনার চেয়ে তাই অনুপমের উপর তার জোর অনেক বেশি। বউ ছেলেকে পর করিয়া ফেলিবে, শাশুড়ির এই আশঙ্কা যেমন বোঝা যায়, স্বামীর উপর শাশুড়ির কর্তৃত্ব বেশি বলিয়া বউয়ের হিংসাটাও তেমনই বোঝা যায়, কিন্তু স্বামীর জন্য শাশুড়ির স্বাভা'বিক বাৎসল্য বউয়ের মনে আগুন ধরাইয়া দেয়। কোন যুক্তিতে ?

বিশেষত বউ যখন জানে, যে দিন খুশি স্বামীকে দিয়া সে এই বাৎসল্যের অপমান করাইতে পারে ?

নিজের মনের এই দুর্বোধ্য রহস্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া যে কয়েকটা দিন আশালতা নিজের মধ্যেই রহস্যের একটা সমীচীন ব্যাখ্যা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করে, সেই কয়েকদিন তাহার চালচলনে একটা অপরূপ স্বাভাবিক মাধুর্যের সঞ্চার হয়, যাহা সাধনাকে করিয়া দেয় অবাক এবং অনুপমকে করিয়া দেয় আরও বেশি মোহাতুর।

কিছুদিনের জন্য আশালতা যেন নতুন মানুষ হইয়া যায়। অনুপমের মনে হয়, ক্রমাগত তাকেই গ্রহণ করিয়া চলিবার প্রক্রিয়াটা বন্ধ করিযা আশালতা যেন এতদিনে নিজেকে দান করিতে শিখিয়াছে, কেবল তাকেই আদর না করিয়া তাব কাছ হইতেও আদর পাওয়ার প্রয়োজনটা একটু বুঝিতে পারিয়াছে।

একটু বুঝিতে পারিয়াছে, অতি সামান্য।

কিন্তু অনুপমের কাছে তাই যথেষ্ট। আশালতা তার মধ্যে যে মোহ জাগাইয়া দিয়াছিল, আশলতার কাছে সে তার তৃপ্তি পায় না, গভীর অতৃপ্তিতে দিন দিন তাহার মোহ তীব্র হইতে তীব্রতব হইয়া উঠে। আশালতা তাকে স্নেহ করে, সেবা করে, আদর করে, মাঝে মাঝে গভীর ও আন্তরিক আবেগে তাকে অভিভূত করিয়া দেয়, হাসিমুখে তার সমস্ত দাবি মিটাইয়া চলে—তবু অনুপমের মনে হয়, কিছুই যেন আশালতা তাকে দিতেছে না, সব দিক দিয়া তাকে বঞ্চিত করিয়া চলিযাছে।

কী সে চায় আশালতার কাছে ও কী সে পায় না, কেন একটা মর্মান্তিক অতৃপ্তির যন্ত্রণা ধারালো অস্ত্রের মতো মনকে তাহার ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয, অনুপম তাহা বুঝিতে পারে না। সময় সময় তাব মনে হয়, আশালতা যেন ঠিক তার বউ নয়, বউয়ের মুখোশ পরিয়া অন্য একটা সম্পর্ক পাতিবার জন্য আশালতা তার শয্যাপার্শ্বে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে। এ জগতে মানুষের যত আত্মীয়া থাকা সম্ভব, মা-বোন-মাসি-পিসি, আশালতা যেন তাই, তার উপরে সে বান্ধবী, তারও উপবে সে নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ একটা মাংসপিণ্ড। আর কিছুই নয় !

গভীর রাত্রি। শহবের আওয়াজ মৃদু হইয়া আসিবার স্তব্ধতা।

আশালতার অতি কোমল, অতি মৃদু মিনতিব আজ্ঞায় ঘুম আসিবে না জানিয়াও অনুপম আশালতাব কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়াছে। বেশি রাত জাগিলে মানুষের শরীব খারাপ হয।

আশালতা কথা বলে, চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা কবে, নিবিড় মমতায় স্তিমিত চোখে মুখেব দিকে চাহিয়া মৃদু ও অপূর্ব হাসি হাসে। অনুপমও কথা বলে, একহাতের আঙুল দিয়া অপর হাতের আঙুলগুলিকে বন্দী করিয়া দুটি হাতকেই বুকের কাছে জড়ো কবিযা রাখে, প্রায অপলক চোখে আশালতার মুখের দিকে চাহিযা থাকে। দেয়ালে লটকানো বিদ্যুৎ আলো হইয়া আশালতাব মুখে আসিয়া পড়িতে থাকে অবিরাম, মুখের একপাশে থাকে মুখের ছায়া, নাকের পাশে থাকে নাকের ছাযা, আধঢাকা চোখে থাকে চোখের পাতার ছায়া—আলোছায়ায় আশালতার মুখখানা অতি ভয়াবহ মনে হয়। অনুপম শিহরিয়া উঠে। সে যেন এক কান দিয়া আশালতার কথার মৃদু গুঞ্জন শুনিতে পায়, অপব কানটিতে সেই গুঞ্জনের সুর কাটিয়া কাটিয়া কে যেন বলিয়া চলে, এ তরঙ্গ নয়, এ তরঙ্গ নয়।

খানিক পরেই অনুপমকে ঘুমের ভান করিতে হইবে। আশালতা যে কথাই বলিযা চলুক, অনুপম জানে, মনে মনে সে আবৃত্তি করিতেছে 'ঘুম-পাড়ানি মাসিপিসি ঘুম দিযে যা'। ঘুমের ভান না করিয়া তার উপায় কী ! জোরে একটা নিশ্বাস টানিয়া সে চোখ বুজিয়া থাকিবে, খানিক অপেক্ষা করিযা আশালতা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিবে, ঘুমোলে ?

সে সাড়া দিবে না।

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আশালতা বালিশ ঠিক কবিয়া সন্তর্পণে তাব মাথাটি বালিশে নামাইয়া দিবে। আলো নিবাইয়া অধিকতর সন্তর্পণে পাশে শুইয়া পড়িবে।

অনুপমের মনে হইবে স্টেজের আলো নিবিয়া গেল।

অভিনয়-মঞ্চের আলো নেবে এবং জ্বলে, কিন্তু বক্তৃতামঞ্চে অনুপমের আনাগোনায় আশালতা যে যবনিকা টানিয়া দিল, তাহা আর উঠিল না। ব্রহ্মানন্দ একদিন অনুপমকে ডাকিতে আসিযা মুখ রক্তবর্ণ করিয়া ফিরিয়া গেল, আর একদিন ডাকিতে আসিয়া সে পড়িল আশালতার পাল্লায়।

আপনাদের ও সব ছ্যাবলামিতে যোগ দেবার সময় আমারও নেই, ওঁরও নেই, ব্রহ্মানন্দবাবু।

ছ্যাবলামি ! আপনি—আপনি— বক্তব্যটা শক্ত জিনিসের মতো ব্রহ্মানন্দের গলায় আটকাইয়া গেল।

চা খাবেন ?

চা না খাইয়াই ব্রহ্মানন্দ বিদায় গ্রহণ করিল এবং কয়েকদিন পরে অনুপমের নামে একখানি বেনামি চিঠি আসিল। চিঠিতে 'দি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেকশন অব এভরিবডিজ রাইটস ইনক্লুডিং স্টুডেন্টস'-এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক সরসীলাল ভাদুড়ীর নামের সঙ্গে আশালতার নাম জড়াইয়া কয়েকটা কথা লেখা ছিল।

আশালতা বলিল, দেখি কার চিঠি ?

আগাগোড়া চিঠিখানা পড়িয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

উঃ, কী শয়তান ছেলে ! সেদিন অপমান করে তাড়িয়ে দিলাম কি না, তাই শোধ নিচ্ছে। কার হাতের লেখা জান ? ব্রহ্মানন্দের।

অনুপমের মুখ গম্ভীর হইয়াছে দেখিয়াও সে নিজের হালকা পরিহাসের ভঙ্গি ত্যাগ করিল না, বলিল, কিগো, দাঁড়িয়ে রইলে যে ? যাও, খোঁজ নিয়ে এসো গে ?

অনুপম বলিল, ধেৎ।

আদর্শের হিসাবে জীবনের মূল্য ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইতেছিল, কিন্তু জীবন যে এত সস্তা হইতে পারে কিছুদিন আগেও অনুপমের এ ধারণা ছিল না। তরঙ্গের আত্মহত্যার পর হইতে আদর্শের নামে যে অবাস্তব স্বপ্নের রঙিন প্রতিবিম্বগুলি জীবন হইতে একটির পর একটি মুছিয়া যাইতেছিল, সেগুলির প্রতি অনুপমের মমতা বড়ো কম ছিল না। কেবল তার নিজের নয়, তার পরিচিত ভালোমন্দ সকল মানুষের জীবন যে আদর্শের রঙে রঙিন করা হইয়াছে, সেগুলির রং এত কাঁচা কেন যে, বাস্তব জীবনের সামান্য একটু স্পর্শ পাইবামাত্র রং উঠিয়া কুশ্রী হইয়া যায়, এতবড়ো একটা প্রশ্নের জবাব আবিষ্কার করিবার মতো মাথা অনুপমের ছিল না, কিন্তু প্রশ্নটা একটা অস্পষ্ট রূপ ধরিয়া মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, প্রশ্নটার জবাব কি এই যে, মানুষের জীবনে আজ মনুষ্যত্ব শিথিল হইয়া গিয়াছে।

তারপর একদিন সাধনা বলিলেন, অপরাধী সেজে থাকলে তো চলবে না অনু, কিছু করতে হবে। কী করবি ভেবেছিস ?

অনুপম কী করিবে সে ভাবনা অনুপমের হইয়া আশালতা আগাগোড়া ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল এবং অনুপমকেও প্রায় সেইভাবেই ভাবিতে শিখাইয়া আসিয়াছিল। মনে মনে অনুপম জানে, আশালতা যাহা স্থির করিয়াছে, তাই তাকে শেষ পর্যন্ত করিতে হইবে, তবু সাধনাকে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিবার সাহস তাহার হইল না।

ভাবছি। এখনও কিছু ঠিক করিনি।

ঠিক তুই কোনোদিন করতে পারবি না। তোর একটুও মনের জোর নেই অনু।

বড়ো শ্রান্ত মনে হয় সাধনাকে, বড়ো অসহায় মনে হয়। মানুষটার গায়েও যেন এতটুকু জোর নেই, মনেও এতটুকু জোর নাই। জীবনযুদ্ধে এতদিনে তিনি যেন একেবারে হার মানিয়াছেন—যুদ্ধের শেষে যখন জয়গৌরব লাভ করিবার কথা ঠিক তখন। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে আজ পর্যন্ত ধরিতে গেলে তিনি একরকম তপস্যা করিয়াছেন বইকী—আত্মনির্ভরশীলতার তপস্যা, স্বামীর ইচ্ছাপালনের তপস্যা, বীরেশ্বরের আশ্রয়ে গিয়া দাঁড়াইবার প্রলোভন জয় করিবার তপস্যা। এমনভাবে সাধনা অনুপমের মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন যে মনে হয়, অনুপমের দাম কষিয়া তিনি যেন ব্যাকুলভাবে

নিজের সুদীর্ঘ ও কঠোর ব্রতপালনের সার্থকতা যাচাই করিতেছেন, সবটাই যে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, কোনোমতেই তাহা যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না।

তুই যে কী করে এমন হয়ে গেলি অনু !

অনুযোগের চেয়ে কথাটা আপশোশের মতোই শোনায় বেশি। নিজেকেই যেন তিনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এত করলাম তবু ছেলেকে আমি মানুষ করতে পারলাম না কেন ? কেন আমার এতদিনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল ?

অনুপমের মন খারাপ হইয়া যায়। কেবল আশালতার জন্যই যে সাধনা হঠাৎ তাহাকে অমানুষ মনে করিতে আরম্ভ করেন নাই, এমন স্পষ্টভাবে অনুপম তা জানে যে, অন্ধভাবে আশালতাব পক্ষ সমর্থন করিয়া সাধনার উপর একটু বিরক্ত হইয়া উঠিবার সুযোগটা পর্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে না। খানিক ইতস্তত করিয়া সে চলিয়া যায় নিজের ঘরে। দেখা যায় সেখানে ওত পাতিয়া বসিয়া আছে আশালতা।

মা কী বলছিলেন ?

শিব গড়তে কেন বাঁদর গড়লেন, তাই জিজ্ঞাসা করছিলেন।

চোখের পলকে আশালতা বুঝিতে পারে, অনুপম রাগ করিয়াছে। কিন্তু কার উপর রাগ করিয়াছে বুঝিতে পারে না।

মাকে বলেছ বুঝি ?

না। আমি বলতে পারব না।

শুনিযা আশালতা রাগ কবে না। শিশুর অবাধ্যতাকে প্রশ্রয় দিবার ভঙ্গিতে মৃদু একটু হাসিয়া বলে, বড়ো ছেলেমানুষ তুমি ! একটুতে মন বিগড়ে যায়।

সাধনা মনে করেন অপদার্থ, আশালতা মনে করে ছেলেমানুষ। এদের কাবও মনে করার সঙ্গে অনুপমের নিজের ধারণা মেলে না। নিজেকে তার মনে হয় একটা রূপধরা ফাঁকি, যার মধ্যে অপদার্থতাও নাই, ছেলেমানুষিও নাই।

বীরেশ্বরের সঙ্গে আশালতার বার চারেক দেখা হইয়াছে। দুবার বীরেশ্বর এ বাড়িতে আসিয়াছেন, দুবার সকলকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। বীরেশ্বরকে যতটুকু চেনা দরকার, চারবার দেখিয়াই আশালতা চিনিয়া ফেলিয়াছে, ও দিক দিয়া তার কোনো ভয় নাই। তার ভয় শুধু সাধনাকে। তবে অনুপমের কাছে সাধনার অদ্ভুত মনের জোর ও একগুয়েমির কাহিনি শুনিতে শুনিতে সাধনার সম্বন্ধে তার যে রকম ভয় হইয়াছিল, এখন সে ভয় অনেক কমিয়া গিয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে, নিজের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে যে অবস্থায় মানুষ ভাঙিয়া পড়ে, সাধনা সেই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া সাধনাকে আরও খানিকটা নির্জীব করিয়া আনিতে পারিলে ভালো হইত, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের বেনামি চিঠির পর আর দেরি করিবার সাহস আশালতার হইল না।

একদিন বিকালের দিকে অনুপমকে সঙ্গে করিয়া সে বেড়াইতে বাহির হইল। বাহির হইল একটু সকাল সকাল, কারণ অনেক কিছু করিবার ছিল। পথে নামিয়া বলিল, পথেঘাটে কোথায় বেড়াব ? তার চেয়ে চলো আমরা দু-একজন বন্ধুর বাড়ি গিয়ে দেখা করে আসি। অনেকদিন দেখা হয়নি, বিয়ের সময়ও নেমন্তন্ন করিনি—নিশ্চয় ভারী ক্ষুণ্ণ হয়ে আছে।

সিনেমায় গেলে হত না ?

সিনেমায় আর একদিন যাব।

যে দুটি বাড়িতে যে দুটি পরিবারের মধ্যে আশালতা অনুপমকে টানিয়া লইয়া গেল, তাদের সঙ্গে আশালতার পরিচয় থাকা সম্ভব, বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। সে সম্পর্ক যে আছে, তারও কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। বরং আশালতার মতো মেয়েকে একদিন চা-পানের নিমন্ত্রণ করিযাই যে কৃতার্থ করিয়া দেওয়া যায়, দুটি পরিবারের একজনেরও, এমন কী খানসামা বেয়ারাগুলির পর্যন্ত, এই জ্ঞানের কিছুমাত্র অভাব আছে বলিয়া মনে হইল না। আশালতা নিজেও আজ সাজগোজ করে নাই, অনুপমও করে নাই। নিজের স্বপ্ন-জীবনের এই দুটি প্রায়-অভিন্ন আবেষ্টনীর মধ্যে নরম আসনে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া মার্জিত কণ্ঠের ভাসাভাসা ভাঙাভাঙা ভদ্রতার আলাপ শুনিতে শুনিতে অনুপমের মনে হইতে লাগিল, সুদৃশ্য অ্যাশ ট্রে পর্যন্ত যেন সস্ত্রীক অনুপমবাবুকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

দুনম্বর বাড়িটির গেট পার হইয়া দুপাশের সম্ভ্রান্ত বাড়িগুলির মধ্যে পিচঢালা পরিচ্ছন্ন পথ ধরিয়া দুজনে ট্রামলাইনের দিকে হাঁটিতে লাগিল।

আশালতা অনুপমের মুখের ভাব লক্ষ করিতেছিল, এক সময় মৃদুস্বরে বলিল, গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেবার কথা বলল—ঠিক একটিবার ! জানে যে প্রথমবার ভদ্রতা করে আমরাও বলব, গাড়ির দরকার নেই। আর একবার যদি বলত, আমি ঠিক বলে বসতাম, এত করে যখন বলছেন, মেনি থ্যাঙ্কস।

অনুপম ঝাঁঝালো সুরে বলিল, হাঁটতে তোমার কষ্ট হচ্ছে নাকি ?

হাঁটতে আবাব কী কষ্ট ?—মজা করে খানিকক্ষণ দামি গাড়িতে চড়ে নিতাম !

দামি গাড়িতে চড়লেই মানুষ সুখী হয় না।

আশালতা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা ঠিক। সুখী হওয়া অ্যাতো কঠিন !

তারপর আরও খানিকক্ষণ রাশ আলগা দিয়া শহরতলির হ্রদের ধারে অনুপমকে একটা পাক খাওয়াইয়া এক সময় আশালতা আবার রাশ টানিয়া ধরিল এবং সন্ধ্যার পরেই অনুপমকে হাজির করিয়া দিল বীরেশ্বরের কাছে।

সমস্ত শুনিয়া বীরেশ্বব বলিলেন, এ বুদ্ধি তোকে কে দিল অনু ?

কেউ বুদ্ধি দেযনি, নিজের ফিউচার ঠিক করে নেবার বয়স আমার হয়েছে ঠাকুরদা।

কথা শুনে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। তোর বিলেত যাওয়ার মানে হয়, বউকে সঙ্গে নিয়ে যাবার তোর কী দরকার ?

এ প্রশ্নের জবাব আশালতা অনুপমকে শিখাইয়া রাখিয়াছিল। মুখ কালো করিয়া সে বলিল, কারণ আছে। আপনাকে বলতে পাবব না ঠাকুরদা।

বীরেশ্বরও মুখ কালো কবিয়া বলিলেন, আমার টাকায় দুজনে বিলেত যাবি, আমাকে বলতে পারবি না ?

অনুপম বলিল, না।

বীরেশ্বর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিলেন। তারপব মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না ঠিক আমার টাকা নয়। তুই তোর বাবার টাকা দাবি করছিস, না অনু ?—রাগ করে আমায় ত্যাগ না করলে শঙ্করের বাবার মতো তোর বাবার জন্যে আমাকে যে টাকাটা খরচ করতে হত সেই টাকাটা, না ? আমি না মরলে আমার যা কিছু আছে, তার ভাগ পাবি না জানিস বলে তোর বাপের কাছে যে টাকাটা ধারি, তাই আদায় করতে এসেছিস, কেমন ?

অনুপম ব্যাকুল হইয়া বলিল, না ঠাকুরদা, না। সত্যি তা নয়, আপনার কাছে সাহায্য চাইছি।

তোর মার কথাটা ভেবেছিস অনু ?

মা অবশ্য একটু রাগ করবেন—

একটু রাগ নয়, হয়তো জীবনে তোদের মুখ দেখবেন না।

কিন্তু মার জন্যে আমার ফিউচারটা তো নষ্ট করতে পাবি না—

বীরেশ্বর হঠাৎ রাগিয়া আগুন হইয়া বলিলেন, নিজের মাকে বাদ দিয়ে মানুষের ফিউচাব কী রে বাঁদর ? মার জন্য একদিন তোর বাবা আমার টাকার লোভ ত্যাগ কবেছিল, সেই টাকাব লোভে আজ তুই তোর মাকে ত্যাগ করছিস। বউমা তোকে মানুষ করতে পাবেননি অনু।

অনুপম তা জানে।

বাগটা কমিতে কিছু সময় লাগিল বীরেশ্বরের। তারপর ঠিক যেন সাধনাব মতো শ্রান্ত ও অসহায়ভাবে বলিলেন, চাইছিস যখন, টাকা আমি দেব অনু। না দিলেই বা বউমাব কী লাভ হবে, যেভাবেই হোক বউমাকে তোরা মেরে ফেলবিই।

বীরেশ্বরের ঘর হইতে বাহির হইয়া অনুপম বারান্দায় একটু দাঁড়াইল। রামলালেব ঘর অন্ধকার, এখনও তিনি রেস্তোরাঁয় রুগ্‌ণ জীবনেব দৈনন্দিন ঔষধের বোতল খালি করিয়া বাড়ি ফেবেন নাই। শঙ্করেব ঘরও অন্ধকাব। বাড়িব মেয়েবা কেউ চলাফেরা করিতেছে, কেউ শিশুদের ঘুম পাড়াইতেছে, কেউ নভেল পড়িতেছে। ছেলেমেয়েরা করিতেছে স্কুলকলেজের পড়া। সকলের জন্য রান্নাঘবে প্রস্তুত হইতেছে খাদ্য।

বারান্দার শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া সীতা পিসিমা আশালতাকে চুপিচুপি কী যেন বলিতেছেন। কে জানে তবঙ্গের জীবনকাহিনি কী না। তরঙ্গ যে ঘরে গলায় দড়ি দিয়াছিল, বাবান্দায় ওই প্রান্তেই সেই ঘরে উঠিয়া যাইবার সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে। গভীর মনোযোগেব সঙ্গে সীতা পিসিমাব কথা শুনিতে শুনিতে আশালতার মাথাব আঁচল খুলিয়া পড়িয়াছিল। তবঙ্গেব মতো চুল তাহাব নাই, তবু কী কৌশলে যেন চুলগুলিকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া প্রায় তরঙ্গের মতোই মস্ত একটা খোঁপা বাঁধিয়াছে। এতদূবে দাঁড়াইয়া ক্ষীণ আলোকে পাশেব দিক হইতে আশালতার মুখখানা দেখিয়া অনুপমেব হঠাৎ মনে হয়, তাব মুখের একধারে যেন তরঙ্গের মুখেব মবণের বিবর্ণ বিসদৃশ মুখোশেব একটা টুকবা কে আঁটিয়া দিয়াছে।

আশালতার সঙ্গে বাড়ি ফিবিবার সময় আশালতার মুখ না দেখিবাব জন্যই অনুপম জোব করিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাড়ি পৌঁছিয়া সাধনার মুখেব দিকেও অনুপম চাহিতে পারিল না, কিন্তু তাহা অন্য কাবণে। ভবিষ্যৎ জীবনকে কীভাবে গড়িয়া তুলিবে, আশালতার সঙ্গে সে বিষয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা করিয়াছে ; আজ এইমাত্র আশালতাব সেই পবিকল্পনা সফল কবিবাব সবচেয়ে দবকাবি ব্যবস্থাটা সে করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজই তাহার বেশি করিয়া মনে হইতেছে যে, সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনটা এতদিনে সে সম্পূর্ণবূপে উদ্দেশ্যহীন করিয়া দিল ! এতদিন ছোটো ছোটো উদ্দেশ্যহীন কাজ কবিয়া দিন কাটাইয়াছে, এইবার আড়ম্বরের সঙ্গে জীবনেব সবচেয়ে বড়ো উদ্দেশ্যহীন কাজটা আরম্ভ করিবে এবং সেই সঙ্গে উদ্দেশ্যহীন কবিয়া দিবে সাধনাব অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবন। এতদিন অনুপমেব মনের কোণে আত্ম-সান্ত্বনার প্রয়োজনে একটা আশা ছিল। সাধনা তাকে মানুষ কবিতে পারে নাই, সে অমানুষ, কিন্তু হয়তো একদিন মানুষ হইতে পারিবে, সন্ধান পাইবে জীবনেব উদ্দেশ্যেব, খুঁজিয়া পাইবে পথ। তারপর যেদিন সে মানুষ হইতে পারিবে, সেদিন প্রমাণ হইবে, সাধনাব জীবনটাও ব্যর্থ হইয়া যায় নাই।

আজ সেই যুক্তিহীন আশা অনুপমের মনে আত্মহত্যা করিয়াছে।

সাধনা রোয়াকে বসিয়াছিলেন। একা। ঠিকা ঝি কাজ সারিয়া চলিয়া গিয়াছে। রান্না শেষ করিয়া সাধনা শূন্যগৃহ আগলাইয়া বসিয়া আছেন।

এত রাত হল যে অনু ?

অনুপম কতদূর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে আশালতা তাহা জানিত, তাকে শান্ত হইবার, ভাবিবার সময় না দিয়া আজই সমস্ত ব্যাপারটা চুকাইয়া ফেলিবার জন্য অনুপমের হইয়া সে জবাব দিল, ও বাড়িতে গিয়েছিলাম মা।

আজ সাধনাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা বা সাহস কিছুই অনুপমের ছিল না। ও বাড়িতে তাহারা কেন গিয়াছিল সাধনার এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া এবং আশালতার দুটি-একটি মন্তব্যের জের টানিতে গিয়া সব কথাই সে বলিয়া ফেলিল।

সাধনা মড়ার মতো বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। পরদিন সকালে ছোটো একটি বাক্‌সো সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেলেন দেশে। একা।

খানিক পরে শুরু হইল বীরেশ্বর ছাড়া ও বাড়ির সকলের আবির্ভাব। একটু আভাস পাইয়া সকলে ব্যাপারটা ভালো করিয়া বুঝিতে আসিয়াছে। বাপের টাকার ভাগটা অনুপম দাবি করিয়াছে এবং তাহার দাবি মঞ্জুর হইয়াছে শুনিয়া মুখ কালো করিয়া সকলে ফিরিয়া গেলেন। সীতা পিসিমা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন।

শঙ্কর আসিল দুপুরবেলা।

আশালতাই সকলকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল, শঙ্করকেও সেই অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। অনুপম একটি কথা বলিল না।

শঙ্কর বলিল, এক গ্লাস জল দিন তো, বড়ো তৃষ্ণা পেয়েছে।

আশালতা বলিল, শরবত খাবেন ? আমি যে শরবত তৈরি কবি—একেবারে অমৃতের মতো।

আশালতা অমৃতের মতো শরবত তৈরি করিয়া আনিতে গেল এবং শঙ্কর ও অনুপম চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল পরস্পরের মুখের দিকে।

মিহি ও মোটা কাহিনি

টিকটিকি

দোতলা বাড়ি। শহরের যে অঞ্চল বেজায় শহুরে বলে খ্যাত সেইখানে। তিনদিকে গাদাকরা বাড়ির চাপ, একদিকে রাজপথের চটুল ফাজলামি, আবেষ্টনীকে লক্ষ করলে সন্দেহ হয়, সমস্তটাই বুঝি হাই মায়োপিয়ার লীলা। তাছাড়া, এমন চেহারা বাড়িটার যে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা অসবর্ণ রহস্যের মতো কুৎসিত। সস্তা মেয়েমানুষ যেন পথিকের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, আমি ভীরু ও সরলা খাঁটি গাঁয়ের মেয়ে, তবে অসতী। বেআবরু সমতল পিঠে পুরানো বাদামি রঙের আবরণটা চোখেই পড়তে চায় না, প্রাচীনতার ছাপ এত বেশি।

দোতলা বাড়ি বটে, একতলা-দোতলায় কিন্তু সিঁড়িব যোগাযোগ নেই। তিনটি সদর দরজার ডাইনেরটি দিয়ে ঢুকলেই খাঁচাবন্দী দোতলার সিঁড়ি। অকারণ নড়াচড়ার একটু স্থান অবশ্য আছে, কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠা অথবা পথে ফিরে-যাওযা ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই কোনো দিকেই। দোতলায় থাকেন ইতিহাসের প্রফেসার, সদর দরজাটির পাশে ছোটো পিতলের ফলকে যিনি এম এ। একতলায় থাকেন জ্যোতিষার্ণব, বাকি দুটি সদর দরজার উপরে কাঠের ফ্রেমলাগানো রঙিন টিনের মস্ত সাইনবোর্ডে যিনি প্রথিতযশা। দুটি দরজাই একটি ঘরের, যার বেশিব ভাগ জ্যোতিষার্ণবের গণনালয়, বাকিটুকু অন্দরের প্যাসেজ। তিনটি সদর দরজার মাঝেরটি দিয়ে ঢুকলেই ডাইনে দোতলার সিঁড়ি-আড়াল-কবা দেয়াল আর বাঁয়ে দুটি বই-ভরা আলমারির বেআবরু পিঠ। এগিয়ে এগিয়ে যখন অন্দরের দবজা ডিঙিয়ে জ্যোতিষার্ণবের আবছা অন্ধকাব স্যাঁতসেঁতে অন্দরে পদার্পণ না করে প্রায় আর উপায় থাকে না, তখন দেখা যায়, আলমারিব দেয়াল একেবারে অন্দরের দেয়ালে গিয়ে ঠেকেনি, ফাঁক আছে হাতখানেক। এই ফাঁকটুকু দিয়ে জ্যোতিষার্ণব নিজে আর তার নিজের লোক অন্দর থেকে গণনালযে যাতায়াত করে।

বাইরের লোক আসে তিন নম্বর সদর দরজা দিয়ে। এসে ডবল চৌকির ময়লা ফরাশেই হোক আর অয়েলক্লথ-মোড়া টেবিলেব সামনে কাঠেব চেয়াবেই হোক, বসে। বসে চারিদিকে তাকায়, বিশ্বাস-অবিশ্বাস শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা আশা-নিবাশাব ভারে বিব্রত চোরের মতো। যা চোখে পড়ে তাই মনকে নাড়া দেয়, দেয়ালেব টিকটিকি পর্যন্ত। সস্তা মেয়েমানুষ যেন সমস্ত পরপুরুষের দৃষ্টি নিয়ে নিজের সমালোচনা কবছে, আমার কী উপায় হবে ?

আসলে, এ ছাড়া প্রশ্নও নেই জগতে। সব কিছুতে এই সমস্যাব ছাপ মারা। ভবিষ্যৎ কি সব কিছুকে গ্রাস করে নেই ?

জ্যোতিষার্ণবের কপালে চন্দনেব ফোঁটা দেবার সময় তার ছেলেমেয়ের মা মাথা কাত করে, চোখ উলটে দেয়, মোটা আলগা ঠোঁট দুটিকে টান করে হাসে। জ্যোতিষার্ণবের অপরাধ, সাতবছর আগে এই ভঙ্গি তাকে ভুলিয়েছিল। তবে, কেবল ভঙ্গি নয়। সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করে, আমি মরলে তোমার কী উপায় হবে ?

জিজ্ঞাসা করে সকালবেলা আর মবে যায় সেই সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে, তবু মনে হয় প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করেই যেন সে মরে গেল।

অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ যার নখদর্পণে, সেও বুঝতে পারে না ব্যাপারখানা কী। তার ছেলেমেয়ের মা মবণের কথা বলবে মনে করার আগেই মাথার উপর কড়িকাঠে যে টিকটিকিটার

লেজ নড়তে আরম্ভ করেছিল, তার ছেলেমেয়ের মা মরণের কথা বলার পরে সেই টিকটিকিটাই যে আরেকটা টিকটিকিকে তার ছেলেমেয়ের মা হতে ডেকেছে, এইটুকু কেবল জ্যোতিষার্ণব জানে না। কিন্তু তাতে কী এসে যায় ? আর সব তো তার জানা আছে, যা কিছু মানুষের জানা দরকার। ওই জ্ঞানটুকু লাভ করলেই কী তার মনের এ ধাঁধা মিটে যেত যে, তার ছেলেমেয়ের মা মরবে বলে টিকটিকিটা ডেকেছিল, অথবা টিকটিকিটা ডেকেছিল বলেই তার ছেলেমেয়ের মা মরে গেছে ?

ছেলেমেয়েরা ছোটো। বড়ো ছেলেটি প্রথম ভাগের বানান শেখে, ছোটো ছেলেটি শেখে কথা বলতে। এদের মাঝখানেরটি মেয়ে, বোবা বলে সে কথা বলতে শেখেনি। মার সম্বন্ধে তাই প্রশ্ন করে শুধু বড়ো ছেলেটি।

মা কোথায় গেছে বাবা ?

স্বর্গে।

বলে প্রমাণের জন্য জ্যোতিষার্ণব কান পেতে থাকে। টিকটিকি বাড়িতে আট-দশটার কম নয়, কিন্তু একটাও জ্যোতিষার্ণবের কথায় সায় দেয় না। নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে বোকা মনে করার লজ্জায় করুণভাবে একটু হেসে জ্যোতিষার্ণব নিজে নিজেই কয়েকবার মাথা নাড়ে। স্বর্গে যদি গিয়েও থাকে তার ছেলেমেয়ের মা, এতদিনে সেখানে পৌঁছে গেছে। অতীত ঘটনার সঙ্গে কী সম্পর্ক টিকটিকির যে তার ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে গেছে সে এ কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে সায় না দিয়ে টিকটিকি থাকতে পারবে না ? তা ছাড়া, স্বর্গে যাওয়া-না-যাওয়া তো জীবনের ঘটনা নয় মানুষের। মরে মানুষ যে স্বর্গে যায় ইহলোকে কি সে স্বর্গ আছে ? স্বর্গই নেই ইহলোকে !

মনে মনে এত গভীর ও জটিল যুক্তিতর্ক নাড়াচাড়া করেও কিন্তু সন্দেহ যায় না। তাব ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে যায়নি বলেও তো চুপ করে থাকতে পারে ত্রিকালদর্শী টিকটিকিগুলি ? স্বর্গে গিয়ে থাকলে অন্যগুলি না হোক, যে টিকটিকিটা তার ছেলেমেয়ের মার মৃত্যুর কথা ঘোষণা কবেছিল, সেটা অন্তত একবার ডেকে উঠত। হোক না অতটুকু জীব, একবার যে অতখানি জ্ঞানেব পরিচয় দিয়েছে তার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই ? জ্যোতিষার্ণবের বিপদ এই সে জানে তার ছেলেমেয়ের মার স্বর্গে যাওয়া নিষেধ। অবিবাহিত বউদের জন্য স্বর্গ নয়। কিন্তু কুমারী জীবন থেকে একজন পুরুষের সঙ্গে যারা জীবন কাটিয়ে দেয় তাদের জন্যও কি স্বর্গে যাওয়ার কড়া ব্যবস্থা একটু শিথিল হয় না ? তার ছেলেমেয়ের মার পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে এইটুকুই আশা-ভরসা জ্যোতিষার্ণবের।

মার জন্য ছোটো ছেলেটা ককায়। মেয়েটা বোবাকান্না কাঁদে। বড়ো ছেলেটা কাঁদে আর জিজ্ঞাসা করে, মা কোথায় গেছে বাবা ?

জিজ্ঞাসা করে গণনালয়ে, তিনজন ক্লায়েন্টের সামনে। জ্যোতিষার্ণব দেয়ালে টাঙানো যোগিনীচক্রের পাশে নিস্পন্দ টিকটিকিটার দিকে একবার তাকিয়েই উঠে দাঁড়ায়। ক্লায়েন্টদের সবিনয়ে বলে, একটু বসুন, আসছি।

বলে ছেলেকে নিয়ে অন্দরে শোবার ঘরে ঢুকে দেয়ালে আর সিলিং-এ ব্যাকুল দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়ায় তার টিকটিকিকে। সে দিন ঘরে যা কিছু ছিল আজও তার সবই আছে, কেবল নেই শৃঙ্খলা আর সেই টিকটিকিটা। শৃঙ্খলা সত্যই নেই, শৃঙ্খলা লুকিয়ে থাকে না, কিন্তু টিকটিকি তো ফাঁকে-ফোঁকরে জিনিসপত্রের আড়ালে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে, অতটুকু জীব টিকটিকি ? একটু আশ্বস্ত হয় জ্যোতিষার্ণব। ছেলেকে বলে, কী বলছিলি তুই খোকা ?

বাপের কোলে উঠে ছেলের মন এতক্ষণে শান্ত হয়েছে।

কখন বাবা ?

আপিসে ঢুকে কী বললি না আমাকে ?

কিছু বলিনি তো।

ছোটোবোন আর ভাইটি বাপের যে লোমশ বুকখানায় আজকাল রাজত্ব করে, সেখানে উঠে স্মৃতিভ্রংশ হবার বয়স খোকার পার হয়ে যায়নি। তবে বয়সের তুলনায় ওজনটা তার হয়েছে অস্বাভাবিক। ছেলেকে জ্যোতিষার্ণব মেঝেতে নামিয়ে দেয়। মৃদুস্বরে সন্তর্পণে বলে, তোর মার কথা কী জিজ্ঞেস করলি না ?

মা কোথায় গেছে বাবা ?

বোমা নিয়ে খেলা করবার মতো অসহায় সাহসের সঙ্গে জ্যোতিষার্ণব বলে, নরকে। বলে কান পেতে থাকে। কানে আসে ছোটো ছেলেটার কান্না, দোতলায় ইতিহাসের প্রফেসারের স্ত্রীর হঠাৎ গাওয়া দু লাইন গান, রাজপথের চটুল ফাজলামি।

বড়ো ছেলেটা বাপের মুখ দেখেই বোধ হয় কেঁদে উঠবার উপক্রম করেছিল।

জ্যোতিষার্ণব চোখ রাঙিয়ে বলে, কাঁদিস না।

খোকা কাঁদে না।

শোন, আমি ভুল বলেছি। তোর মা এখনও নরকে যায়নি, যাবে। বুঝলি? যাবে, ভবিষ্যতে যাবে।

আবার জ্যোতিষার্ণব কান পেতে থাকে। বড়ো ছেলেটা কেঁদে-ওঠা মাত্র হাত চাপা দেয় তার মুখে। কানে আসে ছোটো ছেলেটার থেমে-আসা ছাড়া-ছাড়া কান্না, দোতলায় ইতিহাসের প্রফেসরের থেমে-আসা দুলাইন গানের দুর্বোধ্য গুনগুনানো সুর, রাজপথের চটুল ফাজলামি আর টিকটিকির ডাক।

সেই টিকটিকিটার নয়। সে যাকে সেদিন তার ছেলেমেয়ের মা হতে ডেকেছিল, সেটার। দুটি টিকটিকির আকারে, চামড়ার রঙে, চালচলনে পার্থক্য অবশ্য আছে অনেক, কিন্তু সব টিকটিকিরই এক রা।

মনে যার ব্যথা থাকে তার শখ চাপে মনের কথা বলবার। মনের ব্যথা যে মনকে কামড়ায় এটা তার একটা লক্ষণ। ছেলেমেয়ের মা যার নরকে যাবে, মনে তার ব্যথা থাকা স্বাভাবিক। জ্যোতিষার্ণব তাই হাত দেখাতে, ঠিকুজি মেলাতে, ভাগ্য গণাতে, মাদুলি-কবচ বিধান-ব্যবস্থা নিতে, পূজা-পার্বণ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন নির্বাহের আহ্বান জানাতে যারা আসে, তাদেরও যেমন মনের কথা বলে, শুধু দেখা করতে যে বন্ধুরা আসে তাদেরও তেমনই মনেব কথা বলে। জ্যোতিষ-বচনের মতো মনেব কথা বলার কথা তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। এ যুগের মানুষের অবিশ্বাসপ্রবণতা দিয়ে আরম্ভ করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও যে কেউ কিছু বিশ্বাস করতে চায় না, এ পর্যন্ত আসতে আসতে জ্যোতিষার্ণবের মুখ বড়ো বিমর্ষ হয়ে যায়। গভীর আর্ত বিষাদের ছাপ। তা ছাড়া গলাও কাঁপে। ফরাশে বা চেয়ারে যেখানেই তার শ্রোতা বসে থাক, কথার চেয়ে কথার সুর আর জ্যোতিষার্ণবের চেয়ে তার মুখের ভাব শ্রোতাকে বিচলিত করে বেশি। জ্যোতিষার্ণবের ভন্ডামিতে আর যেন বিশ্বাস থাকে না, অন্তত তখনকার মতো।

প্রমাণ ? বিশ্বাসের জন্য প্রমাণ চাই? আমার নিজের জীবনেই কত বড়ো বড়ো প্রমাণ ঘটেছে। এই তো সেদিন আমার স্ত্রী মারা গেলেন, আমি কি জানতাম না তিনি ওই দিন ওই সময় মারা যাবেন ?

জানতেন ?

গণনালয়ের টিকটিকিটা সব সময় নিজেকে প্রকাশ করে রাখে। হস্তরেখার প্রকাণ্ড ম্যাপ, রাশিচক্র, বর্ষচক্র, পতাকীচক্র, যোগিনীচক্রের ছবি সুকেশিনীর ছবিযুক্ত কেশতৈলের দেয়ালপঞ্জি-বিজ্ঞাপন, দেয়ালে-বসানো তাক, জানালার চতুষ্কোণ গহ্বর, ফাঁকা দেয়াল, ছাদ, কড়িবর্গার আড়াল, সমস্ত জায়গা পাঁতিপাঁতি করে খুঁজে তাকে আবিষ্কার করতে হয় না, এদিক ওদিক একটু তাকালেই

নজরে পড়ে। জ্যোতিষার্ণব খানিকক্ষণ আনমনে তাকিয়ে থাকে টিকটিকিটার দিকে, তার পর মাথা হেলিয়ে বলে, প্রথমে জানতাম না। নিজের লোকের মৃত্যুর দিন গণনা করতে নেই, মানুষের মন তো, মন বিচলিত হয়ে পড়ে। সেদিন সকালবেলা হল কী, তামাশা করে আমায় বললেন, আমি মরে গেলে তোমার কী উপায় হবে ? মানে, সংসার তো এক রকম চালাতেন তিনি, তাই হঠাৎ পরিহাস করে বললেন আর কী যে, তিনি যদি মরে যান এ সব কাজকর্মই বা কে করবে, ছেলেমেয়ে মানুষই বা কে করবে। যেই বললেন কথাটা, সঙ্গে সঙ্গে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল।

টিকটিকি ?

হ্যাঁ, টিকটিকি। মনে কেমন খটকা বাধল। হস্তরেখা বিচার করে ওর বয়স জিজ্ঞেস করলাম। বয়স অবশ্য আমি জানতাম, বিয়ের সময় থেকেই জানতাম, তবু জিজ্ঞেস করলাম। তারপর বললাম, তোমার কুষ্টিটা বার করো তো, কালো তোরঙ্গের তলায় আছে। উনি হাসতে হাসতে কুষ্ঠি বার করে দিলেন। তখনও আমার মন বলছে, থাকগে কাজ নেই, মরণ যদি ওর ঘনিয়ে এসে থাকে, কী হবে আগে থেকে জেনে ? লাভ তো কিছুই হবে না, মাঝখান থেকে কিছুদিন অতিরিক্ত মনঃকষ্ট ভোগ করব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণনা না করে পারলাম না। গণনাব ফল দেখে মাথা ঘুরে গেল। সেদিন গোধূলি বেলা পর্যন্ত ওর আয়ু। ওঁর দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন একটা শবের দিকে তাকিয়ে আছি, ঠিক পিছনে আবছা মতন—

শ্রোতা স্তব্ধ। গলা শুকিয়ে গেছে। ভয়ে নয়, প্রকৃত তৃষ্ণায়। কিন্তু এখন জল চাওযা যায় না।

জানতাম কোনো লাভ নেই, ওঁর বাবা ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান সত্যবাদী পণ্ডিত, তবু একবার জিজ্ঞাসা করলাম, বিয়েব সময় তোমার বয়স তো দু-একবছর কম করে বলা হয়নি ? কুষ্ঠি ঠিক আছে তো ? বিয়ের সময় যদি—থাকগে ও সব কথা। আপনাকে যা বলছিলাম, পার্শ্বমুখ নক্ষত্র—

নয়টি পার্শ্বমুখ নক্ষত্রের একটির নাম রেবতী। ছমাস পরে জ্যোতিষার্ণব ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য রেবতীকে বিয়ে করে আনে। মরে গেলে স্বর্গে যাবার অধিকার নিয়েই রেবতী এ বাড়িতে আসে বটে, বাড়িতে কিন্তু একটিও টিকটিকির দেখা সে পায় না।

তবু, সাবধানের মার নেই ভেবে জ্যোতিষার্ণব বউকে সতর্ক কবে দেয়, দ্যাখো, কোনোদিন মরার কথা মুখে এনো না।

রেবতী তখনও পার্শ্বমুখী, সোজা জ্যোতিষার্ণবের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। জ্যোতিষার্ণব হরদম তাকায়। নিজে যোটক বিচার করে সে রেবতীকে বিয়ে করেছে। বিপদ দুজনের নক্ষত্র নিয়ে। তার নিজের শতভিষা নক্ষত্র আর রেবতীর উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র তাদের মিলনকে করেছে রাক্ষস ও নরের মিলনের মতো।

এখন এই যে জ্যোতিষার্ণব, আমি এর জীবনে উদিত হয়েছিলাম, কী এই আমার জীবনে উদিত হয়েছিল, আজও আমি এ সমস্যার মীমাংসা করতে পারিনি।

কত আর বয়স তখন আমার হবে, রেবতীর চেয়ে অনেক ছোটো। কিছুদিনের জন্য থাকতে গিয়েছি ইতিহাসের প্রফেসরের বাড়ি, কী ভীষণ ভাবটাই যে হয়ে গেল রেবতীর সঙ্গে। বয়সের তুলনায় কী প্রকাণ্ড তখন আমার দেহ, কত পরিণত মন,—কারও স্ত্রীর সঙ্গে ভাব হওয়াটাই তখন আমার পক্ষে পরমাশ্চর্য। অথচ রেবতীর সঙ্গে সারাদিন এত বেশি কড়ি আর তাস খেলতাম যে ইতিহাসের প্রফেসরের স্ত্রী অভিমানে আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলত না।

তাতে আমার সুবিধাই ছিল। আমায় যে ভালোবাসে তার সঙ্গে কথা বলতে আমার বড়ো কষ্ট হয়। মনে হয়, শব্দ দিয়ে অনেক দামি কী যেন আদায় করে নিচ্ছি।

আমি রেবতীব সঙ্গে কড়ি খেলি, জ্যোতিষার্ণব দুবার ঘুরে গিয়ে তৃতীয়বার কাছে এসে উবু হয়ে বসে।

দেখি হে ছোকরা, তোমার হাতটা। আরে বাস রে, এ কী হাত, এত হিজিবিজি রেখা পেলে কোথায় ? ভাল করে দেখতে হবে তো হাতটা তোমার। বাঁচবে অনেকদিন, তবে—

রেবতী আমার হাত কেড়ে নেয়।

খুব হয়েছে, ছেলেমানুষকে ভয় না দেখালেও চলবে।

অন্দর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় গণনালয়ে জ্যোতিষার্ণব আমায় পাকড়াও করে, শোনায় ভূতের গল্প। প্রথমে কান দিয়ে আরম্ভ করে শেষে লোমকূপগুলিকেও শোনার কাজে লাগিয়ে দিই। ক্ষুধাতৃষ্ণার তাগিদটা চাপা পড়ে যায়, তাকিয়ে দেখি রেবতী এসে আলমারির পাশের ফাঁকটাতে দাঁড়িয়ে আছে।·

জ্যোতিষার্ণবেব গল্প শেষ হতে বলি, আরেকটা।

রেবতী ম্লান মুখে চুপ করে থাকে।

জ্যোতিষার্ণব হাসির ভান করে বলে, এ বাড়ির টিকটিকিগুলি যদি মেরে ফ্যালো, তা হলে বলব। একটা টিকটিকির জন্যে একটা গল্প। এ ঘবেই তো তিনটে আছে, লাঠিটা দিয়ে মার না একটা ?

আমি বলি, লাঠি দিয়ে বুঝি টিকটিকি মাবে ? দাঁড়ান, আমার তির-ধনুক নিয়ে আসি।

রেবতী বলে, মানিক, মেবো না, টিকটিকি মাবতে নেই।

আমি একটু দাঁড়াই। হিসাব করে দেখি যে, বেবতীব মতো মেয়ে যখন একবার আমাকে ভালোবেসেছে, কথা না শুনলেও ভালো না বেসে সে পাববে না, আমার সঙ্গে কড়ি আর পাতাবিন্তি খেলবাব জন্য সে যে বকম পাগল হয়ে উঠেছে, সে পাগলামি যাবাব নয়। গল্প না বলে আমায় কষ্ট দেবার সুযোগ পেলে জ্যোতিষার্ণব কিন্তু কিছুতেই সে সুযোগ ছাড়বে না। সোজা দোতলায় গিয়ে আমাব বাঁশেব ধনুক, আব শরেব তির নিয়ে আসি। তির আমার সাংঘাতিক মারণাস্ত্র, ডগায় দুটি আলপিন বসানো আছে।

এককোণে একটা টিকটিকি ছিল, ফরাশে উঠে দাঁড়ালে আমার তিবেব আযত্তে আসে এইবকম স্থানে। নিস্পন্দ শরীর, নিষ্পলক চোখ, ধূসর জীবটিকে দেখলেই মায়া হয়।

রেবতী আবাব বলে, মানিক, মেরো না, মারতে নেই।

রেবতীকে আমি ত্যাগ করিনি, কিন্তু তাব কথার কোনো দাম আমার কাছে নেই। আকর্ণ সন্ধান কবে চার ইঞ্চি তফাত থেকে বাণ নিক্ষেপ কবি। এমন আশ্চর্য জীব টিকটিকি যে শিকাবিকে গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখলেও নড়ে না।

বাণবিদ্ধ টিকটিকি নীচে পড়ে যায়। বাণটি টেনে খুলে নিয়ে দেখি, দুটি আলপিন বিঁধে টিকটিকিটার চোখের পাশে দুটি রক্তের ফোঁটা জমেছে—যেন নূতন দুটি চোখ। মানুষের রক্তের মতো লাল রক্ত টিকটিকির নয়—

জ্যোতিষার্ণব হাসি চেপে হাসতে আরম্ভ করে।

চারচোখো করে দিলে ! টিকটিকিকে চারচোখো কবে দিলে ! তোমাকেও চারচোখো হতে হবে মানিক।

সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে কোথায় যেন একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে। কে জানে বাণবিদ্ধ টিকটিকির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ! ছেলেমেয়ের বাপ-মা হবাব জন্য তারা যদি পরস্পরকে কোনোদিন ডাকাডাকি করে থাকে, সে খবর কেবল তারাই জানে।

রেবতী নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে বলে, ফের ? ফের ছেলেমানুষকে ভয় দেখাচ্ছ ? বলে জ্যোতিষার্ণবের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে নিজেই ভয়ে মুষড়ে যায়।

স্কুলে বোর্ডের লেখা দেখতে না পাওয়ায় একমাসের মধ্যে আমাকে চশমা নিতে হয়। চশমা চোখ নয়, কিন্তু বন্ধুরা আমায় চারচোখো বলে কত যে তামাশা করে ঠিক নেই।

তারপর ইতিহাসের প্রফেসরের বাড়িতে আমি কোনোদিন যাইনি। চারচোখে রেবতীকে একবার চোখেও দেখিনি। রেবতীর কথা মনে হলেই সেই বাণবিদ্ধ টিকটিকিটার দুটি ধূসর চোখ, তার চোখ দুটির পাশে দুটি ফ্যাকাশে রক্তবিন্দুর ছবি মনে ভেসে আসে, দারুন বিতৃষ্ণায় আমার মন ভরে যায়। রেবতীর প্রতি বিতৃষ্ণা,—রেবতীর কোনো দোষ ছিল না, তবু।

হয়তো রেবতী জ্যোতিষার্ণবের ছেলেমেয়ের মা হয়েছে। হয়তো টিকটিকির জন্য জ্যোতিষার্ণবের প্রথম ছেলেমেয়ের মা স্বর্গে যেতে না পারলেও, টিকটিকির জন্যই রেবতীর স্বর্গে যাবার পথ বন্ধ হবার বিপদ কেটে গিয়েছে এবং স্বর্গে যাবার প্রতীক্ষায় সে পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ ভোগ করছে।

এদিকে আমার বেড়েছে চশমার পাওয়ার। কখনও দেয়ালের টিকটিকি না দেখবার ইচ্ছা হলে আমার চোখ বুজতে হয় না—চশমাটা খুলে ফেললেই চলে।

বিপত্নীক

কার্তিকের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাত। ঘুম ভেঙে আমি প্রকাণ্ড একটা হাই তুললাম। কাল রাত্রে গাঢ় ঘুম হয়েছে। চোখ মেলে ঘরের সিলিং-এ কালো কড়িকাঠটার পাশে একটা টিকটিকিকে আবিষ্কার করে খানিকক্ষণ অলস অর্থহীন দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলাম। আজ রবিবার, উঠবার তাড়া নেই। আর ঘুমানো যাবে না বটে, কিন্তু চুপচাপ আরও ঘণ্টাখানেক বিছানায় পড়ে থাকার কল্পনাতেই প্রচুর তৃপ্তি বোধ করলাম।

বিছানার ডানদিকের অংশটা খালি। সবিতা সকালে কখন বিছানা ছেড়ে উঠে যায়, আমি কোনোদিনই প্রায় তা জানতে পারি না। আমার ঘুম ভাঙতে ভাঙতে সবিতার বাসনমাজা শেষ হয়ে রান্না চেপে যায়। অত ভোরে কী করে যে মানুষ ওঠে ! ভোরবেলা বিছানায় শুয়ে থাকার আরামটুকু থেকে প্রত্যেকদিন নিজকে বঞ্চিত করেও সবিতাকে বেশ খুশিই দেখতে পাই। মুখ ধুয়ে উঠতে না উঠতে চা জলখাবার এনে দিয়ে সে যে কথাটি বলে, তাতে বোঝা যায়, রাত্রির অন্ধকার কেটে যাওয়ার পর এক মিনিট চিত হয়ে জেগে পড়ে থাকার মতো কষ্টকর ব্যাপার, সবিতার মতে, জগতে আর নেই।

ডান হাতটি আলস্য ভাঙার ভঙ্গিতে বিছানার শূন্য অংশে প্রসারিত করে দিলাম। সবিতার অঙ্গের উত্তাপ উপে গিয়ে বিছানা ঠান্ডা হয়ে আছে।

হঠাৎ আমাব মনে পড়ে গেল, কাল রাত্রে সবিতার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম।

এতক্ষণ এ কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। মনে পড়ামাত্র রৌদ্রহীন শীতল প্রভাতে সমস্ত রাত্রিব্যাপী গাঢ় নিদ্রার জের টেনে চলার আনন্দ এক মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে গেল। আরামে এলানো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজের অজ্ঞাতেই গুটিয়ে সংকুচিত করে নিলাম।

কী কটু কলহই কাল আমরা করেছিলাম !

আমরা করেছিলাম ? কথাটা বিবেচনা করে দেখবার সময় না নিয়ে খুব সংক্ষেপেই নিজেকে জবাব দিলাম,—না। ঝগড়া বলি, কলহ বলি, কাল আমি একাই সব করেছিলাম। মাঝে মাঝে ক্ষীণ করুণ প্রতিবাদ করে কাঁদা ছাড়া সবিতা তাতে আর কোনো অংশগ্রহণ করেনি। কাল আমাদের মধ্যে যে ব্যাপার ঘটেছিল, চাপড়া চাপড়া রং চড়িয়েও তাকে দাম্পত্য কলহ কোনোমতেই বলা যায় না।

সবিতাকে কাল আমি করেছিলাম শাসন।

মনের মধ্যে তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে অত্যন্ত হিংস্রভাবেই ওকে কাল আক্রমণ করেছিলাম। যা মুখে এসেছে অবাধে কাল তাই সবিতাকে বলেছিলাম। যে বিশেষণ যত বেশি রূঢ় যত বেশি কদর্য মনে হয়েছে তাই দিয়ে ওকে অভিহিত করে কাল আমার আনন্দ হয়েছে তত বেশি। মেয়েদের একেবারে মর্মে গিয়ে আঘাত করে মানুষের ভাষায় এমন শব্দ যত আছে তার একটিও কাল বোধ হয় ব্যবহার করতে বাকি রাখিনি। শেষে রাগ সামলাতে না পেরে পায়ের এক পাটি চটিজুতো ওকে ছুড়ে মেরেছিলাম।

সেইখানেই ইতি। দুহাতে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে সবিতা তখন কাঁদছিল। চটিটা সজোরে তার কান্নায় ফুলে-ওঠা বুকে গিয়ে লাগল। চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে সবিতা তখন একবার জুতোটার দিকে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। দুচোখ তার জলে ভরপুর, সবিতা

কী দেখেছিল বলতে পারব না। কিন্তু তার মুখে যে ভাব দেখেছিলাম এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তবু, রাত্রে গাঢ় ঘুম হতে বাধা হয়নি। সবিতাকে শাসন করার জন্য না হোক, জুতা খেয়ে তার অবর্ণনীয় মুখভঙ্গি দেখার জন্যও না হোক, যে কারণে কাল ও রকম খেপে গিয়ে স্ত্রীকে শাসন করেছিলাম সারারাত কণ্টকশয্যায় তাকে জাগিয়ে রাখাব পক্ষে তাই কি যথেষ্ট ছিল না ? এইমাত্র মনের মধ্যে যে নিবিড় শান্তি অনুভব করছিলাম তা স্মরণ করে অবাক হয়ে গেলাম স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করে যে স্বামী রাত্রে স্ত্রীকে চটিজুতো ছুঁড়ে মারে, সারারাত অঘোরে ঘুমিয়ে সকালে চোখ মেলেই কী কবে সে অত আরাম বোধ করে ? পৃথিবীতে শীতের আমেজ এসেছে টের পেয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠে ?

ঘুম ভেঙেই আমার অনুতপ্ত হয়ে ওঠা উচিত ছিল। কাল বাড়াবাড়ি করেছিলাম বইকী ! নিছক একটা সন্দেহের উপর অত কাণ্ড করার কোনো সমর্থনই শান্ত মনে কথাটা ভেবে দেখতে গেলে খুঁজে বার করা যায় না। স্ত্রীকে অবশ্য মাঝে মাঝে শাসন করা ভালো। বড়ো পাজি জাত। কেবল আদব দিলে একেবারে মাথায় উঠে যায়। কিন্তু শাসনের যে একটা মাত্রা থাকা দরকার, এটা অস্বীকার করব কেন ? সবিতাকে তো কম ভালোবাসি না। এই যে দশটা থেকে পাঁচটা অবধি আপিসে কলম পিষে মরি, সে কার জন্য ? সবিতাব জন্য নয় কি ! ওর ভালোব জন্যই ওকে মাঝে মাঝে শাসন করা প্রয়োজন। কাল কিছু না বলে চুপ করে থাকলে শেষ পর্যন্ত ওবই তো ক্ষতি হত ! নিজেব ভালোমন্দ মানুষ সব সময় বুঝতে পারে না। বিশেষত মেয়েমানুষ। ভুলত্রুটি দেখিয়ে দিলে, ভুল সংশোধনের জন্য একটু বকলে তাতে ওদের মঙ্গলই হয়।

কিন্তু অতটা না করলেই হত। অন্তত ঘুমিয়ে পড়ার আগে সহজভাবে ওর কাছে এক গ্লাস জলটল চেয়ে নিয়ে অথবা পা কামড়াচ্ছে বলে দু-চার মিনিট ওকে একটু সেবা কবতে দিয়ে ব্যাপাবটা স্বাভাবিকতার স্তরে নামিয়ে আনলে কোনো ক্ষতিই ছিল না।

পাশ ফিরলাম। তাকিয়ে দেখি, সবিতাকে ছুঁড়ে মারা জুতোব পাটিটা কাল বাত্রে যেখানে পড়েছিল, সেইখানেই এখনও পড়ে আছে। মনে হল, এতক্ষণ আমাব যেন সত্যসত্যই একটু অনুতাপ হচ্ছে।

কিন্তু সান্ত্বনা খুঁজে নিতেও দেরি হল না। যা হবাব হয়ে গিয়েছে। হাত থেকে খসে-যাওয়া ঢিল আর মুখ থেকে খসে-যাওয়া কথাব মতো আব ফিরবে না। দুঃখ বা অনুতাপ করে লাভ নেই। শুয়ে শুয়ে আরাম কবাটা আজ আব কপালে হল না। উঠে গিয়ে সবিতাকে একটু খুশি করতে হবে।

সবিতাকে একটু খুশি কবার জন্য কী পদ্ধতি অবলম্বন করব শুয়ে শুয়ে তাই ভাবতে লাগলাম। ক্ষমাটমা চাইতে পারব না। স্ত্রীর কাছে দুঃখ প্রকাশ, মার্জনা ভিক্ষা,—এ সব আমার ধাতে নেই। ভাবলেও কী রকম সংকোচ বোধ হয়, বাধোবাধো ঠেকে। কাল রাত্রের কথাটা উত্থাপনই করব না। কাল যেন সবিতাকে কিছু বলিনি এমনই একটা অভিনয় করে যাব। প্রতিদিন যেমন চটি ফটবফটর করে নীচে নামি আজও তেমনই শব্দ করে নীচে নামব, কলতলায় গলা খাঁকরে মুখ ধোব। সাড়া পেয়ে উনান থেকে হাঁড়ি নামিয়ে সবিতা চায়ের কেটলি চাপিয়ে দেবে কিন্তু মুখ ধুয়ে আজ আর দোতলায় উঠে যাব না। একেবারে রান্নাঘরে হাজির হয়ে নিজেই একটা আসন টেনে নিয়ে বসব। গম্ভীর মুখে নয় মুখখানা বেশ হাসি-হাসি করে। সবিতা বিষণ্ণতা ও অভিমানে নিজেকে আচ্ছন্ন ও নির্বাক করে সামনে খাবার দিলে খেতে খেতে এ কথা বলব, সে কথা বলব। সবিতা ভালো কবে জবাব না দিলেও কিছুই যেন লক্ষ করিনি এমনইভাবে নিজের কথার স্রোতকে অব্যাহত রেখে যাব।

সবিতা প্রথমটা নিশ্চয় একটু অবাক হয়ে যাবে। ভাববে, ব্যাপারখানা কী ? কাল রাতে আমাকে অমন করে যে গাল দিলে, সে সেধে এসে এত কথা কইছে ! তারপর একসময় সে বুঝতে পারবে তার গভীর অপরাধ স্বামী তার এবারের মতো ক্ষমা করেছে। কাল রাত্রের ব্যাপার কাল রাত্রেই চুকে গিয়েছে—আজ সকালে তার জের নেই। এটা বুঝতে পেরে সবিতাও ক্রমে ক্রমে সহজভাবে কথা বলতে আরম্ভ করবে। রাগ করে থাকার যার উপায় নেই, রাত্রের শাসন সকালে উঠে নতুন করে আরম্ভ করলেও যার বলার কিছু ছিল না, নিজে থেকে তাকে যেচে সহজভাবে কথা বলা সহজভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য স্বামীর প্রতি সবিতার ভক্তি জন্মে যাবে ! ভাববে, স্বামী আমার সদাশিব। যে অন্যায় করছিলাম বা করতে যাচ্ছিলাম, অন্য স্বামী হলে আমাকে একেবারে মেরেই ফেলত। আমার স্বামী একটু শাসন করেই ক্ষান্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সকালে উঠে এমনি করে আমার মান রাখল, আমার অভিনয়ের মর্যাদা দিল।

মুখে হয়তো সবিতা কিছুই বলবে না। মেয়ে তো চাপা নয় কম ! কিন্তু কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছলছল করবে। স্বামী প্রেমে স্বামী গর্বে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। স্বস্তি ও আনন্দ তার গৃহকর্মের সুচারু সম্পাদনায় স্পষ্ট রূপ নিয়ে ফুটে উঠবে।

উঠে বসলাম। অনুতাপ মিলিয়ে গিয়ে মন এখন খুশি হয়ে উঠেছে। কাল রাত্রে সবিতাকে তার প্রাপ্যের যতটুকু অতিরিক্ত শাসন করেছি, আজ তার তিনগুণ সোহাগ ফিরিয়ে দেব। যে সোহাগ করে, শাসনও তো সেই করে ! একটি মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে অন্যটি বেশি মাত্রায় দিলে ক্ষতিপূরণ হয়েও কিছু লাভ থাকতে কোনো বাধা নেই। সবিতার আজ লাভের কপাল।

এক পাটি চটি পায়ে দিয়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে গিয়ে সবিতাকে ছুঁড়ে-মারা চটিটা অন্য পায়ে লাগালাম। বাঁয়ে সবিতার ড্রেসিং টেবিল। আয়নাটা কুয়াশায় ম্লান হয়ে আছে। সবিতার এই বিলাসিতার ব্যবস্থা করেছি আমি। সবিতার বাপ যৌতুক দেয়নি। বাপের জন্মে সবিতা ড্রেসিং টেবিল দেখেছে কিনা সন্দেহ। ডাইনের আলনায় সবিতার রং-বেরঙের কাপড় সাজানো। কুয়াশায় কাপড়গুলির ভালো রং খোলেনি। এ সবও আমি কিনে দিয়েছি সবিতাকে, সবিতাকে ভালোবেসে কিনে দিয়েছি। সামনে বেঞ্চির উপর সবিতার বাক্সো, ক্যাশবাক্সো, সুটকেস, হারমনিয়াম। কুয়াশায় সবিতার এই সম্পত্তিগুলিকে কেমন যেন মন-মরা দেখাচ্ছে। সবিতার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা টাকায় এগুলি কেনা। চারিদিকে সবিতার প্রতি আমার উদারতার সংখ্যাতীত প্রমাণ দেখে, সবিতাকে যে অনন্যসাধারণ ভালোবাসা দিয়েছি এ বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে, আমি আরও গভীর তৃপ্তি বোধ করলাম। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, কাল রাত্রে ধৈর্য হারিয়েছিলাম কেন। সবিতাকে ভালোবাসি বলে। সবিতার প্রতি প্রেম আমার এত তীব্র যে ঈর্ষাও সেই অনুপাতেই প্রচণ্ড হয়। একটা মিথ্যা সন্দেহ পর্যন্ত তাই আমাকে একেবারে খেপিয়ে দেয়।

সবিতা ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেছে। দরজাটি খোলে, ঘেরা বারান্দায়। সেও একটি লম্বাটে ঘরেরই মতো। রাত্রে এই বারান্দায় দরজা বন্ধ করা হয়, কিন্তু ঘরের দরজাটি খোলাই থাকে। বন্ধ করার দরকার হয় না। সকালে বারান্দায় রাত্রিভোজনের এঁটো বাসন তুলে ধোয়ামোছার শব্দে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয় বলে সবিতা দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে যায়।

সবিতার ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় খানিকক্ষণ নিজের মুখখানা নিরীক্ষণ করে ভেজানো দরজা খুলে বারান্দায় গেলাম। প্রথমে চোখে পড়ল এঁটো বাসনগুলি তারপর সিঁড়ির বন্ধ দরজাটা—তারপর দোদুল্যমানা সবিতাকে।

উঠানের দিকে দুটো বড়ো বড়ো খোলা জানালা দিয়ে আলো আসছিল। এক মুহূর্তে বুঝতে পারলাম সবিতা গলায় দড়ি দিয়েছে।

পাশের বসবার ঘর থেকে হালকা টেবিলটা এনে তার উপরে চেয়ার পেতেও সে বোধ হয় কড়িকাঠের নাগাল পায়নি। তাই টেবিল চেয়ার একপাশে সরিয়ে রেখেছে। ছেলে হলে যে হুক থেকে সবিতার ছেলের দোলনা দুলত, দড়ি ছুঁড়ে ছুঁড়ে সবিতা তাতে দড়ি আটকেছে বোধ হয়। কিন্তু এ কাজে যে পরিমাণ অধ্যবসায় দরকার হয়েছিল, আত্মহত্যা করতে চাওয়ার উন্মত্ততা ছাড়া, ছুঁড়ে-ছুঁড়েই সে যে কড়িকাঠে দড়ি আটকে ছিল, তারও কোনো প্রমাণ নেই। হয়তো অন্য কোনো উপায়ে এই কাজকে সে সম্ভব করেছিল। রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে মানুষের ঘুমের আড়ালে যে মরতে যায়, বুদ্ধি হয়তো তার এমন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, অসম্ভব কাজকে সম্ভব করার এমন উপায়ই হয়তো সে আবিষ্কার করে ফেলে যে প্রত্যেকটি সকালে যারা ঘুম ভেঙে জীবিত অবস্থায় বিছানায় উঠে বসার আশা পোষণ করে, তারা সেই বুদ্ধির প্রক্রিয়াকে আবিষ্কার করার কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না।

গলায় ফাঁসিটা পরাবার আগে কাল সবিতা কী করেছিল জীবনে কখনও আমি তা জানতে পারব না ভাবতেও পারব না।

এই সমস্যাই যেন আমাকে বিচলিত করে দিল। সবিতা গলায় দড়ি দিয়েছে এটা বুঝতে আমার দেরিও হয়নি, অসুবিধাও হয়নি। কিন্তু কড়িকাঠের অত উঁচু হুকে সে দড়ি আটকাল কী করে, এটা বুঝতে না পেরে কাতর হয়ে পড়লাম। অসহায়ের মতো চারিদিকে তাকাতে লাগলাম। সবিতা গলায় দড়ি দিয়েছে বলে যেন নয়, গলায় দড়ি দেবার ঠিক আগের কাজটিকে সে দুর্বোধ্য ও রহস্যময় করে রেখে গেছে বলেই আমার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে উঠল। সবিতা কী করে কড়িকাঠে তার মৃত্যুর আয়োজন করল এ কথাটা আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে ?

আত্মহত্যা করে সবিতা আমাকে সবই বুঝিয়ে দিয়ে গেল, এই একটা তুচ্ছ গোপনতার মোহ সে কাটাতে পারল না কেন ?

সবিতাকে আমি সবদিক দিয়েই চিনেছিলাম। সে কী খেতে ভালোবাসে, কোন গয়না, কী রঙের শাড়ি তার পছন্দ, কী কথা বললে সে খুশি হয়, কোন বিষয়ে মনের সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে সে সুখ পায়, জীবনের কোন স্তরে সে অনায়াসে উদার হয়ে থাকে, এ সবই আমার জানা ছিল। সংসারে কার প্রতি তার কতটুকু মমতা আমি তার হিসাব রাখতাম। অলস কল্পনার মুহূর্তগুলি ছাড়া ওর স্বামীপ্রেমের গভীরতাও আমি নির্ভুলভাবে পরিমাপ করতে পেরেছি। সবিতা ছিল আমার অতিজানা অতিচেনা বউ।

কাল ওর সম্বন্ধে যে বিষয়ে আমার জ্ঞান ছিল না কিন্তু সন্দেহ ছিল, আজ সবিতা আত্মহত্যা করে সে বিষয়েও আমাকে পরিপূর্ণ জ্ঞান দিয়েছে। সন্দেহ আমার মিথ্যা নয় এই সত্য প্রকাশ করে যেতে গলায় সবিতা দড়ি দিয়েছে বলে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু দড়িটা হুকে সে আটকাল কী করে ?

ছায়া

আমার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর কিছুদিন আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। সময়মতো স্নানাহার করতাম না, ঘরের কোণ ছেড়ে বাইরে আসতাম না, দিনরাত পরলোকতত্ত্বের বই পড়তাম আর চুপচাপ বসে আকাশ-পাতাল ভাবতাম।

স্ত্রীকে আমি এত ভালোবাসতাম যে, শ্মশানে নিজে মুখাগ্নি করে তাকে পুড়িয়ে এসেও আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না, সে সত্যসত্যই বাষ্প আর ভস্মে পবিণত হয়ে গেছে, জগতের কোথাও সে আর নেই। আমার মনে হত, সে ফিরে আসবে ; আবার আমি তার দেখা পাব।

বাড়িতে বেশি লোক থাকলে আসতে সে পাছে কুণ্ঠা বোধ করে এই জন্য আত্মীয়স্বজন সকলকে আমি দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পার্থিব কোনো সুখ-সুবিধার দিকে আমার নজর ছিল না। একটা ঝি আর একটা ঠাকুর রেখে দিয়েছিলাম, তারা যা ব্যবস্থা করত আমি তাই মেনে নিতাম। কোনো বিষয়ে তারা হুকুম নিতে এলেই বরং আমি এমন বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতাম যে তারা সভয়ে আমাকে পরিহার করে চলত। একটা ঘরে আমার স্ত্রীর পাঁচখানা ছোটো-বড়ো ফটো, তার জামা-কাপড়, চুলবাঁধার সরঞ্জাম, পায়ের জরিবসানো চটি, হিসাব-লেখার খাতা, এমনই সব হাজার বকম স্মৃতিচিহ্ন জড়ো করে দিনের বেলাটা আমি সেই ঘরে কাটিয়ে দিতাম। সন্ধ্যার সময় যেতাম আমার স্ত্রী যে-ঘরে মারা গিয়েছিলেন সেই ঘরে। যে-খাটে তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলেছিলেন, নিজের হাতে আমি তাতে বিছানা পেতে নিতাম। পাশপাশি বালিশ দিতাম দুটি। শুয়ে, বসে, বই পড়ে আর থেকে থেকে প্রত্যাশাব দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে রাতগুলি আমি একরকম জেগেই কাটিয়ে দিতাম।

এমনি ভাবে মাসখানেক কাটিয়ে পলকের জন্যও আমার স্ত্রীর দেখা না পেয়ে আমি যখন অল্পঅল্প হতাশ হয়ে উঠেছি, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর আমার খেয়াল হল যে, রোজ এ-ঘরে আলো জ্বেলে রাখি বলে তিনি হয়তো আসেন না। খেয়াল করা মাত্র তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে আমি আলো নিবিয়ে দিলাম।

আনন্দে আমার শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠল।

আলো নেবানো মাত্র আমি দেখতে পেলাম ছায়ার বূপ নিয়ে আমার স্ত্রী দেয়াল ঘেঁষে মেঝেতে বসে আছেন, তাঁর সূক্ষ্ম দেহ থেকে জ্যোতি নির্গত হয়ে তার চারিদিকে ফটোর ফ্রেমের মতো চতুষ্কোণ খানিকটা স্থান উজ্জ্বল হয়ে আছে। তেমনই এলোখোঁপা, কপালের কাছে তেমনই পাটকবা চুলের ঈষৎ উচ্চতা, তেমনই টিকলো নাক ও সুডোল চিবুক। গলদেশ বেষ্টন-করা, খসে পড়া ঘোমটাটি পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে আছে।

নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আমি তাকে দেখতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, দুহাত উঁচু করে আমার অতি-চেনা ভঙ্গিতে হাই তুললেন। এবার তার সমস্ত অবয়বের ছায়া আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে হাত-দুই পাশের দিকে সরে তিনি ঘরের আবছা অন্ধকারে মিশে গেলেন। কেবল তার চারিদিকে যে চতুষ্কোণ ফ্রেমের মতো যে উজ্জ্বলতা ছিল তা রয়ে গেল অবিকৃত ! টলতে টলতে বিছানায় গিয়ে আছড়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি পড়লাম ঘুমিয়ে। আমার অসুস্থ দেহমন তাঁর এই অপূর্ব আবির্ভাবের উত্তেজনা সহ্য করতে পারল না।

সেই দিন থেকে রোজই তাকে দেখতাম।

সন্ধ্যা হবার আগেই আমি ঘরে গিয়ে বসে থাকতাম। যখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসত, হঠাৎ ঠিক সেই সময় দেয়ালের গায়ে সেইখানে উজ্জ্বল চতুষ্কোণ পটভূমিকাটির আবির্ভাব হত। কোনোদিন

তিনি এসে প্রথম দিনের মতো দেযাল ঘেঁষে বসতেন, কোনোদিন চঞ্চলভাবে আনাগোনা করতেন, কোনোদিন পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আলগা খোঁপা বেঁধে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে তার বেঁচে থাকার সময়কার আমার সব চেয়ে প্রিয় লীলাভঙ্গিটির অভিনয় করতেন। কোনোদিন হাত নেড়ে মুখ নেড়ে আমার সঙ্গে কথা বলার অভিনয়ও করতেন, কিন্তু শব্দ হত না।

শব্দ তিনি কোথায় পাবেন ?

আমিও তাঁর সঙ্গে কথা বলার অথবা কাছে গিয়ে তাকে স্পর্শ কববার চেষ্টা করতাম না। ছায়ার সঙ্গে যে কথা বলা যায় না, ছায়াকে যে ছোঁওয়া যায় না, এটুকু জ্ঞান আমার ছিল। আমি শুধু তাকে দেখতাম। তাতে আমার বিরহ-বেদনা লঘু হয়ে যেত। কেবল, তিনি যখন ঝাপসা বিকৃত মূর্তিতে দেখা দিতেন, আমার বড়ো কষ্ট হত। আমি বুঝতে পাবতাম শুধু রূপ পরিগ্রহ করার চেষ্টা করেও তিনি পারছেন না, কে জানে তার কত যাতনা হচ্ছে !

একদিন আমাদের এক অদ্ভুত মিলন হয়েছিল। সূক্ষ্মতা ও স্থূলতাব যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, প্রবল ইচ্ছাশক্তি বলে আমি তা অতিক্রম করে গিয়েছিলাম। সেদিন আমি একটি ইংরেজি পরলোকতত্ত্বের বইয়ে জীবন্ত প্রাণীর সূক্ষ্ম দেহধাবণের কতকগুলি বিবরণ পাঠ করেছিলাম। রাত্রে তিনি তার আলোকপটে এসে দাঁড়ানো মাত্র আমি দেখতে পেলাম, আমাব ছায়ারূপ পিছন থেকে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। মুহূর্তের মধ্যে পবলোকগতা পত্নীর সঙ্গে আমার অনন্ত ব্যবধান ভুলে গেলাম। আমার নিবিড় আলিঙ্গানে তাঁর শিথিল অচল দেহ আগের মতো জীবনের আবেগে উষ্ণ ও স্পন্দিত হয়ে উঠল। তাঁর রক্তমাংসের দেহই যে আমার বক্ষে লগ্ন হয়ে আছে, আমার তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না। আমি তাঁব চুলের স্পর্শ পেলাম, ত্বকেব স্পর্শ পেলাম, তাঁব উষ্ণ নিশ্বাস আমার গালে লাগল। তাঁর দেহের ভাব পর্যন্ত আমি অনুভব করলাম।

ছায়া কি ভাবী হয় ?

তারপর সেদিন কী যে হযেছিল আমার মনে নেই। স্ত্রীব ছায়াময়ী মূর্তি আমাব অভ্যস্ত হয়ে এসেছিল, কিন্তু তাঁর বক্তমাংসেব স্পর্শাযত্ত বাস্তব মূর্তি আমায মূর্ছিত কবে দিল।

•

আত্মহত্যা করে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার কল্পনা তাঁব মৃত্যুর দিন থেকেই আমাব মনে ছিল। এই ব্যাপারের পর আর একটা দিনও পৃথিবীতে থাকতে আমাব ইচ্ছা হল না। পবদিন দুভরি আফিম কিনে রাখলাম। ঠিক করলাম, রাত্রে স্ত্রীর আবির্ভাব হলে দরজা বন্ধ করে তাঁব সামনেই আফিম খেয়ে শুয়ে থাকব। রাত্রি প্রভাত হবার আগেই আমাদের জীবন ও মৃত্যু এই দুই স্তবের অন্তর্গত অস্তিত্বের ব্যবধান ঘুচে যাবে।

তাঁর ছায়ারূপকে সেদিন আমার যেন আরও স্পষ্ট আবও নিখুঁত মনে হল। আত্মহত্যা করতে আমার যে একটু-একটু ভয় ছিল, তাঁকে দেখার পর সেটুকুও মিলিয়ে গেল। উঠে গিয়ে আমি দরজা বন্ধ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুধু স্ত্রীর ছায়া নয়, তার আলোর আবেষ্টনী পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে তাঁর এই উজ্জ্বল পটভূমিকে আমি কখনও অদৃশ্য হতে দেখিনি, কিছুই বুঝতে পারলাম না। আবার দরজা খুললাম। দেয়ালের গায়ে আলো এবং আমার স্ত্রীর ছায়া দুই-ই আবার রূপ নিল। তখন তাকিয়ে দেখে টের পেলাম, আমার ঘরের দরজার বাইরে বাড়ির ঝি বসে আছে, ঠিক যেন কার প্রতীক্ষায়। নীচে নামার সিঁড়ির বাঁকের কাছে দেয়ালের গায়ে যে আলোটা জ্বলছে তার আলো দবজা দিয়ে সোজা আমার ঘরে ঢুকেছে।

শুনতে পাই তাবপর বছর খানেক আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। বর্তমানে আমার কিছুমাত্র পাগলামি নেই এবং আমি আবাব বিয়ে করেছি।

অথচ, আশ্চর্য এই, এখনও আমি পরলোকে বিশ্বাস করি !

হাত

কাঠ যদি শুষ্কতার প্রতীক হয়, কাঠির প্রতীক হওয়া উচিত রোগা শুষ্কতার। কাঠ চিরলেই হয় কাঠি, মানুষকে রোগা হওয়ার জন্য ভুগতে হয় কিন্তু রোগে। এদিকে আবার মোটা হবার রোগও জগতে আছে। রোগা হবার ব্যাপারটা তাই বড়ো জটিল, প্রায় দর্শনের সমস্যার মতো। মহামায়া যে কাঠির মতো সরু, সময় সময় সেটা এমন খারাপ দেখায় যে, স্পষ্ট মনে হয় মেয়েমানুষের শরীরে এত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। মহামায়াকে সবচেয়ে খারাপ দেখায় সে যখন দাঁড়ানো অবস্থাতেই উপুড় হয়ে মেঝেতে কোনো হাতের কাজ সারে। বড়ো মাছ পড়লে ছিপও এই রকম ভঙ্গি করেই বেঁকে যায়।

মহামায়ার হাত দুটি বড়ো লম্বা। রোগা না হলে তাকে বেঁটে বলা যেত, গড়নের আর একটু অভাব থাকলে তাকে ছেলে বলা যেত, হাত দুটি তার ইঞ্চি কয়েক ছোটো আর একটু কম সুগোল ও সুপরিপুষ্ট হলে বলা যেত মানিয়েছে। বাড়ির মানুষগুলির মধ্যে সে নিজে যেমন বেমানান, তার প্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে হাত দুটিও তেমনই বেমানান! যেন ধার-করা জিনিস।

ধার-করা জিনিসের মতোই হাত দুটি কিন্তু তার কাজের। কত কাজ যে সে করে সীমা নেই। সেলাইয়ের কাজ, বোনার কাজ, লেখার কাজ, সংসারের কাজ, সেবার কাজ। হাতে কাজ না থাকলে সে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না, ঘুম ভাঙার পর থেকে আবার ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত হাত তার অবিরাম কাজ করে যায়। হাতের পরিশ্রমের শ্রান্তিতে শরীর এলিয়ে আসে, কোমর টনটন করে, মনে হয় হাঁটু মুচড়ে হুমড়ি খেয়ে সে পড়ে যাবে, কিন্তু হাত তখন তার বোধ হয় ডাম্বেল ভাঁজতেও রাজি। জোর করে কাজ থেকে বঞ্চিত করে রাখলে হাত তার এটা ঘাঁটে, ওটা ঘাঁটে, একে টানে, ওকে ঠেলে দেয়—ঠিক নিষ্কর্মা মানুষের মতো ছটফট করতে আরম্ভ করে। তারপর এক সময় দেখা যায় একটা অকাজকে কাজে পরিণত করে হাত তার ভারী ব্যাপৃত হয়ে পড়েছে।

স্বামীর গদি-আঁটা চিত হবার চেয়ারে চিত হয়ে ছোটো মেয়েকে মাই দিতে দিতে মেজো জা কেতকী বলে, চারাগাছটা টব থেকে ওপড়ানো হল কেন ?

মহামায়ার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ফুলের চারার চেয়ে সে নিজের হাতের দিকে তাকায় বেশি করে। তাই তো, তার হাত দুটিকে তো বিশ্বাস নেই ! এই তো হেঁসেল তুলে এসেছে আরও হাজারটা টুকিটাকি কাজ সেরে, এর মধ্যে এত কী অধীর হয়ে উঠল তার হাত যে দেওরের টুথব্রাশ দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে টব থেকে আস্ত একটা ফুলের গাছ উপড়ে ফেলল ?

ছুঁচলো চিবুকের চামড়া কুঁচকে, রেখার মতো পাতলা ঠোঁট ফাঁক করে সে একটু হাসে, বলে, ভালো করে পুঁতব বলে উপড়েছি ভাই। রোজ জল দিচ্ছি, ফুল ফুটবার নাম নেই, তাই ভাবলাম একবার তুলে আবার পুঁতি, দোষটোষ কিছু থাকে তো শুধরে যাবে।

লাগসই কৈফিয়ত দিলে কী হবে, মনটা মহামায়ার খারাপ হয়ে যায়। লাগসই দূরে থাক কোনোরকম কৈফিয়তই দিতে পারেনি, এমন অকাজও কী সে করেনি ? সকালে সেজো দেওরের ছেলেকে চারবার লোফালুফি করে খেয়াল হয়েছিল সেটা মানুষের বাচ্চা, কুমড়ো-কাঁকুড় নয়। তার খানিক পরে ছোটো ননদের সাতাশ টাকার শাড়িখানা ছিঁড়ে দো-ফালা করে ফেলেছিল, এখনকার মতো এমনইভাবে রোদে-মেলা শাড়ির কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে। কেন এমন হয় ? কোনো কথা ভাবতে গেলেই নিজের হাতের কথা কেন সে ভুলে যায় ? কেন তার মনে থাকে না যে, সে একটু

অন্যমনস্ক হলেই হাত দুটি তার চুপিচুপি এমন একটা কিছু কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে, যার জন্য নিজের তার বিপদের সীমা থাকবে না ?

মন খারাপ করে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চমক লাগে মহামায়ার। এইটুকু ভাবনার অবসরেই ডান হাতটি এক কাজ করে বসে আছে। উঠানের ওদিকে উঁচু প্রাচীর, তারও ওদিকের বাড়িটার তেতলার জানালায় দাঁড়িয়ে যে ছেলেটা ইশারায় আসবার অনুমতি প্রার্থনা করছিল, এই নিঝুম দুপুরে তাকে তার ডান হাতটি ডেকে বসেছে।

নিঝুম দুপুর হয়তো নয়, একতলার প্রেসে হয়তো এখনই ঘটাংঘটাং ছাপার কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে, তবু অন্তত দুপুর তো,—এ সময় এভাবে ইশারায় আদান-প্রদান চোখে পড়লে লোকে ভাববে কী ? লোকে তো জানবে না ও বাড়ির বারীনের কাশি হয়ে গলা ভেঙে গেছে বলেই নিজের বুকে হাত ঠুকে জিজ্ঞাসা করেছে, এখন রুমাল নিতে আসবে কি না, আর সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বলেই তার অবাধ্য হাত হাতছানি দিয়ে তাকে ডেকেছে। গলা অবশ্য তার ভাঙেনি, কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে সে চ্যাঁচাবে কী করে ? হাতছানি দিয়ে না ডাকলে হত। ওর ইশারা আর তার হাতছানি যে দেখেছে, সে যখন ওকে এ সময় এ বাড়িতে ঢুকতে দেখবে, ভাবতে আর সে কিছু বাকি রাখবে না।

ভালো করে পুঁতবার জন্য ওপড়ানো-চারাটি ইতিমধ্যে কয়েক টুকরোয় ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সেদিকে চেয়ে মহামায়া আড়চোখে একবার কেতকীর দিকে তাকাল। কেতকী চোখ বুজেছে। দুপুরবেলা স্বামীর ছেলেকে বুকে নিয়ে স্বামীর চিত হবার চেয়ারে চিত হয়ে বেশিক্ষণ কেতকী চোখ খুলে রাখতে পারে না।

ভাঙা চারাগাছটা নীচে ফেলে দিয়ে মহামায়া দু-হাতে রেলিংটা শক্ত করে চেপে ধরল। এই কাজটাই করুক হাত দুটি, এই রেলিং ধরার কাজ। এত জোরে ধরুক রেলিং, যেন খুলবার সময় রীতিমতো একটু কষ্ট হয় হাত দুটির, প্রত্যেকটা আঙুল সোজা করবার সময় যেন বুঝতে পারে এ এক ধরনের শাস্তি।

সেইখানে দাঁড়িয়ে মহামায়া বারীনকে বাড়ি ঢুকতে দেখল, একতলার প্রেসে কেতকীর স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে শুনল, দোতলা ডিঙিয়ে জুতোর শব্দে তেতলায় সপুত্র কেতকীর ঘুম ভাঙিয়ে কাছে এসে দাঁড়াতে দেখল, তবু রেলিংয়ের মুঠি খুলল না। আঙুলের গাঁটগুলি তখন তার ধবধবে সাদা হয়ে গেছে, রক্তের স্রোতের সঙ্গে একটা স্তিমিত ব্যথা দেহের ভিতরের দিকে বয়ে চলেছে।

রুমালগুলো হয়েছে বউদি ?

বারীনের কথায় একটা শব যেন বেঁচে উঠল। এক মুহূর্তে মহামায়ার দেহের অসাড়তম অঙ্গটুকুতে পর্যন্ত যেন এল প্রাণস্পন্দনের জোয়ার। তাড়াতাড়ি রেলিংয়ের বাঁধন থেকে হাত ছাড়িয়ে সে বলল, সব হয়নি, কটা বাকি আছে। একটু বসুন, এখনই সেলাই করে দিচ্ছি,—পাঁচ মিনিট।

কাজের যে কোনো অভাব আছে তা নয়, বাড়িতে লোক তেরোজন, প্রেসের দুজন কম্পোজিটারও বাড়িতেই থাকে। আপিসের তাড়া নেই বটে, স্কুল-কলেজের তাড়া আছে। তবে মহামায়ার মুশকিল এই, সকলে তাকে সব কাজ করতে দেয় না। স্বামী আর ছেলেমেয়ের এমন সেবা আছে, যা খুব বেশি রকম আলসে স্ত্রী আর মাও নিজেরাই করতে ভালোবাসে। আবার এমন কতগুলি কাজ আছে মহামায়ার যা করতে নেই, করতে ভালো দেখায় না বা অন্য কাউকে করতে না দিলে খারাপ দেখায়। তা ছাড়া মহামায়ার আছে ঘেন্না। গা ঘিনঘিন-করা উৎকট অদ্ভুত ঘেন্না। মনের জোরে দরকারের সময় কখনও যদি বা ঘেন্না সে দমন করতে পারে, পেটের যা কিছু হঠাৎ গলা দিয়ে বার হয়ে আসতে

চাইলে কোনোমতেই চেপে রাখতে পারে না। নিজের বমি দেখে নিজেই ঘেন্নায় সে আধমরা হয়ে যায়। ছোটো ছেলেমেয়ের কতকগুলি কাজও সে তাই করে না।

তবু যা করে, তার জন্যই বাড়ির লোক উঠতে বসতে তাকে অনুযোগ দেয়। ওই শরীরে এত কাজ করা কেন ? বাড়িতে ঝি-চাকর নেই ? কাজ করার আর মানুষ নেই ? একজন যখন একজনের কাছে জল চাইল, একজনকে এক গ্লাস জল দেবার সুখ থেকে বঞ্চিত করতে ও রকম ওত পেতে না থাকলেই কী তার চলে না ? ভারীভারী কাজও করবে, টুকিটাকি কাজও করবে—কী এমন মধু আছে রে বাবা কাজে ! আর শুধু কি কাজ করা ? থেকে থেকে এমন এক একটা কাণ্ড করে বসবে—

অনুযোগ শুনতে শুনতে অবসন্ন শরীর এক এক সময় ভেঙে পড়তে চায় মহামায়ার, মনে হয় কেউ যদি চোখের পলকে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিত ! স্বপ্নহীন গাঢ় ঘুম,—হাত দুটিকে যখন যে কোনো একটা কাজে আটকে রাখবার ভাবনা তাকে ভাবতে হয় না। ঘুম গাঢ় না হলেও মহামায়ার হাত নিয়ে স্বস্তি নেই। ঘুমের মধ্যেও হাত দুটি তার বিছানা হাতড়ায়, চাদর গুটিয়ে তোলে, ছেঁড়া থাকলে সেই ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে চাদর বা বালিশের ওয়াড় ফালাফালা কবে দেয়, তোশক বালিশ খুঁটেখুঁটে তুলো বার করে ফেলে, মুঠোর মধ্যে যা কিছু পায় দূরে ছুঁড়ে মারে। তার বিছানার ধারেকাছে আর কারও শোবার উপায় নেই। স্বামী যদি তার বেঁচে থাকত, কে জানে একদিন সকালে উঠে দেখা যেত কি না, তার হাত দুটি গলা টিপে স্বামী বেচারিকে মেরে রেখেছে !

সুখের বিষয় শরীরটা তার কাঠির মতো সরু,—হাতের মতো সবলও নয়, পাগলও নয়। দেহ যদি তার ঘুমের মধ্যে অবাধ্য হতে আরম্ভ করত আর ঘুমের মধ্যে বিছানা থেকে তাকে তুলে তার হাত দুটিকে যেখানে খুশি পৌঁছে দিত, কী যে তা হলে হত, ভাবলেও মহামায়াব সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।

এমনই হাতের জ্বালায় জীবন তার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

ডান হাতে কলের হাতল ঘোরায়, বাঁ হাতে রুমালের কাপড় সূচের নীচে এগিযে দেয়, আর মনে মনে নিজেব বিস্মৃত ও স্বর্গীয় এক পিতৃব্যের মুণ্ডপাত করে। ছেলেবেলা তাকে নিয়ে মোটবে চেপে যাবার সময় তিনি নাকি একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়েছিলেন, পিঠে আর হাঁটুতে চিহ্ন আছে। তারপর থেকে নাকি সে বোগা হয়ে গেছে, পাশে বাড়েনি লম্বায় বাড়েনি,—কেবল তার হাত দুটি বেড়েছে স্বাভাবিক বাড়।

নির্জন দুপুর, কলের মৃদু একটানা আওয়াজ, চেয়ারে বসে বসেই বারীনের ঢুল আসছিল। মহামায়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ঠাকুরপো, আমাকে খুব বিচ্ছিরি দেখায়, না ?

বারান্দায় মাদুরে পাটিতে মেয়েরা শুযেছে, স্বামীর চিত হবার চেয়ারে বাবীনের জুতোর আওয়াজে ভাঙা কেতকীর ঘুম হয়তো এতক্ষণে আবার ফিরে এসেছে, ঘরটা তাই জিনিসে ভরা হলেও কেবল একজন পুরুষ আর একজন নারী থাকায় মনে হচ্ছিল নির্জন।

প্রশ্ন শুনে বারীন চেয়ারেই জড়োসড়ো হয়ে বলল, না, বয়সের তুলনায় আপনাকে বরং ঢের বেশি কচি দেখায়।

তা বলছি না, বলছি হাত দুটোর জন্যে আমায় খারাপ দেখায় তো ? আচ্ছা তা দেখাক। আপনি তো আজ-বাদে-কাল ডাক্তার হবেন, বলুন তো, ছোটোবেলা মোটর অ্যাকসিডেন্ট হলে আমার মতো হয় কি না ?

আপনার মতো কী হয় ?

বেখাপ্পা দেখতে হয়—শরীরটা এমনই শুকিয়ে যায় কিন্তু হাত দুটো ঠিকমতো বড়ো হয়। ছেলেবেলা আমার এক কাকার সঙ্গে মোটরে বেড়াতে গিয়ে আমার এ দশা হয়েছে, তা বুঝি জানেন না ?

বারীনের হাসি দেখে মহামায়া মাথা হেলিয়ে জোর দিয়ে বলল, সত্যি। সবাই জানে। নইলে আমি বুঝি আপনা থেকে এমনি হয়েছি ?

বারীন হাই তুলে বলল, আপনা থেকে হয়েছি মানে ? আপনি তো এমনই—এমনই গড়ন আপনার। আপনার বাবার কি মার নিশ্চয় এ রকম গড়ন ছিল,—নয়তো কোনো এক পূর্বপুরুষের ছিল। Cell-এর মধ্যে যে genes থাকে—

প্রেসে বড়ো একটা মেশিন চলতে আরম্ভ করেছে, তবু সেলায়ের হাত-কলটার মৃদু একটানা শব্দ সুরের মতো স্পষ্ট। এবার আরও তাড়াতাড়ি বাকি রুমালগুলি সেলাই হয়ে গেল। হাতের কাজও যেন ফুরিয়ে গেলে বাঁচে।

বারীনকে রুমাল দিয়ে মহামায়া বলল, কই, পাঞ্জাবির কাপড় তো এনে দিলেন না ?

না, না, আপনার ঘাড়ে অত চাপানো উচিত হবে না।

ঘাড়ে চাপানো !—মহামায়া মৃদু হাসল, বাড়ির কেউ জামা চায় না, কিছু চায় না, বলে আমার ছাঁটকাট সেলাই ভালো নয়। সে কথা না বলে ঘাড়ে চাপানোর কথা কেন ?

বারীন বলল, তা কেন, আপনি চমৎকার ছাঁটেন, চমৎকার সেলাই করেন। আজকেই সন্ধের সময় কাপড় এনে দেব।

কেতকী জেগেই ছিল, বারীনকে চলে যেতে দেখেও কিছু বলল না, কেবল তাকানোতে একটু নতুনত্ব এনে মহামায়ার দিকে তাকাল।

মহামায়ার একবার মনে হল, বুকে একটা ছেলে না ঘুমিয়ে থাকলে এ ভাবে কেতকী তাকাতে পারত না। তারপর আবার নিজেকে মহামায়ার অবসন্ন মনে হতে লাগল। হাতের ভার বহন করে দাঁড়িয়ে থাকতেও যেন কষ্ট হয়। কী নির্ভয় নিশ্চিন্তভাবে সকলে নিশ্চল হয়ে ঘুমিয়ে আছে। কারও হাতের আঙুলটি পর্যন্ত একটু নড়ে না। মীনা পাশ ফিরে শুল, হাত দুটি তাকে পাশ ফিরতে সাহায্য করল, তারপর আবার নিশ্চল হয়ে এলিয়ে পড়ল। তার হাত হলে ? এমন কিছু হয়তো একটা করে বসত সকলে জেগে উঠে যা নিয়ে হইচই করে তারও ঘুম ভাঙিয়ে দিত, বলত, দ্যাখো, তোমার কীর্তি।

ভুলেও কখনও বলত না, দ্যাখো, তোমাব হাতের কীর্তি।

সন্তর্পণে মীনার পাশে বসে মহামায়া তার ডান হাতের কাছে নিজের ডান হাতটি রাখল। মীনার চেয়েও তার হাত সবল আর সুডৌল—শুধু হাত দিয়ে বিচার করলে তার মতো রূপসি মিলবে না। তবু এই হাতের জন্য মানুষটা সে বেঢপ, বেখাপ্পা,—এই হাতের জন্য পদে পদে তার অশান্তি, উদ্‌বেগ। একরকম চ্যাপটা বেমানান একটা বাঁকা হাত নিয়েও মীনার জীবনে সুখের বন্যা—

উঃ ! উঃ ! শব্দ করে মীনা ধড়মড়িয়ে উঠে বসতেই মহামায়া মীনার হাত ছেড়ে দিল। নিজের হাতে হাত বুলোতে বুলোতে মীনা ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কী, তোমার হয়েছে কী বউদি ? হাতে একটু জোর আছে বলে আমার হাতটা গুঁড়ো করতে এসেছ কেন ? পালোয়ানের কাছে যাও না ? গুন্ডার কাছে যাও না ? বারীনদার সঙ্গে লাগো না গিয়ে ?

মহামায়ার কান্না আসবার উপক্রম হয়ে এসেছিল। সজল মৃদুসুরে সে বলল, হঠাৎ মনের ভুলে তোর হাত চেপে ধরেছি মীনা, একটা কথা ভাবতে ভাবতে—

মীনা ঝেঁঝে উঠে বলল, মনের ভুলে তো তুমি সবই কর ! চুল ধরে টানো মনের ভুলে, দামি শাড়ি ছিঁড়ে ফেল মনের ভুলে, হাত চেপে ধর মনের ভুলে,—হাত দুটো কেটে ফেলতে তো পার না মনের ভুলে ?

এ ভর্ৎসনায় ঘুমিয়ে থাকা মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব। তারা জাগল। জেগে উঠেই জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল, কী হয়েছে, কী হয়েছে ?

ঘুমোচ্ছিলাম, আমার হাত মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে।

মহামায়ার প্রতিবাদের জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে সকলে আবার কলরব করে উঠল। একজন মহামায়ার একটি হাত উঁচু করে নেড়ে চেড়ে দেখে ঝটকা মেরে ফেলে দিয়ে বলল, হাত তো নয়, গদা যেন।

মহামাযা নীরবে উঠে গিয়ে রেলিংয়ের সেইখানে দাঁড়াল। মীনার হাত সে মুচড়ে ভেঙে দেয়নি, মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে একটি ফুলের চারা। এখনও সেটি নীচে কল ঘরের ছাদে পড়ে আছে।

সাতটার সময় বারীন সাতগজ পাঞ্জাবির কাপড় নিয়ে এল, নীচে প্রেস তখন বন্ধ হয়ে গেছে, কাজ হচ্ছে কেবল দপ্তরির ঘবে।

এ সময় মুহূর্তের জন্য মহামায়ার হাতের স্থির হবার অবকাশ থাকে না। কিন্তু আজ মহামায়া চুপচাপ বারান্দায় বসেছিল, দুহাতে ধবে ছিল রেলিংয়ের শিক। এ সময় এ অবস্থায় তাকে কেউ কোনোদিন দেখেছে বলে মনে করতে পারে না,—এ বাড়ির লোকেদের তুলনায় সে যেমন বেমানান, তার দেহের তুলনায় তার হাত দুটি যেমন বেমানান, এ সময় এ ভাবে তার বসে থাকা যেন তার চেয়েও বেমানান। কেতকীর স্বামী তার গদি-আঁটা চেয়ারে চিত হয়ে পড়ে আছে, কেতকী নিজেব ছেলেব কান্না থামাতে না পেবে পাগল হয়ে উঠেছে, আরও চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে চেঁচাচ্ছে। ভাঁড়ার বার করে দিতে গিয়ে মীনা প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম করছে, স্কুল-কলেজ থেকে ফিরে একবার যারা খাবার পেয়ে খায়নি, এখন বেড়িয়ে ফিরে খাবার চেয়ে তারা পাচ্ছে না, রান্নাঘর থেকে কীসের একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছে, মহামায়ার বুড়ি শাশুড়ি কাশতে কাশতে মরে যাবার ভয় দেখাচ্ছেন।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে মহামায়া একবার তার গদা দুটি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নামলেই সব গোলমাল থেমে যায়, কিন্তু আঁচল সে জড়িয়ে রেখেছে গায়ে, আঙুল দিয়ে দুটি গদাকেই বেঁধে রেখেছে রেলিংয়ের শিকে। মানুষের উপর তার অভিমান হয়নি, ঘেন্না সে করছে নিজেকে। যে অনুভূতি তার মধ্যে সবচেয়ে প্রবল সেই অনুভূতিই আজ কেবল নাড়ির মধ্যে পাক দিয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে এই বুঝি বমি করে ফেলল।

কোমরে আঁচল জড়ালে এ ভাবটা কমে যাবে কি না, বারীন আসবার অনেক আগে থেকে সে এই কথাটাই ভাবছিল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে সে যে রহস্যের সৃষ্টি করে, তার পীড়ন সকলে যে শুধু তার কোমরে আঁচল জড়ানো সেবার জন্য সহ্য করে মহামায়ার তা অজানা নয়। বমি-বমি ভাব সামলাতে হলে নাভির কাছে খুব আঁট করে তাকে আঁচল জড়াতে হবে। এই সরু কোমর তার, আঁচল আঁট করে বাঁধলে কী অকথ্য সরুই দেখাবে কোমর !—আর তার তুলনায় কী অসম্ভব বিশাল দেখাবে তার হাত ! লজ্জায় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল মহামায়ার। নিজেকে সামলাবার আঁচল-সংক্রান্ত পরীক্ষাটুকু করার সাহস সে পাচ্ছিল না।

বারীন কাপড় নিয়ে আসতে সে উঠে দাঁড়াল। সিল্কের কাপড় দেখে খুশি হয়ে বলল, সিল্ক ?

বারীন বলল, হ্যাঁ। ভালো জামা করা চাই কিন্তু।

এ হাতে কি আর ভালো জামা হয় ঠাকুরপো ?

দু চোখে জল নেমে এল মহামায়ার। বারীনদের বাড়ির আলোকিত জানালাগুলির দিকে তাকিয়ে বলল, বড়ো অবাধ্য, বড়ো কুচ্ছিত হাত। কী যে করি আমি হাত দুটো নিয়ে !

কম্পোজিং রুমে টিমটিমে একটা আলো জ্বলছে, ছাপাখানা অন্ধকার। দপ্তরিখানার ভেতরটা আলোয় ঝলমল করছে। খোলা দরজা দিয়ে খানিকটা আর খোলা জানালা দিয়ে খানিকটা দেখা যায়,

যন্ত্রে ফেলে বুড়ো দাড়িওলা দপ্তরি ছাপা ফর্মা কাটছে। দেখতে দেখতে মহামায়ার হাত এদিকে এগিয়ে যায় বারীনের দিকে। বারীন সাহেবি পোশাকে বেরিয়েছিল, সেই বেশেই সোজা এখানে এসেছে। মহামায়ার ডান হাত এগিয়ে গিয়ে তার কোটের মাঝের একটা বোতামকে পাকড়াও করে পাক দিতে থাকে। মুখে বমি করার ভাব ফুটে আছে ভেবে মুখ মহামায়ার ফেরানো থাকে অন্যদিকেই। কয়েকটা মোচড় খেয়েই বারীনের কোটের বোতামটি আলগা হয়ে খসে আসে। মহামায়া তখন পাকড়াও করে তার উপরের বোতামটিকে।

সেটি খসে এলে, নীচেরটিকে।

কেতকীর স্বামী চিত হয়ে থেকেই মৃদুস্বরে ডাকে, বউঠান, ও বউঠান ?

মহামায়া মুখ ফিরিয়ে আনতে আনতে বারীনের সে বোতামটিও খসে আসে। অন্য একটি বোতাম ধরে মহামায়া আরও মৃদুস্বরে বলে, কেন ঠাকুরপো ?

ও কী করছ ?

কী করছি ?

বোতাম ছিঁড়ছ কেন বারীনের ?

বোতাম ছিঁড়ছি ?—মহামায়া চমকে ওঠে, ওমা তাইতো !

একবার নিজের হাতের বোতামগুলি আর একবার বারীনের কোটের বোতামের খালি ঘরগুলির দিকে তাকায় মহামায়া, নিশ্বাস ফেলতে যাওয়ায় মনে হয় ভেতরে যা কিছু আছে সব তার বেরিয়ে আসতে চায়, কেবল ছিদ্রগুলি ছোটো বলে পারছে না।

একটু সরে দাঁড়ায় মহামায়া। কিন্তু কত দূরে আর সরে যাবে ? সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে মীনা কেতকীর স্বামীকে বলে, বোতাম ছেঁড়ার কথা কী বলছ মেজদা, সারাদিন আজ কত কী ছিঁড়েছে হিসেব রাখ কিছু ? আমাব সেই যে ঘাসের রঙের শাড়িটা কিনে দিয়েছিলে, নবুদের বাড়ি নেমন্তন্নে গিয়ে কাল নিজেই উনি তাতে চুন লাগালেন। ও বেলা ধুয়ে রেলিংয়ে মেলে দিয়েছি, কখন কাছে দাঁড়িয়ে কাপড়খানা ফালাফালা করে ছিঁড়েছেন। তারপর খোকাকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে দিলেন ওব মুখে আস্ত চামচেটা সেঁদিয়ে। দুপুরে তোমার টুথব্রাশ দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে তোমার অত সাধের চারাটি টব থেকে তুললেন, তুলে মুচড়ে ফেলে দিলেন। আমি এই বারান্দায় ঘুমোচ্ছি পাটি পেতে, বলা নেই কওয়া নেই, পাশে বসে এমন মুচড়ে দিলেন আমার হাতটা, এখনও কনকন করছে।

কোমরে আঁচল বেঁধে যে দু হাতকে খাটায়, মীনার কথা শুনতে শুনতে বমি থামাবার জন্য সে মুখে আঁচল গুঁজে দিয়েছে। বারীনের সিল্কের থান মাটিতে ফেলে বারীনের একটা হাত ধরে টানতে টানতে সে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। কেতকীর স্বামী একবার আর সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় বাড়ির দুজন মেয়ে দুবার জিজ্ঞেস করল কোথায় যাচ্ছ, মুখ থেকে আঁচলও সে সরাল না, কথাব জবাবও দিল না।

একেবারে নীচের তলায় নেমে ঢুকল গিয়ে দপ্তরির ঘরে।

মরতেও দিয়ো না ভাই ঠাকুরপো। বাঁচিয়ো।

বলে বাঁধানো বই কাটবার যন্ত্রে ফেলে কনুয়ের নীচ থেকে নিজের দুটি হাতকে মহামায়া কেটে বাদ দিল। নিজের রক্তে-ভেজা কয়েকটা বই খাতা আর ছাপানো ফর্মার ওপর টলে পড়ে জ্ঞান হারাবার আগে বলল, অবাক হয়ো না ভাই, লোকে আত্মহত্যাও করে। রক্ত থামিয়ে বাঁচাও। তোমার পাঞ্জাবি আর তৈরি করে দিতে পারলাম না।

নীচে মাদুরে বই-খাতার ওপর পড়ে রইল হস্তবিহীনা মহামায়া, লোহার যন্ত্রের ওপর একরাশ সরু সরু কাটা কাগজের ওপর পৃথক হয়ে রইল দুটি নিস্পন্দ হাত।

বিড়ম্বনা

স্কুল নিয়ে বুড়ো শিববামের মাথাব্যথার অন্ত নেই। দশ বছর আগে একমাত্র মেয়ে মহাশ্বেতার বিয়ের পর জীবনের এই অবলম্বনটি সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন, আজ মেয়েকে চোখের আড়াল করার সব প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও স্কুল নিয়েই তিনি মেতে আছেন। ছাব্বিশ বছরের বিধবা মেয়ের কাছে শেষ জীবনে মানুষ আর কী সান্ত্বনাই বা সংগ্রহ করতে পারে !

সে আর বেঁচে থাকার অবলম্বন নয়,—বাধা।

দশ বছব স্কুল হয়েছে, দশ বছরে অন্তত দেড়শো ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি ছেলেও অন্তত দশ টাকার একটা স্কলারশিপ পেয়ে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করতে পারল না বলে শিবরামের অসীম আপশোশ। সম্প্রতি এই আপশোশের অন্ত করতে বৃদ্ধ অকর্মণ্য ত্রিলোচনকে বিদায় দিয়ে তিনি নতুন একজন হেডমাস্টার এনেছেন।

নতুন হেডমাস্টারের নাম অনন্ত। ছত্রিশ বছর বয়সে রূপের তার অন্ত নেই, সপ্তাহে একদিনের বেশি কামাতে মনে থাকে না বলে মুখভরা খোচাখেঁচা দাড়িগোঁফের জন্য রূপের যেটুকু হানি হয় দর্শকের সে যেন ব্যক্তিগত ক্ষতি। প্রকৃতিটা একটু অদ্ভুত, মাঝে মাঝে নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো খাপছাড়া ব্যবহার করতে ভালোবাসে। স্কুলসংলগ্ন ছোটো একতলা বাড়িটিতে ঠাকুর-চাকর নিয়ে বাস করে, নাওয়া-খাওয়া ইত্যাদি জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যাপাবগুলির প্রতি সে পরম উদাসীন। দুটি অতি আশ্চর্য বিলাসিতা কেবল তার আছে—রাত্রি জাগরণ এবং দিনে সাত-আটবার চা-পান। চা-পানের বিলাসিতাটা সাধারণ নেশার পর্যায়ভুক্ত বলে সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত ঘরের সামনে খোলা বারান্দায় কোন নেশায় যে সে জেগে বসে থাকে, কল্পনা কবা কঠিন।

হয়তো তারা গোনে। রাত জেগে তাবা গুনতে ভালোবাসে এমন মানুষের অভাব তো নেই

অথবা হযতো ভাবে। রাত জেগে চিন্তার জাল বুনে যায় এমন মানুষের সংখ্যাও পৃথিবীতে কম নয়।

সকালে বেড়িয়ে ফেবার পথে শিববাম অনন্তের সঙ্গে খানিকক্ষণ স্কুল-সংক্রান্ত আলাপ করে আসেন।

বিশৃঙ্খল ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, স্কুলের কাজে তোমার এত শৃঙ্খলা, ঘব এমন নোংরা কেন ?

অনন্ত হাসে,—কর্তব্য আর খেয়ালের মধ্যে এটুকু পার্থক্য থাকবে না ?

শিবরাম বলেন, তা যেন রইল, তবু—বলি, একা থাক কেন ? কেউ নেই নাকি আপনার লোক ?

নাঃ—বলে অনন্ত হাসতে থাকে। —নিজের চেয়ে আপনার লোক আর কে আছে বলুন ? নিজেই যদি ঘর নোংরা রাখতে ভালোবাসি—

ভালোবাসো ? আমার মেয়ে শুনলে তোমায় কিন্তু পাগল বলত বাবা ! আর এ ঘরে এলে ব্যাপার দেখে সে নিজেই পাগল হয়ে যেত ! বিধবা হয়ে অবধি ঘরসংসার সাজিয়ে গুছিয়ে—

মুহূর্তে কল্পনায় যা মূর্ত হয়ে ওঠে বৃদ্ধের তাতে বাক্‌রোধ হয়ে যায়। খানিক নীরব থেকে নিশ্বাস ফেলে বলেন, যাক, ও ছাড়া আর করারই বা আছে কী ! ও সব কথা থাক অনন্ত। সহ্য হয় না।

এমন ভাবে প্রসঙ্গ পরিবর্তন প্রার্থনা করেন যেন অনন্তই তার মেয়ের দুরদৃষ্টের কথা তুলেছিল !

ক্ষণকাল শিবরামের মুখের দিকে চেয়ে থেকেই অনন্তের দৃষ্টি ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। দৃষ্টিকে সে আড়াল করে চশমাটা ঠিক করে বসাবার ছলনায়।

অতঃপর স্কুলের প্রসঙ্গ ওঠে। শিবরাম ধীরে ধীরে এমনই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন যে অনেক আবোল-তাবোল কথাও বলে ফেলেন।

শুধু স্কলারশিপ পাওয়া নয় অনন্ত, তক্ষশিলা রাজগৃহে যেমন একদিন দেশবিদেশের ছেলে জড়ো হত, আমার স্কুলে তেমনই বাংলাদেশের সেরা ছেলেগুলি জড়ো হবে,—এ যদি করতে পার তবেই বুঝব তুমি হেডমাস্টার !

বৃদ্ধের এই অসম্ভব আশাতে অনন্তের হাসি পায় না, সে গম্ভীর মুখেই বলে, চেষ্টা করব বইকী।

শ্বেতা প্রশ্ন করে, নতুন হেডমাস্টারটি বুঝি খুব ছেলেমানুষ বাবা ?

শিবরাম বলেন, না, মাঝবয়সি। ছেলেমানুষ হেডমাস্টার দিয়ে কি স্কুলের উন্নতি হয় ? এমন লোক চাই যার অভিজ্ঞতাও আছে, আবার বুড়ো হয়ে কাজের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেনি।

শ্বেতা স্মিত মুখে বলে, মাঝবয়সি লোক ছাড়া অমন সমন্বয় হয় না বটে। তোমার বুদ্ধি দেখে সময় সময় আশ্চর্য হয়ে যাই বাবা। স্কুলের সব ব্যবস্থা নাকি তিনি উলটে দিচ্ছেন ?

ব্যবস্থা উলটেও দিচ্ছে, সংস্কারও করছে। যে সব মাস্টার ক্লাসে ঘুমোত আজকাল প্রাণপণে পড়াচ্ছে তারা !

সাত বছরের ছেলে কুণালকে কাছে টেনে নিয়ে শ্বেতা বলে, খোকাকে তাহলে এবার স্কুলে ভর্তি করে দিই, কী বল ? আমার বিদ্যে তো ফুরিয়ে এল।

শিবরাম ভেবে বলেন, স্কুলে দিবি ? দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত ওকে না দেখে যদি পাগল হয়ে যাস ?

কী যে বলো তুমি ? বলে শ্বেতা হাসে, কিন্তু হাসির শেষটা অন্তরালের চোখের জলে ভিজে ওঠে। দশটা থেকে চারটা অবধি ছেলেকে চোখের আড়াল করার অনাগত সম্ভাবনায় নয়, না দেখে পাগল হয়ে যাওয়ার কথাটাতেই ব্যথা বাজে ! অতি বড়ো অনুচিত মিথ্যা ! কর্তব্যের কাছে শোক দিনের পর দিন ছোটো হয়ে চলেছে। এমন গ্লানিকর ব্যাপার তারই জীবনে সত্য হয়ে উঠল ! এ চিন্তায় চোখে জল আসা আশ্চর্য নয়। সারাজীবন স্বামীকে না দেখার অভিশাপ যার কাছে সহজ ও সহনীয় হয়ে এল, ক ঘণ্টা ছেলেকে না দেখে সে কাতর হবে ? লজ্জাকর পরিহাস !

কুণাল দাদুর পাশের আসনটি দখল করে বসে অনর্গল কথা আরম্ভ করে দেয়, তারপর একান্ত অসময়েই রূপকথার রস-বৈচিত্র্য প্রার্থনা করে। শ্বেতা সরে যায় জানালায়।

কেন এমন হয় ? না চেয়ে জীবনের প্রথাহীন খাপছাড়া বৈচিত্র্য জুটেছিল, চিরন্তন দীপশিখার ধোঁয়া থেকে কলঙ্কতিলকের কালি সংগ্রহ করেও ভীতা সে তিলক পরেনি, বৈধব্যের বেদনায় আজও তার আপশোশ মিলিয়ে গেল না কেন ? অনুতাপে আজ এত মাধুর্য কেন, মুক্তির গৌরবে দাহ ? জীবনের সব যে মুছে গেল তার চেয়ে প্রত্যাখ্যাত কালিমার অভাবটাই আজ যেন বড়ো হয়ে উঠেছে ! এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কী আছে জীবনে !

শ্বেতার আহ্বানটা শিবরাম নিজেই অনন্তের কাছে পৌঁছে দিলেন। বললেন, সময় করে একবার যেয়ো হে অনন্ত, মেয়ে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছে।

অনন্ত আশ্চর্য হয়ে বললে, কেন ?

ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া সম্বন্ধে তোমার কাছে তার নাকি কতগুলি অনুরোধ আছে। নিজের মুখে জানাতে চায়। আমি শুনতে চাইলাম, বললে না।

অনন্ত আনমনে বলল, তবেই মুশকিল !

শিবরাম অবাক ! মুশকিল ! কীসের মুশকিল ?

অনন্ত অকারণে বিব্রত হয়ে বলল, আজ্ঞে না, আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। আপনার মেয়ে যদি কোনো অন্যায় অনুরোধ করেন—

কথাটা বড়োই অসংগত ও খাপছাড়া কৈফিয়তের মতো শোনাল। মেয়ের সম্বন্ধে এমন অন্যায় অনুমানে ক্ষুণ্ণ হয়ে শিবরাম বললেন, না; তা করবে না—আমি তোমায় কথা দিতে পারি। নিজে সে অন্যায়কে এমন ঘৃণা করে যে অন্যায় অনুরোধ তার গলায় আটকে যাবে।

অনন্ত অধিকতর বিব্রত ও ব্যস্ত হয়ে বলল, তা জানি গাঙ্গুলি মশাই, তা জানি। ও রকম ভাবে কথাটা বলিনি, আমি ভাবছিলাম—

কী যে সে ভাবছিল তা অপ্রকাশিতই রইল। তার মুখ এমনই চিন্তাযুক্ত হয়ে উঠল যে শিবরাম আর একবার বিস্মিত হয়ে গেলেন।

বিকালেব দিকে নিজের ঘরে বসে শ্বেতা একটা অদ্ভুত আত্মচিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে ছিল। হিমানী তার সমবয়সি মাসি, তার শিশু পুত্রটি এইমাত্র কেঁদে মার কাছে ফিরে গেছে। আধঘণ্টারও বেশি মাকে ছেড়ে সে খুশি হয়েই মাসতুতো দিদির সোহাগ সহ্য করেছিল, এ জন্য কৃতজ্ঞ না হয়ে রাগ করার মধ্যে যে কত বড়ো অসংগতি আছে শ্বেতার তা জানা ছিল না। কোথা থেকে খেলায় ব্যাপৃত কুণালের কলরব ভেসে আসছিল, শ্বেতার বুকে জেগে উঠছিল একটা ক্ষুব্ধ অভিযোগ। সন্তান শিশু হয়ে থাক এ কামনা হয়তো কোনো মা-ই করে না, কিন্তু শিশু না থাকলেই বা মায়ের চলে কী করে ! একান্ত অসহায় একটি জীবের হাসিকান্নার বৈচিত্র্য, স্নান করানো কাজল পরানো দুধ খাওয়ানো ঘুম পাড়ানো থেকে মুখে মাই তুলে দেবার প্রয়োজন, একবার যে মা হয়েছে তার তো কোনো দিনই ফুরিয়ে যায় না ! কুণালের বয়সটাকে শ্বেতা আজকাল যেন হিংসা করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। কেন এত বড়ো হয়ে গেল ? দশ মিনিট কোলে করে থাকলে কোমর ব্যথা হয়, হাঁফ ধরে যায়, এ কী বিড়ম্বনা তার !

এক ছেলের মা হয়ে দিন কাটবে এই কী তার জীবনের চরম হিসাব নিকাশ ?

ঝি এসে সংবাদ দিল নতুন হেডমাস্টার এসে বসে আছেন।

বাবা কই রে ঝি ?

বেড়াতে গেছেন বুঝি, কে জানে !

শ্বেতা চিন্তিতা হয়ে বলল, তবে আমি কী করি বল তো ? আড়াল থেকেই কথা বলব অবশ্য, কিন্তু বাবা না থাকলে—

আজ যেতে বলব দিদিমণি ?

না, আমি যাচ্ছি। কুণাল কোথায় ডেকে আন তো।

অনন্তকে শিবরামের বসবার ঘরে বসানো হয়েছিল। শ্বেতা অন্দরের দিকের দরজার একপাট বন্ধ করে বাঁ হাতে দরজার প্রান্ত চেপে আড়ালে দাঁড়িয়ে বলল, আপনাকে একটা অনুরোধ জানাতে বড়ো সংকোচ বোধ করছি।

অনন্ত এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে দরজা বেয়ে একটা কাঠ পিঁপড়ের ঊর্ধ্বগতি নিরীক্ষণ করছিল, দরজার প্রান্তে খানিকটা শ্বেতবসন ও কয়েকটি শুভ্র আঙুলের আবির্ভাব দেখে বুঝল ওদিকে কে এসে দাঁড়িয়েছে। নিঃশব্দে একটু অকারণ হাসি হেসে সে বলল, অনুরোধ জানাতে যদি সংকোচ হয়, আপনি আদেশ করতে পারেন।

অন্তরালে শ্বেতার বিস্ময়ের সীমা নেই ! এ কেমনধারা কথা ? গলার স্বরটাও যেন চেনা মনে হয়। উঁকি মেরে দেখার কৌতূহল দমন করে শ্বেতা বলল, আপনাকে আমি আদেশ করতে পারি না, অনুরোধই করছি। আমার ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করে দিতে চাই, কিন্তু ও স্কুলে যেতে চাইবে না। প্রথম কয়েকদিন আপনি যদি দয়া করে এসে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যান—

বাঁ হাতের আঙুলে কড়া হাতের স্পর্শ পেয়ে শ্বেতা চমকে থেমে গেল, তারপর দরজার পাটটা খুলে ফেলে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, কী স্পর্ধা আপনার !

রাগে তার মুখ লাল হয়েই উঠেছিল, কিন্তু অনন্তের মুখের দিকে চেয়ে এক মুহূর্তে কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল।

অনন্ত গম্ভীর মুখে বলল, স্পর্ধা নয় শ্বেতা। পিঁপড়ে।

পিঁপড়ে কী ?

কাঠপিঁপড়ে—যা কামড়ালে আঙুল ফুলে যায়, খুব ব্যথা হয়।

কই পিঁপড়ে ?

মেঝে থেকে পেষা পিঁপড়েটা তুলে হাতের তালুতে রেখে মৃদু হেসে অনন্ত বলল, এই যে। বিনা কারণে এতকাল পরে তোমার আঙুল ছোঁব কেন ? আড়াল ঘুচিয়ে দেবারও কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না। গলা শুনে যে চিনতে না পারে—

শ্বেতা আহত হয়ে বলল, চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু আজ সে চেনাকে আমি স্বীকার করব কেন ? তোমায় চেনা আজ আমার অনুচিত নয় ?

অনন্ত হাসল, কী জানি ! উচিত-অনুচিত ন্যায়-অন্যায়ের সঙ্গে তোমার আজ কী সম্পর্ক আমার জানা নেই। কিন্তু অনুচিত যদি, এখন স্বীকার করলে কেন যে আমায় তুমি ভালো করেই চেনো ?

তুমি মুখোমুখি দাঁড়ালে বলে। একটু বসি, মাথাটা ঘুরছে।

চেয়ার প্রত্যাখ্যান করে শ্বেতা জানালায় গিয়ে বসল। কপালে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম, নিশ্বাসে চাপা ঝড়ের ইঙ্গিত। এ কথা বিশ্বাস করতেও ভয় হয় যে এতকাল পরে এমন অকস্মাৎ সে আবার অনন্তের সঙ্গে একঘরে বসে আছে। প্রকৃতির কালবৈশাখী ওঠে বহুক্ষণব্যাপী গুমোটের নোটিশ দিয়ে, তার জীবনের এই সব প্রলয়ংকর ব্যাপারগুলি কি কোনো নির্দেশ না দিয়েই এমনভাবে সহসা তাকে কাতর করে তুলবে ! তার মনে আজও অনন্তের স্থান যে কোথায় এই বিচলিত ভাব এই চাঞ্চল্য তা কী স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে দিল ! যদি সে জানত অনন্ত আজ আসবে, প্রস্তুত হয়ে থাকার সময় পেয়ে সে কি এখন হাসিমুখে কথা কয়ে শান্ত আত্ম-সমাহিত ব্যবহার করে নিজেকে গোপন রাখতে পারত না ? এ কী বিড়ম্বনা !

এমনভাবে হৃদয় অনাবৃত হয়ে যাওয়ার লজ্জা সে এখন কোথায় রাখে ?

অনন্ত বলল, আমায় তোমার বসতে বলা উচিত শ্বেতা। মনে রেখ আমি যেচে আসিনি, তুমি ডেকে এনেছ। অতিথিকে পাদ্যঅর্ঘ্য দেওয়া এ দেশের প্রথা, তুমি অন্তত বসতে বলো ! বলে হেসে অনন্ত নিজেই একটা চেয়ারে বসল। অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, এর কোনো মানে হয় না, বুঝলে ? তোমার এই নীরব প্রতিবাদ অর্থহীন। জান, তোমার কপালের ঘাম মুছিয়ে দিলে আজও একটু অস্বাভাবিক হয় না ? হাসিমুখে কথা কও। তা না পার, কবিত্ব করে বলো, হে আমার জীবনের শনি, হে আমার প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক, অভিমান ভুলে তুমি যে আমায় আবার খুঁজে নিলে এতে আমি ধন্য হলাম। তোমার অকল্যাণের তীব্র প্রেমে আমায় ঢেকে দাও, ঘিরে রাখো !

শ্বেতা কাতর হয়ে বলল, চুপ করো ! তুমি অমন করে বললে আমার চিন্তাশক্তি অসাড় হয়ে যায়। ভালোমন্দের জ্ঞান লোপ পায়। চিরদিন তোমার কাছে কী পীড়নটাই আমি পেলাম !

তুমি কি সহজ ভাগ্যবতী শ্বেতা ! তোমার জীবনের ইতিহাস জানলে বাংলার লাখো মেয়ের বুক হিংসায় ফেটে যাবে ! বৈচিত্র্য বেঁচে থাকাব প্রয়োজন ও সার্থকতার মাপকাঠি। তোমার জীবনে কী অসাধারণ বৈচিত্র্য আমি এনে দিয়েছি ? একদিকে ধনী মাতাল স্বামীর বিকর্ষণ, অন্যদিকে কবি ভাবুক প্রেমিকের আকর্ষণ ! সকলের ভাগ্যে এ কি জোটে !

শ্বেতা বিস্ফারিত চোখে শুনছিল, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, তবু আমার মতো দুঃখী কেউ নেই।

দুঃখই তো জীবনের সেরা বৈচিত্র্য—বলে অনন্ত হাসল।

শ্বেতা কিন্তু এ কথার জবাব দিল অপ্রত্যাশিত উষ্ণতার সঙ্গে—তুমি মিথ্যা বলছ। দুঃখ জীবনের বিড়ম্বনা। ছাব্বিশ বছরের বুড়িকে তুমি দার্শনিক তত্ত্বকথা শোনাতে এস না আজ। আমার জীবন বিড়ম্বিত হয়েছে কীসে জানো ? তোমার দেওয়া দুঃখে।

অনন্ত স্মিত মুখে বলল, আমি কোনোদিন তোমার এ কথার প্রতিবাদ করব না শ্বেতা। আমি কেবল বলব, দশ বছরের বিরহীর কাছে দার্শনিক তত্ত্বকথা শোনার ভাগ্য সকলের হয না।

দশ বছরেব বিরহী !

ব্যঙ্গ করলে ?

না!

ইচ্ছে করলে করতে পার। কিছু এসে যায না। কিন্তু সত্যি শ্বেতা, মন দিযে আমার উপদেশ শুনলে তোমার মনের প্রসারতা বাড়ত !

শ্বেতা ক্লিষ্ট স্বরে বলল, আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না।

অনন্ত তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে বলল, আমিও না। আমাদের ঝগড়ার সময় এখনও আসেনি, কী বল ?

এ কথার জবাব না দিয়ে শ্বেতা জানালা দিয়ে বাইবে চেয়ে রইল। বাগানের দিঘিটা চোখে পড়ে, দিঘির জল নাচিয়ে বায়ুর খেলা। বুকভরা ছোটো ছোটো ঊর্মি, চারিদিকে তট। তটে তটে তটোর্মির সন্ধি।

দিঘির পশ্চিম তীরে দাঁড়িয়ে কুণাল জলে ঢিল ছুঁড়ছে। দূর থেকে ছেলেকে দেখে শ্বেতার আজ যেন চমক লাগল। মাতাল স্বামীর খেয়ালের ভেতব দিয়ে বিধাতা যদি অমন অনুকম্পাই কবলেন, ওই সঙ্গে অনন্ত তৃষ্ণার অন্ত কবে এই অনন্তকেও ভুলিয়ে দিলেন না কেন ? তার ওই নাড়ি-ছেঁড়া ধনের সাত বছরব্যাপী প্রভাব ও আত্মমর্যাদার শিক্ষা কত সহজে ব্যর্থ করে দিচ্ছে এই একান্ত পর মানুষটি ! হায়, এ কী বিড়ম্বনা।

কুণাল মুখ তুলে চেয়ে জানালায় মাকে দেখে হাসল। শ্বেতার ইচ্ছা হল কপালে কঙ্কণহীন করাঘাত করে কেঁদে ওঠে !

অথচ জীবন যে রঙিন হয়ে উঠেছে বুঝতে কেবল প্রথম ধাক্কাটি সামলে ওঠারই বাধা ছিল। দশ বছর ধরে প্রেমিক ব্যথার পূজায় তাকেই নন্দিত করেছে, এর গর্ব আর আনন্দ কোনো নারীই কি অস্বীকার করতে পারে ! জীবনের একমাত্র পার্থিব প্রেমই সব যুক্তি-তর্ক বিশ্লেষণের প্রতিকূলেও দিনগুলি অবর্ণনীয় মাধুর্যে ভরে দেবার শক্তি রাখে বইকী !

সমবয়সি মাসি হিমানী বলে, তোর চোখ দেখে মনে হয় জেগে জেগে স্বপ্ন দেখিস। কদিন ধরে দেখছি রাতজাগা রোগেও ধরেছে।

শ্বেতা হেসে বলে, কবিতা লেখা অভ্যাস করছি। একটা অবলম্বন চাই তো মাসি !

মাসি গম্ভীর হয়ে বলে, কাব্য অবলম্বন করে পাড়ি জমাতে পারবি এমন আশা ভুলেও করিস না।

আশা কিছুরই করি না মাসি ! বলে শ্বেতা মাসির কাছ থেকে প্রস্থান করে। মাসি কিন্তু অত সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়, শ্বেতাকে খুঁজে নিয়ে আবার প্রশ্ন করে :

আমার খোকাকে একেবারে ত্যাগ করেছিস যে কদিন ?

আমার কাছে ও থাকতে চায় না,—কাঁদে।

কাল কিন্তু তোর কাছে যাবার জন্যই কাঁদছিল—বলে মাসি শ্বেতার মুখখানি ভালো করে নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করেন।

শ্বেতা ব্যগ্রতা দেখিয়ে বলে, সত্যি মাসি ? তবে তো এক্ষুনি ওকে আমার বড্ড দরকার !

মাসির খোকাকে খুঁজে নিয়ে শ্বেতা এমনই আদর আরম্ভ করে যে খোকা বেচারি কেঁদেই আকুল ! খোকার কান্নায় খুশি হয়ে শ্বেতা বলে, দেখলে মাসি ? সাধে কি নিই না ওকে !

যে আদরই তুই করিস ! একবেলা হবিষ্যি করে এত স্ফূর্তি তোর কোথা থেকে আসে তাই ভাবি।

বোনঝির মধ্যে কী একটা অদ্ভুত অসংগতি হিমানীর চোখে পড়ে, তাই এ রকম একটা সূক্ষ্ম খোঁচা না দিয়ে সে থাকতে পারে না। শ্বেতা মনে মনে রাগ করে, মাসির এই অনধিকার চর্চার কারণ সে খুঁজে পায় না। রাতভোর স্বামীর সোহাগ ভোগ কবে ভোরবেলা ও বিধবা বোনঝিকে খোঁচাতে আসে কেন !

শেষে শ্বেতার মন যায় খারাপ হয়ে। পশ্চিমের খোলা বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে সে স্কুলের টিনের চালাটার দিকে চেয়ে থাকে। হেডমাস্টারের বাড়ি স্কুলের ওদিকে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় না। শ্বেতা ভাবতে থাকে, নির্জন গৃহে নিঃসঙ্গ অনন্ত কী করছে।

হিমানীর ছেলের কান্না, কুণালের চিৎকার করে পাঠাভ্যাস, নীচে ঝি-চাকরের কলরব সমস্ত তার কাছে হঠাৎ মিথ্যা হয়ে যায়, চারিদিকে ঘর বাড়ি মাঠের বুকে সকালবেলার তাপহীন উজ্জ্বল রৌদ্রের ব্যাপ্তি, খানিকদূরে শিরীষগাছের শাখায় কয়েকটা শকুনির নিস্পন্দ অবস্থান, ঘোষেদের বাড়ির সামনের কাঁচাপথ দিয়ে মানুষের আনাগোনা, সমস্তই তার কাছে কেমন যেন দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে, মনে হয় দুবেলা দেখেও তার এই ক্ষুদ্র পৃথিবীকে সে চিনতে পারেনি ; এতদিন যা নিত্যকার দেখায় তুচ্ছ হয়েছিল, আজ তাদের মধ্যে অজস্র মানে, অতিরিক্ত মানে আবিষ্কার করা কঠিন নয়।

স্কুল থেকে এসেই কুণাল শুরু করে দেয়, জান মা, হেডমাস্টার মশাই আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে কত আদর করলেন।

কী আদর করলেন ?

এই চুমু খেলেন।

কোথায় চুমু খেলেন রে খোকা ? গালে ?

হুঁ।

শ্বেতা ছেলের দুটি গালই চুম্বনে ভরে দেয়, বলে, কার চুমু তোর বেশি ভালো লাগে বল তো ?

কুণাল সলজ্জে বলে, তোমার। হেডমাস্টার মশাইয়ের মুখে যা দাড়ি !

শ্বেতা নিঃশব্দে হাসে।

কুণাল নিজের মনে বলে, ওঁর ঘরে তোমার একটা ছবি আছে মা। লাল পর্দা দিয়ে ঢাকা। আমি পর্দা তুলে দেখে ফেললাম বলে বললেন, তুমি ভারী দুষ্টু খোকা। এমন মজা মা, ফুল দিয়ে তুমি অর্ধেক ঢেকে গেছ !

সত্যি খোকা ? শ্বেতার চোখ হঠাৎ ছলছল করে আসে। এ সেই ছবি, ন-বছর আগে শেষবিদায়ের দিন অনন্ত যেটা ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছিল। কায়ার প্রত্যাখ্যানে অনন্ত তবে ন-টি বছর ছায়া নিয়ে কাটিয়েছে ! হায়, মানুষটার জীবনে এ কী বিড়ম্বনা !

নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়, অকিঞ্চিৎকর। কুণালের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে শ্বেতা ভাবতে থাকে, বিনা তপস্যায় এত বড়ো সম্পদ তার জুটল কী করে ?

শিবরাম এসে বললেন, জানিস মা, আমাদের হেডমাস্টারটি বড়ো দুঃখী।

এ যেন জানা নেই এমনি ভাব দেখিয়ে শ্বেতা বলল, কেন বাবা ? ওঁর দুঃখ কী ?

শিবরাম গম্ভীর মুখে বললেন, সংসারে আপনার কেউ নেই, দেওয়ানা ফকিরের মতো ঘুরে বেড়ায়, দুঃখী বইকী ! বললে, ন-বছর আগে ওর বউ হারিয়ে গিয়েছিল, সেই থেকে—

বউ হারিয়ে গিয়েছিল ? ওঃ !

অনন্তের এই রূপকের চমৎকারিত্বে শ্বেতাব মন পুলকিত হয়ে উঠল। নিজের ঘরে গিয়ে সে নিজের মনেই আবৃত্তি করে চলল, বউ হারিয়ে গিয়েছিল ! বউ ! আজ আবার সেই হারানো বউকে পাওয়া গেছে। হারিয়েছিল তরুণী বউ, ফিরেছে ছাব্বিশ বছরের বুড়ি ! যে আজ মন্ত্রেরও বড়ো ঈশ্বরের বিধান মেনে বউ হতে ভয় পায় না !

সকাল থেকে শ্বেতা আজ আনমনা হয়েছিল। সেদিন শমনজারি করে গিয়ে অনন্ত আর আসেনি বটে, আজ কিন্তু সে নিলামের দাবি নিয়ে আসবে। আগামী অভিসারের কল্পনাতেই দিনের আলোয় শ্বেতার গালে রক্ত খেলা করে যাচ্ছিল। বুকের মধ্যে এখন থেকেই অনেক কিছুই যেন উত্তেজনায় খেপে উঠেছে। তারই প্রতিক্রিয়াই সারা দেহে এমনই অবসাদ যে কোনো কাজেই প্রবৃত্তি নেই।

ঝিকে দিয়ে নিজের ঘরখানা ধুয়ে মুছে রাখবে বলে খোঁজ নিয়ে শ্বেতা জানল, ঝি কোথায় যেন গেছে। বাড়িতে ঝি-চাকরের অভাব নেই, ঘর ধোয়ার কাজে কোনো বাধা হল না, কিন্তু দরকারের সময় নিজস্ব ঝিকে না পেয়ে শ্বেতা তার ওপর মনে মনে বিরক্ত হয়েই রইল।

ঝি ফিরতেই বলল, কোন চুলোয় গিয়েছিলি রাখীর মা ?

ঝি বলল, চুলোয় যাব কী জন্যে দিদি? হেডমাস্টারের বাড়ি গিয়েছিলাম। মা গো, কী কাণ্ডটাই হল !

কৌতূহলী হয়ে শ্বেতা বলল, কী কাণ্ড রে ?

শোনো বলি। রাখীর বাপের কাল জ্বর। আমায় বললে, কাজে তো যেতে পারব না রাখীব মা, সকালে একবার গিয়ে বাসনগুলো মেজে দিয়ে আসিস। কী করি, গেনু বাসন মাজতে হেডমাস্টারেব বাড়ি। বাসনটাসন মেজে তো দিদি আমি চলে আসব, গটগট করে বাড়ির ভেতব ঢুকল এক ফিরিঙ্গি খেস্তান মেমসায়েব।

মেমসাহেব ?

খাঁটি মেম নয় গো, দিশি। কিন্তু কী রূপ দিদি, আহা ! মা দুগ্‌গো যেন ফিরিঙ্গি মেয়ে হয়ে এলেন। পায়ে জুতো মোজা, ঘাঘরার মতো শড়ি পরা, গলায় লিকলিকে সরু হার। হেডমাস্টার তো ঘর থেকে বেরিয়ে ভিরমি যাবার জো ! হেঁকে বললে, তুমি কোথা থেকে এলে নীলা ? তোমায় না আসতে বারণ করেছিলাম ? মেয়েটা তার জবাবে বললে, তোমার কাছে না এসে কোথায় যাব ? তুমি আমায় ফেলে এলে কেন ? তারপর বিনিয়ে বিনিয়ে যা বললে দিদিমণি তাতে বুঝলাম মেয়েটা আমাদের মাস্টারের বউ।

কী বললে ?

বললে, আমি তোমার ইস্তিরি, তোমায় আমি ছাড়ব কেন? পিথিমির শেষ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে ঘুরব আমি।

তারপর ?

তারপর দুজনায় বিষোম ঝগড়া শুরু হল। ভয়ে মরি, খুনোখুনিই বা হয়। মাস্টার গগন ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বললে, এই বদস্বভাবের জন্য তোমায় আমি দেখতে পারি না নীলা ! যারা গায়ের জোরে বিয়ে দিয়েছে তাদের কাছে যাও, আমার কাছে এসেছ কেন ? মেয়েটা বললে, আমার কী দোষ ? তোমার কাছে আমি কোনো অপরাধ করিনি। মাস্টার তাতে আরও চেঁচিয়ে বললে, আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইস্তিরি হয়েছ, এই দোষ। যাও যাও চলে যাও তুমি। শুনে মুখে ন্যাকড়া গুঁজে মেয়েটা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মাস্টার আর কিছু না বলে গুম হয়ে দাওয়ায় বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে বললে, কেঁদো না নীলা, এদিকে এসো। তারপর আমায় বললে, তুমি যাও ঝি। আমার কী চলে আসতে পা ওঠে? কিন্তু কী করি—

লাটিমের মতো সারা বাড়িতে শ্বেতা একা পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল, ভিতরের অস্থিরতার সঙ্গে বাইরের সামঞ্জস্য রেখে যতটুকু স্বস্তি মেলে। কিন্তু স্বস্তি তার কাছে চিরদিনের জন্যই দুর্লভ হয়ে গেছে।

পাকা খবর পাওয়া গেল শিবরামের কাছে। প্রাতর্ভ্রমণের পর ফেরার পথে আজও তিনি হেডমাস্টারের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলেন।

বললেন, জানিস শ্বেতা আমাদের হেডমাস্টারের কাণ্ড ? ওর বউ হারানোব কথাটথা সব মিথ্যে। এই বুড়োর সঙ্গে সে দিন একটু ইয়ার্কি দিয়েছিল। বুঝলি !

শ্বেতা নীরব।

ওর বউ আজ এসেছে।

শ্বেতা তবু নীরব।

শিবরাম কন্যার মন্তব্যের জন্য খানিক অপেক্ষা করে বললেন, মানুষটা অতি বদ, অতি বেহায়া। নিজে থেকেই বললে, একটা প্রণয়কাণ্ডের নায়ক হয়েছিলাম গাঙ্গুলি মশাই। শ্বশুর আব শালারা জেলে দেবার ভয় দেখিয়ে—

শ্বেতা অসহিষ্ণু হয়ে বলল, আমি সব শুনেছি বাবা। ওকে তুমি তাড়িয়ে দাও। শিববাম ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, তাড়াতে হবে না মা, ও নিজেই চলে যাচ্ছে। এদিকে স্কুলটার উন্নতি হচ্ছিল বেশ, অমন কাজের লোক কী আর পাওয়া যাবে !

শ্বেতা শিবরামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, যাবে বাবা, ওর চেয়ে ভালো লোক পাওয়া যাবে। আমি তোমায় বলছি, ও যা কাজ করেছে সব লোকদেখানো, সব ভান, সব অভিনয—

রকমারি

বাড়িতে পা দিতেই গৃহিণীর উচ্চকণ্ঠ কানে আসিল। বেড়াইয়া ফিরিতেছিলাম, মনটা বেশ প্রফুল্ল ছিল। ভাবিলাম, প্রফুল্লতাটুকু বুঝি চৌকাঠের বাহিরেই রাখিয়া যাইতে হয়।

ভিতরে আর ঢুকিলাম না। বৈঠকখানা ঘরটা অন্ধকার, ধীরে ধীরে সেখানে প্রবেশ করিলাম। সুইচটা টিপিয়া দিতে গিয়া হাত গুটাইয়া নিলাম। আলো জ্বালিলেই খবর পৌঁছিবে। গৃহিণীর মুখের অন্ধকারের চেয়ে বাহিরের ঘরের অন্ধকারটা নিরাপদ মনে হইল।

জামাটা খুলিয়া চেয়ারের উপর ফেলিয়া রাখিয়া চৌকির উপর বিছানো ফরাশে গিয়া চুপ করিয়া বসিলাম।

পরিচিত কণ্ঠস্বর গ্রামে গ্রামে চড়িতে লাগিল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, ততোধিক তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ ; কাহাকে লক্ষ করিয়া যে প্রয়োগ হইতেছে বুঝিতে দেরি হইল না। সামনাসামনি কী রকম বিঁধিতেছিল ভগবানই জানেন, এতদূরে আসিয়া কিন্তু সব্যসাচীর অব্যর্থ সন্ধানের দুর্ভাগ্য লক্ষ্যের মতো আমাকে বিঁধিতে লাগিল। একটা মোটা গলা সক্রোধে গর্জিয়া কী বলিতে যাইতেছিল, পরক্ষণে থামিয়া যাইতেছিল। প্রলয় গণিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম।

কতক্ষণ পরে সুর নামিতে লাগিল। নামিতে নামিতে শেষে একেবারেই থামিয়া গেল। বুঝিলাম, অপরজন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছে।

পরক্ষণে পুরাতন ভৃত্য হরিচরণ ঘরে ঢুকিল। অন্ধকারে আমায় দেখিতে না পাইয়া খুব কাছেই বসিয়া পড়িল। বুঝিলাম কাঁদিতেছে। বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়। আমারই এক এক সময় কাঁদিতে ইচ্ছা করে। ও তো চাকর !

প্রশ্ন করিলাম, কী হয়েছে রে, হরে ?

ভূত দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া ওঠে, এক হাত দূরে আমার সাড়া পাইয়া হরিচরণ সেই রকম চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, দেখতে পাইনি বাবু—

বলিলাম, আচ্ছা আচ্ছা, তাতে আর কী হয়েছে। তোকে বকছিলেন কেন রে ?

হরিচরণ কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যাহা বলিল, তাহার মর্ম এই : আজ সকালে গৃহিণী তাহাকে শয়নগৃহের দেওয়াল ঝাড়িতে আদেশ করেন। বাজার হইতে ফিরিয়া কাজটা করিবে ভাবিয়া সে বাজারে চলিয়া যায়। তারপর আলুপটলের হিসাবের গোলমালে কথাটা বেমালুম তার মন হইতে সরিয়া পড়ে। সন্ধ্যার আগে হঠাৎ ঘরের কোণে মাকড়সার জাল নজরে পড়ায় গৃহিণীর মেজাজ সপ্তমে চড়িয়া যায় এবং হরিচরণের উপর তৎক্ষণাৎ দেওয়াল ঝাড়িবার আদেশ জারি হয়। সে যত বলে, কাল করব মা, গৃহিণী ততই উষ্ণ হইতে থাকেন। অগত্যা হরিচরণ সেই ভর সন্ধেবেলা দেওয়াল ঝাড়িতে আরম্ভ করে। হঠাৎ নিতান্তই তার কপাল দোষে, ঝাড়নে লাগিয়া একখানা ছবি পড়িয়া গিয়া ভাঙিয়া যায়। সেই হইতে বর্ষণ শুরু হইয়াছে। গৃহিণীর নাকি অভিমত—কাজ করিতে বলায় রাগে সে ইচ্ছা করিয়া ভাঙিয়াছে। নহিলে, সে কি চোখের মাথা খাইয়াছে যে অতবড়ো একটা জিনিস দেখিতে পায় না ?

আমি কি ইচ্ছে করে ভেঙেছি বাবু ? মা তো বুঝলেন না, কেবল বকুনি দিতে লাগলেন। এত কথা সয়ে থাকতে পারব না, কাল সকালে আমায় মাইনে দিয়ে বিদায় দেবেন।—বলিয়া উপসংহার করিল।

দরজার কাছে চড়া গলা শোনা গেল, কার কাছে মানের কান্না কাঁদছিস রে হরে ?

কাঠ হইয়া গেলাম। চাকরকে কাছে ডাকিয়া চুপিচুপি দুঃখের কাহিনি অর্থাৎ গৃহিণীর অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনিতেছি, ইহার চেয়ে বড়ো অপরাধ আমাদের দাম্পত্য পেনাল কোডে লেখে না।

ঘরে ঢুকিয়া খপ করিয়া সুইচটা টিপিয়া দিলেন। আমার দিকে বারেক চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন, বেড়িয়ে এসে চাকরের মুখে আমার নিন্দেটা বড়ো মুখরোচক লাগছে, না ? বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

হাসিটা ভয়ানক ! শুদ্ধ রাগ ঠান্ডা হয়, কিন্তু হাসির আড়ালের রাগটা বড়ো বেয়াড়া, কিছুতেই বাগ মানিতে চাহে না।

হরিচরণ কথা কহিল না। তার ঘরে গিয়া বিছানা পাতিয়া সটান শয়ন করিল। উঠিলাম,—বসিয়া লাভ নাই। চেয়ারের উপর হইতে জামাটা টানিতেই একটা চায়ের কাপ জামার তল হইতে পড়িয়া তিন টুকরা বড়ো এবং বহু ক্ষুদ্র টুকরাতে বিভক্ত হইয়া গেল। জামায় তিন ইঞ্চি ব্যাসের একটি গোলাকার দাগ। বরাদ্দ দুই কাপের উপর তৃষ্ণা পাওয়ায় দোকান হইতে এক কাপ চা আনাইয়া চুপিচুপি এখানে বসিয়া খাইয়াছিলাম। কাপটা আমিই চেয়ারের উপরেই নামাইয়া রাখিয়াছিলাম। অপকর্মের অত বড়ো নীরব সাক্ষীটাকে সরাইয়া ফেলিবার মতো বুদ্ধি ঘটে ছিল না। হায় রে, সেই কিনা আমায় ফাঁসাইল। জামার এ অবস্থা দেখিলে—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি বলিয়া একটা কথা আছে না ?

আলমাবি খুলিয়া মোটা মোটা আইনের বইয়ের পিছনে জামাটা লুকাইলাম, ভাবিলাম কাল সকালে ডাইং ক্লিনিং-এ পাঠাইয়া দিব। উপরে গিয়া শয়নগৃহে ঢুকিতেই নজরে পড়িল খাটের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া তিনি আমার একুশ টাকা দামের ফাউন্টেন পেনটি লইয়া একটা কাগজে খসখস করিয়া কী লিখিতেছেন। পায়ের শব্দে নজর তুলিলেন। বলিলেন, খালি গায়ে ? জামা কী হল ? বিলিয়ে দিয়ে এলে নাকি ? ব্যস, ডাইং ক্লিনিং খতম। নিজের উপর চটিয়া গেলাম। অন্য একটা জামা গায়ে দিয়া এ ঘরে ঢুকিলেই হইত। এই কার্তিকের শেষে স্বামীর খালি গা দেখিয়া কোন সুগৃহিণীর না জামার কথাটা মনে জাগে ! ওকালতি করিয়া বাহিরের লোকের আন্দাজ মতে মাসে তেরো চৌদ্দশো, নিজের হিসাবমতো সাত আটশো টাকা রোজগার করি, আব এইটুকু বুদ্ধি মাথায় আসিল না? ধিক ! বলিলাম, বাইরের ঘরে ফেলে এসেছি, নিয়ে আসছি। বলিয়া তাড়াতাড়ি পা বাড়াইলাম। আলমারির বইয়ের পিছনের গোপনতাটুকু গোপন করাই শ্রেয়।

গৃহিণী বলিলেন, থাক থাক, তুমি বোসো ! ঝিকে দিয়ে আনিয়ে নিচ্ছি। তুমি ওই ফ্লানেলের শার্টটা গায়ে দাও !

কপাল ! বাহিরের ঘরের সেই জাতীয় সাংঘাতিক হাসি হাসিয়া পূর্বে বরাবর একটা গোটা রাত কথা বন্ধ করিয়া আসিয়াছেন। আর যেদিন জামায় চায়ের দাগ লাগিল এবং একটা হাস্যকর জায়গায় সেটা লুকাইয়া রাখিলাম, সেই দিনই তিনি এমন সদয় হইয়া পড়িলেন। ঝিকে ডাকিলেন এবং জামা আনিতে পাঠাইলেন। একটু সরিয়া বসিয়া নিজের পাশে খাটের উপরকার জায়গাটা দেখাইয়া বলিলেন, এইখানে বোসো, একটা কাজ আছে। আগে শার্টটা গায়ে দিয়ে নাও। বেশ ঠান্ডা পড়েছে আজ, তোমার আবার যে সর্দির ধাত !

ওঃ ! কাজ আছে তাই ! প্রয়োজনের খাতিরে অমন হাসিটাকে নিরর্থক হইতে দিবার উদারতা গৃহিণীর ছিল।

জামাটা গায়ে দিয়া নির্দিষ্ট স্থানে বসিলাম। বলিলেন, মৃণালিনীকে চেন তো ?

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, চিনি।

কে বলো তো ?

বঙ্কিমবাবুর মানস কন্যা, এবং—

এবং তোমার প্রণয়িনী।—

আমি বলিলাম, থুঃ, ওয়াক্ !

গৃহিণী বলিলেন, তাই নাকি ! বেশ বেশ। শুনে সুখী হলাম। ঠাট্টা এখন থাক, কাজের কথা শোনো ! এ তোমার সে মৃণালিনী নয়, আমার সই। ধীরেনবাবুর স্ত্রী গো ! মনে নেই !

মনে ছিল, কিন্তু বলিলাম, উঁহু, মনে তো পড়ছে না।

তিনি বলিলেন, থাক থাক অত সাধু বনতে হবে না। যার গান শুনে ধীরেনবাবুর সঙ্গে স্ত্রীবদল করতে চেয়েছিলে তার কথা তিন মাসেই ভুলেছ বটে !

সর্বনাশ ! ধীরেনের কানে কানে বলা সেই পরিহাসটুকুও শুনিতে বাকি নাই !

বলিলেন, এখন শোনো। সই ভারী একটা মজা করেছে। আমার কাছে একটা চিঠি লিখেছে, ইংরিজিতে। একটা ভালো রকম জবাব লিখেছি, কারেক্ট করে দাও দেখি। বুদ্ধি তোমার যদিও কম, এম এ বি এলটা তো পাশ করেছ, পারা উচিত। ভুল থাকলে কিন্তু ধীরেনবাবু হাসবেন !

বলিলাম, মজুরি ?

অগ্রিম চাই ?

নিশ্চয়ই। যদি ফাঁকি দাও !

কণ্ঠস্বর যে কণ্ঠেই বাস করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নহিলে, ওষ্ঠে বাস করিলে গৃহিণীর এই পঁচিশ বৎসর বয়সের অধবসুধাই ঝাল লাগিত এবং ওষ্ঠ জ্বলিত।

বাহির হইতে ঝি বলিল, বাইরের ঘরে বাবুর জামা তো পেলুম না মা। গৃহিণী আমার মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, সদব দরজা বন্ধ ছিল দেখে এসেছিস।

ঝি বলিল, নজর করিনি মা।

নজর করিসনি ! ঘরে গেলি, একটা জামা খুঁজলি, আর তোর নজরে পড়ল না সদব দবজা খোলা কী বন্ধ ! চোখ চেয়ে কাজ করিস ? না, কাজ করবার সময় স্বপ্ন দেখিস ? অবাক করলি বাছা ! যা দেখে আয়।

ঝি চলিয়া গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, সদর দরজা খোলাই ছিল।

বেশ ! সেদিন এতটাকা খরচ করে এমন সুন্দর সাদা ভয়েলের পাঞ্জাবিটা করিয়ে দিলুম, যাবেই তো !

আমি আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, আমি একবার দেখে আসি। বলিয়া নীচে নামিযা গেলাম। আইনের কেতাবের পিছন হইতে জামাটা টানিতেই, খোঁড়াব পা যে খানায় পড়ে ইহাব সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্যই বোধ হয়, কোথায় একটা পেরেক লুকাইয়া ছিল, জামা খানিকটা ছিঁড়িয়া গেল। উহা লইয়াই উপরে গেলাম।

ঝি আসিয়া দাঁড়াইল।

গৃহিণী বলিলেন, জামা যে পেলিনে, এটা কী ?

দেখতে পাইনি মা।

তা দেখতে পাবি কেন ! এমন ব্যাগার ঠ্যালা কাজ করিস কেন বল তো ? এটা কি ছুঁচ না আলপিন যে কোথায় লুকিয়ে ছিল খুঁজে পাসনি ?

ঝি চুপ করিয়া রহিল।

গৃহিণী আরও কী বলিতে যাইতেছিলেন, ঝির দিকে চাহিয়া হঠাৎ বলিলেন, তুই কাঁপছিস কেন রে ?

শরীরটা ভালো লাগছে না মা।

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ আগাইয়া গিয়া তার কপালে হাত দিলেন। বলিলেন, ইস, তাইতো ! বেশ জ্বর হয়েছে যে ! আচ্ছা তুই কী রকম মানুষ বল তো ঝি ? জ্বর গায়ে কে তোকে কাজ করতে বলেছে ? সন্ধেবেলা অতগুলো বাসন মাজলি তুই কোন আক্কেলে শুনি ? একটা বাড়াবাড়ি অসুখ বাধিয়ে আমায় দশটা টাকা খরচ করাবার মতলব, না ? যা যা শুয়ে পড়গে যা। অবাক মানুষ তুই বাছা !

ঝি বলিল, ঠাঁইটা করে দিয়ে শুচ্ছি মা।

ফের মুখের ওপর কথা বলে ! কাল যদি তোকে দূর না করি তো--ভালো চাস তো শুয়ে পড়গে যা বাছা। কেন বকছিস, অসুখটা বাড়লে হাঙ্গামা তো আমাকেই পোয়াতে হবে !

ঝি আর কথাটি না বলিয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণী একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, দেখিগে শুলো কি না। যে সব তোমার ঝি-চাকর ! একটা যদি কথা শোনে ? বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ফিরিয়া আসিয়া আমার জামাটা লইয়া আলনায় টাঙাইতে গিয়া গৃহিণী সেই দাগ ও ছেঁড়া দেখিতে পাইয়া বজ্রগর্ভ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিলেন।

দাগ ও ছেঁড়ার একটা কাল্পনিক ইতিহাস আরম্ভ কবিয়াছিলাম,---ওটা হয়েছিল কী জান ?--- এই গিয়ে---

এ সময় সৌভাগ্যক্রমে নীচে বন্ধু নীরদবরণের কণ্ঠ শুনিলাম, ওহে---ঘুমুলে নাকি ?

নীবু এসেছে। কী বলছে শুনে আসি।---বলিয়া আমি চম্পট প্রদান কবিলাম।

নয়টার সময় বন্ধুকে বিদায় দিয়া, দুর্গানাম জপ করিতে করিতে উপরে গিয়া দেখি, গৃহিণী একমনে একখানি চিঠি পড়িতেছেন। মুখেব মেঘ কাটিয়া গিয়াছে।

নয়টার সময় আহার শেষ কবিযা আবার নীচে নামিলাম। আপিস ঘবে ঢুকিয়া মোকদ্দমাব কাগজপত্র লইয়া বসিলাম। হঠাৎ মনে পড়িল আমার জ্যেষ্ঠ শ্যালকের তিনদিন হইল পত্র আসিয়াছে। পত্রে বহুদিন আমার কোনো পত্র না লেখার জন্য অনুযোগ আছে এবং গৃহিণীও সে পত্রখানা পড়িয়াছেন। তৎক্ষণাৎ কাগজ লইয়া পত্র লিখিতে বসিলাম। লেখা শেষ করিয়া খামে ভরিয়া ঠিকানা লিখিতেছি, গৃহিণীর গলা কানে গেল, ভালো চাস তো উঠে আয় হবে, আমাকে রাগাস নে বলে দিচ্চি ! খাবি না তো তুই বিকেলে বললি না কেন ? অত ভাত নষ্ট হবে ?

হরের জবাব শোনা গেল, আমার অসুখ হয়েছে, আমি খাব না।

গৃহিণী বলিলেন, সে সব আমি জানি। চাকরি করতে এসে ভাতের ওপর রাগ করিস তোর লজ্জা করে না হারামজাদা ? উঠে আয় বলছি !

হরে বলিল, আমি খাব না।

গৃহিণী, বেশ ! বলিয়া স্থান ত্যাগ করিলেন এবং আমার আপিস ঘরে ঢুকিয়া একটা চেযারে বসিয়া পড়িলেন।

ঠিকানার উপরে ব্লটিং চাপা দিয়া বলিলাম, খাওয়া হয়েছে তোমার ?

হুঁ।

হরে বুঝি খেলে না ?

ঝংকার দিলেন, শুনতে পাও না ? এতক্ষণ ধরে সাধছিলাম কাকে ?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কথা বলাটা নিরাপদ নয়।

কতক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলিলেন, তুমি একবার হরেকে বলো গে না !

আমি ? তুমি বলতে খেলে না, আর আমার কথা শুনবে ?

চুপ করিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, মরুক, নিজেই খিদেব জ্বালায় জ্বলবে। একটা চাকর, তাকে আবার খোশামোদ করে খাওয়াতে হবে, ভারী তো ! চলো শোবে, রাত হল।

চলো, বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শয়ন ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, আচ্ছা, একটা শেষ ধর্মের ডাক দিয়ে আসি। একটা লোক না খেয়ে থাকবে তাই, নইলে—কথাটা শেষ না করিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। আমি একটু হাসিয়া বারান্দায় রেলিংয়ের কাছে দাঁড়াইলাম।

গৃহিণীর শান্ত গলা শোনা গেল, হরে, লক্ষ্মী বাবা ! উঠে এসে খেয়ে নে। মিথ্যে জ্বালাস কেন বল দেখি ?

আমার খিদে নেই, খাব না মা।

হরে !—কণ্ঠস্বর ঠিক কোন গ্রামের বলা শক্ত ! কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ। এবং ভর্ৎসনা, ক্রোধ, সান্ত্বনা ইত্যাদি এতগুলি ভাব লইয়া ওই একটি কথা উচ্চারিত হইল যে শুনিলে অবাক হইতে হয়।

হরিচরণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া আসিল।

গৃহিণী বলিলেন, রান্নাঘরে ভাত ঢাকা আছে, খেয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ো। কাল সকালে মাইনে নিয়ে তুমি বাবু বিদেয় হয়ো। তোমাকে দিয়ে আমার পোষাবে না। বলিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। নীচের বারান্দায় আলোতে দেখিলাম হরিচরণ নিঃশব্দে রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

তিনি উপবে উঠিবার আগেই আমি ঘরে ঢুকিয়া খাটের উপব বসিলাম। তিনি আসিলে বলিলাম, খেলে ?

দরজায় খিল দিতে দিতে বলিলেন, হুঁ, খাবে না আবার। কাল কিন্তু ওকে দূর করব।

আমি বলিলাম, বেশ তো।

পাশে বসিয়া বলিলেন, চিঠিটা কারেক্ট করেছ ? কাল সকালেব ডাকে যাওয়া চাই কিন্তু।

বলিলাম, না।

কেন ? সময় হল না বুঝি ?

গম্ভীরভাবে বলিলাম, তুমি না ম্যাট্রিক পাস করেছিলে ? না, বিয়ের সময় ওই কথা বলে আমাদের ঠকানো হয়েছিল ? ম্যাট্রিক পাস করেছ আব শুদ্ধ করে ইংরাজিতে একখানা চিঠি লিখতে পার না ?

কে বললে পারি না ? তবে, হঠাৎ যদি ভুল থাকে, চর্চা তো নেই ! তাই তোমায় অনুরোধটা জানিয়েছিলুম—তা ঘাট হয়েছে। বিয়ের সময় তোমার মামা না কে পুরো আধঘণ্টা ধরে ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেটখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছিলেন, মনে নেই ?

আমি হাসিয়া তাকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া বলিলাম, তাই নাকি ! তবে তো কথাই নেই। আচ্ছা দেব কাল কারেক্ট করে।

আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, আবার কাল ! তোমায় একটা কাজ করতে বললেই দশটা ওজোর কর। বেশি রাত হয়নি, পাঁচ মিনিটও লাগবে না, দাও না লক্ষ্মীটি এখুনি। কাল সকালের ডাকে পাঠিয়ে দেব।

আদেশ প্রতিপালন করিলাম।

পরদিন প্রাতে হরে আসিয়া বেতন ও বিদায় চাহিলে গৃহিণী তাহাকে শুধু মারিতে বাকি রাখিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় ফিরিয়া দেখি আমার সেই চায়ের দাগ-ধরা নূতন ফ্লানেলের পাঞ্জাবিটা হরে গায়ে দিয়া বেড়াইতেছে। ছেঁড়া অংশটুকু গৃহিণী সেলাই করিয়া তাহাকে দিয়াছেন।

কবি ও ভাস্করের লড়াই

প্রতিভার প্রতি চারণী দেবীর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল। রূপ কাকে বলে জানার পর থেকেই সে জানত এ তার মন উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে। অল্প বয়স থেকে এই ধরনের একটা জ্ঞান মনের মধ্যে পুষে রাখার ফলে চারণীর ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে একটি বিশেষ বৃহৎ প্রতিভাকে বৃহত্তর প্রতিভায় পরিবর্তিত করার জন্য সে পৃথিবীতে এসেছে ; তার নারী-জীবনের উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও সার্থকতা সন্তান-পালনের মতো প্রতিভার প্রতিপালনে। অবিকল এই উদ্দেশ্যের উপযুক্ত করে চারণী নিজেকে গড়ে তুলেছিল। কবি, চিত্রকর, ভাস্কর অথবা নিছক গদ্য-সাহিত্যিক ঠিক কোন ধরনের প্রতিভার বিকাশের ভারটা তাকে গ্রহণ করতে হবে জানা না থাকায়, সব দিক বজায় রাখার জন্য, এই চার রকম প্রতিভার উপযুক্ত করেই নিজেকে সে তৈরি করেছিল। স্কুল-কলেজে এ রকম ব্যাপক ও অবাস্তব শিক্ষার ব্যবস্থা নেই ; স্কুল-কলেজ প্রতিভাকে মানে না। স্কুল ছাড়িয়ে চারণী তাই আর কলেজে ঢোকেনি। বাড়িতে নিজেরই তত্ত্বাবধানে সে চারটি ক্লাস করত। সকালে কবিতার, দুপুরে ছবি ও খোদাই-এর, রাত্রে গদ্যসাহিত্যের।

এমনিভাবে পুস্তক ও অ্যালবামের মধ্যস্থতায় চারণী জগতের বড়ো প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হতে লাগল কিন্তু রক্তমাংসের প্রতিভার খোঁজ সে পেলে না। দু-চারজন কবি শিল্পী ও সাহিত্যিক যাদের সঙ্গে তার আলাপ হল তারা এত গরিব যে তাদের প্রতিভাকে চারণী মেনে নিতে পারলে না। তা ছাড়া, এ রকম প্রতিভার বিকাশের ভার নেবার সাধ চারণীর কোনো দিনই ছিল না। টাকাপয়সার গোলমাল সে অত্যন্ত অপছন্দ করত। প্রতিভার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে সে সর্বদাই রাজি ছিল কিন্তু আজ-আনো-আজ-খাও কালকে-উপোস-দাও যে প্রতিভা তার জন্য দু-চারঘণ্টা সময় ও দু-চার কাপ চায়ের বেশি আর কিছু উৎসর্গ করা তার কাছে ছিল নষ্ট করার শামিল। জীবন অমূল্য। দুটো-পাঁচটা ফালতু জীবনও মানুষেব থাকে না যে নষ্ট করা চলে। চারণী তাই তার পরিচিত গরিব প্রতিভাগুলির পাশ কাটিয়ে চলত। সুতরাং পাশে পাশে চলবার মতো প্রতিভাও সে আবিষ্কার করতে পারত না।

বেড়ে বেড়ে চারণীর বয়স যখন হল একুশ এবং তার ক্ষীণ আর্টিস্টিক দেহটি একটু স্থূল হয়ে উঠবার উপক্রম করলে তখন ভয় পেয়ে ও হতাশ হয়ে প্রতিভা-চিনির বোঝাবাহী এক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপকের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া সে প্রায় স্থির করে ফেললে। এমন সময় প্রায় এক সঙ্গে দুজন ধনবান রূপবান বলবান প্রতিভার আবির্ভাবে চারণীর জীবনে একটা খণ্ডপ্রলয় হয়ে গেল। প্রথম এল অরবিন্দ—উদীয়মান ভাস্কর। তারপর, অরবিন্দের সঙ্গে চারণীর বিয়ের কথা যখন পাকা হয়ে এসেছে, তখন এল মহাব্রত,—উদীয়মান কবি।

দুজনেই প্রতিভা। মরবার আগে সাগর পারে দু-চারজন ভক্ত না রেখে ওরা কেউ মরবে না, এটুকু নিঃসন্দেহ। চারণীর ভারী বিপদ হল। দুটি প্রতিভা-স্রোতের সম্পর্কে যে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হল তাতে পাক খেয়ে খেয়ে তার মাথা এমনই গুলিয়ে গেল যে সে কোনোমতেই ঠিক করে উঠতে পারলে না কোন স্রোতে ভেসে যাবে। আসলে চারণীর একেবারেই মনের জোর ছিল না। যখন যে প্রতিভাটি তার কাছে থাকত তার মনে হত তাকেই সে ভালোবাসে। দুজনের দুরকম কিন্তু প্রায় সমান জোরালো ব্যক্তিত্ব দিনের মধ্যে অন্তত দশবার তাকে পেন্ডুলামের মতো এদিক-ওদিক দোলাত আর বাকি

সময়টা দুজনের সমান আকর্ষণ অনুভব করে তার মনে হত নিজেকে চুলচেরা দুভাগে ভাগ না করে ফেললে এ টানাটানি সমস্যার আর মীমাংসা নেই।

আগে এসেছিল বলে অরবিন্দের কিছু কিছু দখলি স্বত্ব জন্মেছিল কিন্তু মহাব্রত এক রকম কথা বলেই তা বাতিল করে দিলে। এদিক দিয়ে অরবিন্দের চেয়ে সে ছিল বেশি শক্তিমান। আশ্চর্য ছিল তার কথা বলার ক্ষমতা। তার বক্তব্য রূপ নিত বক্তৃতার এবং তাতে যেখানে অখণ্ডনীয় যুক্তি থাকত না সেখানে থাকত বেগবতী আবেগ, আর যেখানে বেগবতী আবেগ থাকত না সেখানে থাকত অখণ্ডনীয় যুক্তি। দশ মিনিট তার কথা শুনে চারণী ভেসে যেত। তার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকত না যে তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও সার্থকতা এই বিস্ময়কর মুখর কবি-প্রতিভাকে সন্তানের মতো প্রতিপালন করা। মহাব্রত চলে যাবার পর অরবিন্দের আবির্ভাব ঘটা পর্যন্ত চারণী উত্তেজিত হয়ে থাকত। অরবিন্দ এসে বেশি কথা বলত না, যা বলত তাও মৃদু স্বরে, যার প্রধান সুরটা হত আদরের। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকিয়ে সে ম্লানভাবে একটু হাসত। দেখে চারণীর মন যেত গলে। তার মনে হত মহাব্রতের মুখর প্রেমের চেয়ে অরবিন্দের নিঃশব্দ ভালোবাসা ঢের বেশি কাব্যময়। মহাব্রতের উপস্থিতি অস্বাভাবিক, উন্মাদনাকর, অরবিন্দের কাছে বসে থাকার চেয়ে স্বাভাবিক কিছু নেই। চারণী টের পেত মহাব্রতকে সে ভয় করে। ভালোবাসা দিয়ে যত নয় এই ভয় দিয়ে মহাব্রত তাকে বশ করেছে। মহাব্রতের প্রচণ্ড অস্থির জীবনীশক্তি তাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে দেয়, তাই তার কাছে বসে থাকার সময় জগতে আর কোনো মানুষ আছে বলে সে ভাবতে পারে না আসলে অরবিন্দকেই সে ভালোবাসে।

চারণীর এই দ্বিধা ও সন্দেহের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হল তা এমনই জটিল যে বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিতে গেলে মনস্তত্ত্বের গবেষণার মতো শোনাবে। ঘটনাচক্রে প্রতিভা দুজনের একজন যদি কয়েকটা দিনেব জন্য দূবে সরে যেত তাহলে সব গোলমালের অবসান হতে পারত, কিন্তু যেহেতু চাবণীর কাছে একা থাকার সময় তাদের প্রত্যেকে টেব পেত চারণী তাকেই ভালোবাসে, কোনো ঘটনাচক্রই তাদের একটি দিনের জন্য তফাতে নিয়ে যেতে পারত না, লুকোচুরি খেলার মতো চাবণীকে নিয়ে তারা জয়পরাজয়ের খেলা খেলত। সকালে চারণীকে জয় করে যেত মহাব্রত, বিকালে বিজয়ী হত অরবিন্দ। যেদিন চারণীর হৃদয়-দুয়ারে তাদের আবির্ভাব ঘটত একসঙ্গে সেদিন ঠিক কে যে জয়ী হল বুঝতে না পেবে দুজনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বাড়ি ফিরত, আর দুর্বলচেতা চারণী দ্বিধাসন্দেহের পীড়নে ছটফট করে রাত কাটাত।

মোটা হতে আরম্ভ করে চারণী ভয় পেয়ে রোগা হবার জন্য খাদ্যনিয়ন্ত্রণ আরম্ভ করেছিল, পেট ভরে খেত না, পুষ্টিকর খাবার এড়িয়ে চলত। ফলে, এই সময় মোটা হওয়া স্থগিত হলেও তার মনের মতো তার শরীরটাও খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তার ওপরে তার অদ্ভুত সমস্যার অবিরাম পীড়ন সে সহ্য করতে পারলে না। তার অনিদ্রা অজীর্ণ ও অম্বলের ব্যারাম হল। তারপর হল নার্ভাস ব্রেকডাউন। একদিন মহাব্রত ও অরবিন্দ দেখা করতে এলে দুজনকেই সে তাড়িয়ে দিলে এবং আশ্রয় নিলে শয্যার। তার অসুখের সংবাদে ব্যাকুল হয়ে মহাব্রত ও অরবিন্দ বারবার তাকে দেখতে ছুটে গেল কিন্তু চারণী খবর পেয়ে চেঁচামেচি করে বাইরে থেকেই তাদের বিদেয় করে দিলে।

তারপর একদিন বাড়ির সকলে শহবের অন্য প্রান্তে বিয়ের নেমন্তন্ন রাখতে গেছে, খালি বাড়িতে চারণী অনেক রাত অবধি ঘুমোবার ব্যর্থ চেষ্টা করে মরিয়া হয়ে একরাশি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেললে। একরাত্রির ঘুম অথবা চিরনিদ্রা কোনটা তার কাম্য ছিল জানবার উপায় নেই, পরদিন অনেক বেলায় তার ঘরের দরজা ভেঙে দেখা গেল সে মরে গেছে। মরবার সময় বুকে বোধ হয় খুব যন্ত্রণা হয়েছিল, জামা ছিঁড়ে আঁচড়ে-আঁচড়ে নিজের বুক সে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে।

খবর পেয়ে প্রতিভা দুজন দেখতে গেল।

চারণীর একটি বউদি ছিল, অল্প বয়সে চারণীর অত্যন্ত বিদ্বান ও অত্যন্ত নীরস দাদার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। চোখের সামনে চারণীকে দুটি প্রতিভার পুজো পেতে দেখে তার বোধ হয় খুব হিংসা হত। সেই দুজনকে চারণীর ক্ষতবিক্ষত বুকটা দেখালে।

কেঁদে বললে, বুকে কত যাতনাই না জানি হয়েছিল।

চারণীর মৃত্যু অথবা অপমৃত্যুর আগে এ কথা অনায়াসেই মনে করা চলত যে তার প্রেমিক প্রতিভা দুটির মধ্যে লড়াই বাধিয়ে সে কৌতুক উপভোগ করছে। সাধ করে যে মেয়ে নিজেকে প্রতিভার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার পাগলামিকে প্রশ্রয় দিতে পারে সে এ রকম কৌতুক উপভোগ করবে তাতে বিস্ময়ের কী আছে। চারণীর মৃত্যুর পর এও খুব সহজে অনুমান করা গিয়েছিল যে জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিভা দুটি এবার তাদের মৃতা প্রিয়াকে অতি দ্রুত বিস্মৃত হবে। দুটি প্রেমিকের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে যে মেয়ে মজা দ্যাখে তাকে মনে রাখবে এমন প্রেমিক জগতে কে আছে ? আসলে এ রকম মেয়ের প্রেমেই কেউ পড়ে না। জয় করার জেদটাকে মনে হয় প্রেম। মরে গেলে অথবা সরে গেলে এ রকম মেয়েকে মনে রাখার বিশেষ কোনো কারণ থাকে না। যে রাজ্য রসাতলে গেছে তার অধিকার নিয়ে মামলাবাজ দুটি রাজা হয়তো মারামারি করে মরে, হৃদয়-সংক্রান্ত জয়পরাজয়ের সমস্যা হৃদয়ের সঙ্গে অন্তর্হিত হয়, জেদ যায় জুড়িয়ে, মৃতার স্মৃতির প্রতি একটু দয়ার্দ্র কোমলতা ছাড়া প্রেমের চিহ্নটুকু থাকে না। মহাব্রত ও অরবিন্দের কাণ্ডকারখানা দেখে প্রথম টের পাওয়া গেল নিছক রেষারেষি তাদের প্রেমের ভিত্তি ছিল না, চারণী তাদের নিয়ে কৌতুক করেনি। প্রতিভা দুটির শোকের মাপকাঠিতে আবার মাপজোক করে চারণীর হৃদয়ৈশ্বর্যের নূতন পরিমাণটা আবিষ্কার করে আমাদের অবাক হতে হল। ওরা দুজনে প্রমাণ করে দিল দু-ফোঁটা চোখের জল নিয়ে মরবার মতো সাধারণ মেয়ে সে ছিল না। হৃদয়-জয়ের বিপুল প্রতিভাই তার ছিল।

অরবিন্দ মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করে স্টুডিওতে আশ্রয় নিল, মহাব্রত চিনা আর ফিরিঙ্গি হোটেলে রকম-রকম পানীয় চেখে বেড়াতে লাগল। একজন শুকিয়ে যেতে লাগল ঘরের কোণে নীরবে, আর একজন শুকিয়ে যেতে লাগল বাইরে হইচই করে। লড়াই যেন তাদের থামেনি। প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তারা যেন চারণীর জন্য পাল্লা দিয়ে শোক করতে লাগল। তাদের প্রতিভায় যারা সন্দেহ করত এবার তাদের সন্দেহ দূর হল। অল্পবিস্তর উন্মত্ততা প্রতিভার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ।

তাদের এই অসামাজিক অস্বাভাবিক জীবনযাপনে আত্মীয়স্বজন ব্যথিত হল, প্রতিবাদ করল, বন্ধুবান্ধব হাসিগল্পের আড্ডায় টানবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের নির্লিপ্ত ভাব অব্যাহত রইল। হাসতে না জানলে এ জগতে বন্ধু টেঁকে না, দুজনের মনোবিকার সহ্য করতে না পেরে বন্ধুরা তাদের রেহাই দিল। ব্যর্থ হয়ে হাল ছাড়ল আত্মীয়স্বজন। শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে তারা নিঃসঙ্গ হয়ে গেল। কেবল একজন, পরের সুখদুঃখ নিয়ে নাড়াচাড়া করার প্রবৃত্তি যার মজ্জাগত, সে-ই জোঁকের মতো দুজনের পিছনে লেগে রইল। সে চারণীর ঈর্ষাতুরা বউদি প্রিয়ংবদা। কানাঘুষায় এদের ব্যাপার শুনে সে যেদিন জানতে পারল ভালোবাসার চোটে তার ননদটিকে মেরে শোকের চোটে এবার এরা নিজেদের মারছে, সেইদিন দারোয়ান পাঠিয়ে দুজনকে সে করল নেমন্তন্ন। কিন্তু এরা কেউ গেল না। তাতে অপমান বোধ করে প্রিয়ংবদা দিন পনেরো আর উচ্চবাচ্য করল না। কিন্তু পরের সুখদুঃখের কারবার আয়ত্ত করার কৌতূহল প্রিয়ংবদার বড়ো তীব্র। পনেরো দিন উঠতে বসতে যতবার তার মনে হল একটা লায়লা ও দুটি মজনুর আবির্ভাবের মতো বিস্ময়কর ব্যাপার তার আশেপাশেই ঘটেছে, অথচ সময়মতো ব্যাপারটা সে ভালো করে অধ্যয়ন করেনি ততবারই তার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠতে লাগল। সে আবার দারোয়ান পাঠাল। এবার এরা দুজনেই নেমন্তন্ন গ্রহণ করল

কিন্তু নেমন্তন্ন রাখতে ভুলে গেল। তৃতীয়বার প্রিয়ংবদা দারোয়ানের হাতে দুজনকে কড়ামিঠে এমনই একটা অদ্ভুত চিঠি পাঠাল যে সেদিন বিকেল হবার আগেই দুজনে তাদের বাড়ি গেল।

চারণীর মৃত্যুর পর চারণীর বাড়িরই বসবার ঘরে, যেখানে দেওয়ালের গায়ে চারণীর ফটো ছিল আর চারণীর হাতে আঁকা ছবি ছিল আর অর্গানে চারণীর গান স্তব্ধ হয়ে ছিল আর আবহাওয়ায় চারণীর হাসির রেশ ছিল, সেইখানে প্রিয়ংবদার মধ্যস্থতায় কবি ও ভাস্করের দেখা হল। পরস্পরকে দেখে প্রথমে তারা স্ত্রীলোকের মতো হিংসা ও বিদ্বেষ অনুভব করল, দুজনেরই মনে হল গলা টিপে একটা মানুষকে হত্যা করতে পারলে তাদের সুখের সীমা থাকবে না। তারপর এই পাশবিক ইচ্ছার জন্য লজ্জায় তারা খানিকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে রইল। তারও পরে তাদের দুজনের প্রত্যেকে স্থির করে নিল যে, না, বাস্তব জগতে তাদের শত্রুতা নেই ; চারণীর দেহটা অদৃশ্য হয়েছে সত্য কিন্তু চারণীর প্রেম সে পেয়েছিল, সুতরাং আধ্যাত্মিক পরাজয়ের গ্লানিতে দগ্ধ হয়ে যে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেছে তার সঙ্গে আর বিবাদ কীসের ? প্রত্যেকে এই রকম ভেবে পরস্পরকে তারা ক্ষমা করল।

অরবিন্দ বলল, নতুন কবিতা কিছু লিখলেন ? মরুনন্দিনীর কবিতাগুলি বড়ো ভালো লেগেছিল। মিছরির মতো জমাট-বাঁধা রস—তবে ঝাঁঝটা একটু বেশি,—অ্যামোনিয়ার মতো। বড়ো বেশি অভিভূত করে দেয়।

মহাব্রত বললে, অল্প বয়সের লেখা। ঝাঁঝটাই তখন বেশি ছিল ! নতুন কিছু লিখিনি। আপনি নতুন কিছুতে হাত দিয়েছেন ? গতবার বোম্বের এগজিবিশনে আপনার উর্বশী দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

এই ভাসাভাসা ভদ্রতার আলাপ গড়িয়ে গড়িয়ে সন্ধ্যায় আলো জ্বালবার সময় এতদূর এগিয়ে গেল যে উপেক্ষিতা প্রিয়ংবদা দেখে শুনে থ বনে গেল। কেবল এদের দুজনকে নেমন্তন্ন করলে খারাপ দেখাবে বলে সে আরও দু-চারজনকে বলেছিল, সকলের হাসিগল্প গানের মাঝখানে এই দুই মহাশত্রু যে পরস্পরের মধ্যে এমন করে ডুবে যাবে প্রিয়ংবদার তা কল্পনাতেও আসেনি। ওরা কী পাগল ? চেহারা অবশ্য দুজনেরই অনেকটা পাগলের মতো, তবু ঘরে যতগুলি লোক আছে তাদের সকলের চেয়ে জ্ঞান ও বুদ্ধিতে ওরাই যে শ্রেষ্ঠ তাতে সন্দেহ নেই। খণ্ডখণ্ড ঝাপসা জগৎ নিয়ে যাদের কারবার ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে সূর্যালোকের চেয়ে তীব্র আলোয় ঝলসানো সম্পূর্ণ এক একটা জগৎ দেখে তাদের ভয়ই করে। তবু ওরাই এ রকম খাপছাড়া কাণ্ডগুলি ঘটায় কেন ? তা ছাড়া, আলাপ করবে বলে সে ওদের নেমন্তন্ন করেছে। অথচ কথা কইলে জবাব পর্যন্ত দেয় না। খাওয়ার পর তার কাছে বিদায় না নিয়েই আলাপ করতে ওরা যখন চলে গেল প্রিয়ংবদার মনে হল সকলের সামনেই সে কেঁদে ফেলবে।

তাদের ছাড়াছাড়ি হল পথে। দুজনের মনের পরিচয় পেয়ে দুজনের কাছেই তারা তখন অবাধ হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তারা মিশতে পারে না ; তাদের মনের গড়ন স্বতন্ত্র, তারা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে। আজ আলাপ-আলোচনার উপযোগী একটি সঙ্গী লাভ করে দুজনেই যেন তারা ধন্য হয়ে গেল। কথা রইল, পরদিন মহাব্রত অরবিন্দের স্টুডিও দেখতে আসবে। সঙ্গে আনবে তার অপ্রকাশিত কবিতা। অরবিন্দ কবিতা শুনবে, মহাব্রত দেখবে মর্মর-মূর্তি।

মহাব্রত সকালেই এল। কথা ছিল বিকালে আসবার। চাকর প্রথমে সোজা জবাব দিল যে দেখা হবে না। তারপর মহাব্রতের প্রচণ্ড এক ধমক খেয়ে সে অরবিন্দের বোন পদ্মাকে ডেকে আনল। পদ্মা বলল যে সকালে তার দাদা কাজে ব্যস্ত থাকে, কারও সঙ্গে দেখা করে না।

মহাব্রত রেগে আগুন হয়ে বললে, আমায় নিজে আসতে বলেছিল। দেখা করবে কি করবে না সে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে দয়া করে খবরটা দিন যে মহাব্রত এসেছে।

পদ্মা বললে, আসতে বলেছিল তো আসুন। খবর দেবার আমার সময় নেই।

চাকরের সঙ্গে মহাব্রতকে সে চারতলায় অরবিন্দের স্টুডিওতে পাঠিয়ে দিল। স্টুডিওটা ধরলে বাড়িটাকে চারতলা বলা চলে, আসলে তিনতলা বাড়ির ছাদে অরবিন্দ স্টুডিও বানিয়েছে। দেওয়াল ইটবালির চেয়ে কাচেরই বেশির ভাগ, মাথার উপরে স্কাইলাইটও আছে। আলোয় স্টুডিওর ভেতরটা ঝলমল করছিল। ভেতরে ঢুকে হঠাৎ যেন আহত হয়ে মহাব্রত দাঁড়িয়ে পড়ল। অরবিন্দ নিবিষ্টচিত্তে চারণীকে রূপ দিচ্ছে, পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি চারণী। সমাপ্ত ও অসম্পূর্ণ কয়েকটি মাটি ও পাথরের দর্শক স্টুডিওর এক কোণে ভিড় করে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে।

অরবিন্দ তার দিকে পিছন ফিরেছিল, তার আবির্ভাব সে টের পেল না। মহাব্রত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্যমুখী মর্মরশুভ্রা চারণীকে দেখল। মহাব্রতের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কদিনের মধ্যেই চারণীর জীবন সমস্যার ভারে পীড়িত হয়ে উঠেছিল, চারণীর অবাধ নির্মল হাসি ও চোখের সকৌতুক চাহনি দেখবার সুযোগ তার কখনও হয়নি। এই চারণীকে তার অচেনা মনে হল। তার অগোচরে চারণীর এই অভিব্যঞ্জনা ও ভঙ্গিমার সঙ্গে অরবিন্দের এতদূর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল যে পাথরে সে তা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে, এ কথা মনে করে মহাব্রতের হৃদয় ঈর্ষায় উদ্‌বেল হয়ে উঠল। চারণীর এই প্রতিমূর্তিতে অনেক খুঁত ছিল। সে খুঁতগুলিকে পর্যন্ত মহাব্রত চারণীর অদেখা রূপের বৈশিষ্ট্য বলে ভেবে নিল। তার কষ্টের সীমা রইল না।

অরবিন্দ যখন তাকে দেখতে পেল সে হাঁ করে চারণীর দিকে তাকিয়ে আছে, গতরাত্রির নিবিড় অন্তরঙ্গতা ভুলে গিয়ে অরবিন্দ প্রথমে খুব বিরক্ত হল। এমন কী খবর না দিয়ে একেবারে স্টুডিওতে উঠে আসার জন্য কয়েকটা রূঢ় কথা তার ঠোঁটের কাছে এগিয়েও এল। কথাগুলি চেপে নিয়ে সে বলল, কতক্ষণ এসেছেন ?

মহাব্রত বললে, এই খানিকক্ষণ। দুটো মূর্তি করেছেন কেন ?

এ প্রশ্নের জন্য একটু ভনিতার প্রয়োজন ছিল। অন্তত কিছুক্ষণ অন্যকথা বলে প্রশ্নটা উচ্চারণ করলেও আকস্মিকতা একটু কমত। কাল তারা ইঙ্গিতেও চারণীর সম্বন্ধে কোনো কথা বলেনি।

অরবিন্দ বলল, এ মূর্তিটা ভালো হয়নি। মন শান্ত হবার আগেই কাজ আরম্ভ করেছিলাম, অনেক খুঁত থেকে গেছে। হাসিটা বড়ো স্পষ্ট আর—

মহাব্রত ছেলেমানুষের মতো আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, আপনার মন শান্ত হয়েছে ?

অরবিন্দ বলল, হ্যাঁ।

সেই দিন থেকে মহাব্রত প্রতি সন্ধ্যায় হোটেলে হোটেলে মদ চেখে বেড়ানো বন্ধ করলে। দিবারাত্রি একটা অস্থির আবেগে সে চঞ্চল উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে রইল। কাব্যের যে প্রেরণা তার মদের নেশার সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল আবার তাকে পৃথক করে আয়ত্ত করার জন্য সে পাগল হয়ে উঠল। জগতের সমস্ত কবির দুয়ারে সে স্মরণ নিল, কবিতার পর কবিতা পাঠ করল। নিজের পূর্বকৃত রচনা পড়ে পড়ে সে নিজেকে খুঁজল। বড়ো কষ্টে মহাব্রতের দিন ও রাত্রি কাটতে লাগল। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে সে শিথিল হতে দিলে না। পাথরে চারণীকে অমর করার তপস্যায় অরবিন্দ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। কবিতায় চারণীকে অমর করতে হলে তার তপস্যা আরও উগ্র হওয়া চাই।

মহাব্রতের শরীর অল্পে অল্পে ভালো হল। মনে ধীরে ধীরে ভাব ও আবেগের আবির্ভাব হতে লাগল। ফাল্গুনের গোড়ায় অনেক রাত্রে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে সাগর-ভেজা বাতাসের আর্দ্র স্পর্শ অনুভব করতে করতে মাঝে মাঝে সে যেন সুর-ছন্দ-ধ্বনি-ভাব-গন্ধ-বেদনা প্রভৃতির সমন্বয়-করা তার হারানো কাব্যজগতের সন্ধান পেতে লাগল। সব অস্পষ্ট, ঝাপসা। তবু আশা জাগাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। লেখার তাগিদও যেন সে অনুভব করল। ক্ষীণ, ভীরু সে তাগিদ। মহাব্রত তাতেই খুশি হল। তারপর চৈত্রমাসে একদিন রাতে সে চারণীকে স্মরণ করে লিখতে বসল স্মৃতি-কাব্য,

ইন-মেমোরিয়মের মতো যার অমরতা চারণীকে অমর করবে। তাকেও করবে অবশ্য কিন্তু সেটা বাহুল্য, তার কোনো প্রতিকার নেই। পুরানো দিনের মতো কাগজপত্র ছড়িয়ে, বিদ্যুতের আলো নিভিয়ে রুপোর দীপাধাবে মোমবাতি জ্বালিয়ে সে লিখতে বসল। পাশের ফুলদানি থেকে সোনা রঙের চাঁপা আর সবুজ রঙের কাঁঠালিচাঁপা ফুল পুরানো দিনের মতো তাকে তীব্র মিশ্রিত গন্ধ সরবরাহ করতে লাগল। গভীর রাত্রির নিজস্ব ছাড়া ছাড়া শব্দ দিয়ে ভাগ করা যে স্তব্ধতায় আগে সে কবিতা লিখত আজও সে স্তব্ধতাই তাকে ঘিরে রইল। কিন্তু এক লাইন কবিতা সে লিখতে পারল না, কলম হাতে করে যতক্ষণ সে ঈষৎ নীলাভ কাগজের দিকে চেয়ে রইল তার সময় ব্যেপে তার মনে জেগে রইল এই কথাটা যে, চারণীকে অমরতা দেবার জন্য সে কবিতা লিখতে বসেছে। এই জ্ঞানকে মগ্নচেতনায় তলিয়ে দিয়ে আসল কবিতাকে সে মনে আনতে পারল না। মহাব্রতর ভয় হল। পরদিন সে আবার লিখবাব চেষ্টা করল। যে অবস্থায় সে তার শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা করেছে তেমনই অনুকূল অবস্থাতেও আজ এক লাইন কবিতা তার মনে এল না। কতকগুলি জোড়-বিজোড় শব্দ শুধু তার মনে ভেসে বেড়াতে লাগল।

মহাব্রতর শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। ভয়ে সে যেন মরার মতো হয়ে গেল। এ কোন অদৃশ্য দুর্বোধ্য শক্তি তার প্রকাশের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে, তাব কাব্যের উৎসমুখে শিলাব মতো চেপে বসেছে ? আব আত্মাকে অবরোধ করেছে কীসে ? মহাব্রতর ঘুম এল না বলে তার মদ খাবার ইচ্ছা হল। বাড়ি থেকে মদের গন্ধটুকুও বিতাড়িত করে দিয়েছিল বলে হঠাৎ সবদিক দিয়ে নিজেকে ব্যর্থ ও অসহায় মনে করে সে কাঁদল। সেদিন সকালে অরবিন্দের স্টুডিওতে চারণীকে দেখে সে টের পেয়েছিল চারণী অরবিন্দকে ভালোবাসত। তা না হলে অরবিন্দেব জন্য সে অমন করে হাসবে কেন, অমন করে চাইবে কেন ? সে দিন থেকে মহাব্রতের একটা স্বর্গ ভেঙে ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে। চারণীর অমর স্মৃতিকাব্যটিও যদি সে লিখতে না পারে, সেই পরাজয় সে সহ্য করবে কী করে ? বেঁচে থাকবে সে কীসের জন্য ?

বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য অবশ্য জগতে সংখ্যাতীত, খুঁজলেও মেলে, না খুঁজলেও মেলে, কিন্তু মহাব্রত প্রতিভাবান কবি বলে চারণীর স্মৃতিকে অবলম্বন করে এক অমর ব্যথাকাব্য রচনা করা ছাড়া জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্যই দেখতে পেল না। এও সে ভুলে গেল যে উত্তেজিত অশান্ত মন নিয়ে অমর কাব্য রচনা করা যায় না। হ্যালামের মৃত্যুর সতেরো বছর পরে টেনিসনের ইন-মেমোরিয়ম প্রকাশিত হয়, বন্ধুকে যখন কবি ভুলে গেছে, সুদূর অতীতে নিয়তির রূঢ় আঘাতে প্রাপ্ত ভাব-তরঙ্গের স্মৃতিটুকু মাত্র যখন কবির অবলম্বন, বন্ধুবিয়োগ-বেদনা নয়। আর সে তো শুধু বন্ধু। নিজের মরণ ঘনিয়ে না এলে সুদূর অতীতে হৃদয়ে বিপর্যয় আনা স্মৃতিটুকু মাত্র মনে রেখে মৃতা প্রিয়াকে কে ভুলতে পারে যে অমব স্মৃতিকাব্য লিখতে পারবে ? করুণ রসে টইটম্বুর কবিতা লেখা যায়, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের সেই আবেগ উগ্র কাব্য নিয়ে মানুষ হইচইও করে, কিন্তু লোনা রাসায়নিক চোখের জলের মতো সে বাঁচবে কেন, সে উপে যায়,—সে তো মড়াকান্না। প্রতিভাবান কবি হয়েও মহাব্রত এ সব কথা যেন ভুলে গেল। জবরদস্তি করে পরপর কয়েক রাত্রি সে কাব্য লিখল আর সকালে উঠে না পড়েই ছিঁড়ে ফেললে।

তারপর সে শহর ছেড়ে গেল পালিয়ে।

নানা দেশ ঘুরে মন একটু ঠান্ডা হয়ে এলে হঠাৎ একদিন তার মনে হল চারণীকে নিয়ে যে কারণে সে কবিতা লিখতে পারেনি তা হয়তো এই যে, তার কবি-মন কাব্যরচনার অনুপযোগী স্মৃতিকেই শুধু গ্রহণ করেছে। চারণীর জীবনে যে আবহাওয়া ছিল, যেটুকু বাস্তবতা সমস্ত কবিকল্পনার ভিত্তি, হয়তো সে তা হারিয়ে ফেলেছে। যে সব বস্তু ও বাস্তবতা চারণীকে ঘিরে ছিল তাদের মাঝখানে বসে লিখলে সে লিখতে পারবে। চারণীর অনুশীলন কক্ষটির কথা মহাব্রতর মনে এল। সে ঘরে দীর্ঘ

কাল ধরে সে নিজেকে প্রতিভার উপযোগী করে গড়ে তুলেছিল। সেই ঘরে বসে সে ছবি আঁকত, কবিতা পড়ত, ভাস্কর্যের চর্চা করত, সাহিত্যের পরিচয় নিত। চারণীর আঁকা ছবি ও খোদাই করা মূর্তি, তার পড়া অসংখ্য বই, তার ব্যবহার-করা অসংখ্য বস্তু সে ঘরে চারণীর স্বকীয়তাকে আজও ধরে রেখেছে। ওই ঘরে দুদণ্ড বসলে স্মৃতিকাব্যের আরম্ভটা হয়তো সে আয়ত্ত করতে পারবে।

আশান্বিত হৃদয়ে মহাব্রত কলকাতায় ফিরল। কোনো বিষয়ে তাড়াহুড়ো করতে আজকাল তার ভয় করে। প্রথমে দুদিন বিশ্রাম করে নিল। পরের দিন সকালে সে গেল চারণীদের বাড়ি। শুনল চারণীর সেই ঘরখানা সাফ করে তিনদিন আগে প্রিয়ংবদা একটি মেয়ে প্রসব করেছে। চারণীর ছবি বই প্রভৃতি জিনিসপত্র খানিক এ-ঘরে ও খানিক সে-ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

চারণীর শোবার ঘর ?

সে ঘরে চারণীর পিসিমা শোন।

তারপর মহাব্রত অনেক ভেবে একদিন অরবিন্দের স্টুডিওতে গেল। সেখানে চারণীকে একবার অনেকক্ষণ ধরে দেখে এসে শেষ চেষ্টা করে দেখবে। এতে তার লজ্জা, চারণীকে অমর করার গৌরব এতে তার ক্ষুণ্ণ হবে। কিন্তু উপায় কী ? যেখান থেকে হোক স্মৃতিকাব্য আরম্ভ করার প্রেরণাটুকু সংগ্রহ করতে না পারলে তার যে একেবারেই পরাজয়।

অরবিন্দ তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বলল, আসুন।

মহাব্রত চেয়ে দেখল, চারণীর দ্বিতীয় প্রতিমূর্তি সমাপ্ত হয়েছে। আগেকার হাস্যমুখী মূর্তির চেয়ে এ মূর্তি বহুদিক দিয়ে ভিন্ন—সব দিক দিয়ে। সে মূর্তির খুঁত ও অসম্পূর্ণতা আজ এ মূর্তির সঙ্গে তুলনা করে সে ধরতে পারল। চোখের পলকে এও সে বুঝতে পারল এবারও অরবিন্দের কাছে তার হার হয়েছে। অরবিন্দ সৃষ্টি করেছে চারণীকে, ঈষৎ স্থূলকায়া, ভীরু চোখ, শ্রান্ত বিপন্ন হাসি, দ্বিধা-সন্দেহ-ভয়ে লেপা মুখ, নিখুঁত ও আসল চারণী। অরবিন্দ তাকে অমরতা দেয়নি, পরের কাছে এ মূর্তি হয়তো প্রশংসার বেশি কিছু পাবে না, কিন্তু কী দাম অমরতার ? অরবিন্দ যতকাল বাঁচবে চারণী তার সঙ্গে থাকবে। মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে এনে চারণীকে সে জীবন-সঙ্গিনী করেছে। এরপর তাকে স্মৃতিকাব্যের অমরতা দিতে চাওয়া হাস্যকর।

মহাব্রতর মাথার ভেতরে কেমন গোলমাল হয়ে গেল। অরবিন্দের হাতুড়ি আর বাটালিটা তুলে নিয়ে চারণীর মুখখানা সে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। সে যেন অসতী স্ত্রীকে সাজা দিচ্ছে। অরবিন্দ সবটুকু জীবনীশক্তি ব্যয় করে এই মূর্তি গড়েছিল। চামড়া দিয়ে হাড়-ঢাকা শরীরে তার একটুও শক্তি ছিল না। এবারও সে তার চারণীকে বাঁচাতে পারলে না।

আশ্রয়

শচীন দত্তের বাড়িতে চাকর টেকে না। মাইনে কম, খাওয়ার কষ্ট, পান থেকে চুন খসলে গালাগালি, সুতরাং চাকর টিকবে কেন ! কেরানির মতো ওদের চাকরি তো দুর্লভ নয়, লোকে ডেকে নিয়ে কাজ দেয়।

এক মাস কাজ করে দীনবন্ধুও পালাবার উপায় দেখল। নতুন মাসের দুই তারিখে সে এক পয়সা দিয়ে চারখানা চিঠির কাগজ কিনে ফেলল। আড্ডায় বসে আদালতের পিয়নকে দিয়ে এই মর্মে পত্র লেখাল যে, দেশে তার বউ মরো-মরো, স্বামীকে যেতে লিখছে সকাতরে।

চিঠি পড়ে শচীন দত্তের স্ত্রী বিমলা নাক সিঁটকে বললেন, মরো-মরো তো চিঠি লিখলে কী করে শুনি ? সেজোমেয়ে নন্দরাণী হেসে বলল, বজ্জাতি, না রে ? তোর বউ তোকে খামে চিঠি লেখে, ইস ! কই দেখি বার কর তো খামটা ?

দীনবন্ধু বলল, খামটা ফেলে দিয়েছি আজ্ঞে। আর তেনা চিঠি লিখবে কেন, চিঠি লিখেছে আমার ভাই জগবন্ধু।

দীনবন্ধুর পেটে অনেক বুদ্ধি।

বিমলা অনেকক্ষণ তানানানা ভাঁজলেন, শেষে বললেন, আচ্ছা যাস বাড়ি, কিন্তু লোক দিয়ে যেতে হবে বাছা। নইলে মাইনে পাবিনে।

নন্দরাণী বলল, এই শীতে আমাকে দিয়ে বাসন মাজালে তোর কী হবে জানিস ? গাড়িতে কলিশন হয়ে বাড়ির বদলে একেবারে স্বর্গে চলে যাবি।

দীনবন্ধু আড্ডায় ফিরে বঙ্কু বঙ্কুকে ধরল তাকে উদ্ধার করে দিতে হবে। বিশেষ কিছু না, সে শুধু শচীন দত্তের বাড়ি কাজ করে আসবে। তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দীনবন্ধু বলবে, এই লোক দিলাম, দাও মাইনে। মাইনে নিয়ে সে শটকাবে। বঙ্কুও সে-বেলাটা খেটে পরদিন আর ও মুখো হবে না।

বঙ্কু ত্রিশ বছরের জোয়ান, কিন্তু তার মুখে একটা অসুস্থ বিমর্ষতার ছাপ। মাঝে মাঝে তার মাথার কল একেবারে বিগড়ে যায়। তখন সামান্য একটা কথা বুঝতে তার এত দেরি হয়, এমনভাবে সে হাবার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে যে দেখলে মমতা হয়। মাথা যখন অনেকটা পরিষ্কার থাকে তখনও সে মুখ ভার করে একপাশে চুপচাপ বসে থাকে, সহজে কথা বলতে চায় না, তাসখেলায় যোগ দিতে আহ্বান করলে শুধু মাথা নাড়ে। দুপুরবেলা তেরো টাকার হারমনিয়মের বেখাপ্পা আওয়াজের সঙ্গে দেড় টাকার তবলা পিটে আড্ডায় যখন বিষম সংগীতচর্চা হয়, বঙ্কু নির্লিপ্তের মতো একধারে পড়ে থাকে। সকলে বেশি রকম হইচই আরম্ভ করলে সে আড্ডা ছেড়ে চলে যায় এবং অনেকক্ষণ পথে পথে ঘুরে কাটিয়ে আসে। বঙ্কুর জীবন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে, জীবনের কলরবের প্রতি ওর তাই বিরক্তি।

দীনবন্ধুর প্রস্তাবে অনেক কৌতুক ছিল, যারা শুনল সকলে হাসল—বিশেষ করে বিপিন দাস। বঙ্কু কোনোদিন হাসে না, সে শুধু স্বীকার করে বলল, আচ্ছা।

বিমলা বললেন, এই নাকি তোর নতুন লোক, যে ফরসা জামাকাপড়, থাকলে হয় টিকে !

দীনবন্ধু বলল, বাপরে, আমি দিয়ে যাচ্ছি, টিকবে না ?

নন্দরাণী জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কী ?

বঙ্কু বলল, বঙ্কু।

ব্রঙ্কো? কী কালার? ব্রাউন না ব্ল্যাক? বলে নন্দরাণী হাসল।

বঙ্কু বলল, ব্ল্যাক। ব্ল্যাক মানে কালো।

নন্দরাণী অপ্রতিভ হয়ে বলল, তুমি ইংরেজি জানো?

বঙ্কু বলল, বুক ফার্স্ট—হর্স মানে ঘোড়া, সোয়ান মানে হাঁস।

শুনে নন্দরাণী রাগ করে সেখান থেকে চলে গেল। বঙ্কু এদিক ওদিক চেয়ে কলতলায় গিয়ে অঞ্জলি পেতে জল খেতে আরম্ভ করল। বিমলা মুখভার করে বললেন, ইঞ্জিরি জানা চাকর আমাদের দরকার নেই দীনু। তুই অন্য লোক দেখে দে। ব্যাটা মেয়ের মুখের ওপর ইঞ্জিরি ঝেড়ে দিল!

দীনবন্ধু বিপদগ্রস্ত হয়ে বলল, একটু পাগলাটে মা কিন্তু কাজ দেখলে অবাক হয়ে যাবেন। কিছু খেতে চায় না, দু মাস খেটে এক মাসের মাইনে নেয়। মাসকাবারে মাইনে দিতে গেলে বলে আজ তো মাসের অর্ধেক এখন মাইনে নেব কেন?—মাথাটা একটু খারাপ। দু টাকা কম দিলেও খুশি হয়ে কাজ করবে।

বিমলা নরম হয়ে বললেন, কিন্তু পাগল-ছাগল লোক—

দীনবন্ধু জিভ কাটল, পাগল কেন হবে মা, পাগল নয়। ছেলে-বউ মারা যাওয়ার পর থেকে কেমন একটু হাবামতো হয়ে গেছে, এই মাত্তর। অপঘাতে মরল কিনা ছেলে আর বউটা, তাই—

নন্দরাণী ফিরে এসে দাঁড়িয়েছিল, জিজ্ঞাসা করল, কীসের অপঘাত বে?

দীনবন্ধু বলল, অপঘাত বইকী আজ্ঞে। নদীর ধারে গ্রাম, বউটাকে কুমিরে নিলে, ছেলেটা মোলো জলে ডুবে। সে কী ছেলে দিদিমণি, যেন রাজপুত্তুর! সেদিন সন্ধে লেগেছে কী লাগেনি, মহাকাল ডাকলে, আয় বঙ্কুর বউ, আয় বঙ্কুর ছেলে। মহাকালের ডাক, সাড়া না দিয়ে তো উপায় নেই, ছেলের হাত ধরে বউটা জল আনতে গেল নদীতে। সেই যে গেল দিদিমণি, আর ফিরে এল না। দেহ আমরাই খুঁজে পেলাম চরের মধ্যে এক গর্তে।

নন্দরাণী বলল, সেই থেকে বঙ্কুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে বুঝি?

আজ্ঞে। কিন্তু কোনো জুলুম নেই দিদিমণি, খুব ঠান্ডা। গাল দিলেও ফিরে কথাটি কয় না।

তবে মার খুব সুবিধে হবে, বলে নন্দরাণী হাসল।

মাইনে হস্তগত করে প্রস্থানের আগে দীনবন্ধু হেঁকে বলে গেল, ভালো করে কাজ কবিস বঙ্কু, এমন মুনিব আর পাবিনে। দুবেলা গিন্নিমার পায়ের ধুলো নিস।

কলতলায় বাসন ছড়ানো ছিল, আদেশের অপেক্ষা না রেখেই বঙ্কু সেগুলি মাজতে আরম্ভ করেছিল, ফিরেও তাকাল না। উঠানে লিচুগাছের ব্যাপক ছায়া। একপাশে চৌবাচ্চা ও কল, সেখানে পাতার ফাঁকের চিকরি-কাটা আলোছায়ার আলপনা। নন্দরাণীর মনে হল নতুন চাকরটা যেন রোদ আর ছায়া দিয়ে বোনা চেক আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে বাসন মাজতে বসেছে, যার বউকে খেয়েছে নদীর কুমির, ছেলেকে খেয়েছে নদী নিজে।

ওকে বেশি বকাবকি কোরো না মা। দুঃখী লোক।

বিমলা চটলেন, আমি বুঝি খালি বকাবকি করি?

কর না? দীনবন্ধু পায়ের ধুলোর ঠাট্টা করে গেল কেন, ধরতে পারনি? একটা পাগলাকে দিয়ে ও মিছামিছি পালিয়েই বা গেল কেন তবে? মিছামিছি নয়? খামের চিঠি মা, খামের চিঠি! দীনবন্ধুর বউ খামে চিঠি লেখে!

রান্নাঘর থেকে একটা এঁটো গ্লাস নিয়ে নন্দরাণী কলতলায় গেল।

এটা আগে মেজে দাও তো বঙ্কু।

বঙ্কু থালা মাজা বন্ধ করল। আঙুল দিয়ে বাসনগুলি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কীসের আগে? ওগুলি মাজার আগে না সকলের আগে?

হাসির কথা, নন্দরাণী কিন্তু হাসল না। বলল, সকলের আগে। জল খাব কি না, তাই।

বঙ্কু একটু ভেবে বলল, এক মিনিট লাগবে।

লাগুক, তুমি মেজে দাও।

বঙ্কু গ্লাসটা মাজল, গ্লাসের সঙ্গে হাতও ধুয়ে কল থেকে জল ভরে নন্দরাণীকে দিল। কী জানি কী ভেবে গম্ভীরমুখে বলল, নদীর জল খুব মিষ্টি, কলের জলে স্বাদ নেই। দেশে আমরা নদীর জল খাই।

নন্দরাণীর মনে হল সত্যিই জলে স্বাদ নেই। তার আরও মনে হল, বঙ্কুর দেশের নদীর নাম যদি গঙ্গা হয়! তবে তো বঙ্কু তাকে হাতে করে যে জল দিল তার মধ্যে বঙ্কুর বউয়ের সূক্ষ্মতম এককণা রক্ত আর বঙ্কুর ছেলের তিলপরিমাণ প্রাণ মিশে ছিল! বঙ্কু তাকে কী খাওয়াল? কী গিলে ফেলল সে? জলটা অমন বিস্বাদ লাগল কেন?

বঙ্কুর শোকার্ত উপস্থিতিটা স্নায়ুতে ঘা মারছিল, নন্দরাণীর মনে হল সত্যিই কীরকম একটা বিশ্রী বোটকা স্বাদ আটকে রয়েছে জিভে।

তোমার দেশ কোথায় বঙ্কু? গঙ্গার ধারে?

বঙ্কু বিস্মিত হয়ে বলল, কী করে জানলেন?

আর কী করে জানলেন! নন্দরাণীর সমস্ত শরীর শিরশির করে পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল, সে সেইখানে বসে পেটের সব উগরে ফেলে দিতে আরম্ভ করল। শুধু জল নয়, অবেলায় খাওয়া ডালভাত তরকারি। তার যতই মনে হতে লাগল সেগুলি কুমিরের ভুক্তাবশিষ্ট বঙ্কুর বউয়ের পচা মাংস, ততই বমির ধমক বেড়ে গিয়ে নন্দরাণীর দম আটকে যাওয়ার উপক্রম হল।

বঙ্কু হতভম্ব। জ্বর হয়ে তার বউ একদিন এমনিভাবে বমি করেছিল। কিন্তু এ তো বউ নয়, এ তেমনিভাবে বমি করে কেন?

বিমলা ছুটে এলেন, বড়োছেলে সরোজ ছুটে এল, ছেলেমেয়ে যে যেখানে ছিল মুহূর্তে কলতলায় হাজির হয়ে গেল, সুস্থ হয়ে কলসির জলে মুখ ধুয়ে নন্দরাণী ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ মুখ বাঁকিয়ে পড়ে থেকে হঠাৎ এক সময় বালিশে মুখ গুঁজে সে বেজায় হাসতে আরম্ভ করে দিল। বিমলার কাছে খবর গেল নন্দরাণী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে!

বিমলা এলেন, ও রাণী কাঁদিস কেন?

নন্দরাণী হাসিমুখ বার করে বলল, কাঁদছি কই, হাসছি। ভূতে পেয়েছে ভাবছ। হিস্টিরিয়া হয়েছে? তা নয় মা। আমার নার্ভগুলি গোল্লায় গেছে—এক শিশি নার্ভ টনিক কিনে দিয়ো আমায়। নদীতে স্রোত থাকে সে কথাটা কী একবারও মনে হল ছাই। মিথ্যে বমি করে মরলাম। বঙ্কুর ছেলে বউ অ্যাদ্দিনে সমুদ্রে পৌঁছে গেছে, কী বল মা?...কে রে?

বঙ্কু এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল, একগাল হেসে বলল, আমার বউ বমি করে কাঁদত। একদিন—নন্দরাণী ধমক দিয়ে বলল, যা চলে এখান থেকে, পাজি!

বঙ্কু ধীরে ধীরে সরে গেল।

রাত্রি এগারোটায় বঙ্কু আড্ডায় ফিরল। তিন জোড়া তৈলকৃষ্ণ তাসে বিন্তি কাবার হচ্ছে। বিপিন বাজারের দিকে গিয়েছিল, সে পুঁটির সম্বন্ধে গোপনীয় সংবাদ দিচ্ছে। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, কেমন চাকরি করলি বঙ্কু?

বঙ্কু বলল, বেশ।

দীনবন্ধু বলল, কাল যাস আমার সঙ্গে, বোস-বাবুদের বাড়ি চাকরি করিয়ে দেব।

বঙ্কু বলল, আচ্ছা।

কিন্তু খুব ভোরে উঠে বঙ্কু বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে দীনবন্ধু অবাক হয়ে গেল।

কোথায় চলেছিস রে ?

কাজে যাচ্ছি। দিদিমণি খুব সকালে যেতে বলে দিয়েছে।

ওখানে তুই কাজ করবি নাকি ?

করব, বলে বঙ্কু চলে গেল।

দীনবন্ধু সকলকে বলল, একদম খেপে গেছে। ব্যাগার খাটতে চলল ভূতের বাড়ি।

বঙ্কুর কাজ বেশ, কিন্তু ওর সঙ্গে কথা কইলেই মুশকিল বেধে যায়। নিজে নিজে পনেরো মিনিটের মধ্যে সব মশলা বেটে ফেলে, কিন্তু হলুদটা আগে বেটে দিতে বললেই তার সব গোল পাকিয়ে যায়। প্রত্যেকটি হলুদ পাঁচ মিনিট ধরে কচলে কচলে ধোয়, বাটতে আরম্ভ করে হঠাৎ থেমে গিয়ে কী সব ভাবতে থাকে, শেষে নন্দরাণীকে বলে, আমার বউ খুব তাড়াতাড়ি হলুদ বাটতে পারত। আমার অনেকক্ষণ লাগে। বউ কী করে হলুদ বাটত ভাবছি।...এমনি করে নোড়া ধরত ?

দু মাসে এক মাসের মাইনে নেয়, তাও কম ; বিমলা প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে চলেন। কিন্তু মানুষের স্বভাব কোথায় যাবে ! তিনি বলেন, আ-মরণ ! যেমন করে রোজ বাটিস তেমনি করে বাট না ? রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছিস যে হাঁ করে ? ও জানে নাকি তোর বউ কেমন করে নোড়া ধরত ?

নন্দরাণী মাকে সরিয়ে দেয়, বলে, তুমি যাও মা এখান থেকে। তুমি মুখ ছোটালে এমন ভড়কে যাবে যে সারাদিনেও হলুদ বেটে উঠতে পারবে না।

বঙ্কুকে বলে, আমি দেখিয়ে দেব বঙ্কু ?

কথাটা বুঝতে বঙ্কুর সময় লাগে। বুঝে বলে, দেখি হাত ?

নন্দরাণী হাত দেখায়। বঙ্কু মাথা নেড়ে বলে, নরম হাত, ব্যথা হবে। আমার বউয়ের হাত খুব শক্ত ছিল। একদিন এমন চড় মেরেছিল—কাকে ?

বঙ্কু অনেকক্ষণ ভাবে। তারপর বলে, পাঁচুকে। পাঁচু ঘুরে পড়ে গিয়েছিল চড় খেয়ে। তারপর মা-ব্যাটায় কী কান্না !

নন্দরাণী বলে, চড় মেরে পাঁচুর মা কেঁদেছিল কেন ?

অনেক ভেবেও বঙ্কু এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না, করুণ চোখে নন্দরাণীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, নন্দরাণীর মনে হয় তার মনের ভেতরটা যেন ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে—কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন। এতবড়ো জোয়ান লোকটা নিজের মনের কুয়াশায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু মশলা চাই, নইলে রান্না বন্ধ। নন্দরাণী বলে, তোমার দেরি হবে, আমায় দাও।

এ যেন অন্যায় শাসন, এমনই মুখ করে বঙ্কু জোরে জোরে মশলা বাটতে আরম্ভ করে। নন্দরাণীর মনে হয় শিলটাই বুঝি সে ভেঙে ফেলবে।

চাকরকে ধমকানো এ বাড়ির ছেলেবুড়োর ধাতস্থ, দিনকয়েক সংযত হয়ে চললেও ক্রমেই সকলে নিজের নিজের মেজাজ প্রকাশ করতে আরম্ভ করল। অন্য সকলের চেয়ে বিমলাই বেশি, কারণ তিনি বাড়ির গিন্নি বলে সর্বদা চাকরের সঙ্গে তাকেই কারবার করতে হয় এবং তাতে মেজাজ প্রকাশের সুযোগ অহরহ উপস্থিত থাকে। নন্দরাণী বঙ্কুকে ধমকায় না তা নয়, কিন্তু অন্য কাউকে সে বেশি ধমকাতে দেয় না। বঙ্কু যেন তার নিজস্ব সম্পত্তি, তার খুশি হলে সে বকবে, মারবে, কিন্তু অন্যে তা পারবে না, নন্দরাণীর মনোভাব কতকটা এই রকম। অন্য সকলে বঙ্কুর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে

নন্দরাণী রাগ করে কড়া কথা শুনিয়ে তাদের থামিয়ে দেয়, মাকে অনেক করে বুঝিয়ে বলে, একরকম মাগনার চাকর, ওকে কেন বকো বল তো ? চলে গেলে ভালো হবে বুঝি ? বিমলা চুপ করে থাকেন, কিন্তু রাগ হলে ফের বকেন। কিন্তু তার বকুনি গালাগালির রূপ নিতে পারে না, শুরুতেই নন্দরাণী থামিয়ে দেয়।

একদিন খাওয়া নিয়ে গন্ডগোল বাধল। অল্প দুটি ভাত আর একটু ডাল ছাড়া বঙ্কুর জন্য সেদিন কিছুই ছিল না।

অন্যদিন নীরবে খেয়ে যায়, আজ বঙ্কু বলল, তরকারি কই ?

বিমলা বলল, তরকারি নেই, ওই দিয়ে খা।

বঙ্কু বলল, তবে আমায় দুধ দাও। নইলে খাব না।

তোকে উনুনের ছাই দেব। না খাস তো উঠে যা।

কিন্তু বঙ্কু উঠেও গেল না, ভাতও খেল না, খালি মাথা নেড়ে বলতে লাগল, দুধ দাও। আরে, দাও না দুধ ! কী দিয়ে ভাত খাব ? দুধ দাও।

তার মাথা নাড়ার রকম দেখে শঙ্কিত হয়ে বিমলা ডাকলেন, ও রাণী, দ্যাখ এসে বঙ্কু কেমন করছে। নন্দরাণী এল।

কীরে বজ্জাত ? বদমাসি হচ্ছে ? খা বলছি !

একটু দুধ দেবে না ? এক কড়াই দুধ কে খাবে ?—বঙ্কুব স্বরটা অত্যন্ত করুণ।

নন্দরাণী বলল, তোকে কচু দেব। নবাবপুত্তুর কি না, দুধ খেতে দেবে ওকে ! ডাল দিয়ে খা !

বঙ্কু নীরবে খেতে আরম্ভ করল। নন্দরাণী সগর্বে মার দিকে চেয়ে ঘরে চলে গেল। অর্থাৎ একটু ডাল তো আছে, আমি ইচ্ছে করলে ওকে শুধু ভাত খাওয়াতে পারি !

বঙ্কু যে তার মুখের কথায় বাঁচে মবে এর আনন্দে নন্দরাণী দিশেহারা।

বঙ্কুকে শাসন করে নন্দরাণী আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল। দু ঘণ্টা পরে ঘুম ভেঙে দেখল, বঙ্কু দরজার বাইরে চুপ করে বসে আছে।

সদয় হয়ে বলল, কীরে বঙ্কু !

বঙ্কু বলল, আমার পেট ভরেনি।

আমি তার কী করব ? আড্ডায় গিয়ে খেয়ে আয়গে যা। আমাকে জল দিয়ে যাস এক গ্লাস !

জল দিতে ঘরে ঢুকে বঙ্কু আব বাইরে যেতে চায় না ! নন্দরাণী বলল, যাবি না আড্ডায় ?

বঙ্কু মাথা নাড়ল। নন্দরাণী বলল, তবে আমার একটু পা টেপ।

বিমলা দেখে রাগ করে বললেন, ওকে দিয়ে পা টেপাচ্ছিস যে ? ওই জোয়ান মদ্দ—ধিঙ্গি মেয়ের যদি একটু বুদ্ধিসুদ্ধি থাকে।

নন্দরাণী হেসে বললে, পাগল আর ছাগল সমান মা। ওর শরীরটাই বড়ো মনের বয়স এক বছরও নয়। নইলে তোমার বাড়ি কাজ করে ?

নন্দরাণী মাকে এমনিভাবে খোঁটা দেয়। নিজে যেন সে বঙ্কুর প্রতি দয়াবতী।

কারও দয়া থাক বা না থাক বঙ্কু এ বাড়িতে কায়েমি হয়ে রয়ে গেল। কয়েক মাসের মধ্যে এ কথাটা স্পষ্টই বোঝা গেল যে ধমক ছোটো জিনিস, গালাগালি দিয়েও বঙ্কুকে তাড়ানো যায় না। মাইনে না পেয়ে আধপেটা খেয়েও সে ও-বাড়ির মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে।

নন্দরাণী হেসে বলে, পাগলের মর্জি। কিন্তু তাই বলে সবাই মিলে যে ওকে গাল দেবে তা হবে না কিন্তু। বিমলা এ উপদেশের মর্যাদা রাখতে অস্বীকার করলেন। বালতির কানায় লাগিয়ে কাপড় ছেঁড়ার জন্য একদিন এমন গালাগালি করলেন যে নন্দরাণীকে খুঁজে বার করে বঙ্কু কেঁদেই অস্থির। বঙ্কু বোঝে নন্দরাণী তারই পক্ষে।

অতবড়ো মানুষটির কান্না দেখে নন্দরাণীর বিষম হাসি পেল। তাকে হাসতে দেখে কান্না থামিয়ে বঙ্কু ভীত চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সরে গেল।

হাসি পাক, বঙ্কু তার উপরে নির্ভর করেছে, এটুকু নন্দরাণী বোঝে। এর মর্যাদা রাখবার জন্য বঙ্কুর সামনে সে মাকে বলল, কেন অত বক ? তোমার বড়ো বাড়াবাড়ি মা !

বটে ! বিমলা পেটের মেয়ের মুখ-ঝামটা সইলেন না, সমান প্রত্যুত্তর দিলেন। ফলে মা ও মেয়ের রীতিমতো ঝগড়া হয়ে গেল।

তার পক্ষ হয়ে নন্দরাণীকে লড়তে দেখে বঙ্কু ভারী খুশি। আনন্দে সে কেবল মাথা চালতে লাগল।

একদিন নন্দরাণী কলঘরে স্নান করছে। এমন সময় বঙ্কুর কাণ্ডে বিমলা একেবারে খেপে গেলেন। নন্দরাণীর আয়না-চিরুনির সাহায্যে চুল আঁচড়াবার শখ বঙ্কুর কেন হয়েছিল বলা কঠিন, কিন্তু সে শখ যে জন্যই হোক আয়নাটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে ভালো করে মুখ দেখার শখ না চাপলে কোনো গোল হত না। বঙ্কুর হাতে নন্দরাণীর ক্রিম-মাখা, পিছলে পড়ে আয়নাটা ভেঙে গেল। বিমলা এমন গালাগালি আরম্ভ করলেন যেন আয়নার শোকে আর্তনাদী মড়াকান্না জুড়েছেন।

বড়োছেলে সরোজ জানে কথার মারে মানুষ মরে না। সে বঙ্কুর গালে ঠাস করে চড়িয়ে দিল। বঙ্কু কাঁদোকাঁদো হয়ে কলঘরের সামনে গিয়ে জোরে দরজা ঠেলতে আরম্ভ করল।

ভেতর থেকে নন্দরাণী জিজ্ঞাসা কবল, কে?

আমাকে দাদাবাবু মারছে ! বঙ্কুর স্বর কান্নায় ভেজা।

বঙ্কুর গলার আওয়াজ পেয়ে বিষম চটে নন্দরাণী ধমক দিল, যা এখান থেকে বজ্জাত কোথাকার।

ও দিকে বিমলা হাঁকলেন, ও সরোজ, দ্যাখ বঙ্কু হারামজাদার কাণ্ড।

কাণ্ড দেখে সরোজের মাথায় রক্ত চড়ে গেল, বঙ্কুর কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিয়ে এল রাস্তায়।

দূর হয়ে যা বজ্জাত কাঁহাকা।

বিমলা বললেন, আহা, তাড়িয়ে দিলি কেন একেবারে ! তোর বড়ো বাগ সরোজ। যা ডেকে নিয়ে আয়। মাগনার চাকর মাগনা জোটে ভাবিস নাকি ?

তুমি ডেকে আনো গে। বলে সরোজ দাড়ি কামাতে বসল।

কলঘর থেকে বেরিয়ে এসে নন্দরাণী সদরে গিয়ে পথের দুদিক উঁকি মেরে দেখল, কোথাও বঙ্কুর চিহ্ন নেই, সে চলে গেছে। রাগে মুখ কালো করে সে ভেতরে এল।

সরোজ বলল, যাক যাক, মরুক। স্নানের ঘরের দরজা ঠ্যালে—ব্যাটা বজ্জাত।

নন্দরাণী বলল, দু ইঞ্চি পুরু দরজা, সেটা মনে রেখো দাদা। মাতব্বরি করা তোমার একটা অতি উৎকট স্বভাব। আমার বেরিয়ে আসার তর সইল না তোমার ?

তুই এসে কী করতিস শুনি ?

তোমায় বলতাম তাড়িয়ে দাও, না হয় মারো? বলতাম কিছু বোলো না ! দুমদাম পা ফেলে নন্দরাণী চলে গেল।

কিন্তু দেখা গেল এত সামান্য কারণে কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার মতো মন্দ চাকর বঙ্কু নয়। ঘন্টাখানেক পরে সে কোথা থেকে এসে নীরবে এঁটো বাসন কুড়োতে আরম্ভ করল আর মাঝে মাঝে ভীত চোখে তাকাতে লাগল নন্দরাণীর দিকে। এই এক ঘণ্টায় তার মস্তিষ্ক এইটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে যে, নন্দরাণীর স্নানের সময় কলঘরের দরজা ঠেলা অপরাধ।

সরোজ হেসে বলল, দেখলি ?

নন্দরাণী বলল, তুমি ভাবছ ও মান-অপমান বোঝে না ? বলব চলে যেতে ?

সরোজ বলল, থাক। তুই বললে হয়তো চলে যাবে।

নন্দরাণী সগর্বে হেসে বলল, মানুষ বশ করতে জানা চাই দাদা। শুধু বকলেই হয় না।

সে যেন অনেক চেষ্টায় অনেক তপস্যায় বঙ্কুকে বশ করেছে ; বঙ্কুর বশ্যতা স্বীকারে বিধাতার কোনোই হাত নেই; সবটুকু কৃতিত্ব তারই !

বাইরের চৌবাচ্চায় বঙ্কু কাপড় ধোয়, খানিক পরে ছাড়া-কাপড় আনতে কলঘরে ঢুকে সে আর বেরিয়ে আসার নাম করে না। বিমলা বলেন, তোর সাবান মাখছে হয়তো মুখে, রাণী।

নন্দরাণী তাড়াতাড়ি কলঘরে গেল। দেখল, বঙ্কু সকলের কাপড় বালতিতে তুলে তার ডুরে শাড়িটা দিয়ে মুখ মুছছে।

ও কী হচ্ছে বঙ্কু ?

বঙ্কু তাড়াতাড়ি শাড়িটা ফেলে দিয়ে ভীত চোখে চেয়ে রইল।

নন্দরাণী বলল, ভয়ানক বজ্জাত তো তুই ! আমার কাপড়ে মুখ মুছছিস কেন?

বঙ্কুর মুখে কথা নেই।

বঙ্কুর বুদ্ধির জড়তা ক্রমেই কেটে গেল। কাজটা প্রকৃতির, কিন্তু তাতে নন্দরাণীর অজ্ঞাত প্রভাব কি একটুও ছিল না? অবশ্য চাকরের বুদ্ধির জট খুলবার ধৈর্য ও ইচ্ছা নন্দরাণীর থাকার কথা নয়। বঙ্কুকে সে পছন্দ করত শুধু এই জন্য যে, বঙ্কু নিজেকে বাড়ির মধ্যে বিশেষ করে তারই চাকর করে রেখেছিল। সে যেন নন্দরাণীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তাকে নিয়ে যা খুশি করার অধিকার নন্দরাণীর আছে। মুখের কথা খসামাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করে, বকে কাঁদানো যায়, মিষ্টি কথায় খুশি করা চলে, এমন একান্ত নির্ভরশীল মানুষকে কে না পছন্দ করে?

কিন্তু বঙ্কুর সহজ বুদ্ধি ফিরে আসার সঙ্গে চারদিকে গোল বাধতে লাগল। বঙ্কুর বিশেষত্ব লোপ পেয়ে এল, তার বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে একজন পূর্ণ মানবের মধ্যে শিশুর প্রাণ দেখে এবং সেটা এক শোচনীয় ফল বলে জেনে, তাকে আর অন্যান্য চাকরদের চেয়ে পৃথক করে দেখার আর কোনো কারণ রইল না। তার উপরে বঙ্কু নিজের প্রাপ্যগণ্ডা বুঝে নিতে শিখল এবং একদিন ন মাসের বাকি মাইনে এক সঙ্গে দাবি করে বসে সকলকে ক্রুদ্ধ ও চমকিত করে দিল।

বিনা পয়সায় নন্দরাণীর কেনা গোলাম হয়ে থাকতেও তার বিশেষ আপত্তি দেখা গেল। তার নির্ভরশীলতা গেল শোচনীয়ভাবে কমে। কেউ ধমকালে সে এখন নিজের হয়ে নিজেই লড়াই করে, নন্দরাণীর মুখ চেয়ে থাকে না। নন্দরাণী অন্যায় হুকুম করলে সে গম্ভীর মুখে জানায়, সে অন্য কাজ করছে। নন্দরাণীর জুলুমে বিরক্ত হয়ে এক সময় ফোঁস করে ওঠে।

একটা রাজ্য যেন হাত ছাড়া হয়ে গেছে, নন্দরাণীর এ রকম জ্বালা বোধ হয়। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করে। কিন্তু যে রাজ্য সে নিজের চেষ্টায় জয় করেনি, একবার হারিয়ে নিজের চেষ্টাতেই আবার সে রাজ্য জয় করবে কী করে ! সে রাগ চেপে অনুযোগের সুরে বলে, তুই আজকাল আর আমার কথা শুনিস না বঙ্কু।

বঙ্কু বলে, যে সব অন্যায় কথা, কী করে শুনি। মশলা বাটছি, হুকুম দিলে ঘরঝাঁট দিয়ে যা— একটা মানুষ তো আমি।

তবে তুই দূর হয়ে যা বাড়ি থেকে।

মাইনে চুকিয়ে দাও, এখুনি যাচ্ছি, বলে বঙ্কু রেগে চলে যায়।

শেষে একদিন নন্দরাণীর সঙ্গেই ঝগড়া করে মাইনে না নিয়ে বঙ্কু চলে গেল। বলে গেল, আমার মাইনের টাকায় তুমি হার গড়িয়ো দিদিমণি। এ কথা শুনে সরোজ তাকে মারতে উঠেছিল, কিন্তু বঙ্কুকে রুখে দাঁড়াতে দেখে গায়ে হাত তোলা আর সঙ্গত বিবেচনা করেনি।

দুদিন পরে সকালবেলা কিন্তু বঙ্কু ফিরে এল। নন্দরাণী তখন দাঁত মাজছে।

বঙ্কু ম্লান মুখে বলল, নতুন লোক রেখেছ নাকি দিদিমণি?

যদি রেখে থাকি?

তাকে ছাড়িয়ে আমায় রাখতে হবে। তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। মাইনে চাইনে আমি। কথাটার কদর্থ করে রাগে কাঁপতে কাঁপতে নন্দরাণী উঠে চলে গেল। মাকে গিয়ে বলল, শুনছ মা, আমায় ছেড়ে থাকতে না পেরে বঙ্কু ফিরে এসেছে। মাইনেও নেবে না।

বিমলা বললেন, বেশ তো। পাগলের কথায় তুই রাগ করেছিস নাকি?

নন্দরাণী মুখ বাঁকিয়ে বলল, ও পাগল? দেখ গে ওর ঘরে আমার শাড়ি আমার জুতো আমার চুল এই সব জড়ো করা আছে। হারামজাদাকে রোজ পা টিপতে দিতাম, ঘুমিয়েও পড়তাম এক একদিন....মাগো !

আহা, কী যে সব বলিস ! বলে বিমলা কার্যান্তরে গেলেন।

নন্দরাণী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, তারপর কাকে যে মুখ ভ্যাংচাল অন্তর্যামী জানেন।

পরের বছর বৈশাখ মাসে নন্দরাণীর বিয়ে হল এক দোজপক্ষ মুনসেফের সঙ্গে। বিয়ের তিন মাস পরেই সে স্বামীর ঘর করতে চলে গেল বহরমপুরে।

ঠিক এক মাস পরে বঙ্কু সেখানে গিয়ে হাজির !

নন্দরাণী বললে, কীরে বঙ্কু ?

বঙ্কু বলল, মা বড়ো বকে, তাই কাজ ছেড়ে দিয়েছি। আমায় রাখবে দিদিমণি? আমি মাইনে নেব না। নন্দরাণীর কোলে স্বামীর প্রথম পক্ষের ছেলে, গায়ে একরাশি গয়না, পরনে দামি কাপড়, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর। তার চাল অতি ভারিক্কি—গিন্নির মতো এবং বেমানান। সে বলল, তা বেশ তো, থাক না।

মুনসেফ শুনে বললেন, আরে না, মাইনে দেব বইকী ! খাটবে মাইনে দেব না—ছি !

নন্দরাণী বলল, তোর মাইনে আমার কাছে জমা থাকবে, কী বলিস বঙ্কু ?

বঙ্কু বলল, আচ্ছা।

তারপর দিন কেটেছে মাস কেটেছে বছর কেটেছে অনেকগুলি। নন্দরাণীর ঘরভরা ছেলেমেয়ে, সে বেজায় মোটা হয়ে পড়েছে। বঙ্কু এখনও তার কাছে চাকরি করে—বিনা পয়সার গোলামি। তার মাথার মধ্যে কোনো গোল নেই, কিন্তু নন্দরাণীর উপর তার আগের মতোই নির্ভরতা, নন্দরাণীর মুখের কথায় মরণ-বাঁচন।

কুড়ি বছরের মাইনে জমা, মুনসেফ মাঝে-মাঝে ঠাট্টা করে বলেন, বঙ্কু যদি এখন সব মাইনে চেয়ে বসে রাণী, তোমায় আমি বিক্রি করব।

নন্দরাণী হাসে, তারপর নিজের মোটা শরীরটার দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে যায়। গড়ানো চাকা গড়িয়েই চলবে অবশ্য, কিন্তু তবু ভয় করে ! চুল পাকতে দাঁত পড়তে আর বাকি কত !

বঙ্কুর কিন্তু চুলও পেকেছে, দাঁতও পড়ে গেছে কয়েকটা।

শৈলজ শিলা

জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিধবা মাসির খোশামোদ করা। মাসি মরিল। সুতরাং জীবনটা উদ্দেশ্যহীন হইয়া গেল।

উদ্দেশ্যহীন জীবনটা নিয়া কী যে করিব ভাবিয়া পাই না।

বন্ধুবান্ধবের কু-পরামর্শে একদা সুপ্রভাতে মেয়ে দেখিতে গিয়া যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইলাম। মেয়ে অবশ্য সুন্দরী, ফিরিঙ্গি স্কুলের প্রবেশিকা ক্লাসেও পড়ে, কিন্তু গৃহস্থঘরের মেয়ে তো ?—হবু বরের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া আতঙ্কে মুখ কালো করিবার কী তার অধিকার ? সারাদিন রাগে গজগজ করিলাম এবং পাশের বাড়িব কালো মেয়েটাকেই বিবাহ করিব স্থির করিয়া বিকালে ছাদে উঠিলাম।

আমাকে দেখিবামাত্র মুচকি হাসিয়া মেয়েটা তৎক্ষণাৎ নীচে চলিয়া গেল।

কবে যেন মাদুর পাতিয়া ছাদে শুইয়াছিলাম, কয়েকদিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া মাদুরটা ছাদের সঙ্গে একেবারে আঁটিয়া গিয়াছে। মস্ত একটা হাই তুলিয়া ইহার উপরেই চিত হইযা শুইয়া পড়িলাম। মনে মনে ভাবিলাম, অপরাহ্ণের ওই চকচকে আকাশটা যে আয়না নয়, এ জন্য কত জন্ম ধরিয়া তপস্যা করিয়াছিলাম কে জানে !

আকাশে উঠিয়া পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরাইয়া সাঁতার দিতে থাকিলে কোথাও গিয়া পৌঁছানো যায় কিনা এমনই একটা অবাস্তব চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—স্বপ্ন দেখিলাম পাহাড়ের। তরুহীন শস্যহীন ধূসরবর্ণ রাক্ষসের মতো গাদাগাদি করিয়া রাখা পাহাড়গুলির চাপে স্বপ্নেই আমার উপত্যকার প্রেম গুঁড়া হইয়া গেল। তিনদিন বাদে পিঠে বোঁচকা বাঁধিয়া চলিয়া গেলাম দার্জিলিং এবং একদা টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখিয়া সূর্যের উদ্দেশ্যেই কয়েকদিনের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম।

ইহাতে আমার যে কী শাস্তি হইল শুনিলে আপনাদের চোখে জল আসিবে। একঘণ্টার ভিতরে সূর্যদেব কোন দিকে উঠেন তাহা তো ভুলিয়া গেলামই, পাক খাইতে খাইতে আমি নিজে কোন দিকে চলিলাম তাহার পর্যন্ত কিছু স্থিরতা রহিল না। নিজেকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া একটা খাড়াইয়ের উপর তুলিয়া কোন দিকে নামিলে যে হাত-পা ভাঙিয়াও প্রাণটা বজায় রাখা যাইবে ঠিক করিতে পারি না, যে দিক দিয়া উঠিয়াছি, সে দিকে নামার কথা ভাবিলেও হৃৎকম্প হয়। হাত আব হাঁটুর চামড়া ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, মাসল্‌গুলি ছিঁড়িয়া পড়িতে চাহিল, এমন মাথা ঘুরিতে লাগিল যেন পৃথিবীর ঘূর্ণিত গতি প্রত্যক্ষ করিতেছি !

অবশেষে একবার যখন হাত ফসকাইয়া কুড়ি ফিট আন্দাজ গড়াইয়া একটা গাছের গুঁড়িতে আটকাইয়া গেলাম, তখন আর উঠিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া মনে মনে বলিলাম, থাক যথেষ্ট হইয়াছে। সেইখানে শুইয়া শুইয়া পকেট হইতে বিস্কুটের গুঁড়া বাহির করিয়া মুখে পুরিতে লাগিলাম এবং চারিদিকে চাহিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি উপভোগ করিতে আরম্ভ করিলাম।

ভাবিলাম, একেবারে শুকনা শিলার গায়ে এই গাছটা গজানো না জানি কোন নিষ্ঠুর দেবতার কীর্তি। ওই তো তলা দেখা যাইতেছে, গড়াইয়া পড়িলেই হইত ! জীবনের উদ্দেশ্যটা তাহা হইলে কিছু কিছু বোঝা যাইত নিশ্চয়।

ঘণ্টাখানেক ঝিমাইবার পর উঠিবার চেষ্টা করিলাম। কোনোমতে গাছটা ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া উপরের দিকে চাহিয়া স্পষ্ট বুঝিলাম নিজের ইচ্ছায় যেটুকু নামি নাই শত ইচ্ছা করিলেও সেটুকু আর উঠিতে পারিব না। নানাবিধ কসরতের সাহায্যে ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে নীচে নামিয়া পড়িলাম।

সোজা হইয়া দাঁড়াতেই দেখি, চমৎকার ! ত্রিশ গজ তফাতে পাহাড়ি উনুনে একটা ভাতের হাঁড়ি চাপানো রহিয়াছে এবং নিকটে যে রাঁধুনি বসিয়া আছেন, তিনি নিঃসন্দেহ বাঙালি ভদ্রলোক !

মাতালের মতো হেলিয়া দুলিয়া নিকটে গেলাম। প্রশ্ন করিলাম, আপনি এখানে ?

ভদ্রলোকের মুখ আমসির মতো শুকাইয়া গেল ! বলিলেন, আজ্ঞে, আপনাকে তো চিনলাম না ?

হাসিয়া বলিলাম, এখানেই জীবন কাটিয়েছেন নাকি ? মানুষ দেখেননি কখনও ? আমি আপনার মতোই মানুষ। এত জায়গা থাকতে এখানে এসে ভাত রাঁধছেন কেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।

খিদে পেয়েছে।

খিদে পাবার জন্য বুঝি এখানে শুভাগমন করেছেন ?

ভদ্রলোক বিব্রত হইয়া বলিলেন, আমার বড়ো বিপদ মশাই।

সে আমারও, বলিয়া বসিলাম। নিকটবর্তী গুহাটায় চোখ পড়িল উনানের ধোঁয়া হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া।

বাঃ বাঃ এ যে দেখছি গুহা ! আপনি ওখানে তপস্যা করেন নাকি ? পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ করেছেন ?

আজ্ঞে না। বিপদ তো ওইখানে।

শুনিয়া ভদ্রলোকের আপত্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া গুহায় উঁকি দিলাম। একটি যুবতি মেয়ে মাদুরে শুইয়া বেদনায় কাতরাইতেছে !

ভড়কাইয়া লোকটির কাছে ফিরিয়া গিয়া চাপা গলায় বলিলাম, এ যে বিষম কাণ্ড মশাই !

আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর ছেলে হচ্ছে।

হচ্ছে নাকি ? বলিয়া আমি প্রকাণ্ড একটা হাঁ করিয়া ফেলিলাম এবং বহুক্ষণ অবধি সে হাঁ বন্ধ করিতে খেয়াল হইল না।

যত দুর্গম পথ দিয়াই আমি আসিয়া থাকি এখানে আসিবার একটা সুগম পথও আছে দেখা গেল। এই পথ দিয়া প্রত্যহ দুবেলা পাঁচ-ছয় মাইল চড়াই-উতরাই ভাঙিয়া নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিবার ভারটা আমার উপরেই পড়িল। ভদ্রলোকটি দেখিলাম বেজায় কুঁড়ে। দু বেলা রান্না করেন, খান আর গুহামুখে মস্ত একটা পাথরে ঠেস দিয়া বসিয়া চুপচাপ আকাশ-পাতাল ভাবেন। একেবারেই অকর্মণ্য।

গুহা-আলো-করা একটি মেয়ে হইয়াছে। ট্যাঁট্যাঁ করিয়া কাঁদে, চুকচুক করিয়া দুধ খায় আর চোখ বুজিয়া ঘুমায়। আমি চাহিয়া দেখি আর তারিফ করি।

বলি, লোকজন ডেকে এবার লোকালয়ে নেবার ব্যবস্থা কবা যাক, কী বলেন মশায় ?

লোক ডাকার কথা শুনিলে লোকটা কেমন কাঁদোকাঁদো হইয়া যায়, শহরে ইহাদের বিপদের কথা প্রচার করিব বলিলে একেবারে কাঁদিয়া ফেলে।

স্ত্রী তো চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর দশ ঘণ্টা কাঁদিয়াই কাটায়। ভিতরে কিছু গোলমাল আছে বুঝিতে পারি, মেয়েটার চুলপাড় শাড়ি আর সিঁদুরহীন সিঁথি দেখিয়া সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আঁতুড়ে কী সিঁদুর পরতে আছে ? স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ওঠে !

বড়োই জটিল ব্যাপার। নকল দুঃস্বপ্নের মতো।

দিন দশেক বাদে কিন্তু সব সরল হইয়া গেল। খাদ্য ও দুগ্ধের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম, ফিরিয়া দেখি কচি মেয়েটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলা শুকাইয়া মরিতে বসিয়াছে, মা-বাপ কাহারও চিহ্ন পর্যন্ত নাই ! মেয়েটার কাছে একটা চিঠি পড়িয়াছিল। যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনই ভীষণ। আমার

উপকারের জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া নাম-ধাম না দিয়া লোকটি রহস্যের মীমাংসা করিয়া দিয়া গিয়াছে। যুবতিটি নাকি লোকটির স্ত্রী নয়, বালবিধবা কন্যারত্ন।

পাপটাকে যাহাতে গুহাতেই মরিতে দিয়া পলাইয়া গিয়া জগতের কল্যাণ করি শেষের দিকে এ-রূপ একটা অনুরোধও জানানো হইয়াছে।

খুকিকে কোনো প্রকারে একটু দুধ খাওয়াইয়া আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলাম। অনুপস্থিত বিধবাটি এবং তাহার বাপের উদ্দেশে আমার গালাগালি শুনিয়া গুহার পাথরগুলিও বোধ হয় সেদিন লজ্জা পাইয়াছিল।

পনেরো বছর পরে ভূমিকম্প !

বাৎসল্যের সিমেন্ট দিয়া যৌবনের শক্ত গারদ করিয়াছিলাম, তাহা ফাটিয়া একেবারে চৌচির !

মেয়েটা গুহা আলো করিয়া জন্মিয়াছিল, এখন আমার বাড়িটা এমন আলো করিয়াছে যে, এই প্রৌঢ় বয়সে মাঝে মাঝে চোখে অন্ধকার দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

একরাশি কালো চুল পিঠে ছড়াইয়া ফরসা একখানি কাপড় পরিয়া চঞ্চলপদে সারাদিন চোখের উপরে ঘুরিয়া বেড়ায়, সন্ধ্যার পর আলোর সামনে পড়িতে বসিয়া ছটফট করে, আমি চাহিয়া দেখি আব তারিফ করি। মেয়েটা যে এত সুন্দর, এ যেন আমার অবিশ্বাস্য সুখ। কত কী মনে হয়। পিছু হাঁটতে হাঁটিতে আমি যেন একেবারে কৈশোরের প্রান্তে গিয়া দাঁড়াই, ওর ওই টানা চোখ আর রাঙা ঠোঁট আর অপূর্ব-গঠন তনু আমাকে সেইখানে আটকাইয়া রাখে।

রাতদুপুরে তার ঘরের দরজায় টোকা দিয়া অদ্ভুত গলায় ডাকি, শিলা !

সে অবশ্য ঘুমাইয়া থাকে, সাড়া দেয় না, আমার মুখের ডাকে আমারই ভবিষ্যৎ ভূতটা যেন সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, অকস্মাৎ এমন আতঙ্ক হয়, যে বলিবার নয়। নিজের ঘরে ছুটিয়া গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানায় শুইয়া পড়ি। অন্ধকারে হাতড়াইয়া চুরুট, দেশলাই খুঁজিয়া নিয়া তাড়াতাড়ি চুরুট ধরাইয়া টানিতে গিয়া কাশিতে আরম্ভ করিয়া দিই। কাশিতে কাশিতে হাসি পায়, আমার হাসির শব্দে অন্ধকার যেন নড়িয়া ওঠে, বাড়িটা যেন বিরক্তিতে একবার একটু কাঁপে, আমার গা যেন ছমছম করে। গলা চাপিয়া হাসি থামাইতে গিয়া গোঁগোঁ শব্দ হয়, তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া নিয়া আমি উঠিয়া বসি।

খোলা জানালায় শব্দ হয়, দাদু !

কীরে শিলা ?

আমার ভয় করছে দাদু। কে যেন হা হা করে হাসছিল।

শুনিয়া শিহরিয়া উঠি। চৌকির প্রান্তটা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলি, ভয় আবার কীসের ? ঘুমোগে যা।

আমি তোমার ঘরে শোব দাদু, দরজা খোলো।

মেয়েটা বলে কী ! এই নিস্তব্ধ রাত্রি, অনুভূতিতে ঘা-মারা এই গাঢ় অন্ধকার, অর্ধোন্মাদ এই নিদ্রাহীন তৃষিত প্রৌঢ়, এ ঘরে শুইতে চায় ও কোন হিসাবে ? রাতদুপুরে জ্বালাতন করিতে নিষেধ করিয়া এমন জোরে ধমক দিয়া উঠি যে, নিজেরই চমক লাগে।

মিনিটখানেক ঘড়িটার টিক্‌টিক্ শব্দ ছাড়া সব স্তব্ধ হইয়া থাকে, তারপর শুনিতে পাই অবাধ্য মেয়েটা জানালা ছাড়িয়া এক পাও নড়ে নাই, অধিকন্তু ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

উঠিয়া দরজা খুলি, ভূত আর আমার ভয়ে শিলা ভালো করিয়া কাঁদিতেও পারিতেছে না, দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া জানালার নীচে বসিয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া আমার হৃদয় হিম হইয়া যায় এবং আমি স্পষ্ট অনুভব করি সেখানে অতনুর মূর্ছা হইয়াছে।

ও ঘর হইতে বিছানা টানিয়া আনিয়া নিজেই শয্যা রচনা করিয়া দিই। চোখ মুছাইয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া দিতেই শিলা নীরবে গিয়া শুইয়া পড়ে।

আমি ক্ষণকাল বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকি। খানিক দূরে তেতলা বাড়িটার মাথা ডিঙাইয়া গিয়া বড়ো বড়ো কয়েকটা তারার সংবাদ নিয়া ফিরিয়া আসার পূর্বেই জলীয় কুয়াশায় আমার দু চোখ আত্মহারা হইয়া যায়। ভিজা স্যাঁতসেঁতে তাহার আর্তি।

পাড়া-প্রতিবেশীরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবার নাতনির বিয়ে দাও। অমন টুকটুকে নাতনি তোমার !

নাতনি টুকটুকে বলিয়া নয়, আমার টুকটুকে নাতনি বলিয়া ইহাদের বিস্ময় যেন বেশি ! শুনিলে রাগে গা জ্বলিয়া যায়, আমার তিলোত্তমা বউ থাকা যেন অসম্ভব ! আমার সুন্দরী মেয়ে যেন ছিল না। টুকটুকে নাতনি যেন আমার থাকিতে নাই !

বলি, আমার নাতনির বিয়ের ভাবনা আমিই ভেবে উঠতে পারব মিত্তির মশায়।

সান্যাল বলে, তা অত ভাবাভাবির দরকার কী ? তুমি নিজেই বিয়ে করে ফেল না হে ! পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এমন শক্ত সমর্থ দাদু—নাতনি তোমার বর্তে যাবে।

খুশি হইয়া সান্যালের পিঠ চাপড়াইয়া বলি, তা মন্দ বলনি সান্যাল ! আমিও মাঝে মাঝে ওই কথাই ভাবি। একটা বেরসিক ছোঁড়ার হাতে ওকে দিতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই।

ইহাদের ভিতর চাটুজ্যে লোকটা অতি বদ। বলে, না না ; এ ঠাট্টার কথা নয়। মেয়েটি ডাগর হয়েছে, এবার বিয়ে দেওয়া কর্তব্য। আমাদের এই ভূপেনের সঙ্গে সম্বন্ধ কর না ?

ভূপেন ছোঁড়া পাড়ার হৃদয় ডাক্তারের পুত্র এবং পাড়ার মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে সুপাত্র। অন্দরে ঢুকিতে দিই না, তবু নিত্য আমাদের এই আড্ডায় হাজির হয়। বোধ হয় পান জল দিবার জন্য শিলা যে বাহিরে আসে সেই সময় তাহাকে দেখিবার লোভে। চাটুজ্যের কথায় ছোঁড়ার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া মনে মনে স্থির করিয়া ফেলি এবার হইতে পান জল দিবার বরাতটা চাকরের উপরেই থাকিবে।

মুখুয্যে চাটুজ্যে অপেক্ষাও পাজি। স্মিতমুখে ভূপেনের দিকে চাহিয়া বলে, বড়ো ভালো ছেলে, বড়ো ভালো ছেলে। পাড়ার সবগুলি ছেলে এ রকম হলে—

ঠিক এমনই সময়ে পান নিয়া ঘরে ঢুকিয়া শিলা প্রশংসাগুলি সব শোনে। ইচ্ছা হয় মেয়েটাকে অন্দরে ছুঁড়িয়া দিয়া লাঠি নিয়া সকলকে মোড় পর্যন্ত তাড়াইয়া নিয়া যাই, আর ভূপেনের মাথায় বসাইয়া দিই সেই লাঠি। পুলিসের হাত এড়াইতে শিলাকে নিয়া তার সেই আঁতুড়ের গুহাতে চিরকাল লুকাইয়া থাকি। সেই অপরিসর গুহায় ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া রাত কাটানোর সমর্থন পাইলে আমি কী না করিতে পারি ?

সকলকে বিদায় দিয়া ভিতরে গিয়াই শিলাকে বলি, বিয়ে করবি শিলা ?

সে মাথা নাড়িয়া বলে, না দাদু, বিয়ে আমি করব না।

তবে কী করবি ?

তোমার কাছে থাকব।

তা থাকিস। কিন্তু চিরকাল নাতনি হয়েই থাকবি ? বউ হয়ে থাক না !

দূর ছোটোলোক। বলিয়া সে হাসে।

তাহার মুখ হইতে যে দৃষ্টি সরাইতে পারি না, তাহা এমনই মুখর যে চক্ষু মার্জনার ছলে ঢাকিয়া দিতে হয়। আপশোশ করিয়া মরি যে কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়া ওর দাদু হইয়া স্নেহ শিখাইয়াছি, স্বামী হইয়া প্রেম শিখাই নাই। আজ তাহা হইলে—

চিন্তাটা বড়ো জটিল। আমার স্নেহের পুত্তলী আমাকে এমনভাবে ঠকাইবে, কে তাহা ভাবিতে পারিয়াছিল ?

ইচ্ছা হয় জন্মের কাহিনি শুনাইয়া মেয়েটাকে ভাঙিয়া দিই। উহার মুখের নিষ্পাপ সরলতা ঘুচিয়া গিয়া আমার পথ পরিষ্কার হোক।

মাব কথা শুনবি শিলা ?

বলো দাদু !

আমি বলিতে আরম্ভ করি। গুহার আবছা আলোয় শিলার জন্মকথা। কিন্তু যতবারই বলি আসল বক্তব্যটা গোপন থাকিয়া যায়, শেষ করি একটা মিথ্যা বলিয়া। অযত্নে অচিকিৎসায় ঠান্ডায় না-দেখা মার শোচনীয় মৃত্যুকাহিনি শুনিয়া শিলার চোখ দিয়া জল পড়ে !

নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবি, বদমাইশ তো কোনোদিন ছিলাম না, পারিব কেন ! অন্যায় করিবার অক্ষমতায় আত্মপ্রসাদ জন্মে, যথালাভ মনে করিয়া তাহাতেই খুশি থাকিতে চেষ্টা করি।

কিন্তু পারিলাম। শিলাকে চুম্বন করিবার মতো অবস্থাটা কিছুকালের মধ্যেই সৃষ্টি হইয়া গেল। কেমন করিয়া গেল তাহা এত বেশি সূক্ষ্ম যে ভাষায় মোটা ইঙ্গিতে সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার দুঃখে কলম ছুঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইতেছে।

শিলার বয়স আব পনেরো নাই, ষোলো হইয়াছে।

কিছুকাল হইতেই দেখিতেছি সে গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কী এক না-জানা ভয়ে চোখ দুটি চঞ্চল। মুখ যেন বর্ষণহীন শ্রাবণেব আকাশ, ক্রমাগতই কালো কালো মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। সকালবেলা আমি টাকা পয়সার হিসাব নিয়া ব্যস্ত থাকি, মুখ তুলিতেই দেখি একটা অদ্ভুত বিষণ্ন মুখভঙ্গি করিয়া সে আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

আমাকে চাহিতে দেখিলে সরিয়া যায়।

আমার হিসাব যায় গুলাইয়া, ডাকি, শিলা শোন।

আমি ডাকিলেই শিলা দুড়দাড় ছুটিয়া আসিত, এখন এমন মন্থরগতিতে আসে যেন পদে পদে পা বাধিয়া যাইতেছে। খানিক তফাতে থাকিয়াই বলে, কী দাদু ?

কাছে আয়।

শিলা কাছে আসে না, আসিতে থাকে ! নাগালের মধ্যে আসিলেই খপ কবিযা তার হাত ধরিয়া পাশে বসাইযা দিই। বলি, তুই বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে শিলা।

শিলা জোর করিযা একটু হাসে। বলি, আমাকে তুই ভালোবাসিস শিলা ?

পরম আশ্বস্ত হইয়া সে তৎক্ষণাৎ বলে, বাসি দাদু। ঘামাচি মেরে দেব বুঝি ?

সুতরাং ওইখানেই থামিতে হয়, যদিও সেই থামার অর্থই নেপথ্যে অগ্রসব হওয়া। বলি, ঘামাচি কইরে ? আমার আর ঘামাচি হয় না। দু বেলা কত সাবান মাখি তা জানিস ?

খিলখিল করিয়া হাসিয়া শিলা বাঁচে এবং ইহার পর কয়েকদিন ধরিয়া সে আগের মতো হাসিখুশি হইয়া কাটায়। এই পরিবর্তন কিন্তু সাময়িক পরিবর্তনটাকে তাহার নিকটেও স্পষ্টতর করিয়া তোলে। তাহার শঙ্কা-সংকোচহীন জীবন-প্রবাহ আবার অবাধে বহিতেছে দেখিয়া আমিও এ দিকে ঝিমাইয়া পড়ি। হাই তুলিয়া মোড়ামুড়ি দিয়া ও-মেয়েটার নারীত্ব যে আবার ঘুমাইয়া পড়ে ইহা আমার ভালো লাগে না।

আবার আমার অজস্র সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের পীড়ন চলে। হাসিখুশি মিলাইয়া গিয়া তাহার কপোল হয় পাণ্ডুর, চোখ করে ছলছল।

এমনিভাবে দিন যায়, অবশেষে একদিন বর্ষা-ব্যাকুল দ্বিপ্রহরে আমার এই পুরু তামাকের ধোঁয়ায় বিবর্ণ ঠোঁট দিয়া শিলার হাসিখুশি চিরকালের জন্য মুছিয়া নিলাম। মনে করিয়াছিলাম ঘুমাইয়া আছে, কিন্তু দেখিলাম ধরা পড়িয়া গিয়াছি।

কী দাদু ? বলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল !

কত কথাই বলিতে পারিতাম। দাদামশাই নাতনির ঠোঁটে চুম্বন করিয়াছে, ইহার কত সংগত ব্যাখ্যাই ছিল। চুম্বন যে লভ রাইট-এর সভ্যসংস্করণ এ কথা আজও যে জানে না দুই-চারিটা সস্নেহ বাণী বলিয়া কত সহজেই তাহাকে ভোলানো যাইত। কিন্তু সে সব কিছু না করিয়া আমি দিলাম ছুট !

ছুটিয়া রাস্তায় পড়িয়া হনহন করিয়া পুরা দুই মাইল হাঁটিয়া থামিলাম। পথের ধারে একটা নির্জন গাছতলায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম আর কত ঘণ্টা পরে বাড়ি ফেরা চলিবে।

হঠাৎ খেয়াল হইল একটা শীর্ণকায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক দুই হাতের ভিতরে আসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখে কী যেন খুঁজিতেছেন। ভালো করিয়া নজর করিতে চিনিলাম।

আপনি যে ! এখনও বেঁচে আছেন দেখছি। বলি, এ বারও বিপদ নাকি ? এ কিন্তু লোকালয় মশায় !

আজ্ঞে বিপদ নয়। সে বেঁচে আছে ? বলুন, সে বেঁচে আছে ?

মাথা নাড়িয়া শূন্যে তুড়ি দিয়া বলিলাম, বাঁচে কী? আপনিই বলুন ! মৃত্যুই যে পৃথিবীতে একমাত্র সত্য ! আপনি, আমি বেঁচে আছি এটাই আশ্চর্য। আহা, ওখানে বসবেন না মশাই !

লোকটা মাথায় হাত দিয়া পথেই বসিতে যাইতেছিল, আমার অনুরোধে বসিল না। বলিল, মেয়েটা পনেরো বছর ধরে পাগল হয়ে আছে, আপনাকে সেই থেকে খুঁজছি। দুর্গা দুর্গা, সব পরিশ্রম ব্যর্থ হল !

বলিলাম, তাই হয়। ও জন্য দুঃখ করবেন না। যোলো বছর পরিশ্রম করে প্রিয়ার মন খুঁজে পেলাম না, আপনার তো মানুষ খোঁজার তুচ্ছ পরিশ্রম।

লোকটাকে ফাঁকি দিবার জন্য নানা রাস্তা ঘুরিয়া বাড়ি ফিরিলাম। দেখি, শিলা আমার জন্য ময়দা মাখিতেছে ! মুখখানি তার যেমন বিষণ্ণ, তেমনই শান্ত।

একগাল হাসিয়া বলিলাম, আমি ভাবলাম, তুই রাগ করেছিস শিলা।

সে মুখ কালো করিয়া বলিল, খেতে দিচ্ছ, পরতে দিচ্ছ, রাগ আর কী করে করি দাদু !

আপনারা শুনিলেন ? খাইতে-পরিতে দিই বলিয়া আমি যেন কত জোর খাটাই ! জোর খাটাইতে পারিলে আমার ভাবনা কী ছিল বলুন তো ?

উপরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। আধঘণ্টা পরে ক্ষুধার তাগাদায় শিলাকে তাগাদা দিতে নীচে নামিয়া দেখি, সে তখনও লুচি ভাজিতেছে আর সলজ্জে অদূরে দাঁড়ানো ভূপেনের প্রশ্নের জবাব দিতেছে। আমি বাড়ি না থাকিলে আমাকে ডাকিতে আসিয়া ছোঁড়া সদর হইতে শিলার সঙ্গে দুই-চার মিনিট কথা কহিয়া যায় সম্প্রতি ইহা জানিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু এ যে একেবারে অন্দরে চড়াও হওয়া !

আমাকে দেখিয়া দুজনেই খাসা লজ্জা পাইল। আমতা করিয়া ভূপেন বলিল, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল দাদু।

তা আমাকে ডাকলেই হত ! বলিয়া সটান বৈঠকখানায় চলিয়া গেলাম। এমন স্পষ্ট ইঙ্গিতও কি ছোঁড়া বুঝিতে চায় ! হাঁক দিয়া বাহিরে ডাকিয়া আনিলাম, তবে শিলার সঙ্গে তার গল্প ফুরাইল। বেহায়া !

কী কথা বলতে চাও শুনি ? চটপট বলো।

মুখ লাল করিয়া কোনোমতে কথাটা বলিতেই চটিয়া উঠিলাম—বটে ! তা বিয়ে করে ওকে খাওয়াবে কী শুনি ? এম এ ডিগ্রির ডিপ্লোমাখানা ?

ছোঁড়া যে ইতিমধ্যে সাড়ে তিনশো টাকার চাকরি বাগাইয়া আটঘাট বাঁধিয়া আসিয়াছে, আমি কি সে সংবাদ রাখি ? প্রথমটা বেশ ভড়কাইয়া গেলাম, কিন্তু মুহূর্তে সামলাইয়া নিয়া বলিলাম, তা হোক, তোমার সঙ্গে আমি ওর বিয়ে দেব না।

কেন দাদু ?

সে কৈফিয়ত তোমাকে দেব কেন হে বাপু ? বাধা আছে এইটুকু শুনে রাখ, বলিয়া আমি ফের রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলাম !

দিন চারেকের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া শিলাকে বলিলাম, তল্পি বাঁধ শিলা, এখানকার বাস তুলতে হল।

শিলা সজলচোখে বলিল, কেন দাদু ? বেশ তো আছি এখানে ?

বেশ থাক আর যাই থাক, পরের দিন জিনিসপত্র সব গাড়ির ছাদে চাপাইয়া শিলাকে ভিতরে বসাইলাম। কিছু ফেলিয়া গেলাম কী না দেখিতে পাঁচ মিনিটের জন্য বাড়ির ভিতরে গিয়াছি, ইহার মধ্যে ভূপেন আসিয়া গাড়ির সামনে দাঁড়াইয়াছে।

শুষ্ক হাসিয়া বলিলাম, ভূপেন যে ! আমরা তো চললাম।

একটা কথা শুনুন দাদু, বলিয়া সে আমাকে একান্তে নিয়া গেল।

কোথায় যাচ্ছেন ? শিলাও জানে না বললে।

হাসিয়া বলিলাম, কোথায় যে যাচ্ছি আমিও জানি না হে ! কোনো গুহা-টুহায় আশ্রয় নেব ভাবছি।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া ভূপেন বলিল, আপনার মত কি কোনোদিন বদলাবে না দাদু ? এ বিয়ে না হলে আপনার নাতনি অসুখী হবে।

গম্ভীর হইয়া বলিলাম, দ্যাখো বাপু কবি, তোমায় একটা সৎ উপদেশ দিই। শুধু কাব্যচর্চা করে জীবনটা মাটি কোরো না। জীবনে আরও ঢের বড়ো বড়ো সাধনার সুযোগ আছে। বলিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। আমার সামনেই শিলা যতক্ষণ দেখা গেল ভূপেনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

হে পাঠক হে পাঠিকা, কৈফিয়ত আমি দিব না। শুধু কয়েকটা কথা বলি। শিলাকে নিয়া আমি যে আদিকাব্য রচনা করিতে চাই, ত্যাগের কাব্য তার চেয়ে বড়ো, এ কথা মানা আমার পক্ষে আত্মপ্রবঞ্চনা। ভূপেনের হাতে শিলাকে সঁপিয়া দিয়া আমি শূন্য ঘরে বুক চাপড়াইলে আপনারা খুবই খুশি হন, কিন্তু তাহাতে আমার কী লাভ ? কেনই বা শিলাকে আমি ছাড়িব ! বিলাইয়া দিবার জন্য এত কষ্টে এত যত্নে আমি ওকে মানুষ করি নাই। গুহায় ফেলিয়া আসিলে ও বাঁচিত না। আমি ওর প্রাণ রক্ষা করিয়াছি। আমার চেয়ে ভূপেনের অধিকার বেশি কেমন করিয়া ? আপনারা ন্যায়বিচার করিবেন।

আপনারা বিশ্বাস না করিতে পারেন, শিলাকে আমি ভালোবাসি। আমার যেমন প্রকৃতি, আমার ভালোবাসাও তেমনই। দেড়শো কোটি মানুষের মধ্যে আমি যেমন মিথ্যা নই, আমার এই ভালোবাসাও তেমনই মিথ্যা নয়।

আমার এ প্রেম যেন গোড়া ঘেঁষিয়া কাটা তরুর মতো—শাখা নাই, কিশলয় নাই, পাতা নাই, ফুল নাই, শুধু আছে মাটির উপরে শক্ত গুঁড়ি আর মাটির নীচে সরস সতেজ মূল, যাহার রস সঞ্চয় কেবল নিজেকে পুষ্ট করিবার জন্যই। বাস্তবিক, ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় আমি যে আমার বিশাল

লোমশ বুকে দুই হাতের হাতুড়ি দিয়া কচি মেয়েটাকে ছেঁচিতে চাই, ইহার মধ্যে আমিও নাই, শিলাও নাই, আছে শুধু অনাদি অনন্ত শাশ্বত প্রেম, পশু-পাখি মানুষকে আশ্রয় করিয়াও যে প্রেম চিরকাল নিজের সমগ্রতা বজায় রাখিয়াছে। আমি আর শিলা তো শুধু ক্রীড়নক। দু দিন পরে আমরা যখন শূন্যে মিলাইব এ প্রেম তখনও পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে।

তা ছাড়া শিলার পবিত্রতায় আমার শ্রদ্ধা নাই। ওর বিধবা মাকে আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারি না। তার সেই শুভ্রবাসা শীর্ণা-ক্রন্দসী মাতা আমার মনে একটা স্পষ্ট প্রেরণার মতো জাগিয়া আছে। দুই হাতে অন্ধকার ঠেলার মতো, সেই কলঙ্কিনী মাতার কন্যা আমার প্রেমেরই যোগ্য এই অন্ধ যুক্তি আমি ঠেলিয়া দিতে পারি না।

পশ্চিমে একটা শহরের প্রান্তে নিরালা বাগানবাড়িতে শিলাকে নিয়া নীড় বাঁধিয়াছি। রোমান্স একেবারে রোমাঞ্চকর হইয়া উঠিয়াছে।

আষাঢ়ের মেঘের মতো গম্ভীর হইয়া শিলা আমার তেমনই সেবা করিতেছে। পরিহাস করিলে হাসে না, মিষ্টি কথা বলিলে শ্রান্ত চোখ তুলিয়া তাকায়, হাত ধরিয়া সোহাগ করিতে গেলে কাগজের মতো সাদা আর পাথরের মতো শক্ত হইয়া ওঠে !

ইঙ্গিতে বলি, বেঁচে থাকতে হলে সবই চাই শিলা।

সে বলে, মরাটাও তো কঠিন নয় দাদু !

তা বটে। বলি, তবু যার আর অন্যথা নেই তাকে মানতে হয়।

সে বলে, জানি। কিন্তু মানার পথটা আমি তোমার কাছে শিখব না দাদু। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলে আমি কী করে বাইরে যাই বলো তো ?

দিনের ব্যাপারটা এখন এই রকম দাঁড়াইয়াছে। রাত্রির ব্যাপার অন্যরূপ।

বাহিরে কোনোদিন জ্যোৎস্না থাকে, কোনোদিন থাকে না, কোনোদিন বৃষ্টি পড়ে, কোনোদিন পড়ে না। দুই হাতে বুক চাপিয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকি। ঘুম আসে না, আসিবে না জানি, সে জন্য ভাবিও না। কিন্তু ঘরের বাতাস যেন নিশ্বাসের পক্ষে অপ্রচুর হইয়া পড়ে। উপরে কাঁটা, নীচে কাঁটা দিয়া কে যেন আমাকে জীবন্ত কবর দিয়াছে মনে হয়।

তারপর এক সময় পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া শিলার দরজা ঠেলিয়া বলি, তোর আজকাল ভয় করে না কেন শিলা ?

চব্বিশ ঘণ্টাই তো ভয় করে দাদু।

তবে দরজা খোল। ভয় মিটিয়ে নে।

শিলা কঠিনস্বরে বলে, ঘুমোও গে যাও দাদু। এমন যদি কর, যে দিকে দু চোখ যায় চলে যাব।

নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া শুইয়া পড়ি। শৈলে যার জন্ম, শিলা যার নাম, সে শিলার মতো শক্ত হইবে জানি, কিন্তু চিরকাল ডুবাইয়া রাখিলেও শিলা কেন গলিবে না ভাবিয়া মাথা গরম হইয়া ওঠে।

খুকি

যার ভালো নাম কাদম্বিনী তার ডাকনাম সাধারণত হয় কাদু অথবা কাদি। দশ বছর বয়স পর্যন্ত কাদম্বিনী তার ভালো নামের এই দু রকম ভাঙা সংস্করণেই সাড়া দিত। তারপর হঠাৎ একদিন সে সাড়া দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। প্রতিবাদ নয়, রাগ করাও নয়, ডাকনাম দুটি যে সে পছন্দ করে না সে কথা ঘোষণা করা নয়, একেবারে সাড়া না দেওয়ার অসহযোগ ! কাদু ! ও কাদু ! ডেকে ডেকে গলা চিরে গেল, শুনতে পাস না ? এই কাদি !

কে সাড়া দিবে ? এ বাড়িতে কাদুও কেউ নাই, কাদিও কেউ নাই।

সেই হইতে তাকে খুকি বলিয়া ডাকা হয়। প্রথম প্রথম লোকের মনে থাকিত না, পুরানো নামে তাকে ডাকিয়া বসিত। কাদম্বিনী ভুলিয়াও সাড়া দিত না। নাম যেন তার ছেলেমানুষির চেয়ে বড়ো ছিল—নিত্য ব্যবহার্য তুচ্ছ ডাকনাম ! এখন, যোলো বছব বয়সে (সতেরো হওয়া আশ্চর্য নয়, আঠারোও হইতে পারে) খুকি নামটাও সে অপছন্দ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু একজন মানুষ আর কতবার সামান্য ডাকনামের জন্য চুপচাপ গোলমাল বাধাইতে পারে ? বুড়ো বয়সে সেটা ভালোও দেখায় না। তা ছাড়া, এ বাড়ির বাস সাঙ্গ হইতেই বা তার কত দেরি। ছ মাস, এক বছরের জন্য অত হাঙ্গামা করা হাঙ্গামার অপচয়।

রং একটু ময়লা কাদম্বিনীর, মুখখানাও দেখিতে তেমন সুশ্রী নয়, তবে দেহের গঠনটি তার সুঠাম। এক কথায় বোঝানো যায় না এ রকম। মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরে সচরাচর চোখে পড়ে না এ রকমও বটে। এটা রূপের পর্যায়ভুক্ত নয়। মেয়েদের যে রূপ ভদ্রলোকদের চোখে পড়ে, সেটা থাকে তাদেব মুখে আর চামড়ায়—চামড়াতেই বেশি। জন্মানোর আগে ভৌতিক আত্মারা সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের জ্যোতিতে অন্ধ হইয়া থাকে—নয়তো কালা আদমি আর মেয়েদের 'ফরসা করো ফরসা করো' আবেদনের কোলাহলে জন্মদাতার কান কালা হইয়া যাইত। মেয়েদের স্বাস্থ্যও অনুমোদনযোগ্য, ভদ্ররকমের রোগবিহীন হৃষ্টপুষ্টতা। গঠন আর স্বাস্থ্য আলাদা। শরীর ভালো থাকা স্বাস্থ্য ; গঠন—? সম্ভবত সেটা শরীরের বজ্জাতি, কারণ বজ্জাত লোক ছাড়া ওটা আর কারও দ্রষ্টব্য নয়।

কাদম্বিনীর বাবা ডাক্তার অসমঞ্জ রক্ষিত কিছুদিন হইতে মেয়েকে ভালো ভালো ছেলের বাপ-দাদা-খুড়ো-জ্যাঠা-বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির সামনে হাজির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমে লক্ষ্য ছিল উঁচু, আশা মানুষের চোখে ধাঁধা লাগায় কিনা। কিন্তু সমাজের উঁচু স্তরের লোকেরা এত ঠান্ডা আর ভদ্র আর মার্জিতদৃষ্টিসম্পন্ন যে কাদম্বিনী ঘরে ঢোকামাত্র বিতৃষ্ণায় তাদের যেন মাথা গরম হইয়া ওঠে, একটা প্রাগৈতিহাসিক অভদ্রতায় অপমান বোধ হয়, ফাটা চশমার কাচের ভিতর দিয়া তাকানোর মতো দু চোখে ধারালো রেখার সূক্ষ্ম পীড়ন শুরু হয়। দোষটা বাড়ির লোকেব। তাবা কাদম্বিনীকে না-সাজানোর আধুনিক ফ্যাশানে সাজায়। শাড়ির প্যাঁচে, এলোচুলের ঔদ্ধত্যে এবং আরও কতকগুলি খুঁটিনাটিতে কাদম্বিনীর চেহারায় বৈশিষ্ট্য হয়। চৌকাঠ পার হইয়া কয়েক পা হাঁটিয়া কাদম্বিনীকে বসিতে হয়। তার সেই চলন ও বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় পুকুরে যেন একটি সমুদ্রের ঢেউ আসিয়াছে।

কাদম্বিনীর মুখের একটি সম্পদ এই উপযুক্ততার পরীক্ষা দেওয়ার সময় পরিণত হয় তার একটি অতিরিক্ত বিপদে। মুখের শিশুসুলভ সরলতার ছাপ। অজানা দর্শকদের সন্দিগ্ধ মনে এটা তার মৌখিক অভিনয়ের মতো খাপছাড়া ঠেকে, কাদম্বিনীকে ফেলিয়া দেয় বর্ণচোরা আমের পর্যায়ে। মুখের কচিত্ব পাকামির আবরণ, চোখের নিষ্পাপ দৃষ্টি প্রবঞ্চনার কৌশল।

বাস্তবতার ভারে সকলের আশাও সুতরাং নুইতে নুইতে এখন মাটি ছুঁইয়াছে। কেরানি, স্কুলমাস্টার, দ্বিতীয়পক্ষ প্রভৃতির স্তর। জীবনের অসংখ্য সংস্করণের সবগুলি ভূমিকায় মমতার ভাবপ্রবণতা সার্থক করিতে চাহিলে চলিবে কেন ? তাই, এবার কাদম্বিনীকে একজনের পছন্দ হওয়ার পর বাড়ির লোক হাসিলও না, কাঁদিলও না।

কাদম্বিনী ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিল যে মধ্যস্থ ব্যবহার করিলে গোলমালও বেশি হয়, সময়ও নষ্ট হয়। তার চেয়ে সব কলকাঠি যার হাতে সোজাসুজি তার কাছে যাওয়াই ভালো। যতই হোক, সে তার বাপেরই আদুরে মেয়ে। লোকে আহ্লাদি পর্যন্তও তো বলিতে ছাড়ে না।

অসমঞ্জ রোগী দেখিতে বাহির হইতেছিলেন। কাদম্বিনী গিয়া বলিল, একটু পরে রোগী দেখতে যেও বাবা। আমার একটা দরকারি কথা শুনে যাও।

মেয়ের দরকারি কথা শুনিয়া অসমঞ্জ থতোমতো খাইয়া গেলেন।

মাথামুন্ডু কী যে বলিস ঠিক নেই। চিঠির জবাব দেব না ? পছন্দ করে চিঠি লিখেছে, জবাব দেব না কেন ?

লোক ভালো নয় বাবা।

লোক ভালো নয় ! তুই কী করে জানলি লোক ভালো নয় ?

বাপের মুখের উপর এ কথার জবাব দেওয়ার মতো বেহায়া বা আহ্লাদি বা সরল বা খুকি মেয়ে কাদম্বিনী নয়। মধ্যস্থ শেষ পর্যন্ত তাকে মানিতেই হইল। কৈফিয়ত সে দিল পিসতুতো দিদি শান্তিলতাব কাছে।

লোকটা ভারী বদ শান্তিদি। বিচ্ছিরি করে তাকাচ্ছিল।

বিচ্ছিরি করে তাকাচ্ছিল মানে কী ভাই খুকি ? তুই কি ওর তাকানি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলি ? তাকানি দেখে কী করেই বা বুঝলি সে বদ লোক ?

শান্তিলতা সাত বছরের পুরানো বউ, কিন্তু সুখ অথবা দুঃখের বিষয়, তার শ্বশুরবাড়ি নাই। স্বামী তার এত কম রোজগার করে যে, এ বাড়ির সকলকেই তার খাতির করিয়া চলিতে হয়। এমন শিথিল, তামাশা-বর্জিতা, কথা-শোনা, মন-রাখা মেয়ে সে, যে, বউদির চেয়ে তার কাছেই মনের কথা বলা সহজ।

বিচ্ছিরি চেহারা, বিচ্ছিরি তাকানি, গরিবের একশেষ ; ওকে আমি—

শান্তিলতা মীমাংসিত সমস্যায় স্বস্তি বোধ করিল।

তাই বল তোর পছন্দ হয়নি। গরিব তো নয় ভাই খুকি ? একশো বারো টাকা না কত মাইনে পায় যে !

পাক। ওর সঙ্গে যদি আমার ইয়ে হয়, আমি তা হলে গলায় দড়ি দেব, নয় বিষ খাব, নয় কাপড়ে আগুন ধরিয়ে—

শান্তিলতার কাছে মাসে মাসে একশো বারো টাকা অনেক, অনেক। কাদম্বিনীর অপছন্দ, সজল চোখ আর সাংঘাতিক নভেলি কথার অর্থ সে বুঝিতে পারিল না। এমন বোকা ছেলেমানুষ সরল মেয়ে না হইলে কারও মুখ এমন কচি খুকির মতো হয় ?

ছি ভাই খুকি, এ সব কথা কি বলতে আছে ?

কী বলিতে আছে, আর কী বলিতে নাই, সেটা নির্ভর করে যে বলে তার বুদ্ধি-বিবেচনার উপরে। কাদম্বিনী চোখ পাকাইয়া বলিল, ছি ! ছি, শান্তিদি ! তোমরা আমায় ধরে বেঁধে—

কথা শেষ না করিয়া কাদম্বিনীর ঢোঁক গেলার রকমে শান্তিলতার বুকের মধ্যে টিপটিপ করিতে লাগিল। ভয়ে ভয়ে বলিল, ধরে বেঁধে নয় খুকি। কদিন থেকে সম্বন্ধ হচ্ছে, এক জায়গায় বিয়ে তো হওয়া চাই ? এ সম্বন্ধ মন্দ কী, একশো বারো টাকা—

রাখো তোমার একশো বারো টাকা।

উনি বলছিলেন, কাল মাথা ধরে আমার ঘুম আসেনি কিনা তাই অনেক রাত পর্যন্ত দুজনে কথাবার্তা বলছিলাম—উনি বলছিলেন, এখানে বিয়ে হলে খুকি খুব সুখী হবে। বি এ পাস, একশো বারো টাকা মাইনে—

কাদম্বিনী হাই তুলিয়া বলিল, আমি কিছু শুনতে চাই না শান্তিদি। আমি কি ফেলনা যে, একটা বি এ পাস হাড়গিলে—একশো বারো টাকায় কী হয় মানুষের !

সৌম্য নামে যার জন্য এই বিদ্রোহ সে-ও কম হাড়গিলে নয় এবং ছ মাস ওকালতি করিয়া বারোটা টাকাও সে রোজগার করিয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু তার বাবার এত টাকা আছে যে, তিনি ভয়ানক কৃপণ হওয়া সত্ত্বেও সৌম্য সিল্কের পাঞ্জাবি গায় দেয় আর একটা সিগারেট ফুঁকিয়াই প্রায় তিনটা পয়সা ধোঁয়া করিয়া উড়াইয়া দেয়। মাঝে মাঝে অসমঞ্জের মধ্যবিত্ত সংসারের বিশৃঙ্খল আবর্তের মাঝখানে আসিয়া হাজির হয় এবং অকৃত্রিম প্রসন্নতার সঙ্গে আগাগোড়া ঘরের ছেলের মতো ব্যবহার করিয়া যায়। বড়োলোকের ছেলের এই অনুগ্রহ এখনও এ বাড়ির লোক সময়-সময় বিশেষভাবে উপভোগ করে। কারণ, অনেকদিন হইতে ঘরের ছেলের মতো ব্যবহার করিয়া গেলেও বড়োলোকের ছেলে চিরকাল বড়োলোকেরই ছেলে।

কাদম্বিনীর সতেরো-আঠারো বছর ধরিয়া বড়ো হওয়ার ফলাফল প্রথম যেদিন একসঙ্গে সৌম্যের চোখে পড়িল, সেদিন সকালে তার বড়ো মাথা ধরিয়াছিল এবং অ্যাসপিরিন গিয়াছিল ফুরাইয়া। দু কাপ চা খাইয়াও মাথা ধরা না কমায় বেলা প্রায় সাড়ে নটার সময় সে গেল অসমঞ্জবাবুর বাড়ি। কাদম্বিনীকে দেখিয়া মাথাধরা কমানোর জন্য নয়, অ্যাসপিরিনের জন্য। চাকরকে পাঠাইয়া দিলেও পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঔষধটা আসিত, তবু সে যে নিজেই কেন গেল তার কোনো কারণ নাই। এ রকম কারণবিহীন তুচ্ছ ঘটনার সূত্র ধরিয়া বড়ো বড়ো ওলোটপালট ঘটে বলিয়া অনেকে একে বলে ভবিতব্যতা। সেটা সংগত নয়। কারণ, আজ সৌম্যের মাথা না ধরিলে, বাড়িতে অ্যাসপিরিন থাকিলে অথবা চাকরকে অ্যাসপিরিন আনিতে পাঠাইলেও দুদিন পরে যে কাদম্বিনীর দিকে তার চোখ পড়িত না, তার কোনো প্রমাণ নাই। সে তো অন্ধ নয়। বড়ো বড়ো চোখ আছে তার।

অসমঞ্জবাবু রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন। বাহিরের ডিসপেনসারি হইতে ঔষধ সংগ্রহ করিয়া সৌম্য ভিতরে গেল, কাদম্বিনীকে ডাকিয়া হুকুম দিল, খুকি, জল দে তো আমাকে এক গ্লাস, ওষুধ খাব।

কাদম্বিনীর দুই দাদা অফিসে, এক ভাগনে কলেজে, ও আরও দুই ভাই স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রায় একসঙ্গেই প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া সংসারের আবর্ত এখন চরমে উঠিয়াছে সত্য, তবু সৌম্যের হুকুম অনেকগুলি প্রতিধ্বনি তুলিল। রান্নাঘর হইতে মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন সে ওষুধ খাইবে ; কলতলায় স্নানরতা বড়দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—সে কী ওষুধ খাইবে ; স্বামীর কাপড়-গামছা-হাতে সামনে দিয়া যাইতে যাইতে একটু দাঁড়াইয়া বড়োবউ বলিল—সর্দির জন্য মাথা ধরিয়া থাকিলে সে ইউক্যালিপটাস শুঁকুক না ; আর ঘরের ভিতরে দেয়ালে-টাঙানো-আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাড়ি কামাইতে কামাইতে মেজোদাদা মন্তব্য করিল যে, মাথাটা কাটিয়া ফেলিলেই যখন সব হাঙ্গামা চুকিয়া যায়, এত ওষুধপত্র খা ্যা কী জন্য।

কাচের গ্লাসে জল আনিয়া দিয়া একটু হাসিয়া কাদম্বিনী বলিল, আবার মাথা ধরেছে ? কী বিচ্ছিরি মাথাটা তোমার !

এই হাসি আর মন্তব্যের সুর তার পরিচিত খেয়াল করিয়া, ঝিমানো-ভাব কাটিয়া গিয়া সৌম্য যেন হঠাৎ সজাগ হইয়া উঠিল। একটা বিশেষ বয়সেই শুধু মেয়েরা ঠোঁটের নূতন-পাওয়া খেলনার মতো এই হাসিকে লইয়া খেলা করে, নূতন-শেখা গানের সুরের মতো মুখে সব সময় শোনা যায়

এই কথা, এই সুর। কাদম্বিনী যে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছে, সে একেবারে পরিপূর্ণভাবে বুড়ো ধাড়ি পাকা ঝানু মেয়ে হইয়া উঠিয়াছে, এ জগতে তার যে আর কিছুই জানিতে-বুঝিতে, অনুভব ও কল্পনা করিতে বাকি নাই, এতদিনে যে তার জীবনের আসল সমারোহ শুরু হইয়াছে—এটা তার ঘোষণামাত্র ! কাঁচা আমে প্রথম রং ধরার মতো—বর্ণচোরা আম ছাড়া, এ সংকেত কাদম্বিনীর ব্যক্তিগত মৌলিক সম্পত্তি নয়, একটা স্বাভাবিক ঘটনা। কাদম্বিনীর সর্বাঙ্গে ইহা অপেক্ষা ঢের বেশি স্থূল ও সূক্ষ্ম ঘোষণা অনেক আসিয়াছে। তবু, অ্যাসপিরিনের বড়ি দুটা গিলিয়া সৌম্য খানিকক্ষণ এমনভাবে শুধু কাদম্বিনীর মুখখানাই দেখিল যে, তার হাসিটা গেল মিলাইয়া। তখন সৌম্য বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিল সম্পূর্ণ কাদম্বিনীকে।

কাদম্বিনী একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, রাগ হল নাকি ? সত্যি খুব মাথা ধরেছে ?

সৌম্য বলিল, টনটন করছে মাথাটা।

কাদম্বিনী বিজ্ঞের মতো নির্ভয়ে হুকুম দিল, আজ আর কোর্টে গিয়ে কাজ নেই তবে।

একটিমাত্র নিশ্বাস ফেলিবার অবসরটুকুর আগে ভয়ে এবং পরে নির্ভয়ে কাদম্বিনীকে কথা বলিতে শুনিয়া সৌম্যের আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। একটু ভাবিয়া সে বলিল, না, কোর্টে যাব না।

কাদম্বিনী খুশি হইয়া বিজ্ঞতা বিসর্জন দিয়া আবার একটু হাসিল।

মক্কেল আসে না একটা, কেন যে রোজ কোর্টে যাও ! চুপচাপ শুয়ে থাকো খানিকক্ষণ, মাথা ধরা সেবে যাবে !

সৌম্য হাসিয়া বলিল, সকালবেলা শোব কীরে খুকি, এই তো উঠলাম সারারাত শুয়ে থেকে।

সকালবেলা মাথা ধবাতে পার, শুতে পারবে না ? ডাক্তারের মেয়ে আমি, আমার পরামর্শ শোনো, সমুদা, ওপরে গিয়ে শুয়ে থাকো। ওপরে কেউ নেই, চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারবে। চলো তোমাকে বিছানা পেতে দিচ্ছি।

চুপচাপ শুইয়া থাকার সুযোগ পাওয়ার লোভে সৌম্য জীবনে কখনও এ বাড়িতে আসে নাই, নিজের বাড়িতে এ সুযোগ তার দুর্লভ নয়। এ বাড়ির চেয়ে তার নিজের বাড়িতেই বরং লোকের ভিড় কম। লোভ ও লাভের হিসাব বাদ দিলেও এ সময় কাদম্বিনীর সঙ্গে দোতলায় গেলে অনেকেই তা লক্ষ করিবে এবং কারণ জানিতে চাহিবে। ওষুধ খাওয়ার জন্য কাদম্বিনীর কাছে জল চাওয়ায় সকলের মধ্যে যে কৌতূহল জাগিয়াছিল মাথা ধরার কৈফিয়তে তা পরিতৃপ্ত হইয়াছে। একশো গজ দূরে নিজের বাড়িতে গিয়া শোয়ার বদলে কাদম্বিনীর সঙ্গে দোতলায় শুইতে যাওয়ার কৈফিয়ত হিসাবেও ওটা সকলে গ্রহণ করিবে বটে, কিন্তু কে জানে কারও মনে মৃদু একটু খুঁতখুঁতানি জাগিবে কিনা, কেউ ভাবিবে কিনা, এটা তার কাদম্বিনীকে দোতলায় লইয়া যাওয়ার ছলনামাত্র।

এক মুহূর্ত ভাবিয়া সৌম্য গলা নামাইয়া বলিল, তুই একবার ও ঘরে যা তো খুকি, ভাঁড়ারঘরে।

কাদম্বিনী আশ্চর্য হইয়া বলিল, কেন ?

যা বলছি, শোন। যা।

একটু ইতস্তত করিয়া কাদম্বিনী ভাঁড়ারঘরে চলিয়া গেল। সব বুঝিবার বয়স তার হইয়াছে বটে, সৌম্যের আজকের হেঁয়ালি বুঝিবার ক্ষমতা তার নাই। পেটমোটা কাচের জারের ঢাকনি খুলিয়া এক খাবলা কুলের আচার লইয়া সে খাইতে আরম্ভ করিল। বাবুমশায় তো হুকুম দিলেন এ ঘরে আসিবার, এখন সে করিবে কী ? হাসিবে ? না, কাঁদিবে ?

কাজের ফাঁকে বড়োবউ ইতিমধ্যে সৌম্যের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কাল বিকেলে আমারও যা মাথা ধরেছিল ভাই সমু ঠাকুরপো কী আর বলব। উনি তো ভেবেই অস্থির, ওডিকলোন-টলোন কত কী যে দিলেন ঠিক নেই। কবার হাঁচলাম রাত্রে, তাতে উনি আরও ভয় পেয়ে গেলেন। সকালে উঠেই দেখি ভীষণ সর্দি হয়েছে। ইউক্যালিপটাস শুঁকে শুঁকে একটু আরাম পাচ্ছি। শুঁকবে ?

ধরা মাথাটা নাড়িয়া সৌম্য বলিল, না আমার সর্দি হয়নি।

দাড়ি-কামানো সাঙ্গ করিয়া কাদম্বিনীর মেজোভাই ভূপেন কাছে আসিল। বলিল, তোর এত মাথা ধরে কেন রে ?

সৌম্য বলিল, কী জানি। কাল সারারাত ঘুমোইনি। এমন বিশ্রী লাগছে শরীরটা ! ভাবছি কোর্টে না গিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকি।

তাই থাক ; খানিকক্ষণ ঘুমোলেই হয়তো কমে যাবে।

সৌম্য চিন্তিতমুখে বলিল, নিজের বুদ্ধিতে অ্যাসপিরিন খেলাম, কী রকম যেন করছে শরীরটা। জ্বর আসছে কিনা বুঝতে পারছি না।

ভূপেনও চিন্তিত হইয়া বলিল, তবে এক কাজ কর, এখানেই শুয়ে থাক, বাবা ফিরলে বাবাকে দেখাস—তাড়াতাড়ি কামাতে গিয়ে গালটা কতখানি কেটেছি দেখেছিস ?

সৌম্য বলিল, টিনচার আইডিন দে। ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ি, কী বলিস ? একটা বিছানা—

ভূপেন হাঁকিয়া বলিল, খুকি, ও খুকি, সমুকে একটা বিছানা ঠিক করে দিয়ে আয় তো ওপরে। কোথায় গেলি তুই, খুকি ?

ভাঁড়ারঘরে অভাবনীয় ভাবনায় বিব্রতা কাদম্বিনী হাতের সবখানি আচার মুখে গুঁজিয়া মুখের ভাবনার কুঞ্চনগুলি ঘুচাইয়া বাহিরে আসিল। কলতলায় হাত ধুইয়া সে দোতলায় গেল সৌম্যের সঙ্গে। ভূপেনের ছোটো ঘরে ভূপেনের বিছানা পাতিয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে ভাঁড়ারঘরে পাঠিয়েছিলে কেন বলো তো ?

সৌম্য বলিল, মুখে কী ভরেছিস ফেলে দে খুকি।

কাদম্বিনী বাহিরে গিয়া মুখ খালি করিয়া আসিল। সৌম্য শুইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া অনুযোগ দিয়া বলিল, একটু সবুর সইল না, বিছানাটা ঝেড়ে দিতাম ?

সৌম্য বিছানার প্রান্তটা নির্দেশ করিয়া বলিল, বোস, খুকি, এইখানে বোস।

কাদম্বিনী বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, বসবার কি সময় আছে নাকি আমার ? সবাই ও দিকে খেতে বসেছে, কাজ নেই ? একশোবার একটা কথা জিজ্ঞেস করছি তোমাকে, জবাব দিচ্ছ না কেন ? বলা নেই, কওয়া হঠাৎ আমাকে ভাঁড়ারঘরে পাঠিয়ে দিলে কেন ? মেজদার কী গলা বাবা ! তোমার জন্যে একটা বিছানা পেতে দিতে বলবে, তাও পাড়াশুদ্ধ লোককে শুনিয়ে বলা চাই ! আমি যেন কালা।

কাদম্বিনী ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিল। সৌম্য সন্দিগ্ধভাবে বলিল, তোকে ভাঁড়ারঘরে কেন যেতে বলেছিলাম বুঝতে পারিসনি খুকি ? সত্যি কথা বলিস। যদি বুঝতে পেরে থাকিস, এখুনি বাড়ি চলে যাব।

কাদম্বিনী দু চোখ বড়ো বড়ো করিয়া বলিল, কী বুঝতে পারিনি ? কী বলছ তুমি ? তোমার আজ হয়েছে কী বলো তো ?

মাথা ধরেছে।

মৃদু একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কাদম্বিনীর ডান হাতখানা নিজের কপালে রাখিয়া সৌম্য চোখ বুজিল। কাদম্বিনীর হাতের তালুতে এখনও আচারের গন্ধ লাগিয়া আছে। হাতে ছাড়া ছাড়া মৃদু

কম্পনের আবির্ভাব ঘটামাত্র সৌম্য তা টের পাইল। এবার হাতে টান পড়িবে অনুমান করিয়া আরও জোরে সে হাতের তালু চাপিয়া ধরিল কপালে। কিন্তু দেখা গেল, টানাটানি কাদম্বিনী পছন্দ করে না।

মাথা টিপে দেব ?

না।

আমি তবে নীচে যাই, মা ডাকছে।

সৌম্য তা জানে, চিরকাল মা-ই সকলকে ডাকিয়া থাকে। কাদম্বিনী উঠিয়া দাঁড়ানোয় তার আচারের গন্ধ-মাখা হাতটি সৌম্যের ছাড়িয়া দিতে হইল। চোখ মেলিয়া সে দেখিতে পাইল কাঁচা আমে প্রথম রং ধরার মতো মৃদু একটু রঙের আভাস কাদম্বিনীর মুখে দেখা দিয়াছে এবং জগতের সেরা অভিনেত্রীর মতো সে নিজেই যেন পরিণত হইয়া গিয়াছে নির্বাক বিস্ময় ও প্রশ্নে। তবে অভিনয় নয় বলিয়া এ রকম সে হইয়াছে এমনভাবে, যে দেখিলে মায়া হয়।

সৌম্য মৃদুস্বরে বলিল, মা কেন ডাকছেন শুনে আমাকে একটু আচার এনে দিবি খুকি !

কাদম্বিনী বলিল, জ্বর আসছে, আচার খেতে হবে না। সারারাত ঘুম হয়নি, ঘুমোও না একটু ! বলিয়া সে চলিয়া গেল নীচে। খানিক পরে একটা চায়ের কাপে খানিকটা আচার ও ছোটো একটি চামচ আনিয়া দিয়া হাসিয়া ফেলিল।

আচার খাবে শুনে মা যা বকছে সমুদা ! মেজদা বললে, একটু কুইনিন মিশিয়ে দিতে, একটুখানি দিয়েছি। চার গ্রেনের বেশি নয়, সত্যি বলছি। টেরও পাবে না।

সৌম্য উঠিয়া বসিল। দু আঙুলে একটু আচার তুলিয়া মাখাইয়া দিল কাদম্বিনীর ঠোঁটে। তারপর কাপে অত আচার থাকিতে চাখিতে গেল তার ঠোঁটের হাসি-মাখানো আচারটুকু। হাসি অবশ্য কাদম্বিনীর মিলাইয়া গেল তৎক্ষণাৎ এবং একটি ভয়ার্ত কপোতীর সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য রহিল না। কিন্তু কী করিবে সে ? সে তো ছেলেমানুষ আর সৌম্য তার কাছে চিরদিন দেবতার সমান। তা ছাড়া, তার জন্য বর খোঁজা হইতেছে, সৌম্য যদি তাকে বিবাহ করা ঠিক করিয়া থাকে, সে তো ভালোই। সুখের কথা। সৌম্যের সঙ্গে একা একা সিনেমায় যাইতে তখন আর কোনো বাধাই থাকিবে না। দিনরাত যত খুশি গল্প করিতে পারিবে সৌম্যের সঙ্গে। কাদম্বিনীর চোখে জল আসিয়া পড়িল।

সৌম্য বলিল, কাঁদছিস কেন ?

কাদম্বিনী চোখ মুছিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, কাঁদছি না তো।

সৌম্য খুশি হইয়া ভাবিল যে, এ যদি আর কেউ হইত, তবে নিশ্চয় এ রকম সরল জবাব দিত না, বলিত, চোখে আচার লাগিয়াছে। সত্যসত্যই চোখে আচার অথবা খোঁচা না লাগিলে সেই একুশ বছর বয়সের মেয়েটার চোখে জলই যে আসিত না, এ কথাটা সৌম্যের আর মনে পড়িল না।

তারপর যে দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল, সৌম্যের কাছে না হোক, কাদম্বিনীর কাছে সেগুলি হইয়া রহিল অতুলনীয়। বিরহের দিনগুলি পর্যন্ত। অন্তত দেখা হইলেই সৌম্যের কাছে কাদম্বিনী দু-একবার তাই ঘোষণা করে এবং সৌম্য অবিশ্বাস করে না। এতকালের জানাশোনা মেয়েটার সম্বন্ধে সে একটা নতুন কথা জানিয়াছে। তার অভিজ্ঞতায় সরলতার হিসাবে কাদম্বিনীই আদর্শ বালিকা। কারণ, সরলতার সঙ্গে চিরদিন যে বোকামি সে মিশিয়া থাকিতে দেখিয়াছে, কাদম্বিনীর মধ্যে সে তা খুঁজিয়া পায় না। ধারালো বুদ্ধি তার নাই, চালাক মেয়ে সে নয়। সৌম্য তা জানে। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাব ছাড়া আর কোনো বোকামির পরিচয়ই সে দেয় না। তার যে কথা ও কাজে সৌম্যের হাসি পায়, সেগুলি সে বলে ও করে না-বলা ও না-করার প্রয়োজন সে জানে না বলিয়া, মস্তিষ্কের ওজন তার কম বলিয়া নয়। যা কিছু তাকে একবার বুঝাইয়া বলা যায় চোখের পলকে সে তা বুঝিতে পারে। এমন কী, পুরুষ ও নারীর প্রেম-সংক্রান্ত জটিল দার্শনিক তত্ত্বগুলি পর্যন্ত সে এত সহজে আয়ত্ত

করিয়া ফেলে এবং ও বিষয়ে এমন চমকপ্রদ মন্তব্য করে যে, সময় সময় সৌম্যের মনে হয় সে বুঝি খনাকে বরাহের গণনা শিখাইতে যাওয়ার মতো স্পর্ধা প্রকাশ করিতেছে।

মনে মনে হাসছিস, না খুকি ?

হাসছি ? কী বলছ তুমি পাগলেব মতো ? তুমি যখন এ সব কথা বুঝিয়ে বলো, আমার তখন—তখন—, যাও বলব না তোমাকে।

সৌম্য ভাবে, বিশ্লেষণ করে। কাদম্বিনীর এই কথাগুলির মধ্যেই সে তার বোকামির অভাব ও সরলতার প্রমাণ খুঁজিয়া পায়। মনে মনে হাসছিস, না খুকি ? এই আকস্মিক প্রশ্নেব মানে বুঝিতে বোকা মেয়ের সময় লাগিত, কেন মনে মনে হাসিবে কয়েকবার এ কথা জিজ্ঞাসা করিত এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো সৌম্যকেই বুঝাইয়া বলিতে হইত যে, কবিত্বপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্বকথা শুনিতে শুনিতে এক ধরনের নীরস অমার্জিত হৃদযহীন মানুষ মনে মনে হাসিয়া থাকে, পার্থিব লাভলোকসানের হিসাব ছাড়া জীবনে যারা আর কোনো হিসাব জানে না। প্রশ্ন শোনামাত্র মানে বুঝিয়া কাদম্বিনী রাগিয়া তাকে বলিয়াছে পাগল, কিন্তু তার মুখে ভালোবাসার কথা শুনিতে শুনিতে মনে মনে হাসার বদলে তার মানসিক অবস্থাটা কী করম হয় বুঝাইয়া বলার মতো শব্দ খুঁজিয়া না পাইয়া, হয়তো যে দু-একটি শব্দ মনে আসিয়াছিল লজ্জায় সেগুলি উচ্চারণ করিতে না পারিয়া, মেয়েদের চিরন্তন অধিকার খাটাইয়া এ অক্ষমতা গোপন করিয়াছে। যাও বলব না তোমাকে ! কী মিষ্টি অভিমান, কী মধুর ছলনা ! সেই একুশ বছর বয়সের মেয়েটা হইলে পুরা তিন মিনিট বক্তৃতা দিত, যার মানে বুঝিতে মন নয়, অভিধান খুঁজতে হইত সৌম্যকে। ভাবিতে ভাবিতে সৌম্যের হৃদয়ে আনন্দ ধরিতে চায় না। দু-একমাস নয়, কাদম্বিনীকে তার অনেকদিন ভালো লাগিবে, হয়তো একেবারে কাদম্বিনীর বিবাহ স্থির হইয়া যাওযা পর্যন্ত। গায়ে হলুদের আগের দিন কাদম্বিনীর কাছে সে গ্রহণ করিবে শেষ বিদায়। পরদিন ট্রেনেব কামরায় বসিয়া সে যখন বাংলার বাহিরে মাঠ-বন-গাছপালার বিস্ময়কর বিপরীত গতি দেখিতে থাকিবে, কাঁদিতে কাঁদিতে কাদম্বিনী তখন গায়ে মাখিবে হলুদ। নিজে মাখিবে না, সকলে মাখাইয়া দিবে।

আমি এখন হঠাৎ মরে গেলে তুই খুব কাঁদবি, না খুকি ?

আমি এখন হঠাৎ মরে গেলে তুমি খুব কাঁদবে, না খোকা ?

এ ধরনের তামাশা সৌম্যের বিশেষ ভালো লাগে না। এই যা একটু দোষ আছে কাদম্বিনীর, স্নায়ুগুলি তার বড়ো সতেজ, মরার কথাতেও সে কাবু হয় না, মুখে হাত চাপা দিযা সভয়ে বলে না, ও কথা বলতে নেই। একটা দুর্বোধ্য ক্ষীণ প্রতিবাদ জাগে সৌম্যের মধ্যে, কাদম্বিনী যেন বড়ো বেশি হাসিখুশি, বড়ো বেশি আনন্দময়ী। তার ছেলেমানুষি ও সরলতার তুলনায় ভাবপ্রবণতা যেন বড়ো কম। হাসিতামাশা, কথাকাটাকাটি, ভিত্তিহীন আনন্দের পিরামিড বানানো এ সব সে এত ভালোবাসে বলিবার নয়। কে জানে সময় আসিলে ও কীভাবে ভাঙিয়া পড়িবে, সামান্য কারণে যে এত আনন্দ পায়, অত বড়ো আঘাতে কী প্রচণ্ড হইবে তার বেদনা ? কালীঘাটের গলাকাটা ছাগশিশুর মতোই বোধ হয় ছটফট করিবে। চোখের সামনে বড়ো হওয়ার দাবিতে তার স্নেহ আর মমতা যার প্রাপ্য, তার মতো প্রেমপিপাসু পাষণ্ডের হাত হইতে যাকে রক্ষা করা তার কর্তব্য, তার জীবনে এ বকম ভয়ংকর দুঃখের সম্ভাবনা বোধ হয় না আনাই তার উচিত ছিল। একটু অনুতাপ বোধ করে সৌম্য, কাছাকাছি কাদম্বিনীর বড়ো বড়ো উজ্জ্বল দুটি চোখের দিকে চাহিয়া সব মেয়ের মতো ওকেও সে নিবিড় জোরালো মমতার সঙ্গে ভালোবাসে। এইরকম স্বভাব সৌম্যের, এইরকম বাধ্য তার কোমলহৃদয়ের কোমলতর প্রেম। মনে আবেগ আসিবামাত্র হৃদয়ে প্রেমের বন্যা দেখা দেয়। আবেগটা বাদ দিয়া, প্রেমের বন্যায় ভাঁটা ফেলিয়া, ভালোবাসাটা চিরস্থায়ী করিবার সময় আসিলেই কাদম্বিনীকে আর যে তার ভালো লাগিবে না, এমন কী, কাঁচা আমের কচি শাঁসটুকুর মতো তিতোই হয়তো লাগিবে, সে কথা সৌম্যের আর মনে থাকে না। আদরে আদরে কাদম্বিনীর সে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া দেয়।

তবু কাদম্বিনী মরে না, শ্বাসরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আনন্দে গদগদ হইয়া বাঁচিয়া থাকে, তার নিশ্চিত বিশ্বাসে সৌম্য পর্যন্ত অবাক হইয়া যায়। যত কাঁচা হোক, যত সরল হোক, যত বিশ্বাসী হোক, যত প্রবল প্রেম জাগিয়া থাক তার বুকে, আত্মরক্ষার কয়েকটা মূলমন্ত্র বারো বছরের মেয়েও যে জানে। লোকনিন্দা আছে, আত্মীয়স্বজনের ভয় আছে, আগামীকালের হিসাব আছে, গোপনে গোপনে ভাঙাভাঙা ছেলেখেলাকে প্রকাশ্য ও একটানা লীলাখেলায় পরিণত কবার স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে, আরও আছে কত কিছু—কাদম্বিনী যেন এ সমস্তের ধার ধারে না। সৌম্য যা বলিবে যা করিবে, তাই সই। ফলাফলের দায়িত্বটা যে অন্তত সৌম্যের থাকা উচিত, এ দাবিও যেন সে করিবে না। তিনতলার ছাদ হইতে নিজের ইচ্ছায় উঠানে ঝাঁপাইয়া পড়াব মতো তার আত্মসমর্পণে হিসাব নাই, বিবেচনা নাই, না মরিবার ইচ্ছা নাই—মরণের আতঙ্ক পর্যন্ত যেন নাই। তার ঝাঁপ দিবার কথা, সে ঝাঁপ দিয়াছে। সৌম্যকে সে ভালোবাসে, বাস, সেইখানে সব হিসাবনিকাশের ইতি, তারপর আর কিছু নাই।

আঠারো বছর সংসারে বাঁচিয়া থাকার পর এ জিনিসটা কোনো মেয়ের মধ্যে থাকা অবিশ্বাস্য, অবাস্তব, অসম্ভব। এদের যে নরকে নেওয়া চলে না তা নয়। কিন্তু প্রথমে যাত্রা করিতে হয় স্বর্গের দিকে, সত্যের আবরণে অনেক মিথ্যাকে সামনে ধরিতে হয়, অনেক ভুলাইয়া ভুল করাকে কবিয়া তুলিতে হয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্যের মতো গ্রহণীয়, বাস্তবতার তুলি দিয়া সমস্ত ভবিষ্যৎকে কল্পনার রঙে রাঙাইয়া করিতে হয় তপস্যায় সিদ্ধিলাভের পরবর্তী জীবনের মতো লোভনীয়—আর প্রতিজ্ঞার পব প্রতিজ্ঞা করিয়া দিতে হয় আশ্বাস, জাগাইতে হয় বিশ্বাস। আটাশ বৎসর সংসারে বাঁচিয়া থাকার পর সৌম্য এ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে, এর মধ্যে ফাঁকি থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু কাদম্বিনী যেন তার হাতে একখানা শিশুপাঠ্য রূপকথার বই তুলিয়া দিয়াছে, খবরেব কাগজ পড়া বিদ্যায় যা বোঝা যায় না, দিনের পর দিন কাদম্বিনী যেন তাকে বুঝাইয়া দিয়া চলিয়াছে যে, যে মন দিয়া সে সংগ্রহ করিয়াছে তার মনস্তত্ত্বের জ্ঞান, সে মনটাও সেই ঈশ্বরের সৃষ্টি, তার চেয়ে যিনি ঢের বেশি চালাক এবং বর্তমানের দেড়শো কোটিখানেক মন ছাড়াও অতীতের অগুন্তি মন তিনিই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতের অগুন্তি মনগুলিও তিনিই সৃষ্টি করিবেন ; মন দিয়া মন জানার কাজটা অত সহজ নয়।

সৌম্য বলে, আমি কী রকম খারাপ লোক, জানিস খুকি ?

কাদম্বিনী বলে, জানি।

কী করে জানলি ?

ও সব আমরা জানতে পারি। কচি খুকি তো আর নই আমি।

কাদম্বিনী হাসে। তার সহজ আত্মবিশ্বাস ও গর্ব দেখিয়া সত্যসত্যই মনে হয় কচি খুকি বোধ হয় সে নয়। জয় যেন সেই করিয়াছে সৌম্যকে এবং সৌম্য যে তার কাছে ধরা দিবে, এ বিষয়ে কোনোদিন তার এতটুকু সন্দেহও ছিল না। আশ্বস্ত হইয়া মনে মনে সৌম্য একটু হাসে। এই রকম মনে করে মেয়েরা, মনে করে কিছু না করিয়াও তারাই করিয়াছে সব, সৌম্যদের বুকে ভালোবাসা জাগাইয়াছে তারা, সৌম্যদের আপন করিয়াছে তারা, সৌম্যদের মাথা খারাপ করিয়া দিয়াছে তারা। এই ভালোবাসার ব্যাপার যদি হয় কবিতা, তবে তারা এ কবিতার প্রেরণা। সৌম্যরা তো শুধু কাগজে-কলমে কবিতাটা লেখার কাজটুকু করে। সৌম্য ভাবে, বিশ্লেষণ করে। কাদম্বিনীর অবিশ্বাস্য নিশ্চিন্ত ভাব ও অন্ধ আত্মসমর্পণের একটা কারণ যেন সে আবিষ্কার করিতে পারে। তাকে জয় করিয়া নিজেকে কাদম্বিনী এত দামি মনে করিয়াছে, এমন আকাশস্পর্শী আত্মবিশ্বাস তার আসিয়াছে যে ভবিষ্যতের কথাটা মনে আনাও সে আর দরকারি মনে করে না। দু-চারদিন পরে যা ঘটিবেই, সে বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা করিয়া কী হইবে ? তবে একটা খটকা লাগিয়া থাকে সৌম্যের মনে। এই জল্পনা-কল্পনা, দুজনের একত্র গ্রথিত জীবন সম্বন্ধে তার সঙ্গে গভীর বিস্তারিত আলোচনা

কাদম্বিনীকে সীমাহীন আনন্দ দেওয়ার কথা। এ আনন্দ সে কামনা করে না কেন ? কীসে তার এই অস্বাভাবিক বৈরাগ্য আসিয়াছে ?

কাদম্বিনী কাছে থাকিলে নয়, নিজের ঘরে একা থাকিবার সময় ভাবিতে ভাবিতে সৌম্যের বড়ো রাগ হয়। একটা তুচ্ছ সাধারণ মেয়ে, তার সম্বন্ধে এত ভাবনাবই বা কী দরকার ? ও তো আর তার নিজের জীবনের সমস্যা নয় !

একদিন কাদম্বিনীর বড়দাদার বউ সৌম্যকে বলিল, আমার যেন কী হয়েছে ভাই সমু ঠাকুরপো, খালি অসুখে ভুগছি, আজ মাথা ধরছে, কাল জ্বরভাব হচ্ছে, একটা কিছু লেগেই আছে আমার। এমন ভয় পেয়ে গেছেন উনি !—ভেবে ভেবে শেষে ওঁর আবার কিছু না হয়। শিগগির আমাকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে যাবেন বলেছেন।

সৌম্য বলিল, ভালোই তো। কবে যাবেন ?

বড়োবউ বলিল, জামশেদপুর থেকে খুকিকে দেখতে আসবে, নয় তো কবে নিয়ে যেতেন।

খুকিকে দেখতে আসবে নাকি ?

ও মা, তুমি জান না ভাই সমু ঠাকুরপো ? কী আশ্চর্যি ! ছেলে ওখানে কী যেন কাজ করে, আড়াইশো টাকা মাইনে পায়, বাপ হচ্ছে সাবজজ, এখন পেনশন নিয়েছে। পক্ষাঘাত না কী হয়েছে বাপটার, উঠতে পারে না বিছানা থেকে, ছেলে তাই নিজে বন্ধুর সঙ্গে খুকিকে দেখতে আসবে।

চিঠি এসেছে কবে ?

কাল।—ও মা তাইতো, তুমি তবে কী করে জানবে ? অসুখে ভুগে ভুগে আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে ভাই সমু ঠাকুরপো।

দিন তিনেক পরে ঘণ্টাতিনেকের জন্য কাদম্বিনীকে কাছে পাওয়া গেল বটে, কাদম্বিনী কিন্তু আপনা হইতে সাবজজ-পুত্রের দেখিতে আসার কথাটা উল্লেখও করিল না ! দু ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া সৌম্যই শেষে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, জামশেদপুর থেকে তোকে দেখতে আসবে, না ?

কাদম্বিনী ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

আসবে। বেশ মজা হবে, না ?

মজা হইবে ? কাদম্বিনীর নির্ভয় নিশ্চিন্ত কৌতুকোজ্জ্বল মুখখানা দেখিতে দেখিতে সৌম্যের মনে হইল সে যেন ম্যাজিক দেখিতেছে। কী হবে এবার ?—বলিয়া যার কাঁদোকাঁদো হওয়া উচিত ছিল, এ ব্যাপারটা তার কাছে শুধু মজা !

যদি তোকে পছন্দ করে ?

যদি কী ? আমাকে পছন্দ করবে না, ইস্ !

সৌম্য বিরক্ত হইয়া বলিল, তামাশা রাখ খুকি। তোকে দেখে যদি পছন্দ হয়, বিয়ের সব ঠিক হয়ে যায়, কী করবি তখন ?

কাদম্বিনী দু-হাতে খোঁপা ঠিক করিতে করিতে বলিল, আমি আবার কী করব ?

সৌম্য তার গাম্ভীর্যকে আরও গম্ভীর করিয়া বলিল, কিন্তু তুই তো জানিস খুকি বিয়ে-টিয়ে আমি করতে পারব না ? তোকে যেদিন বিয়ে করব, সেই দিন তোর জন্যে আমার সমস্ত ভালোবাসা ঘেন্না হয়ে যাবে। তুই তো জানিস আমি তা সইতে পারব না।

কাদম্বিনী সহজভাবেই বলিল, দুবার জানিস বললে। কী করে জানব আমি ? কোনোদিন বলেছ ?

বলিনি ?—সৌম্য যেন আশ্চর্য হইয়া গেল।

কবে বললে ? বিয়ে করলেই ভালোবাসা ঘেন্না হয়ে যাবে কেন বলো তো শুনি।

সৌম্য বলিল। পাঁচ মিনিটে তার নিজের কাছেও প্রায় দুর্বোধ্য জটিল যুক্তিতর্ক বিশ্লেষণ দিয়া এমনভাবে কথাটা প্রমাণ করিয়া দিল যে, কাদম্বিনীর আর বলিবার কিছুই রহিল না। সে তাই শুধু একটু হাসিল, বলিল, নাও, তোমাকে আর চালাকি করতে হবে না। সবাইয়ের আসবার সময় হল, এবার আমি পালাই।

সৌম্য ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, চালাকি করিনি খুকি। সত্যি তোকে আমি বিয়ে করতে পারব না।

আচ্ছা সে হবেখন।

বলিয়া কাদম্বিনী চলিয়া যায়, সৌম্য তাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া দিল।

আমার কথা বুঝি তোর বিশ্বাস হচ্ছে না ?

কাদম্বিনী বলিল, হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিলে মানুষের লাগে।—তোমার মতলব আমি বুঝেছি মশায়—একটু ঝগড়া করতে চাও তো ? আরেকদিন হবে, আজ সময় নেই।

সৌম্য বলিল, তুই বড়ো ছেলেমানুষ খুকি, বড়ো বোকা তুই। কিন্তু তোকে আমি বলে রাখছি পরে যে আমায় দোষ দিবি তা হবে না, বিয়ে আমি কাউকে করব না।

কাদম্বিনী সরলভাবে বলিল, এ কথা প্রথমে বলনি কেন ?

সৌম্য বলিল, বিয়ে করব তাও তো বলিনি। প্রথমে বলিনি বলেই তুই আমাকে জোর করে বিয়ে করাবি নাকি তোকে ?

রাগে সৌম্যের গা জ্বলিয়া যাইতেছিল। এখনও ভাবনা নাই কাদম্বিনীর, এখনও তার মুখ ভয়ে পাংশু হইয়া যাইতেছে না ! অন্য মেয়ে হইলে আতঙ্কে এতক্ষণ যে আধমরা হইয়া যাইত। কিন্তু তার শেষ কথাটা কাদম্বিনী যেভাবে গ্রহণ করিল, রাগের বদলে সৌম্য তাতে একেবারে বনিয়া গেল থ। কাদম্বিনীও যে রাগিতে জানে, আজ সে তা টের পাইল প্রথম।

মুখ লাল করিয়া কাদম্বিনী বলিল, দ্যাখো, শোনো বলি তোমাকে, মাঝে মাঝে তুমি এমন কথা বলো যা শুনলে মানুষের গা জ্বলে যায়। তোমাকে বিয়ে করবার জন্যে পায়ে ধরে সেধেছি তোমার ? ও, ভারী তো মানুষ তুমি ! তুমি বিয়ে না করলে আমার যেন বর জুটবে না !

কাদম্বিনী তো চলিয়া গেল গটগট করিয়া, বিছানায় চিত হইয়া শুইয়া সৌম্য অনেকক্ষণ বনিয়া রহিল থ। কাদম্বিনীর রাগটা আশ্চর্য নয়, কিন্তু এমন রাগ !—আজ পর্যন্ত যে একদিনও রাগ করে নাই ? তা ছাড়া, কান্নাবিহীন, অভিমানবিহীন এ কোন দেশি বাগ ছেলেমানুষ মেয়েটার ? কথাগুলি শেষ করিয়াও তো অন্তত একটু তার কাঁদা উচিত ছিল। এ যেন সেই একুশ বছর বয়সের মেয়েটার রাগ। শুধু রাগ—নিছক অবিমিশ্র রাগ। একফোঁটা অনুরাগও যেন কারও জন্য তার নাই।

সাত দিন পরে জামশেদপুরের পাত্রটি সবন্ধু মেয়ে দেখিতে আসিল। পাত্রের মেয়ে পছন্দ হইলে তার মামা আসিয়া আর একবার দেখিয়া যাইবে। তারপর হইবে পাকা কথা। এই সাত দিনের মধ্যে সৌম্য শুধু একদিন কিছুক্ষণের জন্য অসমঞ্জবাবুর বাড়ি গিয়াছিল। এক ফাঁকে কাদম্বিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সেদিন হঠাৎ অত রেগে গেলি কেন রে খুকি ?

কাদম্বিনী হাসিয়া বলিয়াছিল, রাগ হয়েছিল তাই।

পরশু তোকে দেখতে আসবে, না ?

হ্যাঁ। খুব হিংসে হচ্ছে নাকি তোমার ? বাবাকে বলো না গিয়ে, এখ্খুনি বাবা ওদের টেলিগ্রাম করে আসতে বারণ করে দেবে।

সৌম্য ম্লানমুখে বলিয়াছিল, সত্যি হিংসে হচ্ছে। কিন্তু জানিস তো, বিয়ে আমি কোনোদিন করব না।

কাদম্বিনী বলিল, তা না করলে, আমাকে দোষ দিয়ো না কিন্তু শেষে ! ওদের দেখতে আসা বন্ধ করার উপায় বলে দিলাম।

পাকা মেয়ের মতো কথা। সৌম্য সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে কাদম্বিনীর মুখ আর চোখ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিল। কিন্তু কাদম্বিনীর মতো সরল কাঁচা ঘরোয়া মেয়ের মুখে-চোখে সে কী পাকামি খুঁজিয়া পাইবে ?

তারপর সৌম্য বড়োবউকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

কদিন থেকে খুকির কী হয়েছে বলুন তো বউদি ? সব সময় মুখ ম্লান করে থাকে কেন ?

বড়োবউ বলিয়াছিল, কই আমি তো ওকে মুখ ম্লান করে থাকতে দেখিনি সমু ঠাকুরপো ? দেখব কী, নিজের অসুখ নিয়েই সব সময় যা বিব্রত হয়ে থাকি। বেশ হাসিখুশিই তো দেখি ভাই সমু ঠাকুরপো ?

তিনটি বন্ধুর সঙ্গে ছেলে মেয়ে দেখিতে আসিল বিকালের দিকে। গায়ে একটা হালকা সিল্কের পাঞ্জাবি চাপাইয়া প্রসাধনের সময় মুখে ক্রিম মাখার মতো একটা হালকা অবহেলার মতো ভাব মুখে ফুটাইয়া রাখিয়া সৌম্য তার আগেই এ বাড়িতে হাজির হইয়াছিল। একবার অন্দরে পাক দিয়া আসিয়া সে দক্ষিণের বড়ো ঘরখানায় আগন্তুকদের মধ্যে গিয়া বসিল। ছেলে আর তার বন্ধুদের সঙ্গে মন খুলিয়া আলাপও করিল। ছেলের নাম দিব্যেন্দু, দেখিতে ভালোই। তবে একটু রোগা আর লাজুক। পড়িতে পড়িতে মেরুদণ্ডটা একটু বাঁকাইয়া যে সব ছেলে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয় তাদের মতো !

কাদম্বিনী আসিয়া খোলা জানালার সামনে বসিল, আলোতে তাকে যাতে ভালো করিয়া দেখা যায়। তিন জোড়া অপরিচিত চোখ তাকে খুব ভালো করিযাই দেখিল, কেবল যার দেখাটা ছিল সব চেয়ে দরকারি, সে এক সেকেন্ডের জন্য দেখিয়াই পুরা এক মিনিটকাল নামাইয়া রাখিতে লাগিল চোখ। অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল কাদম্বিনীকে, ইংরাজি বাংলা লেখানো হইল তাকে দিয়া, তাব সূচিকর্ম দেখানো হইল, হারমনিয়াম বাজাইয়া সিকিখানা গান আর এসরাজে খানিকটা গজল সুর সে সকলকে শুনাইয়া দিল। লজ্জা, ভয় ও নম্রতার যে মধুর মুখোশ পরিয়া কাদম্বিনী ধীরপদে ঘরে ঢুকিয়াছিল এত কাণ্ডের পরে আবার তেমনই ধীরপদে অন্দরে ফিরিয়া যাওয়ার সময়ও তার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই দেখিয়া সৌম্যের মনে হইতে লাগিল, পানের বদলে সে বুঝি শুধু খয়ের চিবাইতেছে। আগাগোড়া কাদম্বিনীকে সে অবাক হইয়া লক্ষ করিয়াছে। চার মাস ধরিয়া সে যাকে ভালোবাসিয়াছে, তার সামনে কাদম্বিনীর মতো মেয়ে যে চার জন অপরিচিত যুবকেব কাছে এমন নিখুঁতভাবে নিজেকে দেখাইতে পারে, এ অভিজ্ঞতা সৌম্যের ছিল না। এ কী অভিনয় ? হে ভগবান, এ কী অভিনয় তার কাদম্বিনীর ? কিংবা তার চার মাসের প্রেমটাই তাব কাছে কিছুই নয়, প্রতিদিনকার ডালভাত খাওয়া, সাজগোজ করার মতো তুচ্ছ ? তাই সে চাব মাস তার সঙ্গে ভালোবাসার খেলা না খেলিলেও যেমনভাবে নিজেকে দেখাইতে পারিত, আজও অবিকল তেমনইভাবে দেখাইয়া যাইতে পারিল ? এমন একটা রেখা সে কাদম্বিনীর মুখে দেখিতে পাইল না, এমন একটি ভঙ্গি তার চোখে পড়িল না, যার মধ্যে গত চাব মাসের একটি মিনিটকে সে খুঁজিয়া পায় !

কিছু বুঝিতে পারে না সৌম্য। বাড়ি ফিরিয়া সে ছটফট করিতে থাকে। ওমিলনাইন-কেশতৈলের অতি ক্ষীণ একটি গন্ধ যেন সে অনুভব করিতে পারে। মাথা ঘুরিতে থাকে সৌম্যের, গা বমিবমি করে। এ কি সম্ভব ? কাদম্বিনীর প্রকৃতির সঙ্গে এ কি খাপ খায় ? সেই একুশ বছর বয়সের মেয়েটাও তো ছ মাস পরে হঠাৎ তাকে দেখিয়া একটু পাংশু হইয়া গিয়াছিল !

পরদিন সকালে সৌম্য কাদম্বিনীকে বলিয়া আসিল, আজ দুপুরে সেখানে একবার যেতে পারবি খুকি ?

খুব পারব ? কটার সময় ?

একটার সময় যাস।

প্রতিবেশীর বাড়ি যাওয়ার নাম করিয়া কাদম্বিনী বেলা একটার সময় আসিয়া দাঁড়াইল তাদের বাড়ির সামনের পথটার মোড়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডটার কাছে। সৌম্য অপেক্ষা করিতেছিল। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া দুজনে তাদের হোটেলের ঘরখানায় হাজির হইল অল্পক্ষণের মধ্যেই। সমস্ত পথ সৌম্য একটি কথাও বলে নাই। কিছুক্ষণ বকবক করিয়া কাদম্বিনীও শেষে চুপ করিয়া গিয়াছে।

ঘরে ঢুকিয়াই সৌম্য সটান বিছানায় শুইয়া পড়িল। তার শারীরিক অবস্থার সম্বন্ধে কাদম্বিনীর প্রশ্নের জবাবে বলিল, তুই আমাকে ভালোবাসিস না খুকি।

কাদম্বিনী বলিল, তা তো তুমি বলবেই। আগের বার বাড়িতে বলে এসেছিলাম উষাদের বাড়ি যাচ্ছি, একটু পরেই মা ঝিকে পাঠিয়ে দিয়েছিল আমায় ডাকতে। সারা দুপুর বাইরে কাটিয়ে বাড়িতে কৈফিয়ত দেওয়ার মজা মেয়ে হলে বুঝতে।

তুই বুঝি ভাবিস বাড়ির লোকের রাগ, লোকলজ্জা এ সব গ্রাহ্য না করলেই ভালোবাসা প্রমাণ হয়ে যায় ?

আমি ভালোবাসার কিছু জানি না, হল ?

সৌম্য হতাশভাবে বলিল, আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবে বলে তোর একটুও কষ্ট হচ্ছে না ?

কাদম্বিনী সহজভাবে বলিল, আমি বলেছি ছাড়াছাড়ি হতে ?

কিন্তু তোর বিয়ে হয়ে গেলে—

আমি বলেছি বিয়ে হোক ?

তারপর দুজনেই চুপ করিয়া গেল। অল্পক্ষণের জন্য। হঠাৎ কাদম্বিনী কাঁদোকাঁদো হইয়া বলিল, তুমি কিছু বোঝো না। আমি কী করব, আমার কী করাব আছে ? তোমার কথা শুনতে হয়, তুমি যা বল করি, বাড়ির লোকের কথা শুনতে হয়, তারা যা বলে কবি।

কান্না ! চাপিয়া-রাখা কান্না এতদিনে বাহির হইয়া আসিতেছে। কাদম্বিনীর আকস্মিক উত্তেজনায় সৌম্য উঠিয়া বসিল, কাদম্বিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, কিন্তু লোকের কথা শুনে তো তোর সুখ-দুঃখ জাগে না খুকি ? তোর মনে কষ্ট হলে তো বাড়ির লোকের হুকুমে সেটা উপে যায় না !

কাঁদোকাঁদো ভাবটা কাদম্বিনীর উপিয়া গেল। চোখ মিটমিট করিতে করিতে সে বলিল, কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার কষ্ট হলে বাড়ির লোকে কী করবে ? তারপর হঠাৎ কাঁদোকাঁদো হওয়ার মতো হঠাৎ হাসিয়া কাদম্বিনী বলিল, তোমার কী হয়েছে জানো ? মাথা ধরে ধরে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।

এবার সৌম্য অনেকক্ষণ চুপচাপ চিত হইয়া শুইয়া রহিল। কপালে কাদম্বিনীর হাতের স্পর্শ অনুভব করার পর ক্লান্তস্বরে বলিল, তোর সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা খুকি।

কেন ?

তোর বিয়ের সব ঠিকঠাক হচ্ছে, আর আমার সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত হবে না। আজকেই আমাদের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাক। কেমন ?

সৌম্য এতক্ষণ চোখ বুজিয়া ছিল। কথাটা বলিয়া কাদম্বিনীর মুখের ভাব দেখিবার জন্য সে চোখ মেলিল। অল্পক্ষণের জন্য তার মনে হইল কাদম্বিনীর মুখের চামড়াটা যেন টান হইয়া চকচক করিতেছে। কিন্তু একটু ভাবিয়া কাদম্বিনী যখন কথা বলিল তখন সে বুঝিতে পারিল এটা তার কল্পনা অথবা আলোর কারসাজি।

আমি কী বলব বলো ? আমি তো বলেছি তুমি যা বলবে তাই হবে। কিন্তু শেষ দিনটা তা হলে মুখ ভার করে থেক না, হেসে কথা বলো একটু।

সৌম্য উঠিয়া বসিল। জুতায় পা ঢুকাইয়া ফিতা লাগাইতে লাগাইতে বলিল, চল বাড়ি যাই।

উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের এলোমেলো চিন্তার মধ্য হইতে সৌম্য ক্রমে ক্রমে একটা প্রকাণ্ড তত্ত্বকথা আবিষ্কার করে। এ জগতে নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, সমস্ত এখানে আবোল-তাবোল। সেই জন্যই একটু যাদের বুদ্ধি আছে তারা বলিয়া থাকে, ব্যতিক্রম নিয়মকে প্রমাণ করে। আসলে এ কথাটাও একপেশে সত্য। নিয়মটা নিয়ম, না ব্যতিক্রমটা নিয়ম, কে তা বলিতে পারে ? দশবার নিয়ম আর একবার ব্যতিক্রমের দেখা পাইলে নিয়মটাকে মানুষ নিয়ম বলে, কিন্তু দশবার ব্যতিক্রম আর একবার নিয়মের দেখা পাইলে মানুষ তো ব্যতিক্রমটাকেই নিয়ম বলিত? এই ভীষণ জটিল তত্ত্বটা আবিষ্কার করার পর সৌম্য কিছুক্ষণ গভীর তৃপ্তি বোধ করে। প্রহারের পর চকচকে খেলনা পাইলে ছোটো ছেলে যেমন সজল চোখে আহ্লাদে গদগদ হয়, এই দুশ্চিন্তাটি আয়ত্ত করার পর সৌম্যের আহত মনে তেমনই সঞ্চার হয় আনন্দের। সেই একুশ বছরের মেয়েটা যদি চুলোয় গিয়া থাকে, কাদম্বিনীও চুলোয় যাক। কোর্টে গিয়া একটা পেটি কেসে মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করিয়া সে এমন বক্তৃতা জুড়িয়া দেয় যে, তিনবার সংক্ষেপে তার বক্তৃতা শেষ করিতে বলিয়া হাকিম তার মক্কেলের সাত টাকা জরিমানা করিয়া দেন।

এদিকে একদিন জামশেদপুরবাসী দিব্যেন্দুর মামা আসিয়া কাদম্বিনীকে দেখিয়া পছন্দ করিয়া যান এবং দেখিতে দেখিতে কথাবার্তা পাকা হইয়া বিবাহের দিন স্থির হইয়া যায়। তখন একদিন সৌম্য কাদম্বিনীকে দেখিতে যায়। অপরাহ্ণ বলিয়া বড়োবউ তাকে দেয় খাবার আর কাদম্বিনী করিয়া দেয় চা।

বড়োবউ জিজ্ঞাসা করে, এতদিন আসোনি যে ভাই সমু ঠাকুরপো?

কাদম্বিনী মুচকি হাসিয়া তামাশা করিয়া বলে, মাথা ধরার জন্যে বোধ হয়।

বড়োবউ বলে, একটু রোগাই যেন তোমাকে দেখাচ্ছে সত্যি। অসুখ-বিসুখের কথা তো শুনিনি? আমি তো এদিকে অসুখে ভুগে ভুগে মরতে বসেছি ভাই সমু ঠাকুরপো। উনি তো ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেছেন। বলছেন, খুকির বিয়েটা হয়ে গেলেই হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাবেন আমাকে।

কাদম্বিনী বলে, বোসো, পালিয়ে যেয়ো না। একটা নতুন আচার করেছি, তোমাকে চাখতে হবে। ওপরে বাবাকে খাবার দিয়ে এখখুনি আসছি।

এক হাতে খাবারের প্লেট অন্য হাতে জলের গ্লাস লইয়া লঘুপদে কাদম্বিনীকে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে দেখিয়া সৌম্যের সাধ হয় তার খাবারের প্লেট, জলের গ্লাস, চায়ের কাপ আর দেয়াল ভাঙিয়া খানকয়েক ইট মেয়েটাকে ছুঁড়িয়া মারে।

তবু সে বড়োবউকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা বউদি, খুকির নাকি বর পছন্দ হয়নি, লুকিয়ে লুকিয়ে খুব কাঁদে?

বড়োবউ বলে, কই না, কাঁদে না তো ? আমি কখনও দেখিনি ভাই সমু ঠাকুরপো ওকে কাঁদতে। দেখব কী, যা ভোগাটাই ভুগছি অসুখে ! কিন্তু বর খুকির পছন্দ হয়েছে, ও বাড়ির ঊষার কাছে নাকি বলেছে।

কাদম্বিনী নীচে নামিয়া সৌম্যকে খানিকটা আচার আনিয়া দেয়, নিজেও পরম তৃপ্তির সঙ্গে এক খাবলা আচার চাখিতে আরম্ভ করে। সৌম্য হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়ায়, বলে, তোর বাবার সঙ্গে একটা দরকারি কথা আছে খুকি। আগে বলে আসি, তারপর তোর আচার চাখব।

বাসরঘরে, মেয়েরা চলিয়া যাওয়ার পর ঘরে যখন সকলের হাসি-তামাশা গানের সুরের রেশটুকুও বোধ হয় মিলাইয়া যাওয়ার সময় পায় নাই, সৌম্যের বুকে মুখ গুঁজিয়া কাদম্বিনী তখন শুরু করে কান্না। শুকনো গ্রীষ্মের পর বর্ষার মতো প্রবল, অশান্ত, অফুরন্ত কান্না।

কাঁদিতে কাঁদিতে কোনো রকমে বলে, তুমি আমায় বিয়ে না করলে আমি বিষ খেয়ে মরে যেতাম।

কাঁদে সে ঘণ্টাখানেকের কম নয়। মুখে হাসি ফুটিতে লাগে আরও প্রায় আধঘণ্টা।

আমাকে তুমি এবার ঘেন্না করবে?

তাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তোকে ঘেন্না করতে পারব মনে হয় না খুকি।

কাদম্বিনী বলে, এখনও আমাকে খুকি বলবে নাকি? আর দ্যাখো, তুই বোলো না আমাকে। বিচ্ছিরি শোনায়।

স্ত্রী হওয়ার পর স্ত্রীত্বের দাবি আরম্ভ করা সৌম্যও আর অন্যায় মনে করে না।

অবগুণ্ঠিত

বাড়ি থেকে বার হয়েই সামনে পড়ে এক সার গোরুর গাড়ি। গোরুর গাড়িকে পথ দেবার জন্য নবীনকে পথপ্রান্তে শ্যাওলা-ধরা ভাঙা বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াতে হয়। একটা মোটরকে পথ দেবার জন্য গোরুর গাড়িগুলিও যতদূর সম্ভব পথের ধারে সরে এসেছে।

বিরক্তি নবীনের জাগে না। অন্তঃপুরের শান্ত-মধুর মোহ মনকে তার আচ্ছন্ন করে রেখেছে, মন-ভরা তার ক্ষমা ও বিনয়, আত্মত্যাগের উদারতা। বেরিয়ে আসবার আগে বউ একবার ঘরে এসেছিল, যেমন রোজ আসে, জলের গ্লাস আর পান হাতে নিয়ে, জামার বোতাম লাগিয়ে দিতে আর কেবল দিনের আলো ও জাগ্রত পরিবারের চেতনা তার মধ্যে যে রূপান্তর এনে দেয়, তাই দিয়ে এই সংক্ষিপ্ত মিলনে নূতন একটা স্বাদ সঞ্চার করতে।

বউ নিজে যেচে আসে না, মা পাঠিয়ে দেন। অন্ধকার রাত্রের দীর্ঘ মিলনের পর দিনের বেলা টাকা রোজগার করতে বেরিয়ে যাবার আগে এই কয়েক মিনিটের মিলনটুকু ছেলের যে ভূরিভোজনের পর চাটনির মতো মধুর লাগবে, মার কি আর তা অজানা আছে ?

একটি পুরুষকে দিয়ে রোজগার করিয়ে তিনিও তো এতবড়ো সংসার ফেঁদেছেন !

বউ ঘোমটায় প্রায় মুখ ঢেকেই ঘরে ঢোকে, চোখ হয়তো পেতে রাখে পদক্ষেপের দিকে, তবু যে কী করে চারদিকে তার নজর থাকে ! নবীনকে জল দেয়, পান দেয়, নিজেকে দেয়। মনে হয়, বুকটা যেন তার ধুকধুক করছে।

সকলের চোখের সামনে দিয়ে ঘরে আসতে এমন লজ্জা করে !

আস কেন ?

মা যে পান জল দিয়ে যেতে বলেন।

মা না বললে আসতে না ?

মাথা একটু নামিয়ে চোখের পাতার চকিত গতিতে স্বামীর চোখে চোখে তাকানোকে পলকের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে বউ মৃদু একটু হাসে, পায়ের নখ দিয়ে খুঁড়তে আরম্ভ করে মেঝে। নবীনের বুঝতে কষ্ট হয় না, বউ সব সময়েই তার কাছে আসবার জন্য উন্মুখ, লজ্জা ভয় শুধু তার বাধা। হঠাৎ উঠে গিয়ে দক্ষিণের জানালাটা বউ বন্ধ করে দেয়। রোমাঞ্চিত কলেবরে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলে, মা গো, ও বাড়ির ছাতে কে যেন দাঁড়িয়ে !

তাকিয়ে দেখছিল নাকি ?

সংকোচের পেষণে বউ যেন আকারেই ছোটো হয়ে গেছে, নিজেই যেন সে নিজের মধ্যে মিশে যেতে চায়। ও বাড়ির ছাতটিতে কোনোদিন কেউ ওঠে না, ছাতে আলসেও নেই, ছাতে উঠবার সিঁড়িও নেই। জানালা একটু ফাঁক করে নবীন দেখতে পায়, মিস্ত্রি ছাতের ফুটো মেরামত করছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে দাদার ঘরের সামনে দিয়ে নবীনকে আসতে হয়। দাদার বয়েস অনেক, ছেলেমেয়ে অনেক, তামাক টানার ক্ষমতা অসীম, কম কেবল উপার্জন। তবু নবীনের বউদিও জল পান দিতে এ সময় একবার ঘরে আসেন। তবে জামার বোতাম লাগিয়ে দেন না।

নবীনের বউ সর্বদা শেমিজ পরে থাকে, কিন্তু বউদির সে প্রয়োজন অনেকদিন মিটে গেছে, তবু নবীন ঘরের দরজায় দাঁড়ালে তিনি কাপড়ের এখান ও ওখানটা টেনে দেহের অনাবৃত অংশের খানিক-খানিক আবৃত করে ফেলেন, আঁচল তুলে দেন মাথায়। তবে কোলের মেয়েটি যদি কোল অধিকার করে স্তন্যপান করে, বক্ষের আবরণ তাঁর দরকার হয় না। সাতটি সন্তানের জননী তিনি,

দেহ তাঁর একস্তূপ পিন্ডাকার মাংস, বসন টেনে দেহের খানিক খানিক আবৃত করা আর মাথায় আঁচল তোলার অভিব্যক্তি তাঁর যতটুকু মনোরম, স্তন্যদায়িনী জননীরূপে তিনি যে তার চেয়ে শতগুণ মাধুর্য বিকাশ করেন, সকলের মতো এইটুকু জানতে কী আর তার বাকি আছে ?

সংসারের তুচ্ছ প্রয়োজনের কথা বলতে দাদার ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বউদির অভিনব লজ্জাহীন লজ্জার মৃদুতা আর বাৎসল্যের কোমলতা নবীন অভ্যস্ত দৃষ্টিতে শুষে নেয়,—দুই-ই তার মনে জোগায় শান্তি।

মন্থরগতিতে সে অন্তঃপুরের বাকি অংশ অতিক্রম করে। রান্নাঘরে ভাগনি আর ছোটোবোন আপিসের ভাত জোগানোর ব্যস্ততায় কোমরে আঁচল বেঁধেছিল, এখনকার আলস্যেও সে বাঁধন আলগা হয়নি। রান্নাঘরেই উনুনের সামনে পিঁড়িতে বসে বোন যেন কী বই পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে, উনুনে চাপানো মোটা চাল সিদ্ধ হয়ে এলে মুখ তুলে তাকাবে। মুখে তার গভীর বিষাদের ছাপ। বয়েস হয়েছে অনেক কিন্তু বিয়ে হয়নি, কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিলেই মনের দুঃখটা তার মুখে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। কী কমনীয়ই মনে হয় এই বিষাদে তার মুখ,—মুখের কান্তি যেন হৃদয়ের গভীরতায় রসালো হয়েছে। একদিন সে ছিল অবাধ্য দুরন্ত বালিকা, প্রথম কৈশোরে যার নির্লজ্জ বেহায়াপনা সকলকে চমকে দিত, আজ সে যেন মাখনের মতো কোমলা, লতার মতো আশ্রয়ভিখারিনি, পানীয়ের মতো স্নেহবিহ্বলা।

ব্যথাবোধ আর অভিমান ছাড়া আর কোনো অনুভূতি কী বোনের তার আছে ? কে জানে যার হাতে বোনকে সে সঁপে দেবে, ব্যথাবোধকে আনন্দের রূপ দেওয়া আর অভিমানকে আবেগোচ্ছ্বাসে পরিণত করার ক্ষমতা তার থাকবে কী না ? সকলে কী লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করার কৌশল আর কূটনীতি জানে ?

ভাগনি একমনে বুনে যায় তার কার্পেটের আসন। মুখে অবশ্য সে বলে বোনার জন্যই কার্পেট বোনা, কিন্তু বিদেশ থেকে স্বামী ফিরে এলে এই আসনে তাকে বসতে দেবার কল্পনায় বারবার ঘরগোনা তার ভুল হয়ে যায়।

নবীনের মুখে মৃদু একটু হাসি দেখা দেয়। বিদেশের সেই মানুষটি তার ভাগনির সঞ্চিত ঔৎসুক্যের দাম দিতে পারবে ! বিদেশে বসে নিজের মধ্যে সেও এই মূল্যই সঞ্চিত করছে—ভাগনি তার ঠকবে না, প্রাপ্য তার কড়ায়-গন্ডায় শোধ হয়ে যাবে।

তার ভাগনিকে সুখী করে নিজে সুখী হবার লোভে, প্রিয়ার প্রীতির পুষ্পাঞ্জলিতে নিজেকে পূজা করার লোভে, বিদেশবাসী সেই মানুষটি নিজেকে কী ভাবেই না পরিবর্তিত করেছে ! গম্ভীর, জ্ঞানী, শুষ্ক সেই মানুষটি আজ হাসতে জানে, অজ্ঞান হতে জানে, রসের স্বাদ জানে।

শেষ গোরুর গাড়িটি এগিয়ে গেলে নবীন পথের ডাইনে আসবার সুযোগ পায়। মোটরগাড়িটি ধুলো উড়িয়ে উধাও হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে নবীন এগিয়ে চলে। মাঝে মাঝে পা তার পড়ে টায়ারের দাগে। কিন্তু পথের ধুলোয় কোনো গাড়ির চাকাই এমন গভীর দাগ এঁকে যায় না, কেবল পদক্ষেপে যা অনুভব করা চলে।

পিছন থেকে খড়খড়ি-বন্ধ ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়িটি যখন নবীনের নাগাল পায়, মন্থরপদে চললেও নবীন তখন গোরুর গাড়িগুলিকে অতিক্রম করে গেছে। ঘোড়ার গাড়িকে পথ দিতে তাকে পথের একেবারে ধারে সরে যেতে হয় না। খড়খড়ির অন্তরালে কয়েক জোড়া উৎসুক চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে সে কেবল খায় এক হোঁচট। বোরখা-পরা রমণীটি নিজেই ত্রস্তে ধারে সরে গিয়ে তার সংযম বাঁচায়। সংঘর্ষ বাঁচে, কিন্তু মনে মনে নবীন এমন লজ্জা বোধ করে, যেন বোরখা এবং বোরখার ভিতরের নারীর মর্যাদা সে পথের ধুলোতে লুটিয়ে দিয়েছে।

দূরে এক গির্জার চূড়ায় ঘড়িতে সময় আঁকা আছে। সেদিকে তাকিয়ে নবীন গতিবেগ একটু বাড়িয়ে দেয়। কিছুদূর চলে আপনা থেকে তার গতি আবার হয়ে আসে মন্থর। ধুলো উড়িয়ে

আরেকটি মোটর পাশ দিয়ে চলে যায়, মোটরটি চালাচ্ছে এক বিদেশি নারী, তার পাশে এক বিদেশি পুরুষ, মুখে তার মোটা সিগার। পিছনের সিটটা খালি পড়ে আছে। একবার নবীনের মনে হয়, সে যদি ওই সিটে বসে একটু তাড়াতাড়ি তাব পথটুকু অতিক্রম করত, জগতে কার তাতে কী ক্ষতি ছিল। তারপর নবীনের হাসি আসে। খালি আছে বলেই কি যে সিটে খানসামা বসে, সেই সিটে সে বসতে পাবে ! সে ভদ্রলোক নয় ?

একটু জোরে জোরে চলতে আরম্ভ করে নবীন অজ্ঞাতসারে আবার নিজের গতিবেগ কমিয়ে আনে। পিছন থেকে এসে তাকে অতিক্রম করে চলে যায় বাঁক-কাঁধে এক জেলে আর ঝুড়ি মাথায় এক জেলেনি। রুই-কাতলার বংশধর আর হাঁড়িভরা জলের ভারে বাঁক আর দেহ দুই বাঁকা হয়ে গেছে, তবু খালি ঝুড়ি মাথায় জেলেনির চলনের সঙ্গে তার চলনের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য। নবীনের মনে হয়, জেলেনির প্রকট যৌবন প্রত্যেক পদক্ষেপে যেভাবে লীলায়িত হয়ে উঠেছে, তারই ছন্দে জেলে নৃত্য করছে, জেলেনির হাতের রুপোর চুড়ির ক্ষীণ ধ্বনির সঙ্গে সংগত করে চলেছে জেলেব দুটি হাঁড়ির জলে ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।

পাশের এক চোরা-গলি থেকে বেরিয়ে আসেন মাঝবয়সি শীর্ণকায় এক ভদ্রলোক, মুখে রাত্রিজাগরণের ছাপ, জামাকাপড়ে সস্তা বিলাসিতা আর সস্তা এসেন্স।

নবীনকে দেখে একটু লজ্জা পেয়ে বলেন, আপিস যাচ্ছ ? ঝি আসেনি, ঝিকে ডাকতে গিয়েছিলাম ভাই। নচ্ছার মাগি—

হয়তো ঝি-ই ভদ্রলোকের প্রিয়া। দেহে-মনে বসনে-ভূষণে দাসীকে তৃপ্তি দিয়ে জীবনের চরম তৃপ্তি লাভের উপযোগী করেই নিজেকে গড়ে তুলেছেন।

লোকটির অস্বস্তিকর পীড়াদায়ক সঙ্গ পরিহার করবার কোনো উপায় নবীন খুঁজে পায় না, বরং সঙ্গে সঙ্গে চলবার জন্য তাকে আস্তে আস্তে হাঁটতে হয়, লোকটির আবোল-তাবোল বকুনির অর্ধেক কানে না তুললেও মাঝে মাঝে সায় দিতে হয়। এর সঙ্গে গল্প করতে করতে পথ চলতে দেখলে তার সম্বন্ধেও লোক কিছু যদি ভেবে বসে ? ভয়ে ভয়ে নবীন চারদিকে তাকায়। সমস্ত রাত্রি এক গৃহত্যাগিনীব সঙ্গে যাপন করে, স্ত্রীপুত্রেব অসুখ-বিসুখ আর সাংসারিক অশান্তির যে গল্প লোকটি ফেঁদে বসেছেন দুই-একটি টাকা ধার চাওয়াই তার একমাত্র পরিণতি সন্দেহ নেই। মনে ব্যথা না দিয়ে প্রত্যাখ্যান করার একটা লাগসই কৈফিয়ত খুঁজে না পেয়ে নবীন উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে।

একটা পয়সা হাতে নেই, থাকলে নিশ্চয় দিতাম।—বিড়বিড় করে সবিনয় ক্ষমা প্রার্থনাব ভঙ্গিতে নবীনও নিজের সাংসারিক দুঃখকষ্টের খাপছাড়া তালিকা দাখিল করে। মনটা বড়ো খাবাপ হয়ে যায়।

যেমন খারাপ হয়ে যায় বউয়ের কোনো আবদার রক্ষা করতে না পারলে।

নিজেকে লোপ করে বিশ্বেব ভালোমন্দ সকল মানুষের মনে আঘাত লাগা নিবারণ করার দায়িত্ব যেন সে গ্রহণ করেছে।

লোকটি একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, তোমার না মাইনে বেড়েছে এ মাস থেকে ?

নবীন মাথা নেড়ে বলে, কই আর বাড়ল ? বাড়াবে বাড়াবে করে বাড়াচ্ছে না।

মনটা নবীনের আরও খারাপ হয়ে যায়। সে জানে জোর করে চেপে ধরলে কবে তার মাইনে বেড়ে যেত, কিন্তু জোর করে চেপে ধরতে কেমন সংকোচ বোধ হয়। একটু ভয়ও করে।

মাইনে বাড়লে বউকে সেই শাড়িখানা কিনে দিতে পারত। বউ জোর করে চেপে ধরলে অবশ্য এখনও দিতে পারে, কিন্তু বউ তো আর সেভাবে কিছু চাইবে না। এই জনাই তো বউকে সে এত ভালোবাসে।

সিঁড়ি

একতলার উত্তরপ্রান্ত থেকে দোতলা আর তিনতলার মধ্যস্থতা অতিক্রম করে সিঁড়িটা তেতলার খোলা ছাদে গিয়ে পৌঁছেছে। এই সিঁড়ি বেয়ে খোলা ছাদে পৌঁছনোর জন্যে সাধারণ নিয়মে চৌষট্টিবার একটি পায়ের জোরে মাধ্যাকর্ষণের বিরোধিতা করতে হয়। তবে সাধারণ নিয়ম সকলের জন্যে নয়। এমন মানুষও জগতে আছে যারা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার সময় দুটো তিনটে ধাপ একেবারে ডিঙিয়ে যায়। এরা মানুষ হয়েও ঠিক মানুষ নয়,—মহামানব। মহামানব এই জন্যে যে এ জগতে মহামানবী নেই, কারণ মেয়েরা কোনোদিন দুটো তিনটে ধাপ ডিঙিয়ে ওপরে ওঠে না। ক্ষমতাও নেই, বাধাও আছে।

চৌষট্টি ধাপের সিঁড়িটাকে ঢাকা দেবার ছাদটুকুর উপরে পাতলা দেয়াল আর টিনের চালের একটি চিলেকুঠি আছে এ বাড়িতে। পথ থেকে বাড়ির ভিটেয় ওঠবার জন্য আর একতলার বারান্দা থেকে উঠানে নামবার জন্য এ বাড়িতে ধাপের ব্যবস্থা মোটে একটি করে, কিন্তু চিলেকুঠিতে ওঠানামার জন্য ধাপ আছে দুটি, তাই এও একটা সিঁড়ি। দুটি একের সমষ্টি যখন দুই এবং ধাপের সমষ্টি মাত্রেই সিঁড়ি, চিলেকুঠিটিকে সিঁড়ি থাকার গৌরব না দিয়ে উপায় নেই।

চৌষট্টি ধাপের সিঁড়িটিকে বাড়ির ছায়াই শীতল করে রাখে, চিলেকুঠির সিঁড়ি কিন্তু চিলেকুঠির ছায়া পায় শেষবেলায়, গ্রীষ্মকালেও সূর্য যখন নিস্তেজ। মেঘলা দিন বাদ দিয়ে শীতের দুমাস পরেও দুপুরবেলা চিলেকুঠিটি হয়ে থাকে শীতার্ত মানুষের স্বর্গ আর সিঁড়িটা হয়ে থাকে আগুন। শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে যে শীতার্ত, তারও পায়ের পাতা পুড়িয়ে দেয়।

ডান পায়ের চেয়ে ইতির বাঁ পা-টি লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চি ছোটো। হ্রস্ব পা-খানি প্রথম ধাপে নামিয়েই সে তুলে নেয়। ব্যাপারটা মানবকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য দাঁতের ফাঁকে সজোরে শব্দ করে, ইস !

মানব বলে, গরম বুঝি ?

ইতি বলে, আগুন হয়ে আছে।

ঘরে কুঁজোয় জল ছিল, একতলা থেকে মানবের নিজের বয়ে আনা জল। কুঁজো কাত করে মানব সিঁড়িতে জল ঢেলে দেয়। যতক্ষণ সে জল ঢালতে থাকে ইতি কথা বলে না, সবটুকু জল মানব ঢেলে দেয় কিনা দেখবার জন্যে চুপ করে থাকে। কুঁজো খালি হয়ে গেলে মানবের হাত চেপে ধরে বলে, সব জল ঢেলে দিলে ? একটু খেতাম আমি, তেষ্টা পেয়েছে।

এতক্ষণ খাওনি কেন ?

এতক্ষণ কি মনে ছিল ? জল দেখে খেয়াল হল।

মানব একটু হাসে। চল্লিশ বছরের পুরানো মুখখানায় সাতদিনের দাড়ি-গোঁফ জমেছে, বাঁদিকের গালটি কবে যেন চিরে সেলাই করে দেওয়া হয়েছিল। ঘাম মুছে মাজা বাসনের মতো কপাল চিকচিক করছে। তামাকের ধোঁয়ায় ঠোঁট দুটি কালো। দাঁতে আর মুখে বেহিসেবি পান খাওয়ার ইতিচিহ্ন। শান্ত নির্মল হাসিটুকু তাই আরও অপূর্ব মনে হয়,—ইতির মুখও সলজ্জ হাসিতে ভরে যায়, ব্রণের ছোটো ছোটো গর্তভরা দুটি গালেই টোল পড়ে সৃষ্টি হয় দুটি বড়ো গহ্বরের।

মানব বলে, চলো নীচে যাই। তুমি জল খাবে আমি কুঁজোটা ভরে নিয়ে আসব।

ইতি বলে, তোমার তেষ্টা পায়নি ?

মানব বলে, পাবে পাবে, ভাবছ কেন ?

ধাপ দুটি ভাসিয়ে কুঁজোর জল ছাদে তিনটি ধারায় ভাগ হয়ে গিয়েছিল, নালির কাছাকাছি একসঙ্গে মিলে এতক্ষণে নালি দিয়ে নীচে ঝরে পড়তে আরম্ভ করেছে। সমস্ত ছাদে শুকনো শ্যাওলা, আর কয়েকটি দুপুরের রোদ পেলেই আলগা হয়ে উঠে আসবে আর সন্ধ্যার পর মানবের পায়চারিতে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কুঁজো হাতে এক ধাপ নেমেই বোধ হয় আগামী সন্ধ্যায় নিজের পায়চারি করার দৃশ্যটা কল্পনায় ভেসে ওঠে মানবের, মুখ ফিরিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, সন্ধ্যার সময় আসবে একবার ?

না এলে রাগ করবে ?

রাগ ? আর কী তোমার ওপর রাগ করতে পারি ? এবার থেকে অভিমান করব।

তা হলে আসব না।

মানব খুশি হয়ে বলে, সেই ভালো। আজ একা একা তারা গুনে অভিমান করব, কাল তুমি এসে আমার অভিমান ভাঙাবে। আমার এমন ছেলেমানুষি করতে ইচ্ছে করছে ইতি ! কী রকম যে লাগছে আমার কী বলব !

আমারও।

দৃষ্টির একটু গভীরতা এসেছে বইকী মানবের, মনটা তো অন্তত শান্ত হয়েছে। দুজনেই যখন ছাদে নেমেছে, সে হঠাৎ ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো ইতি ?

না গো, না। কীসের কষ্ট ?

সন্ধ্যার পর না এসে ইতি তাকে অভিমান করবার সুযোগ দেবে, পরামর্শ হয়েছে এই। এখনই যেন মানবের অভিমান হয়, মুখখানা গম্ভীর করে সে বলে, তোমার চেয়ে আমি অনেক বড়ো কিনা, তাই বলছি।

আমিই বা কী এমন আকাশের পরি !

অভিমান গাঢ় হয়, মানবের চোখ পর্যন্ত যেন ছলছল করে।

আকাশের পরি হলে তুমি আমার দিকে তাকিয়েও দেখতে না তো ?

কী ছেলেমানুষ তুমি !

আকাশে রোদ, ছাদ গরম। আবার মানবের মুখ হাসিতে ভরে যায়, ইতির কাঁধে মুখ রেখে কথা বলতে গিয়ে কিছু না বলাই সে ভালো মনে করে। কথা বলার চেয়ে কঠিন হাসি হেসে ইতিকে তাই হাসির জবাব দিতে হয়। এ কী আশ্চর্য যে নীচে নামবার কথা ভুলে যাওয়ার মতো ভঙ্গিতে দুজনে কয়েক মুহূর্তের জন্যও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ? পায়ের তলার ছাদটুকু ছাড়া আর সব যেন অনাবশ্যক হয়ে গেছে। অনেক উঁচুতে এই ছাদ,—দামি একটা হাউই পৃথিবী ছেড়ে যত উঁচুতে উঠতে পারে হয়তো তত উঁচুতে নয়, কিন্তু কে আর সে আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রমাণ করতে বসবে দামি হাউই ছেড়ে ? আশেপাশের বাড়িগুলি তো এত উঁচু নয়, এ বাড়ির মতো ইট-বের-করা নয় বলে কেবল দেখতে সুন্দর। কিন্তু সেটুকুও এ বাড়ির ছাদে যারা দাঁড়িয়ে থাকে তাদেরই ভালো লাগে. চোখ মেললেই সমগ্রভাবে চোখে পড়ে। তা ছাড়া পাওয়া যায় আচ্ছন্ন, অভিভূত হওয়ার একটা অতিরিক্ত ক্ষমতা।

ইস !

এবার মানবের চমক লাগে।

গরম বুঝি ?

আগুন হয়ে আছে।

মানব আপশোশ করে বলে, তোমাকে আজ খালি কষ্ট দিচ্ছি।

দিচ্ছই তো। খালি খালি কষ্ট দেওয়ার কথা বলছ।

চৌষট্টি ধাপের সিঁড়ির ছায়াতে নেমে যাওয়া মাত্র দুজনে যেন আশ্চর্য হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। মানব বলে, সিঁড়িটা তো বেশ ঠান্ডা।

ইতি সান্ত্বনা দিয়ে বলে, গরম থেকে এলে কিনা। এতক্ষণ কিন্তু বুঝতেই পারিনি তোমার ঘরটা কী গরম।

ধীরে ধীরে ইতি নামতে থাকে, প্রতি মুহূর্তে এলিয়ে পড়তে চাওয়ার মতো অলস অনিচ্ছুক পদে। সিঁড়ির মুখের কাছে তাপ ও আলো মেশার ফলে ছায়া একটু কম শীতল, কম ম্লান। প্রত্যেক ধাপ নামার সঙ্গে যেন বুঝতে পারা যায় ছায়া গাঢ় হচ্ছে, শীতলতা বাড়ছে। কিন্তু এই গরমে কোনো ছায়াই এমন শীতল হতে পারে না যে একটু আরাম দেওয়ার বেশি কিছু দিতে পারবে, ইতি কিন্তু একবার শিউরে ওঠে। জ্বরের রোগীর গায়ে কেউ যেন হঠাৎ বরফের ছেঁকা দিয়েছে।

তেতলার বারান্দায় বছরখানেকের ছেলে কোলে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, ছেলেটি চুষছিল চুষিকাঠি আর মেয়েটি চুষছিল ছেলেটিব গোটাতিনেক আঙুল। সিঁড়ির মাঝামাঝি বাঁকেব ধাপটি একটু প্রশস্ত, সেখানে দাঁড়িয়ে ইতি শিহরনটুকু সামলায়, তারপর ফিরে যাওয়ার উপক্রম করে, কিন্তু উপক্রম করেই ক্ষান্ত হয়। ছুটে পালানোর এই আকস্মিক প্রেরণার জন্যই বোধ হয় মুখখানা একটু অপ্রসন্ন ও ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে, ততক্ষণে মানবও এদিকে ভদ্রতা করে ফেলেছে।

মায়ে-পোয়ে কী হচ্ছে ?

মেয়েটি মাথার কাপড় তুলে দেয়, মুখ থেকে ছেলের আঙুল খসে পড়ে। অনাবশ্যক নীরবতাব সঙ্গে খানিকক্ষণ ইতির দিকে চেয়ে থেকে বলে, এমনি দাঁড়িয়ে আছি।

নবেন আজ কখন আপিস চলে গেল, জানতেও পারিনি।

উনি ভোরবেলা বেরিয়ে গেছেন, আমার বোনের বাড়ি হয়ে আপিস যাবেন। আজ ধীরে সুস্থে রান্নাবান্না করেছি, একেবারে রাঁধবই না ভেবেছিলাম, হঠাৎ আমার দেওব এসে পড়ল কিনা, তাই রেঁধেছি। রেঁধে বেড়ে না খাওয়ালে নিন্দে করত তো ? গিয়ে বলত, ভাইকে তো পর করেইছি, বাড়িতে এলে একবেলা খেতেও বলি না,—এইমাত্র চলে গেল। কেন এসেছিল জানেন ? টাকা চাইতে ! এদিকে আমার নিন্দে ছাড়া মুখে কথা নেই, দাদাকে বাড়ি না পেয়ে আমার কাছে দিব্যি দশটা টাকা চেয়ে বসল। আমি বললাম, আমি টাকা কোথায় পাব, দাদার কাছ থেকে নেবেন।—তুই ছাতে কী করছিলি ইতি ?

ইতি বলে, বাড়িভাড়া দিতে গিয়েছিলাম। মা বললে, ভাড়ার টাকাটা দিয়ে আয় তো ইতি, সেই জন্য।

ছেলের ভার ডান হাত হতে বাঁ হাতে গ্রহণ করে আবার মেয়েটি অনাবশ্যক নীরবতার সঙ্গে ইতির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ একটা ভুলে-যাওয়া কথা মনে পড়বার ভঙ্গিতে বলে, ও, হ্যাঁ—আমাদের ভাড়ার টাকাটাও তো দেওয়া হয়নি। কী করেই বা দেব, কাল তো মোটে মাইনে পেলেন। আজ দিতে বলে গেছেন। একটু দাঁড়ান, টাকাটা এনে দিই, কেমন ? খোকাকে একটু ধরবি ভাই ইতি ?

ইতির কোলে ছেলে দিয়ে আঁচলে বাঁধা চাবির গোছায় বারকয়েক ঝনাৎ করে শব্দ তুলে ঘরের ভিতরে মেয়েটি বাক্সো খোলে। গোটা দুই বাক্সো মোটে তার সম্পত্তি, কিন্তু চাবির গোছায় চাবি যেন আঁটে না, আঁচল ছিঁড়ে পড়তে চায়। বাক্সো খোলা আর বন্ধ করতেও কত যে অনাবশ্যক শব্দের সে সৃষ্টি করে বলবার নয়।

মানব নিচু গলায় ইতিকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের ভাড়া দিতে এসেছিলে নাকি ?

ইতি বলে, না। ওর কাছে একটা কৈফিয়ত দিতে হবে তো ?

ইতিকে খোকা অনেকদিন থেকে চেনে, প্রায় আজন্ম। কিন্তু ইতি কোনোদিন তার হাতের আঙুল মুখে পুরে চোষে না বলেই বোধ হয় ইতির কোলে থাকতে তার ভালো লাগে না। চুষিকাঠিটা প্রথমে নীচে পড়ে যায়, এদিক ওদিক চেয়ে খোকা মুখ বাঁকায়, তারপর মানব তার গালে একটা টোকা দেওয়া মাত্র সে কাঁদতে আরম্ভ করে।

বাক্‌সে চাবি দিতে দিতে মেয়েটি আনন্দে গদগদ হয়ে বলে, আসছি রে আসছি, দুষ্টু কোথাকার। এক মিনিট আমায় ছেড়ে থাকতে পারবি না, আচ্ছা ছেলে হয়েছিস তো তুই ?

ভাড়ার টাকা, স্বামীর লিখে-রাখা রসিদ আর এক কলম কালি নিয়ে খোকার মা বারান্দায় আসে, মানবকে টাকা গুনে দিয়ে রসিদে তার সই নেয়, তারপর ছেলেকে কোলে করে বলে, এত টাকা ভাড়া তো পান, কী করেন টাকা দিয়ে ? সমস্ত বাড়িটা ভাড়া দিয়ে এই গরমে একা একা চিলেঘরে কী করে থাকেন আপনি ! আমি হলে তো পারতাম না।

মানব ভাড়ার টাকা কোমরে গুঁজে বলে, না পেরে উপায় কী, খোকার বাবার মতো আমি তো চাকরি করি না।

খোকার মা চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, আপনার আবার চাকরি ! একমাসে আপনি যা সুদ পান, ওর মাইনের তা ক-গুণ কে জানে ! একটু শুইগে খোকাকে নিয়ে, ঘুমিয়ে পড়ে তো তোকে ডাকব ইতি। পাখিটার ঠোঁট আর পা দুটো ভালো হচ্ছে না, একটু দেখিয়ে দিস। কটা করে ঘর বুনতে বলেছিলি ভুলে গেছি ভাই, যা দুষ্টুমি করে খোকা !

মানব বলে, আরেকজন দুষ্টুমি করে না ?

করে না ?—ফিক করে হেসে ফেলে পাক দিয়ে ঘুরেই খোকার মা ঘরের ভিতরে চলে যায়। কুঁজোটা তুলে নিয়ে মানব সিঁড়ির এক ধাপ নেমে গিয়ে দাঁড়ায়। মুখ ফিরিয়ে বলে, এসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

ইতি নীরবে আসে। সমতল বারান্দায় ছোটো বড়ো পা নিয়ে চলার ভঙ্গিটি তার বেশ। অন্য সব মেয়ে যেন শুধু চলে। ইতি একটা অজানা ছন্দে দুলে দুলে চলে। কোলে ছেলে নেই ইতির, আঁচলে নেই চাবির ভার, তবু বুকে পিঠে কাঁখে ছেলে যেন আছে তার অনেকগুলি, আঁচলে বাঁধা আছে সে যত ভার বইতে পারে না তার চেয়ে বেশি ভারী চাবির গোছা।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে মানব বলে, তোমাদের পাঁচ মাসের ভাড়া বাকি আছে।

হ্যাঁ।

মানব রসিকতা করে বলে, অন্য কোনো ভাড়াটে হলে কবে তুলে দিতাম।

হ্যাঁ।

রাগ হল নাকি, ভাড়ার কথা বললাম বলে ?

না না, রাগ কীসের ?

সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় নামার শিথিল এলায়িত ভঙ্গি এখন দোতলায় নামার সময় স্খলিত পদে নামার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেছে। নামাও যেন কম পরিশ্রমের কাজ নয়।

মানব মুখ ভার করে বলে, অত হিসেব করে কথা বলা আমার আসে না। যা মনে আসে বলে ফেলি। কী এমন বললাম যে তোমার মুখ ভার হয়ে গেল ?

ইতি একটু হাসে। হাসলে মুখের ভার হালকা হয়।

মুখ আবার ভার হল কোথায় ? কী ছেলেমানুষ তুমি ! তোমার কথায় কি আর মুখ ভার করেছি, মুখ ভার করেছি তেতলার ওই লক্ষ্মীছাড়ির কথায়। খোকার বাবা তো এদিকে মাইনে পায় তেষট্টি টাকা, অহংকারে যেন ফেটে পড়ছে !

সুতরাং মানবও হাসে। ইতির কথায় স্ত্রী-চরিত্রের একটা স্থূল দিক ফুটে উঠেছে আর নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে সেটা ধরতে পেরেছে বলে গর্ব আর আমোদ অনুভব করে। ইতিকে নাড়া দিয়ে স্ত্রী-চরিত্রের আরও দুটো দিক আবিষ্কারের আশায় বলে, কেন, নরেনের বউ বেশ লোক।

বেশ না ছাই। সুখে আছে তাই, আমার মতো পোড়াকপাল তো নয়।

তোমার পোড়াকপাল নাকি ?

দুজনেই থমকে দাঁড়ায়। ইতি পিছনে হেলে যায় সাপের ফণা ধরার মতো, বলে, কী বললে ?

মানব গম্ভীর হয়ে বলে, তোমার পোড়াকপাল বলছ, আমার জন্য তো ?

সাপের ফোঁস করার মতোই ইতি সজোরে নিশ্বাস ছাড়ে, কিন্তু ছোবল মারার বদলে বয়স্কা নারীর চিরন্তন ক্ষমা করা আর প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, তোমার সঙ্গে আর পারলাম না। মা বাবা ভাইবোনেদের কথা ভেবে ও কথা বলেছি, কী কষ্টে আছে সবাই বলো তো ? নইলে, আমি তো আজ রাজরানি। অবিশ্যি, দেখতে শুনতে রাজরানি নই, তোমার জন্যে রাজরানি।

তেতলায় মানুষ আছে, দোতলায় মানুষ আছে, সিঁড়িতে আর কেউ নেই—তবু ইতি জোর করে গলা একেবারে খাদে নামিয়ে দেয়। বলে, তুমি আমার রাজা।

দুজনে দোতলায় নামামাত্র উপরের যে ঘরটিতে খোকাকে নিয়ে খোকার মা শুতে গেছে ঠিক তার নীচের ঘর থেকে বার হয়ে আসে মাঝবয়সি একটি মহিলা। মহিলাটি এত মোটা যে পদক্ষেপে মেঝে না কাঁপলেও দুমদাম শব্দ হয়। তবে এখন পা ফেলার শব্দটা তার একটু জোরালো, হয়তো একটু বেশি জোরেই সে এখন পা ফেলেছে।

কোথায় ছিলি ইতি ?

তেতলায় ছিলাম, খোকার মার কাছে।

ছাই ছিলি, তিনবার ওপরে নীচে তোকে খুঁজে এসেছি।

তখন হয়তো চিলে ঘরে গেছলাম। মা বললে, ভাড়ার টাকাটা দিয়ে আয় তো ইতি, সেই জন্য। এতক্ষণ তো খোকার মার সঙ্গে গল্প করছিলাম, জিগ্যেস করে আয় খোকার মাকে। খোকার মার সঙ্গে গল্প করছিলাম না মানববাবু ?

মানব বলে, করছিলে বইকী।

ইতি আবার জিজ্ঞাসা করে, আপনি বললেন না কুঁজোয় জল ফুরিয়ে গেছে ? আমি বললাম না, চলুন নীচে গিয়ে কুঁজোতে জল ভরে দিচ্ছি ?

মানব মাথা নেড়ে সায় দেয়।

মোটা মেয়েটির রং খুব ফরসা ! এতক্ষণ মুখখানা তার লাল হয়ে ছিল, এবার ধীরে ধীরে লালচে ভাবটা কমে যেতে আরম্ভ করে। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আরও জোরে দুমদাম পা ফেলে সে ঘরে গিয়ে ঢোকে। দরজা বন্ধ করে দড়াম করে খিল তুলে দেয়।

পরক্ষণে খিল খুলে আবার বের হয়ে আসে।

তুই মর ইতি, মর তুই, গোল্লায় যা। পা না তোর খোঁড়া ? খোঁড়া পায়ে তুই না সিঁড়ি ভাঙতে পারিস না ? সিঁড়ি ভাঙতে পারিস না তো, যমের বাড়ি যাস না কেন তুই ?

মানব বলে, সুধা, আজ হাসপাতালে যাওনি ?

সুধা বলে, দেখতে পাচ্ছ না, যাইনি ?

মানব আবার বলে, আজ ডিউটি নেই বুঝি ?

সুধা হঠাৎ কাঁদোকাঁদো হয়ে বলে, ডিউটি থাক বা না থাক, তোমার কী ?

মানব শান্তভাবে বলে, না, এমনি বলছি। ভাড়ার টাকা দেবে নাকি আজ কিছু ?

সুধা স্তব্ধ হয়ে যায়। চোখের চারদিকের অতিরিক্ত মাংস ফেলে ছোটো ছোটো চোখ দুটিকে বড়ো করবার চেষ্টা করে।

ভাড়া চাইছ ? ভাড়া !

মানব মৃদু একটু হেসে বলে, তুমিই তো বলেছিলে আজ কিছু দেবে।

এখনও মাইনে পাইনি।

বেশ মাইনে পেলে দিয়ো। নগেনকে ফিরে আসবার জন্যে খুব বিজ্ঞাপন দিচ্ছ, না সুধা ?

সুধা মুখ সাদা করে বলে, কে বলে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি ?

কাগজে দেখলাম। বেশ বিজ্ঞাপন দিয়েছ, ছেলেমেয়েদের নিয়ে একা আর কতকাল চালাব, আমার জন্যে না হোক ওদের কথা ভেবে ফিরে এসো, ইতি তোমার সুধা। তোমার বিজ্ঞাপন যদি চোখে পড়ে সুধা, যেখানে থাক নগেন ছুটে আসবে।

সুধা আর কথা বলে না, আবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। এবার তার পদক্ষেপের শব্দও হয় কোমল, দরজা বন্ধ করার শব্দও হয় মৃদু।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করে ইতি বলে, সিঁড়ি যেন আর ফুরোতে চায় না।

কষ্ট হচ্ছে ?

থাক, আর দরদ দেখিয়ে কাজ নেই।—সুধাদির ক মাসের ভাড়া বাকি আছে ?

ক মাস আবার, দু-একমাস। কী করবে বলো বেচারি, চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে চাদ্দিক অন্ধকার দেখছে। নার্সগিরিতে কী পয়সা আছে ?

তুমি দাও না কেন ?

আমি কেন দেব ? আমার সঙ্গে কী সম্পর্ক ? আর দুমাস দেখব, ভাড়া যদি না মিটোয়, পষ্ট বলে দেব বিনা ভাড়ায় যে-বাড়িতে থাকতে পারে সেখানে থাকো গে, আমার এখানে ও সব চলবে না।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নামার স্খলিত ভঙ্গি ইতির এবার নিজের হঠাৎ মুচড়িয়ে ভেঙে পড়বার ভঙ্গিতে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু এদিকে সিঁড়িও ফুরিয়ে আসছে, প্রাণপণ চেষ্টায় মানবের বাহুমূলে আস্তে একটি চড় মেরে মৃদু হেসে সে তাই বলে, কী দুষ্টুই তুমি ছিলে !

তেতলায় খোকার মা খোকাকে যেমন করে দুষ্টু বলেছিল, ঠিক তেমনই করে বলে। তারপর আচমকা জিজ্ঞাসা করে, কই দিলে না ?

মানব বলে, কী ?

মা যে দশ টাকা ধার চেয়েছে ? ভাড়ার টাকা তো পেলে, তাই থেকে দাও না ?

মানব মৃদু হেসে কোমরের গোঁজা টাকা বার করে ইতিকে দশটা টাকা দেয়। ইতি ঘাড় গুঁজে নামতে থাকে।

একতলার বারান্দায় নেমে দেখা যায় : বারান্দায় মাদুরে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ইতির মা ঘুমুচ্ছে, পাশে পড়ে আছে বছর তিনেকের একটা উলঙ্গ ছেলে, সর্বাঙ্গে তার অনেকগুলি পাঁচড়া। বারান্দার অপর প্রান্তে এঁটো বাসন পড়ে আছে। ছেলেটার পাঁচড়ার রস ভালো না লাগায় থেকে থেকে পাঁচড়া ত্যাগ করে কয়েকটা মাছি উড়ে যাচ্ছে এঁটো বাসনে আর উচ্ছিষ্ট ভালো না লাগায় থেকে থেকে কয়েকটা মাছি এঁটো বাসন ত্যাগ করে উড়ে এসে বসছে ছেলেটার পাঁচড়ায়।

ইতির মার ঘুম ঠিক ঘুম নয়, চোখ বুজে থাকা। মটকা মেরে নয়, শ্রান্তিতে আর দুর্বলতায়।

চোখ মেলে ইতির মা বলে, ইতি এলি ?

বলে মানবের মুখের দিকে চেয়ে ইতির মা বলে, সকালবেলা এক কুঁজো জল নিয়ে গেলেন, ফুরিয়ে গেছে ? ইতি, যা তো মা, কুঁজোয় জল ভরে দিয়ে আয়। ও সব কী পুরুষ মান্‌ষের কাজ !

মানব বলে, সিঁড়ি ভাঙতে ইতির কষ্ট হয়, আমিই নিয়ে যেতে পারব।

ইতির মা এ কথা শুনতে পায় না। মেয়ের পদমূলে চোখ রেখে বলে, তোর পায়ে রক্ত কীসের লো ইতি ?

ইতি নিশ্চিন্তভাবে বলল, পাঁচড়া চুলকে ফেলেছি।

মানব বলে, তোমার পাঁচড়া হয়েছে ইতি ?

প্রশ্ন শোনামাত্র ইতি বিনা ভূমিকায় খেপে যায়। আর্তনাদ করার মতো বলতে আরম্ভ করে, হ্যাঁ হয়েছে, একশোটা হয়েছে। কী করবে তুমি ? ঘেন্না করবে ? করোগে যাও, কে তোমার ঘেন্নাকে কেয়ার করে ? দেখছ না ভাইয়ের গায়ে পাঁচড়া, জান না ভাইকে আমি কোলে নিই ? পাচড়া হবে না তো কী হবে আমার ?

তাড়াতাড়ি কুঁজোটা নামিয়ে রাখতে সেটা গড়িয়ে উঠোনে পড়ে ভেঙে যায়। মানব সেদিকে চেয়েও দ্যাখে না।

ঘরে যাও ইতি, সুধাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বলে একেবারে তিন-চারটা ধাপ ডিঙিয়ে মহামানবের মতো মানব উপরে উঠতে আরম্ভ করে।

সরীসৃপ

মহাজন

গ্রামের কোনো বউ যখন বলে, তোমারই পথ চেয়েছিলাম, পথ সম্বন্ধে তখন গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বাঁধানো পাকা রাস্তা কাঁচামাটির আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ পল্লিপথে পরিণত হওয়ার উপক্রম করে। দুপাশে দেখা যায় ঝোপঝাড় ডোবাপুকুর, জীর্ণ খড় অথবা শণে ছাওয়া বাড়িঘর—একটি মেয়ের ঘোমটা ফাঁক করিয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিবার ফলে চারিদিকের আবহাওয়াই যেন বদলাইয়া যায়। পথটি দিয়া মোটর চালানো যায় না, পথের দুদিকে কতকটা আধুনিক ফ্যাশনের পাকা দালান খাড়া করা যায় না, যে চোখ দুটি দিয়া বউটি পথের দিকে চাহিয়াছিল (চাহিয়া ছিল কিনা ভগবান জানেন, হয়তো সমস্ত দিনটা পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইয়াছিল,—তোমার পথ চেয়েছিলাম গো !—যাকে বলিতে হয় সে যে রাত্রিটা ঘুমাইতে দিবার পাত্র নয় এটুকু জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা গ্রামের বউদেরও থাকাটা অস্বাভাবিক নয়)। সে চোখে একজোড়া চশমা আমদানি করাটাও প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

তবে বলিয়া দিলে সকলেরই বিশ্বাস করা উচিত যে, বাঙ্গা, গ্রামের বউ, প্রায় সাড়ে তিনশো মাইল লম্বা বাঁধানো রাস্তার ধারে গ্রামেরই দোতলা পাকা দালানে তার বাস, ঘুমানো দূরে থাক সারাদিন সে পাঁচ মিনিট চুপ করিয়া এক জায়গায় বসিয়াছে কিনা সন্দেহ এবং সত্যসত্যই একজনের পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়াছে।

কখনও সদর দরজায় দাঁড়াইয়া চাহিয়াছে, কখনও জানালার শিকের ফাঁকে চাহিয়াছে, কখনও আলিসাহীন ছাদে দাঁড়াইয়া চাহিয়াছে। পথ ছাড়া আর যা কিছু দেখিবার আছে, কিছুই দেখিতে বাদ দেয় নাই। তবে সে একরকম মূল্যহীন দেখা। অনেকদিনের অতি পরিচিত আবেষ্টনী। চোখের সঙ্গে এমন অদ্ভুত ঘনিষ্ঠ পরিচয় যে, নূতনত্ব সৃষ্টিই হইতে পারে না। যে দু-একখানা নতুন ঘরবাড়ি উঠিয়াছে, যে ঘরবাড়ির সংস্কার হইয়াছে, যেখানে বন সাফ হইয়াছে, যেখানে গাছপালা নিবিড়তর হইয়াছে, যেখানে মাঠের খোলা বুক ফসলে ভরিয়া গিয়াছে, যেখানে শুকনো জমিতে জল জমিয়া আয়নার মতো ঝকঝকে জলা হইয়াছে,—তার চোখের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্য কোথাও যেন আকস্মিকতা আমল পায় নাই, সমস্ত পরিবর্তনের পিছনে তার শুভদৃষ্টির অনুমোদন লাগিয়া আছে।

এই ব্যাপারটাই আগাগোড়া কেমন খাপছাড়া লাগে। প্রায় চুয়াল্লিশ বছর বয়সে এ সব কি চলে মেয়েমানুষের ! বাহিরটা ভিতরে চলিয়া আসিবে, এ বয়সে এটা আর ঠিক মানায় না, উচিত হয় না, প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। কপালে ত্রিশ বছরের সিঁদুরের ফোঁটাটা একবারও চড়চড় না করিলে যেমন অন্যায় হয়, এও কতকটা সেইরকম বইকী। সকালে, দুপুরে, বিকালে, রাত্রে, চারিপাশের জগৎকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া ভিতরে আনা, তুচ্ছতম পরিবর্তনকে পর্যন্ত সূচনা হইতে চিনিয়া রাখা। দশটা দিক তার জগতের, দশ-প্রহরণের বৈচিত্র্য। চেতনাকে অবশ করিয়া রাখা মহাপাপের শামিল নয় কী ? বিশেষত আজ যখন একজনের আসিবার কথা ছিল ? আজ যখন সে একজনের পথ চাহিয়া আছে ?

আবেগ বাঙ্গার অতি অভ্যস্ত অনুভূতি—চুয়াল্লিশ বছর বয়সে পর্যন্ত। আবেগের আতিশয্যে প্রায় প্রত্যেক দিনই কয়েকবার কিছুক্ষণের জন্য মাথা ঝিমঝিম করে। এতদিন এ জন্য বিশেষ কোনো ভাবনা ছিল না, এতবড়ো বাড়িতে এত কম লোকের মধ্যে এত কম কাজ করিয়া দিন কাটাইতে হইলে মাঝেমাঝে আবেগের আতিশয্য ঘটিয়া মাথাটা ঝিমঝিম করিলেই বরং আরাম লাগে, কিছুক্ষণের জন্য ভাবনাচিন্তা অনুভূতি সব ভোঁতা হইয়া যায়,—কিন্তু এবার কদিন আগে হঠাৎ একটা দুর্ভাবনা

গজাইয়া উঠায় বিপদ হইয়াছে, চুলে নাকি বাঙ্গার পাক ধরিয়াছে এই জন্য—এ রকম আবেগের আতিশয্য ঘটিয়া মাথা ঝিমঝিম করিতে থাকিলে কিছুদিনের মধ্যেই নাকি তার চুল পাকিয়া যাইবে। বুড়ি হইয়া পড়িবে বাঙ্গা। হায়, চুয়াল্লিশ বছর বয়স হইয়াছে বাঙ্গার, চুল পাকিয়া বাঙ্গা বুড়ি হইয়া যাইবে !

বাঙ্গা নিজেই এটা আবিষ্কার করিয়াছে। কয়েকদিন আগে করুণার বউকে সে এই বলিয়া বকুনি দিয়াছিল : বিইয়েছিস তো বাছা একটা মোটে মেয়ে, লজ্জাশরম নাইবা এর মধ্যে ভাসিয়ে দিলি ? যাক না আর দুটো দিন ? হোক না আর দুটো একটা বাচ্চাকাচ্চা ?

করুণার বউ জবাব দিয়াছিল : বেশি কাচ্চাবাচ্চা না হলে বুঝি বুড়ো বয়েস পোয়্যোন্তো কনেবউটি সেজে থাকতে দিদি ?

কী বললি ?

বলিনি কিছু, জিগগেস করছি। তোমার একটিব বেশি কাচ্চাবাচ্চা হয়নি তো, মাথার চুলে পাক ধরেছে, তবু যে কনেবউটির মতো লজ্জাশরম রেখে চলেছ এটা সেই জন্য কিনা, তাই জিগগেস করছি। জিগগেস করলে তো দোষ নেই দিদি ? তোমায় জিগগেস না করলে কাকেই বা জিগগেস করব বল ?—তুমি হলে গিয়ে, কী যেন বলে, সবজান্তা।

চুলে পাক ধরিয়াছে ? ধরুক। স্বাভাবিক নিয়মে ঠিক বয়সে পাক ধরিয়া সমস্ত চুল শণের নুড়ি হইয়া যাক। কিন্তু মন কেমন করিযা মাথা ঝিমঝিমানির জন্য অসময়ে মাথার চুল সাদা হইবে কেন ? সে কি বরদাস্ত হয় মানুষের ? কে জানিত মাথা ঝিমঝিম করার এমন একটা কুফল আছে !

কপাল পোড়া, তাই অসময়ে জানিতে হইল। এতকাল না জানিয়া কাটিয়াছিল, আরও কয়েকটা দিনও না হয় কাটিত। বছরে চারটি দিনের জন্য বিধুশেখর বাড়ি আসে, তার ঠিক কয়েকটা দিন আগে এমন চাঞ্চল্যকর জ্ঞান নাই বা জুটিত। বিধুশেখর ফিরিযা যাওয়াব পর জুটিলে জ্ঞানটা নাড়াচাড়া করার সময় পাওয়া যাইত একটা বছর। এক বছরে নূতনত্ব ঘুচিয়া যাইত জ্ঞানের, আর চঞ্চল করিতে পারিত না। বছরে চারদিনের জন্য যে স্বামীকে কাছে পায়, দুর্ভাবনা দিয়া স্বামীকে অভ্যর্থনা করা তার পক্ষে মহাপাপ। অন্তত স্বামী তো একটা মারাত্মক ভুল-বোঝা বুঝিয়া ফেলিবার সুযোগ পাইবে। মনে তো করিয়া বসিবে যে বৎসরান্তে চারদিনের জন্য স্বামীকে কাছে পাইয়াও অন্যবারের মতো বউটা খুশি পর্যন্ত হয় নাই, মুখটা হাঁড়ি করিয়া আছে, তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া হয়তো ঠিক করিয়া ফেলিবে যে, এমন বউয়ের কাছে বছরে চারদিনের জন্যও আর তবে আসিযা কাজ নাই ! ব্যাস, আর আসিবে না। দিন কাটিবে মাস কাটিবে বছর কাটিবে, স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক নিয়মে বাঙ্গার চুল সাদা হইয়া আসিবে, চামড়া লোল হইয়া পড়িবে, কোমর বাঁকিয়া যাইবে,—বিধুশেখর আসিবে না। বছরে চারিদিনের জন্যও আসিবে না, একদিনের জন্যও আসিবে না। ত্রিশ বছরের নিয়মটা ভাঙিয়া যাইবে। না মরিলেও দুজনের প্রত্যেকের মনে হইবে, হয় সে নিজে, নয় অপর জন মরিয়া গিয়াছে।

পূজার সময় চারদিনের জন্য বিধুশেখর বাড়ি আসে। কবে আসে সেটা নির্দিষ্ট থাকে না, কোনো বছর পূজার দুদিন আগেই আসিয়া পড়ে, কোনো বছর পূজার মধ্যে কোনো একটা দিন আসিয়া হাজির হয়। গুনিয়া গুনিয়া চারিটি দিন যে থাকে তাও নয়। কোনোবার একদিন কমও থাকে কোনোবার একদিন বেশিও থাকে। চারিদিনের হিসাবটা বাঙ্গার ত্রিশ বছরের গড়পড়তার হিসাব—এ হিসাব বাঙ্গার একেবারে নিজস্ব। বছরে চারদিনের জন্য স্বামীকে কাছে পাইবে বাঙ্গার এই আশা, ভরসা ও বিশ্বাস—নিজের প্রাপ্য সম্বন্ধে ধারণা। বছর ভরিয়া এটা কল্পনার কাজে লাগে। বিধুশেখর একদিন কম থাক আর একদিন বেশি থাক সে জন্য কিছু আসিয়া যায় না, ওটা সাময়িক লাভলোকসানের ব্যাপার।

মোটে তিনদিন থাকবে এবার ?

এই কথাটা বলিবার সময়টুকুর মধ্যেই প্রায় বুকটার ধড়াস ধড়াস সামলাইয়া অন্ধকার পৃথিবীতে আলো আবিষ্কার কবিয়া আত্মসংবরণ করিয়া ফেলিতে পারে—নিজেব ব্যথা ভুলিয়া স্বামীকে দরদ দেখানোর কর্তব্য পালন করিতে আর স্বামীকে কাছে পাওয়ার জন্য তার যে আনন্দের সীমা নাই এই ভাবটা আবার মুখে ফুটাইয়া তুলিতে, বড়ো জোর আরও ততটুকু সময় লাগে। ব্যাস, যেমন বাঙ্গা ছিল, আবার তেমনই বাঙ্গা,—দীর্ঘ বিরহের অবসানে বুড়া বয়সেও মেয়েমানুষের যতটা আনন্দে ডগোমগো হওয়া উচিত তার চেয়ে বোধ হয় বেশি ডগোমগো বাঙ্গা !

পাঁচদিন থাকবে ? সত্যি ?

বলিয়া খুশিতে ছোটো মেয়েটি বনিয়া যাওয়া তো আরও সহজ ব্যাপাব আরও কম সময়েব কাজ।

এবার সপ্তমীর দিনটাও পথ চাহিয়া কাটিয়াছে। বিধুশেখর আসে নাই। অন্য বছর এটা অসাধারণ ঠেকিত না। আজ আসে নাই, কাল আসিবে। কেবল একটা দিনেব এই-আসে-এই-আসে-প্রতীক্ষাব ব্যর্থতা, পরদিন আরও বেশি অধীরতাব সঙ্গে প্রতীক্ষা। কিন্তু এবার ব্যাপারটা আগাগোড়া কেমন যেন খাপছাড়া। কোনোবার আসিবাব আগে বিধুশেখর পত্র লেখে না, এবার আগেই লিখিযা জানাইয়াছে, সপ্তমীর দিন আসিয়া পৌঁছিবে। সপ্তমীর দিন না-আসাটা তাই অনন্যসাধারণ ঘটনার পর্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে।

করুণা বলিয়াছে, আসবেন লিখে এলেন না—এ তো ভারী আশ্চর্যি, নয় বউঠান, আশ্চর্যি নয় ? দাদার বেলা তো এমন হয় না ! বাঙ্গা বলিয়াছে, কেন হবে না, হয়। ওঁর কি কথাব ঠিক আছে ? করুণার বউ ফিসফিস করিয়া বলিযাছে, কথার ঠিক আছে, মাথাব ঠিক নেই। মাথা বেঠিক বলেই না তিরিশ বচ্ছর চুল চিরে কথাব ঠিক থেকেছে।

কী বললি ?

বললাম, কোনো কাজে হয়তো আটকে গেছেন কাল আসবেন।

আব এসেছে। আসবে লিখেছে যখন, আর কোনোদিন আসবে না। জীবনে কোনোদিন আসবে না বলে চলে গিয়েছিল কি না, তাই প্রতি বছর এসেছে। এবাব আসবে লিখেছে কি না, আর আসবে না।

এই ক্ষুব্ধ আলোচনার জেরটা কাটিয়া যাওয়ার আগেই বিধুশেখর আসিয়া হাজিব হয়। অসময়ে, বিনা সংবাদে, একেবারে আলোচনা-সভাব মাঝখানে। আলোচনাটা তখন বাঙ্গাকে প্রায় কাঁদাইয়া ছাড়িয়াছে। অন্যবারের মতো তাই হাসিমুখে স্বামীকে অভ্যর্থনা কবিবার সুযোগটা এবার বাঙ্গার ফসকাইয়া গেল। বিধু আসিয়া দ্যাখে কী, এবার বাঙ্গার মুখের ভঙ্গিটা বড়ো খাপছাড়া, বেশভূষাটা বড়ো বেমানান। গায়ে শেমিজ থাকা দূরে থাক, পরনের কাপড়টাও ময়লা। মুখে হাসি থাকা দূরে থাক, চোখঠাসা জল। স্বামী যেন এবার বাঙ্গার আসিযাও আসে নাই।

সবচেয়ে বিপদের কথা, এবার বাঙ্গার আত্মসংযম নাই। গত বছর বাঙ্গাব বয়স ছিল প্রায় তেতাল্লিশ, কী গভীব আত্মসংযমে গত বছরও নিজেকে সে যুবতি করিয়া রাখিয়াছিল ! এবার দিদিমার মতো বুড়ি সাজিয়া অসংযমের চরম করিয়া ছাড়িল। চোখ পাকাইয়া বিধুর দিকে চাহিয়া মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, কেন এলে আজ ? কাল আসবে লিখে আজ এলে কেন শুনি ? আরে আমাব সাতজন্মের ভালোবাসার ভাতার ! কাল আসবেন লিখে আজ এসেছেন পিরিত করতে !

এ বজ্রপাতের শামিল। হাতের সুটকেসটা মাটিতে ফেলিয়া বিধু বজ্রাহতের মতো তার উপরে বসিয়া পড়িল। একটা বজ্রপাত করিতেই বাঙ্গার সমস্ত বিদ্যুৎ খরচ হইয়া গিয়াছিল, মেয়েমানুষের বিদ্যুৎ আর জীবনশক্তি এক জিনিস, বাঙ্গাও তাই যেন হঠাৎ মরিয়া গেল। বোকার মতো জিভ কাটিয়া প্রথমে বলিল, ছি !—তারপর চারদিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চাহিয়া বলিল, কী বললাম ?

বিধু গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শরীর ভালো নেই ?

চুলের প্রায় তিনভাগ সাদা বিধুর, বয়স তো গিয়াছে ষাটে। তা ছাড়া শরীরটাতে ধরিয়াছে ভাঙন। ত্রিশ বছর আগে এ রকম মুখ করিয়া এত দরদের সঙ্গে এ রকম একটা প্রশ্ন করা চলিত, এখন আর চলে না। করুণা, করুণার বউ, করুণার মেয়ে আর বাঙ্গা চারজনেরই সর্বাঙ্গে তাই রোমাঞ্চ দেখা দিল। করুণার মেয়ের কোলের আড়াই বছরের শিশুটা পর্যন্ত আবহাওয়ার মধ্যে একটা দুর্বোধ্য ভয়ানক কিছুর আবির্ভাব টের পাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মোটের উপর অবস্থাটা দাঁড়াইয়া গেল কুৎসিত। প্রাণাধিকেব মৃতদেহটা জড়াইয়া ধরিয়া একটু বেহিসাবি রকমের বেশি সময় কাঁদাকাটা করার পর নাকে পচা গন্ধ লাগিতে আরম্ভ করিলে যেমন বীভৎস অবস্থার সৃষ্টি হয়।

যাই হোক, রবীন্দ্রকাব্যের চোলাই-খানার দেশে তামাশা করাটা সব অবস্থাতেই সোজা এবং নিরাপদ। করুণার বউ তাই মেয়ের কোল হইতে মেয়ের ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেকে নিজের কোলে নিয়া তার হাঁ-করা মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, বল না খোকন তোর দাদুকে, তুমি এসেছ দাদামশাই এবার দিদিমার শরীল ভালো হবে, সম্বচ্ছর কেঁদে কাটালে শরীল খারাপ হবে না একটু ?

বাঙ্গা বলিল, কী বেহায়াপানা করিস ! সম্বচ্ছর কেঁদে কাটাই না, তোব মাথা।

মুখে হাত চাপা দেওয়ায় খোকনেব ফাঁপর লাগিবার উপক্রম হইয়াছে, তবু কবুণাব বউ হাত সরাইল না। মুখ নিচু করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, আমার কাছে কি লুকোনো আছে দিদি, কত রাত কেঁদে কাটাতে দেখেছি !

তোর মাথা দেখেছিস, বেহায়া বজ্জাত মাগি ! ছেলেটাকে মারবি না কি, অ্যাঁ ?

করুণার বউয়ের কোল হইতে ছেলেটাকে বাঙ্গা ছিনাইয়া নিল। এ ঘবে আব থাকা চলে না। পাশের একটা ঘরে গিয়া বিছানায় বসিয়া নাতিকে কোলে করিয়া চুপিচুপি কাঁদিতে লাগিল। নাতির গগনভেদী আর দিদিমাব মৃদুল কান্নার সমন্বয় এ বাড়িতে একটা নূতনত্বের সৃষ্টি কবিল বইকী আজ। পূজার বাজনা শুনিতে শুনিতে মনে হইতে লাগিল, কয়েক মাইল দূরের গ্রামগুলিতে যেমন বন্যার জলে দুর্ভিক্ষের আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়া যাইবার মতো অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাইয়া গিয়াছে পূজার উৎসবটা সেই রকম মানুষের জীবনটা নিরানন্দে ভরিয়া দিতেছে।

এ ঘরের জানালা দিয়া পথ দেখা যায়। আব দেখা যায় পথের ওদিকের সাড়ে তিনটা কাঁচাপাকা বাড়ি। মাঝখানের বাড়িটার একটা ঘরের জানালা প্রায় এই জানালাটার প্রতিফলিত ছবির মতো। রাখাল দাসের ছবির মতো সেজো মেয়ে টুনুর ঘর বলিয়া জানালাটায় কেবল একটা পর্দা আছে,—তবে আধখানাই প্রায় ছেঁড়া। সকালবেলাই খবর পাওয়া গিয়াছিল আজ টুনুরও জামাই আসিয়াছে। এখন দেখা গেল, শুধু আসে নাই, সশরীরে আসিয়াছেন। বেলা বারোটার সময়েও টুনু জানালার শিক ধরিয়া দাঁড়ানো মাত্র শরীরটা অনায়াসে এবং হয়তো অকারণে তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে দ্বিধা করে না—টুনুর কৌতূহলেরও যেন আর ক্ষণিকের স্বাধীনতা নাই, বাহিরের জগৎকে একটু দেখিয়া লইতে জানালায় আসিলেও তাকে লজ্জা দেওয়া চাই।

অথচ টুনু সঙ্গেই যাইবে—তিনটা কি চারটা দিন পরে। ছমাস আগে হইতে ঠিক হইযা আছে, এবার টুনু সঙ্গেই যাইবে। অন্তত ছমাসের জন্য সঙ্গে যাইতেই হইবে। গন্তব্য স্থানটা এতদূর আর টুনুর বয়সটা এত কম যে ছমাস ধরিয়া টুনুর এই সঙ্গে যাওয়ার কথাটা ভাবিতে গেলেই বাঙ্গার বুক কাঁপিয়াছে, মাথার ঝিমঝিমানি বাড়িয়া গিয়াছে।

আজ এত সব কাণ্ডের ঠিক পরেই পর্দা-ছেঁড়া জানালার ফাঁকে টুনু আর নবাগতকে এক সঙ্গে দেখিয়া ফেলার ভিতরে একটা বড়ো রকমের প্রলয় ঘটিয়া গেল। বিকালেও আগের মতো হওয়া গেল না, পরদিনও গেল না।

এতদিনের সাধনা, এতদিনের অভ্যাস, ভবিষ্যতের ভাবনা কিছুই কাজে লাগিল না বাঙ্গার। বাঙ্গা কোনোমতেই স্বামীর সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার করিতে পারিল না।

বিধু কতকটা নীরব গাম্ভীর্যের সঙ্গেই তার পরিবর্তনটা লক্ষ করিয়া গেল। কিন্তু সেও যে কীরকম সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছে, প্রকাশ পাইতে বাকি থাকিল না। বিধুর দাড়িগোঁপ ভয়ানক কড়া, খুব ভালো করিয়া চাহিবার পরও হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন নিষ্ঠুরতার একটা প্রকাশ্য আবরণ। এই রকম মুখে দুর্ভাবনার সঞ্চার হওয়ায় বাঙ্গার সর্বাঙ্গ ভয়ে অবশ হইয়া আসিল। ভয়ে ভয়ে শেষ পর্যন্ত সে নিজেই কৈফিয়ত দিয়া বলিল, দ্যাখো, আমার শরীরটা সত্যি ভালো নেই। দুদিনের জন্য এলে আমি এ রকম ব্যবহার করছি বলে কিছু যেন মনে কোরো না তুমি, কেমন !

না, কিছু মনে করিনি।

এতবার এসেছ, কোনোবার আমার মুখ ভার দেখেছ ?

না, তা দেখিনি।

এবার হাসিখুশি থাকতে পারছি না—কী যেন হয়েছে। হবে আর কী, শরীরটা ভালো নেই। এবারটি আমায় মাপ করবে না ?

এ এক ধরনের প্রেমালাপ। দিনের বেলা ঘরের বারান্দায় সকলের চোখের সামনে বসিয়া নাতিকে কোলে করিয়া এ ধরনের গভীর ও তীব্র আবেগ-ভরা প্রেমালাপ করিতে হয়। আড়ালে চুপিচুপি ফিসফিস করিয়া এ সব প্রেমালাপ চলে না, তার মতো বেহায়াপনা আর নাই। দুজনের বয়স এখন অনেক পিছাইয়া দিলে, নাতিকে বহুদূর ভবিষ্যতে সঞ্চিত করিলে, বাঙ্গাকে টুনুর মতো হালকা ছিপছিপে একটি নববিবাহিতা মেয়ে, আর বিধুকে টুনুর জামাইয়ের মতো ফিটফাট নববিবাহিত ছেলে করিযা দিলে, দুজনের এই চমৎকার মানানসই প্রকাশ্য প্রেমালাপ যেমন অকথ্য বেহায়াপনায় দাঁড়াইয়া যায়, আড়ালে এই প্রেমালাপ তেমনই বেহায়াপনা। এমন জটিল মানুষের জীবনের এই দিকটা !

পূজা গেল। বিধু গেল না। বলিল, এই যাব আজকালের মধ্যে। দুটো দিন থাকি।

অন্যবার এই কথায় বাঙ্গার আনন্দে পাগলামি করার কথা, এবার তার শ্রান্ত চোখ দুটি জলে ভরিয়া গেল। টুনু একজনের সঙ্গে সেইদিন কয়েক ঘণ্টা আগে চলিয়া গিয়াছে, শুধু এ জন্য অবশ্য নয়, অন্য কারণও ছিল। প্রকৃতপক্ষে, অন্য কারণগুলিই প্রধান কারণ। সেই জন্য পাগলামি সে করিল অনেক রকম, কিন্তু আনন্দে পাগল হইতে পারিল না। কেবল টুনুর জন্য চোখে জল আসিলে সে অনায়াসে স্বামীর আরও দুটো দিন থাকিবার কথা শুনিয়া মুখে হাসিকান্নার শোভা ফুটাইয়া স্বামীকে দেখাইতে পারিত। চাবির গোছাটায় অসঙ্গত আওয়াজ তুলিয়া বলিতে পারিত, সত্যি আরও দুটো দিন থাকবে ? বল কী গো ! এবার কোনদিকে সুয্যি উঠছে দেখতে হবে তো !

বিসর্জনের দশমীর পরের পূর্ণিমা আসিল, তবু বিধুশেখরের যাওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না। বছরের পর বছর, কেবল চারদিনের জন্য বাড়িতে আসা-যাওয়াটা রীতিমতো নাটকীয় ব্যাপার, কিন্তু বিধুশেখর আসা-যাওয়ার মধ্যে হাঙ্গামা ঢুকিতে দেয় না, যন্ত্রের মতো আসে, যন্ত্রের মতো চলিয়া যায়। যেন দৈনন্দিন সাধারণ কাজ—আপিসে যাতায়াতের মতো। এবার আসিয়াছে সে যন্ত্রের মতো, যাওয়া সম্পর্কে এ রকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করায় সকলে অবাক হইয়া গেল। একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, যখন বাড়াবাড়িটা দাঁড় করাইয়া দিল অবিশ্বাস্য নাটকীয়তায়।

আরও তিনদিন বাঙ্গার চালচলন লক্ষ করিবার পর বলিল, দ্যাখো তোমায় একটা কথা বলব ভাবছিলাম। আমার সঙ্গে যাবে ?

ত্রিশ বছর পরে এ প্রশ্ন বুঝিতে সময় লাগে। বাঙ্গা কিছু বলিল না।

এবার তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব ভাবছিলাম। বুড়ো হলাম, কবে আছি কবে নেই—

বাঙ্গা দুচোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে ? আমি তোমার কাছে গিয়ে থাকব ?

যদি তুমি রাজি হও। আমি ভাবছিলাম কী, কবে কী হয়েছিল সে জন্য এতকাল তুমিও কষ্ট পেলে আমিও কষ্ট পেলাম, এবার বাকি কটা দিন—

বাঙ্গার মাথা ঝিমঝিম করিতেছিল। সে সংক্ষেপে বলিল, তুমি এখনও অনেকদিন বাঁচবে।

বিধু বলিল, কি বললে ? অনেকদিন বাঁচব ? বাঁচাবাঁচির কথা পরে হবে, তুমি রাজি তো ?

রাজি নই? ওগো আমি যে সারা বছর তোমার জন্য কাঁদি আর পথের পানে চেয়ে দিন কাটাই।

গ্রাম্য মেয়ে এ ভাবে পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া দিন কাটানোর কথা বলিলে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব না হইয়া পারে ?

বিধুশেখরের কামানো কড়া দাড়িগোঁপের নিষ্ঠুর আবরণে ঢাকা মুখ হঠাৎ এমনভাবে বিকৃত হইয়া গেল যে, দেখিলে ভয় হয়। রাগে আগুন হইয়া সে বলিতে লাগিল, সারা বছর কাঁদ ! পথের পানে চেয়ে দিন কাটাও ! এতদিন বলতে পারনি এ কথাটা ? এতকাল কাঁদতে পারনি একটু ? সারা বছর আশায় আশায় থেকে বাড়ি ফিরতাম, চৌকাটে পা দিতে না দিতে একগাল হাসি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতে, যে কটা দিন থাকতাম, কী স্ফূর্তি, কী সব হাসিতামাশা, হইচই ব্যাপার ! কী করে জানব তুমি সারা বছর কাঁদতে ? কী করে জানব তুমি পথের পানে চেয়ে দিন কাটাতে ? গুনতে তো জানি না আমি !

চিৎকার শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিয়াছিল, ছেলে কোলে করুণার মেয়ে পর্যন্ত। কিন্তু বাঙ্গা কারও দিকে দৃষ্টিপাতও করিল না, রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, আগে জানলে আমায় নিয়ে যেতে ?

বিধুশেখর আরও রাগিয়া বলিল, যেতাম না ? নিয়ে যাবার জন্যই তো এসেছি প্রত্যেকবার। তোমার রকমসকম দেখে ভড়কে যেতাম। আমায় ছাড়া যে অমন স্ফূর্তিতে থাকতে পারে, তাকে আর সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা বলতেই সাধ হত না।

কত পাগলামিই মানুষ জানে ! এ সব কাণ্ডকারখানা দেখিলে মনে হয় না, মানুষের পক্ষে ভাবপ্রবণতা মহাপাপ, যে মানুষ হাসির পিছনে কান্না, আর কান্নার পিছনে হাসি খুঁজিয়া পায় না—ত্রিশ বছর সন্ধান করিয়াও পায় না ? বিশেষত, কয়েকজন কবি পৃথিবীর মানুষের জন্য কাব্যরস পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন এবং কাব্যরসটা সব রসের সেরা রস, এই জন্য পুরুষ মানুষের পক্ষে কবিত্ব করা আত্মহত্যার শামিল। বিধুশেখর কাব্যরস উপভোগ করিয়াছিল, ভালোই করিয়াছিল—সকলেরই করা উচিত। কবি না হইয়া কবিত্ব করিতে গেল কোন হিসাবে ? কে আজ ত্রিশ বছরের ক্ষতিপূরণ করিবে ? কোন মহাজনের এত ক্ষতি সহ্য হয় ?

বন্যা

তারপর ভৈরবকে শেষরাত্রির দিকে একেবারে ঘরের চালায় উঠিতে হইল। আজ কতকাল এই শণে-ছাওয়া চালা তাকে সপরিবারে আকাশের কৃপণ অকৃপণ বর্ষণ হইতে আড়াল করিয়াছে, আকাশ-ফাটা রোদে জোগাইয়াছে ছায়া। এই চালার নীচে কত দিনরাত্রি কাটিয়াছে, কে জানিত কেবল তলায় নয়, একদিন রাত্রিশেষে দরকার হওয়া মাত্র উপরেও তার এমন আশ্রয় মিলিবে ?

ঢালু ভিজা চালা বাহিয়া একেবারে ডগায় উঠিয়া ভৈরব পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিল। এখন বৃষ্টি নাই। আকাশের একদিকে আলগা মেঘ, অন্যদিক ফাঁকা। ফাঁকায় তারাও আছে, ছোটো একটি চাঁদও আছে। মেঘ যেন ঘষামাজা করিয়াছে আকাশকে, বৃষ্টি যেন ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে,—কী জ্বলজ্বলে সব তারা, কী জ্যোৎস্না বিলানোর শখ অতটুকু আনমনা ক্ষয়ধরা চাঁদের!

অথচ পৃথিবী ঝাপসা, চারিদিকে ভালো নজর চলে না। চাঁদ আর তারার আলো যেন পৃথিবীর জন্য নয়, যেটুকু পায় পৃথিবী সে শুধু উপচানো দয়া। উত্তরে আমবাগানের বন, আবছা অন্ধকারের একটা এলোমেলো স্তূপ। পশ্চিমে সেই আবছা অন্ধকারই সমতল করিযা বিছানো,—কদিন আগে ছিল ফসল ভরা মাঠ, এখন প্রায় নিস্তরঙ্গ জলের সমুদ্র ! পূর্ব আর দক্ষিণের বাড়িগুলি নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মধ্যে বিশাল নিশ্চল আবছা অন্ধকারের ঢেউ।

সবগুলি বাড়ি নয়, মাঝে মাঝে মাচা আছে, কিন্তু খুব কাছের মাচাটি ছাড়া একটিকেও মাচা বলিয়া চেনা যায় না।

আরে হোই মহিম, আছ নাকি, হেঁই?

নিজের হাঁক শুনিয়া ভৈরবের নিজেরই চমক লাগে। এত জোরে হাঁক না দিলেও চলিত। কাছের মাচাটি হইতে মহিমের জবাব আসিবার আগে আরও দূরের সাড়া আসিল।

ভৈরব মামা, আগো ও ভৈরব মামা, একবারটি এসো ইদিকে—সর্বনাশ হইছে মোর—শুনছ ভৈরব মামা, আগো ও ভৈরব মামা !

বেশ বুঝিতে পারা যায়, আলতামণির গলা। সম্পদের আলোচনায় এমন কোমল আর মনোহারী, বিপদের আর্তনাদে এমন তীক্ষ্ণ আর মর্মভেদী গলা রাজনগরে আর কারও নাই।

কিন্তু কোনোদিক হইতে কেহ সাড়া দিল না। এমনি ভাবে রাত্রিশেষে ঘরের চালায় উঠিয়া আশ্রয় গ্রহণের আশঙ্কা থাকায় গ্রাম আগেই অর্ধেক খালি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যারা গিযাছে তাদের বেশির ভাগ স্ত্রীলোক আর শিশু, ঘরের চালায় মাচায়, চালের বাঁশ আর গাছের ডাল হইতে দোলনার মতো ঝুলানো তক্তপোশে, অনাথদের বাড়ির পিছনের উঁচু মাটির ঢিপিটায় আর ছোটোবড়ো কয়েকটা নৌকায় যারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাদের অধিকাংশই পুরুষ। এ অবস্থায় কেউ যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাও মনে করা চলে না। তবু আলতামণির আর্তনাদে কেহ সাড়া দিল না।

ভৈরবের হাঁকের জবাবে মহিম বলিল, চালায় বটে নাকি ? কতক্ষণ ?

ভৈরব বলিল, এই মাত্তর উঠলাম, ভাবছিলাম চৌকির পরে রাতটুকুন কাটাব, তা শালার জল হুহু করে বাড়তে শুরু করে দিলে। দিনে দিনে ভাগ্যি সব কটাকে রেখে এলাম বনগাঁয়ে, নয়তো বিপদ ঘটত। চাল কটা নিতে এসে নিজে হলাম আটক। কানাই না-টা নিয়ে গেল বিকেলে, বলল কী, এই এলাম বলে মামা, হাটতলা যাব আর আসব। মিথ্যুক লক্ষ্মীছাড়া বাঁদরটার আর পাত্তা নেই।

আবার আলতামণির আর্তনাদ শোনা গেল, মহিমমামা ! ভৈরবমামা !—আগো শুনছ ?

ভৈরব মহিমকে বলিল, ঘরে ঘরে সমান বিপদ, আলতামণির চিল্লানিটা শুনছ ? সবার আগে মাচান হল তোর, আগে থেকে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে বসে আছিস মাচানে উঠে, এত চ্যাঁচানি কীসের রে বাবু !

অমনি স্বভাব ছুড়ির, গাঁ-সুদ্ধু লোক দেখতে পারে না সাধে ?

মহিম বোধ হয় তামাক সাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, আগুন দেখা গেল। একটু তামাক টানিতে পারিলে মন্দ হইত না, কিন্তু মহিমের মাচানে যাওয়ার উপায় নাই। গেলেও সুবিধা হইবে না, অতটুকু মাচানের উপর মহিমের বউ, মহিমের ছেলের বউ, দুটি বয়স্কা মেয়ে, সকলে আশ্রয় নিয়াছে। তাদেরই বোধ হয় নড়িবার ঠাঁই নাই, ওর মধ্যে কোথায় বসিয়া সে তামাক টানিবে? ডিঙি নৌকাটি অবশ্য আছে মহিমের, কিন্তু তাকে তামাক খাওয়ানোর জন্য মহিম যে মাচান হইতে নামিয়া ডিঙিতে করিয়া এখন তার চালায় আসিয়া উঠিবে সে ভরসা নাই। কোমরে দুটি বিড়ি আর দেশলাই গোঁজা ছিল, একটু হিসাব করিয়া ভৈরব একটা বিড়ি ধরাইল।

তারপর আবার শোনা গেল আলতামণির আর্ত চিৎকার,—এবার আওয়াজটা আরও তীক্ষ্ণ, আরও মর্মভেদী।

ও মহিমমামা ! ও ভৈরবমামা ! তোমাদের ভাগনি জামাই যে মরে গেল গো, একবারটি আসবে না ?

মহিম হুঁকায় একটা টান দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যাবে নাকি ?

ভৈরব বলিল, চল যাই। হুঁকাটা এনো দাদা, বিড়িফিড়ি একদম মুখে রুচে না।

বাড়ির পিছনে সব চেয়ে মোটা আমগাছটার অনেক উঁচুতে মোটা ডাল বাছিয়া আলতামণির মাচান বাঁধা হইয়াছে। গাছটার সকলের নীচের ডালটা পর্যন্ত জল উঠিয়াছে, দেড়খানা মানুষ ডুবিয়া যাইবে। আশ্চর্যের কিছু নাই, উঁচু জমিতে উঁচু ভিটায় ভৈরবের বড়ো ঘর, চালা হইতে নামিবার সময় দেখিয়া আসিয়াছে সে ঘরের দরজার অর্ধেকের বেশি জলের নীচে ডুবিয়া গিয়াছে। ইট দিয়া তক্তপোশ উঁচু করিয়া কী সাহসেই সে ঘরের মধ্যে রাতটা কাটাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল ! তক্তপোশটা এখন বোধ হয় ঘরের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

এখানে আলতামণির অবস্থা সত্যই কাহিল। কাছে আসিয়া ভৈরব ও মহিম দুজনেই বুঝিতে পারিল, অকারণে আলতামণি ও রকম আর্তনাদ করে নাই। আমগাছের ডুবুডুবু ডালটা সে এক হাতে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া আছে ; অন্য হাতে ধরিয়া আছে কানাই জীবিত না মৃত বুঝিবার উপায় নাই, কিন্তু একেবারেই নিশ্চেষ্ট, আলতামণি ছাড়িয়া দিলেই জলে ডুবিয়া স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যাইতে পারে, এমনিভাবে গা এলাইয়া দিয়াছে।

ধরো মামা, চট করে ধরো একজন,—হাত এলিয়ে গেছে আমার। কত্‌খন এমনি করে ধরে আছি।

মৃদু ও মধুর গলা আলতামণির, কে বলিবে একটু আগে তারই গলা দিয়া অমন ইঞ্জিনের হুইসেলের মতো আওয়াজ বাহির হইয়াছিল !

গাছের ডালে ডিঙি বাঁধিয়া দুজনে ধরাধরি করিয়া কানাইকে ডিঙিতে তুলিতেই ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝা গেল। কানাইয়ের মুখ দিয়া দেশি মদের তীব্র গন্ধ বাহির হইতেছে।

ভৈরব বলিল, বটে ! এই জন্য বাঁদরটার নায়ের দরকার হয়েছিল ! না-টা হল কী রে আলতা, অ্যাঁ ?

আলতা তখন ডালটার উপর বুক দিয়া হাঁপাইতেছে, উঠিবার ক্ষমতা নাই। ক্ষীণস্বরে বলিল, ভেসে গেছে। ভৈরব চমকাইয়া বলিল, ভেসে গেছে ! কোনদিকে গেল ? হায় সব্বোনাশ !

আলতা কাঁদিবার উপক্রম করিয়া বলিল, কোনদিকে গেল কী করে বলব মামা? আমার ইদিকে এমন সব্বোনাশ—

সব্বোনাশ ? তোর সব্বোনাশ ? আমার না গেল, সব্বোনাশ তোব ? বজ্জাতটাকে ধরলি কেন তুই, বানের জলে গাঁয়ের কলঙ্ক ধুয়ে যেত! ও ছোঁড়া যদ্দিন বাঁচবে তদ্দিন তোর সব্বোনাশ, বেটাচ্ছেলে মরলে তোব হাড় জুড়োবে।

শাপমন্যি দিয়ো না মামা—গুরুজন বটে না তুমি ?

আলতা হাঁপাইতে ভুলিয়া গিয়াছে, ভৈরবের নৌকা জলে ভাসিয়া যাওয়ার অপরাধ ভুলিয়া গিয়াছে, নিচু গলাতেও কোমলতা নাই,—গাছের ডালে ভর দিযা এমনভাবে মুখ তুলিয়া চাহিযাছে যেন সাপের মতো ছোবল দিবে।

মহিম ভৈরবকে সাহস দিয়া বলিল, কোথাও ঠেকে থাকবে নিশ্চয়,—কাল পাত্তা মিলবে।

নৌকার শোকে কাতর ভৈরব জবাব দিল না। জলে ঢেউ নাই, কিন্তু স্রোত প্রবল। তিনজনের ভারে ডিঙ্গি নৌকাটিব এমন অবস্থা হইয়াছে যে, ঢেউ থাকিলে হয়তো ডুবিযাই যাইত। আলতামণি হাত বাড়াইযা ডিঙ্গির প্রান্তটা ধবিতেই ভৈবব জোব কবিয়া তার হাত ছাড়াইযা দিল।

ডুবিয়ে মাববি নাকি সবাইকে ?

আলতামণি আবার কাঁদোকাঁদো হইয়া বলিল, অমনি করে ফেলে রাখবে নাকি ? মাচানে তোলো তবে ধবাধবি কবে ?

ডিঙির মাঝখানে একটা নির্জীব বস্তাব মতো কানাইকে ফেলিয়া রাখা হইযাছে, সেখানেও জলের অভাব নাই। শবীরের হাড়গোড় থাকিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি এ ভাবে দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া গা এলাইয়া পড়িয়া থাকা যে মানুষের পক্ষে সম্ভব কানাইকে দেখিলে বিশ্বাস হয না। তবে কানাইযের পড়িয়া থাকিবার ভঙ্গিব জন্য নয়, অতটুকু ডিঙ্গিতে এতগুলি লোকের থাকা নিবাপদ নয বলিযাই ভৈরব আর মহিম পরামর্শ করিযা কানাইকে মাচানে তুলিবাব কষ্টটা স্বীকাব কবাই স্থির কবিযা ফেলিল। এ বন্যা, আব কিছু নয়। নদীব বাঁধ কতটুকু ভাঙ্গিযাছে কে জানে, কতখানি ভাঙ্গিবে তাই বা কে জানে। এমন বন্যা আর কখনও হয নাই, এব চেয়ে ভয়ানক, এব চেয়ে সর্বনাশকারী বন্যা কল্পনা করা অসম্ভব, তবু এখনও কিছু বলা যায় না। এ বন্যা, আব কিছু নয়। হয়তো হঠাৎ প্রবল গর্জন করিতে করিতে কোথাকার আটকানো জলবাশি ছুটিয়া আসিবে। তাদেব চিহ্নও আব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তা ছাড়া, আলতামণি কানাইকে এভাবে ডিঙ্গিতে পড়িতে থাকিতেও দিবে না, সে নিজে ডিঙ্গিতে উঠিযা আসিবেই। একজনের ডিঙ্গিতে চাবজন উঠিলে চলিবে কেন ?

মাচানে উঠিবার বাঁশের মইটা কানাই মন্দ করে নাই, গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে শক্ত কবিয়া। এদিক দিয়া বজ্জাতটার গুণ আছে অনেক,—যা করে ভালো করিয়াই কবে। কত তাডাতাডি মাচান বাঁধিয়াছে, হাতের কাছে যা কিছু উপাদান পাইয়াছে তাই লাগাইযাছে কাজে, তবু মাচানটি যেন দারুণ বিপদে কদিনের জন্য নিরুপায়েব আশ্রয় নয়, বন্যা উপভোগ করিবাব আরামের ব্যবস্থা। উপরে ছাউনিটা পর্যন্ত এমনভাবে করিয়াছে যেন বহুকাল রোদ বৃষ্টি ঠেকাইবার জন্য ছাউনিটাব দবকাব হইবে।

ক্ষীণ চাঁদের আবছা আলোয় বাঁশের মই বাহিযা শবেব মতো একটা নিশ্চেষ্ট শিথিল দেহ মাচানে তোলা সহজ ব্যাপার নয়। দূর সম্পর্কের দুই মামাব অকথ্য গালাগালিতে আলতামণির শ্রবণ-যন্ত্র দুটি যে একেবারে বিকল হইযা গেল না, সে এক রহস্যময় ধর্ম বটে মানুষেব ইন্দ্রিয়েব। আলতামণির আর্তনাদে সাধে কেউ সাড়া দেয় না ! তার প্রত্যেকটি আর্তনাদ শেষ পর্যন্ত এমনিভাবে মানুষকে হাঙ্গামায় ফেলে, প্রাণান্ত কবিয়া ছাড়ে। বৈশাখের প্রথমে মাঝরাত্রে সে একবাব এই রকম আর্তনাদ করিয়াছিল,—ঘরে তার আগুন লাগিয়াছে ! কেন লাগিযাছে? নদীর মোটে তিন মাইল দূরে এই গ্রামে বৈশাখ মাসে জলের জন্য মানুষের যেমন পিপাসা জাগে তীব্র, নারীবহুল এই দেশে আলতামণির জন্য কয়েকটা মানুষের তেমনি কামনা জাগিয়াছিল বলিয়া। আলতামণিকে না পাইলে আলতামণির ঘরে আগুন দিতে হয়, এমন হিংস্র সেই কামনা।

মাচার একপাশে কানাইকে ফেলিয়া দিয়া মহিম ও ভৈরব ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। আলতামণি কানাইকে উপরে তুলিতে তাদের সাহায্য করিতে পারে নাই, সেটা সম্ভব ছিল না। এখন তাড়াতাড়ি কানাইয়ের ভিজা কাপড় বদলাইয়া নিজের একটা শাড়ি দিয়া সে তাকে ঢাকিয়া দিল। গাছের পাতা আর মাচানের ছাউনি এখানে জ্যোৎস্নাকে আড়াল করিয়াছে,—মাচান অন্ধকার।

কী হইছে মামা ? নড়ন চড়ন নাই যে ?

ভৈরব বলিল,—কী হইছে সে তো তুই জানিস—আমরা কী করে বলব ?

মহিম বলিল,—হবে আবার কী, ঠেসে মদ গিলেছে, এখন জ্ঞান নেই।

আলতামণি কাঁদোকাঁদো গলায় বলিল, ফিরে এসে কী সব আবোল-তাবোল বকতে বকতে মই বেয়ে উঠছিল মামা, হঠাৎ কী হল পড়ে গেল নীচে। ভেসেই যেত চলে, মাচান থেকে ঝাঁপ দিয়ে ধরেছি। তখন চেতনা ছিল না মামা—অমন হঠাৎ চেতন লোপ পেল কেন মামা ? বড়ো ডর লাগে মামা, গা কাঁপছে মোর—হা দ্যাখো—

গা কাঁপিতেছে কিনা না দেখিয়াই তাকে ঠেলিয়া দিয়া ভৈরব বলিল, দেখেছি বাবু, দেখেছি। বকবক না করে মাথায় হাওয়া কর, আপন থেকে চেতন আসবে। বেশি গিললে অমন হয়।

হাওয়া করার কথাটা খেয়াল ছিল না, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া আলতামণি পাখা খুঁজিয়া বাহির করিল, তারপর কানাইয়ের মাথায় জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

ভৈরব বলিল, আস্তে আস্তে হাওয়া কর, অত জোরে লোকে হাওয়া করে না কী ?

না মামা, জোরে জোরে করি, শিগগির চেতন হবে।

যেমন মুখ্যু তুই,—আস্তে হাওয়া দিলে বেশি কাজ দেয়। তিনবার আমায় মারলি পাখা দিয়ে, পাখা রাখ, আঁচল দিয়ে হাওয়া দে।

আলতামণি এ পরামর্শ শুনিল না, পাখা দিয়াই হাওয়া করিতে লাগিল। তবে অধীর ব্যাকুলতার সঙ্গে নয়, ধীরে ধীরে।

খানিক পরে মহিম বলিল, এবার যাই আমরা ?

না মামা না, ভোরবেলা তক্ বোসো, পায়ে ধরি তোমাদের।

ভৈরব অন্ধকারে হাসিয়া বলিল, এত ভয়কাতুরে যদি তুই, কানাই তো কদ্দিন রাতে ঘরে থাকে না, একা থাকিস কি করে শুনি ?

আজ যে চেতন নেই মামা।

পাখাটা কানাইয়ের মাথায় ঠেকিয়া যাওয়ায় মাচানের উপর পাখাটা একবার ঠুকিয়া আলতামণি আবার বাতাস করিতে লাগিল।

তারপর অস্ত যাওয়ার আগেই চাঁদ ঢাকিয়া গেল মেঘে, ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি হইয়া যাওয়ার পর আবার আকাশ পরিষ্কার হইয়া দু-একটা তারা ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে করিতে ভোরের আলোয় ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া মিলাইয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে আর কোনো বাধা রহিল না। তবে দেখিবার কিছু নাই। এ বন্যা, আর কিছু নয়। বন্যা দর্শনীয় নয়, বর্ণনীয় নয়। বুক চাপড়াইবার, মাথা কপাল ঠুকিবার যা কারণ, উপবাসে আর রোগে মরণ ঘটিবার যা কারণ, আগামী বন্যায় বুক চাপড়াইয়া মাথা কপাল ঠুকিয়া উপবাস করিয়া আর রোগে ভুগিয়া মরা পর্যন্ত রাক্ষুসে জোঁকের কাছে ঋণী থাকিবার যা কারণ, তার মধ্যে পর্যন্ত দেখিবার মতো কিছু নাই, বর্ণনা করিবার মতো কিছু নাই। চারিদিক জলে ডুবিয়া আছে, বন্যায় এই চরম দেখা। চারিদিক জলে ডুবিয়া গিয়াছে, বন্যার এই চরম বর্ণনা।

ভৈরব শেষ বিড়িটা ধরাইবে কি না ভাবিতেছিল। বিড়িটা জমাইয়া রাখিবার আর বোধ হয় দরকার নাই। মহিমের ডিঙিতে তার হারানো নৌকার খোঁজে বাহির হইলে এখানে ওখানে তামাক

কি দু-এক কলকি জুটিবে না ? আলতামণি এখনও কানাইকে সমানে বাতাস করিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ পাখা বন্ধ করিয়া ভাঙা গলায় সে বলিয়া উঠিল, একবারটি দ্যাখো দিকি মামা ভালো করে তাকিয়ে ?

মহিম ও ভৈরব তাকাইয়া দেখিল। দুজনের মুখ পাংশু হইয়া গেল। এমন ধারা মুখ হল কেন মামা? শ্বাস পড়ছে না কেন মামা ? কানাইয়ের মুখ দেখিলেই সেটা বোঝা যায়। কতক্ষণ তার শ্বাস পড়িতেছে না, তাও অনেকটা অনুমান করা যায়।

ভৈরব ও মহিম পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। কাল অত হাঙ্গামা করিয়া মই বাহিয়া তারা কি তবে একটা শবকে মাচানে তুলিয়াছে ? ভৈরব গুরুজন হইয়া কি শাপমন্যি করিয়াছে একটা মৃত মানুষকে ?

তাই সম্ভব। মাচান হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কানাইকে আলতামণি বন্যার জলে ভাসিয়া যাইতে দেয় নাই, এক হাতে আমগাছের ডালটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া অন্য হাতে কানাইকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, আর তীব্র মর্মভেদী আর্তনাদ আরম্ভ করিয়াছিল। তবু বন্যার স্রোত তখন কানাইকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এ বন্যা, আর কিছু নয়। বন্যা মানুষকে রেহাই দেয় না। সাবিত্রী আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে পর্যন্ত বন্যা সাবিত্রীর স্বামীকে ছিনাইয়া লইয়া যাইতে পারে, সাবিত্রী বিধবা হইয়া যায়।

মমতাদি

শীতের সকাল। রোদে বসে আমি স্কুলের পড়া করছি, মা কাছে বসে ফুলকপি কুটছেন। সে এসেই বলল, আপনারা রান্নার জন্য লোক রাখবেন ? আমি ছোটো ছেলেমেয়েও রাখব।

নিঃসংকোচ আবেদন। বোঝা গেল সংকোচ অনেক ছিল, প্রাণপণ চেষ্টায় অতিরিক্ত জয় করে ফেলেছে। তাই যেটুকু সংকোচ নিতান্তই থাকা উচিত তাও এর নেই।

বয়স আর কত হবে, বছর তেইশ। পরনে সেলাই করা ময়লা শাড়ি, পাড়টা বিবর্ণ লাল। সীমান্ত পর্যন্ত ঘোমটা, ঈষৎ বিশীর্ণ মুখে গাঢ় শ্রান্তির ছায়া, স্থির অচঞ্চল দুটি চোখ। কপালে একটি ক্ষতচিহ্ন—আন্দাজে পরা টিপের মতো।

মা বললেন, তুমি রাঁধুনি ?

চমকে তার মুখ লাল হল। সে চমক ও লালিমার বার্তা বোধ হয় মার হৃদয়ে পৌঁছল, কোমল স্বরে বললেন, বোসো বাছা।

সে বসল না। অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ আমি রাঁধুনি। আমায় রাখবেন ? আমি রান্না ছাড়া ছোটো ছোটো কাজও করব।

মা তাকে জেরা করলেন। দেখলাম, সে ভারী চাপা। মার প্রশ্নের ছাঁকা জবাব দিল, নিজে থেকে একটি কথা বেশি কইল না। সে বলল, তার নাম মমতা। আমাদের বাড়ি থেকে খানিক দূরে জীবনময়ের গলি, গলির ভেতরে সাতাশ নম্বর বাড়ির একতলায় সে থাকে। তার স্বামী আছে আর একটি ছেলে। স্বামীর চাকরি নেই চারমাস, সংসার আর চলে না। সে তাই পর্দা ঠেলে উপার্জনের জন্য বাইরে এসেছে। এই তার প্রথম চাকরি। মাইনে ? সে তা জানে না। দুবেলা রেঁধে দিয়ে যাবে, কিন্তু খাবে না।

পনেরো টাকা মাইনে ঠিক হল। সে বোধ হয় টাকা বারো আশা করেছিল, কৃতজ্ঞতায় দুচোখ সজল হয়ে উঠল। কিন্তু সমস্তটুকু কৃতজ্ঞতা সে নীরবেই প্রকাশ করল, কথা কইল না।

মা বললেন, আচ্ছা, তুমি কাল সকাল থেকে এসো।

সে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে গেল। আমি গেটের কাছে তাকে পাকড়াও করলাম।

শোন। এখুনি যাচ্ছ কেন ? রান্নাঘর দেখবে না ? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এসো।

কাল দেখব, বলে সে এক সেকেন্ড দাঁড়াল না, আমায় তুচ্ছ করে দিয়ে চলে গেল। ওকে আমার ভালো লেগেছিল, ওর সঙ্গে ভাব করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, তবু ! আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে মার কাছে গেলাম। একটু বিস্মিত হয়েও। যার অমন মিষ্টি গলা, চোখে মুখে যার উপচে পড়া স্নেহ, তার ব্যবহার এমন রূঢ় !

মা বললেন, পিছনে ছুটেছিলি বুঝি ভাব করতে ? ভাবিস না, তোকে খুব ভালোবাসবে। বারবার তোর দিকে এমন করে তাকাচ্ছিল !

শুনে খুশি হলাম। রাঁধুনিপদপ্রার্থিনীর স্নেহ সেদিন অমন কাম্য মনে হয়েছিল কেন বলতে পারি না।

পরদিন সে কাজে এল। নীরবে নতমুখে কাজ করে গেল। যে বিষয়ে উপদেশ পেল পালন করল, যে বিষয়ে উপদেশ পেল না নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করল—অনর্থক প্রশ্ন

করল না, নির্দেশের অভাবে কোনো কাজ ফেলে রাখল না। সে যেন বহুদিন এ বাড়িতে কাজ করছে বিনা আড়ম্বরে এমন নিখুঁত হল তার কাজ। জল তোলা, মশলা বাটা, চাকরের কর্তব্য ; চাকরকে বারান্দায় বসে আরামে বিড়ি টানতে দেখেও সে অনুরোধ জানাল না, নিজেই জল তুলে মশলা বাটতে বসল। মার ধমক খেয়ে চাকর কাছে যাওয়া মাত্র শিল ছেড়ে উঠে গেল।

কাজের শৃঙ্খলা ও ক্ষিপ্রতা দেখে সকলে তো খুশি হলেন, মার ভবিষ্যৎ বাণী সফল করে সে যে আমায় খুব ভালোবাসবে তার কোনো লক্ষণ না দেখে আমি হলাম ক্ষুণ্ণ। দুবার খাবার জল চাইলাম, চার-পাঁচবার রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু কিছুতেই সে আমায় ভালোবাসল না। বরং রীতিমতো উপেক্ষা করল। শুধু আমাকে নয় সকলকে। কাজগুলিকে সে আপনার করে নিল, মানুষগুলির দিকে ফিরেও তাকাল না। মার সঙ্গে মৃদুস্বরে দু-একটি দরকারি কথা বলা ছাড়া ছটা থেকে বেলা সাড়ে দশটা অবধি একবার কাশির শব্দ পর্যন্ত করল না। সে যেন ছায়াময়ী মানবী, ছায়ার মতোই ম্লানিমার ঐশ্বর্যে মহীয়সী, কিন্তু ধরা ছোঁয়ার অতীত, শব্দহীন অনুভূতিহীন নির্বিকার।

রাগ করে আমি স্কুলে চলে গেলাম। সে কী করে জানবে মাইনে করা রাঁধুনির দূরে থাকাটাই সকলে তার কাছে আশা করছে না, তার সঙ্গে কথা কইবার জন্য বাড়ির ছোটোকর্তা ছটফট করছে।

সপ্তাহখানেক নিজের নূতন অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর সে আমার সঙ্গে ভাব করল।

বাড়িতে সেদিন কুটুম এসেছিল, সঙ্গে এসেছিল একগাদা রসগোল্লা আর সন্দেশ। প্রকাশ্য ভাগটা প্রকাশ্যে খেয়ে ভাঁড়ার ঘরে গোপন ভাগটা মুখে পুরে চলেছি, কোথা থেকে সে এসে খপ করে হাত ধরে ফেলল। রাগ করে মুখের দিকে তাকাতে সে এমন ভাবে হাসল যে লজ্জা পেলাম।

বলল, দরজার পাশ থেকে দেখছিলাম, আর কটা খাচ্ছ গুনছিলাম। যা খেয়েছ তাতেই বোধ হয় অসুখ হবে, আর খেয়ো না। কেমন ?

ভর্ৎসনা নয়, আবেদন। মার কাছে ধরা পড়লে বকুনি খেতাম এবং এক খাবলা খাবার তুলে নিয়ে ছুটে পালাতাম; এর আবেদনে হাতের খাবার ফেলে দিলাম। সে বলল, লক্ষ্মী ছেলে। এসো জল খাবে।

বাড়ির সকলে কুটুম নিয়ে অন্যত্র ব্যস্ত ছিল, জল খেয়ে আমি রান্না ঘরে আসন পেতে তার কাছে বসলাম। এতদিন তার গম্ভীর মুখই শুধু দেখেছিলাম, আজ প্রথম দেখলাম, সে নিজের মনে হাসছে।

আমি বললাম, বামুনদি—

সে চমকে হাসি বন্ধ করল। এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আমি তাকে গাল দিয়েছি। বুঝতে না পেরেও অপ্রতিভ হলাম।

কী হল বামুনদি ?

সে এদিক ওদিক তাকাল। ডালে খানিকটা নুন ফেলে দিয়ে এসে হঠাৎ আমার গা ঘেঁষে বসে পড়ল। গম্ভীর মুখে বলল, আমায় বামুনদি বোলো না খোকা। শুধু দিদি বোলো। তোমার মা রাগ করবেন দিদি বললে ?

আমি মাথা নাড়লাম। সে ছোটো এক নিশ্বাস ফেলে আমাকে এত কাছে টেনে নিল যে আমার প্রথমটা ভারী লজ্জা করতে লাগল।

তারপর কিছুক্ষণ আমাদের যে গল্প চলল সে অপূর্ব কথোপকথন মনে করে লিখতে পারলে সাহিত্যে না হোক আমার কাছে সব চেয়ে মূল্যবান লেখা হয়ে উঠত।

হঠাৎ মা এলেন। সে দুহাতে আমাকে এ রকম জড়িয়েই ধরেছিল, হাত সরিয়ে ধরা-পড়া চোরের মতো হঠাৎ বিব্রত হয়ে উঠল। দুচোখে ভয় দেখা দিল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণে আমার কপালে চুম্বন করে মাকে বলল, এত কথা কইতে পারে আপনার ছেলে !

তখন বুঝিনি আজ বুঝি স্নেহে সে আমায় আদর করেনি, নিজের গর্ব প্রতিষ্ঠার লোভে। মা যদি বলতেন, খোকা উঠে আয়,—যদি কেবল মুখ কালো করে সরে যেতেন, পরদিন থেকে সে আর আসত না। পনেরো টাকার খাতিরেও না, স্বামীপুত্রের অনাহারের তাড়নাতেও না।

মা হাসলেন। বললেন, ও ওইরকম। সারাদিন বকবক করে। বেশি আশকারা দিয়ো না, জ্বালিয়ে মারবে।

বলে মা চলে গেলেন। তার দুচোখ দিয়ে দুফোঁটা দুর্বোধ্য রহস্য টপটপ করে ঝরে পড়ল। মা অপমান করলে তার চোখ হয়তো শুকনোই থাকত, সম্মানে চোখের জল ফেলল ! সে সম্মানের আগাগোড়া করুণা ও দয়া মাখা ছিল, সেটা বোধ হয় তার সইল না।

তিন-চারদিন পরে তার গালে তিনটে দাগ দেখতে পেলাম। মনে হল, আঙুলের দাগ। মাস্টারের চড় খেয়ে একদিন অবনীর গালে যে রকম দাগ হয়েছিল তেমনি। আমি ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম, তোমার গালে আঙুলের দাগ কেন ? কে চড় মেরেছে ?

সে চমকে গালে হাত চাপা দিয়ে বলল, দূর ! তারপব হেসে বলল, আমি নিজে মেরেছি। কাল রাত্রে গালে একটা মশা বসেছিল, খুব রেগে—

মশা মারতে গালে চড় ! বলে আমি খুব হাসলাম। সেও প্রথমটা আমার সঙ্গে হাসতে আরম্ভ করে গালে হাত ঘষতে ঘষতে আনমনা ও গম্ভীর হয়ে গেল। তার মুখ দেখে আমারও হাসি বন্ধ হয়ে গেল। চেয়ে দেখলাম, ভাতের হাঁড়ির বুদবুদ ফাটা বাষ্পে কী দেখে যেন তার চোখ পলক হারিয়েছে, নীচের ঠোঁট দাঁতে দাঁতে কামড়ে ধরেছে, বেদনায় মুখ হয়েছে কালো।

সন্দিগ্ধ হয়ে বললাম, তুমি মিথ্যে বলেছ দিদি। তোমায় কেউ মেরেছে।

সে হঠাৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, না ভাই, না। সত্যি বলছি, না। কে মারবে ?

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে না পেয়ে আমাকে চুপ করে থাকতে হল। তখন কি জানি তার গালে চড় মারার অধিকার একজন মানুষের আঠারো আনা আছে ! কিন্তু চড় যে কেউ একজন মেরেছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ঘুচল না। শুধু দাগ নয়, তার মুখ চোখের ভাব, তার কথার সুর সমস্ত আমার কাছে ও কথা ঘোষণা করে দিল। বিবর্ণ গালে তিনটি রক্তবর্ণ দাগ দেখতে দেখতে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমি গালে হাত বুলিয়ে দিতে গেলাম, কিন্তু সে আমার হাতটা টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরল।

চুপিচুপি বলল, কারও কাছে যা পাই না, তুমি তা দেবে কেন ?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কী দিলাম আমি ?

এ প্রশ্নের জবাব পেলাম না। হঠাৎ সে তরকারি নামাতে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পিঁড়িতে বসামাত্র খোঁপা খুলে পিঠ ভাসিয়ে একরাশি চুল মেঝে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল, কী একটা অন্ধকার রহস্যের আড়ালে সে যেন নিজেকে লুকিয়ে ফেলল।

রহস্য বইকী। গালে চড়ের দাগ, চিরদিন যে ধৈর্যময়ী ও শান্ত তার ব্যাকুল কাতরতা, ফিসফিস করে ছোটো ছেলেকে শোনানো ; কারও কাছে যা পাই না তুমি তা দেবে কেন ? বুদ্ধির পরিমাণের তুলনায় এর চেয়ে বড়ো রহস্য আমার জীবনে কখনও দেখা দেয়নি। ভেবেচিন্তে আমি তার চুলগুলি নিয়ে বেণি পাকাবার চেষ্টা আরম্ভ দিলাম। আমার আশা পূর্ণ হল, সে মুখ ফিরিয়ে হেসে রহস্যের ঘোমটা খুলে সহজ মানুষ হয়ে গেল।

বিকালে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, তোমার বরের চাকরি হলে তুমি কী করবে ?

তুমি কী করতে বল ? হরির লুট দেব ? না, তোমায় সন্দেশ খাওয়াব ?

ধেৎ, তা বলছি না। তোমার বরের চাকরি নেই বলে আমাদের বাড়ি কাজ করছ তো, চাকরি হলে করবে না ?

সে হাসল, করব। এখন করছি যে !

তোমার বরের চাকরি হয়েছে ?

হয়েছে, বলে সে গম্ভীর হয়ে গেল।

আহা, স্বামীর চাকরি নেই বলে ভদ্রলোকের মেয়ে কষ্টে পড়েছে, পাড়ার মহিলাদের কাছে মাব এই মন্তব্য শুনে মমতাদির ববের চাকরির জন্য আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম। তাব চাকরি হয়েছে শুনে পুলকিত হয়ে মাকে সংবাদটা শুনিয়ে দিলাম।

মা তাকে ডেকে পাঠালেন, তোমার স্বামীর চাকরি হয়েছে ?

সে স্বীকার করে বলল, হয়েছে। বেশিদিন নয়, ইংরাজি মাসের পয়লা থেকে।

মা বললেন, অন্য লোক ঠিক করে দিতে পারছ না বলে কি তুমি কাজ ছেড়ে দিতে ইতস্তত করছ ? তার কোনো দরকার নেই। আমরা তোমায় আটকে রাখব না। তোমার কষ্ট দূর হয়েছে তাতে আমরাও খুব সুখী। তুমি ইচ্ছে করলে এ বেলাই কাজ ছেড়ে দিতে পাব, আমাদের অসুবিধা হবে না।

তার চোখে জল এল, সে শুধু বলল, আমি কাজ করব।

মা বললেন, স্বামীর চাকরি হয়েছে তবু ?

সে বলল, তাঁর সামান্য চাকরি, তাতে কুলবে না মা। আমায় ছাড়াবেন না। আমার কাজ কি ভালো হচ্ছে না ?

মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, অমন কথা তোমার শত্রুও বলতে পারবে না মা। সে জন্য নয়। তোমাব কথা ভেবেই আমি বলছিলাম। তোমার ওপর মায়া বসেছে, তুমি চলে গেলে আমাদেরও কি ভালো লাগবে ?

সে একরকম পালিয়ে গেল। আমি তার পিছু নিলাম। রান্নাঘরে ঢুকে দেখলাম সে কাঁদছে। আমায় দেখে চোখ মুছল।

আচমকা বলল, মিথ্যে বললে কী হয় খোকা ?

মিথ্যে বললে কী হয় জানতাম। বললাম, পাপ হয়।

গুরুনিন্দা বাঁচাতে মিথ্যা বললে ?

এটা জানতাম না। গুরুনিন্দা পাপ, মিথ্যা বলা পাপ। কোনটা বেশি পাপ সে জ্ঞান আমার জন্মায়নি। কিন্তু না জানা কথা বলেও সান্ত্বনা দেওয়া চলে দেখে বললাম, তাতে একটুও পাপ হয় না। সত্যি। কাঁদছ কেন ?

তখনও তার চাকরির একমাস বোধ হয় পূর্ণ হয়নি। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরবাব সময় দেখলাম জীবনময়ের গলির মোড়ে ফেরিওয়ালার কাচে কমলালেবু কিনছে।

সঙ্গে নেবার ইচ্ছা নেই টের পেয়েও একরকম জোর করেই বাড়ি দেখতে গেলাম। দুটি লেবু কিনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সে গলিতে ঢুকল। বিশ্রী নোংরা গলি। কে যে ঠাট্টা করে এই যমালয়েব পথটার নাম জীবনময় লেন রেখেছিল ! গলিটা আস্ত ইট দিয়ে বাঁধানো, পায়ে পায়ে ক্ষয় হয়ে গেছে, দুদিকের বাড়ির চাপে অন্ধকার, এখানে ওখানে আবর্জনা জমা করা আর একটা দূষিত চাপা গন্ধ। আমি সংকুচিত হয়ে তার সঙ্গে চলতে লাগলাম। সে বলল, মনে হচ্ছে পাতালে চলেছ, না ?

ও কথা মনে হলেও ভদ্রতার খাতিরে অস্বীকার করলাম। সে হেসে কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। হঠাৎ পথের ধারে ঘেঁষে দাঁড়াল।

গলি দিয়ে দু-একটি লোক চলছিল, মমতাদির সর্বাঙ্গে চোখ বোলানোতেই অভদ্রতার সীমা রেখে। একটি মাঝবয়সি খুব ফরসা লোক কিন্তু এই সীমা অতিক্রম করে গেল। মমতাদির গা ঘেঁষে যাবার সময় চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ ?

লোকটির চেহারা ও পোশাক দুয়েরই দিব্যি জলুশ। এই গলি দিয়ে তাব হেঁটে চলা যেন গলিটাকে পরিহাস করা। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখ দেখে মনের ভাব অনুমান করার চেষ্টা করতে করতে মমতাদি বলল, আমার আত্মীয় হয়—ঠাট্টার সম্পর্ক।

সাতাশ নম্বরের বাড়িটা দোতলা নিশ্চয়, কিন্তু যত ক্ষুদ্র দোতলা হওয়া সম্ভব। সদর দরজার পরেই ছোটো একটি উঠান, মাঝামাঝি কাঠের প্রাচীর দিয়ে দুভাগ করা। নীচে ঘরের সংখ্যা বোধ হয় চার, কারণ মমতাদি আমায় যে ভাগে নিয়ে গেল সেখানে দুখানা ছোটো ছোটো কুঠবির বেশি কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না। ঘরের সামনে দুহাত চওড়া একটু রোয়াক, একপাশে একশিট করোগেট আয়রনের ছাদ ও চটের বেড়ার অস্থায়ী রান্নাঘর। চটগুলি কয়লাব ধোঁয়ায় কয়লার বর্ণ পেয়েছে।

সে আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে টুলে বসাল। ঘবে দুটি জানালা আছে এবং সম্ভবত সেই কারণেই শোবার ঘর কবে অন্য ঘরখানার চেয়ে বেশি মান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জানালা দুটির এমনই অবস্থান যে, আলো যদিও কিছু কিছু আসে, বাতাসের আসা-যাওয়া একেবারে অসম্ভব। সুতরাং পক্ষপাতিত্বের যে খুব জোরালো কারণ ছিল তা বলা যায় না। সংসারের সমস্ত জিনিসই প্রায় এ ঘরে ঠাঁই পেয়েছে। সব কম দামি শ্রীহীন জিনিস। এই শ্রীহীনতার জন্য সযত্নে গুছিয়ে রাখা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে বিশৃঙ্খলতার অন্ত নেই। একপাশে বড়ো চৌকি, তাতে গুটানো মলিন বিছানা। চৌকির তলে একটি চরকা আর ভাঙা বেতেব বাস্কেট চোখে পড়ে, অন্তবালে হয়তো আরও জিনিস আছে। ঘরেব এক কোণে পাশাপাশি রক্ষিত দুটি ট্রাঙ্ক—দুটিবই রং চটে গেছে, একটিব তালা ভাঙা। অন্য কোণে কয়েকটা মাজা বাসন, বাসনেব ঠিক ঊর্ধ্বে কোনাকুনি টাঙানো দড়িতে খানকয়েক কাপড়। এই দুই কোণেব মাঝামাঝি দেওযাল ঘেঁষে পাতা একটি ভাঙা টেবিল, আগাগোড়া দড়িব ব্যান্ডেজের জোরে কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলে কয়েকটা বই খাতা, একটি অল্পদামি টাইমপিস, কয়েকটা ওষুধের শিশি, একটা মেরামত করা আবশি, কয়েকটা ভাঁজ করা সংবাদপত্র, এই সব টুকিটাকি জিনিস। টেবিলের ঊর্ধ্বে দেওয়ালের গর্তেব তাকে কতকগুলি বই।

ঘরে আব একটি জিনিস ছিল—একটি বছর পাঁচেকের ছেলে। চৌকিতে শুধু মাদুরের ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে সে ঘুমিয়ে ছিল। মমতাদি ঘবে ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে ছেলেটির গাযে হাত দিল, তারপব গুটানো বিছানার ভেতর থেকে লেপ আর বালিশ টেনে বাব করল। সন্তর্পণে ছেলেটির মাথাব তলে বালিশ দিয়ে লেপ দিয়ে গা ঢেকে দিল।

বলল, কাল সারারাত পেটের ব্যথায় নিজেও ঘুমোযনি, আমাকেও ঘুমোতে দেয়নি। উনি তো বাগ কবে—কই, তুমি লেবু খেলে না ?

আমি একটা লেবু খেলাম। সে চুপ করে খাওয়া দেখে বলল, মুড়ি ছাড়া ঘরে কিছু নেই, দোকানের বিষও দেব না, একটা লেবু খাওয়াতে তোমাকে ডেকে আনলাম !

আমি বললাম, আর একটা লেবু খাব দিদি।

সে হেসে লেবু দিল, বলল কৃতার্থ হলাম। সবাই যদি তোমার মতো ভালোবাসত !

ঘরে আলো ও বাতাসের দীনতা ছিল। খানিক পরে সে আমায় বাইরে রোয়াকে মাদুর পেতে বসাল। কথা বলার সঙ্গে সংসারের কয়েকটা কাজও করে নিল। ঘর ঝাঁট দিল, কড়াই মাজল, জল তুলল, তারপর মশলা বাটতে বসল। হঠাৎ বলল, তুমি এবার বাড়ি যাও ভাই। তোমার খিদে পেয়েছে।

কয়েক মিনিট পরে রাজা যেন রাজধানীতে প্রবেশ করলেন এমনই ভঙ্গিতে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের একটি লোক বাড়ি ঢুকল। গৃহপ্রবেশের রকম দেখেই আমি তাকে চিনলাম। মমতাদির স্বামী নগেন।

যেমন রোগা তেমনই ঢ্যাঙা। এত লম্বা লোক কোনোদিন আমার চোখে পড়েনি। লম্বাও আবার এক অদ্ভুত রকমের। দেহের দীর্ঘ কাঠামোর সঙ্গে খাপ খেতে প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গও যেন লম্বাটে হয়ে গেছে। বাহু দুটি অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ, দুদিক চাপা ফজলি আমের মতো লম্বাটে মুখে খাঁড়ার মতো নাক, চিবুকটা ঠেলে নেমে ডগার দিকে চোখা হয়ে গেছে, মাথার চুলও মেয়েলি ধরনে বড়ো বড়ো—ঠিক বাবরি নয়। গায়ের কোটটা পর্যন্ত বালিশের ওয়াড়ের মতো সরু আর দীর্ঘ। দোর থেকে তিনবার পা ফেলেই রোয়াকে পৌঁছল। নিচু হয়ে আমার মুখের কাছে মুখ এনে নিরীক্ষণ করে বলল, তুমি কে হে ?

মুখে তামাকের দুর্গন্ধ, দাঁতগুলি কালো। আমি মুখ সরিয়ে নিয়ে বললাম, আমি সুরেশ।

সুরেশ নাকি ? বেশ দাদা বেশ। তা আমার বাড়িতে হঠাৎ সুরেশের আমদানি কী জন্য ? এ বাড়িতে সুরের রেশটুকুও যে নেই দাদা ? ওর জন্য নাকি ?

মমতাদি বলল, এ সব কী বলছ ছেলেমানুষকে ? আমি ওদের বাড়ি কাজ করি, ওকে আমি ডেকে এনেছি। ওকে ভয় দেখাচ্ছ কেন ?

নগেন চট করে সোজা হয়ে গেল, ভয় দেখাচ্ছি ? বড়ো যে লম্বা-চওড়া কথা শিখেছ ! আমি ভূত নাকি যে ভয় দেখাব ?

মমতাদি কথা না কয়ে মশলা বাটতে লাগল। নগেন লম্বা কোটের পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরাল। আচমকা নিচু হয়ে আমার মুখে ধোঁয়া ছেড়ে হ্যা হ্যা করে হাঁপানির মতো হাসল। বিড়ির কড়া ধোঁয়ায় আমি কেশে ফেললাম।

ছি ! ও কী কর ? বলে মমতাদি শিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

নগেন ফের ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে গেল, তুমি ফোঁড়ন কাটছ কেন ? ঠোঁট দুটো বন্ধ করে রাখতে পার না ? বলে ঠোঁটে এত জোরে টোকা দিল যে ব্যথায় সে ঠোঁট কামড়ে ধরল।

বেড়ে দেখাচ্ছে তোমায় মাইরি—খাসা। বোধ হয় গালে টোকা দিলে আরও বেড়ে দেখাবে। দেব ?

মমতাদি পিছু হটল। বলল, খোকার টনিক বুঝি নিজেই গিলে এসেচ ?

আলবত। খোকা টনিক দিয়ে করবে কী ? এখনও খোকার টনিক খাওয়ার বয়স হয়নি। টনিক লাগে এই আমাদের—বলে সগর্বে নিজের বুক ঠুকে দিল। তারপর হঠাৎ মুখের জ্বলন্ত বিড়িটা আমার জামার পকেটে পুরে দিয়ে দুই কোমরে হাত রেখে সামনে পিছনে দুলে দুলে হাসতে লাগল।

মমতাদি বলল, তুমি ওর সঙ্গে অমন করছ, এর ফল কী হবে জান ?

জানি হাত দিয়ে আমার মাথাটা কচাত করে কেটে নেবে !

মমতাদি বলল, তোমার মাথার কিছু হবে না, চাকরি যাবে আমার। তুমি কী মনে কর ও বাড়ি ফিরে তোমার ব্যবহারের কথা বলে দিলে আর একদিনের জন্যও ওর মা আমাকে রাখবেন ? যা খুশি তোমার কর। কিন্তু কাজ গেলে আমায় দুষো না।

এ কথা মন্ত্রের মতো কাজ করল। নগেন মুহূর্তে দমে গিয়ে বলল, ইস ! সেটা তো খেয়াল করিনি ! আগে বলতে হয়।

তারপর মুখখানা করুণ করে বলল, তা খোকাবাবু বাড়িতে বলতে যাবে কেন ? আমি ঠাট্টা করছিলাম বই তো নয় ! ঠাট্টা শুনে রাগ করবে, বাড়িতে নালিশ করবে, খোকাবাবুকে তুমি এত বোকা ভাব নাকি ?

কী জানি। কাল চাকরি থাকবে কী যাবে দেখেই সেটা বোঝা যাবে। খোকার রাগ তুমি জান না। বলে মমতাদি ঘরে চলে গেল।

নগেন ধপ করে আমার পাশে বসে পড়ল। গলা নিচু করে বলল, চুপিচুপি না হয় তোমার পা ধরছি ভাই, রাগ রেখো না। আমি না বুঝে বড্ড দোষ করেছি। অনুতাপে এখন আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মাইরি বলছি। কালীর দিব্যি।

তার চোখ ছলছল করতে লাগল ! আমার অবশ্য আর রাগ রইল না, কিন্তু কী বলব ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইলাম। নীরবতাকে রাগ মনে করে সে হঠাৎ নিজের কান মলে কাতর স্বরে বলল, বাড়িতে বোলো না ভাই, মরে যাব। তোমার দিদি পর্যন্ত যে উপোস করবে রে দাদা।

আমি তাড়াতাড়ি জানালাম যে রাগ করিনি, বাড়িতেও বলব না। শোনামাত্র তার সব কাতরতা দূর হয়ে গেল। অনুযোগ দিয়ে বলল, তুমি বড়ো নিষ্ঠুর ভাই ! পায়ে ধরালে কান মলালে তবে ক্ষমা করলে। তুমিই বল, শুধু ক্ষমাতে কি এখন আমার মন ওঠে ? ক্ষমার সঙ্গে একটু দয়াও করে ফ্যালো, আমার সব দুঃখ দূর হয়ে যাক। বেশি নয় ভাই, একটু দয়া। যৎসামান্য।

কী বলুন ?

বলছি। কিন্তু মনে রেখো আমার জন্য চাইছি না দয়া। তেমন পাত্র আমি নই। নিজের দুঃখের কথা আমি কাউকে বলি না। কার জন্য দয়া চাই জান ? তোমার ওই দিদির জন্য। ওর বড়ো লজ্জা, তাই মুখ ফুটে বলতে পারে না, আমাব কাছে কাঁদে আর বলে পনেরো টাকায় কুলোয় না, কি করি আমি, একদিন বিষ খেয়ে মরে যাব। মাইরি, ও কথা বলে আর হাউহাউ করে কাঁদে। সে কান্না দেখলে পাষাণেরও বুক ফেটে যায়। কালীর দিব্যি।

নগেন বলল, দু টাকা মাইনে বাড়িয়ে না দিলে তো ওকে বাঁচানো চলে না ভাই। ভয়ে মরি, দুঃখের জ্বালায় কবে সত্যি সত্যি বিষ খেয়ে ফেলে। তুমি যদি মাকে বলে ওর দু টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিতে পার তবেই সর্বরক্ষে হয়। নইলে রোজ ওর বুকফাটা কান্না আর সয় না। নগেন মাথা নাড়তে লাগল।

আমি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করলাম মাকে বলব। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে নগেন আচমকা আমায় সশব্দে চুম্বন করে ফেলল। আমি আঁৎকে উঠে ছিটকে সরে গেলাম। নগেন হাতজোড় করে বলল, চটো না দাদা। তোমায় বড়ো ভালোবাসি কিনা, তাই সামলাতে পারলাম না।

যুক্তকর মুক্ত করে সে ফের মুখখানা করুণ করল, কী ভাবছি জান দাদা ? ভাবছি দু টাকায় কী তোমার দিদির কান্না ঘুচবে ! অভাবের সমুদ্রে দু টাকা দু ফোঁটা শিশির বই তো নয়। তুমি বরং পাঁচটা টাকার কথাই বোলো। কেমন ? তোমরা হলে রাজামানুষ, পাঁচটা টাকা তোমাদের কাছে পাঁচটা পয়সা। অ্যাঁ ?

আমি স্বীকার করলাম। নগেন বলল, ওকে বোলো না কিন্তু। ওব বড়ো লজ্জা কিনা, কেঁদে কেটে অসুখ করে ফেলবে। হয়তো লজ্জায় বিষও খেয়ে ফেলবে। জান, ওর কাছে আধ ভরি আফিং আছে।

তারপর একসময় মমতাদি বলল, চলো খোকা, আমরা যাই।

নগেন সুধাল, তুমি কোথা যাবে শুনি ?

দুবেলা যেখানে রাঁধতে যাই সেখানে, আবার কোথা ?

কী ! উনুন ধরাবে কে, ভাত চাপাবে কে ?

তুমি। আমার আজ সময় নেই।

তোর সময়ের নিকুচি করেছে ! রোজ ভাত নামিয়ে নিই তাই তোর বাবার ভাগ্যি তা জানিস? উনুন ধরা, ভাত চাপা, তারপর যেখানে খুশি মরবি যা। মমতাদি উঠানে নেমে পড়েছিল, রোয়াকে উঠল। বলল, বেশ, সব করে দিয়েই যাচ্ছি। কিন্তু কাল চাকরি গেলে আমায় মারতে উঠো না যেন !

জোঁক ফণা ধরেছিল, মুখে নুন পড়া মাত্র নরম হয়ে গেল।

চাকরি যাবে কেন ?

কেন ? বেশ ! সময়মতো কাজে না গেলে কে পয়সা দিয়ে লোক রাখে ? নটা বাজতে না বাজতে নাকেমুখে ভাত গুঁজে আপিসে ছোটো কী জন্য ? তোমার চাকরি, আমার চাকরি নয় ?

নগেন একদম কাদা হয়ে গিয়ে বলল, তোমার কাজে যাওয়ার সময় নাকি ? তবে তুমি যাও। দেরি কোরো না, চলে যাও। এদিকে যা হবার হবে।

মমতাদি হাসল, এদিকে সব হবে, তুমি ভেব না। খোকার অসুখ, আমি শিগগির ফিরে আসব।

মাস চারেক পরে আমিও বুঝলাম তার ছেলে হবে। আরও মাসখানেক সে কাজ করল, তারপর বাধ্য হয়ে আসা বন্ধ করল। দশ-বারোদিন পরে খবর নিতে গেলাম। দেখলাম রোয়াকের যে প্রান্তটা খালি ছিল সেখানে চাঁচের বেড়ার আঁতুড়ঘর নির্মিত হয়েছে। ছাদটাও চাঁচের, তবে তার ওপরে একটা ছেঁড়া শতরঞ্চি বিছানো। ছেঁড়া মলিন বিছানায় সে শুয়েছিল, পাশে একটা কাঁথা জড়ানো পুঁটলি। পুঁটলিটা চোখ বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে, আর মাঝে মাঝে কম্পিত স্তন চুষছে।

লুব্ধ হয়ে বললাম, কোলে নেব দিদি ?

কাশিতে তার গলা ভেঙে গিয়েছিল, বিশ্রী শব্দ করে বলল, আজ নয় ভাই। ওটা আজ অস্পৃশ্য, ছঁলে নাইতে হবে, আঁতুড় উঠুক তখন কোলে নিয়ো। সোমবারের পরে একদিন এস, কেমন ?

বৃহস্পতিবার গেলাম, কিন্তু ছেলেটাকে কোলে নিতে ঘেন্না হল। আঁতুড়ঘরটা অদৃশ্য হয়েছিল, রোয়াকে কাঁথায় শিশু শুয়েছিল। রোগা কালো, পেটটা টিমটিমে, গলায় লাল লাল ঘা। প্রথম দিন শুধু ফুলের মতো মুখখানা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, আজ সম্পূর্ণ অবয়ব দেখে দারুণ বিতৃষ্ণা হল।

সে বলল, নেবে কোলে ?

আমি বিপদে পড়ে অনিচ্ছার সঙ্গে বললাম, দাও। ওর গলায় কী হয়েছে দিদি ?

শিশুর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে সে বলল, কুষ্ঠ।

আমি চমকে বললাম, কুষ্ঠ ?

সে চোখ তুলে তাকাল, দু চোখে একটা অস্বাভাবিক জ্যোতি।

না ভাই, কুষ্ঠ নয়। গরম তেলে পুড়ে গেছে। কিন্তু ওকে তোমার কোলে নিয়ে কাজ নেই। ওর শরীরে অনেক ফোসকা, লাগবে।

কে গরম তেল ফেলে দিয়েছে দিদি ?

সে নীরবে চোখ মুছল, জবাব দিল না। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মমতাদি রোগা হয়ে গেছে, চোখের নীচে গভীর কালো দাগ, চোখ দিয়ে যেন দুঃখের কালি গড়িয়ে পড়ে শুকিয়েছে।

আরও তিনমাস কাটল। সে মা হবার ধাক্কা সামলে প্রায় আগের মতো সুস্থ ও সবল হয়ে উঠল, কিন্তু কাজ করতে এল না। একদিন স্কুল যাবার পথে মমতাদির ওখানে গেলাম।

নগেন আপিসে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রোয়াকে টুলে বসে পান চিবোচ্ছিল, আর গর্জন করে কী সব বলছিল। ছোটো ছেলেকে স্নান করিয়ে কাজল পরাতে পরাতে মমতাদি নির্বিকার চিত্তে শুনে যাচ্ছিল।

উঠানে উপুড় হয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল মমতাদির বড়ো ছেলে পাঁচু।

আমায় দেখে নগেন গর্জন বন্ধ করে সাদরে অভ্যর্থনা করল। নিজে মমতাদির পিঁড়িটা একটানে কেড়ে নিয়ে বসে আমায় টুলে বসাল। বলল যে, আমার জন্য তার নাকি বড়োই মন কেমন করছিল। মমতাদি শুধু একটু হেসেই আমায় স্বাগত জানাল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পাঁচু কাঁদছে কেন ?

নগেন বলল, ও শুয়ারকা বাচ্চার কথা বোলো না ভাই। হারামজাদা দু-এক বছরের মধ্যে জেলে ঢুকবে। এই বয়সে এমন পাকা চোর হয়ে উঠেছে যে, বললে তুমি বিশ্বাস করবে না। চুপ করলি পাষণ্ড ইস্টুপিড নারকী ? চুরি করে মার খেয়ে কাঁদিস, তোর লজ্জা নেই ?

আমি পাঁচুর দিকে চেয়ে দেখলাম, চোরের সাজাই হয়েছে বটে। পিঠময় অসংখ্য শাস্তির চিহ্ন, পাশে পড়ে আছে একটা ভাঙা বাকারি। নিজের চোখ-কানকে আমার বিশ্বাস হল না। মমতাদির ছেলে চোর !

বললাম, কী চুরি করেছে ?

নগেন বলল, পয়সা। খাবার নয়, খেলনা নয়, পয়সা। তাও কি আমাদের পয়সা ? ওই ওদের—বলে আঙুল দিয়ে দোতলাটা দেখিয়ে দিল। বালিশের তলা হাতড়ে পাঁচসিকে চুরি করে পালাচ্ছিল, যাদববাবু দেখতে পেয়ে চোর ছেলে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন—সঙ্গে যাচ্ছেতাই গালাগালি।

আমি চকিতে মমতাদির দিকে তাকালাম। সে মাথাটা এত নিচু করেছিল যে মুখ দেখতে পেলাম না। শুধু চোখ পড়ল, তার কাগজের মতো সাদা কপাল, আর খোকার চোখে কাজল দিতে আঙুলের থরথর কম্পন। দেহ তার নিস্পন্দ, নতমুখী মর্মর মূর্তির মতো।

যা, দূর হয়ে যা সামনে থেকে কুলাঙ্গার !

নগেনের গর্জন শুনে চমকে ফিরে চেয়ে দেখলাম, পাঁচু কখন উঠে দাঁড়িয়েছিল, এখন গুটিগুটি বাইরের দিকে চলেছে। তার সেই ধীর চলন দেখে নগেনের বোধ হয় ধৈর্যচ্যুতি হল, হাতের কাছে খড়ম ছিল এক পাটি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল। খড়মটা পাঁচুর গায়ে লাগল না, ওদিকের দেয়ালে ঠেকে বৌলা ভেঙে পাঁচুর পায়ের কাছে ছিটকে এল। পাঁচু দাঁড়াল। খড়মটা তুলে নিয়ে জিভ বার করে ভেংচি কাটল। তারপর বাপের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়েই চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। পিতাপুত্র দুজনেই লক্ষ্যভেদে বিশেষ অপটু দেখলাম। খড়মটা নগেনের মাথায় না লেগে শোবার ঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

নগেন তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু উটের মতো লম্বা পা থাকা সত্ত্বেও তখনকার মতো অদৃশ্য পলাতককে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা নেই জেনে ফিরে এসে পিঁড়িতে বসে পকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ক্রোধ-বিকৃত মুখে এমন একটা উদাসীন ভাব এনে ফেলল যে, আমি অবাক হয়ে গেলাম। বিড়ির ধোঁয়া যে রাগের এমন ভালো ওষুধ তা জানা ছিল না।

খানিক বিড়ি টেনে নগেন বলল, ঠাকুর কেমন রাঁধছে গো সুরেশবাবু ? ওর রান্নার মতো হচ্ছে ?

ঠাকুর পালিয়েছে।

নগেন সোজা হয়ে বসে ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, সত্যি পালিয়েছে ? তবে ওকে আবার রাখ না ?

আমি সংশয়ভরে বললাম, দিদি কী আর কাজ করবে ?

দিদি মুখ তুলল। ভাবলেশহীন মুখ। ভাবের শুধু অভাব নয়, ভাবগুলি যেন মুখেই মরেছে এমনই। নীরস স্বরে বলল, না ভাই, দিদি আর কাজ করবে না।

নগেন চটে বলল, কী করবে তবে শুনি ? বসে বসে গিলবে ? যার তার বাড়ি নয়, আত্মীয়ের বাড়ির মতো। সেখানে কাজ করতে তোমার আপত্তিটা কী শুনি ? ও সব বজ্জাতি চলবে না, বুঝলে ? আমি কুড়েমির প্রশ্রয় দেব না ! কাল থেকে তুমি কাজ করতে যাবে। মাসে পনেরোটা টাকা সহজ নাকি ? এবার বরং দু টাকা বেশি হবে। হবে না খোকা ?

আমি সায় দিলাম, হবে।

মমতাদি কথা কইল না। রাগে আগুন হয়ে নগেন বলল, যাবে না তুমি ?

না।

না ? বটে ? আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করব আর তুমি বসে বসে খাবে, না ?

স্বামীর রোজগার খেলে স্ত্রী বুঝি বেয়াদব বেহায়া হয় ? ওমা, কী লজ্জা ! এমন কথা আর বোলো না, মানুষ হাসবে।

নগেন বলল, হুঁঃ, বজ্জাতি হোথা হায় ! শুনবে তবে ? শুনবে তবে ? দু পয়সা রোজগার করে স্বামীর একটু সাশ্রয় করার সুযোগ যে মেয়েমানুষ হেলা করে সে শুধু বেয়াদব নয়, সে-সে—

সে ?

সে বেশ্যা ! বলে নগেন ফের একটা বিড়ি ধরাল।

মমতাদির ধৈর্য ও সাহস দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। খোকাকে বুকে তুলে নিয়ে সে চুমা খেল, গাল টিপে আদর করল, খোকার হাসির জবাবে হাসল, শেষে অবসরমতো বলল, তাই নাকি ? তা বেশ।

মমতাদি ঘরে চলে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ এসে ক্রোধে মুহ্যমান স্বামীর গা ঘেঁষে বসে পড়ল। নগেন খানিকক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে রইল, তারপর নড়েচড়ে বারকয়েক আড়চোখে তার দিকে চেয়ে দেখল। সে সময় তার মুখখানা এমন অপূর্ব হয়ে উঠেছিল যে, আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। এটা বাইরের দৃষ্টিতে দেখেছিলাম কিংবা অন্তরের অনুভূতি দিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম আজ সঠিক বলতে পারি না। কারণ, তার বসার ভঙ্গিটা ছিল বিচ্ছিবি—আদুরে গোপাল হ্যাংলা মেয়ের মতো, মাথাটা একদিকে কাত কবে সে দুষ্টামির হাসি হাসছিল, আবার এটাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, সে ইচ্ছে করে লজ্জায় একেবারে অভিভূত হয়ে গেছে। নগেনকে লুব্ধ করে সে যেন কী ভিক্ষা চাইছিল। এ সবের সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয়ের সামঞ্জস্য ছিল না, তাই সমস্ত মিলে সে আমার কাছে হয়ে উঠেছিল দুর্বোধ্য ও অপূর্ব।

আমার অস্তিত্ব সে বোধ হয় বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়ায় সরে বসতে গেল। নগেন খপ করে তার হাত ধরে ফেলল। তারপর এতক্ষণ যত রাগ জমা হয়েছিল তার সবটুকু ঝাল ঝাড়ল নির্দোষ আমাব ওপরেই !

হাঁ করে কী দেখছিস শুনি ? মজা লাগছে দেখতে, না ? বেরো আমার বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যা !

মমতাদির চাকরির খাতিরে আমার খাতির, সে যখন চাকরিই করবে না তখন আর কীসের খাতির ! তিলেক বিলম্ব না করে আমি বেরিয়ে গেলাম। সদর দরজাটা ভেজিয়ে দেবার সময় দেখলাম মমতাদির শুভ্রশীর্ণ হাত নগেনের গলা জড়িয়ে ধরেছে।

মহাকালের জটার জট

মেজো মেয়ে সুমিত্রার বিবাহ আগামী শ্রাবণে। বড়ো মেয়ে সুচিত্রা আধবোবা, আধকালা, আধপাগল।

তাহা সত্ত্বেও পাত্র খুঁজিতে হয়। জোটে না, তবু খুঁজিতে হয়। শেষে না কাঁদিয়া মেয়ে দেওয়া যায় এমন একটি সম্বন্ধ মামার চেষ্টায় প্রায় স্থির হইয়া আসে এবং একদিন বেলা ১০টায় পাত্রপক্ষ সদলে মেয়ে দেখিতে শুভাগমন করেন।

তারপর যাহা ঘটে তাহা যেমন অচিন্তনীয় তেমনই বীভৎস। অর্ধনগ্ন অবস্থায় উঠানে গড়াগড়ি দিয়া সুচিত্রা চিৎকার করিয়া কাঁদে। মরিয়া গেলেও দুবার বিবাহ সে কিছুতেই করিবে না, এই কথা সকলকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টায় পাগল মেয়েটার যেন প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়।

যাঁহারা মেয়ে দেখিতে আসিয়াছিলেন খানিকক্ষণ মজা দেখিয়া মুচকি হাসিয়া তাহারা প্রস্থান করেন। উপস্থিত সকলের মুখে মেঘ ঘনাইয়া আসে। কাহারও মুখে কথা ফোটে না, কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহিতে পারে না। খানিক আগেই তো সুচিত্রার অনাবৃত দেহটা সকলের চোখে পড়িয়াছে। মেয়েটার অস্তিত্বে ফাঁক আছে, কিন্তু অঙ্গের কোথাও ফাঁকি নাই। ওর সম্বন্ধে এ যেন একটা নূতন চেতনা নিয়া জাগিয়া ওঠা।

সুলতা ননদকে শান্ত ও সংযত করিয়া দিতেছিল, প্রশ্নকামী মামাশ্বশুরের নৈকট্য পরিহার করিয়া সে এদিকে সরিয়া আসিল। সুমিত্রাকে চুপিচুপি বলিল, ওকে মিথ্যে জ্বালাতন করা মেজো ঠাকুরঝি।

এদিকে মুখখানা ভয়ানক গম্ভীর করিয়া মামা অতিকষ্টে সুচিত্রাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দুবার বিয়ে কী রে চিত্রা ? তোর আবার বিয়ে হল কবে ?

চোখ মুছিতে মুছিতে করুণ সুরে সুচিত্রা বলিল, হয়েছে মামা। ও রোজগার করে না বলে তোমরা আবার আমার বিয়ে দেবে ?

সে কে রে ? কার কথা বলছিস ?

সুচিত্রা নীরবে মাথা নাড়িল।

কে রোজগার করে না ? মামা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু বহু জিজ্ঞাসাবাদেও সুচিত্রার অক্ষম স্বামীর পরিচয় জানা গেল না। সে বলিবে না। স্বামী তাহাকে বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছে।

শেষ পর্যন্ত মামা হাল ছাড়িয়া দিলেন। একে কুমারী মেয়ে তায় আবার পাগল, ইহার মনের কথা বাহির করিবার মতো বুদ্ধি তাঁর মতো অবিবাহিত লোকের নাই। একটা বিড়ি বাহির করিয়া তিনি নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। অত চেষ্টা যত্নে জোগাড় করা সম্বন্ধ ফাঁসিয়া যাওয়ায় তাঁহার দুঃখের অবধি ছিল না।

আহা, এই পাগল মেয়েটাকে তিনি কত ভালোবাসেন ! তারই মায়ের পেটের বোনকে তিনদিন যন্ত্রণা দিয়া যমের দক্ষিণ দুয়ারের কাছাকাছি লইয়া গিয়া এ মেয়ে পৃথিবীতে আসিয়াছিল। ইহার বিবাহ দিতে পারিলে তার কত সুখ হইত শুধু ভগবানই তাহা জানেন।

ও বাড়ির যাদব মেয়ে দেখানো ব্যাপারে সহায়তা করিতে আসিয়াছিলেন, সুচিত্রার নগ্নতা চোখে পড়ামাত্র তার দৃষ্টি নিজের বাড়ির কার্নিশে উঠিয়া গিয়াছিল, এতক্ষণে চোখ নামাইয়া তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। সুলতার কাছে আগাইয়া গিয়া বলিলেন, এ নিশ্চয় পাগলামি ছোটোবউ।

সুলতা মৃদুস্বরে বলিল, তা ছাড়া কী ?

কাঁচাপাকা দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা আরম্ভ করিয়া যাদব চিন্তিতভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। সুলতার কথায় যথেষ্ট আশ্বস্ত হইলেও জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তাহাকে যেন বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বাস করেন না কিন্তু এ রহস্য যেন তিনি চিনেন।

সরমা পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সুলতার সঙ্গে যাদবকে কথা কহিতে দেখিয়া তার যেন চেতনা হইল। বউকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, চিত্রা এ সব কী বলছে ছোটোবউ ? তুমি কিছু জান ?

এ বাড়ির সকলকেই সুচিত্রা পরিহার করিয়া চলে কিন্তু কী কারণে বলা কঠিন। সুলতাব সঙ্গে তার ভাব আছে। এ বাড়িতে সুলতার দুপুরগুলিই বিনিদ্র। সাতমাসের ভ্রূণের ভারে তাহার পদক্ষেপ মন্থর, কিন্তু সারাটি দুপুর সে এ-ঘর ও-ঘর করিয়া বেড়ায়। চঞ্চল সে নয়, কিন্তু চুপচাপ বসিয়া থাকিতে তরুণী বধূটির যেন দারুণ অস্বস্তি।

সুচিত্রার গোপন পরিণয়ের সংবাদ যদি কাহারও জানা থাকে, তবে সুলতার থাকাই সম্ভব। কিন্তু সুলতা কিছুই জানে না।

শাশুড়ির প্রশ্নের জবাবে সে মৃদুস্বরে বলিল, জানিনে মা। ও বাড়ির পঞ্চু ছাড়া ঠাকুরঝি তো কারও সঙ্গে কথা কয় না।

শুনিয়া সরমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। পঞ্চু ছেলেমানুষ, স্কুলে পড়ে। সরমার ছোটো ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে অত বড়োই হইত এতদিনে। সুচিত্রার বিকৃত মনে এই ভাইটির জন্য কেমন করিয়া একটা আশ্চর্য প্রখর মমতা জন্মিয়াছিল, খুব সম্ভব সেই ভালোবাসাই এখন পাশের বাড়িব গম্ভীর প্রকৃতি ছেলেটির উপর পড়িয়াছে ; পাগল মেয়েব অন্ধ উগ্র ভালোবাসা। প্রকাশটি বিচিত্র। পাঁচুব স্কুল বন্ধ থাকার দিনটির প্রতীক্ষায় সুচিত্রা ছটফট করে, অন্যদিন তার কাছে পাঁচুব বেশিক্ষণ থাকা নিষেধ, তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শিখিয়া পাঁচু মানুষ হোক সুচিত্রার এই আগ্রহ একেবারে নিষ্ঠুব। ছুটির দিন দুপুরটা পাঁচু তার কাছে থাকে। সকালে পঞ্চুর পড়া চাই, বেশ মনোযোগ দিয়া পড়া চাই, সুচিত্রাব মাথার দিব্যি।

খাওয়াদাওয়াব পব এগাবোটা কি বারোটার সময় সলজ্জভাবে পঞ্চু আসিয়া দাঁড়ানোমাত্র তাহাকে ভিতবে নিয়া গিযা সুচিত্রা ঘরে দুয়ার দেয়। পাঁচটা অবধি ছেলেটিকে লইয়া হাসিযা কাঁদিয়া সোহাগ করিয়াও তার যেন তৃপ্তি হয় না।

ভাঙা ভাঙা কথা তাহার এমনই দুর্বোধ্য, পঞ্চুকে সোহাগ করিবাব সময় তাহা এত বেশি জডাইয়া যায় যে বাহির হইতে শুনিলে মানে বুঝা যায় না। কিন্তু সুরটা এমন করুণ যে চোখে জল আনিয়া দেয়।

যাদবের বড়ো ছেলে সতীশ ম্লানমুখে সরমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সরমাকে চোখ মুছিতে দেখিয়া সে আর আত্মসংববণ করিতে পারিল না !

মিছামিছি কেন কাঁদছেন মাসিমা ? ওর কথার কী কোনো দাম আছে ?

সতীশের চোখ ছলছল করিতে লাগিল। সরমার চোখেমুখে ব্যথা আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল। সতীশের সহানুভূতি তার সহ্য হয় না। বুকের মধ্যে কেমন করে। সতীশ আবার বলিল, আপনার হার্ট দুর্বল, এ রকম অধীর হবেন না মাসিমা।

সরমা শ্বাস টানিয়া বলিলেন, আমার বুক ধড়ফড় করছে সতীশ।

সতীশ চমকাইয়া উঠিল, বুক ধড়ফড় করছে ! এরা দেখছি আপনাকে বাঁচতেই দেবে না মাসিমা। চলুন, আপনি একটু শুয়ে থাকবেন।

এইখানে একটু বসি, সতীশ।

সে হবে না মাসিমা, আপনাকে শুতে হবে ! সতীশ ঘরে ঢুকিয়া মাদুর ও বালিশ আনিয়া বিছাইয়া দিল। সরমা ম্লানভাবে একটু হাসিলেন। মমতায় ছেলেটা পাগল। ওর চোখের দিকে তাকাইতেও যেন ভয় করে।

হেমন্ত ছোটো ছেলে, সুলতার স্বামী। ঝড়ের মতো বাড়িতে ঢুকিয়া সে বলিল, ব্যাটাদের আচ্ছা করে গালাগালি দিয়ে এলাম, মামা। পাগল মেয়ে দেখতে এসে তার পাগলামি দেখে হাসবে, এ কী ইয়ার্কি নাকি ?

সুলতা ঘোমটা একটু টানিয়া দিল, লজ্জায় নয়, মুখের ভাব গোপন করিবার জন্য। সুমিত্রা হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ দাদা, রাস্তায় ভিড় জমেছিল ? গালাগালি শুনে পথের লোক প্রাণভরে খুব হেসেছিল ?

অযথা পরিমাণে হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া হেমন্ত বলিল, না, হাসবে কেন ?

সুলতা তীব্র চাপা গলায় সুমিত্রাকে বলিল, বলো না, মেজো ঠাকুরঝি, ওঁর ভঙ্গি দেখে আমাদের সকলের হাসি পাচ্ছে, পথের লোক হাসি চেপে রাখবে কোন দুঃখে।

ও বাবা, ও কথা বলি আর বুড়ো বয়সে পিট্টি খেয়ে মরি আর কি ! বলতে হয় তুমি বল। বলিয়া সুমিত্রা মুখ বাঁকাইল। সুমিত্রার বিবাহ হয় নাই। তার বিবাহ আগামী শ্রাবণে।

সুলতা মৃদুস্বরে বলিল, বলার অধিকার আমারই পুরো বটে।

যাদব আনমনে সুলতার নিকটে সরিয়া আসিয়াছিলেন। সুলতার কথাগুলি তিনি শুনিতে পাইলেন। হেমন্তকে তাঁর কিছু বলিতে সাহস হয় না, কিন্তু সুলতার ইচ্ছা তার ভীরুতার চেয়ে বড়ো। মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া হেমন্তকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন, এ দুর্বুদ্ধি তোমার মাথায় চাপল কেন হেমন্ত ? রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভদ্রলোককে গাল দেবার বয়স তোমার পার হয়ে গেছে বাপু।

এক মুহূর্তে ক্রুদ্ধ হইয়া উদ্ধতভাবে হেমন্ত জবাব দিল, তাই যদি গিয়ে থাকে আপনার উপদেশ শুনবার বয়সও বোধ হয় আমার পার হয়ে গেছে কাকা।

ও, আচ্ছা। বলিয়া যাদব মুখ ফিরাইয়া নিলেন। দেখিতে পাইলেন সুলতা অনভ্যস্ত দ্রুতপদে ঘরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিজের দাড়িকে যাদব জোরে মুচড়াইয়া দিলেন। ভাবিলেন, একালের মেয়েরা সেকালের মেয়ের মতো আছে, কিন্তু ছেলেগুলি হইয়াছে উদ্ধত, দুর্বিনীত, পাষণ্ড। ইহাদের ধরিয়া চাবকানো উচিত। ইহাদের মৃত্যু হইলে পৃথিবীর মঙ্গল।

যাদবের বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ ঘা লাগিল। সুলতার খুব শুভাকাঙ্ক্ষী তো তিনি ! দাড়ি আর তিনি মুচড়াইলেন না, হঠাৎ রাগের বশে যাহা ভাবিয়া বসিয়াছেন মনে মনে তাহারই জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

* * * * *

ও বাড়ির ছাদের কার্নিশে একটা চিল আসিয়া বসিয়াছে। পিঠ তাহার রোদে পুড়িয়া গেল, বুকে কিন্তু নিজের দেহেরই ছায়া।

এ বাড়ির ছাদে চিলে কুঠির ছায়ায় বসিয়া হেমন্ত আকাশে ঘুড়ি উড়াইতেছে। ঘরের জানালা দিয়া একটা সুদূর সাদা মেঘের গায়ে দুর্লক্ষ্য কালো বিন্দুর মতো স্বামীর ঘুড়িটা সুলতার চোখে পড়িল।

তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। আজ সে বাপের বাড়ি যাইবে, আজিকার দিনেই ছাদে গিয়া হেমন্ত ঘুড়ি উড়াইতে বসিয়াছে এ জন্য নয়, স্বামীর এই ছেলেমানুষির পরিচয়ে তাহার চিন্তা যে জীবনের সীমা পার হইয়া স্বর্গীয় পিতার নিকট উপস্থিত হইল, ইহার আতঙ্কে। এখন এ ভাবে বাবার কথা ভাবিতে আরম্ভ করিলে বিকাল পর্যন্ত তার সময় কাটিবে কী করিয়া ?

বাবাকে সুলতা বড়ো ভালোবাসিত। সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত পিতার স্নেহের মূল্যে নিজের সমস্ত জীবনটা সে বিলাইয়া দিয়াছে, গাঢ় সুমিষ্ট মধুর তলে তার যেন আকণ্ঠ সমাধি। তুলিয়া আনা সত্ত্বেও মধুপাত্রে নিমজ্জিত মক্ষিকার মতো এখনও সে মধুর বন্ধন সর্বাঙ্গে জড়াইয়া আছে। এবং তারই ফলে অনড় অচল স্থবির তাহার জীবন, অচেনা অনাত্মীয় মানুষের মধ্যে তাই একা বাঁচিয়া থাকা।

বাবাকে মনে পড়িলে এই বৃন্তচ্যুতির অনুভূতি সুলতার অসহ্য হইয়া উঠে। মনে হয়, জীবনে পাড়ি জমাইবার জন্য ছোটো একটা ডিঙিতে তাহাকে তুলিয়া দিয়া জাহাজ নিয়া পিতা তাহার চিরদিনের জন্য নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন—এ ডিঙি সামনেও আগায় না ডুবিতেও চায় না, এ পারের তীরের কাছে অল্প ঢেউয়ে টলমল করে। বাস্তবিক, জীবন এখানে এমন অগভীর যে খেয়া ডিঙি চড়ার বালিতে ঠেকিয়া গিয়াছে বলিয়াই সুলতা সন্দেহ করে।

হেমন্তর অপরাধ নাই, তার প্রকৃতিই ওই রকম। সে যেন বয়স্ক শিশু, দায়িত্বজ্ঞানহীন নির্বোধ। ওর জন্য কতদিন লজ্জায় সুলতার মাথা কাটা গিয়াছে তার হিসাব নাই। বাড়ির সকলে যখন গম্ভীর মুখে একটা গুরুতর সাংসারিক সমস্যা নিয়া আলোচনা করে পরামর্শ দিবার জন্য ও বাড়ির যাদবকে পর্যন্ত ডাকিয়া আনা হয়, মাঝে মাঝে কী অদ্ভুত হাস্যকর মন্তব্যই হেমন্ত করিয়া বসে ! সুমতি পর্যন্ত দাদার বয়সটা অগ্রাহ্য করিয়া বলে, আবোল-তাবোল কী বকছ দাদা ?

হেমন্তর রাগ আছে ষোলো আনা।

বলে, তোর কী রে বেয়াদব মেয়ে।

তখন গুরুজনের মধ্যে কেউ ভয়ে ভয়ে বলেন, আত্মীয়স্বজনেব সুখদুঃখের কথা অমনভাবে তুচ্ছ করতে নেই হেমন্ত !

বয়ে গেল।

বয়ে গেল ? বয়ে গেল কীবে ! দাদা থাকে বিদেশে, তুই তো এখন সব দেখবি শুনবি ? তোব ওপবে তো সব ভার।

কোণঠাসা হইয়া হেমন্ত একটু মুখ বাঁকায় মাত্র, কোনো জবাব দেয় না।

আড়ালে সুলতার গা রাগে রিবি করে। ছেলের মতো যাকে শাসন কবিতে ইচ্ছা হয, তাব স্বামিত্বের লজ্জা কোথায় লুকাইবে সে ভাবিয়া পায় না।

এ লজ্জা চিরদিনের। সিঁদুর যদি না মুছিয়া যায, পাকা চুলে তো এ কলঙ্ক ঢাকা পড়িবে না। শিশু তার কর্তা, শিশু তার ভর্তা, শিশুর সে অঙ্কশায়িনী।

সুলতা বাক্‌সো গোছানোর অসমাপ্ত কাজে ব্যাপৃত হইবার চেষ্টা করিল। দুখানা কাপড় গুছাইয়া রাখিতেই সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। হাত গুটাইয়া সে চুপচাপ বসিয়া রহিল।

এমনই সময় আসিয়া দাঁড়াইল পঞ্চু।

কী বলিতে গিয়া লাজুক ছেলেটি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুলতা বলিল, কী ভাই ?

আপনি আজ চলে যাবেন ?

যাব। স্কুল পালিয়ে তুমি বুঝি আমায় তাই দেখতে এলে ?

পঞ্চু অস্বীকার করিয়া বলিল, না।

না কি ভাই ?

ক্লাসে থাকতে ভালো লাগে না তাই চলে এলাম।

সুলতা খুশি হইয়া বলিল, অন্য ছেলে বলত হ্যাঁ তোমাকে দেখতে এলাম। ছেলের দল থেকে তুমি বড়ো তফাত হয়ে গিয়েছ ভাই। কিন্তু ঠাকুরঝির জন্য স্কুল কামাই করলে, আমার জন্য পার না ?

সুচিত্রার স্নেহের মর্যাদা রাখা যেন অপরাধ এমনিভাবে পঞ্চু হাসিবার চেষ্টা করিল। সুলতা সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, তোমার হাসি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, মুখে যেন জ্যোতি নেই। খেলাধুলা কর না বুঝি ? অল্প বয়সে এত বুড়ো হয়ে গেলে, বেশি বয়সে বাঁচবে কী করে পঞ্চু ?

সরমা কতকগুলি কারুকার্যখচিত কাঁথা সেলাই করিয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি ভাঁজ করিয়া ট্রাঙ্কে ভরিয়া সুলতা আবার বলিল, এই বয়সে তুমি বুড়ো হয়ে গেছ, আর বুড়ো বয়সে ও কত ছেলেমানুষ জানালা দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখ ভাই। আমি আজ চলে যাব, ঘুড়ি দিয়ে উনি তাই মেঘ শিকার করছেন।

আপনি বারণ করেন না কেন ?

বারণ কবলে কে শুনছে ?

আপনাব বারণ শোনে না !

বউ বারণ কবলে কথা শোনে না এ বকম মানুষ যে পৃথিবীতে থাকিতে পাবে পঞ্চুর এ ধারণা ছিল না। কথা না রাখিলে বউ কাঁদে, বউয়ের কান্না হেমন্ত সয় কী করিয়া ?

আপনি খুব কাঁদেন না কেন ?

ওমা কাঁদব কী জন্য ?

পঞ্চু আবও অবাক হইয়া গেল। ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝিতে পাবিতেছে না ! এমন সময় সুচিত্রাকে আসিতে দেখা গেল। সুলতা বলিল, তোমাব দিদি আসছে পঞ্চু।

ঘবে পা দিয়া কথাটা কানে যাইতেই সুচিত্রা চটিয়া উঠিল।

গেঁয়ো মেয়ের মতো কী ঠাট্টাই যে তুমি কর বউদি ! অনা ননদ হলে গালে ঠোনা মাবত। ছি ছি, ও কথা বলতে আছে ?

সুলতা ভয়ে ভয়ে বলিল, আর বলব না ঠাকুবঝি।

সুচিত্রা এ কথা শুনিতে পাইল না। হঠাৎ তার মনে একটা নূতন খেয়াল জাগিযাছে। মুখের উপর হইতে বুক্ষ চুলের রাশি সরাইয়া একাগ্রদৃষ্টিতে সে সুলতাব সিঁথির দিকে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি দেখিয়া সুলতা দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

অমন করে চেয়ে কী দেখছ ঠাকুরঝি ?

সুচিত্রাব যেন চমক ভাঙিল। লজ্জা ও বেদনার অপরূপ মুখভঙ্গি করিযা সে বলিল, আজ পর্যন্ত এ তো আমার মনেই পড়েনি বউদি ! দেখেছ মেয়েমানুষের মন ? কী লজ্জা, মাগো।

পঞ্চুকে বলিল, আমাব ঘরে গিয়ে একটু বসোগে যাও তো। আমি এখনই আসছি।

অত্যন্ত নির্বোধের মতো মুখ করিয়া পঞ্চু সরিয়া গেল।

সুলতাব পাশে বসিযা নালিশের সুরে সুচিত্রা বলিল, তুমিও তো এতদিন মনে করে দাওনি বউদি ?

কী মনে করে দিইনি ভাই !

নিজের সিঁথি নির্দেশ কবিয়া সুচিত্রা বলিল, সিঁদুর পরার কথা। দেখ দিকি, এই অমঙ্গলেব ধ্বজা উড়িয়ে, এয়োস্ত্রী মানুষ আমি সকলেব সামনে বার হয়েছি। তোমাদের কি চোখ নেই ?

সুলতা তাহার সিঁথি আবিষ্কার করিতে পারিল না, এলোমেলো চুলের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। অস্তিত্বহীন কাল্পনিক স্বামীর মতো এও যেন পাগল মেয়েটার কৌতুক।

দাও বউদি আমায় সিঁদুর পরিয়ে দাও।

আজ থাক ঠাকুরঝি, ভালো দিন দেখে পরো।

না, আজকেই দাও। হাতে নোয়া নেই, শাঁখা নেই, একটু সিঁদুরও পরব না ? এমন করলে ও আমায় ত্যাগ করবে। সাবা গায়ে এত অমঙ্গলের চিহ্ন কি কেউ সইতে পাবে ?

আগে চুল আঁচড়ে বেঁধে দিই, তারপর সিঁদুর পরবে। গা ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে সিঁদুর পরতে হয় ঠাকুরঝি।

সুলতাও যেন পাগল। কুমারী মেয়ের কপালে খানিকটা লাল গুঁড়া লাগাইতে তার আপত্তির অন্ত নাই। এ বিষয়ে তার মনে উদারভাব একান্ত অভাব। এয়োতির চিহ্ন নিয়া ছেলেখেলা সে ভালোবাসে না।

সুচিত্রা অধীর হইয়া বলিল, আমার অত সময় নেই বউদি। এখনই পরিয়ে দাও। বেশি বাহাদুরি তোমার না করলেও চলবে।

না দিয়া উপায় নাই। সুলতা সিঁদুরের কৌটা খুলিয়া আনিল। টিপ পরাইয়া দিতে গিয়া তাহার মনে হইল ইহার এই অর্থহীন খেয়ালটা সত্য ভাবিয়া না নিলে আর কোনোমতে চলিবে না। হিসাব করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় তার চেয়ে এই স্বামীহীন মেয়েটা স্বামী ভাগ্যে কম ভাগ্যবতী নয়। শূন্যকে ভালোবাসিয়া ইহার নালিশ নাই, বেদনা নাই, একেবারে মশগুল হইয়া আছে। জাগিয়া থাকার সময় নিজের স্বামীপ্রেমে নিজেই মুগ্ধ হইয়া থাকে, ঘুমাইয়া স্বামীর স্বপ্ন দেখে। এ ব্যাপারটা সুলতার বড়ো রহস্যজনক মনে হয়। পাগলের জাগ্রত অবস্থাটাই স্বপ্ন, স্বপ্নের অবস্থাটা কেমন ভাবিতেও পারা যায় না।

সিঁদুর পরিয়া সুচিত্রা সুলতাকে প্রণাম করিল। এক পা পিছাইয়া গিয়া সুলতা বলিল, বেঁচে থাকো ভাই, স্বামী সোহাগিনি হও।

দেখিতে দেখিতে সুচিত্রার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

সেই আশীর্বাদই কর বউদি। ও ত্যাগ করবে বলে আমার আজকাল এমন ভয় করে।

ত্যাগ করবে কেন ?

সুচিত্রা ভারী লজ্জা পাইল। এদিক ওদিক চাহিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, ছেলেমেয়ে হল না যে ? ও বলে নাইবা হল ছেলেমেয়ে, চাকরি করে আমি তোমায় ছেলে কিনে দেব। তাতে কিন্তু ভরসা পাই না বউদি।

সুলতার নিশ্বাস যেন আটকাইয়া আসিল।

চাকরি করে তোমায় ছেলে কিনে এনে দেবে বলেছে ?

বলেছে। কিন্তু তবু আমার ভয় করে। কেনা ছেলেকে কেউ ভালোবাসতে পারে ?

সুচিত্রা নিজের মনে মাথা চালিতে লাগিল। চোখ তুলিয়া সুলতা দেখিতে পাইল দরজার কাছে পঙ্কু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে যেন অকূলে কূল পাইল। উঠিয়া কাছে গিয়া মিনতি করিয়া বলিল, পঙ্কু ভাই, ওকে তুমি ডেকে নিয়ে যাও। ও আমাকে পাগল করে দেবে।

পঙ্কু রুক্ষস্বরে বলিল, কেন ? ও তো আপনার কোনো ক্ষতি করেনি ?

কী বলছ পঙ্কু ?

আপনার বড়ো হিংসা।

বলিয়া সুলতার উপর রাগ করিয়াই যেন কড়া সুরে পঙ্কু সুচিত্রাকে ডাকিল, এখানে বসে হচ্ছে কী ? চলে এসো।

যাই।

একান্ত অনুগতভাবে সুচিত্রা তাহার সঙ্গে চলিয়া গেল। সুলতা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হিংসাও তাহার একটু হইল বইকী। কচি লংকা চিবাইতে ঝাল যত না লাগে তেতো লাগে তার চেয়ে ঢের বেশি, পনেরো বছরের একটা অপরিপক্ক ছেলের ধমকে তার বুকের মধ্যে তেমনই অল্প অল্প জ্বালা করিতে লাগিল, সমস্ত মন তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিল। হোক না ছেলেমানুষ, পুরুষ তো বটে—কেউটের বাচ্চা। মায়ের কোলে ওরা বিষাক্ত হইয়া উঠে। নইলে তার উপরে চোখ রাঙাইবার আত্মবিস্মৃতি মুখচোরা লাজুক ছেলেটার কেমন করিয়া হইল ?

সুলতা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, বাপের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া পঞ্চুর সঙ্গে কথা বলিবে না।

ঘরে আর থাকিতে ইচ্ছা হইল না। নিজের যাত্রার আয়োজন নিজের হাতে করা যে কী কষ্টকর সুলতা এতক্ষণে তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে।

ও বাড়ি যাওয়ার জন্য সিঁড়ি দিয়া সুলতা নীচে নামিল। বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল সতীশ ও সুমিত্রা। সুমিত্রার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা ভালো নয়।

প্রথমে সুমিত্রা ভয়ানক চমকিয়া উঠিল। তারপর পরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে অকম্পিত হস্তে একটি একটি করিয়া ব্লাউজের বোতাম লাগাইল। কোনোদিকে না চাহিয়া সে উপরে চলিয়া গেল। সতীশ মাথা নীচু করিয়া বলিল, মাসিমা কেমন আছেন জানতে এসেছিলাম বউদি।

মা ভালোই আছেন।

এ কথা অবান্তর। এ প্রশ্নোত্তরের মানে আছে, সঙ্গতি নাই।

সতীশ একটু ইতস্তত করিয়া কৈফিয়ত দিল।

ছেলেবেলা আমি সুমিত্রার বুকে একটা ফোঁড়া কাটিয়ে দিয়েছিলাম। ও অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সেই দাগটা আজ আমায় দেখিয়েছিল।

কেন ?

দাগটা যেন ভুলে না যাই।

এমন ! এ কি তাহলে আপনার উচিত হচ্ছে ঠাকুরপো ?

সতীশ বিবর্ণ হইয়া বলিল, কী করব বলুন ? আমি নিবুপায়। আমার মনেব কী যেন একটা অসুখ আছে বউদি। সুমিত্রাকে মেয়ের মতো মনে হয়।

মেয়ের মতো মনে হয় ! আপনার মাথা খারাপ নাকি ?

সতীশ অপরাধীর মতো হাসিল।

কী জানি, হওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু মেয়ে মনে করলেই সুমিত্রাকে আমি খুব সুন্দরী দেখি, আর কিছু মনে করতে গেলে, ও কদর্য কুৎসিত হয়ে যায়। ও বড়ো রোগা আর বড়ো ছেলেমানুষ।

সবাই বলে সুমিত্রার মতো সুন্দরী মেয়ে দেখা যায় না। ওর মার চেয়েও সুমিত্রা সুন্দব হয়েছে।

সতীশ একটু ভাবিয়া বলিল, আমার মনে হয় সবাই ভুল বলে বউদি। মাসিমা যখন প্রথম এখানে আসেন, আমার বয়স ছিল নয় কি দশ। সেই বয়সে আমি যে অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকতাম এখনও মনে আছে। সারাদিন ওর আশেপাশে ঘুরতাম।

সুলতা বলিল, তা সত্যি। মাকে এখনও জগদ্ধাত্রীর মতো দেখায়। মোটা হয়ে পড়েছেন নইলে—

সতীশ বাধা দিয়া বলিল, ওইটুকু মোটা না হলে ওকে মানাত না বউদি।

তা হয়তো মানাত না, কিন্তু বয়স আন্দাজে সুমিত্রা তো রোগা নয়। দিব্যি ছিপছিপে গড়ন।

সতীশ হাসিয়া বলিল, ননদ কিনা, ওর সবই আপনার ভালো লাগে। কীরকম হাবলা দেখলেন তো ? বারবার বললাম, দাগের কথা আমার মনে আছে সুমিত্রা, দেখাবার কোনো দরকার নেই, কথা শুনল না। বলিয়া সতীশ গম্ভীর হইয়া গেল, ওষ্ঠের প্রান্ত ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, বাপের জন্য সুমিত্রা দেখতে খারাপ হয়েছে।

তিনি বুঝি দেখতে ভালো ছিলেন না ?

সতীশ সজোরে মাথা নাড়িল, বিশ্রী। নাক বোঁচা, চোখ ছোটো, রং কালো—দেখে আমার হাসি পেত। আফিস থেকে এলে কেন যে ছুটে কাছে যেতেন ভেবে আমি অবাক হয়ে যেতাম। একদিন কি মজা হয়েছিল শুনুন—

বিবর্ণ মুখে সুলতা শুনিল। হেমন্তের সঙ্গে সতীশ উঠানে ক্রিকেট খেলিতেছিল। আপিস ফেরত হেমন্তের বাবা বারান্দায় বসিয়া জিরাইতেছিলেন, তাহাকে বাতাস করিতেছিলেন সরমা। হঠাৎ বল লাগিয়া হেমন্তের বাবার ঠোঁট কাটিয়া একেবারে রক্তারক্তি ব্যাপার।

রুদ্ধ নিশ্বাসে সুলতা জিজ্ঞাসা করিল, ইচ্ছে করে মেরেছিলেন নাকি ?

সতীশ উদাসভাবে বলিল, কি জানি, মনে নেই। কিন্তু মরে যাবেন ভয়ে সারাদিন বুকের মধ্যে কেমন করেছিল, বেশ মনে আছে।

ভয়ে ?

প্রশ্ন শুনিয়া সতীশ চটিয়া উঠিল, তবে কি ? কী বলতে চান শুনি ? ভয়ে নয়তো কীসে বুক কেঁপেছিল ?

আমি কিছুই বলতে চাই না, ঠাকুরপো।

সতীশ কথঞ্চিৎ ঠান্ডা হইয়া বলিল, মাসিমা সে জন্য আমায় কিন্তু শাস্তি দিতে ছাড়েননি, কান মলে দিয়েছিলেন। মনে পড়লে এখনও সে জন্য কান লাল হয়ে ওঠে : মাসিমার উপর অভিমান করতে ইচ্ছা হয়।

সুলতা আব দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। যে সব কথা তাহাব মনে হইতে লাগিল, সতীশের সামনে দাঁড়াইয়া ভাবিতে গেলে যে মূর্ছিতা হইয়া পড়িবে।

দ্রুতপদে সে উঠান পার হইয়া গেল।

মনোরমার কাছে পৌঁছিবার পূর্বে দেখা হইল যাদবের সঙ্গে।

সুলতার কুঞ্চিত ভ্রূ-দুটি সরল হইয়া উঠিল, মুখের ক্লিষ্টভাব মিলাইয়া গেল ! তার মনে হইল, আজ সারাদিন সকল কাজের ফাঁকে সকল দুশ্চিন্তাব আড়ালে ইহার সঙ্গই সে কামনা করিয়াছে। যে শূন্যতা সারাদিন তাহাকে আজ পীড়ন করিয়াছে, ইহার সহিত কথা কহিবাব সুযোগ পাওযামাত্র তাহা ভরাট হইয়া গেল।

আপনার অম্বল হয়েছে শুনলাম, এখন কমেছে ?

যাদবের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় এই প্রশ্ন তাহার হাঁপ ছাড়ার মতো শোনাইল। তাহা লক্ষ না করিয়াই যাদব বলিলেন, অম্বল কমেছে। তুমি বুঝি মনোর খবর নিতে এলে ছোটোবউ ? ওর কান্নাও আজ কমেছে।

এ সুখবর কাকা। মনো বড়ো বেশি কাঁদত।

যাদব বলিলেন, ওটা দুর্বল মনের লক্ষণ। মনেব জোর না থাকলে আনন্দ যেমন পঙ্গু হয়, শোক দুঃখের তেমনই হয় বাড়াবাড়ি। একমাসের ছেলের মরণ ছোঁয়াচে নয়, ও যে কেঁদে কেঁদে মরতে বসেছে সে রোগ ওর নিজের। ওর মনে আত্মনির্যাতনের প্রবৃত্তি আছে, মবণের প্রেবণা আছে। ছেলে মরার উপলক্ষটা ও কামনা করেছিল কি না কে জানে।

মেয়ের মর্মান্তিক বেদনা সম্বন্ধে যাদবের এই ভয়ানক মন্তব্যে সুলতা প্রীতিবোধ করিল। মেয়েব কান্নাকাটিতে যাদবের বিরক্তি যেন তারই ব্যক্তিগত লাভ। তবু অবিশ্বাসের ভান করিয়া মৃদু হাসির সঙ্গে সে বলিল, কী যে বলেন তার ঠিক নেই। অমন কামনা কেউ করে ?

করে না ? তুমি কিছুই জান না ছোটোবউ। যাদব একপ্রকার অদ্ভুত হাসি হাসিলেন। মনে হইল, তাহার বাক্-সংযম আজ একেবারেই মুছিয়া গিয়াছে। জীবনের সর্বাপেক্ষা নিভৃত সর্বাপেক্ষা বীভৎস, সত্যের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া তরুণী বধূটিকে তিনি আজ ভীতা করিয়া তুলিতে চান।

বলিলেন, জীবনের এদিকটা তোমার কাছে অন্ধকার ছোটোবউ । বৈধব্যের রোমান্সের জন্য সব মেয়েই যে মনে মনে স্বামীর মৃত্যু কামনা করে এটা বিশ্বাস করা তোমার পক্ষে কঠিন।

সুলতার অভিজ্ঞতা কম নয়। চোখ নামাইয়া সংক্ষেপে সে শুধু বলিল, কঠিন নয়, বোধ হয় কষ্টকর।

তার চোখ দিয়া দু ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। যাদব তাহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার আঙুলগুলি কাঁপিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ তিনি কাঁচাপাকা দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

দেখিয়া সুলতার মনে হইল আত্মসংযমের এই অতুলনীয় প্রসঙ্গের সঙ্গে তার যেন জন্মজন্মান্তরের পরিচয়। একটা অবাস্তব কল্পনায় নিজের জীবনকে রূপকের রূপ দিয়া যাদবের পায়ে বিদায়ের প্রণামটা এখনই সারিয়া নিবার জন্য তার মন উন্মুখ হইয়া উঠিল। আকাশগঙ্গার মতো শূন্য বাহিয়া ঝরিতে ঝরিতে এমনই একটি প্রাচীন মহাকালের জটায় একটি সুদীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন বিশ্রামের কয়েক মুহূর্তব্যাপী সংক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র অভিনয়।

যাদব বলিলেন, মনোর সঙ্গে দেখা করে এসো। আমি আমার ঘরে রইলাম।

মনোরমার সংবাদ কিছুই অসাধারণ নয়। কাঁদিতে গিয়া আজ চোখ এত জ্বালা করিয়াছে যে বারবার কলের জলে চোখ ধুইয়া সে চুপচাপ বিছানায় বসিয়াছিল।

কয়েকদিনের শোকেই শীর্ণ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক সুরে কথা বলিবার চেষ্টা আজই বোধ হয় তাহার প্রথম।

বুকটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ভাই। এত জল খেয়েছি তা বলবার নয় তবু তেষ্টা মিটছে না। এমন ঘুমেও ধরেছে আজ, সারাদিন কেবল ঢুলেছি।

সুলতা সায় দিয়া বলিল, শরীরের ওপরে অত্যাচার তো কম হয়নি।

না, তা হয়নি। মনোরমা একটা রঙিন উলের টুপি হাতে তুলিযা নিল। উদাসভাবে বলিল, কিন্তু তা ছাড়া আমার বাঁচবার উপায় ছিল না ভাই। বুক ফেটে মরে যেতাম। খোকা তো শুধু আমার ছেলে হয়ে আসেনি ; ওর মধ্যে আমি বন্ধু পেয়েছিলাম, সাথী পেয়েছিলাম, প্রেমিক পেয়েছিলাম ! বিয়ের পর উনি যেমন নিরাশ্রয় প্রেম নিয়ে ভয়ে বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন তেমনইভাবে তাকাতে শিখেছিল। খোকা কাঁদলে আমার মনে হত আমাকে জয় করবার চেষ্টায় উনি আবার মুখর হয়ে উঠেছেন। খোকার হাত গালে ঠেকলে ওঁর প্রথম দিনের স্পর্শ আমাব মনে পড়ে যেত, রোমাঞ্চ হয়ে আমার সমস্ত শরীর ঘুমিয়ে পড়ত ভাই।

সুলতা নীরবে শুনিয়া গেল। তাহার মনে হইল এমনি ভাবেই সকলে নিজের আনন্দ ও বেদনাকে স্বতন্ত্র ও মৌলিক মনে করিয়া থাকে বটে। সে ছাড়া আর কোনো নারী যে কোনোকালে সন্তানকে স্বামীর প্রতিনিধি করিয়া ভালোবাসার অরাজক রাজ্যে শৃঙ্খলা আনিবার চেষ্টা করিয়াছে মনোরমা তাহা ভাবিতেও পারে না।

প্রথম পুত্রের মৃত্যু যে স্বামীপুত্র দুজনকে একসঙ্গে হারানোর মতো অসহ্য পৃথিবীতে মনোরমাই তাহা প্রথম জানিল।

শোকদুঃখের আগাগোড়ায় এ বেদনা তাই চিরস্থায়ী। ত্রিশ বছর পরে স্বামীর যৌবনকালের ফটো দেখিয়া মনোরমাব মনের ভিতর হুহু করিয়া উঠিবে, মনে হইবে, এমনই মুখ, এমনই অতুল অতৃপ্ত হাসি নিয়া যে আজ তাহার নিজস্ব হইয়া থাকিত, সে গেল কোথায় ?

পুত্রবধূর মধ্যে পুনর্জন্ম নিতে সে কেন পারিল না, হায় ভগবান !

সুলতার চমক ভাঙিল। বালিশে মুখ গুঁজিয়া মনোরমা আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যাদবের কাছে শেষ বিদায় নেওয়া হয় না। এ কান্নার ছোঁয়াচ মনে লাগাতে সুলতা সাহস পাইল না। এক পা এক পা করিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যাদব বলিলেন, কাল থেকে দুর্ভাবনা শুরু হবে ছোটোবউ।

আমি চলে যাব বলে ?

যাদব বিচলিতভাবে বলিলেন, আমাব বাড়ি যদি তোমার বাড়ি হত ! তিন কাল অশান্তিতে কাটল, শেষের এই মহাকালটাও কি আমার তেমনই অশান্তিতে কাটবে ? জীবনে একবার জট পাকালে আর ইতি নেই, ক্ষমা নেই।

শেষবেলায় আজ জোর বাতাস উঠিয়াছে। যাদবের দাড়িতে চাঞ্চল্য দেখা দেয়, একটা ক্যালেন্ডার পাখির পাখার মতো দেওয়ালে ঝাপটা মারে। সুলতার চোখ মিটমিট করিতে থাকে। যাদবের কোলে ন্যাকড়া জড়ানো যে ঝাপসা শিশুটি হাত-পা নাড়িয়া খেলা করে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে আশঙ্কায় সুলতা ভালো করিয়া তাকাইতে পারে না।

যাদব আবার বলিলেন, বাপের বাড়ি যেতে তোমাব খুব ইচ্ছা করে ছোটোবউ ?

খুব ! একটুও করে না।

বাপ নাই, বাপের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা তার হইবে কেন ? না গিয়া উপায় নাই তাই যাওয়া। সবমা আর তাহাকে এখানে রাখিবেন না। এ সময়ে এ বয়সে নাকি স্বামীব কাছে থাকিতে নাই।

তবে তোমায় একটা জিনিস দেখাই বাছা।—বলিযা পকেট হইতে যাদব ছোটো একটি ফটো বাহিব কবিয়া সুলতার হাতে দিলেন।

এখানে ওখানে পোকায় কাটিয়া দিয়াছে, লম্বালম্বি পাশাপাশি অজস্র আঁচড় পডিযাছে, কিন্তু এ যে একটি তরুণী বধূর ফটো তাহা সহজেই বুঝিতে পাবা যায়।

সুলতা ভালো করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইযা দেখিল। সাড়ে তিন হাত মানুষকে তিন ইঞ্চি করিয়া ফেলা হইয়াছে, ম্লান আলোছায়াব সামঞ্জস্যেই রক্তমাংসের পরিচয়, তবু সুলতাব দৃষ্টি ভাবী হইয়া উঠিল, এলোমেলো নিশ্বাস পড়িল।

আমার প্রথম স্ত্রীব ছবি ছোটোবউ। মববাব কয়েক মাস আগে নিজেই তুলেছিলাম ভালো ওঠেনি।

আপনার দু বিয়ে !

যাদব হাসিলেন।

মনোর মা জানেন ?

জানেন বইকী ! খুব ভালো করেই জানেন।

সুলতা বুকের মধ্যে কেমন ভার বোধ করিতেছিল ! চাপা গলায সে বলিল, খুব ভালো করে জানেন কেন ?

হ্যাঁ। শান্তি বেঁচে থাকলে আজ মনোর মার চেয়ে বুড়ো হয়ে যেত, কিন্তু মরে গিয়ে সে আমার মনে নতুন বউ হয়েই বেঁচে আছে। একি মনোর মা টেব পায় না বাছা ! এই সেদিন আমায় কবিত্ব করে বলছিল, মরে যাওয়ার পব মানুষের বয়স আর বাড়ে না এ বড়ো আশ্চর্য গো, এ বড়ো অন্যায়।

সুলতা সন্দিগ্ধভাবে বলিল, কবিত্ব করে নয়।

না। তাহলে নিজের কথায় নিজেই ও আঁতকে উঠত। তেইশ বছরের অভিজ্ঞতা।

যাদব খানিকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। সুলতার মনে হইল, কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ির আড়ালে ঠোঁট দুটি কাঁপিতেছে।

একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা তাহার মাথার মধ্যে দপদপ করিতে লাগিল। পাশে গিয়া বসা যায় না ? দাঁড়ি ফাঁক করিয়া দেখা যায় না ঠোঁট দুটি কাঁপিতেছে কি না ? প্রাচীন যন্ত্রে আত্মার বাণী এমন ক্ষীণ মুমূর্ষু কেন ভাবিয়া সুলতার কান্না আসিবার উপক্রম হইল।

যাদব বলিলেন, মনোর মার সংসারের বাইরে আমার স্থান ছোটোবউ। শান্তির সঙ্গে সুখদুঃখের সম্পর্ক যেখানে শেষ হয়েছিল সেইখানে। মনোর মা আমার নাগাল পায় না। আমি তেইশ বছর পিছিয়ে পড়েছি। ওর কি সহজ দুঃখ জীবনে !

সুলতা তাহা জানে। মাসের পর মাস কাটিয়া যায়, দিনে যে কতবার এ বাড়িতে আসে ঠিক নাই, কিন্তু মনোর মার দেখা মেলে কদাচিৎ। নিজের সংসারের কোনখানে যে তিনি নিজেকে গোপন করিয়া রাখেন খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়।

একশো আট রুদ্রাক্ষের মালা নিয়া তিনি কেবল জপই করেন সারাদিন—একান্তে।

একশো সাতটি রুদ্রাক্ষের পর প্রথমটি আবার ফিরিয়া আসে, গ্রহে গ্রহে পা দিয়া সমস্ত বিশ্ব ঘুরিয়া আসিয়া তিনি বোধ হয় বিশ্বদেবতাকেই প্রণাম করেন। সহজ বিশ্বদেবতা নন, সেই আদিম প্রেমিক, পৃথিবী যখন মাটির ঢেলা, মানুষ যখন খেলার পুতুল, তখন যে সহস্রশীর্ষ বিরাট পুরুষকেই একমাত্র ভালোবাসিতে পারা যায়।

সুলতার মুখের বিবর্ণতা নিরীক্ষণ করিয়া যাদব বলিলেন, বিদায় নিতে এসেছিলে সে কথা তোমার বোধ হয় স্মরণ নেই ছোটোবউ। নির্বোধের মতো মুখ করিয়া সুলতা বলিল, না ভুলে গিয়াছিলাম। কিন্তু বেলা আর নেই। শাশুড়ি হয়তো ওদিকে রাগ করবেন।

সুলতা নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। দরজার কাছে পৌঁছিলে পিছন হইতে যাদব বলিলেন, সাবধানে থেকো ছোটোবউ, শরীরের যত্ন নিয়ো।

বলিয়া ঘনঘন দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

বারান্দায় পা দিয়া সুলতা দেখিতে পাইল রুদ্রাক্ষের মালা হাতে মনোর মা চিত্রার্পিতের ন্যায় একপাশে দাঁড়াইয়া আছেন। ঈষৎ স্থূল দেহে গরদের সজ্জা, চওড়া করিয়া সিঁদুর পরিতে পরিতে সিঁথি রক্তাক্ত টাকের মতো প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সুলতা তাহাকে প্রণাম করিল।

আঙুলের ডগায় তাহার চিবুকের স্পর্শ আনিয়া চুম্বন করিয়া মনোর মা বলিলেন, ব্যাটা কোলে ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো মা।

সকলে ভিড় করিয়া বিদায় দেয়।

পঙ্কু মড়ার মতো হাসে, সুচিত্রা সকলের পিছনে আড়াল খুঁজিয়া নেয়। সরমার মুখের দিকে চাহিয়া সতীশের চোখে পলক পড়ে না। সুমিত্রা উদাসভাবে পথের গ্যাসের আলোটার দিকে চাহিয়া থাকে। হেমন্ত সকলের অগোচরে কী একটা ইশারা করে, লজ্জার ভান করিয়া সুলতা মুখ ফিরাইয়া নেয়। ওঠানামার সময় সাবধানতা অবলম্বনের জন্য যাদব সুলতার দাদাকে নানাবিধ উপদেশ দেন। গাড়িতে বসিয়া সুলতা অনুপস্থিত মনোরমা ও তাহার মার কথা ভাবে।

গুপ্তধন

বর্ষাকালে তো বটেই, বছরের অন্যসময়েও কুল্পী নদীর মেজাজ কুল্পী বরফের প্রধান গুণবাচক শব্দটার ঠিক বিপরীত বিশেষণের অধিকারী। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে একটা শাখা নদী মজিয়া যাওযার পর একা একা সমস্ত জলস্রোতকে বহিতে হওয়ায় নদীটা এ রকম গোঁয়ার হইয়া উঠিয়াছিল। হরিখালি এবং তার আশেপাশের কয়েকটা গ্রামও বড়ো নিচু, তাই, মাইল পাঁচেক লম্বা, শহরেব সদর রাস্তাব মতো চওড়া এবং একতলা বাড়ির সমান উঁচু একটা বাঁধ দিয়া এখানে কুল্পী নদীকে ঠেকাইয়া বাখা হইয়াছে। বর্ষাকালে বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলে বিস্ময় জাগে। এদিকে ভবানদীব ছোটোবড়ো ঢেউ বাঁধের গায়ে আছড়াইয়া পড়িতেছে, ওদিকে এলোমেলোভাবে ছড়ানো পড়িয়া আছে গ্রামের গাছপালা বাড়িঘর, মাঝখানে দুদিকে দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রসারিত প্রকাণ্ড একটা মেটে সাপের মতো আঁকাবাঁকা নদীর বাঁধ। পূর্ণিমা অমাবস্যায় নদীতে সমুদ্রের জোয়ার আসিবার দৃশ্যটি সবচেয়ে অপরূপ। হাত তিনেক উঁচু ফেনিল জলস্রোতকে ছুটিয়া আসিতে দেখিলে চোখে পলক ফেলা যায় না, প্রকৃতির প্রতি মনে সভয় শ্রদ্ধার আবির্ভাব ঘটে।

ভীমের চোখে কিন্তু দৃশ্যটি দেখিযা পলক পড়িত বেশিবেশি, দুচোখ তার মিটমিট করিত এবং মনে মনে সভয় শ্রদ্ধার বদলে দেখা দিত একটা হালকা ছেলেমানুষি আনন্দ।

এইরকম খাপছাড়া লোক ছিল হরিখালিবাসী ভীম।

বেঁটে শীর্ণকায় অকালবৃদ্ধ গোবেচারি ভীমের সঙ্গে গ্রামের কারও যেন বনিবনা হইত না, সকলেই অল্পবিস্তর ভয় করিয়া চলিত তাকে। মানুষকে ঠকাইতে সে ছিল ওস্তাদ। মানুষকে ঠকানো অবশ্য তার ব্যাবসা ছিল না, জীবিকা সে অর্জন করিত ন্যায়সঙ্গত ভদ্র উপায়ে কিন্তু নিজের সম্বন্ধে মানুষের মনে অসংখ্য ভুল ধারণার জন্ম দেওয়া, তার কাছে কেউ কিছু লাভের আশা করিলে তাকে হতাশ করা, কেউ ঠকাইতে আসিলে তাকে একেবারে ঘোল খাওয়াইয়া ছাড়া প্রভৃতি কতকগুলি ভাবী বিশ্রী স্বভাব ভীমের ছিল। তার চেহারা দেখিয়া কে কল্পনা করিতে পারিত, লাঠিখেলার কৌশলগুলি সে এত ভালো আয়ত্ত করিয়াছে যে মাথায় আসল লাঠিয়ালের মতো বাবরি চুল রাখিবার অধিকাব তার ছিল। গোরু-ছাগলের দুধ বেচিয়া ভীম কোথায় এত টাকা পাইত যাতে গোয়ালাপাড়ার অনেকখানি তফাতে কিছু ফাঁকা জমির মধ্যে এগারোটি পলাশগাছের আড়ালে সুন্দর একটি গৃহে প্রায় ভদ্রলোকের মতোই স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে পরম সুখে বাস করিতে পারিত, তাও গ্রামের লোক ভাবিয়া পাইত না। ছোটোলোকের মতো সে অজস্র সুখ উপভোগ করিলে কারও কিছু ভাবিবার ছিল না, কিন্তু ভদ্রলোকের মতো সুখ পাইতে তো পয়সা লাগে। সেটা আকাশ হইতে আসে না। তারপর ভীমের ব্যবহার। ছোট্ট মেনি বাঁদরের মতো তার মুখ খিঁচানোর স্বভাবের জন্য সকলের গা জ্বালা কবিত। সকলের সঙ্গে ভীম যে সব সময় হালকা হাসিতামাশা আর ছেলেমানুষি কৌতুক করিয়া চোখ মিটমিট করিতে করিতে ফিকফিক করিয়া হাসিত সেটাকে সকলে মনে করিত নিছক বাঁদরামি। ঘরে ঘরে এত অভাব অভিযোগ, লোকের মনে এত দুঃখকষ্ট আর সে কিনা এ রকম ইয়ার্কি ফাজলামি করিয়া দিন কাটাইবে ! নিজের ঘরে সে যা খুশি করুক, লোকের সঙ্গে তামাশা করা কেন ? তাও অমন সব কৌশলময় মজাদার তামাশা !

মেজোকর্তার মাথা ফাটানোর তামাশার মধ্যে কিন্তু কিছু কৌশল থাকিলেও মজা বেশি ছিল না। ভীম যে কেন মেজোকর্তার মাথা ফাটাইয়াছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে মেজোকর্তার

হুকুমে ভীমের ছটা গোরুকে সাতবার খোঁয়াড়ে দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া, কেউ বলে ভীমের বড়ো মেয়ে, তিনপুকুরের কেষ্টর সঙ্গে যার বিবাহ হওয়ায় গাঁ-সুদ্ধ লোক চটিয়া গিয়াছে, মেজোকর্তা তার মানহানি করিয়াছিলেন বলিয়া। শেষেরটাই সম্ভবত সত্য, কারণ ভীমের বড়ো মেয়ে আসিতে না বলিলে রাতদুপুরে মেজোকর্তা তার বাড়ির পিছনে পলাশগাছের কুঞ্জবনে অভিসারে আসিয়া তাকে যে মাথা ফাটানোর সঙ্গত কারণ ও সুযোগ সরবরাহ করিতেন তা সম্ভব মনে হয় না। তা ছাড়া, নিজের মাথাটা কেউ ফাটাইয়া দিলে সে বিষয়ে প্রকাশ্যভাবে চুপচাপ থাকার মতো মানুষও মেজোকর্তা নন।

তবে মেজোকর্তার যে মাথাটা ভীম ফাটাইয়া দিয়াছিল সেটাতে যথেষ্ট বুদ্ধি না থাকিলেও তার টাকা ছিল অনেক এবং মানুষের আনুগত্য গ্রামের জমিদারেরই থাকে বেশি। তাই একদিন রাত্রে বাবুদের বাড়ি মস্ত একটা ডাকাতি হইয়া যাওয়ার পর ভীমকে আট বছরের জন্য জেলে যাইতে হইয়াছিল। ডাকাতির কথাটা মিথ্যা নয়। একজন খুন, তিনজন ভয়ানক জখম আর নগদে গয়নায় প্রায় তেইশ হাজার টাকা লুট,—এ ব্যাপারগুলি সত্যসত্যই ঘটিয়াছিল। ভীম যে নিজে ডাকাতি করিতে যায় নাই এটা গ্রামের অনেকে বিশ্বাস করিত, এখনও করে। তবে ডাকাতির সঙ্গে তার অন্যভাবে যোগ ছিল কি না এ বিষয়ে কেউ নিঃসন্দেহ নয়। ভীমের পক্ষে কিছু অসম্ভব হওয়া যে অসম্ভব—লোকে এখনও এ বিশ্বাস পোষণ করে। মেজোকর্তার বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও ভীমের শাস্তি কিন্তু অন্য ডাকাতের কয়েকজনের তুলনায় হইয়াছিল খুব কম। তারা কুড়ি বছরের জন্য দ্বীপান্তরে গেল, ভীম এবং আরও তিনজন ডাকাত মোটে আট বছরের জন্য বাস করিতে গেল দেশেরই নানা জেলে। আট বছরের মধ্যে আবাব পুরা একটা বছর মাপ করিয়া সাত বছর পরেই তারা ভীমকে দিল ছাড়িয়া !

ভাদ্রমাসের এক দুপুরবেলা ভীম ফিরিয়া আসিল গ্রামে। ভীমকে দেখিয়া গ্রামের লোক যেমন আশ্চর্য হইয়া গেল, নিজের বাড়ি ও বাড়ির পিছনের এগারোটি পলাশ গাছ একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে দেখিয়া ভীম তার চেয়ে কম আশ্চর্য হইল না। স্থানটিতে সৃষ্টি হইয়াছে একটি সমতল মাঠের, বাঁশের তৈরি দু জোড়া গোলপোস্ট দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় এখানে এখন ফুটবল খেলা হয় !

চারিদিকে খাঁ খাঁ করিতেছিল ভাদ্রমাসের রোদ। তৃষ্ণা মেটানোর জন্য কাছের একটা পুকুরে যাওয়ায় হাঁদার সঙ্গে ভীমের দেখা হইয়া গেল। হাঁদা তার ভাইপো, কুড়ি-বাইশ বছর বয়স, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল : অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া একটি মেয়ের বাপ হওয়ার পর হইতে বয়স্ক লোকের মতো গম্ভীর ভারিক্কি চালে চলিতে এবং মাছ ধরিতে ভালোবাসে। পুকুরের ঘাট জুড়িয়া মস্ত একটা আমগাছের ছায়া পড়িয়াছিল, পুকুরে ছিপ ফেলিয়া হাঁদা সেই ছায়ায় বসিয়া টানিতেছিল বিড়ি। সাত বছর দেখাসাক্ষাৎ না থাকিলেও পরস্পরকে তারা তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল। জেলে সাত বছর ভীমের চুল আধ ইঞ্চির বেশি বাড়িতে পায় নাই। হাঁদার তুলনায় নিজের প্রায় ন্যাড়া মাথাটায় সলজ্জভাবে হাত বুলাইয়া ভীম বলিল, কীরে হাঁদা !

হাঁদা ভারিক্কি চাল চালিতে ভুলিয়া গিয়া উত্তেজিতভাবে বলিল, কাকা ! কবে ছাড়ান পেলে কাকা ?

ভীম বলিল, পরশু তরশু হবে কে জানে ! তুই তো মস্ত হয়ে গেছিস হাঁদা, গোঁপ গজিয়েছে তোর !

অজানাকে জানিবার ভয়ে আপনজনেদের সম্বন্ধে হাঁদাকে হঠাৎ সে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না, হাঁদার গোঁফ গজানোর জন্য প্রথমটা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া থাকিবার সুযোগ পাইয়া সে একটু শান্তি বোধ করিল। হাঁদার সমবয়সি একটি ছেলে সে রাখিয়া গিয়াছিল, কে জানে সেও এ রকম ঝাঁকড়া চুল রাখিয়াছে কিনা, তারও এ রকম গজাইয়াছে কিনা গোঁফ।

তবে এতকাল পরে গ্রামে ফিরিয়া আত্মীয়পরিজনের সংবাদ জানিবার কৌতূহল শুধু কাল্পনিক ভয়ে বেশিক্ষণ ঠেকাইয়া রাখা চলিবে না। প্রথমে ছেলেটার কথাই ভীম জিজ্ঞাসা করিল। না হাঁদার মতো সে গোঁফ গজানোর সুযোগ পায় নাই, ভীম জেলে যাওয়ার কয়েক মাস পরেই স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। মনটা ভীমের যেন মোচড় খাইয়া গেল। কিছু দুঃসংবাদ শুনিতে হইবে এ আশঙ্কা ভীমের ছিল। তবে প্রথমেই এ ধরনের সংবাদ সে প্রত্যাশা করে নাই। হৃদয়টা পুত্রশোকে গোঁয়ার হইয়া যাওয়ায় বাকি দুঃসংবাদগুলি শুনিবার আতঙ্ক কিন্তু আর তার রহিল না।

একে একে হাঁদা সব সংবাদই দিল। ভীমের বউ আর ছোটো ছেলেমেয়ে দুটি বাঁচিয়াই আছে, তবে ওদের মধ্যে প্রথম দুজন যে বর্তমানে কোথায় আছে হাঁদা ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না। অবশ্য দুজায়গায় যে ওরা আছে তাতে হাঁদার কোনো সন্দেহ নাই। হয় তিনপুকুরে বড়ো জামাই কেষ্টর কাছে, নয় কালীতলায় ছোটো জামাই নবীনের কাছে। হ্যাঁ, কালীতলার বুড়া নবীনের সঙ্গেই ভীমের ছোটো মেয়ে রাণীর বিবাহ হইয়াছে।

ভীম জিজ্ঞাসা করিল, এ বিয়ে দিল কে ?

হাঁদা হাঁদার মতো বলিল, বাবা। বাবুরা চালা কেটে তুলে দেওয়ায় খুড়িমা তখন আমাদের বাড়িতে ছিল কিনা—

নবীন তোর বাপকে কত টাকা পণ দিয়েছিল রে ?

তা জানি না কাকা।

তোরা থাকতে তোব খুড়ি জামাইবাড়ি গিয়ে আছে কেন তা তো জানিস বাবা ?

ভীমের গলার আওয়াজে ঝাঁজের খোঁজ পাওয়া যায় না, তবু যে তার কথাগুলি ঝাঁজালো মনে হয়, সেটা সম্ভবত চারিদিকের রোদের ঝাঁজের জন্য। হাঁদার বয়স হইয়াছে, অন্যায়টা সে এখন বুঝিতে পারে। তবে বাপদাদার অন্যায় বলিয়া পুরাপুরি পারে না। গম্ভীর মুখে কৈফিয়ত দেওয়ার মতো করিয়া হাঁদা বলিল, গাঁ সুদ্ধু লোক শত্তুরতা জুড়ল কি না, তাই দুঃখ কষ্ট সইতে না পেরে—

ভীম বলিল, দুঃখকষ্ট হবার তো কথা ছিল না বাবা ! গাঁ-সুদ্ধু লোক শত্তুর হল, আপনজনও তো ছিল গাঁয়ে।

একবার জবাব দিতে না পারিয়া হাঁদা মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া ঝাঁকড়া চুলগুলি পিছনে হটাইয়া দিল।

তারপর ভীমকে হাঁদা তাদের বাড়ি নিয়া গেল। ক্ষুধায় ভীমের শরীর অস্থির করিতেছিল। শোক দুঃখ যদি বা সে কোনো রকমে সহিতে পারে ক্ষুধার জ্বালা একেবারেই পারে না। বুড়া নবীনের কাছে যে তার মেয়েকে বিসর্জন দিয়াছে, বিপদের দিনে যে তার স্ত্রীপুত্রের দিকে ফিরিয়াও তাকায় নাই, ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়াই পেট ভরানোর উদ্দেশ্যে তার বাড়িতে যাওয়া ভীম ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব হইত কিনা ভগবান জানেন। হাঁদা দই-চিড়ার ফলারের ব্যবস্থা করিয়া দিলে সে পরম তৃপ্তির সঙ্গেই তাহা ভক্ষণ করিল। মান অভিমান ঘৃণা ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যেন মনের অন্য মনোভাবের রাহাজানির অপরাধে মনের অমানুষিকতার জেলখানায় বাস করিতে গিয়াছে। এ বাড়িতে বিশ্রাম করিতেও সে প্রস্তুত ছিল কিন্তু ইতিপূর্বে বাড়ির কর্তা ফিরিয়া জেলফেরত একটা ডাকাতকে বাড়িতে ডাকিয়া আনার জন্য হাঁদাকে এমন গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল যে, চাঁচের বেড়ার আড়ালে দাঁড়াইয়া কথাগুলি খানিকক্ষণ শুনিবার পর ভীম আস্তে আস্তে এক পা এক পা করিয়া নামিয়া গেল পথে।

পথে চলিতে চলিতে নানা লোকের সঙ্গে দেখা হইতে লাগিল। কেহ কথা বলিল, কেহ বলিল না ; যে বলিল তার কথাগুলিও যে মিষ্টি শোনাইল তা বলা চলে না। এমনিই ভীমকে একদিন যারা পছন্দ করিত না, আজ জেলের ছাপ-মারা সেই ভীমকে তারা খাতির করিবে এ রকম প্রত্যাশা করাই

অন্যায়। ভীমের মুখ দেখিয়া মনে হইল না অন্যায়টা সে করিয়াছে। এতসব বড়ো বড়ো আশা আকাঙ্ক্ষা তার সাত বছরে লোপ পাইয়া গিয়াছে যে হরিখালিবাসী কোনো গৃহস্থের খাতির ও সমাদর পাওয়ার মতো তুচ্ছ প্রত্যাশাকে মনে পোষণ করিবার ধৈর্যও হয়তো তার ছিল না। হাঁটিতে হাঁটিতে ভীম গ্রামের প্রান্তভাগে গোস্বামীদের আমবাগানের একপাশে বাগদিপাড়ায় আসিয়া হাজির হইল। এখন অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছে, রোদের আর সে রকম তেজ নাই। বাগদিপাড়ার সমস্ত স্ত্রীপুরুষেরাই বোধ হয় একটা খোলা চালার তলে জমা হইয়া হইচই করিতেছিল ; ঠিক চালার তলে নয়, যত লোক একত্র হইয়াছে তার সিকি অংশেরও বোধ হয় চালার নীচে গোবর-লেপা নিচু ভিটাটুকুতে স্থান সঙ্কুলান হইবে না। কোনো একটা উৎসবের জের চলিতেছে তফাতে দাঁড়াইয়াই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিবাহাদি কিছু ঘটিয়া থাকিবে। তাড়ি গেলা যে কবে, অথবা আজ হইতে কখন আরম্ভ হইয়াছিল অনুমান করা অসম্ভব, তবে ইতিমধ্যেই ফলাফলটা ভালোভাবেই ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখানে ওখানে নোংরা অকথ্যভাষায় শুরু হইয়াছে ঝগড়া, দু-একজন চিত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে, দু-একটি স্ত্রীলোকের দিকে তাকানো চলে না। খানিক দূরে দাঁড়াইয়া ভীম অনেকক্ষণ খাপছাড়া দৃশ্যটার দিকে চাহিয়া রহিল।

এই অস্পৃশ্য ছোটোজাতের পাড়ায় সে উদ্দেশ্যহীনভাবে আসিয়া পড়ে নাই, এখানে একদিন তার একটি আকর্ষণ ছিল, নিয়মিত যাতায়াতও ছিল। আকর্ষণটির কুটিরে আসিয়া বসিবার অধিকার পাওয়ার জন্য একদিন অবিকল এইরকম একটি উৎসবের খরচাও দিতে হইয়াছিল তাকে। জীবনে প্রথম সেদিন সে চাখিয়া দেখিয়াছিল তাড়ি ! কত খাপছাড়া শখই যে তখন ছিল ভীমের। এগারোটি পলাশগাছের আশ্রয়স্থিত তার ভদ্র ও নীতিসঙ্গত জীবনযাপনের গৃহটির মতো এখানকার অবৈধ জীবনযাপনের সেই কুটিরটিও নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে দেখিয়া ভীমের চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল। এ আঘাতটা যেন তার হৃদয়ের ব্যথা বোধ করা অংশটুকুর সবচেয়ে দুর্বল দিকটাতে ঘা দিয়াছে—যেখানে ঘা লাগিলে অনায়াসে একটুখানি কান্না আসে। কুকী নাম ছিল সেই লম্বা ছিপছিপে কালো ও নোংরা বাগদি মেয়েটার এবং তার জন্য ভীমের এত বেশি স্নেহ ছিল যে জেলে তার সাত বছরের নারী-সংক্রান্ত কল্পনাগুলির জন্য কদাচিৎ দ্বিতীয় একটি কেন্দ্রের প্রয়োজন হইয়াছে।

ভিড়ের ভিতর হইতে একজন টলিতে টলিতে উঠিয়া আসিতেছিল। কাছে আসিলে ভীম তাকে চিনিতে পারিল। হরিখালির প্রসিদ্ধ চোর মধু। সাত বছরে মধু নিজের ছ্যাঁচড়া চোরের উপযুক্ত রোগা চেহারাটা বদলাইয়া সেকেলে ডাকাতের মতো ভীষণ জোয়ান হইয়া না উঠিলে কাছে আসিবার আগেই ভীম তাকে চিনিতে পারিত।

চিনিতে পারিয়া মধু সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বলিল, পেরনাম বাবুমশায়। লটা পয়সা দিবান্ ?

বাগদিপাড়ার লোকেরা সাধারণত বাবুমশায় বলে না, বলে কর্তা। কুকী কী জন্য তাকে বাবুমশায় বলিত বলা যায় না। সম্বোধনটা তারপর পাড়ার সকলের মধ্যে ছড়াইয়া গিয়াছিল। ভীম বলিল, দেবরে মধু, নিশ্চয় দেব। এখন তো সঙ্গে পয়সা নেই, রাত্তির বেলা ফের যখন আসব তখন দেব। কুকী কোথায় আছে জানিস মধু ?

মধু উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চালার তলে ভিড়ের দিকে একটা হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া বলিল, উই হোথায়।—তারপর সেই হাতটাই নিজের বুকে ঠুকিয়া দিয়া গদগদ কণ্ঠে যোগ দিল, কুকী এখন মোর বাবুমশায়, বেন্দাকে পুলিশে লিয়ে গেছে।

বলিতে বলিতে মধুর মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল, সন্দিগ্ধ চোখে চাহিয়া সে বলিল, কুকীর খপর লিচ্ছ যে ? ওসব মতলব কোরোনি বাবুমশায়, আমি লিয়েছি কুকীকে বেন্দাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে, কুকীর দিকে যদি নজর দিবে ত—

ভীম শান্তভাবে, বলিল, তুই খেপেছিস নাকি মধু ? কাল নয়তো পরশু আমি গাঁ ছেড়ে চলে যাব, আর আসব না। কুকীর জন্য আমার কীসের মাথাব্যথা রে, আঁ ? একটা কাজে এসেছি গাঁয়ে, কাজটা হলেই বাস্ আর একদণ্ড গাঁয়ে রইব না। আর শোন বলি মধু, কাজটা যদি হয় তোদের সবাইকার লাভ হবে, অনেক টাকা পাবি তোরা।

কী কাজ বাবুমশায় ?

রাত্তিরে এসে বলব মধু, এখন নয়, সবাইকে বেশি তাড়ি গিলতে বারণ করিস, তুই নিজেও গিলিস না আর, এক-একজন দশ-কুড়ি বারো-কুড়ি টাকা পাবি, কিন্তু আমার কথা না শুনলে সব ফসকে যাবে তা বলে রাখছি বাপু। কাল যত পারিস, আজ রাতে নয়।

দশ-কুড়ি বারো-কুড়ি টাকা দিবে ! কী কাজ বলে যাও বাবু—এই বাবুমশায় শুনে যাও, পায় ধরি তোমার—

গ্রামের আধা-ভদ্র আধা-অভদ্র গৃহস্থ ভীমের জন্য বাগদিপাড়ার সকলে যেমন ভয় ও শ্রদ্ধা পোষণ করিত, অতিরিক্ত মেলামেশার জন্য নিজেদের মধ্যে তেমনই সহজভাবেই তাকে গ্রহণ করিত ! প্রয়োজনের সময় তাকে মানিয়া চলিত সকলেই, আবার আড্ডা দেওয়ার সময় প্রায় সাঙাতের মতোই সকলের মধ্যে সে মিশিয়া যাইত। গ্রামের কারও জন্য ভীমের এতটুকু মাথাব্যথা ছিল না, কিন্তু বিপদে-আপদে এই অস্পৃশ্য ছোটোলোকগুলির সে অনেক উপকার করিয়াছে—বোধ হয় কুকীর জন্য যে কোনো ব্যাপারেই হোক, তার কূটবুদ্ধির সাহায্য পাইলে বাগদিপাড়ায় সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে চিরদিন।

সাত বছরে স্মৃতি হয়তো মধুর ঝাপসা হইয়া আসিয়াছিল, তবু একেবারে ভুলিয়া যাওয়ার মতো মানুষ ভীম নয়। ভীমের মুখে টাকার কথা শুনিয়া মধুর চমক লাগিয়া গেল, ব্যাপারটা ভালো করিয়া বুঝিবার জন্য সে মুখে মুখেই কতবার যে পায়ে ধরিল ভীমের তার সীমা নাই।

ভীম কিন্তু শুধু বলিল, রাতে ঘুরে এসে বলব মধু, সবাই থাকিস এখানে। তাড়ি খাস না আর।

তাড়ির নেশায় আধা বিভ্রান্ত মধু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, ভীম সরু পথটি ধরিয়া জোরে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। এক এক ধরনের পাগলামি থাকে মানুষের সোজা কথায় লোকে যাকে বলে ছিট আর শুদ্ধ ভাষায় বলে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—যা স্থায়ী কিন্তু অস্থায়ী নেশার চেয়ে জোরালো। পথ চলিতে চলিতে আপন মনে ভীমের মেনি বাঁদরের মতো মুখ খিঁচানো দেখিলে, একদিন তার বাঁদরামিতে গাঁয়ের যত লোক বিরক্ত হইত তারা সকলে আজ অবাক হইয়া যাইত। ভীমের খাপছাড়া মনটাতে বড়ো যন্ত্রণা হইতেছিল। মানুষটা আসলে সে ছিল খুব সরল, কেবল জীবনটাকে সে জিলাপির চেয়েও বাঁকা বলিয়া জানিত বলিয়া হরদম ও রকম বাঁকা ব্যবহার করিত, খাপছাড়া স্বভাবের পরিচয় দিয়া গাঁ-সুদ্ধ লোককে বিরক্ত করিয়া তুলিত। জেলে সে জীবনের আরও কয়েকটা অতিরিক্ত প্যাঁচের সন্ধান পাইয়াছে। ফলে আরও গভীরতর ও সম্পূর্ণতর বিকাশ হইয়াছে তার প্রকৃতির। এখন সে একা একা নিজের মনে, দর্শক না থাকিলেও, অতুলনীয় কৃতিত্বের সঙ্গে মুখ ভ্যাংচাইতে পারে।

গ্রামের কয়েকটি মাত্র পাকাবাড়ির মধ্যে বাবুদের বাড়িটিই প্রকাণ্ড—তিন-তিনটা মহাল আছে বাড়িটার। মুখ ভ্যাংচানোর সাধ মিটিয়া গেলে গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে নদীর ধারে বাঁধটার উপর কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে পাক খাইয়া সূর্যাস্তের সময় ভীম বাবুদের বাড়ির সদর মহলের সামনের বাগানটিতে প্রবেশ করিল। বাগানে একটি কাঁঠালি চাঁপার গাছের তলে আরাম কেদারায় কাত হইয়া মেজোকর্তা আরাম করিতেছিলেন। কয়েকটি লুকানো কাঁঠালি চাঁপা সবে ফুটিবার উপক্রম করিয়াছে, তাই স্থানটিতে গাঢ় মোহকরী গন্ধ এমন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে একবার নিশ্বাস টানিয়াই আবেগে ভীমের যেন আবার একটুখানি কান্না আসিবার সম্ভাবনা দেখা দিল। মধু তাকে যেভাবে সাষ্টাঙ্গে

প্রণাম করিয়াছিল মেজোকর্তাকে তেমনিভাবে প্রণাম জানাইয়া এ ভাবটা ভীম সামলাইয়া নিল অতিকষ্টে।

মেজোকর্তা সবিস্ময়ে বলিলেন, কে ? ভীম ? কী চাস তুই ?

ভীম জোড়হাতে বলিল, বাবু, একটা নিবেদন জানাতে এসেছি, একটা ভিক্ষা চাই বাবু আপনার ঠেঁয়ে। যা হবার তা তো হল, এবার গরিবকে মাপ করে দিন। আমি হলাম গিয়ে আপনার ছিচরণের দাস। আপনি বিরাগ হলে কি আমার রেহাই আছে বাবু ? একটা উপকার করে দিন কত্তা যাতে গাঁয়ে একটা ঘরটর বেঁধে—

মেজোকর্তা সিধা হইয়া বসিয়া বলিলেন, তোর তো স্পর্ধা কম নয় ভীম ! তুই আমার কাছে এসেছিস এ সব কথা বলতে !

ভীম কাতর কণ্ঠে বলিল, আমি বাবুর চাকর।

মেজোকর্তা তখন একটা হাঁক দিলেন। দুজন চাকর আসিয়া দাঁড়াইতে মেজোকর্তা বলিলেন, এ হারামজাদাকে ঘাড় ধরে বের করে দে তো। ব্যাটা আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে এসেছে।—কাল যদি তোকে গ্রামে দেখতে পাই ভীম, জুতো মারতে মারতে গ্রাম থেকে দূর করে দেব। পাজি, ডাকাত, হারামজাদা !

ভীম চলিয়া গেলে আরাম কেদারায় কাত হইয়া মাথায় চুলের নীচে লুকোনো একটা ফাটার উঁচু চিহ্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে মেজোকর্তা লুকানো কাঁঠালি চাঁপা ফুলগুলির গাঢ় গন্ধ মেশানো বাতাস নিশ্বাসে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস যে তিনি কেন ফেলিলেন, সেটা ঠিক বোঝা যায় না।

আজ তিথি ছিল দশমী। ভীম যখন বাগদিপাড়ায় ফিরিয়া আসিল তখন চাঁদ উঠিয়াছে কিন্তু ছাড়া ছাড়া মেঘের জন্য ভালো করিয়া জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়িতে পারিতেছে না। কয়েকটা মশাল জ্বালিয়া তখনও সকলে চালার নীচে উৎসব করিতেছিল। শুধু যে কয়েকটি স্ত্রীলোকের দিকে অপরাহ্নবেলায় তাকানো চলিত না, তারা চলিয়া গিয়াছে। ভীম আশা করিতেছিল কুকীকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু মধু সম্ভবত তাকেও সরাইয়া দিয়াছে।

মধুকে বিশেষভাবে বলিয়া গেলেও তাড়ি গিলিয়া দু-চারজনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ভীম মনে মনে আপশোশ করিতে লাগিল। তবে একটা সান্ত্বনার কথা এই যে পাড়ার বুড়া মোড়ল বিষ্টুও নেশায় চিত হইয়া চোখ বুজিয়াছে। বিষ্টুর সম্বন্ধেই ভীমের একটু ভাবনা ছিল,—লোকটা বড়ো চালাক বিষ্টু, বড়ো খুঁতখুঁতে তার প্রকৃতি। যে কথা আজ সে সকলকে বলিবে, যে কাজ সকলকে দিয়া করাইয়া নিবে, বুড়া তার মধ্যে হয়তো ভয়ভাবনার অনেক কিছুই আবিষ্কার করিয়া সকলকে দমাইয়া দিত। নেশায় যারা কাবু হইয়া পড়িয়াছিল, তাদের বাদ দিয়া জোয়ান লোকগুলিকে গুনিয়া দেখিতে পাইল সর্বসমেত সাতাশজন আছে, দু-চারজন সবলদেহা স্ত্রীলোকও পাওয়া যাইতে পারে। বাগদি মেয়েরা পুরুষের কাজ করিতে অপটু নয়।

একটা চাটাই পাতিয়া ভীমকে বসিতে দেওয়া হইয়াছিল। দশ-কুড়ি, বারো-কুড়ি টাকার ইঙ্গিতটা মধু বোধ হয় ইতিমধ্যেই প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল, ঔৎসুক্য, সন্দেহ ও আশায় বিচলিত গরিব ছোটোলোক নারীপুরুষগুলি ভীমের চারিদিকে ঘেরিয়া আসিল।

ভীম বলিল, কেউ গোলমাল করবে না, যা বলব শুনবে নয়তো সব ফসকে যাবে কিন্তু, গাঁয়ের লোক টের পেলে বিপদ হবে। সবাই চুপ, শব্দটি নয়—বাবুদের বাড়ি ডাকাতি করার জন্য সাত বছর জেলে ছিলাম জানিস তো সবাই ? বেশ, এখন কথা হল, গাঁয়ে আবার আমি ফিরে এলাম কী জন্য ? আমার ঘরবাড়ি গেছে, জমিজমা গোরু বাছুর গেছে, ছেলে বউ কেউ গাঁয়ে নেই, গাঁ-সুদ্ধ লোক পিছনে লেগেছে, গাঁয়ে আমি ফুরতি করতে আসিনি বাবু হাঁ !

মধু বলিতে গেল, বাবুমশায়—

ভীম বলিল, তুই থাম মধু। যত গয়না টাকা লুট করেছিলাম আমরা, সব গাঁয়ের এক জাগায় পুঁতে রেখেছিলাম। সবাই তো ধরা পড়ে জেলে গেলাম, কে আর গয়না টাকাগুলো নিতে আসবে ? সব এখনও সেথায় পোঁতা আছে। সবায়েব আগে আমি ছাড়া পেলাম। আজ রাত্তিরে সব খুঁড়ে নিয়ে সরে পড়ব। কিন্তু কী মুশকিল হয়েছে জানিস মধু, সবাই মিলে মস্ত গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রেখেছিলাম। আমি দুব্বোল মানুষ, একলা খুঁড়ে বার করতে পারব না। আর কী জানিস ঠিক যেখানে সব পোঁতা হয়েছিল, একটা চিহ্ন ছিল সেখানে, সে চিহ্ন হারিয়ে গিয়েছে।

মধু ব্যাকুলভাবে বলিল, তবে ? তবে কী হবে বাবুমশায় ?

ভীম শান্তভাবে বলিল, কী আবাব হবে ? চিহ্ন না থাক, জায়গাটা তো চিনি। খানিকটা জায়গা বেশি খুঁড়তে হবে, এই মাত্তর। নয়তো তোদের ডাকব কেন বে ? তোদের এতগুনো মানুষকে দশ-কুড়ি করে টাকা দিতে আমার কতগুনো টাকা যাবে বল তো ? সাধ করে কেউ তা দেয় ? কিন্তু কী করব, আজ রাত্তিরে খুঁড়ে তোলা চাই সব, কাল আরও তিনজনে ছাড়া পাবে।

বিপিন নামে একজন বলিল, দশ কুড়ি লয় বাবুমশায়, বাবো কুড়ি বলেছ।

ভীম বলিল, আচ্ছা আচ্ছা তাই দেব—বাবো কুড়িই দেব। আগে খুঁড়েই বাব কর তো বাক্সোটা। সব যদি পাইরে আমি, তোদেব বারো কুড়ি করে টাকা দিতে মবব না। কোদাল ফোদাল যা আছে যার ঘবে সব খুঁজে পেতে নিয়ে আয় সবাই, একটু রাত্তির হলে সেথায় নিয়ে যাব। কারও কাছে কথাটি ফাঁস কোরোনি কিন্তু বাবু কেউ, তা হলে সব্বোনাশ হবে।

মধু কাছে আসিয়া ফিসফিস করিয়া অনুযোগ কবিল, এত লোককে কেন বললে বাবুমশায় ? বেছে বেছে কজনকে বললে হত।

ভীম বলিল, অনেক লোক চাই মধু, দু-চারজনের কম্মো নয়। রাতারাতি কত খুঁড়তে হবে তুই কী বুঝবি।

পুলিশের কথা তুলিয়া দু-একজন একটু খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। ভীম তাদের অভয় দিয়া বলিল, কীসের পুলিশ ? জেল খেটে আসিনি আমি ও গয়না টাকার জন্য ? ও সব এখন আমার সম্পত্তি। কিছু ভয় নেই বাবু তোদেব—বিপদ ঘটে তো আমার ঘটবে, তোদেব কী ?

একে একে কোদাল খন্তা শাবল প্রভৃতি মাটি খুঁড়িবাব যন্ত্র আসিয়া হাজির হইতে লাগিল। একজন, নেশাটা তার একটু জোরালো হইয়াছিল, ঘাড়ে করিয়া একটা লাঙল পর্যন্ত নিয়া আসিল। টাকার পরিমাণের কথা ভাবিয়া সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল, সকলকে শান্ত কবিয়া রাখিতেই ভীমের বেগ পাইতে হইল বেশি। ক্রমে ক্রমে সবচেয়ে সন্দেহপ্রবণ ভীবু লোকটিরও ভীমেব উপব বিশ্বাস জন্মিতেছিল। টাকা ও গয়না পুঁতিয়া বাখার কথাটাতে আশ্চর্যেব কী আছে ? ডাকাতি হইয়াছিল সত্য, গয়না ও টাকাগুলি কোনো এক জায়গাতে ডাকাতেরা লুকাইয়া রাখিয়াছিল বইকী—সব ডাকাতেই তাই করে। তারপর ধরা পড়িয়া ডাকাতেরা যে জেলে গিয়াছিল, ভীম যে সাত বছর জেলে কাটাইয়া ছাড়া পাওয়া মাত্র গ্রামে ছুটিয়া আসিয়াছে, তা মিথ্যা নয়। সন্দেহ করার কী আছে তবে ? আজ রাতারাতি সব তারা বড়োলোক হইয়া যাইবে।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল, চাঁদটা আকাশের অনেকখানি উঁচুতে উঠিয়া কিছুক্ষণেব জন্য চারিদিক জ্যোৎস্নায় ঢাকিয়া দিল, তারপর মেঘ উঠিয়া নামিল বৃষ্টি। ভীম বলিল, চ মধু, এবার আমরা যাই।

বিষ্টির মধ্যে ?

তাই তো ভালো, কেউ দেখতে পাবে না যাবার সময়।

কারও দেখিতে পাওয়ার সম্ভাবনা বৃষ্টি না নামিলেও খুব বেশি ছিল না। গ্রামের প্রান্তে নদীর কাছাকাছি বাগদিপাড়া, সন্ধ্যার পরেই অঞ্চল নির্জন হইয়া আসে। খুঁড়িবার যন্ত্রপাতি কাঁধে করিয়া

সাতাশজন পুরুষ ও পাঁচটি মাঝবয়সি স্ত্রীলোক কিছু পিছনে চলিতে লাগিল, আগে আগে নদীর দিকে হাঁটিতে হাঁটিতে বৃষ্টিতে ভেজা সত্ত্বেও ভীমের মনটা খুশি হইয়া উঠিল। এর নাম সর্দারি। এমনিভাবে দল বাঁধিয়া এক একটা মানুষ সংসারে বড়ো বড়ো কাজ করে। সে কোথায় নিয়া চলিয়াছে সকলকে এই বর্ষা বাদলের মধ্যে ? তার নিজের কাজের জন্য ! তার অনেক দিনের স্বপ্ন সফল করার জন্য ! আত্মপ্রসাদের অন্যমনস্কতায় জোরে জোরে পা ফেলিয়া হাঁটিতে গিয়া পিছল পথে ভীম একবার একটা আছাড় খাইল। তা হোক। জল মাটির সঙ্গে আজ তার পিরিতির সীমা নাই। বত্রিশজন মানুষ মিলিয়া আজ যে মাটি খুঁড়িয়া তুলিবে, মুঠা ভরিয়া সে মাটি তুলিয়া নিজের মুখে মাখিতেও ভীমের আজ আপত্তি থাকিবে না।

নদীর ধারে বাঁধের উপর উঠিয়া ভীম বাঁধ ধরিয়াই সোজা দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিল। কিছুদূর আগাইয়া বাঁয়ে দেখা দিল খেত, তারপর ছোটোখাটো একটা জঙ্গল। আধা জঙ্গল আধা বাগান এটা, আম কাঁটাল পলাশ পিপুল বাবলা প্রভৃতি গাছগুলি বিশৃঙ্খলভাবে গজাইয়া উঠিয়া বাঁধের গা পর্যন্ত ঘেঁষিয়া আসিয়াছে, বড়ো বড়ো গাছের ফাঁকগুলিতে শুধু জঙ্গুলে-চারা ঠাসা। আরও খানিকটা আগাইয়া ভীম থামিয়া গেল। এখন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশেব মেঘ পাতলা হইয়া আসায় একটা অপার্থিব মৃদু সাদাটে আলোয় চারিদিক অস্পষ্টভাবে নজরে পড়িতেছে। সকলের আগে ভীম সাবধানে সঙ্গের নরনারীদের গুনিয়া দেখিল, তারপর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলিল, একজন কমল কেন রে ? কে পিছনে পড়ে রইল ?

জবাব দিল মধু, বলিল, কুকী এসেনি বাবুমশায়, রাস্তায় পড়ে আছে।

কুকী আসছিল নাকি ? আমি দেখিনি তো !

দেখেছ বাবুমশায়, দেখেছ। খন্তা লিয়ে মোটামতো মেয়েলোকটা আসছিল না, সে তো কুকী।

মধু নাকি অনেক বারণ করিয়াছিল কিন্তু কুকী কথা শোনে নাই, প্রাণপণে তাড়ি গিলিয়াছিল। তারপর আসিতে আসিতে ধপাস। নাড়া দিয়া হুঁশ নাই দেখিয়া রাস্তার ধারে গাছতলার দিকে ঠেলিয়া দিয়া মধু চলিযা আসিয়াছে।

বিষ্টিতে হুঁশ হলে ঘরকে ফিরে যাবে বাবুমশায়।

সে জন্য ভীম ভাবে না, সে শুধু অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল যে কুকীকে সে চিনিতে পারিল না কেন ? খন্তাধারিণী মোটা স্ত্রীলোকটির দিকে তো কতবার তার চোখ পড়িয়াছিল ! চিনিতে পাবিলে কুকীর সঙ্গে দু-চারটা কথা বলিত ভীম। কিন্তু কুকীও কেন তাকে চিনিতে পারে নাই ? তার তো চিনিতে কোনো বাধা ছিল না ! মধুর ভয়ে কি কুকী তার সামনে আগাইয়া আসে নাই, তার সাত বছরের দুর্দশার জন্য বিনাইয়া বিনাইয়া একটু সহানুভূতি জানাইবার চেষ্টা করে নাই, নিজে সে এতকাল কত কষ্ট পাইয়াছে সে কাহিনি বলিবার সাধ দমন করিয়াছে। মেজোকর্তার সম্মুখ হইতে ভীম অনায়াসে বিষণ্নমুখে উঠিয়া আসিতে পারিয়াছিল, এখন কিন্তু মধুকে তার মুখ ভ্যাংচাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। অন্তরটা গভীরভাবে নাড়া খাইলে ভীমের মুখের চামড়াই সকলের আগে বিদ্রোহ করে।

বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভীমের দলটির প্রচণ্ড উৎসাহ ও উত্তেজনা মাঝখানে একটু দমিয়া গিয়াছিল, এইখানেই আশেপাশে কোথাও টাকা ও গয়নাগুলি পোঁতা আছে বুঝিতে পারিয়া এবং তাড়ির নেশায় আজ সকলেরই বুঝিতে পারার প্রক্রিয়াটা একটু কমবেশি বিশেষভাবে সম্পন্ন হইতে থাকায়, সকলে আবার মহোৎসাহে কলরব জুড়িয়া দিল।

ভীম বলিল, চুপ, চুপ ! একদম চুপ সবাই।

সকলেই আজ ভীমের একান্ত বাধ্য ও অনুগত। মুহূর্তে সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেল। বাঁধের গা ঘেঁষিয়া, পরস্পরের প্রায় ত্রিশ হাত তফাতে দুটি পিপুলগাছ আকাশে মাথা তুলিয়াছিল। সেই গাছ দুটি দেখাইয়া দিয়া ভীম সকলকে বুঝাইয়া বলিল যে এই দুটি গাছের মাঝখানে বাঁধের কোনো এক

স্থানে তাদের প্রার্থিত গয়না ও টাকা পোঁতা আছে। ঠিক কোনখানে পোঁতা আছে ভীম তা বলিতে পারিবে না, পুঁতিবার সময় তাড়াতাড়ি ছোটো একটা পাথর জায়গাটার উপরে চিহ্নস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছিল, পাথরটা যে কোথায় গিয়াছে ! কেউ হয়তো সবাইয়া নিয়া গিয়াছে। না, কেউ মাটি খুঁড়িয়া আগেই সব তুলিয়া নিয়া গিয়াছে কারও এ ভয় করাব কাবণ নাই। কে জানিত যে পাথরটার তলে বিশ বাইশ হাজার টাকার গুপ্তধন পোঁতা আছে ? তা ছাড়া আগে এখানটা খোঁড়া হইয়া থাকিলে তার চিহ্ন থাকিত, টাকা ও গয়না অনেক নীচে পোঁতা আছে, অনেক ভিতরের দিকে। বাজে কথায় সময় নষ্ট না করিয়া সকলে বাঁধের এদিকেব ঢালুর মাঝামাঝি স্থানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিক, তারপর কোনদিকে কীভাবে কত দূর পর্যন্ত খুঁড়িয়া চলিতে হইবে, যথাসময়ে ভীম সে নির্দেশ দিবে। প্রাণপণে খাটুক সকলে, সমস্ত আলস্য ভুলিয়া যত তাড়াতাড়ি পারে খুঁড়িয়া চলুক, কেননা, আজ বাত্রির মধ্যেই যেমন করিয়া হোক লোহার বাক্সোটা তো আবিষ্কাব করা চাই।

সৈন্যদের মতো উচ্চস্তরের নিখুঁত ট্রেনিং কয়েদিরা না পাক, দল বাঁধিয়া ওয়ার্ডাবের হুকুমে ওঠাবসা চলাফেরা করার কায়দাটা তারা আয়ত্ত কবে। দুঃখের বিষয়, ভীমের দলে জেলের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কয়েদি কয়েকজন থাকিলেও সমস্ত দলটাকে পরিচালনা করিতে তাকে বেগ পাইতে হইল কম নয়। তবু যতটুকু শৃঙ্খলার সঙ্গে সকলকে সে মাটি খুঁড়িবার কাজে লাগাইয়া দিতে পারিল তাও তার সাত বছর জেলে থাকিবার ফল। নিজেকে একদল কয়েদির ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্ডাব কল্পনা করিলে ভীমেব আনন্দ হইত সন্দেহ নাই কিন্তু তার অনেক দিনের চিন্তা-পুষ্ট আরও বড়ো, আবও উদভ্রান্ত কল্পনাব কাছে এ সব কল্পনা এখন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। আকাশ আরও পবিষ্কার হইয়া আসিযাছে। জ্যোৎস্নার তেজ বাড়িযাছে। বাঁধের উপব দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ভীমেব চোখ দুটি মিটমিট করিতে লাগিল। ভীমেব চোখে আধা-বন আধা-বাগানটির মধ্যে বিশ্বেব বহস্য আসিযা আজ জমাট বাঁধিয়াছে, ভীতিকর সর্বনাশা সম্ভাবনা এবং কারণহীন আতঙ্ক সে সমস্ত মিশিযা গড়িয়া উঠিযাছে প্রত্যেকটি দূরত্বের দেবদেবী ও ভূতপ্রেত, জীবনে শুধু যাদেরই চরম কর্তৃত্ব। এদিকে নদীর জলরাশি ভাটা শুরু হওয়ার সম্ভাবনায় থমথম করিতেছে। এখন তার জল বাড়িবে না। আর কতটুকু উঠিতে পারিলে ঘোলাটে জল বাঁধটা ডিঙাইতে পারিত ? দেড় হাত ? দুহাত ? এবার জল কমিতে আরম্ভ করিবে। সমুদ্রের জলের দেবতা নদীর জল শুষিতে আরম্ভ কবিবেন। তা হোক, সে দেবতা ডাকাত নন, কৃপণ নন। শেষ রাত্রে জোয়ারের কৌশলে সমস্ত জল তিনি ফেরত পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম ইঙ্গিতে আসিবে মানুষের বুক সমান উঁচু ফেনিল সশব্দ বন্যা। ততক্ষণে ভীম তার অভ্যর্থনাব জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। বছরের পর বছর ধরিয়া যে মাটির বাঁধ নদীর এই জলরাশিকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, ঝপাঝপ শব্দে একত্রিশটি কোদাল শাবল ও খন্তা আজ ভীমেব ইঙ্গিতে ক্ষয় কবিযা চলিয়াছে তার অঙ্গ। এখানে বাঁধের ত্রিশ হাতেরও বেশি অংশ হইয়া থাকিবে কয়েক হাত চওড়া মাটির একটা পর্দা, জোয়ারেব প্রথম আবির্ভাবে সে পর্দা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। তারপর কে ঠেকাইয়া রাখিবে জোয়ারের ক্রমবর্ধনশীল নদীর দুরন্ত জলরাশিকে ? একবার একটি সংকীর্ণতম প্রবেশপথ পাইলে নদীর জল দুপাশের বাঁধ ভাঙিয়া ভাঙিয়া নিজের পথ বড়ো করিয়া নিবে নিজেই। বাঁধের এ পাশের নদী গিয়া পৌঁছিবে বাঁধের ও পাশের গ্রামে। মাঠে ঘাটে পথে, বাড়ির উঠানে, ঘবেব বোয়াকে, ঘবের মেজেতে, চৌকির বিছানায়—কে জানে আরও কত উঁচুতে উঠিবে নদীর জল ! বাবুদের বাড়ির দোতলায় পৌঁছিতে পারিবে না এই যা আপশোশ। চোখের পলকে বন্যাটা গিয়া যদি সমস্ত গ্রামকে, বিশতলা জলের নীচে তলাইয়া দিতে পারিত, যদি নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যাইত হরিখালি গ্রাম !

কুকী যদি গাছতলাতেই নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া ঘুমাইয়া থাকে, সে বোধ হয় তবে ডুবিয়া মরিয়া যাইবে। যতখানি জল পৌঁছিবে সেখানে বেহুঁশ ঘুমন্ত মানুষকে ডুবানোর পক্ষে তাই যথেষ্ট।

ভীমের মুখটা যেন হঠাৎ বিকৃত হইয়া নদীকে ভ্যাংচাইয়া উঠিল। এ মুদ্রাদোষটা বড়ো অবাধ্য।

প্যাঁক

মোটর বললে, প্যাঁক।

হাঁসও বললে, প্যাঁক।

মোটর থামিয়ে মাংস খেলাম। কেবল রান্না-কবা হাঁসের শক্ত মাংস নয়, শকুন্তলার কাঁচা নবম নিটোল—

মোটরেরেই দুটি হর্ন যেন। কিন্তু বোবা। বিধাতা কি হর্ন বাজান নিঃশব্দে ?

গাছতলায় কাঁটা-ঝোপের আড়ালে ঝরাপাতা আর মরাফুলের শয্যা—

আর লেখা গেল না। সুশান্তের নাকে গন্ধ লাগিয়াছে চিংড়ি মাছ ভাজার, মনে ধাক্কা লাগিয়াছে আকস্মিক ক্ষোভের। মোটর কোথায় ? শকুন্তলা ? কোথায় হাঁস ? রান্না করা হাঁসের শক্ত মাংস ? গাছতলা, কাঁটাঝোপ, ঝরাপাতা, মরাফুল ? মুখে একটা বিড়ি গোঁজা, হাতে একটা সস্তা কলম, তক্তপোশে একটা ময়লা চাদর, শীতেব গোড়ায় ঘর জুড়িয়া একটা বর্ষাকালের ভ্যাপসা গুমোট।

শূন্য ঘর, সেই জন্যই যেন আসলে যত ছোটো তার চেয়েও ছোটো মনে হয়।

তবু সব সহ্য হয় সুশান্তের, চোখের উপর যে পর্দা পড়িয়াছে তাতে সব আড়াল হইয়া থাকে, কিন্তু এই কলম-ধরা শীর্ণ হাতের মুঠায় হর্ন কই ?

একতলার ভাড়াটে শিবচরণের মোটা শক্ত হাতের মুঠা হর্ন বাজাইয়া বাজাইয়া ক্লান্ত। বেচারি ট্যাক্সি চালায়, অনেকদিনের পুরানো একটা ট্যাক্সি। গাড়িটা তার বউয়ের চেয়েও পুরানো, বউ তো সবে তার তৃতীয় সন্তানটির মুখে স্তন দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চিংড়ি মাছ বোধ হয় রাঁধিতেছে শিবচরণের বোন মালতী। সেই দুবেলা রান্না করে, কারণ শিবচরণের অন্ন তার দুবেলাই খাইতে হয়, এখনও স্বামী জোটে নাই। মালতীর জন্য সুশান্তের মনে একটু মমতা আছে, সে দুবেলা রান্না করে বলিয়া অথবা এখনও স্বামী জোটে নাই বলিয়া, সুশান্ত ঠিক জানে না। তবে মালতী কাঠির মতো সরু বলিয়া যে নয় তাতে সন্দেহ নাই। কাঠির মতো রোগা হোক, রোগে মেয়েটা ভোগে না। একতলাটা শিবচরণ ভাড়া নিয়াছে বছর দুই, এই দুবছরের মধ্যে মেয়েটা না পড়িয়াছে একদিনের জন্য জ্বরে, না ধরিয়াছে একদিনের জন্য তার মাথা, পুরানো মোটর হুডে আড়াল করা পিছল কলতলায় একদিনের জন্য আছাড় পর্যন্ত সে খায় নাই। মনস্তত্ত্বের খান কয়েক বই পড়িয়া মনের ভাব বিশ্লেষণ করিবার স্বাভাবিক অন্ধ ক্ষমতাটা বজ্রাহত চারার মতো মরিয়া গিয়াছে, নিজের মনে যে ভাব জাগে নিজেই তার একটা কারণ নিঃসন্দেহে আবিষ্কার করিতে সে আর পারে না, তাই শুধু অনুমান করে যে হয়তো মালতীর মুখের চিরস্থায়ী অতি মৃদু পুলকের ছাপটা তার মমতার কারণ। কিছু নাই মালতীর, তবু যেন কোনো একটা কারণে সে কিছু চায় না, আলস্যের মতো অতি জোলো একটা আনন্দ দিবারাত্রি বিনামূল্যে উপভোগ করে। কীভাবে এক চামচ চিনি সংগ্রহ করিয়াছে বেচারি, তাই দিয়া তৈরি করিয়াছে এক পুকুর শরবত, ক্রমাগত পান করিয়া যায় তবু ফুরায় না।

দামি প্যাডের উপর সস্তা কলমটা রাখিয়া সুশান্ত ঘরের সম্মুখে রোয়াকে আসিয়া দাঁড়ায়। দেড় হাত চওড়া ত্রিকোণ রোয়াকে, তিনদিকে চারখানা ঘর, একটিতে সুশান্তর মা দুবেলা রাঁধেন, স্বামীপুত্রকে ভাত বাড়িয়া দেন আর দুবেলা ভাতের হাঁড়ি চাঁছিয়া মাছের কাঁটা বাছিয়া ডাল তরকারির পাত্র পুঁছিয়া স্বামীর থালাতে জড়ো করেন, পেট নাকি তাঁর এই ভাবেই দুবেলা আকণ্ঠ ভরিয়া ফেলা সম্ভব হয়।

সুশান্তের মার এই অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শিবচরণের বউ জানে। তাই মাঝে মাঝে ঠিক এই সময়ে সহানুভূতি জানাইতে মালতীকে পাঠাইয়া দেয়। পাঠায় সে অন্য মতলবে, কিন্তু মালতীর মনে হয় কুকুর-বিড়ালের মতো থালাবাটি চাটিয়া পেট ভরানোর কৌশলটা শিখিতে পাঠাইয়াছে।

নিজেকে একই দুঃখে দুঃখী মনে করায় সহানুভূতিটা সে জানাইতে পারে আন্তরিক আর গভীর। দুচোখে জল পর্যন্ত আসিয়া পড়ে।

ওই খেয়ে কী করে বাঁচবেন মাসিমা ?

সুশান্তের মা বাঁ হাতে কপালে করাঘাত করেন।

কোনো সাধ কি মিটবে, কপাল যে পোড়া !

মালতীর সহানুভূতি আরও গভীর হইয়া আসে। বুকের ভিতর তোলপাড় করে।

কপাল না পোড়া হলে ছেলে আমার বিগড়ে যায়, তোর মতো লক্ষ্মী মেয়েকে বউ করতে পারি না ! দেবে এবার তোর দাদা তোকে কাব হাতে বিলিয়ে, আমাব শেষে জুটবে একটা অলক্ষ্মী পেত্নি। আমার অদেষ্টে সুখ নেই মালতী।

দুবেলা পেট ভরিয়া ভাত জোটার চেয়ে দরদি ছেলেব বউ থাকাটা বেশি সুখের কিনা মালতী জানে না। তার বিগড়ানো ছেলের হাতেই বোনকে দিবাব জন্য শিবচরণ যে ওত পাতিয়া আছে, সুশান্তের মাকে কোনো কৌশলে এ সংবাদটা দিতে না পারিয়া মনটা খুঁতখুঁত করে মালতীব। একটু ভাবিয়া এতক্ষণের আন্তরিক দবদের সঙ্গে আরও খানিকটা কৃত্রিম দবদ জানায়, দরদ জানানো ছাড়া আব কিছু তো তার করিবার উপায় নাই।

যা রাঁধেন সব দিয়ে দেন, নিজেব জন্যে কিচ্ছু রাখেন না। আমি হলে—

নেই বাছা নেই, অদেষ্টে আমাব সুখ নেই। ছেলেটা নইলে মানুষ হয়না ? তোকে বউ কবে এনে দুটো দিন একটু সুখের মুখ দেখতে পাই না ?

আর সকলের মতো, জীবনযাত্রার মতো, কথাও দুজনেব এক সুবে বাঁধা। এক সময়ে কেবল একটা আপশোশ থাকে, অন্য আপশোশগুলি খাজনা দিযা রাজাব মতো তাকেই কবে পুষ্ট।

চিংড়ি মাছ রাঁধছিলি তুই ?

হ্যাঁ, এই বড়ো বড়ো চিংড়ি মাসিমা, তেরোটাতে প্রায় দু সের হবে। ভাজতে গিয়ে সব তেল ফুরিয়ে গেল বলে বউ এমন বকছিল।

কত করে সের নিলে ?

কেনা নয় তো, কে যেন দাদার গাড়িতে ফেলে গিয়েছিল। কার জিনিস কে খায়।

একটু লজ্জা বোধ করে মালতী, কুড়াইয়া পাওয়া চিংড়ি মাছ, তাও সংখ্যায় তেবোটা, ভাগ দেওয়া উচিত ছিল বটে। কিন্তু সুশান্তের মা নিশ্চয় জানেন ভাগ দেওয়া না দেওয়ার মালিক সে নয়। একটু আমতা আমতা করিয়া মালতী বলে, একটা মাছ এনে দেব মাসিমা ? দিই না, অ্যাঁ ?

ভয়ে বুকের মধ্যে টিপটিপ করে। যদি রাজি হইয়া যান সুশান্তের মা, যদি সস্নেহে হাসিয়া বলেন, দিবি, আচ্ছা দে ! তারপর বউদি যদি সুশান্তর মাকেও একটা চিংড়িমাছ ভাগ দিতে রাজি না হয়, তার স্বামীর কুড়াইয়া পাওয়া চিংড়ি মাছ ? ভাগাভাগি বউদি ভালোবাসে না। সে মেয়েমানুষ বটে, কিন্তু এ বিষয়ে স্বভাবটা দুর্যোধনের মতো।

কারণ-না-জানা মমতাটুকুর জন্যই সুশান্তর বোয়াকে দাঁড়ানো। খাওয়ার সময় সুশান্তব মাকে সহানুভূতি জানাইয়া ফিরিবার সময় রোয়াকে তাকে না দেখিলে মালতী রাগ করে, এত বেশি রাগ করে যে সেদিন রাত্রে সে আর আসে না। অনেক রাত্রে ট্যাক্সি নিয়া ফিরিয়া আসিয়া বার কয়েক হর্নটা প্যাঁক প্যাঁক করিয়া শিবচরণ বাড়ির আর পাড়ার অনেকের ঘুম ভাঙায়। মালতী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেয়, ভাত বাড়িয়া দেয়, শিবচরণ শুইয়া পড়িলে নিজেও শোয়, হর্নের প্যাঁক প্যাঁক শব্দে যাদের ঘুম

ভাঙিয়াছিল তাদের মতো আবার সে ঘুমাইয়া পড়ে কিনা ভগবান জানেন, কিন্তু আর উঠিয়া আসে না। দামি প্যাডে সস্তা কলমের আঁচড় কাটিয়া মাঝে মাঝে একটা দুটা সিগারেটের মেশাল দিয়া বিড়ি টানিয়া, বারবার রোয়াকে গিয়া নীচের অন্ধকার উঠানের দিকে চাহিয়া থাকিয়া রাত্রি জাগাই সুশান্তর সার হয়। কত করিয়া মালতীকে সে বুঝায়, কত বলে যে অমন মৃদু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মালতী চলাফেরা করে, রোজ কি তার পক্ষে টের পাওয়া সম্ভব সে কখন উপরে আসিয়াছে, দু-একদিন সময়মতো রোয়াকে গিয়া না দাঁড়াইলে তার কি রাগ করা উচিত ?

মালতী বুঝিয়াও বোঝে না।

পায়ের আওয়াজ নাই বা পেলে, আমি ওপরে আসি মাসিমা যখন খেতে বসেন তখন।

মা কখন খেতে বসে জানব কী করে ?

খেয়াল রাখলেই জানা যায়। তোমাদের খাইয়ে তবে মা ফেলা-ছড়া যা থাকে নিয়ে—

আলাপ আলোচনার এদিকটা সুশান্ত এড়াইয়া যায়। গভীর ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে বলে, তুমি কিছু বোঝ না। লিখতে বসলে আমার কী কিছু খেয়াল থাকে, না খেয়াল থাকলে লেখা যায় ? নিজে যদি লিখতে তাহলে বুঝতে মানুষের গভীর মনের সুখদুঃখের রূপ দিতে হলে বিশ্বসংসারকে ভুলে যেতে হয়। তুমি বুঝবে না মালতী, বুঝবে না।

অন্য সকলের মতো, জীবনযাত্রার ক্ষোভও এক সুরে বাঁধা। ক্ষোভের জ্বালায় মাথাব মধ্যে পর্যন্ত যেন ঝিমঝিম করে, মাথা নাড়িয়া জোর দিয়া সে বলে, বুঝবে না, বুঝবে না, তুমি বুঝবে না মালতী।

মালতী অবশ্য দরদের সঙ্গেই বলে, মানুষ যা বোঝে না মানুষকে তা বোঝাবার দরকাব ? কিন্তু মালতী তো বোঝে না এক ধরনের মানুষ আছে জগতে এক ধরনের দরদের সঙ্গে এক ধরনের রূঢ় কথা বলিলে যাদের স্নায়ুগুলি ফাঁসির আসামির মতো আড়ষ্ট হইয়া যায়—মনে হয় জীবন-কাহিনির শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পৃষ্ঠা আসিয়া গিয়াছে জীবনটার মাঝামাঝি।

আসলে নিন্দা-প্রশংসার কথা নয়, বোঝা না বোঝার প্রশ্ন নয়, অন্য মানুষকে খুন করিয়া ক্রমাগত ফাঁসিকাঠে আত্মহত্যা করিতে গেলে ক্ষোভ জাগিবেই। অনাবৃত বিবর্ণ কাঠের টেবিলে দামি প্যাড পাতিয়া সস্তা কলমের সাহায্যে একটা আন্তর্জাতিক মহাযুদ্ধে যত বাছা বাছা লোক মরে তার চেয়ে বেশি লোক মারিবার ফন্দি আঁটিতে থাকিলে এ বিপদটা অবশ্যম্ভাবী। মাথায় লাঠি মারিযা এ যন্ত্রণার অবসান করিবার যদি কেউ থাকিত, ছাদটা হুড়মুড় করিয়া মাথায় ভাঙিয়া পড়িবার সম্ভাবনা যদি থাকিত, অন্তত শকুন্তলাকে পাশে নিয়া যারা গাছতলায় ঝোপের আড়ালে ঝরাপাতা আর মরা ফুলের শয্যার উদ্দেশ্যে সত্যসত্যই উধাও হইতে জানে এবং পারে তাদের মধ্যে একজনও যদি সজোরে হর্ন টিপিয়া বীভৎস প্যাঁক প্যাঁক শব্দে সতর্ক করিয়া দিতে দিতে মাডগার্ডের ধাক্কায় বিশ-পঁচিশ হাত তফাতে গাছতলায় ঝোপের আড়ালে ঝরাপাতা আর মরা ফুলের শয্যায় ছিটকাইয়া দিত, ক্ষমতা থাকিলে গালাগালি দিবার ছলে সুশান্ত তাকে আশীর্বাদ না করিয়া ছাড়িত না।

মোট কথা, মালতীর ফিরিয়া যাওয়ার সময় রোয়াকে না দাঁড়াইয়া থাকিলে মালতী আর ফিরিয়া আসে না।

সুশান্ত বাবাকে গিয়া বলে, মোটর ড্রাইভিং শিখব বাবা ?

শিবনেত্র হইয়া তামাক টানাটা অনাথবন্ধুর স্বভাব। মুখের দিকে না চাহিলে বোঝা যায় না তার গাম্ভীর্য আসলে জড়বস্তুর প্রাণহীন আলস্যের নকলনবিশি। তবু মানুষটা তো জীবন্ত, রোজ আপিস যাতায়াত করেন। তাই ছেলের প্রস্তাবে থতোমতো খাইয়া রাগিয়া উঠিতে পারেন।

যা শেখ গে মোটর ড্রাইভিং—দূর হয়ে যা।

মোটর ড্রাইভিং শিখিবে। ছোটোছেলের খেলনার মোটরের মধ্যে যেটুকু বাস্তবতা আছে তার সঙ্গে পরিচয় করিতে যার দম বন্ধ হইয়া আসিবে, সে শিখিবে মোটর ড্রাইভিং, সে করিবে মোটর হাঁকাইয়া অর্থোপার্জন। তা ছাড়া ভদ্রলোকের ছেলে অর্থোপার্জন করিয়া মোটর হাঁকায়, মোটর হাঁকাইয়া অর্থোপার্জন করে না। কষ্ট কবিয়া মোটর ড্রাইভিং শিখিবার কী দবকার, রিকশা টানুক না সুশান্ত ? একই কথা, তাতেও পয়সা আসিবে। অমন পয়সা রোজগারের মুখে আগুন !

রাগে আগুন হইয়া অনাথবন্ধু স্নান করিতে গেলেন, আপিসের বেলা তখন হয় নাই, সুশান্তর মার আপিসের রান্নাও শেষ হয় নাই। দেহে জল ঢালিলে মনের যে আগুন নিভিয়া যায়, অনাথবন্ধুর রাগটা সেই সাধারণ পর্যায়ের। স্নান করিয়া ঠান্ডা হইয়া বসিয়া ছেলেকে তিনি ডাকিলেন।

কোথায় শিখবি মোটর ড্রাইভিং ?

স্কুল আছে, মোটর ড্রাইভিং-এর সঙ্গে মেকানিকাল ট্রেনিংও দেবে, ছয় মাসের কোর্স।

অনাথবন্ধু আবার থতোমতো খাইয়া রাগিয়া উঠিলেন।

মাইনে দিয়ে শিখবি ? স্কুলে ? তোব যত সব উদ্ভট খেয়াল।

তিনমাসেবও একটা কোর্স আছে বাবা, মাইনে বেশি নয়।

না না, ওসব মোটর ড্রাইভিং শিখতে হবে না। একদিন আলু আনতে দিলে যে পাকা পটল কিনে আনে তার আবার মোটব ড্রাইভিং। মানুষ চাপা দিয়ে জেলে যাবি তো শেষে।

আজ সকালেই বাজারে আলু কিনিতে গিযা সুশান্ত পটল কিনিয়া আনিয়াছিল, পাকা শুকনো পটল। বাপের যুক্তিটা তাই অস্বীকার কবা গেল না।

তবে শিবচরণের কাছে শিখিতে বাধা নাই। মোটর চালনায় তালিম দিতে শিবচরণের আগ্রহই দেখা গেল, খুঁতখুঁত করিল সে অন্যদিকে। পথের বাস্তবতার ছাপ মারা কর্কশ মুখের চামড়া খোঁচ করিয়া, কলহ কলরবে মজবুত কণ্ঠস্বরকে ভদ্র করিবার চেষ্টা করিয়া ভয়ে ভয়ে সে বারবার বলিতে লাগিল, চাকরি বাকরি না করিয়া এ সব কেন ?

আমি ভাবলাম শখ করে শিখতে চান, নইলে গাড়ি চালানো শিখে আপনার দবকাবটা কী দাদা, অ্যাঁ ? একি ভদ্দরলোকের কাজ, এতে কি আর পয়সা আছে ? শিবচরণ ভীত চোখে চাহিয়া থাকে, আহা রোগা দুর্বল বোনটাকে ভদ্রলোকেব হাতে দিবার কল্পনা কি তার শেষ হইযা গেল।

সুশান্ত বলে, চাকরির চেয়ে তো পয়সা বেশি আছে

কে বললে আছে, ও সব আজগুবি কথা মশাই, না জেনে অমন সব বলে। এগাবো বছুর এ লাইনে আছি, আমি জানি না ভিতরকার খবর ? উপায় থাকলে আমি তো দাদা একটা দিন গাড়ি হাঁকাতাম না। অর্ধেক খাটনির দাম উঠে না, মানুষ এ লাইনে আসে !

পরম ক্ষোভের চরম আঘাতে যে ঝোঁক চাপিয়াছে, শিবচরণের উপদেশে সেটা যাইবাব নয়। কোনোদিন সকালে কোনোদিন বিকালে শিবচরণের সঙ্গে সুশান্ত বাহির হইযা যায়, প্রথম মোটব গাড়ি চড়িবার আরামে গাড়ি চালানোব সহজ ধরাবাঁধা কৌশলগুলিও একরকম কিছুই শেখা হয় না। শিখিবার ঝোঁকটা কিন্তু সমান থাকিয়া যায়। কয়েকদিন পরেই শখটা তার মিটিয়া যাইবে, ভদ্রত্বেব স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবার জন্য আর সে আবদার ধরিবে না,—শিবচরণের এই আশাটা যেন সফল হইবে না মনে হয়।

সুশান্ত বলে, এমন কী মন্দ রোজগার ? বেশ তো আরামের কাজ।

শিবচরণ বলে, শুনুন একটা কথা বলি আপনাকে। এ সব কাজের জন্য একটু কাটখোট্টা শক্ত শরীর দরকার হয়, আপনার কি জানেন তেমন জোরালো শরীর তো নয়, মানে ভদ্রলোকের দেহ তো আপনার, এ সব কাজ আপনার পোষাবে না।

শিবচরণ অবশ্য দরদের সঙ্গেই কথাগুলি বলে, কিন্তু মালতীর মতো সেও বোঝে না এক ধরনের মানুষ আছে জগতে এক ধরনের দরদ দিয়া এক ধরনের রূঢ় কথা বলিলে যাদের স্নায়ু ফাঁসির আসামির মতো উত্তেজিত হইয়া উঠে ! আর সে উত্তেজনা কাজে না লাগায় বড়ো কষ্ট পায়।

এক মাস সুশান্ত ধৈর্য ধরিয়া খেয়ালমাফিক মোটর চালানো শেখে। মন দিয়া উৎসাহের সঙ্গে শেখে, কিন্তু এক মাসে অভিজ্ঞতা জন্মে যেন মোটে একদিনের। পথের বাস্তবতা ধুলাবালি আবর্জনার চেয়ে নোংরা, অসংখ্য মানসিক ব্যাধির বীজাণুতে বোঝাই। শিবচরণের মতো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পাকা যোদ্ধাকে সম্মুখে রাখিয়া একরকম দর্শক হিসাবেই সুশান্ত জীবনের এই প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে নামে, তবু এক মাসেই হৃদয় মন ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না—একটা আদর্শ টিকে না, একটা থিয়োরি খাটে না, একটা শখ বা সংস্কার স্থায়ী প্রশ্রয় পায় না, এ কোন জগৎ ? সেই বা এতদিন এমন কীসের আড়ালে বাস করিয়াছে যে পথে ভাড়াটে মোটরে ভাড়াটের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ানোকে বাঘভাল্লুক দৈত্যদানবের ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে অবিরাম ছুটিয়া পালানোর মতো মনে হয়। তার বাড়িতে পথের বাস্তবতা চিরদিন ছিল, এখনও আছে, পায়ে পায়ে পথেব ধুলা যেমন অন্তঃপুরে প্রবেশ কবে, তেমনিভাবে পথের বাস্তবতা মনে মনে প্রতিদিন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, পথের ধুলার মতো এই বাস্তবতাকেও তাই ঝাঁটাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা দরকার হয়, সকাল- সন্ধ্যা ঘর ঝাঁট দিলেও যেমন আনাচেকানাচে পথের ধুলা থাকিয়া যায়, শত ব্যবস্থার মধ্যেও পথেব বাস্তবতাও তেমনই আনাচেকানাচে আশ্রয় খুঁজিয়া পায়। তবে চাহিয়া না দেখিলে চোখে পড়ে না। দেখিতে না জানিলে চাহিয়া দেখা যায় না। শুধু অস্বীকার করিয়া যাওয়া চলে।

এক মাসে সুশান্ত এতখানি দার্শনিক জ্ঞান সঞ্চয় করে। প্রশস্ত রাজপথে, আঁকাবাঁকা সরু গলিতে শিবচরণের মোটর চালানোর নির্ভয় নিশ্চিন্ত নিপুণতা আজকাল তাকে বড়ো ক্ষুব্ধ করিযা তোলে, সে বুঝিতে পারে এ ভাবে এ জীবনে এমন নিখুঁত মোটর চালানো সে আয়ত্ত করিতে পারিবে না। এমন কী শিবচরণের হাতে গাড়ির হর্ন যেমন বাজে, তার হাতে কোনোদিন সেভাবে বাজিবে না। কতবার কতভাবে সুশান্ত হর্ন বাজাইয়া দেখিয়াছে, প্রত্যেকবার মনে হইয়াছে সুব কাটিয়া গেল, আওয়াজটা জমিল না।

তবে একটা যা ব্যাপার ঘটে, সুশান্ত কোনোদিন কল্পনা করিতে পারে নাই।

মালতীর মৃদু, অসহায় একটানা আনন্দের মধ্যে হঠাৎ সে যেন একদিন ঢেউয়ের আবির্ভাব অনুভব করিতে পারে। জড় পদার্থ ছাড়া যতটুকু প্রাণের অস্তিত্ব আর কিছুর মধ্যেই বোধগম্য হইবার নয়, ততটুকু পুলকের আতিশয্যও মালতীর মধ্যে অসাধারণ। হাত ধরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিযা মালতী বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, এক মাস গাড়ি চালাতে না চালাতে হাতে ফোসকা পড়ে গেল ?

সুশান্ত কৈফিয়ত দিবার ভঙ্গিতে বলে, প্রথম প্রথম—

মালতী অধীর ব্যাকুলতার সঙ্গে বলে, পড়ুক, পড়ুক, ফোসকা পড়া ভালো—সমস্ত হাতে ফোসকা পড়ুক। বলিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে থাকে : বুঝবে না, বুঝবে না, তুমি বুঝবে না।

কারণে অকারণে মোটরের হর্ন বাজাইলেই হাতে চিরদিন ফোসকা পড়ে না—পথিককে সতর্ক করার জন্য কে তবে হর্ন বাজাইত, মোটরের জন্য অন্য ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু সুশান্ত স্পষ্ট বুঝিতে পারে, শব্দের অর্থ রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। কাগজে যেভাবেই হর্ন বাজানোর কথা সে লিখুক, শকুন্তলা সঙ্গে সঙ্গে আগের মতো অভদ্রভাবে মনের মধ্যে বিচরণ করিতে ছুটিয়া আসে না। তাকে চেষ্টা

করিয়া আনিতে হয়। আনিলেও পরাশরের সত্যবতীর মতো তার জন্য কিছু কিছু কুয়াশা মনের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া রাখিতে হয়।

একমাস পরে তাই আবার একদিন সুশান্ত সস্তা কলমে কালি ভরে। দামি প্যাডের লেখা পাতাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিতে আরম্ভ করে।

মোটর বললে, প্যাঁক।

হাঁস বললে, প্যাঁক।

মোটর থামিয়ে মাংস খেলাম। হাঁসটার মাংস শক্ত, কিন্তু শকুন্তলা চমৎকার রান্না করে। মাংসের গন্ধে অদূরের গাঁ থেকে গোটা দুই কুকুর এসে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। গাছতলার কাঁটাঝোপের আড়ালে ঝরাপাতা আর মরামুকুলের শয্যায় বসে তাদের নিঃশব্দ আবেদন দেখতে দেখতে মনে হল, বিধাতা তো শুধু শকুন্তলার অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই ভাষা দেননি ! বোবা কিছু সৃষ্টি করা কি বিধাতার ক্ষমতার বাইরে ?

বিষাক্ত প্রেম

মানুষের মনের মিল তো, যখন তখন যেমন তেমন অবস্থায় যার তার সঙ্গে অনায়াসেই হতে পারে। সত্য আর সরলার মনের মিল হতেও একমাসের বেশি সময় লাগল না। অপরে যেখানে বাদ সাধে না, মাথা ঘামানোও দরকার মনে করে না, সেখানে সেই মিলন হতে মনের মিলটাই সাধারণত যথেষ্ট, যে মিলনটা মনের মিলের স্বাভাবিক পরিণতি। মনের মিলই তো প্রেম। কিন্তু সত্য আর সরলার মনের মিলের জন্য প্রয়োজনীয় মিলনটা যেন তারাই নিষ্প্রয়োজনীয় বলে বাতিল করে রেখে দিল। পরস্পরকে না দেখে তাদের মন করতে লাগল কেমন কেমন, কিন্তু তারা কেউ টের পেল না যে একসঙ্গে বসবাস করতে আরম্ভ না করে তাদের আর উপায় নেই।

ঘটনাচক্রে মনের যে তাদের মিল হয়ে গেছে, সরলার চেয়ে এ বিষয়ে সত্যই যেন হয়ে রইল বেশি উদাসীন। একেই তো লোকটা সে একটু চাপা, তার উপর তার ব্যাবসা হল চুরি—সরলার ঘরে আসাযাওয়াও সে আরম্ভ করেছে একদিন সুযোগমতো তার গয়না আর টাকা নিয়ে পালাবার মতলবে। জীবনে কোনো কিছুর অভিব্যক্তি না হওয়াটাই সত্যর পরম কাম্য। যা কিছু হবার গোপনেই হোক, জীবিকার্জন থেকে জীবনযাপন পর্যন্ত। নিজের মনটা চুরি গিয়েছে জেনে নিজেকে ধন্য মনে করবার মানুষ সত্য নয়।

অবশ্য সরলার ঘরে প্রথম রাত্রে সে এসেছিল প্রচলিত মন-চোরার বেশে। মন-চোবার বেশটা কিছুদিন আগে সংগ্রহ করেছিল এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে। বাড়িতে পর্যন্ত চোরের ভয়ে ব্যবসায়ীরা কেন অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে থাকে তারাই জানে, ব্যবসায়ীটির নিজের ঘরে সত্য সুবিধা করতে পারেনি। তার বিগড়ে যাওয়া ছেলেটার ঘর থেকে কেবল সংগ্রহ কবে এনেছিল রাত্রিচর বাবু সাজবাব সরঞ্জাম—ধুতি পাঞ্জাবি, সোনার ঘড়ি, সোনার বোতাম ইত্যাদি। একজোড়া নতুন জুতো কিন্তু তাকে কিনতে হয়েছিল। তবে জুতো কেনার পয়সাটা জুটেছিল ব্যবসায়ীর বিগড়ে যাওয়া ছেলেটারই মনিব্যাগে। কিন্তু যতই হোক, এমনিভাবে পরের মনিব্যাগ থেকে পয়সা রোজগার করাটা যখন সত্যব জীবিকার্জনের উপায়, হাতে আসা পয়সা খরচ করে দামি জুতো কিনতে হওয়ায় মনটা তার একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল বইকী। মোটামুটি বলা যায়, জামাকাপড়ের সঙ্গে মানানসই জুতো কেনার শখটাকে কাজে লাগাবার প্রয়োজনেই সে সরলার ঘাড় ভাঙবার মতলব ঠিক করেছিল। পায়ের জুতোর মৃদু মসমসানি আওয়াজ কানে এলে মনের মধ্যে কেবলই মৃদু আপশোশ আর অস্বস্তি জাগতে থাকবে, এ অবস্থার একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে মানুষ কদিন ঠিক থাকতে পারে ?

রূপ বলে সরলার কিছু নেই। এ একটা অতি বড়ো সম্পদ সরলার—অতি বড়ো আকর্ষণ। সবাই রূপসি বলবে এমন রূপ যার নেই, কয়েকজন রূপসি বলবে আর কয়েকজন কুরূপা বলবে এমন রূপও যার নেই, রূপ সম্বন্ধে কোনো একটা মতামত ঠিক করে ফেলবাব অপরিত্যাজ্য দায়িত্ব যে নারীকে দেখে কোনো পুরুষের পালন করবার প্রয়োজন হয় না, ভীরু পুরুষেরা তাকে ভারী পছন্দ করে। মেয়েমানুষ কেনা যেসব পুরুষের স্বভাব, তারা বড়ো ভীরু। সরলার গায়ে গয়না আর ঘরে আসবাব আছে তাই অনেক।

তবে গায়ের গয়না অধিকাংশই গিলটি করা, ঘরের আসবাব অধিকাংশই নিলামে কেনা। সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস। আসল সোনার গয়নাগুলি সরলা রেখেছে লুকিয়ে, গায়ে রাখার চেয়ে লুকিয়ে রাখলে গয়না যে নিরাপদ থাকে এ খবর জানা থাকায় গায়ের গিলটি করা গয়নার জন্য তার কোনো

আপশোশ নেই। আসবাবগুলি তার আদায় করা উপহার—আদায় করা উপহার যে সাধারণত সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস হয় এ খবরটাও জানা থাকায়, সেকেন্ড হ্যান্ড আসবাবের জন্যও তার কোনো আপশোশ নেই। তা ছাড়া, তিন পুরুষের একটা ভাঙা খাট আর উইয়ে ধরা আলমারিতে সাজানো স্বামীর ঘরখানার তুলনায় সাহেববাড়িব নিলামে কেনা আসবাবে সাজানো ঘরের শোভাই কি কম মনোহর ! খাটখানা সরলার নতুন—এই ঘরে মদ খেতে খেতে সাতবছর আগে যে লোকটা হার্টফেল করে মরে গিয়েছিল, তার স্নেহের দান। সরলাব স্বাধীন জীবনে সেই প্রথম স্নেহ, সেই প্রথম আসবাব। তা হোক। সাতবছরে অনেক স্মৃতি উপে যায়, কিন্তু দামি খাট পুরোনো হয় না।

এই যে সত্য আর এই যে সরলা, কিছুদিন অযাচিতভাবে তারা পরস্পরকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল যে, একজনের জন্য অপরের মনে ঘৃণা নেই, বিদ্বেষ নেই, বিতৃষ্ণা নেই, বড়ো ভালো তারা, বড়ো সরল, আনন্দের নামে হইচই করতে তাদের পটুত্ব অসাধারণ, দুজনের মধ্যে মিল যা হয়েছে তার তুলনা নেই।

তাবপর দুজনের হল মনের মিল।

কিন্তু কথাটা যতদিন মিথ্যা ছিল ততদিন বিশ্বাস করানো গিয়েছিল সহজেই, এখন কে এ কথায় বিশ্বাস করবে ? বিশ্বাস করিয়ে লাভও নেই, বিশ্বাস করবার উপাযও নেই। সোজাসুজি মুখে বলে, আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করে, বড়ো বড়ো প্রতিজ্ঞা করে দেবদেবীব নামে দিব্যি কেটে জানালেও ফল হবে সেই একই। সত্যর লুকানো গয়না আবিষ্কারের ফন্দি-ফিকির-ফাঁদের মতো সরলাকে যেমন ফাঁপরে ফেলে রেখেছে তেমনি ফাঁপরেই ফেলে রাখবে, সরলার টাকা আর উপহার আদায়ের চেষ্টা সত্যকে যেমন বিপদগ্রস্ত করে রেখেছে তেমনি বিপদগ্রস্তই করে রাখবে। মনের মিল হোক বা না হোক, কারোর জন্য সোনার মায়া বিসর্জন দেবার ক্ষমতা যে সত্যর নেই, টাকাব মায়া বিসর্জন দেবার ক্ষমতা যে সবলার নেই !

সরলা ভাবে, লোকটা যদি চোর না হত ! দাবিদাওয়া নিশ্চয় কিছু কমাতাম, আদরযত্নের পবিমাণ নিশ্চয় কিছু বাড়াতাম, বেশি বেশি সময় কাছে রাখবার নিশ্চয় খুব চেষ্টা করতাম। লক্ষ্মীছাড়া যে চোর বদমাশ।

সত্য ভাবে, ছুঁড়ি যদি ঝানু না হত ! ঘাড় ভাঙার মতলবটা নিশ্চয় বন্ধ রাখতাম, যা রোজগার করি নিশ্চয় সব এনে দিতাম, একটা বোঝাপড়া করে নিশ্চয় এখানে আস্তানা গাড়তাম। বজ্জাত যে পাকা কাবলিওয়ালি !

এইসব ভাবে আর দুজনেরই গা জ্বালা করে।

গা জ্বালা করে আর দুজনেই মনে মনে আপশোশ কবে যে, আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছি বাবা, ভাবনায় চিন্তায় দেহ গেল।

আপশোশ করে আর সত্য ভাবে, যত শিগগির সম্ভব কাজটা হাসিল করে পালাবে।

আপশোশ করে আর সরলা ভাবে, আদায়ে একটু ভাটা পড়লেই লোকটাকে তাড়াবে।

একদিন বিকাল বিকাল হাজির হয়ে সত্য বলে, কতগুলো টাকা পেয়েছি সরলি, আজ একটু ফুর্তি করা যাক, অ্যাঁ ?

সরলা খুশি হয়ে বলে, কত টাকা পেয়েছিস ? কোথায় পেলি ?

এক চোখ বুজে সত্য মুখের যে ভঙ্গি করে তার তুলনা নেই, পেলাম।

জগতে পাওয়াটাই সত্য। কী উপায়ে কোথায় কী পাওয়া গেল তার বিচার করতে বসে কেবল তার্কিক। সরলা তাই খুশিতে গদগদ হয়ে বলে, জেলে যাবি বাপু তুই একদিন।

বিপদ মাথায় করে উপার্জন করে এনে পুরুষ যখন হাতে তুলে দেয়, তখনকার মতো দুর্বল মুহূর্ত মেয়েমানুষের জীবনে আর কখন আসে ? সরলা গদগদ হয়েছে টের পেয়ে সত্যও গদগদ হয়ে বলে, যাই তো যাব জেলে, তোর জন্য যাব তো ?—বয়ে গেল !

সরলা আরও গদগদ হয়ে বলে, ইস্ !

শুনে মনটা সত্যর যেন গলে যাবে মনে হয়। বিবেককে জ্ঞান হয়ে অবধি প্রশ্রয় দেয়নি, তবু কী যেন কামড়ায়। কামড়ায় অবশ্য সেই সাপের মতো, যে সাপ কোনো অঙ্গে ছোবল দিলেই সেই অঙ্গটা হয়ে যায় অবশ।

তাই মুখখানা বিমর্ষ করে সত্য বলে, এক কাজ করি আয় আজ, একটা বড়ো বোতল এনে রেখে বায়স্কোপ দেখতে যাই চল,—ফিরে এসে ফুর্তি জমানো যাবে। ভালো করে সাজিস কিন্তু, সবাই যেন হাঁ করে চেয়ে থাকে তোর দিকে।

আশমানি রঙের শাড়িটা পরব ?

এই জটিল সমস্যার সমাধান করতে সত্যকে একটু ভাবতে হয়।

বেগুনিটা পরলে হত না ?—আচ্ছা পর, আশমানিটাই পর। বেগুনি আর আশমানি দুটোর যেটাই পরিস, এমন দেখায় তোকে মাইরি—সত্যি যেন তুই কার বউ।

ইস্ !

সত্য হাই তুলে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে বলে, গয়নাগুলো বদলাস কিন্তু—গিলটি দেখে লোকে হাসবে, আমার কিন্তু লজ্জা করবে।

এ সমস্যাটা সত্যসত্যই জটিল। সরলা কিন্তু চোখের পলকে মীমাংসা করে বলে, তুই বুঝি ভাবিস গিলটি পরে যেতে আমার লজ্জা হয় না ? যা না, টিকিট কেটে আনগে না তুই, আমি এদিকে বোতল-ফোতল আনাই, সেজেগুজে ঠিক হয়ে থাকি।

সত্য সাত বছরের নতুন খাটে চিত হয়ে শুয়ে বলে, টিকিট কাটতে যাব কি, চার আনার টিকিট তো নয়! দুজনে একবারে গিয়ে টিকিট কাটব।

কিন্তু এ ফিকিরও তার সার্থক হয় না, কখন কোন ফাঁকে সরলা আসল সোনার গয়নাগুলি গোপন স্থান থেকে বার করে আনে সত্য টেরও পায় না। মুখখানা তার গম্ভীর হয়ে যায়।

তবু, সরলভাবেই জিজ্ঞাসা করে, কখন বদলালি গয়না ?

এই তো মাত্তর।

সত্যর বিস্ময় যেন সীমা ছাড়িয়ে যায়।

এই মাত্তর !—কোথায় ছিল রে ?

আদায়-করা উপহার নিলামে-কেনা সেকেন্ড হ্যান্ড আলমারিটার দিকে সোজা আঙুল বাড়িয়ে বিনা দ্বিধায় সরলা বলে, ওই আলমারিতে, আবার কোথা ?

এমন নিশ্চিন্ত, নির্বিকার তার জবাব দেবার ভঙ্গি এবং এমন স্পষ্ট জোরালো তার জবাব যে, এক বিষয়ে সত্য নিঃসন্দেহ হতে পারে। সরলার গয়না কোনোদিন আলমারিতে লুকানো ছিল না, ভবিষ্যতেও কোনোদিন থাকবে না।

রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে ইচ্ছা হয় বলে সত্য দাঁত বার করে হাসে। সরলাকে ধরে মারতে ইচ্ছা করে বলে তাকে বেশিরকম আদর করে। একেবারে চরম পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই জেনে মনটা যত তার ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে, রসিকতা করে ততই সে সরলাকে হাসায়। সিনেমা দেখিয়ে নিয়ে যায় দেশি ফিরিঙ্গি হোটেলে, পচা চপ আর দামি বিলাতি মদ খাওয়ায়।

সরলা বলে, ঘরেই তো ছিল, আবার এখেনে কেন ?

আজ একটু প্রাণ ভরে ফূর্তি করতে সাধ যাচ্ছে।

কেন, আজ কী ?

প্রশ্নের ভঙ্গিতে ক্ষীণ একটা সংশয়, মৃদু একটা ভয় ধরা পড়ে। সত্য সাবধান হয়ে বলে, অতগুনো টাকা রোজগার করলাম যে আজ ? বলে দাঁত বার করে হাসে না, সরলাকে আর বেশিরকম আদর করে না, বেশি বেশি রসিকতা করে হাসায় না।

ঘরে ফেরার কিছুক্ষণ পরে সরলা তাই জিজ্ঞাসা করে, হঠাৎ যে আবার মুখ ভার হল ?

প্রশ্নের ভঙ্গিতে ভয় ও সংশয় স্পষ্টতর প্রকাশ পাওয়ায় সত্য আবার সাবধান হয়ে বলে, না মাইরি না। মুখ ভার হয়নি।

জবাবটা স্বাভাবিক হওয়ায়, বড়োরকম কৈফিয়ত না থাকায়, একটু নিশ্চিন্ত হলে সরলা স্ফূর্তি জমানোর আয়োজন করে। বোতলের রসালো বিষে কখন কোন ফাঁকে যে সত্য কাগজের মোড়কের খানিকটা গুঁড়ো বিষ মিশিয়ে দেয়, সে টেরও পায় না। সত্যকে ফাঁকি দিয়ে লুকানো গয়না বার করতে সে যেমন পটু, ফাঁকি দিয়ে তাকে বিষ খাইয়ে দিতে সত্যও তার চেয়ে কম পটু নয়।

বিষে বিষক্ষয় হবার নিয়মটা এ ক্ষেত্রে বোধ হয় বাতিল হয়ে যায় এ জন্য যে বোতলের বিষকে লোকে সুধা বলে, মনেও করে তাই। মুখ বিকৃত করে সরলা বলে, থুঃ, কী খাওয়ালি আমাকে তুই ? কি বিচ্ছিরি স্বাদ !

সত্য অনুযোগ দিয়ে বলে, বললাম পচা চপ খাস না, তবু তুই খেলি। মর এবার !—নে, পান খা একটা। বলে সস্নেহে তার মুখে পান গুঁজে দেয়।

তারপর সরলা আরও খানিকটা বিষ পান করে আরও কাতর হয়ে বলে, গা কেমন করছে। মাথা ঘুরছে আর খাব না আমি।

সত্য আবাব অনুযোগ দিয়ে বলে, বললাম পান খাস না, তবু তুই খেলি। মর এবার।—আয় মাথাটা টিপে দিই।

তারপর সত্যর কোলে মাথা রেখে সবলা ছটফট করে, গোঙায়, মুখে গাঁজলা তুলে মরে যাবার উপক্রম কবে, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে সত্যর মুখের দিকে, দু হাতে সত্যকেই জড়িয়ে ধরে বিষক্রিয়ার হাত থেকে অব্যাহতি খোঁজে, অপমৃত্যুকে জয় করার চেষ্টায় সাহায্য চায়, আশ্রয় প্রার্থনা করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিথিল, অবসন্ন নিঃশব্দে নিশ্চেষ্ট হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেয় সত্যর হাতে, কিছু চেতনা কেবল থাকে চোখে আর চোখ দেখে মনে হয় ভেতরেও যেন একটা অদ্ভুত নির্বোধ চেতনার সৃষ্টি হয়েছে।

একেই বলে জীবনপাত করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা। যাব সঙ্গে মনের মিল হয়েছে তাকে মরণাপন্ন করে কিছু গয়না আর টাকা সংগ্রহ করা। বিবর্ণ পাংশু মুখে সত্য একে একে সরলার গা থেকে গয়নাগুলি খুলে নেয়, সরলার আঁচলে বাঁধা চাবির সাহায্যে লুকানো ও জমানো টাকাগুলি খুঁজে খুঁজে বার করে। কিন্তু সব সংগ্রহ করে পালাবার সময় বিষাক্ত প্রেমের বিষক্রিয়ায় সত্যর পাও যেন অবশ হয়ে আসে, মাথা ঝিমঝিম করে। বন্ধ দরজাব কাছে এগিয়ে গিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। সরলার পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে কাব সাধ্য কল্পনা করে সে পাকা মেয়ে, জবরদস্ত কাবলিওয়ালি। তাড়াতাড়ি পালানোই ভালো, কিন্তু সত্য জানে, সমস্ত রাত এ ঘরে কেউ আসবে না, দরজা বন্ধ থাকলে কাল অনেক বেলা পর্যন্ত সরলার খোঁজ পড়বে না। মুখের গাঁজলা মুছিয়ে মাথায় একটু জল দিতে কতক্ষণ লাগবে ?

সরলার আশমানি রঙের শাড়ির আঁচলেই তার মুখ মুছিয়ে, মুখেচোখে জল ছিটিয়ে এবং অনেক যত্নে বাঁধা খোঁপা বাঁচিয়ে মাথার চুল ভিজিয়ে দিয়ে আব কতটুকু সেবা করা হয় ? চুরি করে

পালিয়ে যাবার সময় চোরের পর্যন্ত এইটুকু সেবা করে তৃপ্তি হয় না ! এমনই আশ্চর্য সেবা করার নেশা !

পাখা দিয়ে বাতাস করতে আরম্ভ করে সত্যর হঠাৎ মনে হয়, মরবার কথা নয় বটে, কিন্তু যদি মরে যায় ? সব বিষের ক্রিয়া তো সকলের ওপর সমান হয় না। যে বিষে একজনের কিছুই হয় না, সেই বিষে অন্য একজনের মরে যাওয়া আশ্চর্য কী ? আর যদি জ্ঞান না হয়, সরলার অপলক চোখে আর যদি দৃষ্টি না আসে, বক্ষস্পন্দন যদি চিরদিনের জন্য থেমে যায় ? অনেকেই জানে সে সরলার সঙ্গে ছিল, খোঁজ তার পড়বেই। সরলাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে পালালে পালাবার সময়টা সে একটু বেশি পাবে বটে, কিন্তু এই অবহেলার জন্য সরলা যদি মরে যায়, চোরের চেয়ে খুনিকে আবিষ্কার করার জন্য পুলিশের মাথাব্যথাও হবে সেই অনুপাতে বেশি। ধরা পড়লে চোরেব চেয়ে খুনির শাস্তিটাও চিরদিন বেশিই হয়ে এসেছে।

সত্য জানে সরলার কিছু হবে না, কাল অনেকবেলায় জ্ঞান হয়ে টাকা আর গয়নার শোকে সে যদি হার্টফেল না করে। যে বিষ যতখানি সরলার পেটে গিয়েছে তার তিনগুণ বিষ পেটে গেলেও সরলার কিছু হবে না, কিন্তু যদি হয় ? খুব কি দুর্বল নয় সরলা, খুব নির্জীব ? আজ পর্যন্ত যত মেয়েমানুষ সে দেখেছে, তাদের সকলের চেয়ে প্রাণশক্তি কি সবলার কম নয় ? এমন কোমল এমন অসহায় জীব জগতে আছে ?

ভয়ে সত্যর বুকের মধ্যে মোচড় দিতে থাকে, নিস্পন্দ সরলাব দিকে চেয়ে জগতে কারও যে মরবার কথা নয় সেই বিষটুকু সহ্য করবার মতো শক্তসমর্থ সবলা নয় কেন ভেবে ক্ষোভে তাব চোখে জল আসে। এত বেশি রাগ হয় যে, সরলার শিথিল অবসন্ন দেহটা বুকে তুলে তাকে পিষেই মেরে ফেলতে ইচ্ছা হয়। এতদিনের মতলব যে এমনিভাবে ফাঁস করে দেয়, সেই তাব উপযুক্ত শাস্তি। রাগটা খুব বেশি হয় বলে বুকে পিষে মেরে ফেলবার কথাটাই সত্যের মনে আসে, গলা টিপে মেরে ফেলবার সহজ উপায়ের কথাটা খেয়াল হয় না।

একে একে গয়নাগুলি সরলাকে পরিয়ে দিয়ে, তার টাকাগুলি যথাস্থানে লুকিয়ে রেখে, আঁচলে চাবিটা বেঁধে দিয়ে সে সরলার আরও জোরালো সেবা আরম্ভ করে দেয়। যে অবস্থা ফিরে এলে সে যে বাঁচবেই এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকবে না, সে অবস্থাটা ফিরে আসতে কাল বেলা হবে—মেয়ে কি সহজ ননীর পুতুল ! সত্য একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। এবার আর সুবিধা হল না। যাক কী আর করা যায়, চুরি কবার জন্য খুনি হবার বিপদটা তো ঘাড়ে করা চলে না। পরের বার অন্য ব্যবস্থা করবে—আর বিষটিষ নয়। কিছুদিন একসঙ্গে বসবাস কবলে, একদিন কি আর টের পাওয়া যাবে না সরলা গয়নাগুলি কোথায় লুকিয়ে রাখে ? যতদিন তা টের না পাওয়া যায়, ততদিন সে এমন ভাব দেখাবে যে সরলাকে ছেড়ে সে একদণ্ড থাকতে পারে না, সরলার প্রেমে হৃদয় তার টইটুম্বুর !

দিক পরিবর্তন

মনোহরের এত পসার যে রোগীরা নাকি তার হাতে মরতেও ভালোবাসে। মনোহরের প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ির দোতলা আর তিনতলাটা বসবাসের কাজে লাগে, একতলায় বড়ো ডিসপেনসারি আর ওষুধের কারখানা। মনোহবের আবিষ্কৃত অনেকগুলি পেটেন্ট ওষুধ আছে। কতকগুলি রোগের পক্ষে উপকারী সর্বজনবিদিত সাধারণ কতকগুলি ওষুধের সঙ্গে আরও কতগুলি মানুষের পেট, রক্ত, স্নায়ু প্রভৃতির পক্ষে উপকাবী ওষুধ মিশিয়ে যে সব পেটেন্ট ওষুধ সাধারণত তৈরি হয় আর অসংখ্য বিজ্ঞাপনের জোরে অসংখ্য রোগীর উদবে প্রবেশ লাভ করে, মনোহরের ওষুধগুলি সাধারণত সে রকম নয়। তার ওষুধে প্রকৃত যেটুকু গুণ আছে আব সে ওষুধ খেয়ে রোগীর যেটুকু উপকার হয় সেটা মনোহরের অনেকদিনের চিন্তা, পরিশ্রম ও পরীক্ষার ফল।

তাই পেটেন্ট ওষুধ মনোহরের একটু বিক্রি হয় কম। তবু তার অভাব বলতে কিছু নেই। তাব নিজের স্বাস্থ্য ও চেহারা মন্দ নয় এবং চরিত্র ভালো। তার বউ যথাসম্ভব মোটা আর সুন্দরী। তার ছেলেমেয়ে দুটি কচি ও মিষ্টি। ঝি, চাকর, দারোয়ান, কম্পাউন্ডারে বাড়ি তার বোঝাই।

ওই যে ঝি, ওব নাম হল সখী। সখীর বয়স খুব কম এবং সে বিধবা। তার মনিব আছে কিন্তু মালিক কেউ নেই।

কিন্তু স্ত্রীলোকেব—বিশেষত সখীব মতো বযসের—আইনসঙ্গত মালিকেব আসনটি শূন্য থাকলে আইন-অসঙ্গতভাবে সে শূন্য আসনটি দখলের চেষ্টা করার লোকের অভাব মোটেই হয় না। চাকব, ঠাকুর, দারোয়ান থেকে আরম্ভ করে ডিসপেনসাবির কম্পাউন্ডারেব পর্যন্ত সখীর সম্বন্ধে মনের বিকার।

ধর্ম থাকে মন্দিরে, চার্চে, মসজিদে—বিবেক থাকে হৃদয়ে। নীতিজ্ঞান সর্বত্রই ছড়ানো। তবু যে মানুষের, বিশেষত মেয়েমানুষেব নীতিজ্ঞানকে শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রেই অনেক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায় তাব কারণ একজন মানুষকে জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, আর একজন মানুষের নৈতিক জীবনের চতুঃসীমানায় গাঁথা দেয়ালটিকে খাড়া রাখতে হয়। 'কিছু'র জন্য নয়, আদমের আপেল খাওয়ার দিন থেকে 'কারো'ব জনা আমরা ভালো অথবা মন্দ অথবা মধ্যবিত্ত হয়ে থাকি।

সকলেই প্রলোভন দেখায় কিন্তু মনোহরকে সখী এত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে যে তার মাইনে করা চাকবের প্রলোভন সে অনায়াসেই জয় করে চলে। কম্পাউন্ডার একদিন একটি পাঁচ টাকার নোট সখীব আঁচলে বেঁধে দিতে গিয়েছিল, পাবেনি।

অথচ, পাঁচটা টাকা সখীর একমাসেব উপার্জন।

এমনিভাবে দিন যায়। মনোহর মনোযোগ দিয়ে রোগী দেখে, কম্পাউন্ডার ওষুধ তৈরি করে, চাকর দৈনিক বাজার থেকে বাঁচানো পয়সায় বড়োলোক হয়, ঠাকুর দুবেলা ভাত রাঁধে, দারোয়ান নিয়মিত গেট পাহারা দেয় আর সখী বাসন মাজে, কাপড় কাচে, গিন্নির ফাইফরমাশ খাটে। গিন্নি মোটরে চড়ে বেড়ান আর মোটা হন।

তারপর একদিন মনোহর দুপুরবেলা ফিরছে 'কল' থেকে, সারাদিন রোগী দেখে দেখে বেচারির মাথা খারাপ হয়ে গেছে ; সখী তখন কলতলায় স্নান করছিল। রান্নাঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে চাকর বিড়ি টানছিল, মনোহরকে দেখে সে সরে গেল।

সখীর দিকে চেয়ে মনোহর চমকে উঠল। সে যখন বাইরের রোদে ঘুরে ঘুরে তেতে পুড়ে সারা হয় তখন তারই বাড়িতে উঠোনের ভিজে ছায়ায় সখী চুল এলো করে দিয়ে মাথায় ঠান্ডা জল ঢালে এটা মনোহরের কাছে কেমন অসঙ্গত ঠেকল। তার এত তৃষ্ণা পেয়েছে যে সখীর চুলের সস্তা নারকেল তেল ধুয়ে যে জল গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তাই পান করে সে অনায়াসে তৃষ্ণা মেটাতে পারে।

মনোহর অত্যন্ত চিন্তিত ও অন্যমনস্কভাবে স্নানাহার সম্পন্ন করল। বিকেলে সে আর রোগী দেখতে গেল না। সন্ধ্যার সময় গিন্নি আর ছেলেমেয়েদের সিনেমায় পাঠিয়ে দিয়ে সখীকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠাল। বলল, আমার ঘরে এক গ্লাস জল দিয়ে যাও সখী।

জল ? জলে কি মানুষের তেষ্টা মেটে ?

পরদিন দুপুরবেলা সখী ডিসপেনসারি ঝাঁট দিচ্ছে, কম্পাউন্ডার এসে তার হাত ধরে প্রথমে নিজের দিকে তারপর ডিসপেনসারির পাশে নিজের ঘরের দিকে আকর্ষণ করল। সখী বাধা দিল না। শুধু হাত পেতে মুচকে হেসে বলল, টাকা ?

রাত্রে তার বুদ্ধ দরজার সামনে মিনতি করতেই সে চাকরকে দরজা খুলে দিল। চাপা গলায় বলল, বাবু টের পেলে তোকে গুলি করে মারবে।

মশলা বাটছিল, ঠাকুর এসে চুপিচুপি বলল, একটা ঘর ঠিক করে এসেছি। রোজ একবার করে যাস।

ঝি মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল। মুখেও বলল, যাব।

বাড়ির কেউ তখনও ওঠেনি। বারান্দায় বসে চুল এলিয়ে দিয়ে সখী আপনমনে কাঁদছিল। দারোয়ান তখন নেংটি পরে মেহনত করতে আখড়ায় যাচ্ছে। ভেতরে এসে সে সখীকে জড়িয়ে ধরল।

সখী ক্লান্তস্বরে বলল, বাইরের দরজাটা বন্ধ করে এসো ছট্টু সিং। কেউ আসবে।

মাস ছয়েক পরে গিন্নি তাকে তাড়িয়ে দিলেন। সখীর ছেলে হবে।

ভদ্রলোকের বাড়িতে তো এত অনাচার চলতে পারে না।

মনোহর গোপনে সখীর হাতে শ-খানেক টাকা দিয়ে বলল, যে ঘরটা ঠিক করে দিয়েছি সেখানেই থেকো। ছেলেটাকে যত্ন কোরো, মাসে মাসে টাকা দিয়ে আসব।

সখী বলল, পাঠিয়ে দেবে না নিজেই যাবে গো ?

মনোহর একটু দ্বিধা করে জবাব দিল, আচ্ছা নিজেই যাব।

সত্যি ? বলে আড়ালে সখী চোখ মুছল।

মনোহর কদিন খুব মন খারাপ করে রইল। যতই হোক, সখী যে তার ছেলের মা !

কম্পাউন্ডারটির ছেলেমেয়ে হয়নি, বউ বাঁজা। সে ভাবল, আহা, সখী যদি আমার বউ হত ! দুদিন পরে ও আমার ছেলের মা হবে কিন্তু ছেলের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না !

ঠাকুর ভাবল, ইস্, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে ! বংশে একটা ফ্যাকড়া রয়ে গেল। ছেলেটা যেন পেটেই মরে হরি !

চাকর কোত্থেকে একটা ওষুধের মোড়ক এনে বললে, খেয়ে ফ্যাল। ও ছেলে দিয়ে করবি কী ?

ঝি তার হাত থেকে মোড়কটা নিয়ে নর্দমায় ফেলে দিল।

দারোয়ান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবল, বাঙালিনির গর্ভে তার না জানি কি কিম্ভূতকিমাকার ছেলেই হবে ! তাব অমন গৌরবর্ণ, একটুও বোধ হয় বাচ্চাটা পাবে না।

ছট্টু সিং একটা ভজন ধরলে।

নদীর বিদ্রোহ

চারটা পঁয়তাল্লিশের প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিকে রওনা করাইয়া দিয়া নদেরচাঁদ নূতন সহকারীকে ডাকিয়া বলিল, আমি চললাম হে!

নূতন সহকারী একবার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

নদেরচাঁদ বলিল, আর বৃষ্টি হবে না, কি বল?

নূতন সহকারী একবার জলে জলময় পৃথিবীর দিকে চাহিয়া বলিল, আজ্ঞে না।

নদেরচাঁদ লাইন ধরিয়া এক মাইল দূরে নদীর উপরকার ব্রিজের দিকে হাঁটিতে লাগিল। পাঁচদিন অবিরত বৃষ্টি হইয়া আজ এই বিকালের দিকে বর্ষণ থামিয়াছে। পাঁচদিন নদীকে দেখা হয় নাই। নদেরচাঁদ ছেলেমানুষের মতো ঔৎসুক্য বোধ করিতে লাগিল। আকাশে যেমন মেঘ করিয়া আছে, হয়তো আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল ধারায় বর্ষণ শুরু হইয়া যাইবে। তা হোক। ব্রিজের একপাশে আজ চুপচাপ বসিয়া কিছুক্ষণ নদীকে না দেখিলে সে বাঁচিবে না। পাঁচদিনের আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি না জানি নদীকে আজ কী অপরূপ রূপ দিয়াছে? দুদিকে মাঠঘাট জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, রেলের উঁচু বাঁধ ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে দুপাশে চাহিয়া চাহিয়া নদেরচাঁদ নদীর বর্ষণ-পুষ্ট মূর্তি কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ত্রিশ বছর বয়সে নদীর জন্য নদেরচাঁদের এত বেশি মায়া একটু অস্বাভাবিক। কেবল বয়সের জন্য নয়, ছোটো হোক, তুচ্ছ হোক, সে তো একটা স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার, দিবারাত্রি মেল, প্যাসেঞ্জার আর মালগাড়িগুলির তীব্রবেগে ছুটাছুটি নিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্ব যাহাদের সেও তো তাহাদেরই একজন, নদীর জন্য এমনভাবে পাগল হওয়া কি তার সাজে? নদেরচাঁদ সব বোঝে, নিজেকে কেবল বুঝাইতে পারে না। নিজের এই পাগলামিতে যেন আনন্দই উপভোগ করে।

অস্বাভাবিক হোক, নদীকে এ ভাবে ভালোবাসিবার একটা কৈফিয়ত নদেরচাঁদ দিতে পারে। নদীর ধারে তার জন্ম হইয়াছে, নদীর ধারে সে মানুষ হইয়াছে, চিরদিন নদীকে সে ভালোবাসিয়াছে। দেশের নদীটি তার হয়তো এই নদীর মতো এত বড়ো ছিল না, কিন্তু শৈশবে, কৈশোরে, আর প্রথম যৌবনে বড়োছোটোর হিসাব কে করে? দেশের সেই ক্ষীণস্রোতা নির্জীব নদীটি অসুস্থ দুর্বল আত্মীয়ার মতোই তার মমতা পাইয়াছিল। বড়ো হইয়া একবার অনাবৃষ্টির বছরে নদীর ক্ষীণ স্রোতধারাও প্রায় শুকাইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল; দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতে ভুগিতে পরমাত্মীয়া মরিয়া যাওয়ার উপক্রম করিলে মানুষ যেমন কাঁদে।

ব্রিজের কাছাকাছি আসিয়া প্রথমবার নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই নদেরচাঁদ স্তম্ভিত হইয়া গেল। পাঁচদিন আগেও বর্ষার জলে পরিপুষ্ট নদীর পঙ্কিল জলস্রোতে সে চাঞ্চল্য দেখিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে চাঞ্চল্য যেন ছিল পরিপূর্ণতার আনন্দের প্রকাশ। আজ যেন সেই নদী খেপিয়া গিয়াছে, গাঢ়তর পঙ্কিল জল ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফেনোচ্ছ্বাসিত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এতক্ষণ নদেরচাঁদ একটি সংকীর্ণ ক্ষীণস্রোতা নদীর কথা ভাবিতেছিল। তার চার বছরের চেনা এই নদীর মূর্তিকে তাই যেন আরও বেশি ভয়ংকর, আরও বেশি অপরিচিত মনে হইল।

ব্রিজের মাঝামাঝি ইট, সুরকি আর সিমেন্টে গাঁথা ধারকস্তম্ভের শেষপ্রান্তে বসিয়া সে প্রতিদিন নদীকে দেখে। আজও সে সেইখানে গিয়া বসিল। নদীর স্রোত ব্রিজের এই দিকে ধারকস্তম্ভগুলিতে

বাধা পাইয়া ফেনিল আবর্ত রচনা করিতেছে। এত উঁচুতে জল উঠিয়া আসিয়াছে যে, মনে হয় ইচ্ছা করিলে বুঝি হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করা যায়। নদেরচাঁদের ভারী আমোদ বোধ হইতে লাগিল। পকেট খুঁজিয়া পুরাতন একটি চিঠি বাহির করিয়া সে স্রোতের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। চোখের পলকে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল চিঠিখানা ! উন্মত্ততার জন্যই জলপ্রবাহকে আজ তাহার জীবন্ত মনে হইতেছিল, তার সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়া চিঠিখানা যেন তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিয়াছে।

দুদিন ধরিয়া বাহিরের অবিশ্রান্ত বর্ষণের সঙ্গে সুর মিলাইয়া নদেরচাঁদ বউকে প্রাণপণে একখানা পাঁচপৃষ্ঠাব্যাপী বিরহ-বেদনাপূর্ণ চিঠি লিখিয়াছে, চিঠি পকেটেই ছিল। একটু মমতা বোধ করিল বটে, কিন্তু নদীর সঙ্গে খেলা করার লোভটা সে সামলাইতে পারিল না, এক একখানি পাতা ছিঁড়িয়া দুমড়াইয়া মোচড়াইয়া জলে ফেলিয়া দিতে লাগিল !

তারপর নামিল বৃষ্টি, সে কী মুষলধারায় বর্ষণ ! ঘণ্টা তিনেক বিশ্রাম কবিয়া মেঘের যেন নূতন শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে।

নদেরচাঁদ বসিয়া বসিয়া ভিজিতে লাগিল, উঠিল না। নদী হইতে একটা অশ্রুতপূর্ব শব্দ উঠিতেছিল, তার সঙ্গে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ মিশিয়া হঠাৎ এমন একটা সঙ্গত সৃষ্টি করিয়াছে যে নদেরচাঁদের মন হইতে ছেলেমানুষি আমোদ মিলাইয়া গেল, তার মনে হইতে লাগিল এই ভীষণ-মধুর শব্দ শুনিতে শুনিতে সর্বাঙ্গ অবশ, অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

ক্রমে ক্রমে দিনের স্তিমিত আলো মিলাইয়া চারিদিক অন্ধকারে ছাইয়া গেল, বৃষ্টি একবার কিছুক্ষণের জন্য একটু কমিয়া আবার প্রবলবেগে বর্ষণ আরম্ভ হইল, ব্রিজের উপব দিয়া একটা ট্রেন চলিয়া যাওয়ার শব্দে আকস্মিক আঘাতে ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ার মতো একটা বেদনাদায়ক চেতনা কিছুক্ষণের জন্য নদেরচাঁদকে দিশেহারা করিয়া রাখিল, তারপর সে অতিকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বড়ো ভয় করিতে লাগিল নদেরচাঁদের। হঠাৎ তাহার মনে হইয়াছে, রোষে ক্ষোভে উন্মত্ত এই নদীর আর্তনাদি জলরাশির কয়েক হাত উঁচুতে এমন নিশ্চিন্তমনে এতক্ষণ বসিয়া থাকা তাহার উচিত হয় নাই। হোক ইট, সুরকি, সিমেন্ট, পাথর, লোহালক্কড়ে গড়া ব্রিজ, যে নদী এমনভাবে খেপিয়া যাইতে পারে তাহাকে বিশ্বাস নাই।

অন্ধকারে অতি সাবধানে লাইন ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে নদেরচাঁদ স্টেশনেব দিকে ফিরিয়া চলিল। নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে। ব্রিজটা ভাঙিয়া ভাসাইয়া লইয়া, দুপাশে মানুষের হাতে গড়া বাঁধ চুরমার করিয়া, সে স্বাভাবিক গতিতে বহিয়া যাইবার পথ করিয়া লইতে চায়। কিন্তু পারিবে কি ?

পারিলেও মানুষ কি তাকে রেহাই দিবে ? আজ যে ব্রিজ আর বাঁধ সে ভাঙিয়া ফেলিবে, কাল মানুষ আবার সেই ব্রিজ আর বাঁধ গড়িয়া তুলিবে। তারপর এই গভীর প্রশস্ত, জলপূর্ণ নদীব, তার দেশের সেই ক্ষীণস্রোতা নদীতে পরিণত হইতে না জানি মোটে আর কতদিন লাগিবে ?

স্টেশনের কাছে নূতন রং করা ব্রিজটির জন্য এতকাল নদেরচাঁদ গর্ব অনুভব করিয়াছে। আজ তার মনে হইল কী প্রয়োজন ছিল ব্রিজের ?

বোধ হয়, এই প্রশ্নের জবাব দিবার জন্যই পিছন হইতে ৭নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি নদেরচাঁদকে পিষিয়া দিয়া চলিয়া গেল ছোটো স্টেশনটির দিকে, নদেরচাঁদ চার বছর যেখানে স্টেশন-মাস্টারি করিয়াছে এবং বন্দী নদীকে ভালোবাসিয়াছে।

মহাবীর ও অবলার ইতিকথা

একটি ছেলে ছিল আর একটি মেয়ে। ছেলেটির নাম ধরা যাক মহাবীর আর মেয়েটির নাম ধরা যাক অবলা। কার কত বয়স, কে কোন ক্লাসে পড়ে, এ সব জেনে আমাদের দরকার নেই।

একদিন অবলা চোখ সজল আর বিস্ফারিত করে বলল, ছি !

শুনে মহাবীর ভয়ানক ভড়কে গেল। একবার ভাবল হাত বাড়িয়ে অবলার একখানা হাত ধরে। ভেবেচিন্তে সে ইচ্ছাটা ত্যাগ করে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন, ছি কেন ? কীসের ছি ?

মাকে তুমি এমন করে অবহেলা কর !

সত্যসত্যই অবলার চোখ দিয়ে টপটপ করে ফোঁটা ফোঁটা জল মাটিতে ঝরে পড়তে লাগল। কোমল মন কিনা, কারও দুঃখকষ্টের কথা কানে এলেই মনটা গরমের দেশের বরফের মতো গলে যায়। অবশ্য সবচেয়ে বেশি গলে নিজের দুঃখকষ্টে ; ঠিক গরম তাওয়ায় বরফ দেওয়ার মতো, কিন্তু জীবনে এখনও দুঃখকষ্টের আবির্ভাব ঘটেনি বলে পরের জন্য মনটাকে একটু একটু না গলাতে পারলে অবলার দিন যেন কাটতে চায় না।

অবলার অভিযোগ মহাবীরকে আকস্মিক লজ্জায় প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত করে দিল। কেমন যেন বদলে গেল ছেলেটা। পোশাকের চাকচিক্য উঠে গেল, খরচের বাহুল্য কমে গেল, অতিরিক্ত আলস্যটা দরকারি বিশ্রামের চার ভাগের একভাগে এসে ঠেকল, না খায় সে আর সিগারেট, না যায় অবলাকে নিয়ে সপ্তাহে দুদিন সিনেমায়।

অনেক ভনিতা করে মাকে সে চিঠি লিখে দিল যে, মা, তোমায় আমি বড়ো বেশি অবহেলা করেছি, এই অধম সন্তানকে মাপ কর। বাকি জীবনটা আমি তোমার সেবা করে কাটিয়ে দেব।

বাকি জীবনটা আমি মার সেবা করে কাটিয়ে দেব অবলা।

অবলা তা ভালো করেই টের পেতে আরম্ভ করেছিল। মনে হল কী যেন একটা ঘূর্ণিপাকে পড়ে আজকাল তার মাথা ধরার আর কামাই থাকছে না। মুখটা দেখাচ্ছে পাংশু, শরীরটা দেখাচ্ছে রোগা, কথাবার্তা হয়ে গেছে ছাড়া ছাড়া। এমন একটা সাংঘাতিক ভুল কী সে করে বসেছে যার ফাঁদে পড়ে সারাজীবন ছটফট করতে হবে, এই কথাটা সব বয়সের স্ত্রীলোক অনেকবার ভাবে আর উতলা হয়। অবলা ঠিক সেইরকম ভাবে উতলা হতে আরম্ভ করেছিল।

একদিন তাই মহাবীরের সঙ্গে অতি সাধারণ বিষয়ে কথা বলতে বলতে আবার তার চোখ দিয়ে জল পড়তে আরম্ভ করল।

কাঁদছ কেন ?

হাতের ভাঁজে মুখ রেখে অবলা এবার রীতিমতো কান্না আরম্ভ করল।

মহাবীর ভয়ানক ভড়কে গেল। ভেবেচিন্তে অবলার একটি হাত ধরে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে অবলা, কাঁদছ কেন ?

অবলা কেঁদে কেঁদে বলল, তুমি কেবল মাকে নিয়ে মেতে আছ, আমার দিকে ফিরেও তাকাও না। আমি কি তোমার কেউ নই ?

কী সর্বনাশ, অবলার মুখে এই অভিযোগ—অবহেলার !

মহাবীরের হৃৎপিণ্ড যেন হঠাৎ কী একটা অজানা গ্যাস বেলুনের মতো ফেঁপে ফুলে উঠল। সত্যি, জীবনের কী শোচনীয় অপচয় ঘটেছে। অন্ধের মতো সোনার খনি থেকে সে কী ভাবেই শূন্য হাতে বিদায় গ্রহণ করেছে !

মহাবীরের পোশাকে আবার চাকচিক্য দেখা দিল, খরচের বাহুল্য বেড়ে গেল, আলস্যের অতুলনীয় আনন্দে দিনরাত্রি পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, একটা সস্তা দামের পাইপ কিনে টানতে আরম্ভ করে অবলাকে নিয়ে সপ্তাহে তিনদিন সে সিনেমায় যেতে আরম্ভ করল।

অবশ্য সে জন্য মাকে আধপেটা খেয়ে ছেঁড়া কাপড় পবে দিন কাটাতে হল, কিন্তু তার তো প্রতিকার নেই, তাই স্বাভাবিক।

অবলার মন খুঁতখুঁত করে, মাঝে মাঝে চোখে জলও আসে, মহাবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে গালে হাত দিয়ে সে আকাশপাতাল ভাবে।

ভাবে : মহাবীরেরা কী হয় আকাশে ওঠে নয় পাতালে নামে, পৃথিবীতে থাকতে পাবে না ? এই মাটির পৃথিবীতে ?

দুটি ছোট্ট গল্প

বোমা

কাপড়ের দোকান থেকে সাতাশ টাকা দিয়ে স্ত্রীর জন্য একখানা কাপড় ও ব্লাউজ পিস কিনে অক্ষয় ফুটপাতে নেমেছে, এক ভিখারিনি এসে সামনে হাত পাতল।

তার বয়স বেশি নয়। তার দিকে তাকিয়ে অক্ষয়ের মনে হল, বয়স বেশি না হওয়ার জন্যই ভিখারিনির অসুবিধার সীমা নেই। পরনের কাপড়খানা তার মতো জীর্ণ। অনেক কৌশল করেও সে পুরোপুরি লজ্জা নিবারণ করতে পারেনি। পথের লোকের দৃষ্টিপাতে সংকুচিত হয়ে আছে।

বগলে স্ত্রীর জন্য সাতাশ টাকা দামের কাপড় ও ব্লাউজ পিসের কাগজের বাক্সোটার স্পর্শ অনুভব করে অল্পবয়সি ভিখারিনির দুর্দশা দেখে অক্ষয়ের মন কেমন করে উঠল। পকেট থেকে একটা সিকি বার করে সে ভিখারিনির হাতে দিল। তারপর ট্রামের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

দুদিকের ফুটপাত দিয়েই মানুষের সমান স্রোত চলেছে, ভিক্ষা দুদিকেই সমান পাবার সম্ভাবনা। তবু রাস্তা পার হয়ে ওদিকের ফুটপাতে যাবার কী দরকার ভিখারিনির হয়েছিল বলা যায় না। অক্ষয়ের চোখের সামনে সে একটা দ্রুতগামী মোটরের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গেল।

একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড, বীভৎস দৃশ্য। কিন্তু অক্ষয় আহতা ভিখারিনির দিকে তাকাবার সময় পেল না। ভিখারিনির লজ্জা নিবারণে অক্ষম শতজীর্ণ কাপড়ের ভাঁজ থেকে যে একরাশি চকচকে টাকা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেই দিকে।

পার্থক্য

দুটি দেওরের সেবাযত্ন করে বিধবা সুনীতির দিন কাটে। সুনীতির বয়স বছর তেইশ। বড়ো দেওর বিনয় তার সমবয়সি, বি এ পাশ করে জুটমিলে চাকরি করছে। বিয়ের জন্য সুনীতি সুন্দরী মেয়ে খুঁজছে, আগামী অঘ্রানের মধ্যে দেওরের সে বিয়ে দেবেই। ছোটো দেওর পাঁচুর বয়স বছর বারো। স্কুলে পড়ে।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চঞ্চলভাবে বাইরে আসতে গিয়ে চৌকাটে পা বেঁধে পাঁচু দড়াম করে একটা আছাড় খেল। সুনীতি ছুটে এসে তাকে তুলল। পাঁচুর খুব লেগেছিল। কোলে নিয়ে বসে আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে চুমু খেয়ে সুনীতি তাকে শান্ত করল।

পাড়ার সরকার গিন্নি একটু তেলের চেষ্টায় বসেছিলেন। বললেন, বেঁচে থাকো বউ, দেওর তো নয়, পেটের ছেলের বাড়া।

পাড়ায় সুনীতির সুখ্যাতি রটল। দেওরদের সুনীতি মার মতো স্নেহ করে, দিবারাত্রি দেওরদের জন্য খেটে খেটে তার জীবন বেরিয়ে গেল। সবাই বলল, হবে না? লক্ষ্মী বউ যে!

কয়েকদিন পরে বিনয় জ্বর গায়ে আপিস থেকে বাড়ি ফিরল। জ্বর বেশি হয়নি, কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে পড়েছে। সুনীতি তাড়াতাড়ি বিছানা করে দিল। বিছানায় শুয়ে বিনয় ছটফট করতে লাগল। সুনীতি বিছানায় বসে তার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে মুখের দিকে ঝুঁকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করল, খুব কষ্ট হচ্ছে ভাই?

বউ কইগো? বলতে বলতে সরকার-গিন্নি উঁকি দিলেন, পরক্ষণে জিভ কেটে তাড়াতাড়ি গেলেন পালিয়ে। পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেল। সবাই বলল, আ ছি ছি, এ কী অলক্ষ্মী বউ?

সরীসৃপ

চাবিদিকে বাগান, মাঝখানে প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। জমি কিনিয়া বাড়িটি তৈরি করিতে চারুর শ্বশুরের লাখ টাকার উপর খরচ হইয়াছিল। কিন্তু মোটে তিরিশ হাজার টাকার দেনার দায়ে এই সম্পত্তি চারুর হাত হইতে খসিয়া বনমালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে।

প্রথম বয়সে চারু তার টনটনে বুদ্ধির সাহায্যে শ্বশুরের সম্পত্তির এমন চমৎকার বিলি ব্যবস্থাই করিয়াছিল যে, আত্মীয়-পর কেহ কোনোদিন কোনোদিক দিয়া তাহার একটি পয়সা অপচয় করিতে পারে নাই। কিন্তু বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বিকারহীনতা বজায় রাখিতে চারুর তিনটি বিশেষ অসুবিধা ছিল। প্রথমত, আজীবন তাহাকে স্ত্রীলোক হইয়াই থাকিতে হইল। দ্বিতীয়ত, তাহার আধপাগলা স্বামী বিশ বছরের মধ্যে একদিনও প্রাণত্যাগ করিল না, অথচ এই বিশ বছরের প্রত্যেকটি মুহূর্ত বেশ ভালো মানুষের মতোই স্ত্রীব চরিত্রে ভয়ংকর সন্দিহান হইয়া রহিল। তৃতীয়ত, বয়স বাড়ার সঙ্গে চারুর একমাত্র পুত্রটিরও স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশ পাইবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

শেষ জীবনে শ্রান্ত ক্লান্ত ও ভীরুতাগ্রস্ত চারু তাই সম্পত্তির সুব্যবস্থাব নামে নানাবকম মজা কবিতে লাগিল। যেদিকে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই সেদিকে সে তার অতি-সাবধানী দৃষ্টিকে ব্যাপৃত রাখিল। আব যেদিকে সর্বনাশের পথ খোলা রহিল সে দিকটা লাভ করিল তাহার উদাসীনতা ; যাহাকে বিশ্বাস করার কথা, তাহাকে সে করিল একান্তভাবে অবিশ্বাস, আর যাহাকে জেলে দিয়া নিজেকে তাহাব বাঁচানোই ছিল উচিত তাহার মতো বিশ্বাসী লোক সংসাবে সে আব দেখিতে পাইল না।

ফলে চারুর যাহা রহিল তাহাব নাম কিছুই না থাকা।

কোনো লাভ হোক বা না হোক সকলের সঙ্গে শুধু গায়ের জ্বালাতেই বিবাদ করিয়া তবে চারু হার মানিয়াছিল। বনমালীর সঙ্গে সে লড়াই করিল কিন্তু বিবাদ করিল না।

চারুর বিবাহ হয় সতেরো বৎসব বয়সে। বনমালী তখন পনেরো বৎসরের বালক মাত্র। চারুব শ্বশুর রামতারণ প্রত্যেক শনিবাব বারাকপুবে গঙ্গার ধাবে একটা বাগানবাড়িতে স্ফূর্তি করিতে যাইত। বনমালীর বাবা ছিল তাহার প্রতিবেশী, বন্ধু এবং মোসাহেব। তাহাদের ছোটো দ্বিতল গৃহেব সামনে মোটর থামাইয়া, রামতারণ বনমালীর বাবাকে মোটরে তুলিয়া লইত। বনমালীকে হাসিয়া বলিত, বউমাকে পাহারা দিস বুনো।

হাসিয়া বলিলেও কথাটা পরিহাস নয়। নিজের পাগল ছেলের বউ বলিয়া নয়, স্ত্রীজাতিব সতীত্বেই রামতাবণ অবিশ্বাস করিত। কোথাও যাওয়ার আগে সে তাই বাড়িতে পাহারা রাখিয়া যাইত। কিন্তু রামতারণের বুদ্ধি ছিল। চাকর-দাসীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ব্যাপারটা প্রকাশ্য করিয়া দিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। মোসাহেবের সরল ছেলেটাকে সে তাই বাড়িতে রাখিয়া যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া নানা কৌশলে নিজের অনুপস্থিতির সময় চারুর গতিবিধির ইতিহাস জানিয়া লইত। বনমালীর বাবা সবই বুঝিত কিন্তু কিছু বলিত না। হাসিত এবং কর্তব্যে অবহেলা করিয়া রামতারণের বাড়ি ছাড়িয়া মার জন্য মন কেমন করায় বনমালী নিজের বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল জানিতে পারিলে আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিত।

চারুও বুঝিত, কিন্তু অবুঝের মতো তাহার রাগটা বনমালীর উপরে গিয়া পড়িত না। বনমালীকে সে যত্ন করিয়া খাওয়াইত, সারাদিন তাহার সঙ্গে গল্প করিত এবং রাত্রে নিজের শোবার

ঘরের পাশের ঘরখানায় তাহাকে বিছানা কবিয়া দিয়া মাঝখানের দরজাটা খোলা রাখিয়া দিত। স্বামী গোলমাল করিলে সভয়ে বলিত, চুপ চুপ ! বাবার হুকুম। এবং রামতারণকে তাহার ছেলে এমনই যমের মতো ভয় করিত যে আর কথাটি না কহিয়া সে শান্ত শিশুর মতো ঘুমাইয়া পড়িত।

কয়েক বৎসর পরে রামতারণের মৃত্যুর পব এ ব্যবস্থা রহিত হইয়া গেল বটে কিন্তু বনমালীর যাতায়াত বজায় রহিল। যাতায়াত সে কমাইয়া ফেলিল অনেক বয়সে, শহবের ভিতরে একটা বাড়ি করিয়া উঠিয়া যাইবার পর।

আজ বিপদে পড়িয়া বনমালীকে অতিরিক্ত খাতিব করিয়া কোনো সুবিধা আদায় করিবার চেষ্টার মধ্যে নানা কারণে চারুর যথেষ্ট লজ্জা ও অপমান ছিল। তবু একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া পাখা হাতে কাছে বসিয়া এমনই উত্তপ্ত সমাদরেব সঙ্গেই বনমালীকে সে খাওয়াইতে বসাইল যে তাহাতে পাষাণও গলিয়া জল হইয়া যায়।

বলিল, ভগবান সুবুদ্ধি দিয়েছিলেন তাই বাগানবাড়ি তোমার কাছে বাঁধা বাখবার কথা মনে হয়েছিল, ভাই। আমাব সর্বস্ব গেছে, যাক, কী আব করব ,—সবই মানুষের কপাল, মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু যে রইল, এই আমাব ঢের।

বনমালী একবাব মুখ তুলিয়া চাহিল মাত্র। চাবুব মাথাব চুলের কালিমা ফ্যাকাশে হইয়া আসিযাছে কেবল এইটুকু লক্ষ করিযা আবাব সে আহাবে মন দিল।

আসল ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এইবাব একটু মিঠা কথা বলা প্রয়োজন বোধ কবিয়া চারু বলিল, নিরামিষ কপির ডালনা তোমার বোধ হয ভালো লাগছে না, ভাই ?

বেশ লাগছে।

চারুর ছোটো বোন পরী এক মাসেব ছেলে-কোলে কাছে বসিযাছিল। এতক্ষণ কথা বলিতে না পাবিয়া তার ভালো লাগিতেছিল না ! এইবার সুযোগ পাইয়া বলিল, এটা কিন্তু আপনি ভদ্রতা করে বললেন, বনমালী দাদা। ডালনা নিশ্চয় ভালো হয়নি। দিদিকে কত বললাম, আমি বাঁধি দিদি, আমি রাঁধি, দিদি কি কিছুতে আমাকে বাঁধতে দিলে !

চারু মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিল, না রেঁধেছিস বেশ করেছিস বাবু। ওইটুকু ছেলে নিয়ে রান্না কবলে খেতে মানুষের ঘেন্না হত না ?

পরী উত্তেজিত হইযা বলিল, ঘেন্না হত ! আমাব রান্না খেতে বনমালীদাদাব ঘেন্না হত, স্বয়ং বিধাতা এ কথা বললেও আমি বিশ্বাস করিনে দিদি !

চারু একটু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, নে, না কবিস না কবিস। একটু চুপ কব। মানুষেব সঙ্গে দুটো কথা বলতে দে।

আমিও কথাই বলছি।

চারু ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকাইল। কুড়ি বাইশ হাজাব টাকা খবচ করিয়া সে যে তাহার বিবাহ দিয়াছিল এমনি রাগের সময় সে কথাটা মনে পড়িয়া আজকাল চারুব মনেব মধ্যে খচখচ করিয়া বেঁধে।

পরীর ছেলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দিদি উপস্থিত থাকিতে বনমালীর কাছে আমল পাওয়াব সুবিধা হইবে না টের পাইয়া ছেলেকে শোয়ানোর প্রয়োজনটা এতক্ষণে সে অনুভব করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, অমন করে তাকাচ্ছ কেন দিদি ? মুখে কিছু লেগে আছে নাকি আমাব ? বলিযা বনমালীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

চারু বলিল, দেখলে ভাই ? শুনলে মেয়ের কথাবার্তা ? আমি যেন ওর ইয়ার ! আর এই সেদিনও কেঁদে কেঁদে আমায় চিঠি লিখেছে, ও দিদি, আমাকে শপাঁচেক টাকা পাঠিয়ে দিয়ো দিদি ! টাকার বেলা দিদি দিদি, অন্য সময় সে কেউ নয়।

বনমালী বলিল, ছেলেমানুষ, বোঝে না।

বোঝে না ? হুঁঃ, কচি খুকি কি না, বোঝে না ! বোঝে সব, সব বুঝেও, এমনি করে, এ আর আমি টের পাইনে ! দিদির যে আর টাকা নেই, দিদি যে হুট বলতে পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দেয়নি !

বনমালী কিছু বলিল না। চারুও নিজের জ্বালা আর অভিমানে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। উহাদের স্তব্ধতা নিঃসম্পর্কীয়। কাবণ আজ একজন প্রৌঢ়া নারী এবং অপরজন মধ্যবয়সি পাটের দালাল।

খানিক পরে চারু বলিল, যা বলছিলাম। ভাগ্যে এই বাড়ি আর বাগান তোমার কাছে বাঁধা রাখার কথা মনে হয়েছিল! টাকা দেবার মেয়াদ পার হয়ে গেছে বলে তুমি অবিশ্যি বাড়িটা নিয়ে নেবে না, কিন্তু আর কারও কাছে বাঁধা রাখলে কী সর্বনাশ হত বল তো !

তা বইকী। বাগানবাড়ি পরের হাতে চলে যেত। কিন্তু আমার কাছে বাড়ি তো তুমি বাঁধা রাখো নি চারুদি, বিক্রি করেছিলে।

ওমা, সে কী, ওই বাড়ি আমি বিক্রি করলাম কখন ?

বনমালী একটু হাসিয়া বলিল, দলিলের নকলটা একবার পড়ে দেখো। তিরিশ হাজার নগদ আর ওই টাকার ফাঁস বছরের সুদের দামে তুমি আমাকে বাড়ি বিক্রি করেছ। বরাবব সুদ দিয়ে এলে বলতে পারতে বাঁধা আছে।

মুখ পাংশু হইয়া যাওয়াটা চারু সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারিল না। কী বলিবে হঠাৎ সে ভাবিয়া পাইল না। শেষে বলিল, তুমি হাসছ, তাই বল !

বনমালীর মুখের হাসি অনেক আগেই মুছিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে কিছু বলিল না। জীবনের একটা অভিজ্ঞতাকে বনমালী খুব দামি মনে করিয়া থাকে। তাহা এই যে, বক্তব্য দুবার মুখ দিয়া বাহির করিতে নাই। পুনরুক্তিতে কথার দাম কমিয়া যায়।

চারু আবার বলিল, আমি বলি কি, ত্রিশ হোক বত্রিশ হোক দেনা তো তোমার আমি শুধতে পারছি না, এ বাড়ি দিয়ে তুমিই বা করবে কী, তার চেয়ে বিক্রি করে ফেলে তোমার টাকাটা তুমি নিয়ে নাও, বাকিটা আমাকে দাও। তোমার তিরিশ হাজার কেটে নিলে আমার যা থাকবে তাই দিয়ে দেশে একটা ছোটোখাটো বাড়ি তুলে বাস করিগে। জমিজায়গা যা আছে দু-চার বিঘে তার খাজনা পাই না, ফসল পাই না, নিজে থাকলে একটা ব্যবস্থা হবে।

বনমালী খাওয়া বন্ধ করিল। আজকাল কোনো কিছুতেই সে বিস্ময় বোধ করে না, আকাশের একটা বজ্র পাখি হইয়া পাশ দিয়া উড়িয়া গেলেও না। কিন্তু চারুর কথায় সে যেন অবাক হইয়া গিয়াছে এমনই মুখের ভাব করিয়া বলিল, তুমি এ বাড়ি বিক্রি করতে চাও ? খেপেছ !

চারু সভয়ে বলিল, কেন ? তোমার টাকা তো তুমি পাবে !

আমার টাকা চুলোয় যাক।

চারু আরও ভয় পাইয়া বলিল, রাগ কোরো না ভাই। মেয়েমানুষ, কিছুই তো বুঝিনে !

বনমালী বলিল, ভুবনের বাড়ি বিক্রি করার পরামর্শ তোমাকে দিলে কে ? ও সব দুর্বুদ্ধি কোরো না। সময়টা, কী জান চারুদি, আমারও তেমন সুবিধে যাচ্ছে না। তোমার এই বাড়িটা বন্ধক রেখে কিছু ধার পেয়েছি। একটু সামলে উঠলেই ছাড়িয়ে নেব।

চারু রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, তারপর ?

ভুবনের বাড়ি ভুবন ফিরে পাবে।

গলনালী প্রায় রুদ্ধ করিয়া চারু বলিল, কিন্তু তোমার টাকা ? তোমার তিরিশ হাজার টাকা ?

ভুবনের কাছে জমা থাকবে !

এ কথা কেহ বিশ্বাস করে ! নির্মূল আশার শোকে চারু কাঁদিয়া ফেলিল।

বনমালী বলিল, কেঁদো না চারুদি। আমি কি তোমাব পর ? আগে তুমি আমাকে কত ভালোবাসতে।

শুনিয়া চারুর কান্না থমকিয়া থামিয়া গেল। বনমালী যদি পরিহাস কবিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া আগের কথা তুলিয়া পরিহাস করিয়া থাকে, তবে সত্যসত্যই আর কোনো আশা নাই।

আমি যদি তোমার মনে কোনোদিন ব্যথা দিয়ে থাকি, জেনো—

বনবালী আবার খাওয়া বন্ধ করিল।

তুমি আমার মনে ব্যথা দেবে কেন ?

চারু চোর বনিয়া গেল—যদির কথা বলছি।

বনমালী একেই গম্ভীর, সে আরও গম্ভীর হইয়া বলিল, ভুবন কোথায় চারুদি ?

চারু নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল, ও ভুবন, ভুবন। একবাবটি এদিকে শুনে যাও তো, বাবা।

ঘরের ভিতর হইতে ভুবন থুপথুপ করিয়া পা ফেলিয়া আসিযা দাঁড়াইল। সে অত্যাশ্চর্য মোটা। তাহার গলায় দুটি খাঁজ আছে, মনে হয় গালেও বুঝি খাঁজ পড়িবে।

বনমালী ভাবিল, এই ছেলেকে অত ভালোবাসে, চারু তো আশ্চর্য মেয়েমানুষ !

মাসখানেক পরে পরী শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, আর আসব না দিদি।

আরও একমাস পবে বনমালী তাব বুড়ো মা, আশ্রিত-আশ্রিতা, দাসদাসী ও মোটবহব লইয়া শহরের ভিতরেব বাড়ি ছাড়িয়া চাবুর শহরতলিব বাড়িতে উঠিয়া আসিল। চারুর অনুমান করিতে কষ্ট হইল না যে বনমালীর অবস্থানটা সাময়িক হইবে না।

পাংশু মুখে সে জিজ্ঞাসা করিল, ওখানে কি তোমাদের অসুবিধে হচ্ছিল ভাই ?

বনমালী বলিল, অসুবিধে হলে এতদিন বাস কবলাম কী কবে, চারুদি ? সে জন্য নয়। মনে করছি, বাড়িটা আগাগোড়া মেরামত করব আর দু-খানা ঘর তুলব ছাদে। মাস দুই তোমার এখানেই আশ্রয় নিতে এলাম।

চারুকে বলিতে হইল, আহা আসবে বইকী, সে কী কথা, বেশ কবেছ।

তারপর দুই মাসের মধ্যেও বনমালীর বাড়ি মেরামত আবম্ভ হইল না, ছাদে ঘব উঠিবাব কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। চারু গোপনে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিল, নিজের বাড়ি বনমালী দুইশত দশ টাকায় ভাড়া দিয়াছে। ইতিমধ্যে বনমালীর নিরঙ্কুশ তৈলাক্ত অধিকাব সদবের গেট হইতে পিছনের গলিতে খিড়কির দবজা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেল। অতিথির আদব ও সম্মান পাইয়া চারু তার নিজের বাড়িতে বাস করিতে লাগিল।

বনমালী বলে, অসুবিধে হচ্ছে, চারুদি ?

প্রশ্ন শুনিলে রাগ হয় ।

না ভাই, অসুবিধে কিছু নেই।

কিছুদিন যদি দেশে গিয়ে থেকে আসতে চাও, কেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পার। দেশেটেশে মধ্যে মধ্যে যাওয়া দরকার বইকী !

দেশে কী বাড়ি-ঘর-দোর কিছু আছে ভাই, যে যাব ?

হাজার দুই খরচ করলেই দেশে দিব্যি বাড়ি হয়। জমিজায়গা আছে, খাজনা পাও না, ফসল পাও না, সব লুটেপুটে নিচ্ছে ; নিজে থাকলে লোকসানটা বদ হত।

জমি ! জমি কই দেশে ? কিছু কি আর আছে ভাই আমার, সর্বস্ব গেছে।

বনমালী তখনকার মতো চুপ করিয়া যায়।

তাহার মা হেমলতা বলেন, হ্যাঁরে, ওরা কি যাবে না ?

কোথায় যাবে ?

যে চুলোয় খুশি, আমাদের তা ভাববার দরকার ? কদিন দ্যাখ, তারপর নিজের পথ দেখে নিতে বলে দে।

তাড়িয়ে দিতে পারব না, মা। ও সব আমার ধাতে নেই। নিজে থেকে যায় তো যাবে, নইলে রইল।

কয়েকদিন পরে বনমালী আবার চারুকে বলে, শুনলাম, তুমি নাকি তীর্থে যেতে চাও ? আমায় বলনি কেন চারুদি ? আমি সব ব্যবস্থা করে দিতাম। তোমার ধর্মকর্মে আমি বাধা দেব কেন ?

বুদ্ধির ধার পড়িয়া গেলেও চারু এত বোকা হইয়া পড়ে নাই যে ভুবনকে লইয়া এ বাড়ি হইতে নড়িবে। বনমালীর দুর্বলতা সে জানে। বনমালী সোজাসুজি কাহারও প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখাইতে পারে না। সামনে যে উপস্থিত থাকে তাহার মনে বেদনা দেওয়া বনমালীর সাধ্যাতীত। তার মনের চলাফেরার প্রস্তরময় পথে সে এক পরত মাটি বিছাইয়া ফুল ফুটাইয়া রাখিবারই চেষ্টা করে।

তীর্থদর্শন কামনা রাখার অপবাদ চারু তাই অস্বীকার করে। বলে, কই তীর্থে যাওয়ার কথা আমি তো কিছু বলিনি ? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মামিকে বলছিলাম, স্বামী শ্বশুরের এই তীর্থ ছেড়ে আমার এক পাও কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। মাসিমা বুঝি মনে কবেছেন, আমি তীর্থে যেতে চাই ?

বনমালী একটা হাই তোলে। মেয়েমানুষের এত বুদ্ধি তার ভালো লাগে না।

তবু, দেশ বেড়ালে ভুবনের একটু উপকার হত।

হায়রে কপাল, ওব আবাব দেশ বেড়ানো !

চারু কাঁদাকাটা করার উপক্রম করে।

বনমালী আর কিছু না বলিয়া বাগানে পায়চারি কবিতে যায়। ভাবে, কী আর হইবে, থাক। গ্রামকে গ্রাম ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসিয়া আছে, চারুদিব ভারটা আব এমন কী গুবু !

কাঁকর-বিছানো পথের ঠিক মাঝখান হইতে দুটি কচি সবুজ ঘাসের শীষ বাহির হইয়াছে দেখিয়া বনমালী থমকিয়া দাঁড়ায়। পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া যমজ ভাইয়ের মতো তাদেব দুটিকে সে চাপা দিয়া দেয়। ভাবে, আগে চারুর যদি টাকা না থাকিত !

তারপর একদিন পরী বিধবা হইয়া দিদির কাছে চলিয়া আসিল। ছেলেকে সাবধানে মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে বলিতে লাগিল, দিদি গো, আমার কপাল পুড়েছে গো। কে অভিশাপ দিয়ে আমার এমন করলে গো, কে করলে !

গলায় আঁচল জড়াইয়া পাক দিয়া পরী গলায় ফাঁস দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু হেমলতা ফাঁস খুলিয়া দেওয়ায় সে চেষ্টা সে ত্যাগ করিল। খানিকক্ষণ মেঝেতে কপাল কুটিয়া হাত কামড়াইয়া চেঁচাইয়া এক বিষম কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল ও ছুটিয়া নিজের ঘরে গিয়া দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গলায় সে যে আর ফাঁস দিতেছে না সেটা বেশ বুঝা গেল, কারণ বাহির হইতে ভগবানের কাছে তাহার একটানা আবেদন শোনা যাইতে লাগিল, আমায় নাও ভগবান, এবার আমায় নাও।

বনমালী পরীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, অমন করে কাঁদিসনে পরী ; ছেলের মুখ চেয়ে বুক বাঁধ। নে ওঠ, উঠে মাই দে ছেলেকে, ককিয়ে ককিয়ে গলা যে ওর কাঠ হয়ে গেল রে।

হেমলতা বনমালীর সান্ত্বনা প্রত্যাহার করিয়া নিলেন।

ওকে এখন ও সব বলিস নে বনমালী, কাঁদতে দে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ওর শুনেছি যে দজ্জাল, প্রাণ খুলে সেখানে কী ও একটু কাঁদতেও পেরেছে রে ! এই প্রাণঘাতী শোক জোর করে চেপে রেখে শেষে কী অসুখে পড়বে মেয়েটা ? খানিক কেঁদে নিক।

পরী আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল। বনমালীর বিপদের আর সীমা রহিল না। কান্না তাহার একেবারেই সহ্য হয় না। অথচ উঠিয়া যাইবার উপায় নাই। পরী মনে করিবে, দ্যাখো কী নির্মম ; আমার এমন শোকটা চোখ মেলে একটু চেয়েও দেখলে না !

ওদিকে চারুর সাড়াশব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খানিক পরে দম নিয়া পরী বলিল, ও মাসিমা, দিদি কী করছে দেখুন।

হেমলতা খোকাকে বনমালীর দিকে আগাইয়া দিলেন।

ধর তো দেখেই আসি একবার।

বনমালী হাত বাড়াইল না।

আমি দেখে আসছি।

তুই এখানে বোস। পরীর ছেলেকে নিজের ছেলের কোলে এক রকম ফেলিয়া দিয়াই হেমলতা পলাইয়া গেলেন। খোকাকে সঙ্গে নিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাকে আবার ফিরিয়া আসিতে হইত, সে ইচ্ছা হেমলতার ছিল না। এ সব তাঁহার ভালো লাগে না,—সদ্য বিধবার এই কান্নাকাটি। তা ছাড়া কুপিত বায়ুর প্রকোপে সর্বদা তাহার মনেব মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে, কোনো প্রকার উত্তেজনা হওয়া কবিরাজের নিষেধ। পবের মেয়ের কপাল পোড়ার ঝাঁঝে শেষে কী তাহার তালু জ্বলিবে !

চারুর ঘরের দরজা ঠেলিয়া বলিলেন, দরজা খোলো মা, দরজা খোলো, ও সব কী করতে আছে ? মাথা ঠান্ডা রাখো।

বলিয়া ওদিকের জানালায় সরিয়া গিয়া ঘবের ভিতরে তাকাইয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। শরৎকালের ফাজিল মেঘের মতো চারুর শোক ইতিমধ্যেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ভুবনকে আদব করিয়া সে তাহার মাথায় মাখাইতেছে কবিবাজি তেল।

হেমলতা চলিয়া গেলে পরী উঠিয়া বসিল। বনমালীর কাছে একা একা কাঁদিতে তাহার লজ্জা করে। মুখ হইতে এলোচুল সরাইয়া সে ভগ্নস্বরে বলিল, খোকাকে দিন, হাতটা বোধ হয় ওর ভেঙেই গেল।

খোকাকে তার কোলে দিয়া বনমালী বলিল, তোর ছেলেটা তো বেশ হয়েছে রে !

থাক, আপনাকে আর ঠাট্টা করতে হবে না।

বনমালীর দিকে পিছন করিয়া বসিয়া পরী খোকার মুখে মাই তুলিয়া দিল।

এবার বনমালী উঠিয়া যাইতে পারে, যাওয়াই সংগত ; কিন্তু সে বসিয়াই রহিল। পরীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বনমালীর চেতনা কোনোদিন বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ছিল না। সে তার কাছে চিরদিনই চারুর ছোটো বোন। আজ বনমালী লক্ষ করিল যে বিধবার বেশ ধারণ করায় পরীকে কমবয়সি চারুর মতো দেখাইতেছে। তার ব্যবহার, তার মনোবিকার, তার কথা বলিবার ভঙ্গি যেন চারুর যৌবনকাল হইতে নকল করা। কেবল চারুর চেয়ে সে স্পষ্ট, স্বচ্ছ।

তোর ঘাড়ে কী লেগে আছে রে, পরী ?

ঘাড়ে হাত বুলাইয়া পরী জবাব দিল, কী লেগে থাকবে ? কিছু না।

তুই পাউডার মেখেছিস ?

পরী জোরে নিশ্বাস নিয়া বলিল, মেখেছিই তো, একশোবার মেখেছি। আপনি কেন আমায় কালো বলেন ?

পরীর বৈধব্যের আঘাতেই বোধ হয় চারুর মাথা আর একটু খারাপ হইয়া গেল। চল্লিশ বছর বয়সেই তাহার চুলে এবার পাক ধরিল, কোমরে বাত দেখা দিল আর পেটে হইল অম্বল। শোক আর অম্বলের

মধ্যে কোন কারণে তাহার বুক সর্বদা জ্বালা করিতেছে সেটা আর সব সময় ঠিকমতো বুঝিবার উপায় রহিল না।

হেমলতার কাছে সে কাঁদিয়া বলে, আমার মতো অবস্থা মাসিমা শত্রুরও যেন না হয়, দিনরাত ভগবানের কাছে এই কামনা জানাচ্ছি। কোনোদিকে কূলকিনারা নেই মাসিমা, আমি অকূলে ডুবেছি।

হেমলতা বিরক্ত হন। মুখে বলেন, মাথা ঠান্ডা রাখো।

মাথা চারু ঠান্ডা রাখিতে পারে না, ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা গরম করে। একটা পেটের ছেলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, ছেলে নিয়া কচি বোনটাও আসিয়া ঘাড়ে চাপিল। সে কোনদিক সামলাইবে ?

পরীকে সে জিজ্ঞাসা করিল, কিছু রেখে গেছে ?

না।

কিছু না ? পোস্টাফিসে, ব্যাঙ্কে, তোর নামে কিছুই রেখে যায়নি ?

কী রোজগার করত যে রেখে যাবে দিদি ? মাস গেলে হাত খরচের টাকার জন্য বাপের কাছে হাত পাতত, রেখে যাবে !

আমি যা দিয়েছিলাম ?

শ্বশুরের সিন্দুকে ঢুকেছে—খাটপালঙ্ক ছাড়া।

চারু কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, তোর গয়নাও দেযনি নাকি ? তোকে যে আমি তেবো চোদ্দ হাজারের গয়না দিয়েছিলাম রে !

কিচ্ছুটি আমাকে দেয়নি দিদি, সব আটকে রেখেছে। আঁচল থেকে চাবি কেড়ে নিযে বাক্সো খুলে শ্বশুর নিজে সব বার করে নিল। খোকার গয়না পর্যন্ত।

এমন চামার ! তা, আর দুটো মাস তুই ধৈর্য ধরে থাকলি না কেন ? কেমন করে আদায় করে নিতে হয় আমি দেখতাম।

বড়ো খারাপ ব্যবহার করে দিদি, থাকতে ভালো লাগল না।

চারু হঠাৎ রাগিয়া উঠিল, থাকতে ভালো লাগল না ! মেয়েমানুষের অত ভালো লাগা মন্দ লাগা কি লো, যা, কালকেই ফিরে যা তুই,—বুড়ো মরবার সময় খোকাকে তো কিছু দিয়ে যাবে।

পরী ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, আছে ছাই, দিয়েও যাবে ছাই। সাত ছেলের একটা রোজগার করে ? তাদের দিয়ে যেতে হবে না ? ও বাড়ি আমি আর যাচ্ছি না বাবু, হ্যাঁ।

চারু আগুন হইয়া বলিল, ছেলে তবে তোর মানুষ করবে কে শুনি ? তোকে খাওয়াবে কে শুনি ? আমি ! আমার আর সেদিন নেই পরী, বনমালী তাড়িয়ে দিলে নিজের ছেলে আমার খেতে পাবে না।

আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না দিদি, বলিয়া মুখ ঘুরাইয়া পরী চলিয়া গেল।

চারু দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না দিদি ! ভাবতে হবে না তো আমার বাড়িতে এসেছিস কেন লো হারামজাদি ?

তিনদিন পরীর সঙ্গে সে কথা কহিল না। কিন্তু তাহাতেও পরীর কিছুমাত্র অনুতাপের লক্ষণ নাই দেখিয়া চারুর নিজের হাত পা কামড়াইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল।

দ্যাখ পরী, এত বাড় ভালো নয়।

নয় তো নয়, কী হবে ?

খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করিনি তোকে আমি ?

সবাই করে থাকে, তুমি একা নও।

চারু বনমালীর শরণ নিল।

মেয়েটা নিজের সর্বনাশ করছে ভাই। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এলে তাদেরই সুবিধে, একেবারে বঞ্চিত করবে।

বনমালী কাজের ভিড়ে ব্যস্ততার ভান করিয়া বলিল, আহা, যাবে বইকী চারুদি, যাবে। দুদিন জুড়িয়ে গেলে ক্ষতি কি ?

চারু আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

পরদিন পরী মুখভার করিয়া বলিল, লেগেছ তো পেছনে ? জগতে কারও ভালো করতে নেই।

তুই আবার কবে আমার কী ভালো করলি লো ?

এখানে আছ কার জন্য ? ভেবে দেখেছ একবার ?

চারু চোখ পাকাইয়া বলিল, তোর জন্য, না ? তুই দয়া করে থাকতে দিয়েছিস !

তাই।

চট করিয়া ঘুরিয়া দমদম পা ফেলিয়া পরী চলিয়া গেল। চারু নিজের ঘরে গিয়া দেয়ালকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, ওর জন্য আমি আর কিছু করব না। করব না, করব না, করব না ; এই তিন সত্যি করলাম, নারায়ণ সাক্ষী।

পরীর ঔদ্ধত্য তার কাছে বেশিদিন অন্ধকার হইয়া রহিল না। ক্রমে ক্রমে ব্যাপারখানা বোঝা গেল।

বনমালীর খাওয়ার সময় চারু উপস্থিত থাকে, কয়েক দিন পরে পরীকেও দেখা যাইতে লাগিল। চারুর চেয়ে সে বনমালীর বেশি কাছ ঘেঁষিয়া বসে, চারুর হাতের পাখা আগেই দখল করিয়া রাখে, চারুর মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া বলে, খান, পেট আপনার ভরেনি। কখ্খনো ভরেনি। আমি বুঝি না ! ওই খেয়ে মানুষ বাঁচে ?

বলে, কাল আপনাকে পেঁপের ডালনা রেঁধে দেব। খেয়ে দেখবেন বেশ রাঁধি।

চারু এমন করিয়া বলিতে পারে না, এমন স্নেহসিঞ্চিত গাঢ় কণ্ঠে, এমন মনোহর আবদারের ভঙ্গিমায়। অবাক হইয়া সে বোনের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

পরী বলে, হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছ দিদি ? দুধটা এনে দাও ! খাওয়া যে হয়ে এল, উঠে গেলে ভালো হবে ?

পরী যেন বনমালীর ছায়াটিকে বেদখল করিতে চায়। আশেপাশে কোথাও সে সর্বদা আছেই। বনমালীকে কখনও চুরুট খুঁজিতে হয় না, ওষুধ খাইতে ভুলিয়া যাইতে হয় না, দিনের মধ্যে দু-চার মিনিটের জন্য কারও সঙ্গে হালকা কথা বলিবার সাধ জাগিলে কেমন করিয়া টের পাইয়া পরী আসিয়া দাঁড়ায়, বলে, স্নান করতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখে যাই আপনি কী করছেন।

রাত্রে বনমালী বিছানায় শুইলে চুপিচুপি ঘরে আসে।

বলে, কী চাই বলুন।

বনমালী হাসি গোপন করিয়া বলে, পা কামড়াচ্ছে—কেষ্টকে ডেকে দিয়ে যা। আর কিছু চাই না। পরী বলে, কেষ্ট কেন ? আমি কি পা টিপতে জানিনে ?

অবশ্য পা সে টেপে না, অত বোকা পরী নয় ; কেষ্টকেই ডাকিয়া দেয়। হুকুম দিয়া যায়, যাবার সময় আলো নিভিয়ে দিস কেষ্ট।

ছেলের দিকে চাহিবার সময় পরীর হয় না। ঝির কোলে পরীর ছেলে প্রায়ই মাতৃস্তন্যের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

বনমালীর চারিদিকে পরী যে বৃত্ত রচনা করিয়া রাখে তার পরিধির বাহিরে চারু পাক খাইয়া বেড়ায়, কোথাও প্রবেশের ফাঁক দেখিতে পায় না।

ভাবে, কী মেয়ে বাবা ! ও দেখছি সর্বনাশ করে ছাড়বে !

একদিন একটু বেশি রাত্রে খুব বাদল নামিয়াছে।

খানিক বর্ষণের পর অবিরত বিদ্যুৎচমক আর বজ্রপাত আরম্ভ হইয়া গেল ; প্রকৃতির সে এক মহামারী কাণ্ড।

চারু ভাবিল, অন্য ঘরে একা একা পরী বড়ো ভয় পাইতেছে।

উঠিয়া দরজা খুলিয়া সে বাহিরে আসিল। একটু খোঁজখবর নিলে পরী খুশি হইবে। বনমালীকে ও যেরকম বাগ মানাইয়া আনিতেছে ওকে একটু খুশি রাখা দরকার বইকী !

নিশুতি রাত, বাড়িটা এক একবার প্রাণঘাতী আলোয় চমকাইয়া উঠিয়া অন্ধকারে আড়ষ্ট হইয়া যাইতেছে। চারু পা চালাইয়া বারান্দাটুকু পার হইয়া গেল। কী জানি, একটা বজ্র যদি তাহার ঘাড়েই আসিয়া পড়ে।

পরীর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলিতে খুলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে দু-পা আগাইয়া চারু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এ দৃশ্য তাহাকে দেখিতে হইবে চারু তাহা কল্পনাও করে নাই। মেঘগর্জনে পরী ভয় পাইবে এ আশঙ্কা কয়েক মিনিটের জন্যও তাহার পোষণ করার প্রয়োজন ছিল না। পরী একা নয়। বনমালীর বুকের কাছে যদিও সে জড়োসড়ো হইয়াই তাহার কথা শুনিতেছে, সেটা ভয়ে নয়।

খোকার ছোটো বিছানাটি মেঝেতে নামানো, বিছানা হইতে গড়াইয়া বনমালীর এক পাটি জুতা দু হাতে বুকের কাছে আঁকড়াইয়া ধরিয়া খোকা শান্তভাবে ঘুমাইয়া আছে।

পা হইতে মাথা অবধি চারু একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করিল। একটা ভয়ানক চিৎকার করিয়া বিছানায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরীকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেওয়ার জন্য, গলা টিপিয়া তাহাকে একেবারে মারিবার জন্য, সে একটা অদম্য অস্থির প্রেবণা অনুভব কবিতেছিল।

কিন্তু সংসারে সব কাজ করা যায় না। কাকে সে কী বলিবে ? এটা তাহাব বোনের শয়নঘব, কিন্তু ঘরের মালিক বনমালী। বনমালীকে কিছুতে বলা যায়ই না, পরীকে কিছু বলিলেও বনমালী নিজে অপমানিত জ্ঞান করিবে। দারোয়ান দিয়া এই রাত্রেই যদি তাহাকে আর ভুবনকে বনমালী বাহির কবিয়া দেয়, আটকাইবে কে ? ছেলের হাত ধরিয়া এই দুর্যোগে সে যাইবে কোথায় ?

চারু আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দরজা যেমন ভেজানো ছিল, তেমনই ভেজাইয়া দিল।

আকাশে এখনও বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চিড় খাওয়া বিদ্যুৎ। চারু ভাবিতে লাগিল, এ কী মহা বিস্ময়ের ব্যাপার যে পরী শেষ পর্যন্ত বনমালীকে জয় করিয়া ছাড়িল, সেদিনকার কচি মেয়ে পরী ! এমন মূল্য দিয়াই সে বনমালীকে কিনিয়া নিল যে তার ছেলের সমগ্র ভবিষ্যৎটা সোনায় মণ্ডিত হইয়া গেল। বনমালী এইবার সারা জীবন অনুতাপ করিবে আর পরীর ছেলের পিছনে টাকা ঢালিবে !

হয়তো ভুবনকে না দিয়া এ বাড়িটা সে পরীকেই দান করিবে। বলিবে, ভুবন আর বাড়ি দিয়ে করবে কি চারুদি ? পবীকেই দিয়ে দিলাম।

ঘরে গিয়া খাটে বসিয়া ছেলের গায়ে হাত রাখিয়া চারু অনেকক্ষণ চুপচাপ ভাবিল।

সে জানে উহারা তাহার যাওয়াআসা টের পাইয়াছে। পাক টের। কাল তারা যদি তাহার কাছে লজ্জা বোধ না করে, তাহারও লজ্জা পাইবার কোনো কারণ থাকিবে না। পরী তাহার কে ? কেউ নয়। ছুঁইতেও ঘৃণায় গা শিহরিয়া উঠিল বলিয়া সে যাহার চোখ দুটা উপড়াইয়া আনিল না, সে তাহার বোন হইবে কোন দুঃখে ? কপাল পুড়িয়া যাওয়ার তিন মাসের মধ্যে এমন কাজ যে করিতে পারে বাড়ির ঝি-এর চেয়েও সে পর, অনাত্মীয়া। ওর অক্ষয় নরকের সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্ক নাই।

মনে মনে মস্ত এক প্রতিজ্ঞা করিয়া আঠারো বছরের ঘুমন্ত ছেলের মাথায় সস্নেহে চুমা খাইয়া চারু মেঝেতে তাহার সংক্ষিপ্ত কম্বলের শয্যায় নামিয়া গেল।

এ বাড়িতে পাপের বন্যা বহিয়া যাক, এ ঘরখানাকে সে পবিত্র মনে করিবে।—যতদিন বাঁচে সপুত্র এই ঘরের বায়ু সে নিশ্বাসে গ্রহণ করিবে। বাহিরে এমন বৃষ্টি হইয়া গেল, তাহাদের গায়ে লাগিল কি ? বাহিরে যত অন্যায়ই ঘটিয়া চলুক তাহাদের গায়ে ছোঁয়াচ লাগিবে না।

এই কথাটা বারবার ভাবিয়া এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করিয়াও চারু কিন্তু সমস্ত রাত ঘুমাইতে পারিল না। পরীর আদিম শৈশবের ইতিহাস ছায়াছবির রূপ নিয়া তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বাপের বাড়ির গ্রামে পরী যখন ছেঁড়া ডুরে পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, আর বিবাহের পর এখানে আসিয়া পিঠে বেণি দুলাইয়া স্কুলে যাইত, তখনকার কথা। কত আদরে কত যত্নে তাকে সে মানুষ করিয়াছিল। সেই পরী যে আজ তাহার ভুবনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া নেওয়ার জন্য এমন ভাবে নিজের সর্বনাশ করিল এর আকস্মিকতা এর অসামঞ্জস্য সমস্ত রাত চারুকে অভিভূত করিয়া রাখিল।

বনমালীকে ভালোবাসিয়া, যৌবনের অপরিতৃপ্ত অসংযত ক্ষুধায় অথবা নেহাত ছেলেমানুষি খেয়ালে যে পরী এই নিদারুণ ভুল করিয়া থাকিতে পাবে, চারুব মনে ঘুণাক্ষরেও সে কথা উদিত হইল না। যাহার বিবাহ হইয়াছে, যে তিনবছর স্বামীব ঘর করিয়াছে, বিশেষ করিয়া যে তাহার বোন, তাহার মধ্যে ও সব পাগলামি চারু কল্পনা করিতে পারে না। চল্লিশ বছরের জীবনে কাহারও মধ্যেই আভিজাত্যের চিহ্ন তো সে খুঁজিয়া পায় নাই।

মতলব থাকে। যে দিকে যে ভাবে মানুষ পা ফেলুক, পিছনে মতলব থাকে।

বনমালীর আটত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছে। টাকা ছাড়া তার আর কী আছে যে তার টানে মেয়েমানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে ? মানুষটা একটু অদ্ভুত, একটু গভীর। প্রথম বয়সে মনে মনে সেও তাহাকে একটু ভয় করিত। মনে হইত তাহার ভিতরটা কী কারণে মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া পাক খাইতেছে, তার বড়ো যন্ত্রণা। তখন বনমালী যুবক। তার মধ্যে সে তো তখনও কোনো আকর্ষণ আবিষ্কার করিতে পাবে নাই ! তার নৈকট্যকে, তার নির্বাক আবেদনকে, তার দুচোখের গভীর তৃষ্ণাকে, সে যে কতবার অপমান করিয়াছে তার হিসাব হয় না।

তার সঙ্গে কথা কহিবার সময়ও কি সব সময় সে পাইত !

তাহার কাছে মানুষ হইয়া পবী কি তাহাব মনের জোর এতটুকু পায় নাই ? অসহায় আক্রোশে থাকিয়া থাকিয়া চারুব মনে হইতে লাগিল, এর চেয়ে সেই যদি সে সময় বনমালীর নিকট আত্মসমর্পণ করিত তাও ভালো ছিল, এ রকম বিপদ ঘটাইবার সুযোগ পরী আজ তাহা হইলে পাইত না।

চারুর জীবনে অন্ধ আবেগের স্থান ছিল না। সমস্ত জীবন তাহাকে সংসাবের এলোমেলো বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। প্রথম জীবনে তাহার লড়াই ছিল অভাবেব সঙ্গে আর গ্রামের দু-তিনটি যুবকের স্বভাবের সঙ্গে। বিবাহের পর তাহার লড়াই শুরু হইয়াছিল ধনসম্পদের পলাতক প্রবৃত্তির সঙ্গে আব নিজেকে সামলাইয়া না চলার দুরন্ত ইচ্ছার সঙ্গে। এর কোনোটাই সহজ ছিল না। পুরুষ অভিভাবকের অভাবে সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে তাহার যেমন প্রাণান্ত হইত, অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে পাগলা স্বামীকে খাপ খাওয়াইতেও তাহার তেমনই অবিরাম নিজেকে শাসন করিয়া চলিতে হইত। হাতে টাকা, দেহে রূপ, মনে অতৃপ্ত যৌবন—এ রকম ভয়ানক সমন্বয় ঘটিয়াছিল বলিয়া সারাজীবন তাহাকে অনেক ভুগিতে হইয়াছে।

চারুর হৃদয়ের কতকগুলি স্থান তাই ভয়ানক শক্ত।

পরদিন সকালে সে নিজে গিয়া পরীকে ডাকিয়া তুলিল, কিছুই যেন ঘটে নাই এমনিভাবে বলিল নে, ওঠ এবার। অনেক বেলা হয়েছে।

পরী সাড়া দিল না। পায়ের বুড়া আঙুলের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

খোকাকে তুলিয়া নিয়া বাহিরে আসিয়া চারু হাঁফ ছাড়িল।

কিন্তু তখনও আর একজন বাকি।

বনমালীকে চারু আবিষ্কার করিল বাগানে।

এক মুহূর্তের জন্য তার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। এই বাগানে এক স্বপ্নধূসর সন্ধ্যায় বনমালী এক রকম জোর করিয়াই একদিন তাকে প্রায় চুম্বন করিয়া বসিয়াছিল। সেদিন যদি সে বাধা না দিত !

গাছের ডাল হইতে টপটপ জল পড়িতেছিল। কতকগুলি ফুলের গাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চারু বলিল, কী বৃষ্টিটাই কাল হয়ে গেল !

বনমালী বলিল, বেশ ঠান্ডা পড়েছে।

হ্যাঁ। কদিন গরমে প্রাণটা গেছে—আমি আজ একবার তারকেশ্বর যাব ভাই।

বনমালী আচমকা বলিল, ক্ষেন্তির মা দুশো টাকা চেয়েছে, মেয়েকে নিয়ে কাশী যেতে চায়, তুমি যাবে ওদের সঙ্গে ?

চারু মাথা নাড়িল।

কাশী মাথায় থাক, তোমাদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না ভাই। ক্ষেন্তির মার কী ? হুট বলতে ও যেখানে খুশি যেতে পারে, আমরা পারিনে। আমাদের মায়ামমতা আছে। বিশ বছর ধরে যার সঙ্গে—

চারু একটা নিশ্বাস ফেলিল।

তারকেশ্বর রওনা হওয়ার আগে চারু বলিয়া গেল, ভুবন রইল ভাই, একটু দেখো। আর শোনো, কাল পরীর একাদশী, এই বয়সে ওর একাদশী করাব কী দরকার কে জানে ! কথা কি শুনবে মেয়ে ! তোমাকে মানে, ফলটল যদি খাওয়াতে পার একটু চেষ্টা দেখো ভাই।

আগে, চারুর সরকার প্রথমে গিয়া একটা আস্ত বাড়ি ভাড়া করিয়া আসিত তবে চারু তারকেশ্বর যাইত। এবার সে সোজাসুজি যাত্রীনিবাসে গিয়া উঠিল।

প্রত্যেক দিন এই মানত করিয়া সে দেবতার কাছে পূজা দিল যে তার ফিরিয়া যাওয়ার আগেই পরী যেন কলেরা হইয়া মরিয়া যায়। পরীর যে আর বাঁচিয়া থাকার দরকার নাই দেবতাকে এই কথাটা সে খুব ভালো করিয়াই বুঝাইয়া দিল।

পরীর ছেলে ? পরীর ছেলেকে সে মানুষ করিবে।

তৃতীয় দিন মন্দিরে পূজা দিয়া যাত্রীনিবাসে ফিরিয়া চারু দেখিল, একটি বউয়ের কলেরা হইয়াছে। তাকে বিদায় করিবার ষড়যন্ত্র আর পলায়নপর যাত্রীদের কোলাহলে যাত্রীশালা সরগরম।

সকালে বউটির সঙ্গে চারুর পরিচয় হইয়াছিল। স্বামীর অম্বলের অসুখের জন্য ছেলেমানুষ দেওরকে সঙ্গে নিয়াই মরিয়া হইয়া সে ধর্না দিতে আসিয়াছে। বউটির নাম কনক, বয়স অল্প ; থুপথুপ করিয়া পা ফেলিয়া ওর চলার ভঙ্গি অনেকটা পরীর মতো !

দেওর শিশুকে দুধ খাইতে দিবে বলিয়া সকালে চারুর কাছে একটি পাথরের বাটি ধার করিতে আসিয়াছিল। ঘনিষ্ঠতা হইতে মিনিট দশেক লাগিল বইকী !

হ্যাঁ মাসিমা, কদিন থাকবেন আপনি ?

চারু হিসাব করিয়া বলিল, আজ নিয়ে হল তিনদিন, আরও পাঁচ-ছ দিন থাকবার ইচ্ছে আছে, এখন বাবা যা করেন। পরের কাছে পাগল ছেলে ফেলে এসেছি মা, থাকতে কি মন চায় ! কিন্তু দেখি কটা দিন, ছেলেটাকে কেমন যত্নআত্তি করে। আমি চোখ বুজলে ওদের কাছেই তো থাকতে হবে। বোসো বাছা এইখেনে, পা গুটিয়েই বোসো না, বিছানা একটু নোংরা হয়তো হবে। তুমি বুঝি ভাবছ

ছেলেকে ওরা কী ভাবে রাখছে ফিরে গিয়ে আমি তা কী করে জানব ? এতকাল একটা জমিদারি চালিয়ে এলাম, আমার কি ও সব ভুল হয় বাছা ? সে ব্যবস্থা করেই এসেছি, আমাদের পদ্ম ঝিকে দুটো টাকা দিয়ে এসেছি, চোখ দিয়ে সব দেখবে, কান দিয়ে সব শুনবে, ফিরে গেলে আমায় সব বলবে।

এখানে আসিয়া চারু কথা বলিয়া বাঁচিয়াছে। বাড়িতে থাকিলে ভাষার একটু সংযম দরকার হয়, কে জানে কে গ্রাম্য মনে করিবে, বুড়ি মনে করিবে !

কিন্তু যে যার হৃদয়-চর্চা নিয়া থাকে।

কনক বলিয়াছিল, আপনি তাহলে আছেন কদিন ? আমার দেওরকে একটু দেখবেন মাসিমা। বাবার দয়া হতে, দুদিন লাগে কি তিনদিন লাগে ঠিক তো কিছু নেই, একা কি করে থাকবে এখানে ভেবে বড়ো ভাবনা হচ্ছিল। আপনি যখন রইলেন তখন অবিশ্যি আর—

কনক একটু হাসিয়াছিল, শিশুকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, মাসিমাকে প্রণাম কর শিশু।

কাল কনক ধর্না দিবে স্থির হইয়াছিল, এখন আজ তাদের এই বিপদ।

ছেলেমানুষ শিশু একেবারে দিশেহারা হইয়া গিয়াছে, যে যা বলিতেছে তাই করিতে গিয়া কিছুই সে করিতে পারিতেছে না।

এদিকে যাত্রীনিবাসের কর্তা একটা গাড়ি ডাকাইয়া আনিয়া ক্রমাগত বলিতেছে, যাও না হে ছোকরা, হাসপাতালে নিয়ে যাও না, সবাইকে মারবে নাকি ? আচ্ছা বেযাক্কেলে লোক বাপু তুমি, কথাটা জানাজানি হবার আগে আমাকে একবার বলতে নেই ! দেখুন, আপনারা কেউ যাবেন না, কোনো ভয় নেই—আমি বলছি কোনো ভয় নেই। রুগি হাসপাতালে পাঠিয়ে এখুনি প্রত্যেক ঘরের চৌকাঠ থেকে চাল পর্যন্ত ডিসেনফিট করে দিচ্ছি।...আপনাদেব যদি কিছু হয় তো আমায় বলবেন তখন !

হলে আর তোমায় বলে কী হবে বাপু ? এই ধরনের প্রশ্ন করিলে যাত্রীনিবাসের কর্তা চোখ লাল করিয়া একবার তার দিকে তাকাইতেছে, কিন্তু কোনো জবাব দিবাব লক্ষণ দেখাইতেছে না।

চারু সঙ্গের চাকরকে গাড়ি আনিতে পাঠাইয়া দিল।

শিশু এতক্ষণ তাহাকে দেখিতে পায় নাই, এবার তাহাব দিকে চোখ পড়ায় সে যেন অকূলে কূল পাইল।

মাসিমা, দেখুন না এবা জোর কবে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আপনি একটু বলে দিন না ?

চারু বলিল, তা যাও না বাছা, হাসপাতালেই নিয়ে যাও। এখানে কি চিকিৎসে হয় ? তাবপর ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, এখনও একজন ডাক্তার ডাকোনি, করেছ কী ? ডাক্তার আনতে পাঠাও বাছা, আগে ডাক্তার আনতে পাঠাও। তারপব অন্য কথা। বলিয়া নিজেব ঘরে ঢুকিয়া দবজা বন্ধ করিয়া দিল।

বাহির হইল গাড়ি নিয়া চাকর ফিবিয়া আসিলে।

শিশুকে ইশারায় কাছে ডাকিয়া বলিল, আমার পাথরেব বাটিটা ?

বাটিটা বউদি নোংবা করে ফেলেছে, মাসিমা।

চারু বিরক্ত হইয়া বলিল, কেন নোংরা কবেছে ? পরের জিনিস নিলে সাবধানে রাখতে হয় বাবু। আচ্ছা, যা করেছে বেশ করেছে, এবার বাটিটা এনে দাও.

একটু দাঁড়ান, ধুয়ে দিচ্ছি।

চারু অনাবশ্যক রূঢ়তার সঙ্গে বলিল, দাঁড়াবার আমার সময় নেই বাছা, তোমার বাটি ধোবার জন্য গাড়ি ফেল করব নাকি ? যেমন আছে তেমনই এনে দাও।

শিশু আর কথা না কহিয়া বাটি আনিয়া দিল। চারু তার একখানা পরনের কাপড় মাটিতে বিছাইয়া বলিল, এইতে দাও। অনেক পবত কাপড়ে বাটিটা সন্তর্পণে জড়াইয়া পুঁটলি করিয়া চারু

সেটা আলগোছে তুলিয়া নিল। নিজের জিনিস ফিরাইয়া নিয়া চোরের মতো কয়েকবার চারিদিকে চাহিয়া শিশুর হাতে দশ টাকার একটা নোট গুঁজিয়া দিয়া সে পলাইয়া আসিল।

বাড়ি ফিরিয়া ধুলাপায়ে সকলের আগে চারু পরীর হাতে পাথরের বাটিতে নির্মাল্য তুলিয়া দিল।

বলিল, এক হাতে নয়, দুহাতে ধর। ছেলের মা তুই তোর তো সাহস কম নয় পরী ! কপালে ঠেকিয়ে খেয়ে ফেল।

দুটো ভাত যে দিদি।

ভাত নয় প্রসাদ, খা।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে পরীর নির্মাল্য পান চাহিয়া দেখিল। তারপর বাটিটা নিয়া স্নানের ঘরে সাবান দিয়া সোডা দিয়া অনেকবার মাজিল। নিজে একঘণ্টা ধরিয়া স্নান করিয়া আসিয়া বেতের বাস্কেট হইতে দেবতার ফুল বাহির করিয়া ভুবনের কপালে ছোঁয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোকে সকলে ভালোবেসেছে ভুবন ?

ভুবন অস্বীকার করিল।

তোমার কাছে পালিয়ে যাচ্ছিলাম, কেষ্ট আমায় ধরে আনল কেন ? আমায় ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।

চারু ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, কীরে পদ্ম ? সকলের ভাবসাব কী রকম দেখলি বল তো !

পদ্ম জানাইল সকলের ভাবসাব মন্দ নয়। আবার ভালোও নয় কিন্তু। দুয়ের মাঝামাঝি। পরী তার ভাগনেকে ঠিক সময় মতো না হোক ডাকিয়া খাওয়াইয়াছে, মার জন্য হাউহাউ করিয়া কাঁদিলে ভোলানোর চেষ্টাও যে করে নাই এমন নয়। তবে চোখে চোখে ওকে কেউ রাখে নাই। কাল দুপুরবেলা ভুবন চুপিচুপি পলাইতেছিল, পদ্ম দেখিতে পাইয়া কেষ্টকে দিয়া ধরাইয়া আনিযাছে। গোলমাল শুনিয়া আসিয়া বনমালী তাকে কয়েক ঘণ্টা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

কী জান মা, মার মতো কেউ কি করে ?

চারু বলিল, আমি যে চিরকাল বাঁচব না পদ্ম, তখন কী হবে ? মারধব করেনি তো কেউ ?

ধরিয়া আনিবার সময় কাল কেষ্ট বুঝি ভুবনকে একটু মারিযাছিল, কিন্তু পদ্ম সে কথা গোপন করিয়া গেল।

না মারধর কেউ করেনি।

চারুর পুরা নাম চারুদর্শনা, পরীর পুরা নাম পরীরাণী। এগুলি কেবল যে নাম তা নয়। মানানসই নাম।

সারাদিন পরীকে চারু আজ বিশেষভাবে সুন্দরী দেখিল,---অপরূপ, অভিনব। পরী যতবার তার লাল-করা ঠোঁট দুইটি ফাঁক করিয়া হাসিল, ততবারই চারুর সর্বাঙ্গে একটা শিহরন বহিয়া গেল।

ভাবিল, না, এত রূপ নিয়ে সংসারে থাকাটা কিছু নয়। চাদ্দিকে আগুন জ্বেলে দিত বই তো নয়।

শরীরটা চারুর ভালো লাগিতেছিল না। সে সকাল সকাল শুইয়া পড়িল। একটা আশঙ্কা সে মন হইতে কোনো মতেই দূর করিতে পারিতেছিল না যে, আজ রাত্রেই যদি পরীর কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পায় ভুবনকে কোথাও সরানোর সময় পাওয়া যাইবে না। তারকেশ্বরের সেই বউটির ভেদবমির কথা স্মরণ করিয়া চারুর গা ঘিনঘিন করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল একটা নোংরামির মধ্যে সে শুইয়া আছে, বিছানাটা অপবিত্র, অশুচি।

সম্ভবত মনের ঘেন্নাতেই খানিক পরে চারুর বমি আসিতে লাগিল।

আর খানিক পরে সে প্রথমবার বমি করিল। একবার বমি করিয়াই তার মনে হইল সমস্ত শরীরের রস তার শুকাইয়া গিয়াছে।

বমির শব্দে পরী উঠিয়া আসিয়াছিল, চারু কাঁদিয়া তাকে বলিল, ও পরী, আমার কলেরা হয়েছে, বনমালীকে ডাক শিগগির।

বনমালী উঠিয়া আসিল। ডাক্তারকে ফোন করা হইল।

ডাক্তার আসিল একঘণ্টা পরে। ইতিমধ্যে চারুর মাথা একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে। বিড়বিড় করিয়া আপন মনে কী যে সে বকিতে লাগিল কেহ তার মানে বুঝিল না। মানে বুঝুক আর না বুঝুক বনমালী বারকতক তাকে শুনাইয়া দিল যে ভুবনের জন্য তার কোনো ভয় নাই, ভুবনের ভার সে নিল।

পরীর মনে হইল তারও কিছু বলা দরকার।

ভুবনকে আমি চোখে চোখে রাখব দিদি, চোখের আড়াল করব না কখনও।

কিন্তু মরিয়া গেলেও চারু কি ইহার একটি কথা বিশ্বাস করে! চল্লিশটা বছর সংসারে বাস করিয়া শিক্ষা পাইয়াছে শুধু মৃত্যু কেন, মৃত্যু যাহার বিধান তারও বোধ হয় ক্ষমতা নাই সে শিক্ষা তাহাকে ভুলাইয়া দেয়।

কদিন পরী খুব কাঁদিল। দিদি আমায় বড়ো ভালোবাসত, এই কথা বনমালীকে সে কতবার যে শোনাইল তার ইয়ত্তা নাই। বনমালী সভয়ে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল।

তখন পরী সভয়ে কান্নাও বন্ধ করিল এবং সুরও বদলাইয়া ফেলিল।

একদিনের তরে সুখ কাকে বলে জানেনি। তারপর ওই তো ছেলে। গিয়েছে না বেঁচেছে।

বনমালী বলিল, শরীরও ভেঙে গিয়েছিল।

পরী বলিল, হ্যাঁ। অম্বলের অসুখটা হবার পর থেকে একরকম মরবার দাখিল হয়েছিল।

অথচ একটু যত্ন হয়নি।

না। নিলে তো কারও যত্ন ' তেমন মানুষই ছিল না দিদি। সকলের সেবাই করেছে প্রাণপণে, পরের জন্য খেটে খেটে প্রাণটা দিয়েছে।

আড়চোখে চাহিয়া আবার বলিল, বড়ো ঘা খেয়ে গেল। আমাদের একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল, কী বল ?

হলে না কেন ?

পরী হাসিয়া বলিল, বাঃ, বেশ ; আমি হলাম মেয়েমানুষ, আমাদের কি অত হিসাব থাকে ? তুমি ঘরে এলে আমার বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুল হয়ে যায়, সাবধান থাকব !

বনমালী বলিল, তাই নাকি !

চারুর মৃত্যুর পর বনমালী দিনে অথবা রাত্রে কখনও পরীর ঘরে আসে নাই। দুর্ভাবনার পরীর আর সীমা ছিল না। চুলে সেদিন সে অল্প একটু তেল দিল, এলোচুলে একটু স্নিগ্ধ রুক্ষতাই ভালো মানায়। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ভাবিবার পর বাটিতে পাতলা করিয়া আলতা গুলিয়া গালে লাগাইয়া সিল্কের রুমাল দিয়া মুছিয়া নিল। ছোটো একটি পান সাজিয়া মুখে নিয়া একটু চিবাইয়া ফেলিয়া দিল।

তারপর বনমালীর বেড়াইতে যাওয়ার সময় সামনে পড়িয়া একটু হাসিল।

শোনো। কাছে সরে এসো, কানে কানে বলি। একটা ফিডিংবোতল এনো, আমি মরুভূমি হয়ে গেছি। আনবে তো ?

আনব। পদ্মর কাছে খোকা ভারী কাঁদছে পরী।

পদ্ম ওকে ইচ্ছে করে কাঁদায়।

পদ্মর কাছে না দিলেই হয়।

আমাকে সেজেগুজে ফিটফাট থাকতে না বললেই হয় !

বনমালী তাহার গালে একটা টোকা দিল।

না সাজলেই তোকে ভালো দেখায় পরী।

বনমালী চলিয়া গেলে পরী ছুটিয়া গিয়া পদ্ম-ঝির কাছ হইতে খোকাকে ছিনাইয়া নিল। চোখ পাকাইয়া বলিল, তোকে না পাঁচশোবার বলেছি বাবুর ধারেকাছেও খোকাকে নিয়ে যাবি না ?

পদ্ম একগাল হাসিয়া বলিল, বাবু নিজে ডাকলে গো। বললে, খোকাকে আন তো পদ্ম। ভয়ে মরি দিদিমণি।

মরণ তোমার ! ভয় আবার কীসের ?

তা যাই বল, বাবুকে আমি বড্ড ডরাই বাপু ! দেখলে বুকের মধ্যে টিপটিপ করতে থাকে দিদিমণি। এই অ্যাদ্দুর থেকে বাবুকে আমি গড় করি।

পরী হাসিয়া বলল, আচ্ছা আচ্ছা, বেশ করিস। তারপর কী হল বল।

ভয়ে ভয়ে খোকাকে তো নিয়ে গেলাম। বাবু কোলে নিলে, আদর করলে, চুমো পর্যন্ত খেলে। তারপর বললে, বেশ ছেলেটা, নারে পদ্ম ? লজ্জায় মরি দিদিমণি।

বনমালী বেড়াইয়া ফিরিলে পরী বলিল, আচ্ছা, পরের ছেলেকে তুমি এত ভালোবাসলে কী করে বলো তো ? তোমার হিংসা হয় না ?

বনমালী হাসিয়া বলিল, না দুদিনের জন্য এসেছে, ওকে আবার হিংসে করব কী ? বরং তোর ছেলে বলে ভালোই বাসি।

পরীর মুখ শুকাইয়া গেল।

এ কী পরিণাম ! সংক্ষিপ্ত ও সাংঘাতিক !

আরশি কি প্রত্যহ মিথ্যা বলিয়াছে ? বনমালীর সেই উগ্র আবেগময় ভালোবাসা এর মধ্যে উপিয়া গেল কী করিয়া ? আজন্ম দেখিয়া আসিয়াও আরশিতে নিজেকে তাহাব প্রত্যহ নতুন মনে হয়, আপনার রূপ ও যৌবনের এক একটা অভিনব ভঙ্গিমা আজও সে প্রত্যহ আবিষ্কার করে। আর বনমালীর কাছেই এব মধ্যে পুরানো হইয়া গেল ? মাথায় না তুলিয়া বনমালী তাহাকে কোথায় নামাইয়া দিতে চায় ?

পরীর বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। তাহার পাপের সমান অংশীদার তখনও চোখের আড়ালে চলিয়া যায় নাই। তাকাইয়া দেখিয়া পরীর মনে হইল পদ্ম-ঝি বড়ো মিথ্যা বলে নাই। বনমালীকে সেও কম ভয় করে না।

অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া বনমালীর চিরদিনের স্বভাব। জীবনের কোনো স্তরই একটা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ছাড়া তাহাকে নিজস্ব কবিয়া রাখিতে পারে নাই। জীবনের বৈচিত্র্যগুলি বনমালী দ্রুতগতিতে সমগ্রভাবে আয়ত্ত করিয়া নেয়। তাহার উপভোগ যেমন প্রখর তেমনই অধীর। স্থূল হোক সূক্ষ্ম হোক জীবনের রস-বস্তুকে সে তাড়াতাড়ি জীর্ণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে।

তাহাকে জব্দ করিয়াছিল চারু।

চারু তার প্রথম বয়সের নেশা ; অদম্য, অবুঝ, বহুকাল স্থায়ী। যে বয়সে নারীদেহের সুলভতা সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান জন্মে, নারীমনের দুর্লভতায় প্রথম হতাশা জাগে চারুকে বনমালী সেই বয়সে দেহ মন দিয়া চাহিয়াছিল। চারু রীতিমতো তাহাকে নিয়ে খেলা করিত ; ওষুধের ডোজে আশা দিয়া তার প্রেমকে বাঁচাইয়া রাখিত এবং প্রাণপণে এই খেলার উন্মাদনা উপভোগ করিত। বনমালীর এক গ্রাসে পেট ভরানোর প্রবৃত্তি ক্ষুধাতুর বন্য জন্তুর মতো চারুর দুর্ভেদ্য সাবধানতা ঘেরিয়া পাক খাইয়া মরিত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

পরীর রূপ আছে, চারুর মতো প্রতিভা নাই। বনমালীর পাকখাওয়া মনকে সে একাভিমুখী করিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার নদীতে হাঁটু ডুবাইয়া বনমালী পার হইয়া গেল, সে তাকে ভাসাইয়া নিতে পারিল না।

পরী তাহার ঘরে সযত্নে শয্যা রচনা করিয়া রাখে, বালিশের নীচে জুঁই আর বেল ফুল রাখিয়া দেয়। কিন্তু যাহার জন্য ফুলগুলি হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া চাপা গন্ধ বিলায় সে আসে না। সোজাসুজি নিমন্ত্রণ করিবার সাহস পরীর নাই, জানালায় বসিয়া সে শুধু কাঁদে। এখন প্রকৃত বর্ষাকাল। প্রতি রাত্রেই প্রায় বাদল নামে। গাঢ় ভিজা অন্ধকারে বিবরবাসিনী নাগকন্যার মতো পরী ফুলিয়া ফুলিয়া সাশ্রু নিশ্বাস নেয়। খোকা কাঁদে, ককায়, তাহার গলা ভাঙিয়া আসে, শ্রান্ত হইয়া এক সময় ঘুমাইয়া পড়ে। পরী সাড়াশব্দ দেয় না। খানিক পরে খোকার মুখের উপর ঝুঁকিয়া মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলিতে থাকে, শোধ নিস, শোধ নিস ; তাতেই হবে। ছাড়বি কেন ? শোধ নিস।

তারপর অদম্য আক্রোশে খোকার দুই কাঁধ ধরিয়া সজোরে ঝাঁকি দিয়া চেঁচাইয়া উঠে, কেন তুই এসেছিলি হারামজাদা !

গভীর রাত্রে দরজা খুলিয়া সে বাহিরে চলিয়া যায়, প্যাসেজের আলো নিভাইয়া অন্ধকারে এ বারান্দা ও বারান্দা ঘুরিয়া বেড়ায়, ঘরে ঘরে উঁকি দেয়, বনমালীর ঘরের দরজায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

একদিন নৈশ পর্যটনের সময় ভুবনের ঘরে উঁকি দিয়া সে দেখিতে পাইল বিছানায় উপুড় হইয়া সে হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দৃশ্যটা সে খানিকক্ষণ উপভোগ করিল। সে চিরদিনই দুঃখী, অন্যের দুঃখ দেখিলে সে আনন্দ পায়।

তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া বনমালীকে সে ডাকিয়া তুলিল।

ভুবন কী রকম করছে দেখবে চলো।

কী রকম করছে ?

কাঁদছে আর ছটফট করছে। অন্ধকারে পরী বনমালীর গা ঘেঁষিয়া আসিল।

বনমালী বলিল, প্যাসেজের আলো নিভিয়েছে কে ?

আমি।

বনমালী সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল। পরী সঙ্কুচিতা হইয়া বলিল, দ্যাখো তো কী করলে ! নিভিয়ে দাও।

বনমালী তাহার আলো নিভানোর প্রয়োজনটা চাহিয়া দেখিল না।

ঘরে যাও, বলিয়া ভুবনের ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

রোষে ক্ষোভে আত্মহারা পরী আলোকে লজ্জা দিয়া আলোর নীচে দাঁড়াইয়া রইল।

বনমালীর পাশের ঘরখানা হেমলতার। তিনি দিনের বেলায় বিছানায় শুইয়া থাকেন বলিয়া রাত্রে বিছানায় শুইয়া আর ঘুমান না, ঝিমান। বারান্দায় কথা শুনিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

কে রে ? পরী নাকি ? বনমালীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তুই কী করছিস পরী ? বলিয়া ঠাহর করিয়া যোগ দিলেন, মরণ তোমার, বেহায়া মেয়ে !

পরী তখন যে কাজ করিয়া বসিল তাহার অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার। চট করিয়া বনমালীর ঘরে ঢুকিয়া সে দড়াম করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল এবং স্তম্ভিতা হেমলতা নড়িবার শক্তি ফিরিয়া পাওয়ার আগেই বনমালীর একটা চাদর গায়ে জড়াইয়া তাহার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

হেমলতা শূন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এ কী কাণ্ড মা ! অ্যাঁ ?

পরদিনটা কোনোরকমে চুপ করিয়া থাকিয়া তার পরের দিন হেমলতা ছেলেকে অনুরোধ করিলেন, পরীকে এবার পাঠিয়ে দে বনমালী।

দেব। এখন থাক।

পরীকে এখন সে অবহেলা করিতেছে। অমন সুন্দর একটা পুতুলের আবোল-তাবোল নাচ দেখিতে তার ভারী মজা লাগিতেছে। এ অবস্থাটি অতিক্রান্ত না হইলে বনমালী তাহাকে কোথাও পাঠাইবে না।

হেমলতা অত জানেন না, তিনি আবার বলিলেন, না বাবা, পাঠিয়েই দে। স্বামী না থাক, স্বামীর ঘর তো আছে। কেন পরের বোঝা ঘাড়ে করে আছিস ?

বনমালী হাই তুলিয়া বলিল, দুটি খায়, ও আবার বোঝা কী মা ?

হেমলতা আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না। ডাইনির মায়া হইতে ছেলেকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিবেন শুইয়া শুইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কবিরাজের মাথা গরম না করিবার উপদেশটা পর্যন্ত তাঁহার স্মরণ রহিল না।

দুদিন পরে আবার বলিলেন, যে রাগি মানুষ তুই, তোকে বলতে সাহস হয় না বাবু। কিন্তু চোখ মেলে এ তো আর দেখা যায় না বনমালী !

কী হয়েছে ?

রাগের মাথায় কিছু করে বসবি না, বল ?

বনমালী হাসিয়া বলিল, না। আমার রাগ হবে না, বলো।

হেমলতা গলা নিচু করিয়া বলিলেন, পরীর স্বভাবচরিত্র ভালো নয় বনমালী। মেয়ে মিটমিটে ডান। শ্রীধরের ভাইটা আসে জানিস ? ওই যে রোগা লম্বা কোঁকড়া চুল ?

জানি। আমার চিঠি টাইপ করে।

আমি নিজের চোখে দেখেছি, বনমালী। দুপুর বেলা সেদিন চোরের মতো পরীর ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে নীচে নেমে গেল।

কবে ?

পরশু।

বনমালী হাসিয়া বলিল, পরশু তো ? আমি তখন পরীর ঘরে ছিলাম, টাইপ করার জন্য শ্রীধরের ভাই একটা দরকারি চিঠি নিতে এসেছিল। মানুষকে অত সন্দেহ কোরো না মা। পরী সে রকম নয়।

হেমলতার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তার মিথ্যার পাশে ছেলের মিথ্যা আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র মুখোশ গেল খুলিয়া, গোপন সত্য প্রকাশ হইয়া গেল, লজ্জার আর সীমা রহিল না। বনমালী চলিয়া গেলে তিনি ভাবিলেন, বাহাদুরি করিতে যাওয়ার এই শাস্তি। চুপচাপ থাকিলেই হইত ! আটত্রিশ বছরের লাখপতি ছেলের ভালো করিতে যাওয়া কী তাহার সাজে ?

এদিকে, বনমালীর স্বাভাবিক সংযত নির্মমতায় পরী পাগল হইয়া উঠিল। কেন এ রকম হইল, বনমালীর অমন উদ্দাম কামনা তুবড়ির মতো জ্বলিয়া উঠিয়া এমন অকস্মাৎ কেমন করিয়া নিভিয়া গেল কিছুই সে বোঝে না, দিনরাত আগের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার উপায় চিন্তা করে। ভাবে, অভিমান করে গম্ভীর হয়ে থাকব ? যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে হেসে খেলে দিন কাটাব ? আর কারও দিকে একটু ঝুঁকব ? একদিন রাতদুপুরে ঘরে গিয়ে পাগলের মতো বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ব ? পায়ে ধরে যে দোষই করে থাকি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেব ?

এর মধ্যে শেষ কল্পনাদুটিকে সে কার্যে পরিণত করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। দিন দিন পরী শুকাইয়া যায়।

ভুবনকে এখন বনমালী খুব ভালোবাসে।

অন্তত তার ভাব দেখিয়া তাহাই মনে হয়।

কেষ্টকে সে অন্য কোনো কাজ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে, ভুবনকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিবে। খাওয়ার সময় বনমালী ভুবনকে কাছে খাইতে বসায়, প্রায়ই তাহাকে সঙ্গে নিয়া মোটর

চাপিয়া বেড়াইতে যায়, অবসর সময়ে কাছে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলে, তাহাকে নানান বিষয় শিখাইবার চেষ্টা করে।

তার বুদ্ধির জড়তা বিনষ্ট করিবে এই তাহার ইচ্ছা। কাজের মতো একটা কাজ পাইয়া বনমালী ভারী সুখী।

বলে, ওকে চারুদি বোকা করে রেখেছিল, আসলে ও বোকা নয়।

পরী তোষামোদ করিয়া বলে, আগে থাকতে তোমার হাতে পড়লে অ্যাদ্দিন ও মানুষ হয়ে যেত। খোকাকেও তুমিই মানুষ করে দিয়ো।

তারপর হাসিয়া যোগ দেয়, যেন মানুষ করবে না, তাই বলে দিচ্ছি।

বনমালীর প্রতি ভুবনের আনুগত্য অদ্ভুত !

হেমলতার জ্বর হইয়াছে। তিনি আর বাঁচিবার আশা করেন না। তাই প্রাণপণে ছেলের সেবা আদায় করিয়া নিতেছেন।

বনমালী বলে, আপিসে কাজ আছে মা, যেতে হবে।

হেমলতা বলেন, আমায় চিতায় তুলে দিয়ে যাস।

শিয়রে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া বনমালী বিকালে বাগানে পায়চারি করিতে যায়। এদিকে ভুবন বারবার হলঘরের বড়ো ঘড়িটার দিকে তাকাইতে থাকে। একবার সে ভয়ানক চমকাইয়া ওঠে। এইমাত্র সে দেখিয়া গেল, পাঁচটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে, এর মধ্যে সাড়ে দুটা বাজিতে চলিল কী করিয়া ?

ঘড়ির ডায়ালটা ভালো করিয়া দেখিবার চেষ্টায় ভুবনের প্রকাণ্ড দেহটা বিহ্বল প্রশ্নের ভঙ্গিতে পিছন দিকে হেলিয়া যায়। তারপর এক সময় সে তাহার ভুল বুঝিতে পারে। ঘড়ির বড়ো কাঁটা আর ছোটো কাঁটার মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলিয়া সে যেন ভারী কৌতুক করিয়াছে এমনিভাবে সে হাসিয়া ফেলে। মুষ্টি তুলিয়া ঘড়িটাকে শাসন করিয়া বলে, ভেঙে ফেলে দেব, পাজি কোথাকার !

ঘড়িতে ছটা বাজিতে আরম্ভ করামাত্র সে বাগানে ছুটিয়া যায়। বলে, ছটা বাজল মামা।

তাহার কথা শেষ হওয়ার আগে অথবা পরে হলঘরের ঘড়িটা নীরব হয় ঠিক বোঝা যায় না।

বনমালীর এক প্রকার অভূতপূর্ব অনুভূতি হয়। ছটার সময় হেমলতাকে ওষুধ খাওয়াইতে হইবে, কিন্তু সময়মতো ডাকিয়া দিবার কথা ওকে সে কিছুই বলে নাই। যাহাকে বলিয়াছিল সে হয়তো কার সঙ্গে গল্পে মাতিয়াছে, কিন্তু অন্যকে দেওয়া তাহার সে আদেশ ভুবন ভোলে নাই। কাঁটায় কাঁটায় অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করিয়াছে।

কেন করিয়াছে ? তাহাকে একটু খুশি করার জন্য। কোনো প্রত্যাশা করিয়া নয়, কোনো মতলব হাসিল করিবার জন্য নয়, তাহাকে খুশি করিবার প্রেরণা মনের মধ্যে ছিল, শুধু এই জন্য !

ভুবনকে সে যে ভালো বাসিয়াছে সেটা তাই অকারণ নয়। ভুবনের নিষ্কাম প্রেম ছাড়া আরও একটা গৌণ কারণও ইহার ছিল। চারুর জন্য পরী কাঁদিয়াছে, কিন্তু তাহার কান্নায় বনমালী হইয়াছে বিরক্ত ; চারুর জন্য ভুবনের শোক একটিবার মাত্র দেখিয়া বনমালীর মনে শোকের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। আহত পশুর মতো ভুবন মধ্যে মধ্যে মার জন্য ছটফট করিয়া কাঁদে ; বনমালীর শুষ্ক তৃণহীন জগতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়।

পরীর সামনেই একদিন সে ভুবনকে বলিল, একটা বাড়ি নিবি, ভুবন ?

নেব মামা !

আচ্ছা, তোকে একটা বাড়ি লিখে দেব।

এ বাড়ি অবশ্য নয়, শ্যামবাজারের একটা ছোটো বাড়ি সম্প্রতি এক প্রকার বিনামূল্যেই বনমালীর হাতে আসিয়াছে। সেই বাড়িটি দান করিবার কথাই সে ভাবিতেছিল। কিন্তু পরী তো তাহার

মনের খবর রাখে না, সে ভাবিল ভুবনকে বনমালী এই বাড়িটিই দিয়া দিবে, একদিন মিথ্যা করিয়া চারুকে সে যাহা বলিয়াছিল তাহা পালন করিবে।

পরীর বুকের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগল। খোকাকে অনেকক্ষণ বুকে চাপিয়া রাখিয়াও সে জ্বালা তাহার কমিল না।

সারাদিন তাহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া রহিল। বনমালীর আশ্রিতাদের মধ্যে সকলের চেয়ে নিরীহ ক্ষেন্তির মাকে এমন অপমানই সে করিল যে গৃহপালিতা কুক্কুরীর মতো অপমান-জ্ঞানহীনা সেই নারীটি কাঁদিয়া ফেলিল।

তারপর পদ্ম-ঝির সঙ্গে পরীর কলহ হইয়া গেল। বিকালে বিনা অপরাধে কেষ্টকে সে তাহার পায়ের ঘাসের চটি ছুঁড়িয়া মারিল।

এবং পঞ্চমী তিথিতে একাদশী করিয়া গভীর রাত্রে উন্মত্তার মতো বনমালীর রুদ্ধ দরজার সামনে মাথা-কপাল কুটিয়া আসিয়া ঘুমন্ত ছেলেটাকে হ্যাঁচকা টানে কোলে তুলিয়া নিয়া কয়েক সেকেন্ডের জন্য তাহার কচি গলাটি সজোরে টিপিয়া ধরিল।

গলা ছাড়িয়া দিবার পর কাশিতে কাশিতে খোকা বমি করিয়া ফেলিল। পরদিন দেখা গেল গলা তাহার লাল হইয়া আছে এবং কাঁদিতে গিয়া সে শব্দ বাহির করিতে পারিতেছে না।

পদ্ম ভয় পাইয়া বলিল, কী করে এমন হল দিদিমণি ?

পরী ফিসফিস করিয়া বলিল, বাবুর কীর্তি পদ্ম। অন্ধকারে—

পদ্ম চোখ মিটমিট করিয়া বলিল, সেবে যাবে। আমি ভাবলাম পেলেগ। হুঁদো বেড়ালটাব হয়েছিল দেখনি ? দেখে আমি তো ঘেন্নায় মরি দিদিমণি, গলা জুড়ে এই ঘা পুঁজে রক্তে—।

*   *   *   *

কয়েকদিন পরে হেমলতার অসুখ হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়ায় তাকে নিয়া বনমালী বিশেষ ব্যস্ত আছে, দুপুরবেলা পরী চুপিচুপি ভুবনকে বলিল, মার কাছে যাবি, ভুবন ?

ভুবন উৎসুক হইয়া বলিল, যাব।

এক কাজ কর তবে। জামা গায়ে চুপিচুপি খিড়কির দরজা দিয়ে বেবিয়ে গলিতে দাঁড়িয়ে থাকবি যা। আমি যাচ্ছি, গাড়ি চাপিয়ে তোকে মাব কাছে নিয়ে যাব।

ভুবন তৎক্ষণাৎ জামা গায়ে দিল।

মামাকে বলে যাই ?

তবেই তুমি গিয়েছ ! মামা তোকে যেতে দেবে ভেবেছিস ? ছাই দেবে !

ভুবন আর কথা কহিল না। চটি পায়ে দিয়া মার কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া নিল।

পরী বলিল, কাউকে কিছু বলিসনে কিন্তু খবরদার। বললে নিয়ে যাব না। যা, রাস্তায় দাঁড়াগে।

ভুবনের এক মিনিট পরে খোকাকে কোলে নিয়ে খিড়কির দরজা দিয়া বাড়ির পিছনদিকের গলিতে নামিয়া গিয়া পরী দেখিল, ভুবন তার প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া আছে। হাত ধরিয়া পরী তাহাকে হনহন করিয়া টানিয়া নিয়া চলিল। বড়ো রাস্তায় পড়িয়া ট্যাক্সি ধরিয়া হাজির করিল একেবারে হাওড়া স্টেশনে।

দরাজ হাতে অনেকগুলি নোট কাউন্টারের ওপাশে চালান করিয়া দিয়া বোম্বে পর্যন্ত ফার্স্টক্লাসের একখানা টিকিট কিনিয়া গাড়ি ছাড়ার অল্প আগে পরী ভুবনকে বোম্বে মেলের একটি খালি ফার্স্টক্লাস কামরায় তুলিয়া দিল।

যা যা বলেছি মনে আছে, ভুবন ? কাল বিকেলে ঠিক ছটার সময় যেখানে গাড়ি থামবে সেইখানে নেমে যাবি।

ভুবন বলিল, আমি ঘড়ি দেখতে জানি মাসি। পকেট হইতে দশ টাকা দামেব ঘড়িটি বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, মামা দিয়েছে। কটা বেজেছে জানো ? তিনটে বেজেছে।

ঘড়ি দেখে কাল ঠিক ছটার সময় নেমে যাবি। গাড়ি না থামলেও লাফিয়ে নেমে যাবি। মার কাছে যাচ্ছিস কিনা, দেখিস তোর কিছু হবে না।

ভুবন বলিল, আচ্ছা।

রেলের লোক টিকিট দেখতে চাইলে দেখাবি। খিদে পেলে খাবার কিনে খাবি। টাকা ঠিক রেখেছিস ? ওটা পাঁচ টাকার নোট জানিস তো ? ভাঙিয়ে কাল খাবার কিনিস।

মা স্টেশনে আসবে, মাসি ?

আসবে।

ভুবনের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

খোকাকে দাও না মাসি, একটা চুমু খাই।

পরী খোকাকে বুকেব মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিল।

না না, এখখুনি গাড়ি ছেড়ে দেবে।

গলির মুখে ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া খিড়কির দরজা দিয়াই পরী বাড়ি ঢুকিল। তাকে অভ্যর্থনা করিল বনমালী স্বয়ং।

ভুবনকে কোথায় রেখে এলি পরী ?

ভুবন ? ভুবনেব আমি কী জানি ! বাড়ি নেই ?

বনমালী হাঁকিল, কেষ্ট এদিকে আয়।

কেষ্ট ভয়ে ভয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

তোকে ছাড়িয়ে দিলাম কেষ্ট। মাইনে যা জমেছে পাবি না। পালা, দাঁড়িয়ে থাকলে পুলিশে দেব।

কেষ্ট কাঁদোকাঁদো হইয়া বলিল, কেন বাবু ?

রাত দুপুরে তুই দোতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকিস বলে। আমার নশো টাকা চুরি গেছে।

ঝি-চাকর আশ্রিত ও আশ্রিতারা চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরীর বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতেছিল।

অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, ভুবন কোথায় গেছে কেষ্ট ? পালিয়ে গেছে ?

কেষ্টর হইয়া জবাব দিল বনমালী।

ও জানে না। তুই ঘরে যা পরী।

দোতলায় যে ঘরখানায় সে এতদিন ছিল বনমালী যে সে ঘরখানার কথা বলে নাই ঘরে ঢুকিয়াই পরী তাহা টের পাইল। তার সমস্ত জিনিস অদৃশ্য হইয়াছে। ধোয়ামোছা শূন্য ঘরের মাঝখানে সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালী আসিয়া বলিল, এখানে থাকতে তোর অসুবিধা হচ্ছিল বলে তোকে নীচের একটা ঘর দিয়েছি পরী। ক্ষেন্তির পাশের ঘরখানা।

নীচে ভাঁড়ারের পাশে একসারিতে খান সাতেক ঘর আছে, বনমালী যাদের খাইতে দেয় ওটা তাদের কলোনি অথবা বস্তি। ক্ষেন্তির পাশেব ঘরখানা ওই সারিতেই।

পরীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। ইতিমধ্যে শুধু সন্দেহের উপর তার বিচার হইয়া শাস্তির ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, এটা সে হঠাৎ ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল না। এ বাড়িতে যাদের স্থান ঝি-চাকরেরও

নীচে বনমালী অনায়াসে তাকে তাদের দলে নামাইয়া দিল ? সারাদিন ধরিয়া সে যে নিজের অনুপস্থিতির কৈফিয়ত রচনা করিয়াছে সেটা একবার শোনাও দরকার মনে করিল না ?

সে কাঁদিয়া ফেলার উপক্রম করিয়া বলিল, আমি কী করেছি ? তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।—

কিন্তু গা সে ছুঁইবে কার ? বনমালী আগাইয়া গিয়াছে, বিদায় দিয়াছে।

পরীকে নীচেই যাইতে হইল।

ক্ষেন্তি বলিল, কী গো, ওপর থেকে তাড়িয়ে দিলে ? বড়োলোকের মর্জি দিদি, কী করবে বলো।

পরী বলিল, কী যে বলো তার ঠিক নেই। তাড়িয়ে আবার দেবে কে ? আমি যেচে এসেছি। ওপরে যে সব ম্লেচ্ছাচার—বিধবা মানুষ আমি, আমার পোষালো না।

ক্ষেন্তি বলিল, ভাবলে অবাক লাগে বোন, এ বাড়ি তো একদিন তোমার নিজের দিদির ছিল ! আজ যে রানি, কাল সে দাসী। হায়রে কপাল !

ছোটো স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া পরী কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষেন্তি পিছু পিছু আসিয়া বলিল, কাঁদছ কেন ? সয়ে যাবে।

বলিয়া সে পরীর বিছানাতে বসিল।

শোনো বলি। কলকাতার সে বাড়িতে আমি যখন কপাল পুড়িয়ে এলাম—

পরী বাধা দিয়া বলিল, থাক। তুমি যাও।

শোনোই না। আমি যখন কপাল পুড়িয়ে এলাম, বাড়ির রাজা আমাকে বললে, নীচেরটা স্যাঁতসেঁতে তুই ওপরেই থাক। তোর মার সহ্য হয়ে গেছে কিছু হবে না, তোর অসুখ করবে। আমি—

ক্ষেন্তির হঠাৎ খেয়াল হইল, পরী সখী নয়, ওকে শুনাইয়া বুক হালকা হইবে না।

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া ঢোঁক গিলিয়া সে বলিল, ব্যাপার বুঝে আমি রাজি হলাম না। নীচে মার কাছেই রইলাম।

পরী শুইয়া পড়িল। আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া বলিল, আমার জ্বর আসছে তুমি যাও ভাই।

একদিন হেমলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁরে, ভুবনের কোনো খোঁজ করলি না ?

বনমালী বলিল, আপদ গেছে, যাক।

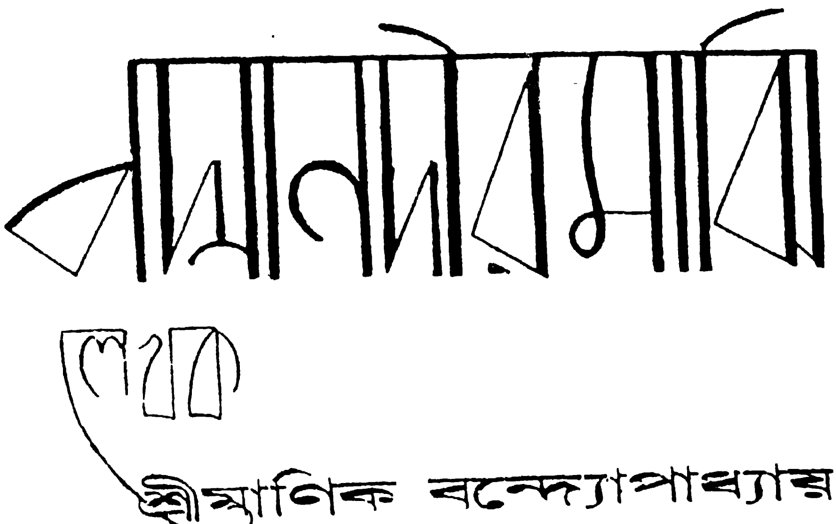
ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌঁছিয়া গেল, মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় নিয়াছে।

গ্রন্থপরিচয়

বর্তমান খণ্ড মানিক রচনাসমগ্রে সংকলিত গ্রন্থগুলির মূলপাঠের ক্ষেত্রে, গ্রন্থনাম বা গল্পের শিরোনামসহ, সর্বত্র 'বাংলা আকাদেমি বানান অভিধান'-সম্মত বানান অনুসৃত হয়েছে। কেবল চরিত্রের নামের ক্ষেত্রে আদি বানান সাধারণত অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। গ্রন্থপরিচয় অংশে গল্প ও উপন্যাসের পরিচিতিদান বা তথ্যপ্রদানের প্রয়োজনে প্রথম প্রকাশকালীন আদি বানানগুলি বজায় রাখা হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পাণ্ডুলিপিতে পাত্রপাত্রীর সংলাপে কখনও উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করতেন, কখনও করেননি। তদনুযায়ী, মুদ্রিত গ্রন্থেও কোথাও উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও হয়নি। মানিক রচনাসমগ্রে মুদ্রণে একরূপতা রক্ষার খাতিরে সংলাপেও উদ্ধৃতিচিহ্ন বর্জন করা হয়েছে।

পদ্মানদীর মাঝি

প্রকাশকালের আনুমানিক হিসাবে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-কে তৃতীয় গ্রন্থ ধরলে 'পদ্মানদীর মাঝি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব চতুর্থ মুদ্রিত গ্রন্থ, তৃতীয় উপন্যাস। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি' উভয়েরই প্রকাশ বৎসর ১৯৩৬ হলেও দুই উপন্যাসেব প্রকাশনার অগ্রপরতা নির্ণয় করা এখনও পর্যন্ত সম্ভবপর হয়নি। উভয় গ্রন্থেই প্রথম মুদ্রণকালে প্রকাশকাল অনুল্লেখিত ছিল। সজনীকান্ত দাস প্রদত্ত তথ্যে (পরিচয়, পৌষ ১৩৬৩) পদ্মানদীর মাঝি-র প্রকাশ তারিখ (২৮ মে ১৯৩৬) পাওয়া গেলেও পুতুলনাচের ইতিকথা সম্পর্কে সাল ছাড়া আর কিছুই মেলে না। মানিক রচনাসমগ্রের প্রথম খণ্ড গ্রন্থপরিচয়ে উক্ত উপন্যাসের ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশ-সংক্রান্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে (পৌষ ১৩৪১-অগ্রহায়ণ ১৩৪২)। ডিসেম্বর ১৯৩৫-এর পর ঠিক কোন মাসে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল সঠিক নির্ণীত না-হওয়ায় আনুমানিকভাবে পুতুলনাচের ইতিকথা-কে মানিক রচনাসমগ্রের প্রথম খণ্ডে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং পদ্মানদীর মাঝি-কে দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত কবা হয়েছে। মুদ্রিত উপন্যাসেব প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, কলকাতা ; পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪ + ২০৮, দাম দেড় টাকা। গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত পূর্বাশা মাসিকপত্রে এই ধাবাবাহিক প্রকাশের নিম্নবর্ণিত কিস্তির তথ্য পাওয়া যায় :



পূর্বাশা-য় প্রকাশিত পদ্মানদীর মাঝি-র নামলিপি

তৃতীয় বর্ষ ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়-শ্রাবণ তিন কিস্তি, আশ্বিন-কার্তিক দুই কিস্তি, পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন তিন কিস্তি এবং চতুর্থ বর্ষ ১৩৪২ প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ, পূর্বাশা-য় প্রকাশিত উপন্যাসের মোট এই নটি কিস্তি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই কিস্তিগুলিতে উপন্যাস-কাহিনির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ আছে।

১৯৩৪-এ পূর্বাশার প্রকাশ কোনো কারণে রহিত হওয়ায় পদ্মানদীর মাঝি সম্ভবত পূর্বাশায় অসমাপ্তই থাকে। পরে গ্রন্থাকারে দুবছর পর প্রকাশিত হয়। পদ্মানদীর মাঝি-র পঞ্চম সংস্করণ বা মুদ্রণের (চৈত্র ১৩৫৮) উল্লেখ পাওয়া যায় লেখকের ডায়েরি (অপ্রকাশিত মানিক, পৃ ১৬৬)-তে। লেখকের জীবিতকালে উপন্যাসটির আর একটি মুদ্রণ হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পরের মুদ্রণ (৭ম মুদ্রণ) পৌষ ১৩৬৩-তে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম ও পরবর্তী কয়েকটি সংস্করণে লেখকের নামের বানান ছিল মাণিক। চতুর্থ সংস্করণ বা মুদ্রণ (আশ্বিন ১৩৫৫) থেকে উপন্যাসটির সর্বাধুনিক একত্রিংশতম মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স।

পূর্বাশা পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ থেকে পদ্মানদীর মাঝি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। পূর্বাশার উক্ত সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত পদ্মানদীর মাঝির মুদ্রিত অংশ প্রকাশিত গ্রন্থপাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেছে যে পরিবর্তন খুব গুরুতর বা উল্লেখনীয় নয়। কয়েকটি উদাহরণ উল্লিখিত হচ্ছে :

পূর্বাশায় প্রকাশিত প্রথম কিস্তিতে পদ্মানদীর মাঝি কুবেরের কর্মস্থলের ভৌগোলিক নির্দেশ ছিল : 'গোয়ালন্দের মাইল দেড়েক উজানে।' মুদ্রিত গ্রন্থে সেটি হয়েছে : 'দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে।' উপন্যাসের পরবর্তী অংশেও লেখক 'গোয়ালন্দ' সর্বত্র পরিবর্তিত করে 'দেবীগঞ্জ' স্থানের উল্লেখ করেছেন। কুবেরের নৌকাব বর্ণনায় যে বিবরণ উপন্যাসে আছে ('এই হাতল ধরিয়া জাল উঠানো এবং নামানো......এই নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি।'), কিস্তিতে তা অনুপস্থিত, কেবল 'নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি' মাত্র উল্লিখিত। পত্রিকার পাঠে 'সকালে বাজারে বাজারে ইলিশগুলি কিনিয়া কলিকাতার মানুষ বাড়ী ফিরিবে' বাক্যটি উপন্যাস পাঠে হয়েছে 'সকালে বিকালে বাজাবে বাজাবে ইলিশ কিনিয়া কলিকাতার মানুষ ফিরিবে বাড়ি'—এ কেবল একটি শব্দের যোজনা নয়, প্রাতঃ সন্ধ্যা বিস্তৃত কলকাতার বাজারের একটি সার্থক বিবরণ। ক্বচিৎ সংলাপেও সংস্কার ঘটেছে। যথা, গ্রন্থপাঠে, 'তালি খানিক খাড়াও শেতলবাবু।' পত্রিকার পাঠে ছিল, 'তবে খানিক দাঁড়াও শেতলবাবু।' অনুরূপ, 'পারলাম না' হয়েছে 'পারুম না', 'নিস' হয়েছে 'লইস', 'দিবাম' হয়েছে 'দিমু', 'না আইলে পারতা' হয়েছে 'না আইলে পারতি', 'বইবার পার' হয়েছে 'বইবার পারস', 'কুবের' নামটিও সংলাপে একাধিকবার 'কুবির' রূপে পরিবর্তিত হয়েছে। এরূপ পরিবর্তনের সংখ্যা অবশ্য কম নয়, যেগুলি লেখকের ভাষা ও সংলাপ বিষয়ে অধিকতর সতর্কতা ও মনোযোগের পরিচায়ক যথা, 'বাবুগোর পোলার নাখান ধলা (পত্রিকা পাঠ) 'বাবুগোর পোলার চাইতে ধলা', ইত্যাদি।

পূর্বাশার দ্বিতীয় কিস্তিতে কিছু সর্বনামগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন, 'যাহারা আরো বেশী ভদ্রলোক তাহাদের শুকনো খটখটে স্থায়ী আঁতুরঘর থাকে। কুবেরের তো সেই ক্ষমতা নাই, তাহার যতখানি সাধ্য সে তাহা করিয়াছে।' মুদ্রিত পাঠে, প্রথম পুরুষ সর্বনামগুলির সংক্ষেপিত তদ্ভব রূপগুলি ব্যবহৃত হয়েছে (যথা যারা, তাদের, তার, তা)। তাছাড়া, কুবের-গণেশ সংলাপে যেখানে মধ্যমপুরুষ ক্রিয়াপদের সাধারণ রূপ ব্যবহৃত হয়েছিল সেখানে গ্রন্থপাঠে তুচ্ছার্থক রূপগুলি আরও বস্তুগ্রাহ্যতার পরিচায়ক। তাই, 'যাইবা না কুবেরদা' হয়েছে 'যাবি না কুবির'। 'তুমি চিন না কুবেরদা' হয়েছে 'তুই চিনস্ না কুবির'। 'কাণ্ড জাননি' হয়েছে 'কাণ্ড জানস্'। 'যাবা কুবেরদা' হয়েছে 'যাবি কুবির'। 'তুমি চাল কনে পাইবা কুবেরদা' হয়েছে 'তুই চাল পাবি কনে ?' কিন্তু পত্রিকার পাঠে 'গোঁসা করলা নি কুবের দা' উপন্যাস পাঠে অপরিবর্তিত আছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন

ব্যাখ্যামূলক বাক্য : 'মাঝে মাঝে, কুবেরের রাগের সময়, ভীরু গণেশ তাহাকে সম্মান করিয়া তুমি সম্বোধন করে।' এ ছাড়া, 'কলকাতা' > 'কইলকাতা' 'পয়সা' > 'পয়হা' এইরূপ পরিবর্তনও আছে।

তৃতীয় কিস্তিতে ময়নাদ্বীপ থেকে প্রত্যাবৃত্ত রাসুর সংলাপে কুবেরের উদ্দেশে 'আমি আলাম রে কুবের' এইরূপ বাক্য 'আমি আলাম গো কুবির দা' এই সম্ভ্রমাত্মক রূপ পেয়েছে। তাছাড়া :

> পীতম শিহরিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'ময়না দ্বীপে বাঘ সিঙ্গি আছে না রাসু ?'
>
> 'আছে না ? বাঘ সিঙ্গিতে বোঝাই।'

এই অংশের পর আছে, 'যাহারা রথের মেলায় গিয়াছিল সন্ধ্যার সময় একে একে তাহারা ফিরিতে থাকে....।' কিন্তু গ্রন্থপাঠে এইখানেই রাসুর মুখে ময়নাদ্বীপের একটি অতিরঞ্জিত বর্ণনা পাঠক হিসাবে আমরা পাই।

পূর্বাশার পরবর্তী কিস্তিগুলির পাঠ ও মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ মিলিয়ে দেখা যায় যে, মোটামুটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। কিছু শব্দগত পরিবর্তন বা বাক্যাংশের পরিবর্তনের উদাহরণ অসংখ্য হলেও সেগুলি উল্লিখিত হয়নি। পূর্বাশায় প্রকাশিত পাঠে অনুপস্থিত কিন্তু উপন্যাসে সংযুক্ত, এমন শব্দ বাক্যাংশ বা বাক্যও স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে দেখানো হয়নি। উপন্যাসে তৃতীয় অধ্যায়ে ঝিমোতে ঝিমোতে নিদ্রাকাতর চোখে মালার দিকে চেয়ে কুবেরের ভাবনা গ্রন্থে গৃহীত পাঠের তুলনায় সামান্যই পৃথক। যথা—

> হ, ছেলে কোলে বোগা ক্যাঙ্গটা বৌটিকে তাহাব রাজরানীর মতো দেখাইতেছে বটে। কে জানে রাজরানী দেখিতে কেমন ? ছেলেটাও যেন ফর্সাই হইযাছে মনে হয়। এমনি বয়সে লখা আর চণ্ডী যেমন তামাটে লাল ছিল সে বকম নয। আঁতুবে যতদিন ছিল কুবেব বিশ্বাস কবে নাই, এখন তাহার মনে সন্দেহ আসিয়াছে ছেলেটা কালো হইবে না বীতিমতো ধলাই হইবে।

পূর্বাশা ৩য় বর্ষ পূজা, পৃ ২২৪-২৫

এইরূপ কয়েকটি উপন্যাস-অংশ উদ্ধৃত হচ্ছে :

> সেই হইতে ছেলেদেব মারামারিকে মালা ডরে ভয় কবে। ছেলে দুটিকে সে ঘরে আটকাইয়া রাখিতে চায়। কিন্তু খাতিব তাহাকে কেহ কবে না। বসিয়া বসিযা যাহাব দিন কাটে কে তাহাব মুখ চাহিবে ? লখা ও চণ্ডী চোখের পলকে উধাও হইয়া যায়। ফাঁকি দিয়া কাছে ডাকিয়া জোর করিয়া ধবিয়া বাখিতে গেলে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া রক্তপাত কবিযা ছাড়ে।

পূর্বাশা, তদেব, পৃ ২২৬

উপন্যাসে এই অংশে সামান্য কিছু শব্দযোজনা বা বাক্যপ্রকাশগত রূপান্তর ঘটেছে। ঈষৎ পরের অংশ :

> লখা ও চণ্ডীব মতই মন দিয়া সেও যে রূপকথা শুনিতেছে মালার তাহা টের পাইতে বাকী থাকে না, ছেলেরা ঘুমাইয়া পড়িলেও সে তাই থামে না হাত নাড়িয়া মুখভঙ্গি কবিয়া রস দিয়া দিয়া ঘুমন্ত ছেলেদের গল্প বলিতে থাকে। গল্প বলিতে সে ওস্তাদ। দশবার বলা গল্প এগারোবার বলিয়া সে শ্রোতাকে সমান মুগ্ধ কবে।

পূর্বাশা, তদেব, পৃ ২২৮

পূর্বাশার ৩য় বর্ষ কার্তিক সংখ্যা শুরু হয়েছিল এইভাবে :

> এবারের বর্ষায় আউস ধানের ফসল নষ্ট হইযা গিয়াছিল। পীতম মাঝিব বাড়ীব পিছনে তেঁতুল গাছটাব গুঁড়ি পর্যন্ত কোনবাব জল আসে না, এবার আউস ধান পাকিবার সময় হঠাৎ এত জল বাড়িয়া গেল যে গাছের গুঁড়িটা সপ্তাহ কাল ডুবিয়া রহিল প্রায় তিন হাত জলেব নীচে। এ জল আগে বাড়িলে ক্ষতি ছিল না জলের সঙ্গে ধানেব গাছও বাড়িয়া চলিত কিন্তু ফসল পাকিবাব সময় জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া ধানগাছ কেমন করিয়া বাড়িবে। আমন ধানের গাছগুলি সতেজে জলের উপরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে আমনের ফসল মেলে,—জলে ডুবিয়া মার খাইয়া গেল আউসের ফসল।
>
> বড বর্ষা হইয়াছিল এবাব।

পূর্বাশা, ৩য় বর্ষ কার্তিক, পৃ ৩৩৭

পূর্বাশার পাঠে কপিলাকে সন্তানবতী রমণীরূপে দেখা গেছে। অস্বাভাবিক বর্ষার কারণে কুবের মালার অনুরোধে চরডাঙ্গায় মালার বাপের বাড়ির খবর আনতে গিয়েছিল (উপন্যাসের ৪র্থ পরিচ্ছেদ)। চরডাঙ্গায় পৌঁছে দেখা গেল, মালার ছোটো বোন কপিলাও সেখানে আছে :

কুবের আসিয়াছে শুনিয়া মালার ছোটো বোন কপিলা মই ধরিয়া নামিয়া আসিল।

পূর্বাশার পাঠ :

কুবের আসিয়াছে শুনিয়া মালার ছোট বোন কপিলা একহাতে বুকের কাছে স্তন্যপায়ী শিশুকে ঝুলাইয়া আবেক হাতে মই ধরাইয়া নামিয়া আসিল।

পূর্বাশা, কার্তিক, পৃ ৩৩৯

উপন্যাসে কুবেরের শ্বশুর বৈকুণ্ঠকে কুবের তামাক সেজে দিয়েছে। এই পর্যন্ত লেখার পর এই কিস্তি শেষ হয়ে গেছে। এরপর সম্পাদকীয় টীকা আছে :

'মাণিকবাবু অসুস্থ তাই, এর বেশী এ সংখ্যায় দিতে পারিলেন না।' তদেব, পৃ ৩৩৯

পূর্বাশা তৃতীয় বর্ষ ৭ম সংখ্যা শুরু হয়েছে এই বাক্য দিয়ে :

জল কমিয়া যাওয়া পর্যন্ত কেতুপুরে তাহার বাড়ীতে গিয়া থাকিবাব জন্য কুবের সকলকে নিমন্ত্রণ করিল। এ আহ্বান তুচ্ছ করিবার মত নয়, কিন্তু সকলে গেলে কেমন করিয়া চলে ?...

উপন্যাসে এর পর কতকগুলি নতুন সংযোজনা ঘটেছে, কৌতূহলী পাঠক দুই পাঠ তুলনাসূত্রে তা দেখতে পাবেন। তবে কপিলার জননীরূপের প্রসঙ্গটি একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে :

সে বড় দুঃখের কাহিনী ভাল ঘর দেখিয়া কপিলার বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল, সুখে ঘবকন্না করিতেছিল কপিলা। কি যে শনি ভর করিল তাহার কপালে, শীতেব গোড়ায় স্বামীর সঙ্গে কলহ কবিয়া কচি ছেলেকে নিয়া সে চলিয়া আসিল বাপের বাড়ী। পূর্বাশা, ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃ ৩৯৪

উপন্যাসের পঞ্চম অধ্যায়ে আশ্বিনের আকস্মিক ঝড়ে গ্রামবাসীদের অধিকাংশ ঘর ভেঙে পড়ার পর হোসেন মিয়ার বদান্যতায় ঘর সংস্কার ও পরিবর্তে খত লেখার ব্যাপার যেখানে আছে, সেখানে পত্রিকাপাঠ ও গ্রন্থপাঠে সামান্য পরিবর্তন কৌতূহলী পাঠকের জন্য উদ্ধৃত হল :

তারপর একখানা খত বাহির করিয়া বলিল, টিপ সই দেও কুবেব—এগার টাহা দশ আনাব মত লিখছি—বাদ দিছি দুই টাহা। টিপ সই দিয়া রাখ, যখন পাববা দিবা।—না দিলি' মামলা কবুম না কুবের বাই ।—হোসেন মিয়া মৃদু মৃদু হাসিল, জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, খত কিসির ?..

মুদ্রিত পাঠে খতে টাকার অঙ্ক এগারো থেকে একুশে বর্ধিত হয়েছে।

পূর্বাশা ৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যার পর ৪র্থ বর্ষ ১ম (শ্রাবণ) সংখ্যা থেকে উপন্যাসের পারম্পর্য পুনশ্চ শুরু করার পূর্বে, সম্ভবত বিরতির কৈফিয়ত স্বরূপ, উপন্যাসের ঘটনাগত পশ্চাৎপটটি বিবৃত করা হয়েছে। সেই অংশ উদ্ধৃত হল :

ভূমিকা

[পদ্মার কোল ঘেঁষিয়া একটি গ্রাম কেতুপুর। সেখানকাব মাঝিদেব দারিদ্র্য-বুভুক্ষা-কাম-স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতা পঙ্কিল জীবনেব উপব লেখক তাঁহাব কাহিনীর যবনিকা তুলিয়াছেন। গরীবের মধ্যেও গরীব কুবের, ধনঞ্জয়ের নৌকায় মাছ ধরে—মাছ ধরিবার সামান্য সরঞ্জামও তাহার নাই, আছে খাইবার অনেকগুলি মুখ—ছেলেমেয়ে স্ত্রী, পিসী, সমস্তরাত পদ্মায় মাছ ধরিয়া দিনের বেলায় সে বাড়ি ফিরিয়া আসে—বর্ষাকাল ঘরের চালায় ছন নাই—ভিজা সাঁৎসেতে মেঝেতে ছেঁড়া মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়ে। তার স্ত্রী মালা আঁতুড় ঘরে। একটি ছেলে হইয়াছে—রং তার একটু অস্বাভাবিক ফর্সা, তাই নিয়া জেলেপাড়ায় কুৎসিত গুজব রটে। জন্ম হইতেই মালা পঙ্গু কিন্তু পঙ্গু বলিয়া কুবেরের যত্ন হইতে সে বঞ্চিত নয়।

কেতুপুরের জেলেপাড়ায় হুসেন মিয়ার ভয়ানক খাতির। অদ্ভুত লোক এই হুসেন মিয়া। নোয়াখালি হইতে সে এখানে আসিয়াছিল একান্তই নিঃসম্বল অবস্থায়। কিন্তু ধীরে ধীরে কি করিয়া যে সে টাকা করিল তাহা দুর্জ্ঞেয়। বঙ্গোপসাগরে তাহার একটি দ্বীপ আছে—ময়নাদ্বীপ। এখান হইতে দরিদ্র মাঝিদের ধরিয়া নিয়া সে সেখানে বস্তি

বসাইতে চায়। তাই মাঝিদের অভাব শুনিলে সে মুক্ত হস্ত। সব বিষয়ে সে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে উন্মুখ। পরে শুধু একটি খত লেখাইয়া নেয়। জেলেপাড়ারই রাসু খাইতে না পাইয়া স্ত্রী ছেলেমেয়ে লইয়া ময়নাদ্বীপে গিয়াছিল। স্ত্রী-পুত্র সব কটি সেখানে মরিয়াছে। রাসু কঙ্কালসার হইয়া পলাইয়া আসিয়াছে আবার কেতুপুরে। ময়নাদ্বীপ সম্বন্ধে মাঝিদের দারুণ বিভীষিকা। কিন্তু হুসেন মিয়ার সঙ্গে খাতির তাহাদের সমানই আছে। ইদানীং কুবেরের দারিদ্র্যের দিকে নজর পড়িয়াছে হুসেন মিয়ার। সহৃদয় ব্যবহারে কুবেরকে সে ভিজাইয়া দিয়াছে। কুবেরের বাড়ি আসিয়া এক রাত্রি কাটাইয়াও গেল। হুসেনের ঘুমের সুযোগে তাহার পকেট হইতে কুবের পয়সা চুরি করিল। এ দোষ কুবেরের নয়—তার দারিদ্র্যের—কুবের হুসেন মিয়াকে শ্রদ্ধা করে।

বর্ষার বন্যায় পদ্মাতীরের অনেক গ্রামই ভাসিয়া যায়। খবর আসিল কুবেরের শ্বশুরের গ্রামও ভাসিয়া গেছে। বাড়ির লোকজনরা মাচা বাঁধিয়া আছে। কুবের তাহাদিগকে আনিতে গেল। জল কমিয়া যাওয়া পর্যন্ত তাহারা কুবেরের বাড়িতেই থাকিবে। এক পাল ছেলেমেয়ের সঙ্গে কুবেরের শালী কপিলাও আসিল। স্বামীর সঙ্গে কপিলা ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। স্বামীও অন্য বিবাহ করিয়াছে, কপিলাকে আর ঘরে নিবে না। অভাবের সংসারে এতগুলি লোক খাইবার জন্য আসিয়া জুটিয়াছে—কুবের আসন্ন অনাহারের চিন্তায় শুকাইয়া উঠিল। কপিলা তার লীলায়িত গতিভঙ্গীতে, তরল কথাবার্তায় কুবেরের শুদ্ধ মনে মোহমেঘ ঘন করিয়া আনিল। পঙ্গু স্ত্রী বলিয়া জীবনে যে সেবাযত্ন হইতে কুবের বঞ্চিত ছিল, কপিলা তাহা সব পুরাইয়া দিল। কপিলা আর বাপের বাড়ি যাইতে চায় না। অভাবের মধ্যেও এ বোঝাকে কুবের সাদর অভ্যর্থনা জা... ...বের সহিত কপিলা দিন দিন ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে এ ব্যাপার মালার চোখ এড়াইয়া যায় নাই। কিন্তু প... কি করিতে পারে—পারে না সে কপিলা হইতে—শুধু দৃষ্টি রাখে স্বামীর উপর।

কুবেরের বড় মেয়ে গোপির বয়স এগার বছর। ইতিমধ্যে তার দুই একটা বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। কুবেরের ইচ্ছা যুগল মাঝির কাছে মেয়ে বিবাহ দেয়। যুগলের টাকাকড়ি আছে—চড়া দামে মেয়ে কিনিতে পারিবে। এদিকে রাসু—সর্ব্বহারা রাসু আবার নীড় বাঁধিতে চায়। হুসেন মিয়া তাহাকে কিছু টাকা দিয়াছে। সে গোপিকে বিবাহ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে কুবেরকে এখন সে ভারি খাতির করে, পলাইয়া গোপির সঙ্গে দুটা কথা বলিয়া আসে। একদিন ধরা পড়িয়া কপিলার কাছে বকুনিও খাইয়াছে।

এভাবে চলিতেছিল কুবেরের সংসার। একদিন আসিল ভীষণ ঝড়। কেতুপুরের জেলেপাড়ায় চলিল তার তাণ্ডব লীলা। কুবের ছিল পদ্মায়। ঘরে ফিরিয়া দেখিল ঘর পড়িয়া গোপির পা ভাঙ্গিয়া গেছে, ভীষণ কিছু ক্ষতি হয় নাই, তবু এ ক্ষতিও তার পক্ষে মারাত্মক। কিন্তু জেলেদের হুসেন মিয়া আছে। সকলের আগে হুসেন মিয়া কুবেরের ঘর তুলিয়া দিল আর কুবেরকে দিয়া টিপ সই লইল একটি এগারো টাকা দশ আনার খতে।]

পূর্বাশা, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ ১৫-১৬

ছয় অধ্যায়ে কুবের কন্যা গোপিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

মহকুমা সহর রাজবাড়ী, সেইখানে সরকারী হাসপাতাল। কেতুপুর হইতে রাজবাড়ী বেশী দূর নয়, ঘণ্টা তিনেক লাগিল পৌঁছিতে। পূর্বাশা, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ ১৭

উপন্যাসের সংস্কার করতে গিয়ে পরবর্তী পাঠে রাজবাড়ী স্থানে আমিনবাড়ি নাম ব্যবহৃত হয়েছে। হাসপাতালে গোপিকে ভর্তি করে দেওয়ার পর কপিলাকে নিয়ে কুবেরের চিন্তা ও কপিলার সঙ্গে সংলাপ :

তা বৈকি ! কলঙ্ক কিনিবার সাধ যে কপিলার ষোল আনা দেখা যায় ? কুবের গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে। এ তো ভাল কথা নয়। এক বাড়িতে যারা বাস করে। শুধু দুর্নাম কিনিবার জন্য এখানে তাদের পড়িয়া থাকিবার কোন মানে হয় না। শুধু গোপির জনাই কি কপিলা রহিয়া গেল ? গোপিকে সে এত ভালবাসে ? তারপর কুবের বলে, পোলারে আনলি না, কাইন্দা মরব তোর পোলা।

দিদি আছে ক্যান তবে ?

এঃ তো আরও ভাল কথা নয়। ছেলের জন্য কপিলার এত দুর্ভাবনার অভাব যত মায়া গোপির জন্য ?

পূর্বাশা, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ, পৃ ২০-২১

বলা বাহুল্য, প্রচলিত পাঠে কপিলার সন্তান-প্রসঙ্গ অন্তর্হিত হয়েছে। তৎপরিবর্তে নিম্নরূপ মন্তব্য আছে :

....শুধু গোপির জনাই কি কপিলা রহিয়া গেল ? গোপিকে সে এত ভালোবাসে ? কে জানে, কপিলার মন বুঝিবার ক্ষমতা ভগবান কুবেরকে দেন নাই।

অর্থাৎ কপিলার রহস্যময় প্রকৃতিকে আরও স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। পূর্বাশার পাঠে কপিলা সম্পর্কে কুবেরের চিন্তা, 'বড় নির্মম কপিলা।' আর প্রচলিত পাঠে 'বড়ো নির্মম কপিলা, বড়ো দুর্বোধ্য তাহার ব্যবহার।'

পাঠগত পরিবর্তনের আর একটি উদাহরণ একটি গীত ও তার আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি-রচনার ব্যবহার থেকে উদ্ধৃত হচ্ছে। পূর্বাশা পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ শারদ সংখ্যার সূচনাংশ :

পূর্বানুসৃতি

ভোরে আগে ঘুম ভাঙ্গিল হোসেনের। কুবেরকে সেই ডাকিয়া তুলিল। চোখ মেলিয়াই কুবেরের কেন যে হঠাৎ এক অকারণ ত্রাসে মন ভরিয়া গেল। কি হইয়াছে ? বিপদ কিসের ? হাঁ, কাল রাত্রে সে হোসেন মিয়ার পয়সা চুরি করিয়াছিল। একদফা চোখ মিটমিট করিয়া কুবের আশ্বস্ত হইল। হোসেন মিয়াকে খাতির করিয়া বলিল 'যান নাকি মিয়াবাই ? খিদায় কাতর হইছেন সন্দ' করি—রাইতে কিছু খান ত নাই। এক কাম কবেন, দুইগোটা আম খাইয়া যান।'

প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গা মুখেও হোসেন মিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে পারে।

'খাওনের কথা থোও কুবের বাই। বাড়ীত্ গিয়া খামু।'

একটা প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া বিড়ি ধরাইয়া হোসেন উঠিল। ঘুমন্ত গোপির দিকে এক নজর চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'মাইয়ার বয়স কত কুবের বাই ?'

'নয় সন্দ' কইরা থুইছি।'

'বিয়া দিবা না মাইয়ার ?'

'হ। দিমু, কেরমে কেরমে দিমু।'

কথা কহিতে কহিতে দুজনে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন বৃষ্টি নাই কিন্তু মেঘে মেঘে প্রভাতের রূপ অস্বাভাবিক থমথমে। হোসেন একবার মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে তাকাইল। ইয়া আল্লা, নামানো আকাশের তলে কি দীনা এই পৃথিবী। ভিজিয়া চুপসিয়া চারিদিক সকাতর হইয়া আছে। হোসেনের মনের কোণে একটু স্বাভাবিক কবিত্ব ছিল, জীবনের ভিন্ন অবস্থায় পড়িলে হয় ত সে কয়েকটি গীতিকা রচনা করিত, তার মধ্যে দুটি একটি মুখে মুখে প্রচার হইয়া স্থান পাইত শতাব্দীর সঞ্চিত গ্রাম্যগীতিকার অমর অলিখিত কাব্যে,—মাঠে ঘাটে, মশালের আলোয় আলোকিত উঠানে গীত হইয়া হইয়া ভণিতায় হোসেনের নাম দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িত, লোকে বলিত হোসেন ফকির, চল কেতুপুরে দেওয়ান ফকির হোসেন ছাহাবের দরগায় চেরাগ জ্বালি। হোসেন বুঝি কুবেরকে একবার ভুলিয়া যায়। অনেক দিন আগে, কুবেরের মত ছেঁড়া কাপড়ে আধপেটায় জলে কাদায় সে যখন দিন কাটাইত, সকাল সন্ধ্যায় তখন মনে তাহার ভাসিয়া আসিত গানের চরণ। আর ফুটা চালার নীচে ময়লা চাটাইএর বিছানায় উদরে উপবাস লইয়া তেমনি ভাবে কাল রাতটা কাটাইয়া আজ আবার হোসেনের মনে গানের চরণ ভাসিয়া আসিতেছে।

'কুবের গাহান বাইন্ধবার পার ?'

'আমি পারতাম না। আমাগোর যুগইলা পারে। মুখে মুখে ছড়া বাইন্ধ্যা দেয়।'

'আমি বাইন্ধবার পারি।'

'কন কি মিয়াবাই।'

পূর্বাশা, শারদীয় ১৩৪১, পৃ ২২১-২২২

গ্রন্থপ্রকাশকালে এই অংশ থেকে উপন্যাসে তৃতীয় অধ্যায় সূচিত হয়েছে যদিচ পূর্বাশার কিস্তিতে অধ্যায় সংক্রান্ত উল্লেখ নেই। তা ছাড়া পত্রিকায় অনুল্লেখিত একটি নতুন যুক্ত অনুচ্ছেদে হোসেন মিয়ার পকেট থেকে টাকার ব্যাগ বের করা ও পূর্বরাত্রে সেই ব্যাগ থেকে গোপনে কুবেরের অর্থ সরানোর কারণে কুবেরের অপরাধবোধ ও স্নায়বিক চাঞ্চল্যের উল্লেখ মনস্তত্ত্বসম্মত হয়ে উঠেছে। প্রথম সংস্করণেই এই অংশ যুক্ত হয়েছিল, পরবর্তী সংস্করণে তা অপরিবর্তিত আছে :

ভোরে আগে ঘুম ভাঙ্গিল হোসেনের। কুবেরকে সেই ডাকিয়া তুলিল, চোখ মেলিয়াই কুবেরের কেন যে হঠাৎ এক অকারণ ত্রাসে মন ভরিয়া গেল । কী হইয়াছে ? বিপদ কীসের ? হ, কাল রাত্রে সে হোসেন মিয়ার পয়সা চুরি করিয়াছিল। একদফা চোখ মিটমিট করিয়া কুবের আশ্বস্ত হইল। হোসেন মিয়াকে খাতির করিয়া বলিল, যান নাকি মিয়াবাই ? খিদায় কাতর হইছেন, সন্দ করি—রাইতে কিছু খান ত নাই। এক কাম করেন, দুইগোটা আম খাইয়া যান।

প্রত্যূষে ঘুম ভাঙা মুখেও হোসেন মিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে পারে।

খাওনের কথা থোও কুবির বাই। বাড়ীত্ গিয়া খামু।

একটা প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া বিড়ি ধরাইয়া হোসেন উঠিল। ঘুমন্ত গোপির দিকে এক নজর চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাইয়ার বয়স কত, কুবির বাই ?

নয় সন্দ কইরা থুইছি।

বিয়া দিবা না মাইয়ার ?

হ। দিমু, কেরমে কেরমে দিমু।

পকেট হইতে হোসেন ব্যাগটা বাহির করিয়া খুলিল। দেখিয়া পাংশু হইয়া গেল কুবেরের মুখ। কিন্তু না, টাকা পয়সা গুণিয়া দেখিবার জন্য হোসেন ব্যাগ বাহির করে নাই। একটা সিকি বাছিয়া লইয়া সে কুবেরর হাতে দিল। বলিল, বাচ্চাগো খাবার কিনা দিও কুবির বাই। বলিয়া ব্যাগটা আবার পকেটে রাখিয়া দিল। কুবের আত্মসম্বরণ করিল তৎক্ষণাৎ। যে বিপদ ঘটিল না তার জন্য আর কেন বুক কাঁপিবে, মুখ শুকনো দেখাইবে ? খুশিতে বেসামাল হইয়া সে জিজ্ঞাসাই করিয়া বসিল, ব্যাগটা নতুন দেখি ? মেলায় কিনছেন বুঝি কাইল ?

হোসেন বলিল, হ।

কথা কহিতে কহিতে দুজনে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন বৃষ্টি নাই কিন্তু মেঘে মেঘে প্রভাতের রূপ অস্বাভাবিক থমথমে। হোসেন একবার মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে তাকাইল।...

মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৩৫-৩৬

এরপর উপন্যাসে হোসেন মিয়া যে সদ্যরচিত গানটি শুনিয়েছে, তার পাঠেও সামান্য হেরফের ঘটেছে। পূর্বাশার পাঠ ও গ্রন্থভুক্ত পাঠ পরপর উদ্ধৃত হল, প্রথম কয়েকটি ছত্র :

আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইয়া থোও
বোনধূ কত ঘুমাইবা।
বাঁয়ে বিবি ডাইনা পোলা আকাল ফসল রোও
মিয়া কত ঘুমাইবা।
মাণের পাতে রাইতের পানি হইল রূপার কুপি,
উঠ্যা দেখবানা।
আলো করেন ঘরের চালা কেডা চুপি চুপি
উঠ্যা দেখবানা।
তোমার লাইগা হাওর দিয়া বাইয়া চেরাগ-নাও
মিয়া, তোমার লাইগা রে
চিরা মেঘের বাদাম তুইলা বিহান বেলার বাও,
সাঙ্গাত, তোমার লাইগা রে—
উঠ্যা আলেন আসমানেতে সূর্যি গোসায় খুন,
অখনে না জাগলি মিয়া, মাখবো কালি চুণ,
মিয়া কত ঘুমাইবা। পত্রিকার পাঠ পৃ ২২২-২৩

আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও
বোনধু, কত ঘুমাইবা।
বাঁয়ে বিবি ডাইনা পোলা আকাল ফসল রোও
মিয়া, কত ঘুমাইবা।
মানের পাতে রাইতের পানি হইল রূপার কুপি,
উঠ্যা দেখবা না।
আলা করেন ঘরের চালা কেডা চুপি চুপি,
দিশা রাখবা না।

তোমার লাইগা হাওর দিয়া বাইয়া চেরাগ নাও
দিল-জাগানি আলেন যিনি, মিয়া,
চিরা-মেঘের বাদাম তুইলা বন্ধু কনে যাও ?
জিগায় তারে খাঁচার চিড়িয়া।
নিদ্ ভাঙে না, দিল জাগে না, বিবির বুকের শির,
পাড়ি দিবার সময় গেল, মাঝি তবু থির—
মাঝি কত ঘুমাইবা।

মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৩৬

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর পদ্মানদীর মাঝি-র পরবর্তী সংস্করণে লেখক কর্তৃক পাঠের যতগুলি সংশোধন-পরিমার্জনের সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলির অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য মিতভাষিতা তথা বাক্যের সংক্ষেপসাধন। ক্বচিৎ অন্য জাতীয় সংস্কার বা শব্দ বা বাক্য-যোজনা ঘটেছে। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রকাশিত ১৩৬১ ভাদ্রের ষষ্ঠ মুদ্রণ বা সংস্করণের পাঠকেই মানিক রচনাসমগ্রে গ্রহণ করা হয়েছে। এটিই লেখকের জীবৎকালে প্রকাশিত সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য পাঠ। ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩-তে লেখকের প্রয়াণের অব্যবহিত পরেই পৌষ ১৩৬৩-তে প্রকাশিত হয় সপ্তম মুদ্রণ। প্রকাশিত পাঠের মুদ্রণপ্রমাদগুলি যথাসম্ভব সংশোধিত হয়েছে। কথোপকথনের ভিতর উচ্চারণের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার স্বার্থে সামান্য দু-একটি ব্যতিক্রম ঘটানো হয়েছে। নামবাচক বিশেষ্যের বানান অপরিবর্তিত আছে, যেমন যুগী, গোপি, উলুপী। এই উপন্যাসেও, পূর্ববর্তী কয়েকটি গল্প-উপন্যাসের মতো, প্রথম পুরুষ সর্বনামে সাধু ও মান্য দুই প্রকার প্রয়োগই দেখা যায়, যথা তাহার, তার। সাধারণভাবে এগুলির কোনো সংস্কার করা হয়নি।

বানানের পরিবর্তন বা গুণগত যৎসামান্য কিছু পরিবর্তন ব্যতীত, কয়েকটি পাঠভেদের উল্লেখ করা হল। লক্ষণীয়, অধিকাংশই সংক্ষেপীকরণ, ক্বচিৎ নতুন শব্দ বা বাক্য-যোজনা। যথা :

প্রথম সংস্করণ	গ্রন্থ পাঠ
...নদীবক্ষের রহস্যময় অন্ধকারে দুর্বোধ্য সঙ্কেতের মতো সঞ্চালিত হয়।	...নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সংকেতের মতো সঞ্চালিত হয়। মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ১৩
জালের শেষ সীমার বাঁশটি নৌকার পার্শ্বদেশের সঙ্গে সমান্তরাল। তাহার দুইপ্রান্ত হইতে লম্বা দুটি বাঁশ নৌকার ধারে আসিয়া মিশিয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া নৌকার ভিতরে আগাইয়া আসিয়াছে। জালের এ দুটি হাতল। এই হাতল ধরিয়া জাল উঠানো এবং নামানো হয়। নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি।..	এই হাতল ধরিয়া জাল উঠানো এবং নামানো হয়। গভীর জলে বিরাট ঠোঁটের মতো দুটি বাঁশে বাঁধা জাল লাগে। দড়ি ধরিয়া বাঁশের ঠোঁট-হাঁ-করা জাল নামাইয়া দেওয়া হয়। মাছ পড়িলে খবর আসে জেলের হাতের দড়ি বাহিয়া, দড়ির দ্বারাই জলের নীচে জালের মুখ বন্ধ করা হয়। এই নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি।... মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ১৩
একবেলা স্বাধীনভাবে স্বার্থপরতা করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে সামলাইতে পারিল না ? এমনি প্রবল নাকি জুয়াখেলার নেশা ? কে জানে ?	একবেলা স্বাধীনভাবে স্বার্থপরতা করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে সামলাইতে পারিল না ? মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ২১
স্পষ্ট কইরা যুগল কিছু কয় না গোপির মা। কয় না ? ক্যান ? গোপিরে নিব না ?	স্পষ্ট কইরা যুগল কিছু কয় না গোপির মা। মালার গলাতেও এতটুকু ঝাঁঝ নাই। কয় না ? ক্যান ? গোপিরে নিব না ? মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৩৮

উলুপী কলসী কাঁখে জল নিতে আসিয়াছে, আমিনুদ্দির মেয়েকে তাহার ছুঁইবার উপায় নাই। আমিনুদ্দি হাঁকিয়া হাঁকিয়া মেয়েকে বলিতে লাগিল, সে ফিরিয়া আসিবে...	উলুপী কলসী কাঁখে জল নিতে আসিয়াছে, আমিনুদ্দির মেয়েকে তাহার ছুঁইবাব উপায় নাই। কিন্তু এখন সে কথা ভাবিবার সময় নয়। সে-ই মেয়েটাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিল। আমিনুদ্দি হাঁকিয়া হাঁকিয়া মেয়েকে বলিতে লাগিল, সে ফিরিযা আসিবে মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৬৮
প্রথম প্রথম ওরা যখন খাতির করিয়া ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিল তখন একটু কঠিন হওয়া তাহার উচিত ছিল, একটু দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিলে ভাল হইত।	প্রথম প্রথম ওরা যখন খাতির কবিয়া ভাব জমাইবার চেষ্টা কবিয়াছিল তখন একটু দূবত্ব বজায় বাখিয়া চলিলে ভালো হইত। মা বচনাসমগ্র-২ পৃ ৬৪
হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপের উপনিবেশের কাহিনী শোনাইয়া সে বলিল যে, শ্যামাদাসের কাছেই সে আসিয়াছে। ময়নাদ্বীপে গিয়া বাস কবিতে চাহিবে এমন যদি কেহ জানা থাকে শ্যামাদাসেব।	হোসেন মিয়াব ময়নাদ্বীপে গিয়া বাস কবিতে চাহিবে এমন যদি কেহ জানা থাকে শ্যামাদাসেব। মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৭৮
কুবের কি বুঝিবে খোঁড়া পায়েব জন্য সাবাজীবন কী দুঃখ মালা পুষিয়া রাখিয়াছে মনে ? আগো, মিয়া চল, যাইবা নিয়া ?	কুবের কী বুঝিবে খোঁড়া পায়ের জন্য সারাজীবন কী দুঃখ মালা পুষিয়া রাখিয়াছে মনে ? মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৮৪

৪খ সংস্করণ পৃষ্ঠা ১৪৪, ১২ পংক্তিতে আছে :

শম্ভু বলিল, আপিম মিয়া আপিম, চুপ যাও।

কুবেবকে শম্ভুর 'মিয়া' বলে সম্বোধন, অনবধানতাজনিত হতে পারে। প্রথম সংস্করণ থেকেই এই পাঠ আছে।

পদ্মানদীব মাঝি লেখকের জীবদ্দশা থেকেই একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়। এর প্রথম ইংরেজি অনুবাদ করেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় Boatman of the Padma নামে (মে ১৯৪৮), প্রকাশক কুতুব পাবলিশার্স, বোম্বাই। এরপরও একটি অনুবাদ হয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ কুইনসল্যান্ড প্রেস অস্ট্রেলিয়া থেকে, ইউনেসকোর একটি প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে, ১৯৫৬-এ। Padma River Boatman নামের এই অনুবাদের অনুবাদক বারবারা পেইনটার ও ইয়ান লাভলক। ১৯৫৬ সালে নয়াদিল্লির ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর পক্ষ থেকে পদ্মানদীর মাঝি-র হীরেন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদটি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ সম্পর্কিত আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায় অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থের উল্লেখপঞ্জি থেকে : আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও মানবিক ভাবধারা প্রসারের উদ্দেশ্যে, মানুষ ও তার প্রতিবেশ বিষয়ে সুইডিশ ভাষায় রচিত একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়সাধ্য গ্রন্থে (Över gränserna, Del 2. ইংরেজি নাম Across the Borders, প্রকাশক Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1944), পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্য থেকে নির্বাচিত রচনাংশের সঙ্গে, আধুনিক ভারতীয় জীবন ও সাহিত্যের পরিচয় হিসাবে পদ্মানদীর মাঝি-র একটি দীর্ঘ অংশ সংকলিত হয়েছে। Ake Isling সম্পাদিত গ্রন্থটি ইউনেসকোর জন্য সুইডিশ ন্যাশনাল কমিশনের সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়।

[অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ডায়েরি ও চিঠিপত্র পৃ ৪০৫]

উপন্যাসটির চেক অনুবাদ করেন দুসান জ্বাভিতেল ; প্রাহা-র চেসকোশ্লোভেনস্কি স্পিশোভাতেল থেকে ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। অবশ্য তারও কিছু আগে (১৯৫৩) সুইডিশ

ভাষায় স্টকহোম থেকে ভিভেক বার্থেল কর্তৃক অনূদিত পদ্মানদীর মাঝি বেরিয়েছে বলে জানা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপিতে এই দুটি অনুবাদের প্রসঙ্গ বা স্বত্বজনিত অর্থপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে। চেক অনুবাদের নাম Plavec na řece Padmě এবং সুইডিশ অনুবাদের নাম Roddare På Padma। হাঙ্গেরিয় ভাষায় অনুবাদের নাম A Padma Hajósa, অনুবাদক কেলেমেন মারিয়া (বুদাপেস্ট, ১৯৫৬)। শ্লোভাক অনুবাদ Člnkár Na Rieke Padme, অনুবাদক আন্না রাকোভা (ব্রাতিশ্লাভা, ১৯৫৬) ; ডাচ অনুবাদ Roeier op de Padme, অনুবাদক হ্যান্নেকে রিচার্ড নাটবে (ব্রাসেল, ১৯৫৬) এবং জার্মান অনুবাদ Die Fischer vom Padma, অনুবাদক সরল সেন (বার্লিন, ১৯৫৬)।

চৈনিক ভাষাতেও পদ্মানদীর মাঝি অনূদিত হয়েছিল, অনুবাদক Guo Kailian ; হীরেন মুখোপাধ্যায়-অনূদিত ইংরেজি উপন্যাস অবলম্বনে এটি বেজিং রাইটার্স পাবলিশিং সোসাইটি থেকে ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। লিথুয়ানিয়, নরওয়েজিয়, বুলগেরিয় ও রুশ ভাষাতেও গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছিল। অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ-সংক্রান্ত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

পদ্মানদীর মাঝি লেখকের সর্বাধিক জনপ্রিয় রচনা, সর্বাধিক সংস্করণে সৌভাগ্যবান, নাটক-গীতিনাট্য-চলচ্চিত্রে ব্যাপকভাবে রূপায়িত ও বহু ভাষায় অনূদিত উপন্যাস। একাধিক ভারতীয় ভাষাতে পদ্মানদীর মাঝি-র তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সবগুলি অনুমোদিত বা অনুমতিলব্ধ অনুবাদ নয় বলে সেগুলির সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৫৭ সালে উপন্যাসটির হিন্দি ও মালয়ালম ভাষার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। হিন্দি অনুবাদক প্রবোধকুমার মজুমদার ও প্রকাশক বারাণসীর সরস্বতী প্রেস। মালয়ালম ভাষার প্রকাশক কেরালা ত্রিচুরের কারেন্ট বুক, অনুবাদক শ্রীরবি বর্মা। সম্মুখসুন্দরম কৃত তামিল অনুবাদ মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৫৬-তে, কানাড়ি অনুবাদক শিবানন্দ যোশি, ধারওয়ার থেকে বেরিয়েছে ১৯৫৭-তে। গোবিন্দচন্দ্র শাহু অনূদিত পদ্মানদীর মাঝি ওড়িয়া ভাষায় সাহিত্য অকাদেমি নতুন দিল্লি থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে।

পদ্মানদীর মাঝি সম্বন্ধে লেখকের অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় ১০.৮.১৯৪৬-এ মাসিক বসুমতীর সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটককে লেখা একটি চিঠির নিম্নবর্ণিত অংশ থেকে :

> ...'পদ্মানদীর মাঝি'র মত আবার একটি উপন্যাস লিখতে অর্ডার করেছেন, কিন্তু তখনকার মন আর চোখ এখন আর নেই। সেই পারিপার্শ্বিককে হারিয়েছি বহুকাল আগে। এখন আমি শহরের বাসিন্দা। যান্ত্রিক কলকাতার সংস্পর্শে এসে গ্রামীণ সরলতাকে প্রায় ভুলতে বসেছি। তবুও হলপ করছি, আপনাকে এমন লেখা দেব যে আপনি অবশ্যই খুশি হবেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকেই পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণের উদ্যোগ লক্ষ করা যায় যদিও দীর্ঘকাল তা বাস্তবায়িত হয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনপঞ্জিতে দেশি-বিদেশি একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লেখকের এতৎসংক্রান্ত চুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে লেখকের জীবিতাবস্থায় কোনো চুক্তিই কার্যকর হয়নি। পদ্মানদীর মাঝির চিত্রায়ণ সম্পর্কে লেখকের মনে অনেক প্রত্যাশা ছিল। চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনৈক ব্যক্তির উদ্দেশে একটি পত্রে ২ আগস্ট ১৯৫২ তারিখে লেখক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন :

> ...কয়েক বছর আগে থেকেই আমি অনুভব করছিলাম যে বাংলা তথা ভারতবর্ষের ছায়াচিত্র জগতে একটা মৌলিক পরিবর্তন আসন্ন। ক্রমে ক্রমে এটা আরও স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ হয়েছে। এই পরিবর্তন ঘটবার সূচনা পরিষ্কার দেখতে পাই। কারও সাধ্য নেই এই পরিবর্তন ঠেকিয়ে রাখে। কারণ সাধারণ মানুষের চেতনার পরিবর্তনই এটা ঘটাচ্ছে।
>
> সিনেমার সাধারণ দর্শক সচেতনভাবে বিচার না করুক, না বুঝুক, সময়ের সঙ্গে তাদের রুচি বদলে যাচ্ছে। তারা ছায়াচিত্রে বাস্তব জীবনের, জীবন্ত মানুষের কাহিনী চায়। রোমান্টিক রোমাঞ্চকর বা ধর্মঘটিত কাহিনী— আড়ম্বরপূর্ণ রঙীন ছবি, এসবের দিকে টান এখনো আছে, কারণ পছন্দ ঝট করে একদিনে বদলে যায় না কিন্তু পরিবর্তন যে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি এসসি পড়বার সময় আমি সাহিত্য করতে নামি—বাড়ীর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে। কারণ, তখন আমি অনুভব করছিলাম যে সাহিত্যজগতে একটা বড রকম পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, এরকম সন্ধিক্ষণে সাহিত্য সৃষ্টি করার বদলে অন্যকাজে সময় নষ্ট করা যায় না। তখন কল্লোল যুগের সমারোহ কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম সাহিত্য যে মোড় ঘুরছে কল্লোলী সাহিত্য তার লক্ষণমাত্র, আসল পরিবর্তন আসবে অন্যরূপে—সাহিত্য ক্রমে ক্রমে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে।

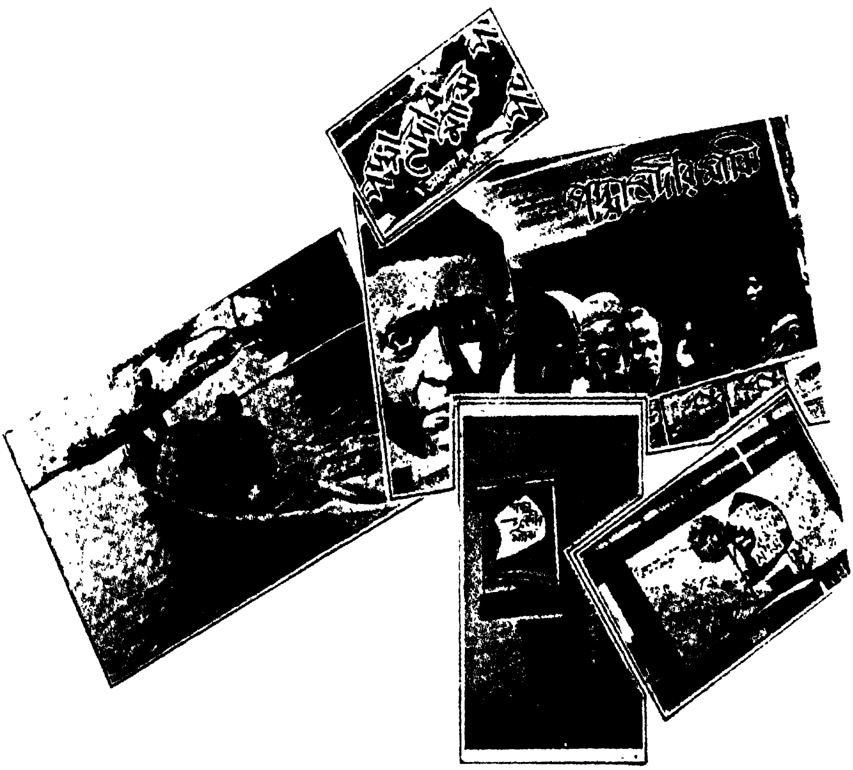
কয়েক বছর আগে থেকে আমি অনুভব করছিলাম যে ছায়াচিত্রের জগতেও এইরকম একটা মৌলিক পরিবর্তন আসন্ন। সে পরিবর্তনের আসল কথাও এই যে শুধু রোমান্স, রোমাঞ্চ, পুরাণ, ধর্ম এসব অবলম্বন করে তৈরী ছবি সাধারণ মানুষকে তুষ্ট করতে পারবে না—তারা বাস্তব জীবন, বাস্তব চরিত্র চায়।

রোমান্স, রোমাঞ্চের মোহ যে দর্শকদের একদম ঘুচে গেছে তা অবশ্যই বলছি না। রাতারাতি মানুষ পাল্টে যায় না—তবুও একটা প্রক্রিয়া আছে। কিন্তু এটুকু লক্ষণ আজ স্পষ্ট যে বাঙালী দর্শকেরা বাস্তব জীবন বাস্তব মানুষকে ভিত্তি করা কাহিনী খুসী হয়ে গ্রহণ করছে।

পদ্মানদীর মাঝির চিত্ররূপের সাফল্য সম্পর্কে আমার বিশ্বাসের এটাই ভিত্তি। কাহিনীটা বাস্তব মানুষের বাস্তব জীবন নিয়ে। একেবারে নিখুঁত করে যদি না-ও তোলা যায় ছবি—চরিত্রগুলি যদি মোটামুটি রূপ পায় আর কাহিনীটা দর্শকেরা বুঝে অনুসরণ করে যেতে পারে, ছবিটি লোকে খুসী হয়ে নেবে।

আশা করছি অবশ্য অনেক বেশী! পদ্মানদীর মাঝির চিত্ররূপ হবে বাংলা ছবির মোড় ঘুরবার প্রথম সার্থক নিদর্শন। আমাদের মিলিত প্রচেষ্টা চিত্রজগতে আলোড়ন তুলবে, নূতন মূল্যবোধের চেতনা আনবে, নূতন পথ দেখাবে।...

(অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৩০৭-০৮)



মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশকাল ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮, যদিও গ্রন্থে অনুল্লেখিত। গ্রন্থে লেখকের নামের বানান 'মাণিক'। গ্রন্থনামে কাহিনি এ যাবৎ 'কাহিনী' বানানে মুদ্রিত হয়ে এসেছে। বর্তমান আকাদেমি সংস্করণের মূল পাঠে আকাদেমি-সম্মত বানানবিধি অনুসৃত হয়েছে। গ্রন্থমধ্যে তদনুযায়ী সর্বত্র বানানের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হলেও ক্বচিৎ লেখক-ব্যবহৃত কোনো কোনো বানানের স্বকীয়তা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। যথা দ্যাখে, দ্যাখা, দ্যাখাও ইত্যাদি।

পরবর্তী এবং সর্বশেষ সংস্করণ ১৯৩৮ জানুয়ারি, প্রকাশক বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড। উল্লেখ্য বসুমতী-সংস্করণটিতে প্রকাশকাল উল্লেখিত ছিল না, পরে সংযোজিত হয়েছে।

প্রথম সংস্করণভুক্ত গল্পগুলি যথাক্রমে : টিকটিকি, বিপত্নীক, ছায়া, হাত, বিড়ম্বনা, রকমারি, কবি ও ভাস্করের লড়াই, আশ্রয়, শৈলজ শিলা, খুকী, অবগুণ্ঠিত, সিঁড়ি।

গ্রন্থালয়-প্রকাশিত মানিক গ্রন্থাবলীর চতুর্থ খণ্ডে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপরিচয়ে মিহি ও মোটা কাহিনী-র একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত হয়েছে। এতে গল্পগ্রন্থটির নামোল্লেখ না থাকলেও আলোচ্য গল্পসংকলনের প্রেক্ষিতরূপে ইতিপূর্বে প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিমত আছে। যথা :

> মানিকবাবুর সাহিত্যরচনার ক্ষেত্র যে কিরূপ বিস্তৃত সাহিত্যরসিকের তাহা অজানা নাই। পদ্মানদীর মাঝিরা সমাজের যে স্তরে বাস করে, চোরডাকাত ভিখারীর জীবনে প্রাগৈতিহাসিক দুর্দান্ত জীবনযাপন-প্রণালীর যে অভিব্যক্তি আজও সুস্পষ্ট ধরা পড়ে, মধ্যবিত্ত সমাজের জননীর জীবন নিজস্ব আবেষ্টনীর মধ্যে সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে যে-ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, আবার কালচার নামক ব্যারামটি মানুষের জীবনে আনন্দ-বেদনার উপর যে কৃত্রিম যবনিকা টানিয়া দেয়—সমাজের সকল স্তরের সকল শ্রেণীর মানুষের জীবন হইতে মানিকবাবু তাহার রসসৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করেন। এই সকল মানুষের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে মানিকবাবুর লেখায় যে রসসৃষ্টি হইয়াছে তাহার তুলনা নাই।

মানিক রচনাসমগ্রে মিহি ও মোটা কাহিনী-র প্রথম সংস্করণের পাঠ গৃহীত হয়েছে।

মিহি ও মোটা কাহিনী-র অন্তর্গত দু-একটি গল্প পরবর্তী কয়েকটি গল্পসংকলনে গৃহীত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পে (প্রথম সংস্করণ ১৯৫০, সম্পাদক জগদীশ ভট্টাচার্য ; নূতন সংস্করণ ১৯৬৫, সম্পাদক যুগান্তর চক্রবর্তী ; প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স) টিকটিকি গল্পটি স্থান পেয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্পে (প্রথম সংস্করণ ১৯৫৬, প্রকাশক ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং) টিকটিকি, বিপত্নীক ও সিঁড়ি গল্প তিনটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মিহি ও মোটা কাহিনী সংকলনগত গল্পগুলির কয়েকটির প্রাথমিক প্রকাশসূত্র এইরূপ :

রকমারি (চিত্র)	মানসী ও মর্মবাণী	বৈশাখ ১৩৩৬
বিড়ম্বনা	আগতা (টাঙাইল)	আষাঢ় ১৩৩৮
শৈলজ শিলা	গল্পলহরী	ভাদ্র ১৩৩৯
কবি ও ভাস্করের লড়াই	বিচিত্রা	অগ্রহায়ণ ১৩৪১
সিঁড়ি	সাপ্তাহিক অগ্রগতি	১৩ চৈত্র ১৩৪৩
হাত	সাপ্তাহিক অগ্রগতি	৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪
টিকটিকি	পরিচয়	শ্রাবণ ১৩৪৪
অবগুণ্ঠিত	সাপ্তাহিক অগ্রগতি	পূজা সংখ্যা ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৪৪

রকমারি গল্পটি পত্রিকায় প্রকাশকালে শিরোনাম ছিল রকমারি (চিত্র)।

বিড়ম্বনা গল্পের পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বপাঠটি সংগৃহীত হয়েছে। তদনুযায়ী প্রকাশিত গ্রন্থপাঠের সঙ্গে পূর্বপাঠের তুলনায় সংস্কার-পরিবর্তন-সংযোজনগুলি নিম্নরূপ :

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থ পাঠ
সে আর বেঁচে থাকার অবলম্বন নয়, —বাধা। যৌবনের আবরণী শুভ্রবাস দুঃখের প্রাচীরের মত কাছে আসা মেয়েকে সুদূর করে রেখেছে, হারামণি বলে পুলকিত হবার কোন পথই আর খোলা নেই ! দশ বছর স্কুল হয়েছে, দশবছরে কম করে দেড়শ ছেলে... পৃ ১৪	সে আর বেঁচে থাকার অবলম্বন নয়,—বাধা। দশ বছর স্কুল হয়েছে, দশ বছরে অন্তত দেড়শো ছেলে.... মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৩৩৯
এ যদি করতে পার তবেই বুঝব তুমি হেডমাষ্টার বটে ! পৃ ১৫	এ যদি করতে পার তবেই বুঝব তুমি হেডমাস্টার মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৩৪০
কি যে বলো বাবা !	কী যে বলো তুমি ? মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৩৪০
এক ছেলের মা হয়ে দিন কাটাবে এই কি তার জীবনের চরম হিসাব নিকাশ ? তাই যদি, ছোট্ট একটি জ্যান্ত পুতুলের অভাবে ছাব্বিশ বছরের যৌবন তার আজ মাথা খুঁড়ছে কেন ? ঝি এসে সংবাদ দিল নতুন হেডমাষ্টার এসে বসে আছেন। পৃ ১৭	এক ছেলের মা হয়ে দিন কাটাবে এই কী তার জীবনের চরম হিসাব নিকাশ ? ঝি এসে সংবাদ দিল নতুন হেডমাস্টার এসে বসে আছেন। মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৩৪১
তার ওই নাড়ী-ছেঁড়া ধনের সাতবছরব্যাপী প্রভাব ও আত্মমর্য্যাদার শিক্ষা কত সহজে ব্যর্থ করে দিচ্ছে এই একান্ত পর মানুষটি পৃ ১৯	তার ওই নাড়ি-ছেঁড়া ধনের সাত বছরব্যাপী প্রভাব ও আত্মমর্যাদার শিক্ষা কত সহজে ব্যর্থ করে দিচ্ছে এই একান্ত পর মানুষটি ! হায়, এ কী বিড়ম্বনা। মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৩৪৩
কায়ার প্রত্যাখ্যানে অনন্ত তবে নটি' বছর ছায়া নিয়ে কাটিয়েছে ! পৃ ২০	কায়ার প্রত্যাখ্যানে অনন্ত তবে ন-টি বছর ছায়া নিয়ে কাটিয়েছে ! হায়, মানুষটার জীবনে এ কী বিড়ম্বনা। মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৩৪৪
যে আজ মন্ত্রেরও বড় ঈশ্বরের বিধান মেনে বৌ হতে ভয় পায় না। এই পর্য্যন্ত গল্প লিখে আমার মনে পড়ল শ্বেতার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার পর কুণালের মুখে ফুল দিয়ে শ্বেতার ছবি পুজো করার ইঙ্গিতটুকু ছাড়া অনন্তের কোন সংবাদ দেওয়া হয়নি। অথচ সেই বিকালের পর কেটে গেছে পুরো সাতটি দিন। কিন্তু নিজে যদি এই অন্যায়ের প্রতিকার করতে বসি গল্পের রসভঙ্গ হয়ে যাবে। ষষ্ঠদিন পর্য্যন্ত অনন্তের খবর খুব ভাল, কিন্তু সপ্তমদিনের সংবাদে শ্রী একটুও নেই, আগাগোড়া সবটাই বিশ্রী। শ্বেতার ঝির মুখ দিয়েই সেদিনের ব্যাপারটা বিবৃত করি। সকাল থেকে শ্বেতা আজ আনমনা হয়েছিল।	যে আজ মন্ত্রেরও বড়ো ঈশ্বরের বিধান মেনে বউ হতে ভয় পায় না ! সকাল থেকে শ্বেতা আজ আনমনা হয়েছিল। মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৩৪৪

বললে, ইস্তিরীর অপকার আমি ছাড়ব কেন ? পিথিমীর শেষ পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে ঘুরবো আমি।

শ্বেতা ধীরে ধীরে বললে, স্ত্রীর অপকাব নয় অধিকার বলেছিল না ঝি ?

হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি, তাই।

তারপর ? পৃ ২১

বললে, আমি তোমার ইস্তিরি, তোমায় আমি ছাড়ব কেন ? পিথিমির শেষ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে ঘুরবো আমি তারপর ?

মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৩৪৫

শুনে মেয়েটা মুখে ন্যাকড়া গুঁজে—

রুমাল গুঁজে।

হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি, তাই। মুখে রুমাল গুঁজে মেয়েটা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। পৃ ২১

শুনে মুখে ন্যাকড়া গুঁজে মেয়েটা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৩৪৬

পত্রিকায় প্রকাশিত অন্যান্য দু-একটি গল্পের গ্রন্থভুক্তিকালে সামান্য কিছু যতিচি নংস্কার বা শব্দপরিবর্তন মাত্র চোখে পড়ে। যথা সিঁড়ি গল্পের শেষাংশে :

পত্রিকার পাঠ

ইতিব মা এ কথা শুনতে পায় না।

মেয়ের পদমূলে চোখ বেখে বলে, 'তোব পায়ে ঘা কিসেব লো ইতি ?'

ইতি নিশ্চিন্তভাবে বলল, 'পাঁচড়া চুলকে ফেলেছি।'

গ্রন্থ পাঠ

ইতিব মা এ কথা শুনতে পায় না।

মেযেব পদমূলে চোখ বেখে বলে, তোব পাযে বক্ত কীসেব লো ইতি ?

ইতি নিশ্চিন্তভাবে বলল, পাঁচড়া চুলকে ফেলেছি।

মা বচনাসমগ্র-২ পৃ ৩৯৮

দু-একটি গল্পের অনুবাদ সম্পর্কেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ও অতুলচন্দ্র গুপ্তের ভূমিকা-সংবলিত, নয়াদিল্লির পিপল্‌স পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত প্রিমিভ্যাল অ্যান্ড আদার স্টোরিজ (Primeval And Other Stories, 1958) গ্রন্থে সিঁড়ি (Stairs, অনুবাদক সমর সেন) গল্পটি গৃহীত হয়েছে। দিলীপকুমার গুপ্ত সম্পাদিত ও সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত দ্য বেস্ট স্টোরিজ অফ মডার্ন বেঙ্গল (The Best Stories of Modern Bengal 1946-47) সংকলনেও সিঁড়ি গল্পটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বলে জানা যায়। অমৃতস্য পুত্রাঃ উপন্যাসের ইংবেজি অনুবাদ যে অনুবাদ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত ওয়াইভস অ্যান্ড আদার্স-এ মিহি ও মোটা কাহিনী-র অন্তর্গত বিপত্নীক গল্পের অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত অনুবাদ-গ্রন্থটি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ অমৃতস্য পুত্রাঃ-র গ্রন্থপরিচয়ে পাওয়া যাবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি-র একটি পৃষ্ঠায় (১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৬) প্রাপ্ত উল্লেখ থেকে মনে হয়, লেখক সিঁড়ি গল্পটির উর্দু অনুবাদের অনুমতি দিয়েছিলেন। অবশ্য সেটি কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য যে, অতসী মামী এবং প্রাগৈতিহাসিক-এর মতো মিহি ও মোটা কাহিনী-তে কোনো বিশেষ গল্পনামের দ্বারা গ্রন্থের নামকরণ হয়নি।

সরীসৃপ

'সরীসৃপ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দশম গ্রন্থ ও চতুর্থ গল্পসংকলন। এর প্রথম প্রকাশকাল গ্রন্থে উল্লিখিত হয়নি। সজনীকান্ত দাস প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী এই গ্রন্থের প্রকাশকাল আগস্ট ১৯৩৯। প্রথম সংস্করণের প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪ + ১৭৬, দাম দেড় টাকা। সংকলনভুক্ত মোট বারোটি গল্পের নামকরণ হয়েছে সর্বশেষ গল্পটির নামে।

সরীসৃপ সংকলনের প্রথম সংস্করণে এই গল্পগুলি ছিল :

মহাজন, বন্যা, মমতাদি, মহাকালের জটার জট, গুপ্তধন, প্যাঁক, বিষাক্ত প্রেম, দিকপরিবর্তন, নদীর বিদ্রোহ, মহাবীর ও অবলার ইতিকথা, দুটি ছোট্ট গল্প—বোমা ও পার্থক্য এবং সর্বশেষ গল্প সরীসৃপ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবিতকালে এই গল্পসংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পে (১৯৫০) সরীসৃপ এবং স্বনির্বাচিত গল্পে (১৯৫৬) মহাকালের জটার জট গল্পটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ গল্পের পরবর্তী সংস্করণেও (১৯৬৫) সরীসৃপ গল্পটি আছে। এই সংকলনের কয়েকটি গল্পের প্রথম প্রকাশকাল নিম্নরূপ :

মহাকালের জটার জট	দীপক	শারদীয় সংখ্যা ১৩৩৯
সরীসৃপ	বঙ্গশ্রী	আশ্বিন ১৩৪০
দিক পরিবর্তন	সাপ্তাহিক অগ্রগতি	৭ পৌষ ১৩৪৩
নদীর বিদ্রোহ	বঙ্গশ্রী	আষাঢ় ১৩৪৫
বিষাক্ত প্রেম	সাপ্তাহিক অগ্রগতি	১৪ শ্রাবণ ১৩৪৫
প্যাঁক	পরিচয়	শ্রাবণ ১৩৪৫
বন্যা	যুগান্তর	শারদীয় সংখ্যা ১৩৪৫
মহাজন	আনন্দবাজার পত্রিকা	শারদীয় সংখ্যা ১৩৪৫

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সাপ্তাহিক অগ্রগতি পত্রিকার ১৪ শ্রাবণ ১৩৪৫ সংখ্যায় 'বিষাক্ত প্রেম' গল্পটি ছাড়া 'উত্তর দক্ষিণ' নামে একটি কবিতাও প্রকাশিত হয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে প্রথম সংস্করণের পাঠ মিলিয়ে বর্তমান সংগ্রহগ্রন্থে প্রথম সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রন্থ প্রকাশকালে লেখক কর্তৃক ভাষাসংস্কারের প্রয়াস সামান্য হলেও উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি উদাহরণ

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থ পাঠ
ভয় করিতে লাগিল নদেরচাঁদের।	**নদীর বিদ্রোহ** বড়ো ভয় করিতে লাগিল নদের চাঁদের। মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৪৫৬
স্বাধীন জীবনে সেই প্রথম স্নেহ, সেই প্রথম আসবাব।	**বিষাক্ত প্রেম** . সরলার স্বাধীন জীবনে সেই প্রথম স্নেহ, সেই প্রথম আসবাব। মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৪৪৯
ফিরে এসে জমান যাবে।	ফিরে এসে ফুর্তি জমানো যাবে। মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৪৫০
এই তো এই মাস্তর।	.এই তো মাস্তর। মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৪৫০
চুরি করে পালিয়ে যাবার সময় চোরের পর্যন্ত এইটুকু সেবা করে তৃপ্তি হয় না।	চুরি করে পালিয়ে যাবার সময় চোরের পর্যন্ত এইটুকু সেবা করে তৃপ্তি হয় না। এমনই আশ্চর্য সেবা করার নেশা। মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৪৫১
সকলের চেয়ে প্রাণশক্তি সরলার কম নয় ?	সকলের চেয়ে প্রাণশক্তি কি সরলার কম নয় ? মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৪৫২

কতগুলি ...উপকারী কতগুলি ওষুধ মিশিয়ে	**দিকপরিবর্তন** : কতকগুলি ...উপকারী ওষুধ মিশিয়ে... মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৪৫৩
নিশুতি রাত, বাড়ীটা এক একবার প্রাণঘাতী আলোয় চমকাইয়া উঠিয়া অন্ধকারে আড়ষ্ট হইয়া যাইতেছে।	**সরীসৃপ** : নিশুতি রাত, বাড়িটা একবার প্রাণঘাতী আলোয় চমকাইয়া উঠিয়া অন্ধকারে আড়ষ্ট হইয়া যাইতেছে। মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৪৬৮
ছুঁইতেও ঘৃণায় গা শিহরিয়া উঠিবে বলিযা সে যাহার চোখ দুটা উপড়াইয়া আনিল না।	ছুঁইতেও ঘৃণায় গা শিহরিযা উঠিল বলিয়া সে যাহার চোখ দুটা উপড়াইয়া আনিল না। মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৪৬৮
এটা সে হঠাৎ ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল।	এটা সে হঠাৎ ধাবণা করিয়া উঠিতে পারিল না। মা বচনাসমগ্র-২ পৃ ৪৭৯
মালতীর জন্য সুশান্তর মনে একটু মমতা আছে, সে দুবেলা রান্না করে বলিয়া অথবা দুবেলা দাদার অন্ন ধ্বংস করে বলিয়া অথবা এখনও স্বামী জোটে নাই বলিয়া, সুশান্ত ঠিক জানে না।	**প্যাঁক** : মালতীব জন্য সুশান্তর মনে একটু মমতা আছে, সে দুবেলা বান্না কবে বলিযা অথবা এখনও স্বামী জোটে নাই বলিয়া, সুশান্ত ঠিক জানে না। মা বচনাসমগ্র-২ পৃ ৪৪২
ক্ষোভের জ্বালায় মাথার মধ্যে পর্যন্ত যেন ঝিমঝিম করে, মাথা নাড়িয়া জোর দিয়া সে বলে, 'বুঝবে না, তুমি বুঝবে না মালতী।'	ক্ষোভেব জ্বালায় মাথার মধ্যে পর্যন্ত যেন ঝিমঝিম কবে, মাথা নাড়িয়া জোব দিয়া সে বলে, বুঝবে না, বুঝবে না, তুমি বুঝবে না মালতী। মা বচনাসমগ্র-২ পৃ ৪৪৪

পরিশিষ্ট

পাণ্ডুলিপি-পরিচয়

পদ্মানদীর মাঝি	:	খণ্ডিত মূল পাণ্ডুলিপি
জীবনের জটিলতা	:	খণ্ডিত আদি পাণ্ডুলিপি (অসম্পূর্ণ)
প্রাগৈতিহাসিক	:	'অন্ধ' গল্পের দুটি ভিন্ন পাঠ
অমৃতস্য পুত্রাঃ	:	উপন্যাসের একটি বিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠা
সরীসৃপ	:	'মহাজন' গল্পের এক পৃষ্ঠায় একাধিক পাঠ
		'গুপ্তধন' গল্পের প্রথমাংশের পাঠ
		'প্যাঁক' গল্পের ছিন্ন পাণ্ডুলিপি
		'বিষাক্ত প্রেম' গল্পের ছিন্ন পাণ্ডুলিপি

পদ্মানদীর মাঝি

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অভিলেখাগারে পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের একটি খণ্ডিত অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আছে। এতে লেখকের উক্ত উপন্যাসের স্বহস্তলিখিত ঊনত্রিশটি পৃষ্ঠা বিচ্ছিন্নভাবে আছে, কোনো কোনো পৃষ্ঠায় সংখ্যার বদলে A বা অনুরূপ সংকেত আছে। তবে মুদ্রিত উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই পাণ্ডুলিপির কাহিনিসূত্র অনুসরণ করা যায়। পাণ্ডুলিপির ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি ও সংলাপ মুদ্রিত উপন্যাসে মাঝে মাঝে পরিবর্তিত হয়েছে। তবে সে পবিবর্তন উপন্যাসের প্রথম মুদ্রণ ও পরবর্তী সংস্করণের কোন স্তরে, কী পরিমাণে সংঘটিত হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে নির্দেশ করা যায় না। পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তুলনা করলে স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় ভাষাগত সংস্কার, রচনার উন্নতমানের পরিচায়ক। অন্যান্য তথ্যগত বা নামগত সংস্কার কাহিনির নিজস্ব ত্রুটিসংশোধনের কারণেই। শব্দগত ছোটোখাটো সংস্কারের পরিমাণই বেশি ; কয়েকটি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ .

পাণ্ডুলিপি	গ্রন্থ পাঠ
জাল নদীব জলে নামায এবং মাছ সঞ্চয কবে .	জালটি জলে নামায এবং তোলে, মাছগুলি সঞ্চয় কবে
ঢেউয়ে নৌকা টলমল কবে	ঢেউয়ে নৌকা টলমল কবিতে থাকে
...মাছ উঠিযাছিল। আজ আশাতিরিক্ত মাছ পড়িতেছিল।	মাছ উঠিয়াছিল। আজ খুব মাছ উঠিতেছিল।
গোযালন্দে গিয়া দর না জানা অবধি...	দেবীগঞ্জেব মাছেব দব...
সৌভাগ্য কি না বলিবাব উপায় নাই .	সৌভাগ্য কি না বলা যায় না
যদি আজ এই রকম মাছ পডে দর কাল এত নামিযা যাইবে যে বিশেষ লাভের আশা কবা চলিবে না. .	যদি এ রকম মাছ পড়ে, দাম কাল এত নামিয়া যাইবে যে বিশেয কোনও লাভেব আশা থাকিবে না .
সাঁঝের দরটা শুধো দিকি কুবের .	সাঁঝেব দবটা জিগা দেখি কুবেব
সন্ধ্যাবেলা সওয়া পাঁচ, পাঁচ ও পৌনে পাঁচ টাকা দরে মাছেব শ' বিকাইযাছে. .	সন্ধ্যাবেলা আজ পৌনে পাঁচ, পাঁচ এবং সওয়া পাঁচ টাকা দবে মাছ বিক্রি হইয়াছে .
কুবেব বলিল, 'বও খুড়ো টানতে দাও'।	কলিকাটা তাহাব হাতে দিয়া কুবেব বাগ করিয়া বসিয়া রহিল।

পাণ্ডুলিপিস্থিত প্রথম পাঠের সঙ্গে প্রচলিত উপন্যাসের পাঠগত তুলনা সবিস্তারে প্রদর্শন সম্ভব নয়, কারণ পাণ্ডুলিপিটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে। তথাপি, তারই সাহায্যে কয়েকটি পাঠভেদ নির্দেশ করা হল :

পাণ্ডুলিপি	গ্রন্থ পাঠ
নৌকাটা ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি। জালটাও তাহারই। প্রতি রাত্রে যত মাছ ধরা হয় তাহার অর্ধেক লয় ধনঞ্জয় একা, বাকি অর্ধেক ভাগ হয় কুবেব ও গণেশের মধ্যে। এই তাহাদের ভাগাভাগির বন্দোবস্ত। কিন্তু আসলে মাছ ভাগ হয় না। সকালে গোয়ালন্দে মাছ বেচিয়া যেটাকাটা পাওয়া যায়, ভাগ হয় তাহাই।	এ নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি। জালটিও তাবই। প্রতি রাত্রে যত মাছ ধরা হয় তাব অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়েব, বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের। মা বচনাসমগ্র-২ পৃ ১৩
গণেশ কুবেরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বাড়াবাড়ি রকমে কাঁপিতেছিল। এবার মুখ ফুটিয়া কহিল 'জাড় লাগছে বাবু, আজ।'	কুবেবের পাশে বসিয়া গণেশ বাডাবাড়ি বকমের কাঁপিতেছিল। এ যেন সত্যসত্যই শীতকাল। হঠাৎ সে বলিল, ইঃ আজ কী জাড় কুবির।

তাহাব কথাটা কেহ কানে তুলিল না। কারও কাছে সায় না পাইয়া কুবেরের হাঁটুতে একটা খোঁচা দিয়া গণেশ আবাব বলিল, 'জানিস কুবের আজ বড়ো জাড় লাগছে। কাঁপুচ্ছে একদম।' কুবের সংক্ষেপে বলিল 'কাঁপুক'।

কথাটা কেহ কানে তুলিল না। কারও সাড়া না পাইয়া কুবেরের হাঁটুতে একটা খোঁচা দিয়া গণেশ আবার বলিল, জানস কুবির, আইজকার জাড়ে কাঁইপা মরলাম।

মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ১৪

পুড়িয়া শেষ হওয়া অবধি পালা কবিয়া তাহাবা তামাক টানিল। নৌকা এতক্ষণে কেতুপুরের কাছাকাছি আগাইয়া আসিযাছে। কুবের ও গণেশ জাল নামাইয়া বৈঠা ধবিল।

পূবদিক লাল হইয়া ওঠা পর্যন্ত তাহারা জাল ফেলিয়া বেড়াইল।

পুড়িয়া শেষ হওয়া অবধি তাহারা পালা করিয়া তামাক টানিল। নৌকা এখন অনেক দূবে আগাইয়া আসিয়াছে। কলিকার ছাই জলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া হুঁকাটি ছইয়ে টাঙাইয়া দিয়া জাল নামাইয়া কুবেব ও গণেশ বৈঠা ধরিল।

গণেশ হঠাৎ মিনতি কবিয়া বলিল, একখানা গীত ক দেখি কুবিব।

হু, গীত না তর মাথা।

কুবেরের ধমক খাইয়া গণেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর নিজেই ধরিয়া দিল গান। সে গাহিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ধনঞ্জয় ও কুবের মন দিয়া গানেব কথাগুলি শোনে। যে যাহাকে ভালোবাসে সে তাহাবে পায় না কেন, গানে এই গভীব সমস্যাব কথা আছে। বড়ো সহজ নয়।

পূবদিক লাল হইয়া উঠা পর্যন্ত তাহারা জাল ফেলিয়া বেড়াইল।. .

মা বচনাসমগ্র-২ পৃ ১৫

বিকালেব দিকে গোপি সওদা আনিতে কেতুপুব গ্রামেব মধ্যে যায়, পথেব সবচেয়ে নির্জ্জন অংশে প্রায়ই তাহাব দেখা হয় বাসুর সঙ্গে।

বাসু বলে, 'দুকানে যাও নাকি গোপি ?' গোপি বলে, 'বোজ এক কথা জিগাও কেবে ?'

স্নেহে রাসুব গলা ভিজিয়া আসে। কি করিয়া যে গোপিকে জানানো যায় তাহাব স্নেহেব কথা কি কৌশলে যে মন হবণ কবা যায় গোপিব, সে ভাবিযা পায় না।

কি সওদা আনবা গোপি ?

পথেব মাঝখানে দাঁড়াইয়া রাসু সারাদিন গোপির সঙ্গে আলাপ করিতে পারে কিন্তু গোপিব অত ধৈর্য্য নাই। সে আগাইয়া চলিতে থাকে। বাসু এদিক-ওদিক তাকায়। আজ কপাল ভালো, পথটা নির্জ্জনই আছে। কাছে ঘেঁষিয়া গোপিকে সে দাঁড়াইতে বলে। গোপি দাঁড়ায় কিন্তু হাত ধরিতে দেয় না। বড়ো রাগ করে গোপি হাত ধবিলে।

গাঁট হইতে রাসু তখন বাহিব করে কাঁচ বসানো পিতলেব একটা আংটি আব পুঁতির মা'। সাগ্রহে বলে, নিবা ?

গোপি খুশি হইযা উপহাব গ্রহণ করে। সলজ্জভাবে একটু সে হাসে। বাসুকে ভালই লাগে গোপির, ভালবাসা পশুপাখি টেব পায় গোপি তো মানুষের মেয়ে, রাসুর জন্য

সেই ঘরে বাসু বাস কবে একা, হয়তো ধ্যান করে গোপির। বিকালে কেতুপুব গ্রামের মধ্যে সওদা আনিতে যাওয়াব সময় পথেব নির্জনতম অংশে কোনো কোনোদিন গোপি রাসুকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পায়।

বাসু বলে, কই যাও গোপি ? সে একটু স্নেহব্যঞ্জক হাসি হাসে। গাঁট হইতে বাহিব কবে একটি কাচ-বসানো পিতলের আংটি আব পুঁতিব মালা, বলে, নিবা ?

গোপি খুশি হইযা উপহার গ্রহণ করে। রাসুকে ভালোই লাগে তাহার, রাসুব জন্য সেই একটু দুঃখ বোধ করে। কোথায় সে ময়নাদ্বীপ কে জানে, সকলকে রাসু সেখানে হাবাইয়া আসিয়াছে, বড়ো কষ্ট পাইয়াছে সে জীবনে। তা ছাড়া রাসুব কথাগুলি ভারী মিষ্টি, শুনিতে বড়ো ভালো লাগে গোপিব। আর কী খাতিরটা রাসু তাহাকে কবে। কত যেন সে বড়ো হইযাছে, এগারো বছরের মেয়ে সে নয়।

মা বচনাসমগ্র-২ পৃ ৪৫

সেও একটা টান অনুভব করে, কেবল তাহাকে একা পাইলে কেমন খাপছাড়া খাপছাড়া ব্যবহার করে রাসু এইটুকু শুধু গোপির আপশোষ। কেমন লজ্জা বোধহয়, অস্বস্তি লাগে। হঠাৎ বলা নাই কওয়া নাই হঠাৎ যেন ভয়ানক রাগ হইয়া যায় রাসুর উপর গাল দিতে ইচ্ছা হয়।

অথচ ভালও লাগে রাসুকে। যেদিন সওদা আনিতে যাওয়ার সময় রাসুকে সে দেখিতে পায় না সেদিন অনেকক্ষণ গোপি মুখ ভার করিয়া থাকে রাসুর মমতার স্বাদটা বোধহয় মিষ্টি মদের গোপিকে নেশা জন্মাইয়া দিয়াছে ; তাকে না পাইলে যে রাসু বিবাগী হইয়া যাইবে, জলে ডুবিয়া মরিবে বোজ রোজ রাসুর মুখে এ প্রতিজ্ঞা শুনিতে না পাইলে গোপির মনটা কেমন করিতে থাকে।

মাঝে মাঝে এ কথা ভাবিয়াও গোপির মন কেমন করিতে থাকে গোপির যে, জগতে রাসুর কেহ নাই। কোথায় সে ময়নাদ্বীপ কে জানে, সেখানে সকলকে হারাইয়া একা রাসু ফিরিয়া আসিয়াছে—রাসু নিজে বলিয়াছে বুক জুড়িয়া দিবারাত্র তাহার হাহাকার। তা হইবে না ? আহা, বলিতে বলিতে রাসুর চোখ কেমন ছলছল করিতেছিল ! বৌ হইতে হইবে এই তো রাসু চায় তার কাছে ? তা বৌ হইতে গোপির আপত্তি নাই !

প্রথম প্রথম রাসুকে গোপি বড়ো অবিশ্বাস করিত। কে জানে কি বদ মতলব আছে ওর—একা পাইলেই হাত ধরিয়া কাছে টানিতে চায় ? ক্রমে ক্রমে বাসুবও বুঝি মনের পরিবর্তন হইয়াছে গোপিরও জন্মিয়াছে বিশ্বাস সে জানিয়াছে রাসু তার বড়ো বাধ্য—পোষমানা।

[*পাণ্ডুলিপির পববর্তী পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি।*]

জেলেপাড়ার বৃদ্ধ ও রমণীবা হাহাকার কবিয়া রাত কাটাইল, ছেলেমেয়েরা কেহ ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিল, কেহ গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ইলিশের মরশুম শেষ হইতে চলিয়াছে, মোটা উপার্জ্জনের সুযোগ দুদিন পরে ফুরাইয়া যাইবে, জেলেপাড়ার কোনো ঘরে আজ বুঝি সমর্থদেহ পুরুষ নাই, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছে দূরে দূরান্তরে।

কেহ ফিরিবে প্রভাতে, কেহ ফিরিবে না ?

ইলিশের মবসুম শেষ হইলে মোটা উপার্জনের সুযোগ দুদিন পবে ফুরাইয়া যাইবে, জেলেপাড়ার কোনো ঘবে আজ বুঝি সমর্থদেহ পুরুষ নাই, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছে দূর দূরান্তরে।

কে ফিরিবে প্রভাতে, কে ফিরিবে না।

মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৪৭

উঠান ভরিয়া গিয়াছে, গোপি খুব আঘাত পাইয়াছে। কে জানে ডান পা-টি তাহার ভাঙিয়া গিয়াছে কি না, চালা উড়িয়া দূরে গিয়া পড়িয়াছে পীতমের গোয়ালঘরের উপর।

..উঠান ভরিয়া পথ জুড়িয়া জমিয়াছে গাছের ডালপালা। কুবেরের শোবার ঘরখানা পড়িয়া গিয়াছে, গোপি খুব আঘাত পাইয়াছে, কে জানে ডান পা-টি তাহার ভাঙিয়া গিয়াছে কি না। চালা উড়িয়া দূরে গিয়া পড়িয়াছে পীতমের গোয়ালঘরে, হীরু আর সিধুর একখানা ঘরও দাঁড়াইয়া নাই...

মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৪৭

তখনও নদীতে কিছু কিছু কুয়াশা ছিল। সকলকে দাঁড় ধরিতে বলিয়া হোসেন নিজে হাল ধরিয়া বসিল। নৌকা চলিল গোয়ালন্দের দিকে।

তখন নদীতে কিছু কিছু কুয়াশা ছিল। সকলকে দাঁড় ধরিতে বলিয়া হোসেন নিজে হাল ধরিয়া বসিল। নৌকা চলিল দেবীগঞ্জের দিকে।

দেবীগঞ্জে হোসেন নামিয়া গেল।

মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৬৩

কলিকাতা হইতে বিড়ি চালান আসিয়াছে, নৌকায় বাজবাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে হইবে .

কলিকাতা হইতে বিড়ি চালান আসিয়াছে, নৌকায় আমিনবাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে হইবে..

মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৬৩

বিকালেব দিকে গণেশেব খোঁজে কপিলা আসিল, বলিল যুগল আসিয়াছে। কি খবব যুগলেব ? সাতদিন পরে তাহাব বিবাহ। চাব কুড়ি টাকা পণ দিয়া সোনাখালিব এক বৃপসী কন্যাকে ঘরে আনিতেছে।

বিকালের দিকে গণেশের খোঁজে উলুপী আসিল, বলিল যুগল আসিয়াছে। কী খবব যুগলেব ? সাতদিন পবে তাহার বিবাহ। চাব কুড়ি টাকা পণ দিয়া সোনাখালিব এক বৃপসি কন্যাকে সে ঘবে আনিতেছে।

মা বচনাসমগ্র-২ পৃ ৬৬

বেলা বাড়িতে লাগিল। কুবের সকলকে চাল-খাবাব বণ্টন কবিয়া দিল। বাড়ী হইতে বাহির হইবাব সময় মনটা খাবাপ হইয়াছিল, এখন মন্দ লাগিতেছে না কুবেরেব। নদীকে সে বড় ভালবাসে, নদীব বুকে ভাসিয়া চলাব মত সুখ আব নাই। একে একে কতগুলি লঞ্চ ও ষ্টিমাব দুদিক হইতে ঢেউ তুলিয়া আসিয়া চলিয়া গিয়াছে। ছোট ছোট নৌকাগুলি পিছন হইতে আসিয়া আগাইয়া যায়। সম্মুখেব বোঝাই নৌকাগুলি পড়ে পিছনে। কোথাও নদীব একটি ছাড়া তটবেখা নাই। কোথাও অপর তীবেব গাছপালা অস্পষ্ট চোখে পড়ে। কাক-চিলা পাখিগুলি ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। বকেবা এখন একক শিকাবী, সন্ধ্যায় ঝাঁক বাঁধিবে। ষ্টিমাব নৌকা ভাসমান কচুবিপানা, আকাশেব পাখী ও মেঘ সব ভাসিয়া চলিয়াছে—তীবেব দিকে চাহিয়া মনে হয় জলেব সীমায় মাটিব তীবভূমিও বুঝি লঘু গতিতে চলিয়াছে পিছনে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। কুবের সকলকে জলখাবাব বণ্টন কবিয়া দিল। বাড়ি হইতে বাহিব হইবার সময় মনটা খাবাপ হইয়াছিল, এখন মন্দ লাগিতেছে না কুবেরের। নদীকে সে বড়ো ভালোবাসে, নদীব বুকে ভাসিয়া চলাব মতো সুখ আর নাই। একে একে কতগুলি লঞ্চ ও স্টিমাব দুদিক হইতে ঢেউ তুলিয়া আসিয়া আগাইয়া যায়, সম্মুখেব বোঝাই নৌকাগুলি পড়ে পিছনে। কোথাও নদীব একটি ছাড়া তটরেখা নাই, কোথাও অপব তীবেব গাছপালা অস্পষ্ট চোখে পড়ে। কাউয়াচিলা পাখিগুলি ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। বকেবা এখন একক শিকাবি, সন্ধ্যায় ঝাঁক বাঁধিবে। স্টিমার, নৌকা, ভাসমান কচুরিপানা, আকাশের পাখি ও মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে,—তীরেব দিকে চাহিয়া মনে হয় জলের সীমায় মাটিব তীবভূমিও বুঝি লঘু গতিতে চলিয়াছে পিছনে।

মা বচনাসমগ্র-২ পৃ ৬৮

সকলে অভিভূত হইয়া শোনে। হোসেনেব মুখে ময়নাদ্বীপের কথা কুবের কখনও শোনে নাই, আজ হোসেন বলিতে থাকে ওই দ্বীপটিব জন্য কত দবদ তাহার। নীলামে দ্বীপটি কিনিবাব পর ওখানে জনপদ বসানোব স্বপ্ন দেখিতেছে সে, জীবনে আব তাহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই কামনা নাই,—হাজার দেড়েক মানুষ ওখানে চলাফেরা করিতেছে, এক বিঘা জমিও দ্বীপের কোনখানে অকর্ষিত নাই, মরিবার আগে এইটুকু শুধু সে দেখিয়া যাইতে চায়। কত অর্থ ও সময় সে দ্বীপেব পিছনে ব্যয় কবিয়াছে ! ময়নাদ্বীপের নেশা পাইয়া না বসিলে আজ সে বড়লোক—একসঙ্গে তাহাব এতগুলি লাভবান ব্যবসা দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে ভাবিতে বসিলে আল্লার করুণায় [-ব] পরিচয়ে মাথা নত হইয়া আসে। হ, ময়নাদ্বীপ ব্যাপিয়া

সকলে অভিভূত হইয়া শোনে। হোসেনেব মুখে ময়নাদ্বীপেব কথা কুবেব কখনও শোনে নাই, আজ হোসেন বলিতে থাকে ওই দ্বীপটির জন্য তাব কত দরদ। নিলামে দ্বীপটি কিনিবাব পব ওখানে জনপদ বসানোব স্বপ্ন দেখিতেছে সে, জীবনে আব তাব দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই, কামনা নাই,—হাজাব দেড়েক মানুষ ওখানে চলাফেবা করিতেছে, এক বিঘা জমিও দ্বীপেব কোনোখানে অকর্ষিত নাই, মরিবাব আগে এইটুকু শুধু সে দেখিয়া যাইতে চায়। কত অর্থ ও সময় সে ব্যয় কবিয়াছে দ্বীপেব পিছনে ! ময়নাদ্বীপেব নেশা না পাইয়া বসিলে আজ তো সে বড়োলোক—একসঙ্গে তাহাব এতগুলি লাভবান ব্যবসা দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে ভাবিতে বসিলে আল্লার করুণার পরিচয়ে মাথা নত হইয়া আসে। হ, ময়নাদ্বীপ ব্যাপিয়া

একদিন মানুষের জীবনের প্রবাহ বহিবে বলিয়া যে কাজে হোসেন হাত দেয় সেই কাজ খোদাতালা সফল করিয়া দেন। টাকা না থাকিলে সে পারিবে কেন এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করিতে ?

—কী কও রসুল, নিকা সারি কাইল ?

বসুল সায় দিয়া বলে, আমি কি কমু মিয়া, যা মন লয় করেন।

—বইন কি কয়, জিগাও।

রসুল ছইএর মধ্যে গিয়া খানিকক্ষণ পরামর্শ করিয়া আসে, বলে নছিবনের মত আছে।

আমিনুদ্দি স্তব্ধ হইয়া থাকে। কে জানে কী সে ভাবিতে থাকে বন্দরের আলোকমালার দিকে চাহিয়া। কুবের সবিস্ময়ে হোসেনের প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে। কি প্রতিভা লোকটার, কি মনের জোর ! যেখানে যত ভাঙ্গাচোরা মানুষ কুড়াইয়া জোড়া দিয়া নিজের দ্বীপে রাজ্য স্থাপন করিতেছে—প্রজাবৃদ্ধির ব্যবস্থার দিকে তাহার সজাগ দৃষ্টি ! হোসেনের উদ্দেশ্যই হয়ত তাই, আমিনুদ্দির মত জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হতাশ নিবুৎসাহ মানুষগুলিকে তাহার প্রয়োজন নাই, ওরা তাহার দ্বীপটি যে নবীন নরনারীতে ভরিয়া দিবে সে তাহাদেরই প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

একদিন মানুষের জীবনের প্রবাহ বহিবে বলিয়া যে কাজে হোসেন হাত দেয় সেই কাজ খোদাতালা সফল করিয়া দেন। টাকা না থাকিলে সে পারিবে কেন এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করিতে ?

কী কও রসুল নিকা সারি কাইল ?

রসুল সায় দিয়া বলে, আমি কী কমু মিয়া, যা মন লয় করেন।

হোসেন বলে, বইন কী কয় জিগাও।

রসুল ছই-এর মধ্যে গিয়া খানিক পরামর্শ করিয়া আসে। নছিবনের মত আছে। আমিনুদ্দি নিঃশব্দে বসিয়া থাকে। আপন মনে কী যেন সে ভাবিতে থাকে বন্দরের আলোকমালার দিকে চাহিয়া। কুবের সবিস্ময়ে হোসেনের প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গি লক্ষ করে। কী প্রতিভা লোকটার, কী মনের জোর ! যেখানে যত ভাঙাচোরা মানুষ পায় কুড়াইয়া নিয়া জোড়াতালি দিয়া নিজের দ্বীপে রাজ্যস্থাপন করিতেছে—প্রজাবৃদ্ধির ব্যবস্থার দিকে তাহার সজাগ দৃষ্টি ! হোসেনের উদ্দেশ্যই হয়তো তাই, আমিনুদ্দির মতো জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হতাশ ও নিরুৎসাহ মানুষগুলিকে আসলে তাহার প্রয়োজন নাই, ওরা তাহার দ্বীপটি যে নবীন নরনারীতে ভরিয়া দিবে, সে তাহাদেরই প্রতীক্ষা করিয়া আছে !

মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৭০

হোসেনের কাছে ফিরিয়া যাওয়ার কথা কেহ মুখে আনিতে পারে না। ফিরিয়া যে যায়, সে যায়, পলাইয়া, চুপিচুপি চোরের মত।

হোসেন তাদের ক্ষমা করে। দেখা হইলে বাসুর মতো হোসেন তাদের জঙ্গল সাফ করার মজুরি দেয়।

কদিন কুবের দ্বীপ দেখিয়া ও দ্বীপের মানুষগুলির সঙ্গে ভাব করিয়া কাটাইয়া দিল।

হোসেনের কাছে ফিরিয়া যাওয়ার কথা তাই কেহ মুখে আনিতে পারে না। ফিরিয়া যে যায়, সে যায় পলাইয়া চুপিচুপি, চোরের মতো।

হোসেন তাদের ক্ষমা করে। দেখা হইলে বাসুর মতো হোসেন তাদের জঙ্গল সাফ করার মজুরি দেয়। জোর-জবরদস্তি হোসেনের নাই, অন্যায় সে কারও প্রতি করে না। শুধু তাকেই হোসেন শাস্তি দেয়, ভীষণ ও মর্মান্তিক, যারা শত্রুতা করে হোসেনের, অকারণে ক্ষতি করিতে চায়, বিঘ্ন জন্মায় হোসেনের স্বপ্ন সফল হইবার পথে।

কদিন কুবের দ্বীপ দেখিয়া ও দ্বীপের মানুষগুলির সঙ্গে ভাব করিয়া কাটাইয়া দিল। .

মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৭৩

খবর শুনিয়া হোসেন হাই তুলিয়া বলিল, হ ? ঘুমাও গা কুবির। আর শোন মিয়া, কি দেখলা কি শুনলা আঁধার রাইতে মনে মনে থুইও, কইয়া কাম নাই।

বলিয়া হোসেন পাশ ফিরিয়া শুইল।

তিন সপ্তাহ পরে কুবের ও গণেশ গ্রামে ফিরিয়া আসিল।..

খবর শুনিয়া হোসেন হাই তুলিয়া বলিল, হ ? ঘুমাও গা কুবির। আর শোন বাই, কী দেখলা কী শুনলা আঁধার রাইতে মনে মনে থুইও, কইয়া কাম নাই।

বলিয়া হোসেন পাশ ফিরিয়া শুইল।

এতবড়ো একটা ব্যাপারকে অবহেলা করিয়া হোসেনের পাশ ফিরিয়া শোওয়া অবাক করিয়া দিল বটে কুবেরকে আজ, ব্যাপার সে বুঝিতে পারিল দ্বীপ ছাড়িয়া

ফিরিবার দিন। বুড়া বসির নৌকায় আসিয়া উঠিল, তাব ছেলেমানুষ বউ রহিয়া গেল দ্বীপে। ছেলেমেয়ে হয় নাই বসিবের—একটিও নয়। পাঁচ বছরে যে একটিও মানুষ বাড়াইতে পাবিল না দ্বীপের, কয়েক বছবের মধ্যে সে প্রবেশ করিবে কবরে, তাকে দিয়া আর কী প্রয়োজন আছে হোসেনেব ? বসিব এবাব তালাক দিবে তার বউকে। তারপর যথাসময়ে এনায়েতেব সঙ্গে নিকা হইবে বউটির। একটি বউ আছে এনায়েতের, শীঘ্রই সে হোসেনকে উপহাব দিবে একটি আনকোবা নতুন মানুষ—ময়নাদ্বীপেব একটুকরা ভবিষ্যৎ। তবুও, আবও একটি বউ হোক এনায়েতেব, সার্থক হোক দুজনেব অন্যায় অসামাজিক প্রেম, পাঁচ বছব যে রমণী জননী হইতে পায় নাই তাব কোল জুড়িয়া আসুক সন্তান, মানুষ বাড়ুক হোসেনেব সাম্রাজ্যে।

গ্রাম ছাড়িবার তিন সপ্তাহ পরে কুবের ও গণেশ গ্রামে ফিরিয়া আসিল।.

মা বচনাসমগ্র-২ পৃ ৭৪

বাড়ী বাডী ঘুরিয়া সময কাটায কুবেব, যোয়ান মানুষগুলি জীবিকা অর্জনেব জন্য বাহির হইয়া যায়, গ্রামে থাকে শুধু বুডা ও শিশু ও নাবীর দল, কুবের শুধু পাকা মুখেব আপশোস শোনে আব নরম গলাব কলহ শুনিতে পায়।

আলস্যে সময কাটায কুবেব, গ্রামের জোযান মানুষগুলি জীবিকা অর্জনেব জন্য বাহির হইযা যায়, গ্রামে থাকে শুধু বুডা, শিশু ও নাবীব দল, কুবেব শুধু শুনিতে পায় পাকা মুখেব আপশোশ আব নরম গলাব কলহ।

মা বচনাসমগ্র ২ পৃ ৭৬

বুকেব ভিতবে টাটায় কুবেরের। এই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী (sic) তাহাব ভাঙা ঘরে শাকান্ন খাইযা কটা দিন কাটাইয়া আসিযাছিল বলিয়া আজও সে আকাশকুসুম বচনা করে, ভাবে আজও লক্ষ্মীর মন পডিয়া বহিযাছে কেতুপুরে তাহাব সেই নোংরা নীড়টিতে।

কপিলা জিজ্ঞাসা করে, খবব কি মাঝি ? কি মনে কইরা আইলা ? ভালা নি আছে পোলাপানরা ?

ডুবে সাড়ী পবিযাছে কপিলা, চুলের তেলে কপাল তাহার ভিজিয়া গিয়াছে। দেহ যেন উথলিয়া উঠিয়াছে কপিলাব, বর্ষাব পদ্মার মত। কি ভীষণ সুখী মনে হইতেছে কপিলাকে ! নিজের মলিন কাপড় ও চাদরটির লজ্জায কুবেরেব ছুটিয়া পালাইতে ইচ্ছা হয়।

ছেলেকে কুবেরের কোলে দিয়া কপিলা আবার রাঁধিতে যায়। খানিক আলাপ করিয়া কপিলার শাশুড়ীও প্রস্থান করে। বাড়ির দু'একটি ছেলেমেয়ে শুধু ঘোরাফেরা করে কুবেরের কাছে, তারপর তাবাও চা৷ ' যায়। কুবেব একা বসিয়া থাকে। তার কোলে কপিলার ছেলে ঘুমাইয়া পড়ে।

কপিলা আসিয়া ছেলেকে নিয়া বলে, থাকবা নাকি মাঝি ?

.. বুকেব ভিতবে টাটায কুবেবেব। এই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী গিয়া তাহার ভাঙা ঘবে শাকান্ন খাইয়া কটা দিন কাটাইয়া আসিযাছিল বলিয়া আজও সে আকাশকুসুম বচনা করে, ভাবে আজও লক্ষ্মীর মন পডিযা রহিযাছে কেতুপুবে তাহার সেই নোংবা নীডটিতে। কী বোকাই কুবেব ছিল ।

কপিলা জিজ্ঞাসা করে, খবব কী মাঝি ? কী মনে কইরা আইলা ? ভালা নি আছে পোলাপানবা ?

ডুরে শাড়ি পরিয়াছে কপিলা, চুলের তেলে কপাল তাহার ভিজিযা গিযাছে। দেহ যেন উথলিয়া উঠিয়াছে কপিলাব, বর্ষাব পদ্মাব মতো কী ভীষণ খুশি মনে হইতেছে কপিলাকে ! নিজেব মলিন কাপড় ও চাদবটির লজ্জায কুবেরের ছুটিয়া পলাইতে ইচ্ছা হইতে থাকে।

কয়েক মিনিট সাধাবণ কথাবার্তা বলিয়া কপিলা আবার রাঁধিতে যায়। আবও খানিকক্ষণ আলাপ করিযা কপিলার শাশুড়িও প্রস্থান কবে। বাড়িব দু-একটি ছেলেমেয়ে শুধু ঘোরাফেরা করে কুবেরেব কাছে, তারপব তাবাও চলিয়া যায়। কুবের বসিয়া থাকে একা। বোকা, নোংরা, অপদার্থ কুবেব। ময়নাদ্বীপে এনায়েত ও বসিবেব কথা কুবেরের মনে পড়ে—জোৎস্নালোকে হোসেনেব কুটিরের দাওয়ায় বন্দী এনাযেতের ভাত খাওয়া ; যার

কুবের বলে, না,

দুইদিন থাইকা যাও ? আইছ ক্যান কও দেহি ?

সুবচনীব হাটে যামু মন কইরা বাইরাইছি কপিলা। তা ভাবলাম তরে দেইখা যাই।

কপিলা মুচকি হাসিয়া বলে, সুবচনীর হাট নাকি আইজ ?

কুবেব বিবর্ণ হইয়া বলে, না ?

হাটে গিয়া ঘুমাইয়া থাক গা মাঝি, কাইল হাট কইরা বাড়ীত যাইও,—বলিয়া কপিলা ঘবে ঢুকিয়া যায়। কুবের উঠিয়া নামিয়া যায় উঠানে। লাউমাচার কাছে গিয়া সে দাঁড়ায়। লজ্জায় মুখখানাতে তাহার মাচার উপরকার উপুর-করা কালো হাঁড়িটার ছায়া পড়ে যেন। কপিলার সঙ্গে সে কেন পারিয়া উঠিবে। পদ্মানদীর বোকা মাঝি সে, এক হাটে কিনিয়া কপিলা তাহাকে আরেক হাটে বেচিয়া দিয়াছে।

জন্য দ্বীপের অধিবাসীদের কাছে কবার সে মার খাইয়াছে, তারই আনিয়া দেওয়া ভাত ! হোসেনের কল্যাণে কদিন পরে মিলনও তাদের হইবে—প্রকাশ্য সামাজিক, আইনসংগত মিলন। কী আশ্চর্য ভাগ্য লইয়াই এক-একটা লোক জন্মায় জগতে ! বসিয়া থাকিতে থাকিতে পথ চলাব শ্রান্তিতে ঢুল আসে কুবেরের। আধজাগা আধ-ঘুমানো অবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিতে থাক, রচনা করিয়া চলে আকাশকুসুম। সর্বশক্তিমান হোসেনকে সে যেন বলিয়াছে কপিলাকে পাইলে সপরিবারে সে ময়নাদ্বীপে গিয়া বাস কবিবে—গণেশকেও বলিয়া সে রাজি করিবে যাইতে। হোসেন তাহাব চিরন্তন হাসি হাসিয়া যেন বলিয়াছে, তাই করুম কুবির বাই, তাই করুম—আইনা দিমু কপিলারে। তাবপর যেন একদিন—কপিলা আসিয়া বলে, থাকবা নাকি মাঝি ?

কুবেব বলে, না।

দুইদিন থাইকা যাও ? আইছ ক্যান কও দেহি ?

সুবচনীর হাটে যামু মন কইরা বাইবইছি কপিলা। তা ভাবলাম তরে দেইখা যাই।

কপিলা মুচকি হাসিয়া বলে, সুবচনীর হাট নাকি আইজ ?

কুবেব বিবর্ণ হইয়া বলে, না ?

হাটে গিযা ঘুমাইয়া থাক গা মাঝি, কাইল হাট কইবা বাড়িত যাইও, বলিয়া কপিলা বান্নাঘরে চলিয়া যায়। কুবের উঠিয়া নামিয়া যায় উঠানে। লাউমাচাব কাছে গিযা সে দাঁড়ায়। লজ্জায় মুখখানাতে তাহাব মাচার উপবকাব উপুড়করা হাঁড়িটাব ছায়া পডে যেন। কপিলাব সঙ্গে সে কেন পারিয়া উঠিবে ? পদ্মানদীব বোকা মাঝি সে ; এক হাটে কিনিয়া কপিলা তাহাকে আরেক হাটে বেচিয়া দিয়াছে। অনেকদিন আগে।

মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৭৭

কয়েকদিন পরে হোসেন ফিরিয়া আসিলে কুবেবের অলস দিনগুলি শেষ হয়। রকমারি ব্যবসা হোসেনের, ধান, পাট, বিড়ির পাতা, তামাক, গুড়, চিনি, মশলাপাতি এক একবার এক একরকম বোঝাই নিয়া কুবের বন্দর হইতে বন্দরে যাতায়াত করে। গোয়ালন্দের অপর তীবে একবার সাতশ ছাগল আসিয়া হাজির, সারাদিন ধরিয়া কুবেব তাহাদের নদী পার করিল। ছাগলেব গন্ধে বাব বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল কপিলাব বাড়ীতে এক কষ্টকর রাত্রিযাপনের কথা।

কয়েকদিন পরে হোসেন মিয়া ফিরিয়া আসিলে কুবেবের অলস দিনগুলি শেষ হয়। রকমারি ব্যাবসা হোসেনের, ধান পাট বিড়ির পাতা তামাক গুড় চিনি মশলাপাতি এক একবার এক একরকম বোঝাই নিয়া কুবের বন্দর হইতে বন্দরে যাতায়াত করে। গোয়ালন্দের অপর তীরে একবার সাতশো ছাগল আসিয়া হাজির, সারাদিন ধরিয়া কুবের তাহাদের নদী পার কবিল। ছাগলের গন্ধে বারবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল কপিলার বাড়িতে এক কষ্টকর রাত্রিযাপনের কথা। পরের বাড়িতে পরের শাসনে নিরুপায় নির্বাক বউ কপিলা যেখানে তাকে পাট-জমানো পাঁঠা-বাঁধা ভাঙা ঘরখানায় শুইতে দিয়াছিল।

মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৮০

মনে মনে কুবের কলহ করে হোসেনের সঙ্গে। হোসেনেব অন্যায়টা বুঝাইয়া দিতে সে ভাবি অনুতপ্ত হয়, তাড়াতাড়ি কোমরের কালো বেল্ট হইতে একতাড়া নোট নিয়া সে কুবেরকে দেয়। চারভিটায় চারখানা বড় বড় ঘর তোলে কুবেব, গোয়াল করে, ধানের মরাই করে, ঝাঁকার উপর লাউলতা তুলিয়া দেয় তারপর একদিন কপিলাকে নিমন্ত্রণ কবে। কপিলার পা দুটি জড়াইয়া ধরিযা বলে যে তাকে ছাড়িয়া থাকিতে বুক ফাটিয়া গিয়াছে কুবেবেব—ও কপিলা, আমাবে ফেইলা আব যাইস না, যাইস না—আমি নি মইবা গেলাম কপিলা ?

মনে মনে কুবের কলহ করে হোসেনের সঙ্গে। কল্পনায় সে বারবাব এই ঘটনাগুলি ঘটাইয়া যায় : হোসেনের অন্যায়টা বুঝাইয়া দিতে সে ভাবী অনুতপ্ত হয়, তাড়াতাড়ি কোমরের কালো বেল্ট হইতে একতাড়া নোট নিয়া সে কুবেরকে দেয়। চারভিটায় চারখানি বড়ো বড়ো ঘর তোলে কুবের, গোয়াল করে, ধানেব মরাই কবে, ঝাঁকার উপর লাউলতা তুলিযা দেয। তাবপর একদিন কপিলাকে নিমন্ত্রণ কবে। কপিলার পা দুটি জড়াইয়া ধবিয়া বলে যে তাকে ছাড়িয়া থাকিতে বুক ফাটিয়া গিয়াছে কুবেরের—ও কপিলা, আমাবে ফেইলা আব যাইস না—আমি নি মইরা গেলাম কপিলা তরে না দেইখা ?

মা বচনাসমগ্র-২ পৃ ৮১

এ কথা জানিতে কুবেবের বাকী নাই যে বিবাহের পর দম্পতিকে হোসেন ময়নাদ্বীপে নিযা যাইবে, কিন্তু জানিযা কি লাভ ? হোসেন মিয়ার অবাধ্য কুবের কেমন কবিযা যাইবে ? তাছাড়া পাঁচ কুড়ি টাকার মায়া ত্যাগ করিবার সাধ্য হোসেনের [?] নাই। বিবাহ দিলে মেয়ে পরেব ঘবে যায। গোপি না হয় যাইবে। মাঝে মাঝে হয়ত কখনো একটু মন কেমন করিবে কুবেরেব, কিন্তু তার প্রতিকাব কি ? মন তো অনেক কারণেই কেমন করে মানুষেব।

এ কথা জানিতে কুবেবেব বাকি নাই যে বিবাহেব পব নবদম্পতিকে হোসেন ময়নাদ্বীপে লইয়া যাইবে, কিন্তু জানিয়া কী লাভ ? হোসেন মিয়াব অবাধ্য কুবেব কেমন কবিযা হইবে ? তাছাড়া পাঁচকুড়ি টাকাব মায়া ত্যাগ কবিবার সাধ্য কুবেবেব নাই। বিবাহ দিলে মেয়ে পরেব ঘবে যায, কাছে অথবা দূবে। গোপি না হয় যাইবে দূবে—অনেক দূবেব ময়নাদ্বীপে। হয়তো কখনও একটু মন কেমন কবিবে কুবেবের, কিন্তু তাব প্রতিকাব কী ? মন তো অনেক কাবণেই কেমন কবে মানুষেব।

খবর শুনিয়া রাসু গালাগালি করিযা গিয়াছে। বলিয়াছে, কথা দিয়া কথা রাখিল না কুবের, কুবেবেব সে সর্বনাশ কবিযা ছাড়িবে। যুগীকে গিয়া রাসু বুঝি ধরিয়াছে তারপর, একদিন শীতল আসিয়া রাসুর স্বপক্ষে খানিকক্ষণ ওকালতি কবিয়া গিয়াছে কুবেরের কাছে। বলিযাছে, টাকাই যদি বেশী চায কুবের সে তা বলে না কেন ? সোনাখালিব পাত্র যত টাকা দিতে চায় তাই দিবে রাসু। গ্রামে রাসুর মতো পাত্র থাকিতে দূব দেশে মেয়েকে কুবের পাঠাইবে কেন ?

কুবের তাব কি জানে ? তাকে এসব বলা মিছে।

খবর শুনিয়া বাসু গালাগালি কবিযা গিযাছে। বলিয়াছে, কথা দিযা কথা বাখিল না কুবেব, কুবেবেব সে সর্বনাশ করিয়া ছাড়িবে। যুগীকে গিযা বাসু বুঝি ধবিযাছে, তাবপর একদিন শীতল আসিযা বাসুব সপক্ষে খানিকক্ষণ ওকালতি কবিয়া গিয়াছে কুবেবেব কাছে। বলিয়াছে, টাকা যদি বেশি চায় কুবেব, তা সে বলে না কেন ? সোনাখালিব পাত্র যত টাকা দিতে চায় তাই দিবে রাসু। গ্রামে রাসুব মতো পাত্র থাকিতে দূব দেশে মেয়েকে কুবেব পাঠাইবে কেন ?

কেন ? এ কেনব জবাব দিবাব ক্ষমতা নাই কুবেরেব ! ময়নাদ্বীপে গিয়া গোপিকে বাস করিতে হইবে ভাবিলে জালে আবদ্ধ ইলিশ মাছেব মতো মাঝে মাঝে তারও মনটা কি ছটফট কবে না ? তবু তাকে এ সব বলা মিছে।

মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৮৭

মালার উপর রাগের সীমা থাকে না কুবেরের। চরডাঙ্গা যাওয়ার আর তো কোন ছুতা তাহার নাই ! জামাই অকারণে শ্বশুরবাড়ী গেলে দোষ অবশ্য কিছুই হয় না, কিন্তু এখন কপিলা ওখানে আছে। হঠাৎ কুবেরের আবির্ভাব ঘটিলে কে জানে কে কি ভাবিয়া বসিবে। বসিয়া বসিয়া

মালার উপর রাগের সীমা থাকে না কুবেবের। ..

[*এই অংশের পর থেকে* 'দোলের উৎসব কাল, লখা ও চণ্ডী আবির কিনিয়া আনিযা আজই অঙ্গনে খানিক ছড়াইয়াছে'—*এই পর্যন্ত গ্রন্থে যথাযথ আছে। তার পরবর্তী গ্রন্থভুক্ত অনেকখানি পাঠ পাণ্ডুলিপিতে পরে লিখে*

কুবের উপায় চিন্তা করে আব ক্রুদ্ধ চোখে মালার দিকে থাকিয়া থাকিয়া তাকায়। হ, আজ বসন্তের আদর্শ আবহাওয়া আসিয়াছে কেতুপুবে, দোলের উৎসব হইবে কাল, লখা ও চণ্ডী আবির কিনিয়া আনিয়া আজই অঙ্গনে খানিক ছড়াইয়াছে।

হঠাৎ কুবের বলে, চবডাঙ্গা যাবি লখা ?

—যামু বাবা যামু।

—কাইল বিয়ানে মেলা দিমু, আঁই ?

যুক্ত করা হয়েছে। সেই সংযোজিত পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত অংশ প্রায় অপরিবর্তিত। তাব প্রাবম্ভ বাক্য নিম্নরূপ :]

বিকালে পদ্মার ঘাটে নৌকা তদবির করিতে গিয়া কুবেবের আরও মন কেমন করিতে থাকে। কাব্যের মসৃণ মার্জিত মন-কেমন-কবা নয়, তার ভীবু প্রকৃতির সঙ্গে যতখানি খাপ খায় ততখানি দুরন্ত মানসিক অস্থিরতা।.

[*পরবর্তী সংযোজিত অংশের শেষ বাক্য*]

পদ্মায় স্নান কবিয়া কুবের বাড়ি ফিবিল। ভাত খাইতে বসিয়া হঠাৎ কুবের বলে চবডাঙ্গা যাবি লখা ?

যামু বাবা যামু।

কাইল বিয়ানে মেলা দিমু, আঁই ?

হ এ ফন্দি মন্দ নয়। দোলেব উৎসবে মামাবাড়ী যাইবে ছেলেরা, একা তো যাইতে পারিবে না, কুবের তাই সঙ্গে যাইবে। কপিলা টেরও পাইবে না কিসে কুবেবকে টানিয়া আনিয়াছে চবডাঙ্গাতে।

হ এ ফন্দি মন্দ নয়। দোলেব উৎসবে মামাবাড়ি যাইবে ছেলেরা। একা তো যাইতে পারিবে না তাবা, কুবেব তাই সঙ্গে যাইবে। কেহ টেরও পাইবে না কীসে কুবেবকে টানিয়া আনিযাছে চবডাঙ্গাতে।

মা বচনাসমগ্র-২ পৃ ৮৮

বাত্রি থাকিতে উঠিয়া লখা ও চণ্ডীকে টানিয়া তুলিযা কুবেব রওনা হইযা গেল। সকাল সকাল তাহারা পৌছিল চবডাঙ্গায়।

বাত্রি থাকিতে উঠিয়া লখা ও চণ্ডীকে টানিযা তুলিয়া কুবেব বওনা হইযা গেল। মাথা-কপাল কুটিয়া যাওয়াব জন্য কাঁদিতে লাগিল মালা, কুবেব ফিরিযাও তাকাইল না। সকাল সকাল তাহারা পৌছিল চরডাঙ্গায়।

মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৯১

রঙ ও কাদা নিয়া গ্রামে দোলেব উৎসব চলিয়াছে, রঙের চেয়ে কাদার পরিমাণটাই এ পাড়ায় বেশী। চাষাভূষা জেলেমাঝিব পাড়া এটা, এখানে রঙেব বড় অনটন। অনেক বেলায় কাদামাখা মূর্তিসমূহেব একটা শোভাযাত্রা পাড়া হইতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইল। গাধার মতো ক্ষুদ্রকায় একটা ঘোড়ার উপরে বিচিত্র সাজে দোলেব রাজা, গলায় তাহার ছেঁড়া জুতোব মালা, গায়ে গোটা দশেক ছিন্নভিন্ন জামা, চারিদিকে লড়বড় কবিয়া ঝুলিতেছে। সামনে দিয়া যাওয়ার সময় শোভাযাত্রাব লোকেরা কুবের বৈকুণ্ঠ ও অধরকে কাদা মাখাইয়া দিয়া গেল, অধব ভিড়িয়া গেল দলে।...

রং ও কাদা নিয়া গ্রামে দোলেব উৎসব চলিযাছে, রঙেব চেযে কাদাব পবিমাণটাই এ পাড়ায় বেশি। চাষাভূষা জেলে-মাঝিব পাড়া এটা, এখানে বঙের বড়ো অনটন। অনেক বেলায কাদামাখা মূর্তিসমূহেব একটা শোভাযাত্রা পাড়া হইতে গ্রাম প্রদক্ষিণ কবিতে বাহিব হইল। গাধার মতো ক্ষুদ্রকায় একটা ঘোড়াব উপবে বিচিত্র সাজে দোলেব রাজা অতিকষ্টে বসিয়া আছে, গলায় তাহার ছেঁড়া জুতোব মালা, গায়ে গোটা দশেক ছিন্নভিন্ন জামা, চাবিদিকে লডবড কবিয়া ঝুলিতেছে অনেকগুলি ছেঁড়া ন্যাকড়া। সামনে দিয়া যাওয়ার সময় শোভাযাত্রার লোকেরা কুবের, বৈকুণ্ঠ ও অধরকে কাদা মাখাইযা দিয়া গেল, অধব ভিড়িয়া গেল দলে।...

মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৯১

হ, ভীত চোখে চারিদিকে চাহিয়া কলসীর মতই আলগোছে কপিলা ভাসিয়া থাকে, শঙ্কিত কমলের মত স্তন দুটি ভাসে আর ডোবে। হাসিবার ভান কবিয়া কপিলা বলে, কথা যে কও না মাঝি ?

হ, ভীত চোখে চারিদিকে চাহিয়া কলসির মতোই আলগোছে কপিলা ভাসিয়া থাকে, তেমনি ত্রাসের ভঙ্গিতে স্তন দুটি ভাসে আর ডোবে। চোখের পলকে বুকে কাপড় টানিয়া হাসিবার ভান করিয়া কপিলা বলে, কথা যে কও না মাঝি ?

কুবের বলে, তর লাইগা দিবাবাত্র পরানডা পোড়ায় কপিলা।
—ক্যান মাঝি ক্যান ? আমারে ভাব ক্যান ? সোযামীব ঘবে না গেছি আমি ? আমারে ভুইলো মাঝি—পুরুষের পবান পোড়ে কয়দিন ? গাঙের জলে নাও ভাসাইয়া দূরদ্যাশে যাইও মাঝি, ভুইলো আমারে।
সাঁতার দিয়া কপিলা কলসী ধরিয়া আনে। কাপড় ঠিক করিয়া ভরা কলসী কাঁখে পিছল ঢালু পাড বাহিয়া উপরে উঠিয়া যায়। হ, ফিরিয়া তাকায় একবার কপিলা। ভবা কলসীর জল খানিকটা উছলাইয়া পড়ে।

কুবের বলে, তর লাইগা দিবারাত্র পবানডা পোড়ায় কপিলা।
কপিলা চোখ বুজিয়া বলে, ক্যান, মাঝি ক্যান ? আমারে ভাব ক্যান ? সোয়ামিব ঘবে না গেছি আমি ? আমারে ভুইলো মাঝি—পুবুষেব পবান পোড়ে কযদিন ? গাঙের জলে নাও ভাসাইয়া দূব দ্যাশে যাইয়ো মাঝি, ভুইলো আমারে। ছাড, মানুষ আহে।
সাঁতাব দিয়া কপিলা কলসি ধরিযা আনে। কাপড় ঠিক কবিয়া ভবা কলসি কাঁখে তুলিয়া পিছল ঢালু পাড় বাহিয়া উপরে উঠিয়া যায়। হ, ফিবিয়া একবাব তাকায় কপিলা। ভরা কলসিব জল খানিকটা উছলাইয়া পডে।

খাইয়া উঠিযা কুবেব বলে, লখা, চণ্ডী, ল মেলা কবি। দিনে দিনে গাঁয়ে ফিবুম।

দুপুবে খাইয়া উঠিয়া কুবের বলে, লখা, চণ্ডী, ল মেলা কবি। দিনে দিনে গাঁয়ে ফিবুম।

মালা বিস্মিত হইয়া বলিল, আইজ ফিবা আইলা যে ?
—মাইনষে থাকে তব বাপেব বাড়ী ?

মালা বিস্মিত হইযা বলিল, আজ ফিবা আইলা যে ?
মা বচনাসমগ্র-২ পৃ ৯২

পদ্মাব ঠাণ্ডা বাতাসে জুড়াইয়া জুড়াইয়া কি যে মধুর হইযা উঠিবে কুবেবেব ব্যবহাব। কাল হয়ত আবাব সে কাঁদাইবে …লাকে মেজোবাবুব কথা তুলিয়া

পদ্মাব ঠাণ্ডা বাতাসে জুড়াইযা জুড়াইযা কী যে মধুব হইযা উঠিবে কুবেবেব ব্যবহাব ! কাল হযতো আবার সে কাঁদাইবে মালাকে মেজোবাবুব কথা তুলিয়া। এমনি প্রকৃতি পদ্মানদীব মাঝিব, ভদ্রলোকেব মতো একটানা সংকীর্ণতা নয, বিবাট বিস্তাবিত সংমিশ্রণ।
মা বচনাসমগ্র-২ পৃ ৯১

কুবেব খুসী হইয়া বলিতে লাগিল আইছস কপিলা আইছস ? কুবের যেন ভুলিয়া গিয়াছে চবডাঙ্গায পুকুবেব জলে কি কথা তাহার হইযাছিল কপিলার সঙ্গে। কিন্তু কপিলা সব মনে পড়াইয়া দেয। সবিয়া সবিয়া পলাইযা বেড়ায় কপিলা, ঢেঁকি ঘবের ভিতবে দাঁড়াইয়া কুবেব ইসাবা করিয়া কাছে ডাকিলে মুখ ঘুরাইয়া থাকে। এ তো ছলনা নয, খেলা নয় কপিলাব। কি যেন ভাবিয়া আসিয়াছে কপিলা এবাব, বড় সে গম্ভীব। একটু হাসি, দুটি কথাব কাঙ্গাল কুবের, কপিলাব হাসি কই, কথা কই কপিলাব মুখে ?

কুবেব খুশি হইযা বলিতে লাগিল, আইছস কপিলা, আইছস ? কুবেব যে ভুলিয়া গিযাছে চরডাঙ্গাব পুকুবেব জলে কী কথা তাহার হইযাছিল কপিলাব সঙ্গে কিন্তু কপিলা সব মনে পড়াইযা দেয। সরিয়া সরিয়া পালাইযা বেড়ায কপিলা, ঢেঁকি ঘবেব ভিতবে দাঁড়াইযা কুবেব ইশারা করিয়া কাছে ডাকিলে মুখ ঘুরাইযা থাকে। এ তো ছলনা নয, খেলা নয় কপিলার। কী যেন ভাবিযা আসিয়াছে কপিলা এবাব, বডো সে গম্ভীব। একটু হাসি, দুটি কথার কাঙাল কুবেব, কপিলাব হাসি কই, কথা কই কপিলার মুখে ?

বিবাহ হইয়া গেল গোপির। বরকনেকে কুবেব পদ্মায় নৌকায় তুলিয়া দিল। গোপি আবার ফিরিয়া আসিবে। হোসেন মিয়ার তাড়াতাড়ি নাই। বঙ্কু ও গোপি দু'মাস ছ'মাস দেশে থাক, তাতে সে আপত্তি করিবে না।

হলুদ মাখিতে মাখিতে হলদে হইযা বিবাহ হইয়া গেল গোপির। বব-কনেকে কুবের পদ্মায নৌকায তুলিয়া দিল। গোপি আবাব ফিরিয়া আসিবে। হোসেন মিয়াব তাড়াতাড়ি নাই। বঙ্কু ও গোপি দুমাস দেশে থাক, তাতে সে আপত্তি করিবে না।

বিবাহের পরই কপিলার যাওয়ার কথা ছিল, কি ভাবিয়া সে রহিয়া গেল। কদিন পরে শ্যামাদাস আসিয়া তাকে চরডাঙ্গা নিয়া যাইবে। দিন দুই পরে কুবেরকে হোসেন মিয়ার একটা চালান আনিতে যাইতে হইল। মাইল দশেক উজানে একটা গ্রামের ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া সে পাট বোঝাই

বিবাহের পরই কপিলার ফিবিয়া যাওয়ার কথা ছিল, কী ভাবিয়া সে রহিয়া গেল। কদিন পরে শ্যামাদাস আসিয়া ইহাকে আকুরটাকুর লইয়া যাইবে। দিন দুই পবে কুবেরকে হোসেন মিয়ার একটা চালান আনিতে যাইতে হইল। মাইল দশেক উজানে একটা গ্রামের ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া সে পাট

করিল নৌকায়। গোয়ালন্দ (sic) ফিবিয়া আসিল অনেক রাত্রে।	বোঝাই করিল নৌকায়। তারপরে দেবীগঞ্জ ফিরিয়া আসিল অনেক রাত্রে। মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৯৪
কুবেরের মুখে কথা সরিল না। অনেকক্ষণ পরে সে বলিল, রাসুর কাম। —কি করবা মাঝি ?	কুবেরের মুখে কথা সরিল না। অনেকক্ষণ পবে সে বলিল, রাসুব কাম। সব্বোনাশ করব কইছিল না রাসু—রাসুর কাম। কী করবা মাঝি ? মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ৯৭
কুবের বলে, হোসেন মিয়া দ্বীপি আমারে নিবই কপিলা। জেল খাইটা পাব পামু না। কপিলা আর কথা বলে না।	কুবের বলে, হোসেন মিয়া দ্বীপি আমারে নিবই কপিলা। একবাব জেল খাটিয়া পাব পামু না। ফিরা আবার জেল খাটাইব। কপিলা আব কথা বলে না। মা বচনাসমগ্র-২ পৃ ৯৭

পদ্মানদীর মাঝি পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

জীবনের জটিলতা

বাংলা আকাদেমি অভিলেখাগারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার-কর্তৃক প্রদত্ত আলোচ্য উপন্যাসের একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি আছে। এই খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি-দৃষ্টে মনে হয়, প্রকাশের উদ্দেশ্যে উপন্যাসটির প্রভূত সংস্কার ও পুনর্লিখন হয়েছিল। ফলে উপন্যাসের কাহিনিভাগের আনুপূর্বিক পরিবর্তন ব্যতীত চরিত্রনাম বা অধ্যায়বিন্যাসও অনেকখানি বদলানো হয়েছে। মুদ্রিত গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদের শেষাংশ থেকে খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির কাহিনিসূত্র অনুসরণ করা যায়। জীবনের জটিলতা-তে শান্তা বিবাহিতা, কিন্তু খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির (পৃ ১৭৮) একস্থানে 'তাহার কুমারী-বেশের কাতর আবেদন'...এইরূপ মন্তব্য আছে। পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠায় (পৃ ১৮১) প্রমীলার মুখে নগেন-কর্তৃক শাড়ি দেওয়ার উল্লেখ আছে, উপন্যাসে এরূপ নেই। পাণ্ডুলিপির খণ্ডিত অংশে (পৃ ১৮৩-৮৫) শান্তার স্বামীর গোলোক নাম পাওয়া যায়, উপন্যাস অনুযায়ী অবশ্য নাম অধর। পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী, বিমলের ভগ্নী প্রমীলার সঙ্গে গোলোকের ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের প্রয়াসের বিবরণ আছে, উপন্যাসে তা নেই। শান্তার মৃত্যুতে বিমলের প্রতিক্রিয়া ও প্রমীলার মনোভাব উপন্যাসের তুলনায় বিস্তৃততর। যথা, বিমলের উদ্দেশ্যে, প্রমীলার উক্তি :

> 'মবুর পাখিকে তোমাব সবুজ সম্পদটুকু দেখিয়ে তুমি ভোলালে—তেষ্টায় যে মরে যাচ্ছে তাকে দেখালে জলের ছবি। ছলনা বুঝবার আগে যে পাখি মরে গেল তাই বক্ষে—নইলে সারাজীবন পাখা ঝাপটে ছটফট করে তোমায় পাগল করে সে নিজেই বুঝিয়ে দিত ও অপরাধ কত বড় ! কি নিষ্ঠুর তুমি দাদা, কি অবিবেচক তুমি।'
>
> বিমল অপ্রসন্ন মনে ভাবিল, 'This is not misunderstanding She has got hold of some theory to prove my guilt'
>
> 'সান্ত্বনা দিতে দিতে সুর বদলালি যে মিলি ?'
>
> 'কি করব দাদা, তোমাব বিরুদ্ধে নালিশ আমার এত বেশি—চাপতে চেয়েও চাপতে পারি না তুমিও কি বোঝ না যে খাঁচা ভাঙবাব ক্ষমতা না থাকলে ঘেরাটোপ তুলে খাঁচাব পাখিকে আকাশ দেখানো কি মহাপাপ ?'
>
> (পাণ্ডুলিপি পৃ ১৯৪)

মুদ্রিত গ্রন্থে আছে :

> কিন্তু প্রমীলা ছাড়িল না। বিকালে বিমল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে বলিল, শান্তা ক্ষমা করে গেছে বলাতে তখন চটলে যে ? ক্ষমা বললে অপরাধের কথা এসে পড়ে এইজন্য ? তুমি বলতে চাও তোমার কোনও অপরাধ ছিল না ? নিজেকে ভুলিও না দাদা। খাঁচা ভাঙবার ক্ষমতা নেই কিন্তু ঘেরাটোপ তুলে তুমি খাঁচার পাখিকে আকাশ দেখিয়েছিলে।
>
> সেটা পাখিব সৌভাগ্য।
>
> কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা কোর না দাদা, কেঁদে ফেলব। মরুব পাখিকে তোমার সবুজ সম্পদটুকু দেখিয়ে ভোলাবাব অধিকার কেউ তোমাকে দেয়নি। তুমি অন্যায় করেছিলে।

শান্তার মৃত্যুর পর প্রমীলা কর্তৃক রক্ষিত শান্তার চুলের জট ও বিমলের সংরক্ষিত শান্তার রক্তমাখা ব্যান্ডেজ প্রসঙ্গ পাণ্ডুলিপির তুলনায় উপন্যাসে সংক্ষিপ্ততর। পাণ্ডুলিপির তুলনায় উপন্যাসের অধ্যায়-নির্দেশে গরমিল থাকলেও এই অংশটি পাণ্ডুলিপি ও উপন্যাস উভয়ত্রই দশম অধ্যায়ভুক্ত। পাণ্ডুলিপিতে এই একই অধ্যায়ে কেদার নামে এক পত্রিকা-প্রতিনিধি বিমলের কাছে লেখা চাইতে এসেছে। কিন্তু বিমলের দেওয়া কবিতা পাঠ করে কেদার খাতাটা বিমলের গায়ে ছুঁড়ে ফেলে বলেছে, 'তুই গোল্লায় যা।' পাণ্ডুলিপিতে এই অংশে শান্তার চুলের জট ব্যান্ডেজ প্রসঙ্গের পরবর্তী। উপন্যাসে আগেই তা বর্ণিত। উপন্যাসে প্রমীলার অনুরোধে বিমলের গল্প-লেখা ও কেদারের সানন্দে তা গ্রহণ করার প্রসঙ্গ পাণ্ডুলিপিতে নেই। পাণ্ডুলিপিতে এগারো অধ্যায়ে

ঝড়-বৃষ্টির প্রসঙ্গ আছে। বিমল সে ঝড়-বৃষ্টির সময় ছাদে ছিল। কিন্তু উপন্যাসে এরূপ উল্লেখ নেই। প্রিয়নাথ নামক ব্যক্তির প্রমীলাকে এসরাজ দেওয়ার পাণ্ডুলিপি-কথিত বৃত্তান্তও উপন্যাসে অনুপস্থিত। পাণ্ডুলিপিতে এগারো অধ্যায়ের পর 'বারো' লিখিত পাঁচটি পাতার লেখা উপর-নীচে সরলরেখা দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে। কাটা পৃষ্ঠাগুলির পর পুনরায় বারো সংখ্যক অধ্যায় লিখিত হয়েছে। উপন্যাসটি এগারো অধ্যায়েই সমাপ্ত। উপন্যাসের নবম অধ্যায়ে যে নগেন-প্রমীলা বৃত্তান্ত আছে, পাণ্ডুলিপির দ্বাদশ অধ্যায়ে তাই উপস্থাপিত। তবে বর্ণনা একরূপ নয়, ছোটোখাটো তথ্যগত পরিবর্তন অনেক। যেমন, পাণ্ডুলিপি-ধৃত বারো অধ্যায়ে নগেন রূপসী নাম্নী আশ্রিতা বিধবা ও মা হেমলতার সঙ্গে সিমলা বেড়াতে এসেছে। নগেনের স্বভাবের নির্মমতাও স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে প্রত্যক্ষ বর্ণনার মাধ্যমে। পাণ্ডুলিপির ২১৭-২২২ পৃষ্ঠায় রূপসী ও নগেনের সম্পর্কের যে বিবরণ আছে উপন্যাসে তা অনুক্ত। পাণ্ডুলিপির পরবর্তী কয়েকটি পৃষ্ঠায় নগেনের স্নেহাস্পদ মানসিক রোগী জনৈক অপরিণতবুদ্ধি শচীন, কিংবা বিমলের মদ্যপানের প্রসঙ্গ, শ্যামাচরণ নামক নগেনের আশ্রিত এক পিসেমশায়, এ সবও উপন্যাসে অনুল্লেখিত। নগেন চরিত্রের বিস্তৃত বিশ্লেষণও উপন্যাসে লেখক বর্জন করেন, পাণ্ডুলিপিতে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শেষাংশে তা করা হয়েছে।

পাণ্ডুলিপির ২৩৯ পৃষ্ঠা-পরবর্তী অংশে প্রমীলার সন্তানসম্ভাবনার কথা আছে এবং তার জন্য দায়ি নগেন এ ইঙ্গিতও আছে। উপন্যাসের দশম অধ্যায়ে প্রমীলা ও বিমলের জননী অনুরূপার সন্তানসম্ভাবনার ও আঁতুড়ঘরে যাওয়ার কথা আছে। পাণ্ডুলিপিতে সদ্যোজাত কন্যাসহ অনুরূপা আঁতুড়ঘরে আছেন, এই বিবরণ পাই তেরো অধ্যায়ে। পাণ্ডুলিপি-ধৃত চোদ্দ অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হল :

> আঁতুড় হইতে বাহির হইয়াই অনুরূপা সব টেব পান। তাহার মাথা ঘুরিয়া ওঠে, তিনি বসিয়া পড়েন। কোলেব ছেলেটা (sic) মাটিতে পড়িয়া ট্যাটায় সেদিকে তাহাব দৃষ্টি পড়ে না। কন্যার স্তব্ধ মূর্তির দিকে চাহিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলেন, 'ওলো সর্বনাশী ওলো সর্বনাশী ওলো সর্বনাশী ! তাই তুই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতি ! তাই তুই তাই তুই—' তাহার বাক্‌রোধ হইয়া যায়।
>
> প্রমথ দিন-পাঁচেকের জন্য দেশে গিয়াছেন, একা একা কি করিবেন ভাবিয়া অনুরূপাব মাথা গরম হইযা ওঠে, ভয়ে হাত-পা পেটের ভিতর ঢুকিয়া যায়, রাত্রে ঘুমাইতে পারেন না, শুধু ভাবেন, শুধু ভাবেন।
>
> কন্যার সন্তানসম্ভাবনার মধ্যে তাহারই যেন মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।
>
> অবশেষে একদিন সন্ধ্যাকালে প্রমথ ফিরিয়া আসেন। ব্যাপার শুনিবামাত্র নগেনের উদ্দেশে উর্ধ্বশ্বাসে বাহির হইয়া পড়েন। ভাবেন, নগেন যদি মাথা নীচু করিয়া হাজার পাঁচেক বিবাহের খরচ বলিয়া দেয়. .

পৃ ২৪১

> ...এমনিভাবে চারদিন কাটিয়াছে। মাদুরে শুইয়া অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া আজ প্রমীলার মনে হইতেছিল আজীবন তাহার এমনিভাবেই কাটিয়াছে—সকলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিয়া, আলস্যে কাঁপর লাগিয়া, নগেনের কথা ভাবিয়া আর নাভীনিম্নে প্রাণভার বহিয়া।

পৃ ২৪২

> অথচ এ তাহার জানাই ছিল। কল্পনাতীত কিছুই ঘটে নাই। বিবাহ স্থগিত রাখিয়া নগেনের কাছে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে গেলে যে সকলের কাছে মাথা নীচু করিতে হইবে ইহাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এই অস্থায়ী লজ্জা ও অপমানের মূল্যে নগেনের কাছে জীবনব্যাপী সম্মান কিনিতে ভয়ও সে পায় নাই। তথাপি আজ যেন সহ্য হয় না।
>
> নগেন আসিয়া সাহস দেয় না কেন ? দশ-বারোদিনের মধ্যে একবার আসিয়া দেখা করিয়া যাইবার সময় সে পাইল না ?

জীবনেব জটিলতা পাণ্ডুলিপিব একটি পৃষ্ঠা

অনেক ভাবিয়াও নগেনের এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ প্রমীলা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। অসুখ হইলে খবর পাঠাইত ; প্রমীলা তাহাকে দিয়া সে প্রতিজ্ঞা করাইয়া নিয়াছিল। কেন সে তবে আসে না ? খবর দেয় না কেন ?

পৃ ২৪৩

সিমলা যাইবার আগে তাহার সকল আপত্তি সকল যুক্তিতর্ক হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা করে নাই বলিয়া অভিমানে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে রাজি করা নগেনের পক্ষে এতটুকু কঠিন ছিল না। এবং নগেনও তাহা ভাল করিয়াই জানিত। তাহার আপত্তির মূল্য কতটুকু ? কতটুকু জোর তাহার প্রতিবাদের ? কী এমন অখণ্ডনীয় ছিল তাহার যুক্তি ? না মানিলেই পারিত নগেন ? বলিলেই পারিত 'বাজে বোকো না মিলি, এ বিয়ে না হলে আমি সিমলা যেতে পারছি না ?—আর কি সে কথা কহিতে পারিত ?'

অতএব প্রমীলা ও নগেনের সম্পর্কের কাহিনি পাণ্ডুলিপিতে যেমন ছিল, মুদ্রিত উপন্যাসে অনেকটাই তাকে লেখক বদলে দিয়েছেন। বর্তমান উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে অধরের নির্বিকার অবস্থার সঙ্গে তুলনাসূত্রে প্রমীলার নিজের সম্পর্কে এইরূপ ধারণার পরিচয় বর্ণিত হয়েছে :

তাব [প্রমীলার] নিজের অবস্থা শোচনীয়, এক অদ্ভুত মানুষের অদ্ভুত খেয়াল তাকে শেষ করিয়া দিয়াছে, স্বামী থাকিতে সে কুমারী। দিন কাটিলে তার রাত কাটিতে চায় না, একটা ভোঁতা অশান্তি জীবনেব স্বাদ নষ্ট করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তিক্ত ও বিস্বাদ করিয়া দিতে পারে নাই। কঠিন অসুখে যেমন জীবনও থাকে না, মরণও থাকে না, একটা অকথ্য অবস্থায় দিন কাটিতে থাকে, প্রমীলার অবস্থাও অনেকটা সেই বকম।.

(মা রচনাসমগ্র-২ পৃ ১৬০)

এরপরই অধরের কাছ থেকে প্রমীলাকে বিবাহ করার প্রস্তাব এসেছে ও তদনুযায়ী বিবাহের দিনক্ষণ স্থিব হয়েছে। বিমলের পক্ষ থেকে বাধাদানের কোনো চেষ্টার কারণ ঘটেনি। অন্যদিকে নগেনেব সঙ্গে লাবণ্যের বিবাহের সংবাদও এসেছে। অথচ পাণ্ডুলিপিতে এ সবের বদলে আছে, প্রমীলার সন্তানসম্ভাবনাজনিত ঘনীভূত পারিবারিক সমস্যার কথা। শান্তার স্বামী গোলোকের প্রমীলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাবৃদ্ধির চেষ্টার কথা, যদিও গোলোকের সেই উদ্যমে প্রমীলা সাড়া দিতে পারছে না। পাণ্ডুলিপিতে গোলোকের সঙ্গে প্রমীলার কথাবার্তা এইরকম :

সত্যি কবে বল তো প্রমীলা আমায় তোমার একটুও ভাল লাগে না ?

প্রমীলা অতিকষ্টে বলিল, লাগে। (পাণ্ডুলিপি, পৃ ২৫৮)

পাণ্ডুলিপির কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে একস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজনৈতিক কারণে পুলিশ নগেনকে গ্রেপ্তার করেছে।

পাণ্ডুলিপির পনেরো পবিচ্ছেদের কিয়দংশ উল্লেখযোগ্য :

পৃ ২৬১

শান্তার শূন্য সিংহাসনে তাহার প্রতিষ্ঠার আয়োজন যে পাকা হইয়া উঠিতেছে প্রমীলা ক্রমে ক্রমে তাহা বুঝিতে পাবে।

কিন্তু গোলোকের কল্যাণে পরা সিঁদুরে তাহার কপালেব কলঙ্কচিহ্নটা এখন আর কেমন করিয়া চাপা দেওয়া যাইতে পারে এই কথাটা সে বুঝিতে পারে না।

এই অধ্যায়ের একটি অচিহ্নিত পৃষ্ঠায়, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৬৪ ও ২৬৫-র মধ্যস্থ পাতায় প্রমীলার চিন্তা :

এটাই তাহা হইলে জীবনধারণের সেরা কথা। মানুষের বিশেষ করিয়া মেয়েমানুষের সবখানি স্বাধীনতা পাকস্থলীতে পাক খায়—বাহিরে তাহার চিহ্নটুকুও নাই।

উপায় ভগবান সর্বাঙ্গেই দিয়াছেন—কিন্তু নাইবা দিতেন অমন উপায় ? স্বামীর ব্যবসা নাই বা করিত নারী জাতি ?

মুদ্রিত উপন্যাস একাদশ পরিচ্ছেদে শেষ হয়েছে, অধরের সঙ্গে প্রমীলার বিবাহ-সম্ভাবনার সংবাদে ও বিমল-কর্তৃক শান্তার রক্তমাখা ব্যান্ডেজ পুড়িয়ে ফেলার বিবরণে। এই পরিচ্ছেদ-সূচনায় প্রমীলার আত্মহত্যার চেষ্টা সম্পর্কিত সামান্য ইঙ্গিত আছে। পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তার মিল ও অমিল এইরূপ। উপন্যাসে আছে :

বিমল সারাবাড়ি প্রমীলাকে খুঁজিল। রান্নাঘরে ভাত-তরকারি ঢাকা রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে প্রমীলা নাই। সব ঘরগুলিতে একবার উঁকি মারিয়া সে ছাদে গেল।

চিলকুঠির গাঢ় অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সে চাহিয়া দেখিল, সমস্ত ছাদটা একবার চক্কর দিয়া আসিয়া উঠানের দিকে আলিসার উপর ঝুঁকিয়া প্রমীলা কয়েক মুহূর্তে নীচের অন্ধকারের গভীরতা মাপিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং ছিটকাইয়া ছাদের মাঝখানে সরিয়া আসিতেছে।

সেখানে দাঁড়াইয়া কী যেন সে ভাবিল। হঠাৎ সোজা আগাইয়া গিয়া আলিসার উপর উঠিবার চেষ্টা করিল।

বিমল আগাইয়া গেল। শক্ত করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ছাদের মাঝখানে টানিয়া আনিয়া ভর্ৎসনাব সুরে বলিল, এর মানে ?

প্রমীলা জড়ানো গলায় বলিল, প্রলোভন জয় করছিলাম দাদা।

বিমল তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। বলিল, এসব প্রলোভনের সঙ্গে খেলা করতে নেই মিলি। হঠাৎ প্রলোভনের জয় হয়ে যায়। আলসের ওপরে উঠে দাঁড়ালে মানুষের মাথা ঘুবে যায়, শেষে কোনদিকে জয় কোনদিকে পবাজয় খেয়াল থাকে না।

প্রমীলা অস্পষ্টভাবে বলিল, সেই তো ভালো দাদা। আত্মহত্যার পাপ হয় না।

কে বললে হয় না ? তোর মতো মনের অবস্থা নিয়ে আলসেয় উঠে দাঁড়াতেই আত্মহত্যার পাপ হয়।

(মা বচনাসমগ্র-২ পৃ ১৬৪)

পাণ্ডুলিপিতে সতেরো অধ্যায়ে বিমল অন্ধকার রাতে প্রমীলাকে ছাদ থেকে উঠোনে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করতে দেখছে :

পাগলের মতো ছাদে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ আলসের উপর ঝুঁকিয়া কয়েক মুহূর্ত নীচের অন্ধকারেব গভীবতা মাপিবার চেষ্টা করিযা প্রমীলা ছিটকাইয়া ছাদের মাঝখানে সরিয়া আসিতেছে এবং ঠায় দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতেছে।

বারকয়েক এমনি করিয়া সে আলিসার উপর উঠিবার চেষ্টা করিল।

শক্ত কবিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে ছাদের মাঝখানে টানিয়া আনিয়া বিমল চাপা ভর্ৎসনাব সুরে বলিল, এর মানে ?

প্রমীলা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। অকম্পিত কণ্ঠে বলিল, প্রলোভন জয় কবছিলাম দাদা। হাত ছাড়ো, লাগছে। (পাণ্ডুলিপি, পৃ ২৭৪)

পাণ্ডুলিপির সতেরো অধ্যায়ে প্রমীলাকে রক্ষা করার উপায় সন্ধানে বিমলকে নগেনের গৃহে যেতে দেখা যায়। হেমলতা প্রমীলার বিবাহের যৌতুক হিসাবে পাঁচ হাজার টাকার প্রত্যাশা জ্ঞাপন করেছেন। উপন্যাস শেষ হয়েছে সজনীর বাড়িতে বিমলের আত্মবিশ্লেষণে :

বিমল আজকাল বুঝিতে পারিয়াছে বজ্রাহত তরুর উপমাটা বইএ পড়িয়া তাহার যে হাসি পাইত তাহা সঙ্গত হয় নাই। তাহার অবস্থা ওর চেয়ে কোনও অংশেই ভাল নয়। শান্তার শোক তাহার সহিবে না। সে ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যেই সে ভাঙিয়া পড়িবে। এ ভাঙন কোনমতেই আর ঠেকানো যায় না।

সে শেষ হইয়া গিয়াছে।

শেষ হইয়া যাক সেজন্য তাহার দুঃখ নাই। কিন্তু অসম্পূর্ণতার তুলনাতেও সে যে অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। হৃদয়কে প্রাধান্য দিয়া বাঁচিতে গিয়া যাহারা হৃদয়কে অস্বীকার করিয়া বাঁচে তাহাদের চেয়েও সে যে ঠকিয়া গেল ?

(পাণ্ডুলিপি, পৃ ২৯৩)

পাণ্ডুলিপিতে এরপর 'সমাপ্ত' লেখা আছে। পাণ্ডুলিপিতে পরবর্তী চারটি পৃষ্ঠার লেখা উপর-নীচে টানা রেখায় কেটে দেওয়া হয়েছে। উক্ত পৃষ্ঠাগুলির বিষয় যথাক্রমে পাণ্ডুলিপিতে পূর্ববর্তী ২৭৮, ২৭৯, ২৮২ ও ২৮৩ পৃষ্ঠায় আছে।

উল্লেখযোগ্য যে প্রাপ্ত খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিটি মোট দুটি খাতায় বিভক্ত। প্রথম খাতার আরম্ভহীন পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৩৭ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খাতা শুরু হয়েছে পৃষ্ঠাঙ্ক ২৩৯ থেকে, শেষ হয়েছে ২৯৩ পৃষ্ঠায়, পরবর্তী চারটি পৃষ্ঠা লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও পাণ্ডুলিপিভুক্ত বহু পৃষ্ঠায় বর্জনচিহ্ন আছে। মাঝে মাঝে অনুচ্ছেদান্তে space শব্দটি লেখা।

পাণ্ডুলিপির ২০৩ পৃষ্ঠার পরবর্তী একটি পৃষ্ঠাঙ্কহীন পাতার নিম্নবর্তী অংশে একটি নারীমুখ আঁকা, যার মুখটি কাপড় জড়ানো। ছবির নীচে লেখা the face of an ever silent girl।

পাণ্ডুলিপিতে ২১৪ পৃষ্ঠার পরের দুটি পৃষ্ঠার লেখা বর্জনচিহ্নিত। পৃষ্ঠা দুটির মধ্যে দ্বিতীয়টিতে মধ্যবর্তী অংশে জানলার ভিতরে এক যুবকের মুখ কলম দিয়ে আঁকা। ২২৫ পৃষ্ঠার পরের পৃষ্ঠার লেখা কেটে দেওয়া। সেই পৃষ্ঠার শূন্যস্থানে দুই নরনারীর মুখ এবং জালবন্দী একটি পুরুষের মুখ আঁকা আছে।

পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার অংশ

প্রাগৈতিহাসিক

প্রাগৈতিহাসিক গ্রন্থভুক্ত অন্ধ গল্পটির দুটি স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপি পাঠের সঙ্গে মুদ্রিত পাঠের পার্থক্য নির্দেশের কারণে দুটি পাণ্ডুলিপি-পাঠই উদ্ধৃত হল। কালগত দিক থেকে কোনটি আগে-পরে জানা যায় না।

(পাঠ ১) সনাতন চক্রবর্তীর দুটি মেয়ে ছিল। মোহিনী ও রোহিণী। একটি বাড়িও ছিল সনাতনের। বেশ বড় বাড়ী, দোতলা। আর কিছু টাকা ছিল নগদ,—কয়েক হাজার। মেয়ে দুটির বিবাহ দিবার আগে একটা সহজ হিসাব সনাতন করিয়া রাখিয়াছিল যে উত্তরাধিকারিণী হিসাবে তার মৃত্যুর পর মেয়েরাই যখন ভাগাভাগি করিয়া বাড়ীটা পাইবে, পণ হিসাবে জামাইদের সে দিবে না একটি পয়সাও। কতদিনে সে মরিবে, মরার আগে বুড়ো বয়সের মতিচ্ছন্নতার দরুণ বিবাহাদি করার ফলে যদি তার আরও ছেলেমেয়ে হয় বাড়ীর ভাগটা তখন ফস্কাইয়া যাইবে—এইসব হিসাব করিয়া জামাইদের বাবারা যদি তাদের ছেলেদের তার জামাই করিতে পিছপাও হয়, তার ব্যবস্থা বরং সে করিয়া দিবে বিবাহের পণ হিসাবে জামাইদের নামে আগেই বাড়ীর ভাগ লিখিয়া দিয়া—পণ সে নগদ দিবে না একটি পয়সাও। বুড়ো বয়সে যখন চাকরী থাকিবে না জমানো টাকাটা তখন মদের খরচ বাবদ লাগিবে না তাহার ? কেউ কি তখন একটি পয়সা তাহাকে দিবে মদের জন্য !

মদ ? মদ সনাতন খাইত। মাতাল হইত না একদিনও, মনের ভুলে অন্যমনস্ক অবস্থায় স্বর্গীয়া পত্নীর কথা ভাবিতে ভাবিতেও নয়, তবু মদ সে খাইত রোজ। কি ভয়ঙ্কব মনেব জোর যে ছিল সনাতন চক্রবর্তীব ! কি আশ্চর্য্য ছিল যে তাহার হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ! বছর কাটিত একটির পর একটি। মৃতা স্ত্রীর জন্য রোজ হৃদয়টা কেমন একটা আশ্চর্য্যরকম কাণ্ড করিত বলিয়া রোজ সে খাইত মদ, মেয়ে দুটোর মনে আঘাত লাগিবে বলিয়া একদিনও সে হইত না মাতাল, আইনমতে মেয়েদের যা প্রাপ্য তার লোভ দেখাইয়া হিসাব করিত জামাই সংগ্রহের, আব ভগবান রাগ করিবেন বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিত প্রত্যেকটি পাপেব।

পাপ ? পাপ করিত নাকি সনাতন ? কি পাপ করিত। সনাতনের অন্তর্যামী হিসাবে, আমি, এই গল্পেব লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অবশ্য সে সমস্তের হিসাব রাখি আগাগোড়া, তবে কোনো লাভ নাই বলিয়া সে হিসাবটা আর দাখিল করিতে চাই না। পাপ অথবা অন্যায় না করিয়া মানুষ কি বাঁচিতে পাবে সংসারে ! দিন কি কাটে মানুষের অপরাধের বোঝা না বাড়াইয়া চলিলে ! অতি-মানুষেব কাটে, সাধারণ মানুষের নয়।

আর কোনও পাপ যে করে না, মানুষের মনে ব্যথা তো অন্ততঃ সে দেয়।' মানুষেব মনে ব্যথা দেওয়াব চেয়ে বড পাপ মানুষকে খুন কবাও নয়।

(পাঠ ২) দুটি মেয়ে ছিল সনাতন চক্রবর্তীর। মোহিনী ও রোহিণী। একটা বাড়ীও ছিল সনাতনেব। বেশ বড় দোতলা বাড়ী। আর ছিল কিছু নগদ টাকা—কয়েক হাজার। মেয়ে দুটিব বিবাহ দিবার অনেক আগেই মনে মনে সনাতন একটা মতলব করিয়া রাখিয়াছিল : ঠিক মতলব নয়, হিসাব। উত্তরাধিকারিণী হিসাবে তার মৃত্যুর পর মেয়েরাই যখন ভাগাভাগি করিয়া বাড়ীটা পাইবে, বিবাহের সময় পণ হিসাবে জামাইদের সে দিবে না একটি পয়সাও। মেয়েদের গয়নাগাটিও দিবে কম, যত কম দিয়া পারা যায়। বুড়ো বয়সে যখন তার চাকরী থাকিবে না, জমানো টাকা কটা তখন মদের খরচ বাবদ লাগিবে না তার ? কেউ কি তখন একটা পয়সা তাকে দিবে মদের জন্য ! বুড়ো বয়সের আর বাকিই বা কত ?

মদ ? মদ খাইত নাকি সনাতন ? কিছু কিছু খাইত বৈকি সন্ধ্যার পর। মাতাল সে হইত না একদিনও, মনের ভুলে, অন্যমনস্ক অবস্থায়, মৃতা স্ত্রীর কথা ভাবিতে ভাবিতে পর্য্যন্ত নয়। তবু মদ সে খাইত রোজ। কি ভয়ানক মনের জোর যে ছিল সনাতন চক্রবর্তীর ! কি আশ্চর্য্য ছিল যে তার হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ! বছর কাটিত একটির পর একটি, জীবনকে কাটিয়া কাটিয়া বছরগুলি যথানিয়মে যেমন কাটে, ধারালো এবং ভোঁতা। মৃতা, অনেকদিন ধরিয়া মৃতা স্ত্রীর জন্য হৃদয়টা রোজ নিয়মিতভাবে কেমন একটা বিশ্রী, শোচনীয় এবং অদ্ভুত কাণ্ড করিত বলিয়া রোজ সে খাইত মদ, মেয়ে দুটার মনে আঘাত লাগিবে বলিয়া একদিনও সে হইত না মাতাল, আইনমতে মেয়েদের যা প্রাপ্য শুধু তার লোভ দেখাই (sic) চেষ্টা করিত জামাই সংগ্রহের আর ভগবান রাগ করিবেন বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিত প্রত্যেকটি পাপের।

পাপ ? কি পাপ করিত সনাতন ? সনাতনের অন্তর্য্যামী হিসাবে আমি এই কাহিনীর লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অবশ্য সে সমস্তের হিসাব রাখি আগাগোড়াই, তবে হিসাবটা আর এখানে দাখিল করিতে চাই না।

লাভ তো কিছু নাই। পাপ অথবা অন্যায় না করিয়া মানুষ কি বাঁচিতে পারে সংসারে ? দিন কি কাটে মানুষের অপরাধের বোঝা না বাড়াইয়া চলিলে ! অতি মানুষেরও কাটে না, সাধারণ মানুষের তো কথাই নাই। আর কোনো রকম পাপ যে করে না মানুষের মনে ব্যথা তো অন্ততঃ সে দেয়। তার চেয়ে বড়ো পাপ মানুষকে খুন করাও নয়। মানুষকে যে দুঃখ দেয় না সে দেবতার চেয়েও বড়ো। কারণ, দুঃখই মানুষেব দেবতাকে জন্ম দিযাছে : সুখটা মানুষের নিজস্ব কীর্তি, দুঃখের দায়িত্ব দেবতার।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

অমৃতস্য পুত্রাঃ উপন্যাসের একটি বিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠ সংকলিত হল। উদ্ধৃত পাঠ অবশ্যই উপন্যাসের ষষ্ঠ অধ্যায় সূচনার অংশ। উপন্যাসোক্ত পাঠের সঙ্গে এই পাঠের প্রধান পার্থক্য ভাষাঘটিত, তা ছাড়া উপস্থাপনার বাক্যরচনাতেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

অনুপম,

এত লোক থাকিতে তোমাকেই যে এতবড় একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গেলাম, তাহাব কারণ, তোমাব মনেই এ ধাবণার উদ্ভব হওয়া সম্ভব যে, তোমায় ভালবাসি বলিয়াই আমি গলায় দড়ি দিলাম। আমার জন্য তোমার দুঃখ হইবে না এমন কথা বলিতেছি না, কযেকদিন গোপনে আমার জন্য কাঁদাও তোমার পক্ষে আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু তোমার জনাই আমি মরিয়াছি একথা ভাবিয়া সুখও তুমি পাইবে।

একে ত' এইরকম সুখ পাওয়াই মানুষের স্বভাব, তার উপর তোমার আমিত্ববোধটা একটু বেশি।

সেদিন আঙ্গুল কাটার কথা মনে আছে ? 'এই ভোঁতা ছুরিতে শেষকালে আমারি আঙ্গুল কাটল !' বলিয়া তোমার সে কি রাগ ! আমার আঙ্গুল কাটিলে তোমার জাগিত নিছক সহানুভূতি, নিজের আঙ্গুল কাটায় রাগেব জ্বালায় ব্যথাটাও ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিলে না। মিথ্যা অহঙ্কারে আমার শোকটাও তুমি ঠিকমত উপভোগ করিতে পারিবে বলিয়া ভরসা হয় না।..

সরীসৃপ

সরীসৃপ সংকলনের মহাজন গল্পটির তিনটি পাঠের পাণ্ডুলিপিচিত্র বাংলা আকাদেমির অভিলেখাগারে আছে। তন্মধ্যে তৃতীয় পাণ্ডুলিপিচিত্রটি মুদ্রিত পাঠের প্রায় অনুরূপ। কিন্তু অন্য দুটি পাঠ সম্পূর্ণত পৃথক। পাঠ দুটি যথাক্রমে :

(পাঠ ১) সকালবেলা খাতকেরা যাতায়াত করে, সময় বড় কম। পাঁচগণ্ডা পয়সা কর্জ দেওয়াব হাঙ্গামা অনেক। অন্ততপক্ষে আধঘন্টা হাত জোড় করাইয়া বসাইয়া না রাখিয়া কথাই বলিতে আরম্ভ করা চলে না, সেটা প্রথারও বিরুদ্ধে যায়। হবু খাতককে মাথায়ও তুলিয়া দেওয়া হয়। আধঘন্টা অবজ্ঞা কবিবাব পর উদাসভাবে বলা চলে, 'কিরে কানাই !'

কানাই তখন একগাল হাসিয়া বলিতে পারে, 'এজ্ঞে'।

তারপর আরও কিছুক্ষণ অবজ্ঞার পালা।

(পাঠ ২) কারণ কেউ জানুক বা না জানুক মানুষ কাঁদিলে মানুষেব ভাবান্তর হয়। যে কাঁদে তারও হয়। মুনিঋষিদেব চোখের জল ফেলা বারণ, তবু যদি কো‌ কারণে আমাদের সেই মুনিবরের সমুদ্র শোষণ করিবার আগে একফোঁটা চোখের জল পড়িয়া থাকে, সে ক্ষতির পূরণ হইয়াছে বলা চলে না। কাঁদিলে একফোঁটা কেন, চোখ দিয়া অনেক ফোঁটা জল পড়ে।

পঞ্চাননের জল ফোঁটা ফোঁটা পড়িবার সুযোগ পায় না, সূচনার অল্পক্ষণের মধ্যেই ধারা সৃষ্টি হইয়া যায়। মনে হয় যে যেন ম্যাজিকওয়ালা, চোখের কোণে ঝর্ণা সৃষ্টি করিবার ম্যাজিক দেখাইতেছে। খানিকটা কৌতুক জাগে, খানিকটা কৌতূহল জাগে, কিন্তু সহানুভূতি জাগে না একফোঁটাও।

মহাজন গল্পের এই মূল পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা ঢাকার বাংলা সংরক্ষিত আছে বলে মানিক-পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সরীসৃপ গুপ্তধন গল্পটির প্রথমাংশের সামান্য কয়েকটি পৃষ্ঠা রক্ষিত হয়েছে। প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠের কিছু পার্থক্যও দেখা যায়। পাণ্ডুলিপি থেকে সেই পাঠটি যথাযথ উদ্ধৃত হল :

বর্ষাকালে তো বটেই, বছরের অন্যসময়েও কুল্পী নদীর মেজাজ কুল্পী বরফের প্রধান গুণবাচক শব্দটার একেবারে বিপরীতে বিশেষণটার অধিকারী। হরিখালি এবং তার আশেপাশের কয়েকটা গ্রাম বড়ো নীচু। তাই মাইল পাঁচেক লম্বা, বড় শহরের সদর রাস্তার মত চওড়া এবং একতলা বাড়ির চেয়ে উঁচু একটা বাঁধ দিয়া নদীকে ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছে। বর্ষাকালে বাঁধের উপরে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলে বিস্ময় জাগে। এদিকে ভরা নদীর ছোটবড় ঢেউ বাঁধেব মাথার তিন-চার হাতেব মধ্যে আছড়াইয়া পড়িতেছে, এদিকে গ্রামের এলোমেলোভাবে ছড়ানো গাছপালা বাড়ীঘব, মাঝখানে দুদিকে যতদূব চোখ যায় ততদূব পর্য্যন্ত প্রসাবিত একটা প্রকাণ্ড মেটে সাপের মত নদীর বাঁধ।

হরিখালি গ্রামের নদীর ঘাটটা একেবারে বাঁধের গায়ে। ঘাট বলিতে তেমন কিছুই নয়, কযেকটা খাঁজ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। সাতবছর জেলে বাস কবিয়া ভাদ্রমাসের এক দুপুরবেলা ভীম মাঝি নামক হবিখালিবাসী জনৈক ডাকাত হরিখালির এই ঘাটে আসিয়া পদার্পণ করিল। ঘাট তখন প্রায় নির্জ্জন। একটা নৌকায় শুধু একজন বুড়ো মাঝি তামাক টানিতেছিল আর নদীতে ছিপ ফেলিয়া ঘাটের একপাশে বসিয়াছিল ঝাকড়া-চুলো কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের একটা ছোকরা। সে যদু মাঝির ছেলে ননী। সাতবছর দেখা-সাক্ষাৎ না থাকিলেও পরস্পরকে তাবা তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল। সুতরাং জেল-ফেরত ভীমকে সেদিন প্রথম যে অভ্যর্থনা করিয়া নিল হরিখালি গ্রামে, সে যদুমাঝিব ছেলে ননী : একদিন যে ভীমকে তাব মাংসপেশী আর মোটা লাঠিটার জন্য একরকম পূজাই করিত। ভীমের মাথাতেও তখন বাবরি চুলের ঝাঁক ছিল। ননীর ঝাঁকড়া চুল রাখিবার ধবন দেখিয়া সন্দেহ হয় এটা তাব সেই একদা-পূজ্য দেবতাটিরই অনুকরণ।

জেলে সাতবছব ভীমের মাথার চুল আধ ইঞ্চির বেশী বাড়িতে পায় নাই। ননীব মাথাব তুলনায় নিজের প্রায়-ন্যাড়া মাথাটায় সলজ্জভাবে হাত বুলাইয়া ভীম বলিল, 'কিরে ননী !'

ননী উত্তেজিতভাবে বলিল, 'ভীমকাকা ! কবে ছাড়ান পেলে ভীমকাকা ?'

'পরশু। একবছর মাফ্ দিলে কিনা, নয়তো আরেক বছর রইতে হোতো জেলে।—

মস্ত হয়ে গেছিস ননী তুই—গোঁপ গজিয়েছে তোব !'

তাই বটে। জেলের বাহিরে নবজীবনের সূত্রপাতে ননীর গোঁপ গজানোর বিস্ময়টাই ভীমের সবচেয়ে বড়। ননীর সমবয়সী একটা ছেলে রাখিয়া গিয়াছিল ভীম,—মেজ ছেলে কার্ত্তিক। কে জানে তারও গোঁপ গজাইয়াছে কিনা, মাথায় সে রাখিয়াছে কিনা ননীর মত ঝাঁকড়া চুল। অজানাকে জানিবার ভয়ে অনেকক্ষণ ভীম কৌতূহলটা চাপিয়া রাখিল। ছিপ গুটাইয়া ননী যখন তাব পাশে পাশে গ্রামের ভিতবের দিকে চলিতে আরম্ভ কবিল তখন পর্য্যন্ত।

ননী ভীতকণ্ঠে জানাইল, 'কাত্তিক নাই ভীমকাকা, সগ্‌গে গেছে।'

ভীম দাঁড়াইয়া পড়িল। তারপর বসিল পথের ধারে একটা আমগাছের তলে আমগাছেরই একটা কুড়ুল-কাটা মোটা গুঁড়িতে। হাউহাউ করিয়া কাঁদিবার সময় যেমন দেখায় প্রায় তেমনই দেখাইতে লাগিল মুখখানা ভীমের, তবে সে কাঁদিল না। পরিবারের সকলের খবর জিজ্ঞাসা করিতে এতক্ষণ তার বড় ভয় করিতেছিল। কয়েকটা দুঃসংবাদ যে শুনিতেই হইবে তাতে সন্দেহ ছিল না ভীমের। মেজছেলেটা মরিয়া গিয়াছে শুনিয়া প্রাণটা ভীমের মোচর খাইয়া গেল বটে, বাকি দুঃসংবাদগুলি শুনিবার আতঙ্ক আর রহিল না। ভয়ানক শোকে হৃদয়টা হঠাৎ গোঁয়ার হইয়া গেল তার।

ননী সব খবরই দিল। কার্ত্তিক মরিয়াছে অনেকদিন, ভীম জেলে যাওয়ার দু'বছর পরে, গ্রামে যেবার কলেরা হইয়াছিল না, সেইবার। ভীমের বড় ছেলে মধু ? জেলে তার সঙ্গে ভীমের দেখা হয় নাই ? বাপকে মিছামিছি জেলে দেওয়ার জন্য...(অসমাপ্ত)

সরীসৃপ-সংকলনের অন্তর্গত প্যাঁক গল্পের প্রথম পৃষ্ঠার একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিচিত্র অনুযায়ী গল্পসূচনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ এইপ্রকার :

আর লেখা গেল না, কিছুক্ষণের জন্য আর লেখা সম্ভবও নয়। হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে অনঙ্গ। মোটর কোথায় ? শকুন্তলা কোথায় ? কোথায় শকুন্তলার মোটরের হর্নের মতো নরম নিটোল দুটি স্তন ? কোথায় হাঁস ? কোথায় রান্না-করা হাঁসের শক্ত মাংস ? গাছতলা, কাঁটা-ঝোপ, ঝরাপাতা, মরা ফুল এসব অনঙ্গ না হয় বাদ দিল, কিন্তু হাতের মুঠায় সে হর্ন কই যে হর্ন বাজে আর যে হর্ন বাজে না ?

একতলার ভাড়াটে শিবচরণ ট্যাক্সি চালায়, অনেকদিনেব পুবাণো ট্যাক্সি। গাড়ীটার তুলনায় বৌ শিবচবণের অনেক নতুন, সবে তিন নম্বর সন্তানকে স্তন দিতে আরম্ভ কবিযাছে। তবু যে হর্ন বাজাইয়া শিবচবণ . (অসম্পূর্ণ)

উক্ত সংকলনের বিষাক্ত প্রেম গল্পের আর একটি খণ্ডিত অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি থেকে দেখা যায়, কাহিনির চরিত্রনামই শুধু পরিবর্তিত হয়নি, বিন্যাসও অনেকভাবে পরিবর্তিত করেছেন লেখক। পাণ্ডুলিপি চিত্রের তৃতীয় পৃষ্ঠার প্রাপ্ত অংশের পাঠ :

..দেখতেও সে মন্দ নয, গানও জানে চলনসই, মানুষ ভোলাবার কায়দাতে পটুতাও তার অসাধাবণ, স্বামীকে ত্যাগ করে এসে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনও করছে এগার বার বছরেব কাছাকাছি। সুতরাং গায়ে গযণা আব আসবাব ছিল তার প্রচুর।

তবে গায়ের অধিকাংশ গয়ণাই তার গিল্টি করা সোণার, আসবাবগুলি নীলামে কেনা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড জিনিষ। আসল সোণাব গয়ণাগুলি দুর্গা এমন এক জায়গায লুকিয়ে বেখেছে, যেখানে সাধারণ চোবেব পক্ষে সে গযণাব নাগাল পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আসবাবগুলি তার আদায়-করা উপহার,—আদায় কবা উপহাব যে সাধাবণতঃ নীলামে কেনা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড জিনিষ হয় সে খবর জানা থাকায় দুর্গাব কোনো আপশোষ নেই। তা ছাড়া তিন পুরুষের একটা ভাঙ্গা খাট আর উইয়ে ধবা একটা কাঠেব আলমাবীতে সাজানো স্বামীর মেটে ঘবেব তুলনায সাহেব-বাড়ীর সেকেণ্ডহ্যাণ্ড আলমাবী টেবিল, সোফা, কোচ, আয়না, টিপয় দিযে সাজান এতবড়ো ইঁটসুর্বকিব ঘরের শোভা কি সহজ মনোহর। খাটখানা কিন্তু নূতন—দুর্গার এই ঘরে মদ খেতে খেতে যে লোকটা বছব সাতেক আগে হার্টফেল করে মারা গিয়েছিল, তার স্নেহের দান। সাত বছবে খাট পুরাণো হয় না।

প্রথমদিন দুর্গার গায়ের গয়ণা দেখেই সত্য টের পেল সেগুলি ফাঁকি, তাই সবলভাবে নাক সিঁটকে বলল, ‘আবে ছ্যা, গিল্টি সোণা !’

দুর্গা আহত হবার ভাণ কবে বলল, ‘খাঁটি কে দিচ্ছে ? দাও না আসলি এনে—মোটে তো কটা !’

সত্যর পবের কথাটায় শ্লীলতা বইল না, দুর্গা আন্তরিক কৌতুক বোধ কবে হেসে লুটিযে পড়ল।..(অসম্পূর্ণ)

সম্পাদকমণ্ডলী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি

১৯০৮ জন্ম, ১৯ মে মঙ্গলবার। বঙ্গাব্দ ১৩১৫, ৬ জ্যৈষ্ঠ। জন্মস্থান সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকা শহর। পৈতৃক নিবাস বর্তমান বাংলাদেশে, ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালপদিয়া গ্রাম।

পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা দেবী। পিতামাতার পঞ্চম পুত্র—পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাকনাম মানিক।

পিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব বিজ্ঞান-বিভাগেব গ্রাজুয়েট। সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো এবং শেষ পর্যন্ত সাব-ডেপুটি কালেকটর পদে পিতার চাকরির সূত্রে লেখকের বাল্য-কৈশোর ও ইস্কুলের শিক্ষাজীবন বিক্ষিপ্তভাবে অতিবাহিত হয় উড়িষ্যা, বিহার ও অখণ্ড বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে—প্রধানত দুমকা, আড়া, সাসারাম, সমগ্র মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশ, কুমিল্লার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়া, বারাসত, কলকাতা, ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে।

১৯২৪ ২৮ মে, টাঙ্গাইলে মাতৃবিয়োগ।

১৯২৬ মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতে বিশেষ কৃতিত্বসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৯২৮ বাঁকুড়ার ওয়েস্‌লিয়ান মিশন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি এস্‌সি ক্লাসে ভর্তি হন। এই বছরেই কলেজেব সহপাঠীদের সঙ্গে তর্কে বাজি ধরে প্রথম গল্প 'অতসী মামী' বচনা কবেন এবং বঙ্গাব্দ ১৩৩৫-এর পৌষ-সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৯২৮) 'বিচিত্রা'-পত্রিকায় তা ছাপা হয়। প্রথম গল্পের লেখক হিসাবে ডাকনাম 'মানিক' ব্যবহারেব কাহিনী নিজেই পরবর্তীকালে 'গল্প লেখার গল্প' নামক রচনায় বলেছেন।

তবে আকস্মিকভাবে প্রথম গল্প লেখার আগেই লিখিত, কৈশোরক কবিতাচর্চার নিদর্শনস্বরূপ প্রায় একশোটি কবিতা-লেখা সম্পূর্ণ একটি খাতা লেখকের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের ভিতর পাওযা গেছে।

১৯২৯ 'বিচিত্রা'-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্প 'নেকী' (আষাঢ় ১৩৩৬) ও 'বাথার পূজা' (ভাদ্র ১৩৩৬)। প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি বচনা এই বছরেই শুরু হয। ক্রমে সাহিত্যচর্চায় আগ্রহ পারিবারিক মতবিরোধের কারণ হয়ে ওঠে—শেষ পর্যন্ত কলেজেব শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে সাহিত্যকর্মেই সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৪ বঙ্গাব্দ ১৩৪১-এর বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকায় 'একটি দিন'-নামক বড়োগল্পের আকারে প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' শুরু হয় , ক্রমে 'একটি সন্ধ্যা', 'রাত্রি', এবং শেষ পর্যন্ত 'দিবারাত্রিব কাব্য'-নামে ধারাবাহিক প্রকাশের পর পৌষ ১৩৪১-এ উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয়। একই বছরে 'পূর্বাশা'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় 'পদ্মানদীর মাঝি', কিন্তু 'পূর্বাশা'র প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ায় উপন্যাসটিব ধারাবাহিক প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকে।

১৯৩৫ পূর্ববর্তী বছরের ডিসেম্বর কিংবা বর্তমান বছরের জানুয়াবি, বঙ্গাব্দ ১৩৪১-এর পৌষ সংখ্যা থেকে, 'ভারতবর্ষ'-পত্রিকায় শুরু হয় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। এই বছরেই গ্রন্থকার হিসাবে লেখকের প্রথম আবির্ভাব। উপন্যাস 'জননী', প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অতসী মামী', এবং গ্রন্থরূপে পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত 'দিবারাত্রির কাব্য', পর-পর প্রকাশিত হয় যথাক্রমে মার্চ, অগাস্ট ও ডিসেম্বব মাসে।

বর্তমান বছরেরই কোনো-এক সময়ে লেখক মৃগীবোগ বা Epilepsy-র আক্রমণে প্রথম আক্রান্ত হন—চিকিৎসার অতীত এই ব্যাধি ছিল তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী।

১৯৩৬ একই বছরে প্রকাশিত হয় তিনটি উপন্যাস—'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'জীবনের জটিলতা'।

১৯৩৭ একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রাগৈতিহাসিক', লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড-এর পরিচালনাধীন মাসিক ও সাপ্তাহিক 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকাবী সম্পাদক-পদে যোগদান ; 'বঙ্গশ্রী'-র তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন কিরণকুমার রায়।

বর্তমান বছরের শেষভাগে টালিগঞ্জ, দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়িতে বসবাস শুরু ; পরবর্তী এগারো বছর, পিতা ও অপর তিন ভ্রাতার একান্নবর্তী সংসারে, উক্ত বাড়িতেই বাস করেন।

১৯৩৮ ১১ মে, ২৮ বৈশাখ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, ময়মনসিংহ গবর্নমেন্ট গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং বিক্রমপুর পঞ্চসার নিবাসী, প্রয়াত সুরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় কন্যা শ্রীযুক্তা কমলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে উপন্যাস 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ও গল্পগ্রন্থ 'মিহি ও মোটা কাহিনী'।

১৯৩৯ ১ জানুয়ারি থেকে 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের চাকরিতে ইস্তফা। প্রায় একই সময়ে, পরবর্তী ভ্রাতা সুবোধকুমারের সহযোগিতায়, 'উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস' নামে ছাপাখানা ও প্রকাশনালয় স্থাপন।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ মাঘ-সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) 'পরিচয়'-পত্রিকায় 'অহিংসা' উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু (সমাপ্তি পৌষ ১৩৪৭)। অগাস্ট মাসে প্রকাশিত হয় চতুর্থ গল্পগ্রন্থ 'সরীসৃপ'।

বর্তমান বছরের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহবতলী'—'সহরতলী' প্রকাশের মধ্য দিয়েই উক্ত পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশের রীতি প্রবর্তিত হয়।

১৯৪০ বর্তমান বছরের গোড়ার দিকে লেখকের নিজস্ব প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত হয় তাঁব পঞ্চম গল্পগ্রন্থ 'বৌ' ; সম্ভবত এর পরেই প্রতিষ্ঠানটি উঠে যায়।

জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে 'সহরতলী' ১ম পর্ব। বঙ্গাব্দ ১৩৪৭ কার্তিক-সংখ্যা 'পরিচয়'-পত্রিকায় লেখক-সম্পর্কে প্রথম স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪১ প্রকাশিত গ্রন্থ 'সহরতলী' ২য় পর্ব, 'অহিংসা' ও 'ধরাবাঁধা জীবন'—তিনটি উপন্যাস।

১৯৪২ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহরবাসের ইতিকথা'। ১৫ মে তারিখে প্রকাশিত উপন্যাস 'চতুষ্কোণ', একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ।

১৯৪৩ 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকা থেকে পদত্যাগের পব লেখকের দ্বিতীয় এবং শেষ চাকরিজীবন শুবু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব মধ্যবর্তী কোনো-এক সময়ে—তৎকালীন ভারত সরকারেব ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রর্ভিন্সিযাল অরগানাইজার, বেঙ্গল দপ্তরে পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে তিনি যোগদান করেন এবং অন্তত বর্তমান বছরেব শেষভাগ পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় থেকেই অল ইন্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ-বিষয়ক প্রচাব ও আবও নানাবিধ বেতার-অনুষ্ঠানে লেখক অংশ নেন।

সেপ্টেম্বব মাসে প্রকাশিত হয় ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বাদ'।

বঙ্গাব্দ ১৩৫০ শারদীয় যুগান্তর পত্রিকায় 'প্রতিবিম্ব'-নামক ছোটো একটি উপন্যাস—সম্ভবত একই বছবে, বা পববর্তী বছর, উপন্যাসটি গ্রন্থরূপেও প্রকাশিত হয়।

১৯৪৪ ১৫-১৭ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘেব দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। ক্রমে এ-দেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বর্তমান বছবেই ভাবতেব কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টির সাহিত্য-ফ্রন্টের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। ২৫-২৭ অগাস্টে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সাধারণ অধিবেশনের অন্যতম সভাপতি। একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ, গল্পসংকলন 'ভেজাল'।

১৯৪৫ ৩-৮ মার্চে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিবোধী লেখক ও শিল্পী সংঘেব তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীব অন্যতম সদস্য। বর্তমান সম্মেলনে পুনরায় সর্বভারতীয় সংস্থার সঙ্গে সঙ্গতি বেখে সংঘের বাংলা শাখাব নাম হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ' এবং এই সম্মেলন থেকে লেখক উক্ত সংঘেব পববর্তী বছরেব অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১২ মে তাবিখে কলকাতা বেতাব কেন্দ্র থেকে 'গল্প লেখার গল্প'-পর্যাযে ভাষণদান।

অক্টোবর-ডিসেম্ববের বিভিন্ন দিনে, আঠারো-উনিশ শতকীয় বাঙালী সঙ্গীতকার-বিষযে পর্যাযক্রমিক বেতার ভাষণ। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্পগ্রন্থ 'হলুদপোড়া' এবং উপন্যাস 'দর্পণ';

১৯৪৬ পর-পর প্রকাশিত হয় পাঁচখানি গ্রন্থ ,

ফেব্রুয়ারি-মার্চ, 'সহরবাসের ইতিকথা', উপন্যাস।

এপ্রিল-মে, 'ভিটেমাটি', নাটক।

মে-জুন, 'আজ কাল পরশুর গল্প', গল্পগ্রন্থ।

জুলাই-অগাস্ট, 'চিন্তামণি', উপন্যাস।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 'পরিস্থিতি', গল্পগ্রন্থ।

১৬ অগাস্ট ও পরবর্তী কয়েকটি দিনের ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, দাঙ্গা-বিধ্বস্ত টালিগঞ্জ অঞ্চলে, জীবন বিপন্ন করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও মৈত্রী প্রযাসে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

১৯৪৭ প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি : উপন্যাস 'চিহ্ন' ও 'আদায়ের ইতিহাস' এবং গল্পগ্রন্থ 'খতিয়ান'।

ডিসেম্বরের শেষভাগে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্যসম্মেলনে গণসাহিত্য শাখার সভাপতি।

১৯৪৮ দুটি গ্রন্থের প্রকাশ : গল্পগ্রন্থ 'ছোটবড়' ও 'মাটির মাশুল'।

১৯৪৯ ৫ ফেব্রুয়ারি, টালিগঞ্জ-দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়ি থেকে বরানগর, গোপাললাল ঠাকুর রোড-এব ভাড়াবাড়িতে উঠে আসেন এবং অবশিষ্ট জীবন সেখানেই বাস করেন।

৭ ফেব্রুয়ারি, লেখকের পিতা তাঁর টালিগঞ্জেব নিজস্ব বাড়ি বিক্রয় করে দেন এবং ৪ ডিসেম্বর তারিখে স্থায়ীভাবে লেখকের কাছে চলে আসেন। আমৃত্যু তিনি লেখকের সঙ্গেই বরানগরের ভাড়াবাড়িতে বাস করেন—পুত্রের মৃত্যুব দুবছর পর মুমূর্ষু পিতা মারা যান।

এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি। সংঘের পূর্বতন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে লেখক এই সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন—'প্রগতি সাহিত্য'-নামক প্রবন্ধরূপে এই রিপোর্ট লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'লেখকের কথা'য় (১৯৫৭) সংকলিত হয়েছে।
চলচ্চিত্রে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'— ২৮ জুলাই মুক্তি পায়।
একমাত্র গ্রন্থ, 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী', গল্পগ্রন্থ।

১৯৫০ জুন থেকে অগাস্টের মধ্যে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'জীয়ন্ত', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির-কর্তৃক প্রকাশিত 'মানিক-গ্রন্থাবলী' ১ম ভাগ।

১৯৫১ বর্তমান বছরের প্রায় শুরু থেকেই দারিদ্র্যে এবং অসুস্থতায় ক্রমাগত আক্রান্ত হতে থাকেন।
'পেশা', 'সোনার চেয়ে দামী' (১ম খণ্ড। বেকার), 'স্বাধীনতার স্বাদ' ও 'ছন্দপতন'—চারখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৯৫২ আর্থিক সংকট চরমে ওঠে—তিন মাসের মধ্যে 'অন্তত পাঁচশত টাকা' সঞ্চয়ের লক্ষ্য নিয়ে সংসার-চালনার 'ত্রৈমাসিক প্ল্যান' নেন মে-জুলাই মাসে, যদিও তা 'প্ল্যান'ই থেকে যায়।
ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে পাঁচখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় : 'সোনার চেয়ে দামী' (২য় খণ্ড। আপোস), 'ইতিকথার পরের কথা', 'পাশাপাশি' ও 'সার্বজনীন'—চারখানি উপন্যাস এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির-কর্তৃক 'মানিক-গ্রন্থাবলী' ২য় ভাগ।

১৯৫৩ দারিদ্র্য এবং অসুস্থতার আক্রমণ অব্যাহত থাকে।
১১-১৫ এপ্রিল, লেখকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চম বা শেষ বার্ষিক সম্মেলন।
প্রকাশিত গ্রন্থ : 'নাগপাশ', 'আরোগ্য', 'চালচলন', 'তেইশ বছর আগে পরে'—চারখানি উপন্যাস এবং দুটি গল্পগ্রন্থ, 'ফেরিওলা' ও 'লাজুকলতা'।

১৯৫৪ দারিদ্র্য, এবং অসুখ ও আসক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণ আত্মরক্ষার সংগ্রাম—আত্মরক্ষা এবং আত্মহনন ক্রমেই একাকার হয়ে যায়।
বর্তমান বছরের একেবারে গোড়া থেকেই লেখকের ব্যক্তিগত ডায়েরির লেখায় ঘুরে-ফিরে দেখা দেয় একপ্রকার অতিপ্রাকৃত বা অতিলৌকিক প্রসঙ্গ।
প্রকাশিত গ্রন্থ : দুটি উপন্যাস, 'হরফ' ও 'শুভাশুভ'।

১৯৫৫ স্বেচ্ছানির্বাচিত দারিদ্র্য এবং চিকিৎসাতীত ব্যাধির যুগপৎ আক্রমণে অস্তিত্বসুদ্ধ বিপন্ন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত শুভানুধ্যায়ী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, স্থায়ী চিকিৎসার জন্য ইসলামিয়া হাসপাতালে ভর্তি হন ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে। মাসাধিককাল চিকিৎসাধীন থাকার পর ২৭ মার্চ, চিকিৎসকদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেই নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল ত্যাগ করে বাড়ি চলে আসেন।
বিপর্যস্ত শরীর-মনের শেষ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হয় লুম্বিনি পার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে—২০ অগাস্ট সেখানে ভর্তি হন এবং দু' মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ২১ অক্টোবর বাড়ি ফেরেন।
একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'পরাধীন প্রেম', উপন্যাস।

১৯৫৬ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'হলুদ নদী সবুজ বন'। বর্তমান বছরের গোড়া থেকেই ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির আক্রমণে একাধিকবার আক্রান্ত হন এবং ২৫ জুন তারিখে প্রায় মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। জুন মাসেই প্রকাশিত হয় জীবিতকালের শেষ গল্প-সংকলন 'স্ব-নির্বাচিত গল্প'। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে, লেখকের জীবিতকালে সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস, 'মাশুল'।
২ ডিসেম্বর, সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে নীত হন।
৩ ডিসেম্বর (বঙ্গাব্দ ১৩৬৩, ১৭ অগ্রহায়ণ), সোমবার অতি প্রত্যুষে উক্ত হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। নিমতলা শ্মশানঘাটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

সূচি : প্রথম খণ্ড